ইস্পাতের স্বাক্ষর

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

আশি

পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট পার্টি সরকারী অভিশাপে নির্বাসিত! নির্যাতন চল্‌ল অনেক। সক্রিয় কর্মী যাঁরা বিপ্লব প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে ধ্বংসমূলক কাজে ছেলেছোকরাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন, তাঁদের অনেকেই বন্দী। বাকী যাঁরা সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা মাটির তলায় চলে গেলেন—অর্থাৎ গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

সেদিন দেবজ্যোতিদের কোয়ার্টারেও পুলিস হানা দিয়েছিল—দেবিকার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা রয়েছে। দেবিকা বাড়িতেই ছিল তবু তাকে পুলিস ধরতে পারল না। ওয়ারেণ্টে একটা ভুল ছিল,—ওয়ারেণ্ট ছিল দেবকী মুখার্জির নামে অতএব সীতানাথ এবং দেবজ্যোতির চোখের সাম্‌নে দেবিকাকে ঢাকা কালো গাড়িতে উঠতে হ'ল না। তবে এও ঠিক যে, পুলিস আবার আসবে, ভুলটুকু শুধ্‌রে নিয়ে। ইত্যবসরে দেবিকা গা-ঢাকা দিল।

দেবজ্যোতির খুব হাসি পায়। দেবিকার মতো মেয়ে নাকি স্বদেশী মন্ত্রীদের গদি কাঁপিয়েছে! এ কথা কল্পনা করবে কি ক'রে দেবজ্যোতি। কতটুকু জানে, কি বোঝে দেবিকা? এই সব নিরীহ মানুষকে এত ভয় কি জন্যে? সত্যি কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড কিছু একটা করার ক্ষমতা এদের আছে? নাকি, নিছক আতঙ্কের বশে কংগ্রেসীরা এদের পিছনে পুলিস লেলিয়ে দিচ্ছে!

ক'দিনই বা দেশের হাতে স্বাধীনতা এসেছে! এরই মধ্যে দেশের একদল লোক অপর দলকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে। শুধু অবিশ্বাসই নয়, শত্রুতার চরমে পৌঁছেচে, নইলে সরাসরি জেলখানায় আটক ক'রে দাবানোর চেষ্টা হ'ত না। অথচ দেশের মানুষ ত এরা সবাই। ইংরেজের আমলে এরা সকলেই বিদেশী শাসনের বিপক্ষে সংগ্রাম ক'রে এসেছে। ইংরেজ যেই চলে গিয়েছে—অমনি প্রশ্ন উঠেছে অধিকারের। কংগ্রেসের আধিপত্য কমিউনিস্ট পার্টি মানবে না। এ স্বাধীনতা নাকি মিথ্যে, ভুয়ো!

দেবজ্যোতি বুঝতে পারে না, সত্য কোথায়! নিজেকে কোনো জবাব সে দিতে পারে না। তবু যখন মনে পড়ে যে, দেবিকার মতো সাধারণ মেয়ে, যার চরিত্রে এমন কোনো সমাজবিধ্বংসী মারাত্মক সম্ভাবনা নেই, তাকেও পুলিসের ভয়ে অভিযুক্ত দাগী ফেরার আসামীর মতো দিনরাত লুকিয়ে লুকিয়ে ফিরতে হচ্ছে,— তখন দেবজ্যোতি প্রতিবাদে মাথা নাড়ে। কোথায় যেন মস্ত একটা ভুল হচ্ছে।

কলকাতা থেকে অমলা এসে পৌছলো। দীনদয়ালের বাড়িতে অমলা আশ্রয় নিয়েছে। ছেলেকে সঙ্গে আনে নি, কি জানি কখন কি হয় বলা ত যায় না।

অমলাকে দেখে দেবজ্যোতি প্রথমে বিস্মিত হয়—তার চেয়ে খুশীই হয়েছে বেশি। অনেকদিন পরে যেন এক আত্মীয়ের সাক্ষাৎ পেয়ে দু'টো মনের কথা বল্‌তে সাধ হয় তার। কতকাল যে নিজের মধ্যেই নিজেকে আটক রেখেছিল আজ হঠাৎ মুক্তির সন্ধান পেল। মুক্তি আর কি, মন খুলে কথা বলতে পাওয়া —আর এমন লোকের কাছে বল্‌তে পাওয়া যে তার কথা বুঝবে ব'লে দেবজ্যোতির বিশ্বাস। মনে পড়ল সেই কলকাতায় যাওয়ার কথা। সে দিন অমলা রিক্ত, অবসন্ন, সহায়সম্বলশূন্য হ'য়ে মানিকপুর থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। আজ আবার সেই মানিকপুরেই আশ্রয় নিতে ফিরে এল। কিন্তু যে মানুষটা চলে গিয়েছিল এ যেন তার চেয়ে অনেক দিক দিয়ে আলাদা—তবু একটা জায়গায় অমলা সেই পুরনো অমলাই রয়েছে। ঠাকুরপো ব'লে পুরনো সুরেই দেবজ্যোতিকে ডেকেছে অমলা।

সাড়া দিতে দেবজ্যোতির একটুও দেরি হ'ল না—কি বৌদি!

—ভালো আছো? কতোকাল তোমাকে দেখি নি।

এ কণ্ঠস্বরে অভিযোগ নেই, আছে বেদনা।

দেবজ্যোতি বলে—এখন থাকছেন ত?

—হ্যাঁ ভাই, তোমাদের বিয়ের নেমতন্ন খেতে এসেছি!

বলেই অমলা হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে নিজেকে যেন বাড়িময় ছড়িয়ে দেয়।

ছড়িয়ে দেয় একটা আনন্দের সজীব সুরের ঝঙ্কার। সন্ধ্যার বিষণ্ণতা বিদীর্ণ ক'রে মোহময়ী রাত্রি রহস্য-মাখা মায়ার আলো নিয়ে এগিয়ে আসে।

মিণ্টু আর দীপুও এসে জুটল হাসির সাড়া পেয়ে।

দীপু বলে—আর ভাবনা নেই, এবার আমি প্রীতি উপহার লিখে রেখেছি। দেবুদা তোমাদের ইস্তাহার ছাপার প্রেস থেকে ছেপে দেবে ত !

—বেশ, নগদ মূল্য দিয়ো !

—ও বাবা। ঝানু ব্যবসাদারের মতো কথা বল্‌ছ যে।

দীপু অভিযোগ করল।

অমলা বল্‌ল—ওসব রাখ দেখি ! আগে দিনটা পাকা করি। কাকাবাবু আবার এই সময়ে কোথায় যে গেলেন ?

মিণ্টু গম্ভীরভাবে দেবজ্যোতিকে প্রশ্ন করে—বিকেলে পেটে কিছু পড়েছে ? মুখ তো শুকনো।

অপরাধীর মত দেবজ্যোতি বলে—নাঃ ঠিক কিছু খেতে ইচ্ছা ছিল না।

—বাড়ি গিয়েছিলে ?

—গেলেই হবে। এখন ত দেবি নেই যে, না-গেলে বকুনী খেতে হবে।

—এরকম করলেই চল্‌বে ? ওর কোন খোঁজ খবর পেয়েছ নাকি ?

—না পাওয়াই ত ভালো। আমি যদি খোঁজ পাই ত পুলিসেও পাবে। তার চেয়ে নিরাপদে থাকুক, যে কটা দিন থাকতে পারে।

দেবজ্যোতির কথায় দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল মিণ্টুর।

অমলা বল্‌ল—তোমার বাবাকে এখন বাড়িতে ধরা যাবে, ঠাকুরপো ?

—এ সময়ে তিনি রাধেশ্যামের মন্দিরে যান শুনেছি।

—কখন থাকেন বাড়িতে ?

—সে সময়ে আপনি যেতে পারবেন না বৌদি। তখন গভীর রাত্রি।

—আর কোনো সময়ে তাঁকে পাকড়ানো যায় না ?

—চেষ্টা করে দেখতে পারেন ! কিন্তু কেন বলুন তো ?

—সব কথা তোমাকে বলতেই হবে তার কি মানে আছে ?

—বেশ, বলতে না চান না-ই বল্‌লেন। তবে বিয়ের ব্যাপারে তাঁর

মতামত নিতে গেলে সুবিধে হবে না। কাকামণির সঙ্গে কথা যা কইবার ক'য়ে নিন্।

—কেন ?

—কৈফিয়ৎ শুনে কি লাভ! আমি বলি কি, কাজের কাজটুকু করতে পারেন ত তা করাই ভালো।

—ঠিক বুঝতে পারছি না ভাই! অনেকদিন দূরে দূরে রয়েছি, কত কথাই জানি নে ত। যাক্, তাহলে বিয়ের ব্যাপারে তুমিই কর্তা, এই দাঁড়াচ্ছে।

—আর দিদি গিন্নী!

দীপু বল্‌ল।

মিণ্টু ভ্রূকুটি করল—বড় ফাজিল হয়েছিস দীপু!

অমলা বল্‌ল—ওসব চল্‌বে না, দিদির গিন্নীপনার দৌড় ত দেখছি। এত দিনেও বিয়েটা ঘটাতে পারল না। আমি গিন্নীপনা কেড়ে নিলাম।

দেবজ্যোতি অনুযোগের সুরে বলে—না বৌদি, আপনি আমার তরফে চলে আসুন। দেখচেন ত আমি একলা!

—আহা, উনি একলা বল্লেই হ'ল। অমল জামাইবাবু, মল্লিকাদি, তার তিনমাসের ছেলে। সবাই তোমার পক্ষে। মুকুলদিও—আর মুকুলদি একাই ত একশ'!

দীপু ঝড়ের বেগে ঝগড়ার সুরে কথা বলে যাচ্ছিল। হয়তো অমলা বাধা না দিলে থামতো না সহজে। অমলা বল্‌ল—আচ্ছা ঠাকুরপো মানিকপুর কি এখনো আগের মতো আছে—আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করে!

—বেশ তো চলুন না আজই। স্বচক্ষে দেখে রায় দেবেন।

—নিয়ে যাবে ?

মিণ্টু ওদের দ্রুতগামী উৎসাহের পিছনে একটা মালগাড়ি জুড়ে দিল যেন, গম্ভীরভাবে বলল—জলখাবার খেয়ে বেরিয়ো কিন্তু!

ব'লেই মিণ্টু রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

দেবজ্যোতি বলল—আপনার পুরনো কোয়ার্টার দেখবেন বৌদি!

—সে ত আমার মনেই জ্যান্ত রয়েছে। ওইটুকু ছাড়া আর কিছু কি

দেখেছি এর আগে ? তখন ছিলাম বধূ। আর সত্যি কথা বলতে কি, ছেড়ে যাবার পর থেকেই যেন মানিকপুরকে ভালোবাসতে শুরু করেছি।

দীপুকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিল দেবজ্যোতি। কিন্তু দীপু বলল—না বাবা আমি যাচ্ছি না। অনেকদিন পরে আজ নিখিলদা আসবে, এবার সত্যি নাকি বিলেত যাবার ব্যবস্থা পাকিয়ে তুলেছে। ওকে খাতির যত্ন করি বাবা!

পথে বেরিয়ে অমলা বলল—কোথায় যাচ্ছি এখন ?

—এমনি পথে পথে ঘুরে বেড়াতেই ত চাইছেন।

—খানিকটা তাই বটে।

—তাহলে চলুন নতুন যে জলাটাকে বাঁধিয়েছে সেই দিকে। ভারী সুন্দর নাকি হয়েছে। শখ ক'রে বেড়ানো তো আমার ভাগ্যে জোটে না।

চলতে চলতে অমলা খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল, বলল—ও কী দৌড়চ্ছো কেন ?

অপ্রস্তুত হয়ে থমকে দাঁড়ালো দেবজ্যোতি। অমলা এগিয়ে এসে তার ডান হাতখানা চেপে ধরল—নাও এবার চলো, আস্তে আস্তে। আচ্ছা একটা কথার উত্তর দেবে ঠাকুরপো ?

—কী ?

—আমি একদিন তোমাকে যে বলেছিলাম, মানুষ যা চায় তা পায় না, মনে আছে ?

—ছিল না, কিন্তু এখন মনে পড়েছে বটে! আজ সে কথা কি জন্যে।

—আজ নয় কখনই আমি সে কথা ভুলতে পারি নি। যেদিন মন্দাকিনীর খবরটা শুনলাম সেদিন থেকেই যেন আরও বেশি ক'রে মনের ওপর ওই কথা-গুলো দাগ কেটে বসে গিয়েছে।

দেবজ্যোতি চুপ করে থাকে।

নির্জন পথ। রেল লাইনটা মাথার ওপর দিয়ে সরল রেখার মতো চলে গিয়েছে। তার তলায় সুড়ঙ্গ—সুড়ঙ্গের মাঝখানে বাঁধানো পথ, দু'সারি আলো বসানো দেয়ালের গায়ে গায়ে। সবাই বলে 'টানেল' গেট। কারখানার একটি দরজা টানেলের ওপারে, বিস্তীর্ণ জলার অপর প্রান্তে। নিজের পায়ের

জুতোর আওয়াজটা টানেলের মধ্যে কানে যেন বড় জোরালো শোনায় এই স্তব্ধ রাত্রে।

অমলা বলল—এটা কবে হয়েছে।

—আগেও ছিল, তবে কিছু সংস্কার করা হয়েছে যুদ্ধের সময়।

টানেলের এপারে কেউ নেই। প্রবেশের মুখে একটি প্রহরী ছিল ওপারে।

—মানিকপুরে এমন চমৎকার জায়গা আছে।

সুড়ঙ্গের এ পারটা শান্ত স্তব্ধ। সামনে তাকাও দেখবে কারখানার মাথায় রাবণের অতৃপ্ত অন্তর্জ্বালার মতো চিমনীটা শিখার জিহ্বা মেলে দিয়েছে। চোখ নামালে জলের ওপর নজর পড়বে। নিস্তরঙ্গ দীর্ঘিকার মতো লম্বা জলরেখার বুকে জ্যোৎস্না চিক্‌চিক্‌চিক্ করছে। থেকে থেকে লোহা গলানো ফার্নেসের ব্লাস্টে আচমকা অস্বাভাবিক উজ্জল আলোর ধাক্কা খেয়ে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ মায়াটুকু আহত হচ্ছে।

কথা বলছে না অমলা। মুগ্ধ আচ্ছন্নতায় ওর শ্রান্ত মন যেন ডুবে রয়েছে। কী একটা রাতচরা পাখী ডানা ঝাপ্‌টে গাছের ডালে-পাতায় শব্দতরঙ্গ তুলে ক্ষণেক বিশ্রাম নিতে বসলো।

দেবজ্যোতি অনুভব করে তার হাতখানা অমলার বুকের দপ্‌-দপানী টের পাচ্ছে। কখন যে নিজের বুকের ওপর হাতখানা তুলে নিয়েছে দেবজ্যোতি টের পায় নি। অনেক দিন আগের স্মৃতিতে সে মশগুল হয়ে ছিল। অমলার সঙ্গে এতক্ষণ পথ চলার অবকাশে মন্দাকিনীকেই বড় বেশী মনে পড়েছে। টুক্‌রো-টুক্‌রো ছবির মালা হয়ে মন্দাকিনী তার মনের সবটুকু যেন ঘিরে ধরেছে বিশেষ ক'রে শেষ দিনের কয়েকটি মুহূর্ত, আজ আবার হঠাৎ জীবনমুখর হয়ে উঠেছে।

এমন সময়ে এই আবিষ্কার! ইচ্ছে করছে হাতখানা সরিয়ে নিতে। কিন্তু টেনে নিতে গিয়েও দেবজ্যোতি পারল না। তার মনে হল এখনই একটা বিশ্রী অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হবে। অমলাকে সে যতটুকু দেখেছে—বুঝেছে তার মধ্যে কোথাও ছন্দপতনের সন্ধান মেলে নি। আশ্চর্য শক্ত মেয়ে। নিজের পায়ের উপর ভর করে যে মেয়ে চরম দুর্ভাগ্যকে মাড়িয়ে জীবনকে স্বপ্রতিষ্ঠ

করেছে তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে দেবজ্যোতির পৌরুষে আটকালো। অথচ, এই অবস্থায় কী যে করা যায় না ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

যেন কিছুই সে টের পায় নি, কিম্বা টের পেলেও এই সামান্য ছোঁয়াছুঁয়ির মধ্যে গূঢ় কোনো অর্থ বা ইঙ্গিত লুকোনো থাকতে পারে ব'লে সে অনুমানও করতে পারে না—সেটুকু বোঝাবার জন্যই দেবজ্যোতি সহজ ভাবে বল্‌লে—কেমন দেখছেন আজকের মানিকপুর?

কথা দিয়ে অমলার তরফের জবাব এল না। যেন কথার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে! একবার দেবজ্যোতির মুখের পানে তাকিয়ে অমলা হাসে। আস্তে আস্তে দেবজ্যোতির হাতে আরও টান পড়ে। অমলা বসে পড়ল ঘাসের ওপর, সে আকর্ষণে দেবজ্যোতিকেও অমলার গা ঘেঁসে বসতে হয়। মুক্তি পায় নি সে, অমলা কি আঁকড়ে ধরে রাখবে অনন্তকাল এমনি ক'রে?

অমলার মুখ দিয়ে হঠাৎ যেন অন্য কোন মানুষ কথা বল্‌ছে। ওর কণ্ঠস্বরও যেন অন্যরকম হয়ে গেছে—তোমাকে এমন করে কাছে পাবার সাধ যে কত যুগ ধরে পুষে রেখেছি দেবু! জানি তুমি হাসবে, আমাকে ছোটো হয়ে যেতে হবে তোমার চোখে! কিন্তু তোমারই কাছে ছোটো হবো তো, তাতে লজ্জা কী! না, না, কোনো কথা ব'ল না, আমাকে বল্‌তে দাও। তোমার চওড়া কপালে যখনই চোখ পড়েছে তখনই মনে মনে কতো চুমো খেয়েছি। সত্যি, কতো করে নিজেকে বুঝিয়েছি—যুক্তি দিয়ে নিজেকে শাসিয়েছি কিন্তু কিছুতেই পারলাম না।

দেবজ্যোতির হাতখানা অনেক আগেই ঘামে ভিজে উঠেছিল। তার কান মাথা অব্যক্ত এক উত্তাপে ঝাঁ ঝাঁ করছে। মনে হচ্ছে, এ কী করছে সে! এমনি ক'রেই সে নিজেকে ভাসিয়ে দেবে?

মনের মধ্যে প্রতিবাদের প্রবল আলোড়ন চলেছে। অথচ বাইরে তার কোনো প্রকাশই নেই। কেন? তবে কি সেও অমলার এই মানসিক বিকারকে সমর্থন করেছে? না, না, তা হতে পারে না। কিন্তু অমলাকে বাধা দিতে পারছে না কেন!

অমলা বলে চলেছে—দেবু! সত্যি কথা বলো, আমার কাছে লুকিয়ো না!

—কী?

—আমার ওপর তুমি রাগ করেছ? এমনি ক'রে টেনে এনেছি ব'লে।

'হ্যাঁ' বল্‌তে গিয়েও পারল না দেবজ্যোতি। সাড়া দিল উল্টো সুরে—না।

অমলার কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য স্থৈর্য, ও বল্‌ল—আমি জানি মুখ ফুটে বল্‌তে পারছ না, পাছে আঘাত দেওয়া হয়। তুমি এত ভালো! তোমাকে আর কেউ চিনল না দেবু। কেউ তোমাকে ষোল আনা বুঝবেও না কোনোদিন। আমার শুধু এই দুঃখু। কিন্তু কীই বা করতে পারি! আমার ভাগ্যে শুধু দেখে যাওয়ার সুখ—দূর থেকে দেখা। তাতে সুখ নেই, দুঃখই জমে উঠেছে। কি জানি আমিও হয়তো তোমাকে ষোলো আনা বুঝি নে। যেটুকু বুঝতে পারি নে, তার জন্যে ভাবি নে। তোমাকে শুধু ভালোবাসতে চাই। কেন জানো?

থম্‌কে অমলা দেবজ্যোতির মুখের দিকে তাকালো। ওর এই হঠাৎ স্তব্ধতায় দেবজ্যোতিও তাকালো অমলার দিকে। তার মনে হ'ল যেন মন্দাকিনী! হ্যাঁ সেই চেনা চোখের চাহনী। তেমনি মন ঢেলে দেওয়া তরল সিক্ততায় উজ্জ্বল দৃষ্টি।

অমলা হঠাৎ দেবজ্যোতির গলা জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল।

স্তব্ধ বিমূঢ় দেবজ্যোতির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—বৌদি!

অমলা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। দেবজ্যোতির কোলের উপর মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে উঠছে অমলার সাদা শাড়ীতে ঢাকা পিঠখানা।

দেবজ্যোতি আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে—পথ দেখতে পাচ্ছে না সে! একটা নিদারুণ যন্ত্রণায় শরীর অস্থির হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে করছে অমনি করে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে। অমলার মতোই কোনো একটি আশ্রয় খুঁজে পেলে সেও স্বচ্ছন্দে নিজেকে কান্নার জোয়ারে ভাসিয়ে দিতে পারত। সেও যেন একটা পরম নির্ভরের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু অমলাকে ত সে আশ্রয় মনে করতে পারে না দেবজ্যোতি। তাই বুঝি ওই অসংখ্য তারার মধ্যে হারানো কোনো আশ্রয়কে খুঁজে পাবার এত চেষ্টা। চাঁদের দিকে

তাকাতেই দেবজ্যোতির নজর আটকে গেল কারখানার চিম্‌নীর লেলিহান শিখায়। মন তার নেমে এল মানিকপুরের মাটিতে। ওই চিম্‌নীর আলোর নীচে কালো কালো ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য অতৃপ্ত মূর্তি!…এখানে হাজার হাজার মানুষ জীবনীশক্তি বিকিয়ে দিয়ে কিনছে বাঁচবার আশ্বাস। হ্যাঁ, ওরা বাঁচবার জন্যই খাটে—আর খাটবার জন্য বেঁচে থাকে। রোজ ওরা কারখানায় গিয়ে পয়সা রোজগার করে, খেয়ে বাঁচবে বলে। আবার বাড়িতে ফিরে আসে, খাওয়া দাওয়া করে, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, পরদিন কারখানাতে খাটতে যাবে ব'লে। জীবনটা এই চাকায় বাঁধা। খায় খাটবে বলে—আর খেটে চলে খেয়ে বাঁচবে বলে! দেবজ্যোতিও ত ওদেরই একজন! ওদের জীবনে ত কোনো উপসর্গ নেই—আদর্শবাদের কোনো বাড়তি উপদ্রব নেই! ওরা বেশ আছে। জীবনকে সহজভাবে নিতে পেরেছে ব'লেই বেশ আছে। তবে কেন দেবজ্যোতি পারবে না জীবনকে সহজ করে চালিয়ে দিতে!

অমলার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে দেবজ্যোতি বলে—ওঠো, ওঠো! কেঁদো না!

অমলা ঘন ঘন মাথা নাড়ে। মুখ তুলছে না। চোখ তুলে তাকাতে পারছে না।

ওদের দু'জনকে চম্‌কে দিয়ে পৌনে দশটার বাঁশী বাজল।

আচম্‌কা অমলার মুখখানা দু-হাত দিয়ে তুলে ধরে দেবজ্যোতি বলে—কি চাও! তুমি কী চাও। আমার মতো দেউলে মজুরের কাছে তোমার আদর্শ-বাদী মন কী আশা করে?

—না, কিছু চাই নে। শুধু দিতে চেয়েছিলাম নিজেকে। কিন্তু কি দেবো? আমার সব যে কেড়ে নিয়েছে। কিছুই যার নেই, তার আর কি আছে দেবার। ভেবেছিলাম লুকিয়ে থেকে তোমাকে আড়ালে আড়ালে ভালোবেসে যাবো। কিন্তু এখন বুঝছি হাওয়াকে আঁকড়ে ধরে, নিছক ভাবকে ভালোবাসার মতো বিধবা মন আমার নয়। রক্তমাংসের দাবি তোমাকে

ছোঁবার পর থেকে নেশার মতো জড়িয়ে ধরেছে। ওগো তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, শুধু এটুকুই চাই।

দীর্ঘনিশ্বাসটা দেবজ্যোতির মুখে চোখে দমকা হাওয়ার মতো ছড়িয়ে দিয়ে অমলা গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো কোনো রকমে। স্খলিত স্বরে বল্‌ল—চলো ফিরে যাই। আমি বড় নীচ, তাই ভাবছো, না? কিন্তু জীবনে কোনো সাধই যার মিটলো না, সে যদি একবার, মাত্র একটি ভিক্ষে চায়—তবে কি সত্যিই নীচ হয়ে যায়, দেবু?

মুখখানা এমন আকুতি ভরা ভঙ্গীতে দেবজ্যোতির চোখের সামনে তুলে ধরেছে অমলা যে দেবজ্যোতি সব ভুলে গিয়ে অমলার তৃষ্ণাতপ্ত ঠোঁটে একটি চুম্বন এঁকে দিল। চোখ বুজে অমলা দেবজ্যোতির গালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে যেন নিজের মনে মনেই এমনি অস্ফুট স্বরে বলে—আর না, এবার চলো। পৃথিবীতে ফিরে চলো। এ আমার পরম সম্বল। দেবু, তুমি পারলে, এই অভাগীকে ক্ষমা করতে পারলে!

দেবজ্যোতির পায়ের তলায় মাটি যেন কাঁপছে। সে কি পাগল হয়ে যাবে নাকি? কি হয়েছে তার! পা-হাত সারাদেহ কাঁপছে—না, মাটি ত কাঁপছে না। চোখের সামনে থেকে জ্যোৎস্নার আলোটুকুও যেন শুষে নিয়েছে কে। হাতের কাছে যে নারীমূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকে যেন এখনই প্রবল আকর্ষণে নিজের সর্বাঙ্গের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ফেলবে সে। অন্ধ আবেগে সে যেন অমলাকে বুকে টেনে নিল। দেবজ্যোতি সব ভুলে গিয়েছে।

অমলার কথায় দেবজ্যোতির হুঁশ হ'ল—কী অমন দাঁড়িয়ে রইলে যে! চলো।

কথার ধাক্কায় সে চমকে উঠল। না, সে কিছুই করে নি। শুধু মনেরই ভুল!

—বৌদি, এ কী করলাম আমি?

—মন থেকে মুছে ফ্যালো। আমার পাগলামীকে পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাও। হ্যাঁ, তাই করো। এ কী তুমি কাঁপছো যে!

অমলা দেবজ্যোতির গায়ে হাত দিয়েই আবার সরিয়ে নিল—না, না। চলো ঠাকুরপো। আমি আর তোমাকে ছোঁবো না। আর নয়।

দেবজ্যোতি জোরে জোরে পা ফেলে খানিকটা এগিয়ে যায়। একখানা মোটরগাড়ি হেড্‌লাইট জ্বেলে কারখানার গেট থেকে দ্রুতবেগে বেরিয়ে আসে। দেবজ্যোতি আবার থমকে দাঁড়ায়, অমলা পিছনে পড়ে রয়েছে।

—ঠাকুর পো!

—কি।

—ক্ষমা চাইব না। চেয়ে আর সব পাওয়া যায় কিন্তু ক্ষমা যদি মন থেকে নেমে না আসে ত তা সত্যিকার ক্ষমা হয় না জানি ঠাকুরপো। কিন্তু একটা কথা তুমি বিশ্বাস করো—মিণ্টু আর তোমার মধ্যে আমি কাঁটা হতে চাই নি। বল্‌বে, তবে কেন এ কাজ করলাম? সত্যি, আমার কোনো হাত ছিল না। যদি পারতাম তাহলে মুছে দিতাম একটু আগের সব কিছু। তা যখন হয় না, তখন আর কি করবে বলো। আমি কথা দিচ্ছি কাল সকালেই এখান থেকে চলে যাবো।

—না।

—যাবো না! কিন্তু দিনের আলোতে তোমার সামনে এ মুখ আমি কি করে দেখাবো?

—চলে গেলে তোমার মুখই নয় দেখবো না। কিন্তু নিজের মুখ? সেটা ত আমার সঙ্গেই থাকবে? সত্যি নিজেকে আমি বড় করুণা করি। বেচারী যে মন্দাকিনী চলে যাবার পরও বেঁচে রইল! জীবনের ওপর এত মমতা কেন? সত্যি বৌদি, মন্দাকিনীর মতো মনকে নিজের মূঢ়তা দিয়ে হত্যা করলাম!

—তুমি হত্যা করলে তাকে? না সে বোকামী করল। তোমার মূল্য না বুঝে শুধু নিজের অভিমানটাকে বড় ক'রে দেখল! আমি সব শুনেছি মিণ্টুর কাছে ঠাকুরপো!

—না, না, বৌদি! মন্দাকিনী বড় চড়া স্বরে নিজেকে বেঁধে ছিল। সেই স্বরের সঙ্গে আমার সঙ্গৎ করার ক্ষমতা ছিল না—সে আমার নাগালের বাইরে

চলে গেল। তাই ওর অপমৃত্যু। ও ছিল স্বর্গের দূতী। ওর কাছে মন অনাবিল আদর্শ। সে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের কোনো চুক্তি ঘটল না। মিণ্টু বুঝবে কী করে? এখনও অবাক হয়ে যাই, যখন ওর মনের ছোঁয়া লাগে আমার মনে! ও মানুষ ছিল না।

—এখনও তুমি ওকে ভালোবাসো। না?

—ওকে বুঝতে চেষ্টা করি, শ্রদ্ধা করি! ভালোবাসবো যোগ্যতা কি আমার আছে বৌদি!

—ও কথা ব'ল না। তোমার ভালোবাসার ক্ষমতার বুঝি শেষ নেই ঠাকুরপো। নইলে আজ তুমি আমাকে সহ্য ক'রে গেলে কি ক'রে?

ওরা টানেল গেটের এপারে চলে এসেছে। দেবজ্যোতির নজর পড়ল জুনিয়র ইনস্টিট্যুটের মাথার আলোতে। সে বল্‌ল—বড় করতে চেয়ো না আমাকে। নিতান্ত সাধারণ মানুষ। এতে কোনো ভুল নেই। মিণ্টুর যদি একটা সদ্‌গতি করে দিতে পারতাম তাহলে বাঁচতাম। ওর জন্যে দুঃখ হয়, একটা খোসার ওপরই ওর জীবনের সব আশা ভরসা সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল!

—খোসা কাকে বল্‌ছ? না, না, এ ভুল তোমার ভাঙা উচিত। দুনিয়ার দিকে চোখ মেলে তাকালে বুঝতে পারতে মানুষের মধ্যে এটাই বড় দুর্লভ গুণ।

—কোন্‌টা?

—এক কথায় তার জবাব দেওয়া যায় না! মানুষ তো শুধু কথা দিয়ে গড়া নয় ঠাকুরপো! তোমাকে দিয়েই মানুষের একটা মাপকাঠি খাড়া করতে পারি। এই মাপের মানুষ খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। সত্যি বলছি।

—কেন আমাকে খুশী করতে চাও জানি নে! আজকে যে পরিচয় দিয়েছি, আমার মনের মাপকাঠিতে হিসেব করলে তাকে আমি—

—না, না, ব'ল না! ও কথা বলো না।

অমলার আর্তকণ্ঠে দেবজ্যোতি চমকে ঘুরে দাঁড়ালো—কি হ'ল!

বিকার গ্রস্তের মতো অমলা হেসে উঠল—কিছু না, তোমরা সুখী হও এই আশীর্বাদ করি ঠাকুরপো। আর কিছু নয়।

দরিয়া খাঁ সেলাম ঠুকে দেবজ্যোতির সামনে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—কি মুখুর্জি গুরু মেম সাহেবা ?

দরিয়া খাঁকে এতক্ষণ দেখতে পায় নি। তার কথায় দেবজ্যোতি ফিরে চাইল। পর মুহূর্তে দরিয়া খাঁর ভুলটুকু শুধরে দিয়ে বল্‌ল—নেহী ভাই, হামারা ভাবীজী।

দরিয়া খাঁ হাত জোড় করে বল্‌ল—মাপ করবেন ভাবীজী! নমস্তে!

দরিয়া খাঁর ভারী জুতোর আওয়াজটা ওদের পিছনে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

দরিয়া খাঁ চলে গেল—মানিকপুরের পুরোপুরি পরিবেশটা দেবজ্যোতির চোখের সামনে মেলে দিয়ে! পথ জনশূন্য হ'তে পারে, কিন্তু দেবজ্যোতির চোখে এখন বাস্তব মানিকপুর সজীব সক্রীয়। কে জানে ওই লোকটা এতক্ষণ কোথায় কোন্ অলক্ষ্যে থেকে দেবজ্যোতির গতিবিধির ওপর নজর রেখেছিল। হয়তো বা ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় মারণাস্ত্রের মতোই আজকের এ ঘটনার কাহিনীতে চড়া রং লাগিয়ে ব্যবহার করবে দরিয়া খাঁ। লোকটিকে দেবজ্যোতি ইদানীং রীতিমত সন্দেহ করে। ওর এই রহস্যময় আচরণের পিছনে কোনো গভীর অভিসন্ধি গোপন থাকা বিচিত্র নয়।

কিন্তু তাকে বেশি ভাবতে অবকাশ দেয় না অমলা, বলে—তাহলে কি করব বলো ঠিক ক'রে। চলে যাবো ?

দেবজ্যোতি চিন্তিত মুখখানা ফিরিয়ে দিল অমলার দিকে—কোথায় যাবে ?

—দরকার বুঝলে চলেই যেতে হবে। কোথায় সেটা তখন পথে পা দিয়ে ভাববো।

—না, অতখানি দরকার মনে হচ্ছে না বৌদি! আমার জন্যে ভেবো না, নিজের দিকে তাকিয়ে ছাখো, শেষ পর্যন্ত মানিয়ে চলতে পারবে কি না ?

—আমি? আমার কথা ছেড়ে দাও। বলেছি ত, তোমাদের পথের কাঁটা হবার সাধ নেই। সত্যি মিণ্টুকে আমি ভালোবাসি। ও যে তোমাকে কি চোখে ছাখে তাও অনেক দিন ধ'রেই জানি। সব সত্যি। নাঃ কাঙাল-পনার জন্যে এখন এত লজ্জা করছে।

—তুমি থাকো। তবে আজ আবার নিজেকে ওজন করে দেখবো।

—কিসের ওজন দেবু ?

—আচ্ছা ওকে যদি আমরা সব কথা খুলে বলি ? সে কি বুঝবে না ?

অমলা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেবজ্যোতির মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বল্‌ল—পাগল নাকি ? কখনো অমন কাজ করতে আছে ! ও হয়তো সুইসাইড্ করবে।

দেবজ্যোতি হতচকিত হয়ে প্রশ্ন করে—সুইসাইড্ ? কেন ?

—থাক তোমাকে অত কথা জানতে হবে না। দোহাই আমাকে ক্ষমা করো। এর চেয়ে জেলখানাতে আটক হওয়া ঢের ভালো। চলেই যাবো, হ্যাঁ !

দেবজ্যোতি বাধা দিল, বল্‌ল—না, না, জেলখানা মানুষকে অমানুষ করে দেয় বৌদি ! সেখানে যেয়ো না। বেশ, কথা দিচ্ছি, আজকের কোনো কথা কোনদিন কেউ জানবে না। তুমি জেলের কথা তুলো না—উঃ !

—এবার আমাদের সহজ হতে হবে ! বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়েছি।

—হুঁ ! আমি আর ভেতরে ঢুকবো না। দরজায় পৌঁছে দিয়েই চলে যাবো কিন্তু।

—বেশ।

—তাহলে জেলে যাবার জন্যে চলে যাচ্ছ না ত ?

—আচ্ছা তাই হবে। বিয়েটা দিয়ে তবে আমার স্বস্তি !

বলতে বলতে অমলা দীনদয়ালের কোয়ার্টারের গেট খুলল।

পথের ধারে আমগাছে মুকুল ধরেছে, বাতাস সুবাসিত। দেবজ্যোতি সেই সৌরভের ঘ্রাণ নিল।

একাশি

হঠাৎ কোথা থেকে একজন শ্রমিকের মারফতে খবর এল যে, বিমল চৌধুরী জানিয়েছেন—মানিকপুরের পুরনো ইউনিয়নের হিসেবে ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমা পড়ে রয়েছে, আর ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেটও তাঁর কাছে রয়ে গিয়েছে। বিমল চৌধুরীর ইচ্ছা, বকেয়া হিসাবপত্র চুকিয়ে দিয়ে নতুন ইউনিয়নের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া। তিনি একথাও জানিয়েছেন যে, তারিখ ঠিক ক'রে জানিয়ে দিলে বিমলবাবু স্বয়ং উপস্থিত হবেন। তবে তাঁর একান্ত অনুরোধ, পুলিসের কাছে ব্যাপারটা ফাঁস করা হয় না যেন। তাতে অযথা তাঁকে বিপদে ফেলা হবে। ইউনিয়নের সঙ্গে তাঁর কোনোই বিরোধ নাই! যদি নতুন ইউনিয়ন শ্রমিকদের যথার্থ কল্যাণ করতে পারে, তাহলে তিনি খুশীই হবেন। রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট ফেরৎ দেওয়ার মূলেও সেই শুভেচ্ছা! আর টাকা, সে ত কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়! উভয় পক্ষের সম্মতিপত্র স্বাক্ষরিত হ'লেই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সেটাকা নতুন ইউনিয়ন আদায় করতে পারবে।

রামঅওতার সব শুনলো। যে লোকটি খবর এনেছিল তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বল্‌ল—আচ্ছা ভাই ঠিক আছে, কাল তোমাকে বল্‌ব—কি করা যায়-না-যায়!

লোকটি আপত্তি জানালো—আজ সন্ধ্যেতে লোক আসবে খবর নিতে। দু-তিন দিনের মধ্যে বিমলবাবু এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবেন। তার আগেই সব মিটিয়ে দিতে চান।

চিন্তিত ভাবে রামঅওতার বল্‌ল—আচ্ছা, তুমি কাজ করো গিয়ে, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খবর দিচ্ছি।

সাইকেল নিয়ে রামঅওতার তখনই ছুটলো সীতানাথের কোয়ার্টারে—সেখানে দেবজ্যোতিকে না পেয়ে দীনদয়ালের কোয়ার্টারে গেল। সেখানেও দেবজ্যোতি নেই। অমলা বেরিয়ে এসে জানালো,—খুব সম্ভব দেবজ্যোতি অমল চৌধুরীর কোয়ার্টারে রয়েছেন।

অমলের বাড়িতে দেবজ্যোতিকে পেয়ে রামঅওতার খানিকটা আশ্বস্ত হ'ল।

এমন অসময়ে রামঅওতারকে দেখে দেবজ্যোতি খুব বিস্মিত হয়েছে। মনে মনে খুশীও হয়েছে! তার মনে হ'ল, হয়তো দেবজ্যোতির জন্য একটা কুলী টাইপ কোয়ার্টার আদায় ক'রেই রামঅওতার সাত-তাড়াতাড়ি সংবাদ দিতে এসেছে।

হেসে বল্‌ল সে—আসুন সিংজী ভেতরে বসুন! ব্যস্ত ব'লে মনে হচ্ছে যেন?

রামঅওতার তখনও হাঁপাচ্ছে। বল্‌ল—গুরু, তুমি আমাকে 'আপনি', 'সিংজী' ব'লে তামাশা করছ? কিন্তু একদম ফুরসৎ নেই গুরু! আমার ওপর বহুৎ গোসা হয়ে আছ মালুম!

—আরে না-না! তা এত তাড়াহুড়ো ক'রে না এলেই পারতে দাদা! দেখা ত হ'তই কারখানাতে।

রামঅওতার ঘরে ঢুকে চারদিকে চোখ বুলিয়ে সটান বিছানাতেই গিয়ে বসল।

দেবজ্যোতি হাঁক দিল—মল্লি, চা কর এক পেয়ালা।

—না, চা খাওয়ার সময় নেই। ডিউটি ফেলে বেরিয়েছি।

রামঅওতারের একথায় দেবজ্যোতি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল—ডিউটি! আরে চা-বিড়ি খাওয়াই ত এখন ডিউটি।

—মওকা মিল্‌নেসে কৌন্ ছোড়তা! আচ্ছা ভাই ডাঁটতে রহো। লেকিন এক মতলব ত দেও ভাই গুরু—

দেবজ্যোতি এবার গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে—আবার কি হ'ল। মারপিট—না কি ইন্‌কিলাব দিয়ে সব হাত গুটিয়ে বসেছে? আজকাল ওই এক হয়েছে, পান থেকে চুন খসেছে কি হাতিয়ার বন্ধ।

রামঅওতার একটু হাসলো—না, ওসব কিছু নয়। বড় ঘোরালো ব্যাপার আছে।

—তাও ত বটে, ইন্‌কিলাব সামলাতে তোমার রায়ই ত যথেষ্ট। তবে বলো শুনি, ঘোরালো ব্যাপারটা—

রামঅওতার চা খেতে খেতে বিমল চৌধুরীর বার্তা সবিস্তার বল্‌ল।

ওদিকে মল্লিকার ছেলেটা গোলমালে ঘুম থেকে উঠে পড়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে, তাকে কোলে তুলে নাচাতে নাচাতে দেবজ্যোতি শুনে যাচ্ছিল রামঅওতারের কথা। এক সময়ে সে ব্যস্ত ভাবে হাঁক দিল—ওরে ও মলি এদিকে আয়, ব্যাটাচ্ছেলে অকর্ম ক'রে সব ভিজিয়ে দিয়েছে, ছাখ ছাখ!

রামঅওতার মনে মনে বিরক্ত হয়। দেবজ্যোতির নির্লিপ্ততা যেন বড় প্রকট। কিন্তু মুখে সে কিছু বলে না।

মল্লিকা এসে ছেলেকে নিয়ে বল্‌ল—যা পারো না, তা করতে যাওয়া কেন! খুব হয়েছে, দাও ওকে—

মুক্তি পেয়ে দেবজ্যোতি রামঅওতারের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে, বলে—হ্যাঁ, তা, বেশ ত ভালো কথা! এর মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ আবার কোথায়?

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রামঅওতার তাকালো—আমি ঠিক ভালো সম্‌ঝাচ্ছি না গুরু! ইস্‌মে দোসরা কুছ্‌ মতলব জরুর রহ্‌ গিয়া হোগা!

—কি থাকতে পারে! তোমাদের ওই এক দোষ বুঢ়াউ, মানুষকে কেবল মতলব-ফিকির দিয়েই চেনো।

—দুনিয়াতে এ ছাড়া আর কি আছে! আচ্ছা, মতলব যদি না-ই থাকে ত এতদিন বাদ হঠাৎ বিমলবাবুর ভালবাসা হ'ল কেন, আগেও ত তিনি দিয়ে দিতে পারতেন!

—সোজা কথা, আগে হয়তো আশা ছিল ওঁরা ইউনিয়ন আবার দখল করতে পারবেন। এখন আর সে রকম চান্স নেই। তাই তিনি সম্পর্কটা ভালো রাখতে চান এও ত হ'তে পারে। নতুন ইউনিয়ন যখন পাকাপাকি ভাবে কায়েম হয়েছে তখন তার সার্টিফিকেট আটক রাখলে ইউনিয়নের অসুবিধে হ'বে, অথচ ওঁদের কোনো লাভও নেই।

রামঅওতার বল্‌ল—ব্যস! এতে আমাদের কোনো লোকসান নেই ত তুমি ঠিক বলছ!

—মনে ত হয় না।

—ব্যস, তবে আর কি, বলে দিই কাল রাতেই বিমলবাবু আসুন।

—বেশ ত!

—আচ্ছা, চলি এখন।

—আচ্ছা।

রামঅওতার বেরিয়ে যাচ্ছিল। দেবজ্যোতি বল্‌ল—দেখো বুঢ়াউ, খবরটা আব চাউর ক'র না। ইউনিয়নের তরফে কেবল তুমি আর সেক্রেটারী থাকলেই চল্‌বে। কোনোরকমে পুলিসের কানে খবরটা গেলে বিমলবাবুকে এ্যারেষ্ট ক'রে ফেল্‌বে। সেটা আমাদেরই বদনামী!

হাসতে হাসতে রামআওতার জবাব দিল—হাঁ এতো খাশ্‌ বাৎ! কিন্তু কালকের মিটিং-এ তোমাকেও থাকতে হবে, জরুর।

—দরকার দেখি না তার।

—আছে। আমার আবদার।

—বেশ।

রামঅওতার চলে যেতেই দেবজ্যোতি বিমর্ষ হয়ে পড়ল। তার স্বার্থবুদ্ধির জন্য একদিকে যেমন সে নিজের কাছে লজ্জিত, তেমনি অপরপক্ষে রামঅওতারের ঔদাসীন্যের জন্য ক্ষুণ্ণও বটে। রামঅওতারকে দেখে প্রথমে সে ভেবেছিল, এক খুপ্‌রীর একটা নিজস্ব আস্তানা হ'ল বুঝি। তার মনে একটু খুশীর হাওয়া বয়েছিল বই কি। কিন্তু তা না হয়ে, ইউনিয়নের জরুরী পরামর্শ হ'ল! তা হোক, দেবজ্যোতি এরকম কাজে নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিতে কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু তার নিজের প্রয়োজনের দিকটা এরা একেবারেই নজর দিয়ে ছাখে না কেন? আজকাল তোষামোদ পেয়ে পেয়ে এদের এমন অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে যে, তোষামোদ, ঝুলোঝুলি, ধরপাকড় ছাড়া কোনো কাজই এদের দিয়ে করানো যায় না! এমনটা কেন হবে? এক দেবজ্যোতিই নয়, আরও অনেক শ্রমিকেরই ত এই দুর্দশা।

ছেলেকে শোয়াতে এসে মল্লিকা দেখল দেবজ্যোতি বিছানার উপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে, তার দৃষ্টি ওই রাণীগঞ্জ-টালিছাওয়া ছাদের দিকে। মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল—কি এত আকাশ পাতাল ভাবছো দাদা?

—নাঃ, কিছু না।

—আমার কাছে লুকিয়ে কি লাভ? বলোই না!

—কি বলব? বল! এসব নিয়ে আলোচনা ক'রে কোনো লাভ আছে?

—তা নেই। কিন্তু ভাবনাকে ত ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

—হ্যাঁ, তাই দেখছি। অথচ মানিকপুরে ত কত লোকেই এধারে-ওধারে ওরকম বাজে মেয়েদের সঙ্গে থাকে! তাদের দেখে ত এই ধরনের লজ্জা টের পাই নে। কোনো মানুষের যদি সত্যিই দেহের ক্ষিদেটা বড় হয়ে দেখা দেয়—তার জন্যে এতই বা বিচলিত হবার কি আছে? সমর্থন করার কথা বলছি না, তবে—মানিয়ে চলার চেষ্টা ত করা চলে!

মনের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভঙ্গিতে দেবজ্যোতি কথাগুলো ব'লে যাচ্ছিল।

মল্লিকা ক্ষুব্ধ। ওর চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। মাথা নেড়ে বল্‌ল—মনে মনে যা মানতে পারি নে, সেটা বাইরে মানিয়ে চলার কি মানে হয়? তাছাড়া বাইরে লোকের সঙ্গে আল্‌গা ধরনের ব্যবহার বজায় রাখা সোজা—বাপ-দাদার বেলাতে ও নিয়ম খাটে না! আপন লোকের অন্যায় অপরাধও যদি হেসে উড়িয়ে দিতে চাও তাহলে সংসারের ধর্ম থাকে কোথায়! ভগবানের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবে পরে?

দেবজ্যোতি বোনের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—তুমি যতটা অপরাধ ভাবছো মল্লি, আসলে হয়তো সেটা অতোখানি নয়। তিনি ত কণ্ঠি-বদল ক'রে সেই বৈষ্ণবীকে মর্যাদাও দিয়েছেন। এমন ত নয় যে,—

দেবজ্যোতির কথা শেষ হবার আগেই মল্লিকা অসহিষ্ণুভাবে বল্‌ল—থামো! তুমি আর কতটুকু জানো। ও কি আজকের ব্যাপার? মা বেঁচে থাকতেও ওই মেছুনীর সঙ্গে বাবার ইয়ে ছিল। তা তখন আমরা জানতাম না, মা ঢেকেঢুকে রাখতেন। দিদিও সবই টের পেতো। এখন মাও নেই! যা ছিল ঢাকাচাপা ছিল। কিন্তু ঢাক পিটিয়ে লোক হাসানোর কি মানে হয়! বুড়ো বয়সে ভীমরতি না হ'লে কেউ এমন কাজ করতে পারে? ছি-ছি—আমার মরতে ইচ্ছে হয়!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দেবজ্যোতি বল্‌ল—মৃত্যু দিয়ে মহৎ কিছু কেনা যায় না বোন্। জীবনকে সহ্য করা বড় শক্ত। যাক্ যার ওপর হাত নেই, তার জন্যে

মাতামাতি ক'রে বাজে সময় নষ্ট। এখন বলো ক'দিনের ছুটি নিতে হবে আমাকে।

মল্লিকা গম্ভীরভাবে জবাব দিল—দিন পনেরো নাও।

—আরে অতদিন ছুটি নিয়ে কি হবে? বিয়ে ত একদিনের মামলা।

—জানি না বাপু! আমার আর ভালো লাগে না। দশটা-পাঁচটা নয় আমাদের একটি মাত্র ভাই তুমি—তোমার বিয়েতে কত আনন্দের সাধ ছিল। কিন্তু গ্রহের এমনি ফের, সবটুকুই এখন দায়সারা গোছের হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মল্লিকার কণ্ঠে বেদনা-বিরক্তি মিশিয়ে বিচিত্র স্বর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। দেবজ্যোতি স্বগত ভাবে একটু হাসে। আপন মনেই সে ভাবে, মল্লিকা মিথ্যে বলে নি। বিয়ের রঙ বল্‌তে যা বোঝায় তা কোনোদিন দেবজ্যোতির মনে ধরে নি। কিন্তু এরকম অপ্রীতিকর অবস্থাও সে কল্পনা করতে পারে নি। সীতানাথ ষোলআনা অসহযোগ ঘোষণা করেছেন। হা-ঘরের মেয়েকে তিনি পুত্রবধূ করতে নারাজ্। এর উপর মুকুল দেবজ্যোতিকে জানিয়েছে যে, নিজের কোয়ার্টার না-পেলে দেবজ্যোতি যেন বিয়ে না করে। অন্ততঃ বিয়ের পর মিণ্টুকে সীতানাথের কোয়ার্টারে রাখার কথা স্বপ্নেও ভাবা চলবে না দেবজ্যোতির—এই হচ্ছে মুকুলের ফতোয়া। বরং সে অমলের কোয়ার্টার থেকে বিয়ের পালা চুকিয়ে, দীনদয়ালের বাড়ীতেই বসবাস করতে পারে—তাতে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।······এ নিয়ে সেদিন তর্ক বিতর্কের মুখে মুকুল স্পষ্টই বলে ফেলেছিল—'যে মানুষ বুড়ো বয়সে মেছুনির-ঘরে পড়ে থাকে, আর মুখে রাধে-গোবিন্দ আওড়ায় সে যে ছেলের বৌকে মন্দ নজরে দেখবে এ আমি হলপ করে বল্‌তে পারি।'···সবচেয়ে খারাপ লাগে দেবজ্যোতির এই ভেবে যে, বিয়েতে তার এতটুকু মানসিক সায় নেই তবু সেই ব্যাপার ঘিরেই এত আলোড়ন চল্‌ছে। শুধু বিবেচনা আর কর্তব্যকে খাতির করতেই শত ঝঞ্ঝাট বাড়াতে হবে!

তাকে নির্বাক থাকতে দেখে মল্লিকা বল্‌ল—অমন হাত-পা গুটিয়ে পড়ে থাকলেই চল্‌বে বুঝি। ফর্দটর্দ করা দরকার।

—হুঁ!

বলে দেবজ্যোতি উঠে বসল।

—কোয়ার্টারের কথা কিছু হ'ল তোমার শিশ্নের সঙ্গে?

—না।

—তা কেন হবে! ওদিকে ছাতুয়া দেশোয়ালী ভাইদের বেলায় ত হরদম কোয়ার্টার স্যাংশন হয়ে যাচ্ছে। ও ঠিকই বলে,—

দেবজ্যোতি হেসে প্রশ্ন করল—ও, কে? ও অমল! তা অমল কি ঠিক বলে রে?

—সেকথা শুনলে তোমার আবার রাগ হয়ে যাবে বাবা! থাক।

—আমি বুঝি খুব রাগী, হ্যাঁ রে!

—আচ্ছা, আমি বুঝি তাই বলেছি। তবে ওদের নিন্দে করলে তুমি চটে যাও, তাই বল্‌ছিলাম। আসলে কি জানো দাদা, তোমার এই সিং-টিং সবাই আপনা-আপনির সুবিধে নিয়ে ব্যস্ত, তোমাদের বেলায় কিছু জোটে না। নইলে ও কি আর একটা কোয়ার্টার তোমাকে দেওয়াতে পারে না?

—পারলে ঠিক দিতো রে! আমার আর ক' বছরের চাকরী। অনেক পুরনো লোকের ক্লেম পড়ে পচ্‌ছে। মাঝখান থেকে হুট্ করে আমাকে দিলে, ওকে খেলো হ'তে হবে, আর আমারও মুখ থাকবে না। তার দরকারই বা কি, আমাদের ত ভালো কোয়ার্টার রয়েছে। ভেবে চিন্তে দেখলাম, বাড়ি থেকেই কাজকর্ম হওয়া ভালো।

মল্লিকা মাথা নেড়ে আপত্তির সুরে বল্‌ল—তা কি ক'রে হয়। শহরময় সব ঢিঢিক্কার পড়ে গিয়েছে বাবার কণ্ঠী নেওয়ার ব্যাপারে।

—পড়ুক। বুড়োকে খামোখা অপমান ক'রে কি হবে। তাছাড়া আমি ত মনে করি যে, ভুল যখন করেই ফেলেছেন তখন সেটা চাপা দিয়ে লুকিয়ে না রেখে, স্বীকার করতে পেরেছেন এটাই বড় কথা।

—তুমি থামো দাদা। চিরকাল অবুঝই রয়ে গেলে। একবার ভাবো দেখি, আক্কেল বিবেচনা থাকলে কেউ এমন কাজ করতে পারে—নেহাৎ বেহায়া হ'লে যা হয় আর কি!

মল্লিকার কথার পিঠে দেবজ্যোতি বল্‌ল—তাহলে তুই কি বলতে চাস যে,

ডুবে ডুবে জল খাওয়াটাই ভালো? আমি ঠিক উল্টোটা ভাবি,—যদি সাহস থাকে ত উনি ওই বৈষ্ণবীকে নিয়ে নিজের কোয়ার্টারে বাস করুন না।

—ওইটুকুই এখন বাকী। বকুলপুরের বাড়ি ঘর ত তাকে দানপত্র ক'রেই দিয়েছেন। বক্সী বাঁধের জমি বেচে হয়তো বোস্টমীর গলার মফ্‌চেন তাগা হবে। ওই মাগীই সব খাবে এ তুমি দেখো নিয়ো।

কথাগুলো দেবজ্যোতির কানে যেন ফার্ণেশের একঝলক আগুনের মতো উত্তপ্ত, দুঃসহ হয়ে ওঠে। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—তাকে গালাগালি করার আগে তোমার ঘরের লোকের কথা ভাবো।

উত্তেজনায় মল্লিকার কান দুটো লাল দেখাচ্ছে।

দেবজ্যোতি এর আগে কখনই সীতানাথ বা বৈষ্ণবীকে নিয়ে এতখানি মাথা ঘামায় নি। আজই প্রথম সে ভাবতে শুরু করেছে—মল্লিকার সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে এখন দেখতে পাচ্ছে এদের ভাবনায় অনেক গলদ রয়েছে।

ভাই বোন দু-জনেই চুপ করে রয়েছে। কারুরই যেন আর কিছু বল্‌তে ইচ্ছে নেই। মল্লিকার অভিমান হয়েছে তাই ও চুপ—আর দেবজ্যোতি বুঝতে-পেরেছে যে, তার নগ্ন উক্তি মল্লিকার মনে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে, এর পর সে আর কিছু বল্‌লে মেয়েটা আরও আহত হবে। কাজেই সে ওষ্ঠ সম্বরণ করে আছে। ঠিক এই অবস্থায় সাড়ে এগারোটার বাঁশী বাজ্‌লো।

দেবজ্যোতি ব্যস্তভাবে বল্‌ল—এখন আসি রে!

বিষণ্ণ ম্লান দুটি চোখ তুলে মল্লিকা বল্‌ল—তাহলে কি ঠিক করলে?

—অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন, বাবার কোয়ার্টার বয়কট করলে ব্যাপারটা নিয়ে ঘোঁট পাকাবে অনেক বেশি। যেই লোক বুঝবে যে সীতানাথ মুখুয্যেকে তার ছেলে পর্যন্ত ত্যাগ করেছে, অমনি সবাই জোর পাবে। তখন এই বুড়ো বয়সে বেচারাকে একলা নাকাল হ'তে-হবে। তার চেয়ে ওখানে হ'লে বিশেষ কিছু গড়াতেও পারবে না। আর আসল কথা, ঠগ্‌ বাছতে গেলে গাঁ উজোড়ের ভয় নেই?

—ত্যাখো, দিদি যা বলেছে সেগুলো—

—দিদি?

বলে দেবজ্যোতি মুক্ত কণ্ঠে হাসতে শুরু করল। তারপর গম্ভীর হয়ে গিয়ে বল্‌ল—তাকে বলিস, মায়ের শ্রাদ্ধের আগেকার দিনগুলোর কথা, আর সবাই ভুলে গেলেও তার ত মনে থাকা উচিত।

পরক্ষণে নরম সুরে দেবজ্যোতি বল্‌ল—না, থাক! ওসব আর কেন! কিছু বলে কাজ নেই রে।

মল্লিকার দু-চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নামে। কান্নায় ও যেন এখনই ভেঙ্গে পড়বে।

দেবজ্যোতি অপ্রতিভ হয়ে গেল।

ছেলেটা কেঁদে উঠেছে। মল্লিকা চোখ মুছতে আর ফুরসৎ পায় না। এখনই হয়তো বিছানা ভিজিয়ে ফেলবে। অমল ঘরে ঢুকেই নাক কুঁচ্‌কে বল্‌বে—'উঁ, কি বিশ্রী গন্ধ!'

দেবজ্যোতি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বেরিয়ে পড়ল। মল্লিকা ছেলে নিয়ে ব্যস্ত।

পথে অনেক লোক। টিফিনের ছুটি পেয়ে কারখানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। পথেই যাদের কাজ সেইসব সাঁওতাল কামীনেরা গাছতলার ছায়াতে বসে পান্তাভাত খাচ্ছে, কেউ বা পা-ছড়িয়ে গল্প করছে বিড়ি টান্‌তে টান্‌তে। হুশ্‌ ক'রে একখানা নতুন মডেলের চক্‌চকে মোটর বেরিয়ে গেল।

শিউকিষেণ ফোরম্যান আজকাল দেবজ্যোতিকে দস্তুরমত খাতির করে। পদমর্যাদায় সে উপরওয়ালা, কিন্তু সেটা কোনো কথাই নয়—দেবজ্যোতি ইউনিয়নের সবারই গুরু! সেদিন বিকেলের দিকে শিউকিষেণ এসে বল্‌ল—চলো গুরু, একদফে ক্যান্টিনে।

মুখ তুলে দেবজ্যোতি বল্‌ল—হাতে যে কাজ রয়েছে!

—আভি রহে দো ভাই, পিছে হোগা।

ওরা ক্যান্টিনে গিয়ে বস্‌তেই এপাশ-ওপাশ থেকে অনেকে জুটে গেল। টাইম অফিসের রাম হালদার, মেল্টিং শপের জটাধারী মাহাতো, মেকানিক্যাল সেক্‌শনের গদাই দত্ত, ঢালাই মিলের একশ'-এগারো, জিলিপী, আরও

অনেকে! ব্যাপার কা? দেবজ্যোতি এক নজর দেখে নিয়ে কেমন যেন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। সব শেষে এল সুবল দস্তীদার।

সে এসেই শিউকিষেণকে বল্‌ল—কি ব্যাপার এখানে এত হৈচৈ কেন ফোরম্যান সাহেব?

একটু হেসে শিউকিষেণ জবাব দিল—আরে ভাই, গুরু আজ আমাদের খাওয়াচ্ছে! জানো না সান্যাল বাবুর দামাদ্‌ হচ্ছে কি না গুরু!

—আরে তাই নাকি। দেবুদা আমি খেতে পাবো না?

দেবজ্যোতিকে কথা বল্‌বার ফুরসৎ দিল না একশ'-এগারো। একগাল হেসে তিলক কাটা কপাল নাচিয়ে সে বল্‌ল—আরে বৈঠ যাও ভাই!

সুবল দস্তিদার বসে পড়েই গদাই দত্তকে বল্‌ল—শুনেছেন দাদা একটা খবর? আপনাদের নেতাজী নাকি বিয়ে করেছিলেন!

আর যায় কোথায়! একশ-এগারো রক্তচক্ষু ঘুরিয়ে দাঁড়ালো—কভি নেহি! ঝুটা বাৎ মাৎ বোলো সুবল বাবু! সুভাষ বাবুকো হম খুদ পছন্‌তা।

গদাই ফোড়ন দিল—আর ভাই ব'ল না। আমিও ভেবেছিলাম বুঝি ওটা বাজে খবর, কিন্তু এখন দেখছি বিলকুল্‌ সত্যি কথা।

একশ-এগারো এবার গলা ফাটিয়ে চেল্লাতে শুরু করল—এই বাংলা জাহান্নামে যাবে, যতো সব কমবক্‌ত্‌ দালাল বদমাস এসে জুটেছে কারখানাতে, তারা কেউ কাজ করবে না—কেবল আজেবাজে 'গপ্‌' উড়িয়ে সময় কাটাবে।

সুবল গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—আচ্ছা-আচ্ছা ক্ষ্যামা দাও বাবা, সত্যি কথা আর বল্‌ব না। জহরলাল যে মদ খেতে ভালোবাসতেন সে কথাও বল্‌ব না।

এবার একশ-এগারো পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সুবলের ওপর। হনুমানজীর কৃপায় তার দুধ-ঘি-পুষ্ট ওজন বড় কম নয়। নেহাত সুবল চতুর ছেলে, আগে থেকে বিপদটা আঁচ ক'রে একটু পাশে সরে দাঁড়িয়েছিল তাই রক্ষে। আসামী হাতছাড়া হয়েছে, একশ'-এগারোর মুখের তোড় তাতে চতুর্গুণ বেড়ে যায়।

এই সময় অভিজিৎ সিং এসে জুটল। আজ আসানসোল কোর্টে তার

মামলা ছিল। কাজেই তাকে দেখে সবাই একশ-এগারোকে নিয়ে তামাসা করা ছেড়ে, অভিজিতের দিকে মনোনিবেশ করল।

মেণ্টিং শপের জটাধারী বল্‌ল—কি হ'ল সিংজী ?

অভিজিৎ হেসে উঠল—আরে ভাই ছোড়ো, যো হোগা সো হোগা! তারিখ লে লিয়া।

জিলাপীর ভাগনে কচৌড়ীরও, 'কেস' ছিল। সে প্রশ্ন করল—আরে কচৌড়ী কাঁহা গিয়া রে ?

অভিজিৎ গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—ও তো ফঁস গয়া !

—ক্যা ফঁস গিয়া ?

—হাঁ, এক বরিষ কে লিয়ে ডিষ্টিক আউট !

—রাখ্ শালা, ছোটা আদালতকো কৌন মান্‌তা। বর্ধমানমে আপীল কিয়া যায়—

—হাঁ, দরখাস্ত হুয়া ! লেকিন—

ব'লে অভিজিৎ একবার চারিদিকে তাকিয়ে গলা খাটো ক'রে বল্‌ল—বহুৎ মুশকিল হায় ! কচৌড়ী কা উপর খুদ মল্লিক সাহাবকা খেয়াল হো গিয়া !

গদাই দত্ত চোখ নাচিয়ে বলে—তা আর হবে না ! একবারে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছিল যে !

একশ-এগারো এতক্ষণে সামলে উঠেছে। সে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে—ক্যা ভাই—ক্যা হুয়া ?

গদাই ধমকের সুরে জবাব দেয়—বুড়োর এদিকে ত কপালজোড়া কাঠ-বেড়ালীর ডোরা, রাম-হনুমানের সাইনবোর্ড, আবার রসের গন্ধে নাক শুড়-শুড় করে ! শোনো তবে বলি, তোমার পেয়ারের মল্লিক সাহেবের—

এই পর্যন্ত বল্‌তেই একশ-এগারো বোমা ফাটার গর্জনে ধম্‌কে উঠ্‌ল—চোপ রও বদমাস! আগর মল্লিককা নামমে এক কুত্তাকো ভি বোলায়েঙ্গে—

শিউকিষেণ দেবজ্যোতির দিকে একবার তাকালো। দেখল দেবজ্যোতি চুপচাপ চায়ের কাপ নিয়ে বসে রয়েছে।

গদাই দত্ত বল্‌ল—আচ্ছা ভাই মল্লিক তোমার দুষমণ্‌ হয়েছে ত ! সেদিন

ওই যে গো, জি, টি, রোডের ধারে মদের ভাটি আছে না বিলিতি কোম্পানীর—

—হাঁ-হাঁ!

সায় দিল একশ-এগারো।

—সেখানে, তুমি ত জানো, মাগীদের আড্ডা!

একশ-এগারো দু-হাত কানে ঠেকিয়ে বলে—রাম কহো! হাম কুছ্ নেহি জান্‌তা ভাই!

গদাইএর চোখের চাহনী সরস হয়ে উঠেছে, সে বল্‌ল—আহা আমি কি বলেছি যে তুমি সেখানে বসতে যাও! তা নয়।—একদিন, তখন রাত প্রায় বারোটা, মল্লিক সাহেব নাকি দিসেরগড় থেকে মদ খেয়ে টর্‌র্ হয়ে ফিরছিল। আরে ওপাড়ায় তখনই ত মজার মরশুম। গাড়ি থামিয়ে বুঝি মল্লিক একটাকে জাপ্‌টে ধরে গাড়িতে তুলেছে। সেই সময় কচৌড়ী আর দরিয়া খাঁর দল গাড়ি ঘেরাও ক'রে হল্লা জুড়ে দিয়েছে।

—তারপর?

রাম হালদার ব্যস্তভাবে বলে—নে ভাই একটু তাড়াতাড়ি কর। উদিকে আবার শালা ছুটির সময় হয়ে এল! আমায় যেতে হবে।

—তারপর আর কি। ওরা ত তখুনি গাড়ি-বামাল নিয়ে থানায় যেতে চায়। মাগীটা কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। আশেপাশে বিস্তর ভিড়। শেষে মাগী-গুলো একজোট হয়ে বল্‌ল, এরকম ঝামেলা হ'লে ওরা এ তল্লাটই ছেড়ে চলে যাবে! তখন বুঝি একটা মিট্‌মাট্ হয়ে যায়। মল্লিকের মেজাজ সেই থেকে খাট্টা হয়ে আছে। অন্তত যে কটাকে সে শালা চিন্‌তে পেরেছে সে ক'টার দফা গয়া। সে তুমি বর্ধমানেই যাও আর হাইকোর্টেই যাও—মামলাতে বাবা ওই রায়ই দাঁড়াবে।

জিলিপী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—শালা কচৌড়ীটা বেহুদা বুর্‌বাক!

একশ-এগারো বল্‌ল—কভী নেহী! মল্লিকটাকে শায়েস্তা করতে পারলে বুঝতাম। তা হোক, জিতা রহো বেটা কচৌড়ী! লেকিন এক বাৎ গদাই বাবু, ওই ছোকরী খুবসুরৎ ছিল বহুৎ কি?

তার এ কথা সবাই একসঙ্গে হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

ক্যান্টিনের মালিক ললিত মুখুয্যে একপাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, এরা কেউ দ্যাখেও নি। কাজেই সে যখন কথা বল্‌ল তখন ওরা সবাই তার দিকে তাকালো। ললিত বল্‌ল—গদাই দা আসর জমাতে জানেন বটে। কিন্তু একটা কথা দাদা, মল্লিক সাহেবের মুঠো-বোঝাই বিলিতি মেমসাহেব, সে ওই ঘেয়ো বাজারে বেশ্যাদের টানাটানি করতে যাবে এটা যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না।

টাইম অফিসের হালদার চলে যাচ্ছিল, ললিতের কথায় মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল—নজর ভাই! কথায় বলে না, স্বর্গের রাজা করে দিলেও কুকুরের নজর ঠিক জুতোর দিকেই থাকে। যাক চলি।

দেবজ্যোতিও উঠে পড়ছিল, শিউকিষেণ বাধা দিয়ে বল্‌ল—কাজের কথাটা ত বলা হয় নি গুরু!

—আচ্ছা, সে নয় ডিপার্টমেণ্টে বসেই শোনা যাবে, চলুন!

—না, ওখানে সুবিধে হবে না! আর একটু বসো, এরা এখুনি খসে পড়বে—দ্যাখো না!

কথাটা ভাল বলে নি শিউকিষেণ। ছুটির বাঁশী বাজবার মুখেই যে-যার একে একে সরে পড়ল।

শিউকিষেণ শুরু করল—আমার একটা কথা শোনো গুরু। এ সেকশনে আর কতদিন তুমি এভাবে ঘষবে? এখানে কোনো আখের নেই। ডিপার্টে তোমার ওপরে আরো দু-জন লোক রয়েছে। আমি চলে গেলে তাদের চান্স দেবে কোম্পানী। ফোরম্যান হওয়া তোমার ভাগ্যে নেই। তাই ভাবছিলাম যে, যদি একটা বদলীর কাজে রাজী থাকো তো তোমার আখেরে ভালো হবে।

দেবজ্যোতি বুঝতে পারে না শিউকিষেণের কথা। সে প্রশ্ন করে—তার মানে?

মামলাটা শিউকিষেণ তিন কথায় বলে দিল, কোন এক বিলিতি কোম্পানী এই কারখানাতে একটা মোটর মেরামত করতে দিয়েছিল কিছুদিন আগে। মেরামতী কাজটা এমন নিখুঁত হয়েছে যে, সেই কোম্পানীর কর্তা খুশী হয়ে

শিউকিষেণের সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি শিউকিষেণকে মোটা মাইনে দিয়ে নিজের ফার্মে বহাল করতে চান। কিন্তু মেরামতের কাজটা ত সে নিজে হাতে করে নি, দেবজ্যোতিই করেছে। শিউকিষেণ সেকেলে লোক, হালফিল যে সব নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি বেরিয়েছে সে সবের খোঁজখবরও রাখে না। দেবজ্যোতি যে হরদম ডায়াগ্রাম এঁকে যন্ত্রের অন্ধি-সন্ধি ছকে তার ধারকাছ দিয়েও শিউকিষেণ যায় না। নিজের দৌড় সে জানে। অতএব সাহেবের কাছে স্পষ্টই বলে দিয়েছে আসল লোকটির কথা। সাহেব তাতেই রাজী। দেবজ্যোতির 'হাঁ' বলার ওয়াস্তা এখন।

সব শুনে দেবজ্যোতি বল্‌ল—একটু ভেবে দেখি!

—এতে আর ভাববার কি আছে তোমার, গুরু। ওখানে তুমি চারশ টাকা মাইনে পাবে। আর এখানকার মতো হাজারো মতলবের তলায় থাকতে হবে না। চলে যাও। আরে ভাই আমি যদি তেমন কাজ জানতাম তবে আমিই যেতাম।

দেবজ্যোতি হাসলো, বল্‌ল—মানিকপুরে যে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে!

এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে জিলানী ছুটে এল ক্যান্টিনে! দূরে কোথায় যেন এ্যাম্বুলান্সের গাড়ি ঘণ্টার ঢং ঢং করতে করতে ছুটে চলেছে।

জিলানীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেবজ্যোতি হেসে বল্‌ল—কি ইউনিয়ন মাস্টার, তোমার যে আর দেখাই নেই হে!

জিলানী সে কথার জবাব দিল না। সরাসরি এগিয়ে এসে দেবজ্যোতির হাত ধরে হিড়্‌-হিড়্‌ ক'রে টেনে নিয়ে চল্‌ল। শিউকিষেণের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দেবজ্যোতি বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে বল্‌ল—আরে চলো, যাচ্ছি। কিন্তু কি ব্যাপার জিলানী?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেবজ্যোতি অনুমান করতে পারে, সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটে গিয়েছে। এখন একটি কথাও জিলানীর মুখ থেকে বেরুবে না। একেবারে ঘটনাস্থলে গিয়ে যদি সে কিছু বলে!

ওরা চলেছে মালগাড়ীর পাশ দিয়ে রেললাইন ধরে। কারখানার ভেতর থেকে এই লাইনের ওপর দিয়ে মালভর্তি গাড়ি বোঝাই হয়ে বাইরে যায়।

আবার এই লাইনেই আয়রন ওর, লাইমস্টোন, কাঁচা কয়লা বোঝাই গাড়ি এসে ঢোকে। খট-খটাং শান্টিং হচ্ছে ওপাশে। কুলীদের কথার টুক্‌রো ভেসে আসছে। এসব ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে এ্যাম্বুলান্স গাড়ির ঘণ্টাধ্বনি।

দেবজ্যোতি মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। কোনো সাংঘাতিক একটা এ্যাক্‌সিডেন্ট হয়েছে নির্ঘাৎ। সে আবার প্রশ্ন করে—জখম হয়েছে কেউ?

চল্‌তে চল্‌তে মুখ না ফিরিয়েই জিলানী ঘাড় কাৎ করল—হুঁ!

অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে দেবজ্যোতির মনে ঠেলাঠেলি করছে। কিন্তু জিলানী যে ভাবে হন্‌হনিয়ে চলেছে তাতে ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলাই শক্ত, এর ওপর কথা কইবার ফুরসৎ কোথায়! উদ্বেগ আরও উত্তাল হয়ে ওঠে।—

একটু এগিয়েই ওরা দেখল, অনেকগুলো মাথা! এম্বুলেন্সগাড়ির ঘণ্টাধ্বনি আর শোনা যাচ্ছে না। ভিড় ঠেলে জিলানী দেবজ্যোতিকে টেনে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। দু-একজন সাহেব এবং এদেশী কয়েকটি অফিসার গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁদেরও সরিয়ে জিলানী দেবজ্যোতিকে যে দৃশ্যের সম্মুখীন করল তা সে কল্পনা করতে পারে নি। মাটির ওপর দীনদয়ালের রক্তাক্ত দেহ স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে।

অস্ফুট আর্তনাদ—'উঃ'। এর বেশি আর কিছুই দেবজ্যোতির স্তম্ভিত বিমূঢ় কণ্ঠ ব্যক্ত করতে পারে না। দীনদয়াল? হ্যাঁ, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

কারা যেন বল্‌ছে—হাসপাতালের গাড়িতে তুলে দেওয়া হোক।

আবার কে বল্‌ল—খামোখা সেখানে নিয়ে গিয়ে কি হবে? এখান থেকে সোজা শ্মশানে নিয়ে যাওয়াই ভালো।

সবই কানে আসছে। কিন্তু দেবজ্যোতি কিছুই ঠিক বুঝতে পারছে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। তার চোখের সাম্‌নে দীনদয়ালের স্থির অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টি নিবদ্ধ। পলক নেই সে চাহনীতে। একবার শুধু নজর পড়েছিল দীনদয়ালের নিম্নাঙ্গের দিকে। ব্যস্, তারপর আর সেদিকে তাকায় নি দেবজ্যোতি। ও অংশটা এই মুখের এই চোখের সঙ্গে এতই বেমানান! রীতিমত বীভৎস—কোমর থেকে নীচের দিকটা হাড়ে-মাংসে-রক্তে-কাপড়ে মিলিয়ে দুর্বোধ্য মণ্ড

তৈরী করে ফেলেছে কোন দানব! না, দেবজ্যোতি ওদিকে তাকাতে পারবে না। সে কেবল দীনদয়ালের বিস্ফারিত মুক্ত-দৃষ্টি-মেলা মুখের দিকেই চেয়ে থাকবে। স্থির অভিব্যক্তি-শূন্য দুটো চোখে কি লেখা আছে!

পিছন থেকে জিলানী ফিস্‌ফিস্ ক'রে বল্‌ল—গুরু, কি হবে?

তারপরই হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো জিলানী। অনেকক্ষণ ধরে যে কান্নার প্রবল বেগকে জোর ক'রে আটকে রেখে জিলানী যন্ত্রের মত কর্তব্য করে গিয়েছে, হঠাৎ সেই নিরুদ্ধ কান্নার স্রোত পথ পেয়ে অস্বাভাবিক রকমের একটা উন্মত্ত রোল তুল্‌ল। জিলানী ছেলেমানুষ? সে কি পাগল?—কে জানে! দেবজ্যোতি একবার পিছন ফিরে ওকে দেখল, সেই সঙ্গেই আবার নজর পড়ল দীনদয়ালের থ্যাঁৎলানো কোমরের দিকে! চম্‌কে উঠলো দেবজ্যোতি। তারপর মিনিটখানেক চোখ বুজে রইল।

অল্প সময়ের মধ্যেই দেবজ্যোতি নিজেকে সামলে নিয়ে বল্‌ল—এঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। একবার ভাল ভাবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

তার কথা শুনে কোথা থেকে রামঅওতার এগিয়ে এসে দাঁড়ালো। তারপর যন্ত্রের মত কাজ শুরু হ'ল। জনতা নির্বাক।

দীনদয়ালের ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা আশ পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদেরই মধ্যে একজন দেবজ্যোতিকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বল্‌ল—আপনি একবার সাহেবের সঙ্গে কথা বলবেন চলুন।

—এখন নয়, পরে।

দেবজ্যোতি সংক্ষেপে এই লোকটির হাত থেকে রেহাই পেতে চাইছিল, কিন্তু তা হ'ল না। ভদ্রলোক বল্‌লেন—পরে নয় মশাই! এখন যা পারেন হাতিয়ে নিন্। এসব জায়গার দস্তুর ত জানেন না, ব্যাটারা একবার মওকা পেয়ে গেলে আর পুছবে না। বুঝি সবই ভাই, শোকতাপের সময় স্বার্থ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে চায় না। কিন্তু কি করবেন বলুন,—অই যে সাহেব ত দাঁড়িয়েই রয়েছে। চলুন আমি কথা কইয়ে দিচ্ছি।

রামঅওতার ওদিক থেকে ডাকলো—গুরু চলো হাসপাতালে যাই!

দেবজ্যোতি একবার জিলানীকে কাছে ডেকে বল্‌ল—ভাই আমার ফোরম্যানকে একটা খবর দিয়ো।

এতক্ষণ জিলানী কাঁদছিল, কিন্তু কাজের হুকুম পেতেই চোখ মুছে ফেলে রওনা দিল। অফিসারবর্গ আপন আপন পথে রওনা হয়ে গেলেন। এ্যাম্বুলান্সের সঙ্গে রামঅওতার আর দেবজ্যোতি হাসপাতালে গেল।

রামঅওতার বেশ দক্ষতাসহকারে হাসপাতালের আলস্যমন্থর অবস্থাকে কর্মব্যস্ত ক'রে তুল্‌ল। প্রথমেই সে বল্‌ল—মেহেরা সাহেবকে এখুনি খবর দিয়ে আনাতে হবে!

ডাক্তার রায়, যিনি এখন ডিউটি দিচ্ছেন তিনি, গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন—সাহেব ত এখন আসবে না। আপাততঃ আমিই দেখছি, বড় সাহেব সন্ধ্যের পর এলে দেখার ব্যবস্থা করা যাবে।

রামঅওতার প্রায় ধমকের স্বরে বল্‌ল—আমি বল্‌ছি, ফোন করুন আপনার বড় সাহেবকে। তাঁকে এখুনি আসতে হবে। সিরিয়াস এ্যাক্‌সিডেণ্ট—সন্ধ্যে পর্যন্ত ওয়েট করা চলে না।

অনিচ্ছায় মুখ বিকৃত ক'রে ডাক্তার রায় বল্‌লেন—অসময়ে ডাকলে উনি আসবেন না, মাঝখান থেকে আমার কাছে এক্‌স্‌প্লানেশন চাইবেন। আপনাদের খবর কি বলুন—

ডাক্তারের দিকে বহ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে রামঅওতার নিজেই টেলিফোন তুল্‌ল।

দেবজ্যোতির মুখের ওপর অসহায় ভাবে তাকিয়ে ডাক্তার রায় বলেন—আমাদের হয়েছে জ্বালা। সকলের হম্বিতম্বি সামলাতেই আছি। আরে মশাই, আপনার এ কেস্‌ ত দেখেই বলে দেওয়া যায় যে মেহেরা সাহেবকে ডাকার কোনো দরকার নেই! হামেশা কারখানার লোক জখম হচ্ছে, ওয়ার্ডে পড়ে থাকছে—আবার কপাল খারাপ হ'লে বেঁচেও যাচ্ছে।

ওয়ার্ডবয়দের ডেকে রায় বল্‌লেন—গাড়িসে পেশেণ্ট উঠাকে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডমে লে যাও!

খুট-খুট জুতোর শব্দ ক'রে নার্স এসে দাঁড়ালো। রায় মুখ তুলে বল্‌লেন—কি চাই সিস্টার? এ্যাঁ, বাল্‌ব্‌—

—হ্যাঁ স্যর, মেটারনিটির একটা ড্রুম ফিউজ হয়ে বসে আছে।

—আচ্ছা রোজ-রোজ এখন আমি ড্রুম কোথা থেকে জোগাবো?

—তা ব'লে অন্ধকারে পেশেণ্ট থাকে কি ক'রে স্যর!

—বুঝলাম! আচ্ছা ঝামেলা, বয়েতে-বয়েতে ঝগড়া সাম্‌লাও, কোথায় বাতি বিগ্‌ড়ালো ছাখো—এইসব করব না, ডাক্তারী করব!

রামঅওতারের দিকে অপ্রসন্ন নজর ফেলে ডাক্তার বল্‌লেন—কি হ'ল, পেলেন?

ওদিকে কথাবার্তা শুরু হয়েছে। রামঅওতার গম্ভীরভাবে বল্‌ছে—সাবকো আভি বোলো! আরে খেলা—মারো গোলী! কহো কি অস্‌পাতাল্‌সে ইউনিয়নকা ভাইস প্রেসিডেণ্ট রামঅওতার সিং নে টেলিফুন করতা হ্যায় আভি সাহাবকো আনে পড়ে গা—হাঁ! হাম ছোড় দেতা, সমঝ লো—ইউনিয়ন কা ভাইস প্রেসিডেণ্ট।

দেবজ্যোতির দিকে তাকিয়ে রামঅওতার বল্‌ল—গুরু তুমি আর এখানে থেকো না। চলে যাও, সান্যালবাবুর লেড়কীদের নিয়ে এস—যাও যাও, এখন হাত-পা গুটিয়ে থাকলে চল্‌বে না। আমি এদিকে যা করবার ঠিক করে যাচ্ছি।

অগত্যা দেবজ্যোতিকে বেরিয়ে পড়তে হয়। পিছন ফিরেই সে শুনতে পেল, ডাক্তার বল্‌ছেন—খুব ডাঁটের ওপর চালিয়ে যাচ্ছেন সিংজী। লেকিন আমাদের ভাগ্যে যে আঁধার সেই আঁধারই রয়ে গেল।

অনেকদিন পরে বিকেলের সঙ্গে দেবজ্যোতির চাক্ষুষ হ'ল। উঁচু চওড়া হস্‌পিট্যাল এ্যাভেন্যুতে লোকজন চল্‌ছে। ভিজিটিং আওয়ারের ভিড় শুরু হয়েছে।

হাসপাতালের সামনে, পথের এপারে খেলার মাঠ, সেখানেও জনতা! মাঠের পাশ দিয়ে সরু একটা পথ সোজা চলে গিয়েছে দীনদয়ালের কোয়ার্টার

ছাড়িয়ে কারখানা পর্যন্ত। দেবজ্যোতি সেই পথেই চলেছে। খবর দিতে হবে—মিণ্টুকে, দীপুকে! তারপর? কি হবে তারপর, সেটা অনুমান করতে সাহস হয় না। কি বলবে দেবজ্যোতি—দীনদয়াল মারা গিয়েছেন? হ্যাঁ. তিনি বেঁচে নেই। না কি এ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে। বাকীটুকু ওরা বুঝে নেবে!

কিন্তু তাকে আর বেশি ভাবতে হ'ল না। অন্যমনস্কতাকে ধাক্কা দিয়ে কে ডাকল—দেবু দা!

চমকে উঠল দেবজ্যোতি, তার সামনে অমলা, দীপু আর মিণ্টু।

তার হাত ধরল দীপু—চলো!

দেবজ্যোতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়—কে খবর দিল?

মিণ্টু বল্‌ল—আপিস থেকে হরিবাবু এসে বলে গেলেন সব।

দেবজ্যোতির হাতে ঝাঁকানী দিয়ে দীপু প্রশ্ন ক'রে—বাবার কোথায় কোথায় চোট লেগেছে দেবুদা! বাবার জ্ঞান ফিরেছে দেবু দা!

পিছন থেকে একদল চ্যাংড়া ছেলে বলে উঠল—বেড়ে আছে মাইরী! দেখিচিস্ বাবুপাড়াটা বিলেত হয়ে উঠল!

দেবজ্যোতি কোনো কথারই জবাব দিতে পারে না। শুধু চলার বেগে এগিয়ে যায়।

বিরাশি

কান্নার রোল উঠল না। হাসপাতালের আপাদমস্তকে এমন একটা অনাত্মীয় নিষ্করুণতা ছড়ানো রয়েছে যে দীপু, মিণ্টু, অমলা কেউই গলা ছেড়ে কাঁদতে পারল না। তা ছাড়া দীনদয়ালের যে সৌম্য প্রশান্ত রূপ ওরা দেখতে অভ্যস্ত সে চেহারার সঙ্গে এই বিকৃত বিভৎস, শবদেহের যেন কোনোই মিল নেই।

ওদের সাম্‌নেই ডাক্তার মেহেরাকে রামঅওতার দুর্ঘটনার বিবরণ দিচ্ছে :

বেলা তিনটে পঁয়ত্রিশ। দীনদয়াল সান্যাল তাঁর ডিপার্টমেণ্টের একটা জরুরী নির্দেশ নিয়ে ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করতে যান। ট্রাফিক অফিসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন না। তাঁর পি-এ, বল্লেন যে সাহেব ইয়ার্ডে গিয়েছেন। অতএব সান্যাল সোজা ইয়ার্ডে যাচ্ছিলেন। ওদিক থেকে একটা খালি রেক্ গড়িয়ে গড়িয়ে ঢালু পেয়ে এগিয়ে আসছে, দীনদয়াল সেটা দেখতে পান নি। ওঁর লক্ষ্য ছিল লাইনের ওপারে ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দিকে। সুপার নিজেও সান্যালকে দেখে টুপী খুলে সহাস্য অভিবাদন জানান। তিনিও লুজ্ রেকটা গড়াতে ছাখেন নি। লাইন ক্রশ করবার সময় দীনদয়ালের পিঠের ওপর রেকের একটা বাফারের ধাক্কা লাগে। তারপর উনি লাইনে পা আটকে তেরছা হয়ে পড়ে যান।

ডাক্তার মেহেরা বল্‌লেন—এতো ইন্‌স্ট্যাণ্টেনিয়াস ডেথ! পুলিসকে ইন্‌ফরম্ করা হয়েছে?

রামঅওতার গম্ভীরভাবে জবাব দিল—আমরা ত স্যর বুঝি নি, কি, উনি মারা গেছেন! কেস সিরিয়াস বুঝেই ডাক্তার রায়ের অমতেও আপনাকে ডেকে এনেছি, যদি কোনো উপায়ে বাঁচানো যায়।

হাসলেন ডাক্তার মেহেরা—প্রাণ থাকলে আমরা চেষ্টা করতে পারি মিস্টার সিং, কিন্তু আমাদের বিজ্ঞান এখনো প্রাণ সৃষ্টি করতে পারে নি, তা

আপনি জানেন। এনি ওয়ে, রায়—একবার থানাতে চৌধুরীকে দাও, কথা বলি—

ব'লে ডাক্তার রায়ের দিকে তাকালেন ডাক্তার মেহেরা।

রামঅওতার অমলাদের দিকে একবার তাকালো। তারপর মেহেরাকে বল্‌ল—দেখুন ডাক্তার সাহেব আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে।

—কি, বলুন!

'—ময়নাতদন্তের হাঙ্গামায় ফেলবেন না।

—ইউ মিন পোস্টমর্টেম্! অবিশ্যি সেটা আমাদের ডিউটি, তবে, এটা অবিশ্যি সুইসাইড নয় বলেই মনে হয়। আপনাদের অমতে, মানে মৃতের আত্মীয়দের আপত্তি থাকলে আমি জোর করব না। এখন অবিশ্যি এটা শুধু আমার এক্তিয়ারে থাকবে না, পুলিস যদি সন্দেহ করে—আহা আপনি ত সবই জানেন, মানে কোম্পানীর ইন্‌টারেস্ট যদি ফোর্স করে।

রামঅওতার গম্ভীরভাবে জবাব দিল—আমি ত মনে করি না যে পুলিসের সেরকম বদখেয়াল হবে। ওদিকে ট্রাফিক সুপার রয়েছে, তাছাড়া আরও সব লোক যারা এ্যাকসিডেন্ট হতে দেখেছে তারা সবাই—

বাধা দিয়ে মেহেরা বল্‌লেন—আই নো উইথ হুম আই অ্যাম টকিং! মিষ্টার সিং, আপনার মগজ যে সাফ আর ঠাণ্ডা সবাই তা জানে। মনে ত হয় না যে, এ নিয়ে—

কথাটা শেষ হবার আগেই ডাক্তার মেহেরা টেলিফোন ধরলেন—হ্যাঁ, আমি মেহেরা। ভ্যাখো ভাই চৌধুরী, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি খবর পেয়েছ। বেশ, বেশ চলে এসো এখানে সবাই রয়েছেন—হ্যাঁ, সান্যালের রিলেটিভরাও। এ্যাঁ, কি করি বলো, ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট কেসটাতে ইন্‌টারেস্ট নিয়েছে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—অল্ রাইট।

ফোন নামিয়ে রেখে মেহেরা তাকালেন—এতক্ষণে সকলের দিকে নজর পড়েছে তাঁর। ব্যস্তভাবে তিনি বল্‌লেন—আরে আপনারা সবাই দাঁড়িয়ে! চলুন-চলুন আমার ঘরে বসবেন। মেয়েরা সব দাঁড়িয়ে! কি বলব, এই হল

আমাদের কাজ, থ্যাঙ্কলেস আনপ্লেজ্যাণ্ট এ্যাফেয়ার। ডাক্তারী ত নয় যমদূতগিরি।

ডাক্তারের সঙ্গে সকলকে মেহেরার ঘরে গিয়ে বসতে বলা যে আদেশেরই নামান্তর এটা তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রতিভাত হয়। ওয়ার্ড থেকে সকলে বেরিয়ে যাবার পরই দীনদয়ালের লোহার খাটের চারপাশে পর্দা খাটিয়ে ঘিরে দেওয়া হল। আর শবদেহের উপর লাল কম্বল ঢেকে দেওয়া হল। ওয়ার্ডের অন্যান্য যত রোগী কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। ওরই মধ্যে যারা একটু পুরনো রোগী তারা বল্ল—আর কি, এবার ত মূর্দাটা নিয়ে যাবে ট্রলি করে মূর্দাঘরে। হয়ে গেল।

ওদিকে থানার বড়-দারোগা চৌধুরী এসে পড়লেন জিপ্ হাঁকিয়ে। হাসিমুখে মেহেরার হাতে হাত মিলিয়ে বল্লেন—আপনার জন্যে মশাই একটু জিরোবো, কি ককটেলের নেমন্তন্ন রক্ষে করব, তা হবার উপায় নেই! অ, আবার ইউনিয়নের কর্তা এখানে রয়েছেন—

রামঅওতারের দিকে তাকিয়ে চৌধুরী অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন।

এসব দেবজ্যোতির আদৌ সহ্য হচ্ছে না। তার ইচ্ছে করছে বাইরে গিয়ে ফাঁকা হাওয়াতে দু-দণ্ড একলা চুপ করে বসে থাকতে। সে দেখছে, চৌধুরী আর মেহেরার সহজ সচ্ছন্দ কথাবার্তার মধ্যে এতটুকু সহানুভূতির ভাব নেই, নেই কোনো দরদের ছিটেফোঁটা! বিশেষ করে চৌধুরী ঢোকার পরই দেবজ্যোতি সেটা বেশি অনুভব করে। সে একবার সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। মিণ্টু, দীপু, অমলা প্রত্যেকেই নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টি মেলে বসে আছে। তাই কি? ওরা যেন মৃত্যুদণ্ডের আদেশে অভিযুক্ত—একবিন্দু রক্তের লেশ নেই মসৃণ গৌরী-মুখাবয়বে! সব কি একই ছাঁচে ঢালা মৃত্যুমুখী পুতুল ওরা?

চৌধুরীর একটা কথাতে দেবজ্যোতির চিন্তাপ্রবাহে বাধা পড়ল। তিনি বল্ছেন—হ্যাঁ, খুব চিনেছি। পুরনো রেকর্ডে সবই রয়েছে। ট্রাবলমেকারদের ব্রেণ সোর্স বলে উল্লেখ রয়েছে। তবে এও আছে, ভেরি পপুলার এ্যাণ্ড আপ রাইট ম্যান! খুব কুইয়ার ফিগার, বুঝলেন ডাঃ মেহেরা! আচ্ছা,

এবার লেট আস কাম ডাউন টু বিজ্‌নেস! বডি কোথায়? একবার চলুন দেখি।

মেহেরা বল্‌লেন—দেখবার কিছু নেই। পিওর কেস অব ইন্‌স্ট্যাণ্টেনিয়াস ডেথ ডিউ টু ফেটাল্‌ ইন্‌জুরি।

গম্ভীর হয়ে গেল চৌধুরীর মুখ, তিনি বল্‌লেন—হ্বাট আই নো। বাট্‌—

রামঅওতার এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে মুখ বুজে শুনছিল। এবার খদ্দরের টুপীটা মাথা থেকে খুলে নিয়ে সে চাপা গলায় আস্তে আস্তে বলল—চৌধুরী সাহেব, সব জায়গায় চালাকী খাটাতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আপনি যদি সান্যাল মশায়ের ওপর পুলিসী প্যাঁচ কষতে যান ত সুবিধে করতে পারবেন না। মল্লিক সাহেব, রবিন্‌সন, কোনো মিঞার মতলবে ভিড়বেন না, যদি ভালো চান।

—বটে?

চৌধুরী হাসলেন। তারপর ঢোক গিলে বল্‌লেন—আপনাকেও চিনি, আর ওই যে আর একজন বসে রয়েছেন তিনিও আমার পরিচিত। কিন্তু মিস্টার সিং, পুলিসের ডিউটিতে বাধা দিতে গেলে বিপদ আপনারও হতে পারে, জানেন ত!

ডাক্তার মেহেরা তাঁর স্বভাবগম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—এনি ওয়ে চৌধুরী তুমি কি নেহাতই বায়ার দেখবে? আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট এনি আনপ্লেজাণ্টনেস হিয়ার! যদি বডি দেখে খুশী হ'তে চাও আমি দেখতে দিতে বাধ্য। বেয়ারাকে ডাকছি সে দেখিয়ে দেবে।

হঠাৎ অমলা আর্তকণ্ঠে বলে উঠল—ডাক্তারবাবু এর ওপর ছুরি দিয়ে কেটেকুটে তচ্‌নচ্‌ করবেন না!

জবাব দিলেন না ডাক্তার মেহেরা, চৌধুরী বল্‌লেন—অতো উতলা হচ্ছেন কেন? পুলিস ব'লে কি আমরা মানুষ নই! হ্যাঁ, ভালো কথা—সান্যাল মশাই-এর ত দুই মেয়ে—আর আপনি?

একমুহূর্ত লাগল অমলার জবাব দিতে। একটু আগে যে নিষ্প্রাণ রক্ত-শূন্যতায় ওর মুখখানা ছেয়ে ছিল তার চিহ্নমাত্র আর নেই। অত্যন্ত আরক্ত

সপ্রতিভ মুখে ও বল্ল—কি বল্লে আপনি খুশী হবেন জানিনে, তবে উনি আমাকে নিজের মেয়ের মতোই দেখতেন।

চৌধুরী উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন—নাঃ আপনি দেখছি আমাদের ওপর বড্ড চটেছেন। সান্যাল মশাই অতি সজ্জন ব্যক্তি সে ত আমি এখানে পা দিয়ে ইস্তক শুনে আসছি। কিন্তু এমন চাকরী করি যে, সামাজিক ভাবে মেলামেশা করতে গেলেও লোকে উল্টো বোঝে। কিছু মনে করবেন না। মানে আপনাদের এই চরম বিপদের সময়ে অযথা বিরক্ত করছি।

তারপর মেহেরার দিকে তাকিয়ে চৌধুরী বল্লেন—আচ্ছা ডাক্তার মেহেরা আজ রাতের মত আর আপনাকে বিরক্ত করব না। বডি এখন দেখার দরকার নেই। আপাততঃ আপনার রেকর্ড থেকেই এন্‌কোয়্যারী শুরু করি। মানে, উইট্‌নেসদের একটা স্টেট্‌মেণ্ট নেওয়া দরকার। প্লিজ হোল্ড দি বায়ার, ইয়েস।

রামঅওতারের দিকে বিব্রত দৃষ্টিতে তাকিয়ে চৌধুরী বল্লেন—শেষ পর্যন্ত আপনার কথাই থাকবে বুঝলেন না! জাস্ট এ ফরম্যাল এনকোয়্যারী। এটুকু না করলে আমার চাকরী যাবে। কাল সকালেই যাতে আপনারা মড়া নিয়ে যেতে পারেন তার চেষ্টা করছি।

রামঅওতার তীক্ষ্ণ শ্লেষের হাসি হেসে বল্ল—সুবিধে হবে না চৌধুরী বাবু! ট্রাফিক সুপারকে ঘুষ খাওয়ানো যাবে না। তার প্রমাণ আপনাদের হাতে বিস্তর আছে। নেই?

—তা আছে। কিন্তু—

—আগ্‌ জল যায়েগা! আপ লিখ্‌রাখ শকৃতে হেঁ! ইউনিয়ন হামারা হ্যায়, পন্দর হাজার হামারা সাথী—!

ডাক্তার মেহেরা রামঅওতারকে নিরস্ত করলেন, বল্লেন—আপনাদের লড়াই আমার এলাকায় চলবে না মিস্টার সিং! তবে একটা ছোট্ট কথা বলি মিস্টার চৌধুরী, স্বেচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা হলে দেহের পিছন দিকে আঘাত লাগার কথা নয়। তা ছাড়া ইঞ্জিন থেকে খোলা ওয়াগন্‌টা আল্‌গা গড়িয়ে আসছিল—স্বাভাবিক নিয়মে আত্মহত্যাকারী সুনিশ্চিত উপায়কেই আঁক্‌ড়ে ধরে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে—

চৌধুরী বাধা দিয়ে বলে উঠ্‌ল—ডাক্তার মেহেরা আপনি এ ব্যাপারে বেশ ভেবে চিন্তে কথা বল্‌ছেন নিশ্চয় !

মেহেরার চোখমুখ উত্তেজনায় আরক্ত হয়ে উঠল, তিনি জবাব দিলেন—আপনাদের ভাবনার সঙ্গে আমার চিন্তার মিল হওয়া অসম্ভব। দশ দিন বডি আটকে রাখলেও আপনি অবস্থা বিশ্লেষণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মত পাল্টে দিতে পারবেন না।

টেবিল থেকে টুপীটা তুলে নিয়ে কোলের উপর রেখে চৌধুরী সাহেব বল্‌লেন—আমার অতো গরজ নেই মশাই, ম্যান ওয়ারেস্ নট উইথ দি ডেড্ ! তবে কি জানেন, চাকরী বড় বালাই। যাক যেতে দিন—আপনি তাহলে সার্টিফাই করে দিন। এঁদের মিথ্যে হয়রান করে কি হবে ! ঝামেলা ক'রে কি হবে। ঝামেলা কি একটা মশাই,—ওদিকে পাঁচশো গজ কেব্‌ল্ চুরি গিয়েছে। ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ড ত দিব্যি জামাই আদরে আছে। শালারা দেখ্‌ল না, কারখানার ভেতর, মাটির নীচ দিয়ে হেভি কারেণ্ট রান করছে, তার মধ্যে থেকে কোন্‌টায় কারেণ্ট রান করছে না, সে খবর রামাশ্যামার টের পাবার কথা নয় ! মাটি খুঁড়ে রাতারাতি কেব্‌ল্ লোপাট ! এখন আমাদের ঘাড়ে পড়েছে চোর ধরার ঝামেলা। কোন দিক সামলাই বলুন তো !

ডাক্তার মেহেরা কাগজপত্র তৈরী করতে করতে বললেন—দেখ ভাই চৌধুরী, সিধে রাস্তায় কাজ করলে অন্ততঃ নিজের মনের কাছে পরিষ্কার থাকা যায় ! এই যে মিস্টার সিং—ওঁর সঙ্গে কি আমার ঝগড়া নেই ? আছে। আমার স্টাফকে উনি হোস্টাইল করেছেন, কিন্তু তাই বলে সুযোগ পেয়েই ওঁকে হয়রান করতে হবে তার কোনো মানে নেই। আফ্‌টার অল আমরা সবাই মানুষ !

—তা তো বটেই, ঠিক কথা !

চৌধুরী সরবে সমর্থন করলেন।

তারপর দেবজ্যোতির দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনারা আজ রাত্রেই অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু এদিকে ত রাত হয়ে যাচ্ছে।

সাড়া দিল রামঅওতার—রাতের জন্যে ভাবনা নেই। মানিকপুরের মজদুর সান্যাল মশাইকে বাপের মতো ভক্তি করে। লোকের অভাব হবে না।

মুকুল আর মল্লিকা আগে থেকেই এ বাড়িতে এসে রাত্রে ছিল। ভোর বেলা শ্মশান থেকে শবযাত্রীরা এসে পৌছতেই মুকুল বাইরে বেরিয়ে এসে বল্‌ল—আপনারা একটু দাঁড়ান এখানে, একটা নিয়ম আছে।

বলে তাড়াতাড়ি আঁশবটি নিমপাতা নিয়ে এল! খড়ের আগুন করে বল্‌ল একটু তাত নিয়ে নিমপাতা দাঁতে কাটতে হয়—

কেউ কোনো প্রতিবাদ করল না। দেবজ্যোতি একটু হাসলো।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই মিণ্টু আছড়ে পড়ল। উপুড় হয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল মিণ্টু। দীপু ওর পাশে বসে বোঝাবার চেষ্টা করছে, সে মুহূর্তে ওর নিজের গাল বেয়ে ঝর্‌-ঝর্‌ ক'রে অশ্রু ঝরছে। পিছনে দাঁড়িয়ে অমলা দেখছে। অমলার চোখ দুটো রক্তবর্ণ, কিন্তু তাতে অশ্রুর কোনো চিহ্ন নেই—যেন দু-চোখে ওর চিতা জ্বলছে।

মুকুল ব্যস্তভাবে এসে মিণ্টুকে ওঠাতে যাচ্ছিল, অমলা বল্‌ল—আহা একটু কাঁদুক! বুকের মধ্যেটা যন্ত্রণায় ফেটে পড়বে যে নইলে। কাঁদতে দাও ওদের।

ঠিক এই সময়ে দেবজ্যোতি ঢুকল, বল্‌ল—বৌদি!

অমলা মুখ ঘোরালো—কি ঠাকুর পো?

—আপনি তৈরী হয়ে নিন্। যেতে হ'বে।

অমলা বুঝতে পারে না, দেবজ্যোতির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—যেতে হবে? কোথায়!

বাইরের বারান্দায় অমলের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। সে রীতিমত উত্তেজিত ভাবে বলছে—আচ্ছা, আপনারা কি মানুষ, না জানোয়ার, মশাই! এতটুকু সবুর সইল না! সব জেনে, বুঝে এই সময় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয়েছেন?

কথাগুলো সবই অমলার কানে যাচ্ছে। ও এবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল—ঠাকুরপো, অমলবাবুকে বলো, ওঁরা ঠিক সময়েই এসে হাজির হ'য়েছেন। এই ত শুভলগ্ন। আমি তৈরী।

আচম্‌কা অমলার কথাগুলো কানে যেতেই মুকুল ওর হাত চেপে ধরল—না, না, বৌদি! তোমার এ সময়ে যাওয়া হ'তে পারে না। মেয়ে দু'টোকে দেখবে কে? ওদের এই বিপদের মধ্যে ফেলে যেয়ো না বৌদি!

হাসলো অমলা। উজ্জ্বল রক্তাক্ত দৃষ্টির দ্যুতি ঘিরে টল্‌টলে দুটি চুনীর মতো অশ্রুবিন্দু স্থির হয়ে প্রতীক্ষা করছে। ও বল্‌ল—আমি গেলেও ক্ষতি হবে না ভাই! এখন থেকে তোমরাই রইলে। আর, থাকতে চাইলেই কি থাকা যায়! যা চাই, কোনোদিনই তা পেলাম না।

কথাগুলো শেষ হবার আগেই অমলা তাকায় দেবজ্যোতির দিকে। এবার সেই চুনীর মত রক্তাভ অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ল চোখের কোল বেয়ে, স্ফুরিত নাসাদেশ ছুঁয়ে, ঠোঁটের পাশ দিয়ে মেঝের ওপর।

দেবজ্যোতির হাত ধরে অমলা বল্‌ল—তোমার ওপর অনেক ভরসা। পারো তো এর পর খোকাকে তোমার কাছে নিয়ে এসো, আমি যতদিন না ফিরি ওকে তোমাদের কাছেই রেখো।

ব্যাপারটা মুকুল বুঝতে পারে নি এখনো। অমলকে জিজ্ঞাসা করবে ব'লে বাইরে বেরিয়েই মুকুল দেখল, অনেক পুলিস দীনদয়ালের কোয়ার্টারের এপাশ-ওপাশ ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করছে। একজন খাকী পোশাক পরা লোকের সঙ্গে অমল কথা বল্‌ছিল। মুকুলকে দেখে অমল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো—দিদি, কিছু বল্‌বেন?

মুকুল বল্‌ল—এত পুলিস কেন?

অমল জবাব দিল—অমলা বৌদিকে এ্যারেস্ট করতে এসেছে।

—কেন?

—জানেন না বুঝি! এঁদের বিশ্বাস, বৌদি একজন পাণ্ডা কমিউনিস্ট! রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ওঁকে আটক রাখা দরকার।

মুকুলের মুখ শুকিয়ে গেছে। স্বগত ভাবে ও বলে—কি সর্বনেশে কাণ্ড!

বৌদি, আমাদের বৌদি—ওই ননীর মত নরম মেয়ে! ওকে জেলে নিয়ে যাবে? না, না, না।

মুকুল কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকল, এ ঘরে আর দাঁড়ালো না—সোজা ভেতরের ঘরে গিয়ে নিজের ঘুমন্ত ছোট ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে শুরু করলো। মনে মনে শিউরে ওঠে মুকুল। ওর দৃঢ় বিশ্বাস দীনদয়ালের এই বাড়িখানার ওপর শনিগ্রহের অশুভ দৃষ্টি পড়েছে। এই অবস্থায় কোলের কচি ছেলেটাকে এখানে আর একদণ্ড রাখা চল্‌তে পারে না। কি জানি কোন্ পথে শনির দশা প্রকট হয়ে পড়বে!

ওঘর থেকে অমলা এঘরে এল। নিজের একান্ত প্রয়োজনীয় দু-চারটে জিনিস একটা ছোট্ট এ্যাটাচী কেসে ভর্তি করাই ছিল। প্রতিটি মুহূর্তে ও নিজেকে তৈরী রাখে—কখন যে চলে যেতে হবে, কে জানে!

এ্যাটাচীটা হাতে তুলে নিয়ে একবার মুকুলের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—আসি ভাই! দুঃখু এই যে, বিয়ের ভোজটা ফস্কে গেল।

একবার মুখ তুলে তাকিয়ে মুকুল বল্‌ল—দুর্গা শ্রীহরি! সাবধানে থেকো বৌদি!

মিণ্টু তখনও মেঝেতে উপুড় হয়েই পড়ে ছিল।

অমলার পিছু পিছু দীপু এল গাড়ি পর্যন্ত। অমলা ওর হাত ধরে একটু চাপ দিয়ে বল্‌ল—কাকাবাবুর কাজ হয়ে গেলেই বিয়েটা চুকিয়ে ফেলো ভাই। অপঘাত মৃত্যুতে আনুষ্ঠানিক শ্রাদ্ধ হয় না! তোমার ঘোষালদারও হয় নি।

কথাগুলো অমলা দেবজ্যোতিকেই বল্‌ছিল, তবে দীপুর দিকে তাকিয়ে—কেন যেন ও আর কিছুতেই দেবজ্যোতির দিকে চাইতে পারছে না।

অমলা গাড়িতে ওঠবার পর পুলিস অফিসারটি ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল। তারপর অমলের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—অসময়ে আপনাদের বিরক্ত করলাম, মাপ করবেন। কি করি বলুন, এই হ'ল আমাদের চাকরী। আচ্ছা স্যর, গুড্‌ বাই!

পথের পাশে ঝাড়ুদারনীরা ঝাঁট দেওয়া থামিয়ে অবাক হয়ে দেখছিল। পুলিসের গাড়ি চলে যেতেই বিড়বিড় ক'রে বকতে থাকে—পোড়ার মুখো মিন্‌সেদের ঢঙ ছ্যাখো! এখন আবার মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছে, নইলে অস্‌ হবে ক্যানে! বক্‌তে বক্‌তে ঝাঁটা চালাতে থাকে।

তিরাশি

বিমল চৌধুরী কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটায় ইউনিয়ন অফিসে হাজির হ'লেন। অল্প সময়ের মধ্যেই কাজ মিটে গেল। পুরনো ইউনিয়নের হিসেবে নশো বারো টাকা জমা রয়েছে ব্যাঙ্কে। তার পাশ বই এবং পুরনো ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিত্বের অধিকার বলে বিমল চৌধুরী সে টাকা নতুন ইউনিয়নের হাতে সমর্পণ পত্র দিয়ে দিলেন। আর দিলেন ইউনিয়নের রেজেষ্ট্রীর দলিল।

এর পরই তাঁর চলে যাবার কথা।

কিন্তু রামঅওতার বল্‌ল—তা হয় না, চায়ের ব্যবস্থা করেছি। আপনাকে খেয়ে যেতে হবে।

দেবজ্যোতি আপত্তি করল—এখন আর ওসব ঝামেলায় কাজ নেই বুঢ়াউ, তুমি ওঁকে ছেড়ে দাও।

—তা কি করে হয়। উনি আমাদের অতিথি, সম্মান আছে একটা।

ব'লেই জিলানীর দিকে রামঅওতার ইশারা করতে সে বেরিয়ে গেল।

বিমল বল্‌লেন—বেশ ত খুব ভালো কথা। আমি একটু এই বাইরে থেকে আসছি।

রামঅওতার বল্‌লেন—ওদিকে নয়, বাথরুম এদিকে।

হেসে জবাব দিলেন বিমল চৌধুরী—আরে মশাই, আমরা হচ্ছি মাটির তলার মানুষ, মাঠঘাট না পেলে পেচ্ছাপ-বাহ্যে আট্‌কে যায়।

ব'লেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

এক মিনিট, দু মিনিট, পাঁচ মিনিট—সময় কেটেই যায়। উদগ্রীব, সাগ্রহ দৃষ্টি মেলে ওরা এক মনে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। এখনো তো ফিরছেন না বিমল চৌধুরী। কি হ'ল?

বাইরে একসঙ্গে অনেকগুলো জুতোর শব্দ শুনে দেবজ্যোতি বেরিয়ে গেল। —কি ব্যাপার? কারা আবার এই অসময়ে এলো?

যা আশঙ্কা করেছিল ঠিক তাই। পুলিস। দেবজ্যোতিকে সাম্‌নে দেখেই কে যেন গর্জে উঠ্‌ল—হল্ট্‌!

থম্‌কে দাঁড়ালো দেবজ্যোতি।

মুঠিতে রিভল্‌বার ধরে ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে এলেন যিনি, কাছে আসতেই তাঁকে দেবজ্যোতি চিন্‌তে পারে—মিস্টার চৌধুরী!

চৌধুরী বিরক্তিভরে বল্‌লেন—আপনি? এখানে?

দেবজ্যোতি হেসে বল্‌ল—ইউনিয়ন অফিস ছাড়া মজদুরদের আর জায়গা কোথায়! তা আপনার এখানে কি দরকার পড়ল হঠাৎ?

চৌধুরী সে কথার জবাব না দিয়ে সোজা অফিসের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। দেবজ্যোতি বাধা দিয়ে বল্‌ল—দাঁড়ান, বাইরে! এখন আমাদের এক্‌জিকিউটিভ্‌ কমিটির মিটিং হচ্ছে!

—আঃ, আপনি পুলিসের কাজে বাধা দিচ্ছেন ভুলে যাবেন না।

—আপনিও ভুলে যাবেন না যে, এটা আমাদের অফিস। সার্চ্চ ওয়ারেণ্ট আছে? অফিস সার্চ্চের ওয়ারেণ্ট?

—না। কিন্তু যার নামে ওয়ারেণ্ট রয়েছে, সে আপনাদের অফিসে লুকিয়ে রয়েছে।

—মিথ্যে কথা।

—আমি দেখব।

—দাঁড়ান বাইরে। যদি আজকের মিটিং-এর প্রেসিডেণ্ট অনুমতি দ্যান তাহলেই ভেতরে যেতে পারবেন।

—অল রাইট। কিন্তু চিড়িয়ার পালাবার সমস্ত পথ ছিপি দিয়ে আটকানো! পাঁচ শো পুলিস ঘেরাও করেছে, আপনি কিছু ভাববেন না!

রামঅওতার এই গোলমালে বেরিয়ে এসেছে—কি হ'ল?

—দেখুন মশাই উড়ো ঝামেলা! উই আর ওল্‌ড্‌ ফ্রেণ্ডস—তাই নয় কি! আমি একবার আপনাদের ঘরে যেতে চাই, তা ইনি বাগ্‌ড়া দিচ্ছেন।

রামঅওতার হেসে বল্‌ল—আরে সে কি কথা, আসুন—আসুন।

মিস্টার চৌধুরী ঘরে ঢুকে প্রথমে চোখ বুলিয়ে চারিদিক দেখে নিলেন।

তারপর পাগলের মতো ঘরময় ছুটে বেড়াতে লাগলেন—যেখানে যা ছিল উল্টে পাল্টে তচ্‌নচ্‌ করে ফেললেন তিন মিনিটের মধ্যে। বাথরুম, ছাদ, এপাশ-ওপাশ কোন কিছুই বাকী রইল না খুঁজতে। অবশেষে কপালের ঘাম মুছে বললেন—এ হতে পারে না। আমার লাইফে এরকম ভোজবাজী দেখি নি। হি ওয়াজ হিয়ার ফর টুয়েন্টি মিনিট্‌স্‌। এ্যাণ্ড হি ইজ হিয়ার!

জিলানী চা নিয়ে ঘরে ঢুকে কাণ্ডকারখানা দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রামঅওতার প্রসন্ন ভঙ্গীতে বল্‌ল—এই যে, জিলানী, সাহেবকে চা দাও!

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে চৌধুরী হাসলেন, তারপর হাঁক দিলেন—চৌবে!

বাইরে থেকে সাড়া এল—জি হুজুর!

—জঙ্গল পিটাও, চৌবে! চিড়িয়া উধারই হোগা—

—জী সরকার!

হুকুম জারি ক'রে চৌধুরী চায়ে চুমুক দিয়ে বল্‌লেন—নাঃ, এদের সঙ্গে এঁটে ওঠা খুব শক্ত। দেখুন দেখি, কেমন খাসা ফাঁদ, তা পা দিয়েও শয়তানী করবে!

দেবজ্যোতি এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার সে বল্‌ল—আপনাদের যতো জোর কেবল নিরীহ মেয়েদের ধরবার বেলায় মশাই!

চৌধুরী যেন কথাটা শুনতেই পান নি এমন ভাবে চায়ের কাপ হাতে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

রামঅওতার একবার দেবজ্যোতির দিকে তাকালো। দেবজ্যোতি তার জবাব ইশারায় বুঝিয়ে দিল আসামী এতক্ষণ অনেক দূরে চলে গেছে।

সত্যি তাই, ঘণ্টা দুয়েক ধরে চারিধারে টর্চ ফেলে লাঠি পিটিয়ে, বড় নর্দমা ঘেঁটেও বিমল চৌধুরীর কোনোই পাত্তা না পেয়ে পুলিস হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

ইউনিয়ন অফিস থেকে দেবজ্যোতি সোজা দীনদয়ালের কোয়ার্টারে রওনা হ'ল। ক্লান্তির চেয়ে মানসিক উদ্বেগটাই এখন তার প্রধান। দীপু আর

মিণ্টুর ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তার অবধি নেই। ওদের বর্তমান অবস্থাও কিছু স্বস্তিকর নয়। মল্লিকা নিজের সংসারে একা মানুষ, কোলে ওর কচি-ছেলে, তৎসত্ত্বেও যথেষ্ট করছে—কিন্তু সে আর ক'দিন। মুকুল তো সকালেই শ্বশুরবাড়ী ফিরে গিয়েছে। আর থাকবার মধ্যে এক দেবজ্যোতি, সে ত পুরুষ মানুষ। অমলা যদি এই সময়ে থাকত তাহলে সব দিক দিয়েই নিশ্চিন্ত হতে পারত দেবজ্যোতি।

কিন্তু—এরপর? দীপুকে কোথায় রাখা যাবে? সীতানাথের কোয়ার্টারে দেবজ্যোতিদের থাকা নিয়েই গোলমালের আশঙ্কা রয়েছে—তার ওপর দীপুকে নিয়ে গেলে ত কথাই নেই। অথচ ইউনিয়নের মাতব্বরেরা দেবজ্যোতির কোয়ার্টার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। কি হবে?

কয়েক দিনের মধ্যেই ত কোম্পানীর নোটিশ পড়বে—কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হবে। শেষে কি দেবজ্যোতি শহরের বাইরে ঘর ভাড়া করবে? পছন্দসই ঘরই বা পাচ্ছে কোথায়? পেলেও খরচপত্র সামলানো আর এক সমস্যা। দুখানা ঘরের কমে চল্‌বে না। তার মানে মাসিক অন্ততঃ পঞ্চাশটা টাকা। সপ্তাহে যার সাতাশ টাকা বারো আনা মোট আয়, সে কোথা থেকে মাসে পঞ্চাশ টাকা ঘর ভাড়া দেবে?

সত্যি কথা বল্‌তে কি, নানা দুশ্চিন্তায় পড়ে দেবজ্যোতি প্রায় ভুলে গিয়েছিল দীনদয়াল সান্যাল মারা গিয়েছেন। এবং তাঁর মৃত্যুতে সে যে কতখানি আঘাত পেয়েছে সেটুকু টেরও পাচ্ছে না সে। একটা এলোমেলো ঝড়ের মধ্যে পড়ে দেবজ্যোতি দিশেহারা! সে চল্‌ছে, সে কথা বল্‌ছে, সে ভাবছে, সবই করছে—তার সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা নৈর্ব্যক্তিকতার পর্দা পড়ে রয়েছে। আচ্ছন্নতার অর্ধ-অবসন্ন জড়ত্বে সে নিষ্প্রাণ।

অবসন্ন দেহে সে সাইকেল থেকে নেমে দেখল কোয়ার্টারের কোনো ঘরে একটিও আলো জ্বলছে না। দেবজ্যোতির বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ির ঘা মারতে শুরু করেছে—স্মিথী সেক্‌শনের সারি সারি হাতুড়িরা দল বেঁধে একসঙ্গে আছড়ে তার বুকের ভেতরে উঠছে-পড়ছে! উঃ, কি উৎকট আওয়াজ—ঘট্ ঘট্-ঘটাং-ঘট্-ঘট্ ঘটাং! মাথাটা ঘুরে উঠল দেবজ্যোতির। পরক্ষণে সে

বুঝতে পারে, সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে পথের উপর অচল অবস্থায় সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছুই ঘটে নি—মানসিক শূন্যতা!

কোনো রকমে সাইকেলের চাকার সঙ্গে নিজেকে টেনে নিয়ে বারান্দায় উঠল। ঠেলা মারতেই বৈঠকখানার দরজাটা খুলে গেল। অন্ধকার।

সাড়া এল—এসেছ?

মিণ্টুর কণ্ঠস্বর।

দেবজ্যোতি বল্ল—এরকম আঁধার ক'রে বসে রয়েছ?

—আর পারছি না। একের পর এক লোক এসেই যাচ্ছে। তাদের সহানুভূতি দরদ যেন অসহ্য লাগছে। তাই আলো নিভিয়ে দিয়েছি, কেউ আর আসবে না। একটু নিরিবিলির জন্যে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।

বল্‌তে বল্‌তেই আলো জ্বালালো মিণ্টু।

দেবজ্যোতি দেখল, মিণ্টুর মুখখানা শুকিয়ে উঠেছে, ওর কপালে চূর্ণ চুলেরা যেন কালো আঁচড় কাটছে এলোমেলো। তাকিয়ে রইল দেবজ্যোতি—সহজ নির্বাধ, উদার দৃষ্টি মেলে। মিণ্টু যেন একদিনেই বদলে গিয়েছে। এই নিঃসহায়, মায়াভিখারিণীর সঙ্গে সেই সপ্রতিভ আত্মপ্রত্যয়শীলার কোনোই মিল নেই। ওর চোখের সে দীপ্তি কোথায় হারিয়ে গেছে, যেন অশ্রুভরা বাদলের মেঘছাওয়া আকাশের মেদুরতা ওর চাহনীতে,—সামান্য নাড়া পেলেই অশ্রু ঝরতে থাকবে!

মিণ্টু বল্ল—অমন ক'রে কি দেখচো?

দেবজ্যোতির দৃষ্টি এতটুকু নড়ল না। সে যেন শুন্‌তেই পায় নি ওর কথা। আস্তে আস্তে বল্ল—বড্ড কষ্ট হচ্ছে?

মুখ নামিয়ে মিণ্টু অস্ফুট স্বরে বলে—তোমার দিকে চাইতে ভরসা হচ্ছে না!

বল্‌তে বলতেই ওর কণ্ঠে অশ্রুর আভাস ফুটে ওঠে। থামল না মিণ্টু, রুদ্ধ স্বরে বলল—যদি কোনো উপায় জানা থাকতো তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারতাম। তোমার ঘাড়ে এতটা বোঝা চাপলো, কি হবে?

আজকের মতো এমন নরম আর ঘনিষ্ঠ এর আগে কখনও মনে হয় নি

মিণ্টুকে। আশ্চর্য এক অন্তরঙ্গতার স্বাদে দেবজ্যোতির মন আর্দ্র হয়ে পড়ে। সে নিজের অজ্ঞাতেই মিণ্টুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে পিঠের ওপর হাত রেখে—বলে—ছিঃ, অমন ক'রে বলে না। বোঝা আবার কি কথা! আমি কি পর?

জলভরা টল্‌টলে চাহনী মেলে মিণ্টু তাকালো দেবজ্যোতির দিকে।

ওর দু চোখ মুছিয়ে দিয়ে দেবজ্যোতি বলল—বিপদকে সহজ ভাবে নিতে চেষ্টা করো, তাহলে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।

—সহজ? জীবনের সব কিছুই তো সহজ ভাবে নিয়েছি। কিন্তু বাবা যে, এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন তা কি জানতাম! কালও কারখানায় যাবার সময় কত কথা বলে গেলেন বৌদিকে—

দেবজ্যোতি বলল—খাওয়া দাওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—দীপু কোথায়?

—ও সেই সন্ধ্যে থেকে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। বেচারী ছেলেমানুষ! নিখিলবাবু এসে কতো ক'রে জাগাবার চেষ্টা করলেন, কিছুতেই উঠল না। আহা, কষ্ট ওরই সবচেয়ে বেশি।

—মল্লি আসে নি?

—এই ত খানিক আগে ওঁরা গেলেন। জামাইবাবুর ইচ্ছে, মল্লিকা এখানে থাকে, তা আমিই জোর করে পাঠিয়ে দিলাম।

—হুঁ! তা এবার তুমি শুয়ে পড়ো গিয়ে, আমি চলি!

অসহায় ভাবে মিণ্টু তার দিকে তাকালো। তারপর বলল—তোমার খাবার রয়েছে, মুখ হাত ধুয়ে খেয়ে নাও।

—খাবার? এসব হাঙ্গামা আবার কেন করতে গেলে?

—হাঙ্গামা আবার কি! কোনো কাজ নেই হাতে। চুপচাপ বসে থাকলেই কেমন কান্না পায়! তাছাড়া আমি ভেবেছিলাম—

ব'লেই মিণ্টু চুপ ক'রে গেল।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেবজ্যোতি বলল—কি ভেবেছি—?

—না, কিছু নয়।

—ভাবতে পারলে, আর বলতেই বাধা ! বলো ।

—তুমি এখানে থাকবে ভেবেছিলাম । অথচ তার কোনো দরকারও ত নেই ।

—তা ত বটেই । থাকা দরকার । নইলে, তোমরা দুটি প্রাণী । আমারই এটা মনে হওয়া উচিত ছিল ।

—না, তার জন্যে কি আছে । আমার ভয়ডর কিছু নেই । পাশের কোয়ার্টারে স্বরূপারা রয়েছেন । বেশ থাকতে পারবো ।

—বাঃ, তাই হয় নাকি । দোহাই তোমার, কখন কি করতে হয় না হয় সব সময়ে আমার হুঁশ থাকে না । তুমি ত চেনো মিণ্টু তবে কেন এসব বলছ !

মিণ্টু অনুযোগের স্বরে বলল—আচ্ছা হয়েছে, আর রাত বাড়িয়ো না । বাইরের জামাটামা ছাড়বে চলো ।

সাইকেলটা বৈঠকখানা থেকে ভেতরের বারান্দায় দেয়ালের গায়ে রাখতে রাখতেই দেবজ্যোতি শুনল দরজায় কড়া নাড়ছে কে ।

ব্যস্ত ভাবে সে বাইরে যাচ্ছিল, মিণ্টু বলল—তুমি বাথরুমে যাও, আমি দেখছি ।

—এত রাত্রে আবার কে এল ?

বলতে বলতে দেবজ্যোতি দেখতে গেল ।

মিণ্টু দরজার মুখে দাঁড়িয়ে রইল । কিন্তু পরক্ষণে ছুটে গিয়ে একেবারে জড়িয়ে ধরল—বাদল ! তুই,—তুই এসেছিস বাদু ! বড় দেরী হয়ে গেল রে—

দিদির বুকের মধ্যে বাদল পুতুলের মতো অনড় নির্বাক পড়ে আছে ।

তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর মিণ্টুর দু চোখ বেয়ে অশ্রুধারা বয়ে চলেছে । হঠাৎ দেবজ্যোতির দিকে দৃষ্টি পড়তে মিণ্টু নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে, বলে—তুই বড় অভাগারে বাদল ! তোর কি হবে ?

বাদল এবার নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বলল—তুই ঠিক বলেছিস দিদি ! বাবা খুব ফাঁকি দিয়ে কেটে পড়লেন । আর একটা মাস হ'লেই আমি পাঁচশো টাকা জমিয়ে ফেলতে পারতাম, সে চান্স এইভাবে নষ্ট হয়ে গেল—অথচ বাবার সঙ্গেও দেখাটা হ'ল না । যাক্—

দেবজ্যোতি গম্ভীর ভাবে বলল—যাক্ তুমি যে শেষে ফিরেছ এটাই শুভ! নাও এখন একটু জিরোও।

—জিরোবার কি হ'ল আবার। এই ত ট্যাক্সি থেকে নামলাম।

মিণ্টুর চোখে মুখে একটা অস্বাভাবিক তৃপ্তি। আনন্দের আতিশয্যে ও বলল—সকালে উঠে দীপু দেখে খুব অবাক হয়ে যাবে।

পরক্ষণে প্রশ্ন করে—তা এ্যাদ্দিন বাঁদরামী ক'রে কোথায় ছিলি, হ্যাঁরে? একটা চিঠিতে খবর দিতে পারতিস!

—ছিলাম বেশি দূরে নয়! বার্ণপুরেই একটা কাজ জুটে গেল। হটমিল-এ বেশ ভালো মাইনে ওখানে। তবে বড্ড আগুনের আঁচ লাগে। যাক, ওসব এখন—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে রে! হ্যাঁ ভালো কথা, এখন ত আমার যখন-তখন যা-তা খাওয়া চলবে না।

দীর্ঘশ্বাস বাদলের পড়ে না। কথাবার্তায়ও তার এতটুকু ভাবাবেগ প্রকাশ হয় না।

দেবজ্যোতি একটু হাসলো—তোমার জন্যে নিয়মকানুন আলাদা ভাই।

ইয়ে শোনো—। বলে সে মিণ্টুর দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—ওকে খাবার দাও। আমি ততক্ষণে দীপুকে ঠেলে তুলি।

বাদল পকেট থেকে একখানা খাম বার করে বল্‌ল—নে দিদি এগুলো রাখ! পুরো পাঁচশো নেই, তা বাকীটা হয়ে যাবে'খন।

মিণ্টু এবার নিজেকে সংযত রাখতে পারে না, চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌ল—না, না, ও টাকা আমি নিতে পারবো না! তুই আর জ্বালাস নে—

—আরে তুই যে কেঁদেই সারা হ'লি। বলি এতে কান্নার কি হল শুনি। এখন এটা তোর কাছে রাখতে বললাম, বাকীটুকু পুজিয়ে মল্লিক সাহেবকে দিয়ে দেবো—ব্যাস্, তাহলেই ত ল্যাঠা চুকে যাবে। আমার অনেক কষ্টে রোজকার করা এ টাকা, এর জন্যে বাবাকেও শেষ দেখাটা দেখতে পেলাম না। আর তুই ঘরে বসে স্রেফ কাঁদবি! এই জন্যে আমি মেয়েদের দেখতে পারি নে। নে, ধর!

বলে বাদল দিদির হাতে খামখানা গুঁজে দিল। মেঝের ওপর হাত-পা

ছড়িয়ে বসে পড়ে সে বল্ল—তারপর দেবুদা, মুখাগ্নি আপনিই করলেন ত! তা ভালোই হয়েছে, বাবাও তাই চেয়েছিলেন নির্ঘাৎ।

দেবজ্যোতি তাকিয়ে থাকে বাদলের দিকে, ক মাসে যেন ওর চেহারায় একটা বয়স্কতার ছাপ পড়েছে। সেই সুকুমার কিশোরসুলভ লালিত্য মুছে গিয়ে একটি যুবকের আবির্ভাব ঘটেছে বাদলের ব্যক্তিত্বে।

মিণ্টু বল্ল—নাও তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না। দুজনকে একসঙ্গেই খেতে দেবো।

—তাই নাকি। তাহলে সময় নষ্ট করা চলে না, বাদলের খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

বলে দেবজ্যোতি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ভাইকে একলা পেয়ে মিণ্টু আরও একটু কেঁদে নিল। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা যা কথা বল্ল সবই দীনদয়ালের কথা—তিনি বাদলের কথা কিরকম গভীরভাবে চিন্তা করতেন, আরও একটা ইঙ্গিত ওর কথার আড়ালে লুকিয়ে থাকে, তা হচ্ছে এই: হয়তো বাদলের ভাবনাতেই উনি অন্যমনস্ক হয়ে ওয়াগনের ধাক্কা খেয়েছিলেন। কথাটা খুব স্পষ্ট করে বল্ল না মিণ্টু পাছে ভাইএর মনে দুঃখ দেওয়া হয়।

দীনদয়ালের বাড়ির বৈঠকখানায় শুয়ে দেবজ্যোতি কিছুতেই ঘুমোতে পারল না। শুয়ে শুয়ে অনেক পুরনো স্মৃতির ভিড়ে সে নিজেকে হারিয়ে ফেল্ল। মন্দাকিনী, অমলা, মিণ্টু এই তিনজনকে নিয়েই তার মানসিক দ্বন্দ্ব শুরু হল। এদের কাউকেই সে অস্বীকার করতে পারে না। এরা কেউ বোধকরি কারুর চেয়ে ছোট কিম্বা বড় নয়। প্রত্যেকেই আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। অনেক টুকরো ঘটনার, কথার, ছবির অরণ্যে দেবজ্যোতির নৈশ পরিক্রমা—এ যেন আর শেষ হতে চায় না। এক সময়ে রাত্রি শেষ হয়। বাইরে পথে জাগরণের কলরব শুরু হয়।

চুরাশি

মানুষ যদি অভ্রান্ত পথে চল্‌তে পারতো তাহলে হয়তো সে যন্ত্রের পর্যায়ে পৌঁছে যেত। তাতে অনেক সমস্যার হাত থেকে যদি চ অব্যাহতি মিল্‌ত, তবু যন্ত্র হবার বাসনা মানুষের কোনো দিনই নেই। নেই বলেই মানুষ—মানুষ। তার নিত্য নব আবিষ্কার আর জটিলতার উদ্ভব। তাই শত সতর্কতা সত্ত্বেও মানুষ ভুল করে, তার ফলও ভোগ করে। কালে কালে তার কীর্তি অপকীর্তি ইতিহাসের পুঁথিতে পুঞ্জিত হয়।····· যন্ত্রের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ ভাবে দিনের পর দিন অতিবাহনের পরেও মানুষ তাই যন্ত্রনিয়মের বাইরে থাকে, থাকতে না চাইলেও থাকে।

এমনি একটা ভুলের জালে মানিকপুরের শ্রমিক সমাজ আবার আটকে পড়ল। একদা যে মানসিক তাগিদে তারা কমিউনিষ্ট ইউনিয়নকে অস্বীকার ক'রে তাকে ভেঙে নতুন ইউনিয়ন গড়েছিল, আজ আবার সেই মানসিক তাড়নাই তাদের অস্থির চঞ্চল করে তুল্‌ল। একটু একটু করে অসন্তোষ জমে উঠেছে—কোম্পানীর বিরুদ্ধে, ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। হাঁা, এ ইউনিয়নও দেখা যাচ্ছে মালিকের তাঁবেদার হয়ে উঠল। অবশ্য হাতেনাতে তেমন প্রমাণ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, তবে যতটা আশা দিয়েছিল ধর্মঘটের সময়ে তার একাংশও সাধন করতে পারে নি ইউনিয়ন। আর যেটুকু করেছে তাও আত্মীয়-পরিজন তোষণের আওতায় পড়ে। ছোটখাটো পক্ষপাতের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল বৃহৎ বিরূপতার আকার নিয়ে। কানাঘুষো শুরু হয়ে গেল, রামঅওতার অসাধু 'জান্‌-পছানা' পেয়ারের আদমীদের সপ্তস্বর্গে তুলে দিচ্ছে সে। বাঙালীদের স্বার্থের খারাপ করে দিচ্ছে রামঅওতার। আরও একটি ধূয়ো উঠল—রামঅওতারের চরিত্র ভালো নয়। প্রথম যৌবনে একটি মেয়েকে 'বার করে' এনেছিল, তার সঙ্গেই সহবাস করে—বিয়ে-থা করে নি ওরা দুজনে। এর পর এসে জুটল সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত—যাকে বলে শিরে

সর্পাঘাত ! অর্থাৎ ইউনিয়নের তহবিল ভেঙেছে রামঅওতার। ব্যস্ আর কি চাই ! এবার রামঅওতারকে হঠাও।

কিছুদিনের মধ্যেই ইউনিয়নের ভেতরে-বাইরে গুজব-গুল্‌জার গরম হয়ে উঠল। এই সময়ে গোমেজ সাহেবই একমাত্র ভরসা। তাঁর কাছে রামঅওতারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব তোলা যেতে পারে ! কিন্তু কোথায় গোমেজ ! তিনি এখন বড় ব্যস্ত। তাঁকে নানান্ ইউনিয়নের হাল-পাল সামলাতে হচ্ছে। ইদানীং তিনি মানিকপুরে বড় একটা আসেন না। তার আরও একটা কারণ, এখানকার দায়িত্ব ত রামঅওতারই আত্মসাৎ করে বসে রয়েছে।

এই কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় ষোলে'-সতেরো জন শ্রমিকের ওপর সরকারী ফতোয়া জারি হয়েছে। তারা কেউ পুরনো গুণ্ডা, কেউ বা চুরি ডাকাতির ব্যাপারে লিপ্ত, এককথায় অসদুপায়ে জীবনযাত্রা নির্বাহের দায়ে তারা অভিযুক্ত হল। দরিয়া খাঁ, কচৌড়ী দোবে, রামখেলাওনা চৌবে, ডোমন প্রসাদ প্রভৃতি 'খান্ আদমী' এই আসামীদের মধ্যে রয়েছে। অনেক লড়াই করেও এরা রেহাই পেলে না। বর্ধমান জেলার চৌহদ্দী ছেড়ে এদের চলে যেতে হল আদালতের নির্দেশে।

অনেকের বিশ্বাস, রামঅওতারের হাত রয়েছে এরও পিছনে—নইলে এতকাল পরে হঠাৎ এইসব ব্যক্তিকে আজ আইনের বিষচক্ষে পড়তে হবে কেন ! অতএব রামঅওতারের অখণ্ড জনপ্রিয়তা চিড় খেল।

আর রামঅওতার সেই শ্রেণীর লোক যে উড়ো গুজবকে আমল দেয় না। ভাঙা-ভাঙা অভিযোগের ছিটেফোঁটা সে গায়ে মাখতে নারাজ। যদি কেউ তার সাম্‌নাসামনি এইসব কথা তুল্‌তো তাহলে কি হত বলা যায় না। এসব কথা যারা ওর কানে তুল্‌তে যায় তারা উল্টে ধমক্ খায়। রামঅওতার বলে—আরে ইয়ার কৌয়াতে কান নিয়ে গেল বল্‌লেই অমনি কৌয়ার পিছে ধাওয়া করব ? না পহেলা কানে হাত দিয়ে মালুম করব যে, কানটা আপন মোকামে হাজির কি না ! ফাল্‌তু বাৎ ছোড়ো ভাই ! আপ্‌না আপ্‌না কাম রাজাতে চলো—!

কারখানার মধ্যে এখন চরম বিশৃঙ্খলা! প্রায়ই মজ্দুররা 'ইন্‌কিলাব' হেঁকে হাতিয়ার বন্ধ ক'রে বসে। ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা করবার মতো ঠাণ্ডা মেজাজ ওদের নেই—ওরা জানে, এখন মজ্দুর-রাজ, ইউনিয়ন এখন ওদের হুকুম-মোতাবেক চল্‌বে। আর ইউনিয়নের অঙ্গুলিসঙ্কেতে চল্‌বে কারখানার কর্তৃপক্ষ। · হঠাৎ হরতাল নিয়ে রামঅওতার যখনই মজ্দুরদের অপ্রিয় সমালোচনা করতে গিয়েছে তখনই শ্রমিকেরা তার উপর বিরক্ত হয়েছে, সাম্‌না-সাম্‌নি তাকে অপমান না করলেও আড়ালে উষ্মা প্রকাশ করতে ছাড়ে নি।···আব্‌তো বহুৎ পোজিশান মিল্ গিয়া, কম্প্‌নিকা দামাদ্ বন্ গিয়া বুঢ়াউ। আভি লেবর-কা ইয়াদ শরম্ কা গর্দা মালুম্ হোতা!

মোট কথা রামঅওতারের প্রতিষ্ঠার শিকড়ে ঘুন ধরেছে। তা ধরতেই পারে, আজও পর্যন্ত দু-কামরার লেবার কোয়ার্টার তৈরী হল না। ধর্মঘটের পর-পর খান পঞ্চাশ দু-কামরার কোয়ার্টার তৈরী হয়েছিল বটে। তবে, সরকারের প্রতিনিধি এসে নতুন কোয়ার্টার দেখে খুশী হয়ে রিপোর্ট পাঠানোর পরই হল কি, দু-খানা ঘরের মাঝে করোগেট শীট দিয়ে পার্টিশন তৈরী করে—দুই পরিবারকে বিলি করে দেওয়া হল। এই ত গেল কোয়ার্টারের কেচ্ছা। বিজ্‌লী আলোর বেলাতে কোনো উচ্চবাচ্যই শোনা যায় নি আজ পর্যন্ত। অথচ, কোম্পানীর যে সব কোয়ার্টারে ইলেক্‌ট্রিক ব্যবস্থা রয়েছে তার জন্য নামমাত্রই খরচ নেয় কোম্পানী। এর আগে নাকি বিনামূল্যেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হত। সম্প্রতি ইউনিট পিছু চার পয়সা খরচ নেয় কোম্পানী। এখানে আরও একটি কথা বলে রাখা ভালো—কোম্পানীর যে-কোনো কোয়ার্টারেরই ভাড়া নাকি চার টাকা! প্রথম শ্রেণীর সাহেব বাংলোর ভাড়াও চার টাকা, আবার 'কে'-টাইপ খুপ্‌রীরও চার টাকাই ভাড়া আদায় করা হয়ে থাকে। যে সব শ্রমিক কোয়ার্টার পায় নি, তাদের চার টাকা হিসেবে কোয়ার্টারের খরচ ধরে দেওয়াই এখানকার রেওয়াজ। এটা নাকি ভাড়া নয়,—খাজ্‌না, কিম্বা তাও নয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, মেরামত করা ইত্যাদির খরচ! যাই হোক, কোম্পানীর এই সাম্যদৃষ্টির তারিফ করতেই হয়।

আর শিক্ষা! না, সেই পুরনো একমেবাদ্বিতীয়ম্ স্কুলই বজায় রয়েছে।

তার পরিচালনায় অবশ্য পরিবর্তন ঘটেছে। এখন মাস্টার মশাইরা বুঝে নিয়েছেন যে, স্কুল হ'ল পরীক্ষা পাশের কারখানা। অভিভাবকেরা স্পষ্টই বলে রাখেন, ছেলে যেন ফেল না করে। তার জন্য স্কুলেরই কোনো মাস্টার মশাইকে 'প্রাইভেট টিউটর' রূপে বহাল করাই শ্রেয়। তাতে কাজ হয়। সাধারণ শ্রমিকদের অত পয়সা নেই—অতএব ফেল যদি করতেই হয় তাদের ছেলেরাই করুক! স্কুলে মাইনে যা ই হোক-না কেন ছাত্র পড়িয়ে মাস্টার মশাইরা ঘাটতি উসুল করেন। ব্যস, এই পর্যন্তই হ'ল শিক্ষাবিস্তারের নমুনা।

বাকী থাকে স্বাস্থ্য! সেদিক দিয়েও বিশেষ কোনো রদবদল হয় নি। তফাতের মধ্যে এই ঘটেছে যে,—আউটডোর বিভাগের জন্য রাস্তার ওপারে একটা নতুন বাড়ি তৈরী হয়েছে। সেখানে দু জন নতুন চিকিৎসক নিযুক্ত করেছে কোম্পানী। তবু, হাসপাতালেরই কিছু উন্নতি হয়েছে বল্‌তে হয়। ডাক্তার মেহেরা খুব কড়া লোক। কর্তব্যে অবহেলার অপরাধে তিনি অনেকগুলি নার্সকে বরখাস্ত করেছেন, তিন জন ডাক্তারও তাঁর দাপটে খতম হয়েছেন। মেহেরা রাতদুপুরেও অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে থাকেন,—নাইট ডিউটির নার্সকে ঘুমন্ত অবস্থায় ধরে ফেল্‌তে তাঁর একটুও অসুবিধে হয় না। আর এসব ব্যাপারে সংশোধনের সুযোগ দিতে তিনি নারাজ, সোজাসুজি ইস্তফার ব্যবস্থা! এইজন্য মেহেরার ওপর অনেকের রাগ আছে। তিনি নাকি বাঙালী বিদ্বেষী। বটেই ত, যাদের চাকরী গিয়েছে তারা কেউ অবাঙালী নয় যে।·· আর ইউনিয়নের চোখ রাঙানীকেও মেহেরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। বলেন,—ইউনিয়ন কি রোগীর জীবন রক্ষা করতে আসবে? মেহেরার চেষ্টাতে, ছোঁয়াচে রোগ, কলেরা, যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ খোলা হয়েছে।···

যেটুকু কাজ হয়েছে তা অবশ্য ধর্মঘটের পর পরই হয়েছে। মাইনে আর ছুটির ব্যাপারে শ্রমিকদের খানিকটা সুরাহা হয়েছে। বাড়তি দুদিন ছুটি জুটেছে—এই বিশ্বকর্মা পুজো আর বিজয়া দশমীর ছুটিকে সবাই বলে বারি সাহেবের ছুটি।

ইউনিয়নের সঙ্গে কোম্পানীর ঝগড়াঝাঁটি সমানেই লেগে রয়েছে।

ফাইলের পর ফাইল মোটা হচ্ছে, কিন্তু কাজের কাজ সে তুলনায় এগোচ্ছে সামান্যই। রামঅওতার বিরক্ত, সবসময়ই সে আজকাল ভ্রূকুঞ্চিত করে থাকে। কোনো দিকেই যেন আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। মজদুরদের অভিযোগ-অনুযোগ শুনতে সে বাধ্য। সব শুনে বলে—আরে ভাই লেতে চলো মাংতে চলো। এমনিভাবেই চল্‌বে। আদায় করে নাও যতটুকু পারো, তারপর আবার দাবির জিগির তোলো। এ ছাড়া পথ নেই!

এমনি করেই ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ এসে পড়ল। আবার বিমল চৌধুরীর দল মানিকপুরের শ্রমিক মহলে আনাগোনা শুরু করেছে। সোস্যালিস্ট পার্টির মাতব্বরেরা সভা আহ্বান করলেন—গোলমাল, হট্টগোল, মারপিট হয়ে সভা পণ্ড হল। কয়েকজন মার্কামারা গুণ্ডাকে ধরে জেলার বাইরে বার করে দেওয়া হল। মানিকপুর আবার রাজনীতির আখড়া হয়ে উঠল। সামনে আসছে সাধারণ নির্বাচনের দিন। অতএব, এমন একটা শহরকে হাতের মুঠোয় ধরতে প্রত্যেক দলই চাইবে। আর মানিকপুরের কর্তৃত্ব দখল করবার সহজতম এবং প্রধানতম পন্থা: ইউনিয়নকে দখল করা।

প্রায় প্রতিদিন বিকেলে সন্ধ্যায়, এখানে ওখানে সভা হচ্ছে। আর তার মূল সুর: ইয়ে ইউনিয়ন খিলাফ্ হায়। ইউনিয়ন কমিটি দালাল হায়।...... শোভাযাত্রা চলে পথে পথে। সবার মুখেই এক কথা—বারি সাহেবের আমলে যে কার্যনির্বাহক সমিতি তৈরী হয়েছে, সেই পুরনো কমিটিই আজ পর্যন্ত বহাল রয়েছে! বারেকের জন্যও নির্বাচন হয় নি কেন? ইউনিয়নের ঘাঁটি আগলে যারা রয়েছে তাদের সে অধিকার নেই। জুলুম করে তারা গদি আঁকড়ে মজা লুট্‌ছে। অথচ ইউনিয়ন ত কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।

বিশ্ব দুনিয়ার সঙ্গে মানিকপুরের তফাৎ এইখানেই। যখন সারা ভারতবর্ষ নির্বাচনী যুদ্ধের মহড়াতে উন্মত্ত—বিধান সভা আর লোক সভার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণের প্রতিযোগিতা করতে ব্যস্ত, তখন মানিকপুরে চলেছে ইউনিয়নের নির্বাচনী জিগির। এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে লোকসভার সম্পর্ক কতটুকু? তার চেয়ে ইউনিয়ন তাদের কাছে অনেক, অনেক বড় সংস্থা।

কথাটা মিথ্যে নয়। তার যাথার্থ্য প্রমাণিত হল, যখন, কারখানার মধ্যেও

ইউনিয়নের কার্যকলাপ নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা দলাদলি শুরু হয়ে গেল। এতদিন যারা চুপ করে ছিল তারা জোর গলায় 'ডিং' হাঁকতে লাগলো—জরুর, জরুর পাক্কা বাৎ হ্যায়! ইস্‌মে আগর কোই ভেইয়া বুরা সম্‌ঝে ত ও শালা সর্‌মায়াদার বন্‌ গিয়া জরুর! ইলেক্‌শান হোনাই চাহি।

রামঅওতার এবার ক্ষেপে উঠল। প্রথম প্রথম সে অশ্লীল ভাষায় সকলকে গালিগালাজ দিয়ে গায়ের ঝাল মেটাতো, বল্‌ত—কারখানার ভূত ছাড়া এমন কথা কোনো মানুষে বল্‌তে পারে না। আনপঢ় (মূর্খ) বুদ্ধুরা দু-দিন ইউনিয়ন করে পীর-পয়গম্বর বনেছে। চোট্টামতলববাজদের পাল্লায় পড়লে তখন আবার সিধে হয়ে যাবে।

সে ভেবেছিল এতদিনের নেতৃত্ব করার ফলে তার একটা হক্‌ জন্মেছে চোখরাঙাবার। এবং যেহেতু সে এতদিনের মধ্যে মজতুরের কল্যাণের ব্রতে নিরন্তর পরিশ্রম করেছে সেহেতু তার প্রভাব-প্রতিপত্তি সাময়িকভাবে ক্ষুণ্ণ হলেও সেটা স্থায়ী হ'তে পারে না। মজতুরের এই বিরূপতার পিছনে যে স্বার্থসন্ধানী রাজনীতিক দলের উস্কানী রয়েছে সেটুকু যদি শ্রমিকদের সে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে পারে তাহলেই সব গোলমাল মিটে যাবে—রামঅওতারের আন্তরিক প্রত্যয় তাই।

কিন্তু কার্যতঃ সেটা হল না।

ওদিকে মল্লিক সাহেব যে এতদিনে একেবারে হাত-গুটিয়ে চুপ করে বসে ছিলেন, এরকম মনে করার কোনো হেতু নেই। তিনি বিবিধ উপায়ে শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন।

আপাতদৃষ্টিতে মল্লিকসাহেবের কার্যকলাপ কিছুই টের পাওয়া যায় নি। কিন্তু তিনি নিত্য নূতন লোককে বশ্যতায় টেনে নিয়েছেন। সে সব ইতিহাস অবশ্য অনেক পরে প্রকাশ হয়েছে। রামঅওতারের আসন টলাবার জন্য কয়েক বছরে খুব কম করে কোম্পানীর একলাখ টাকা খরচ হয়। তার ফলেই শ্রমিক মহলে তার নামে চরিত্রহীনতা, অসাধুতা, দাঙ্গাহাঙ্গামা করানো ইত্যাদি কুৎসা রটনা সম্ভবপর হয়েছে। নিত্য দিনের সেসব কাহিনী কিছুটা ফাঁস করে রবিনসন সাহেবের আরদালী এবং কিছুটা বা মল্লিক সাহেবের

বেয়ারা। কিন্তু সেকথা তারা সকলের সামনে বল্‌তে সাহস পায় নি। বলেছে রামঅওতারের কাছে, এবং এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে যারা লিপ্ত রয়েছে তাদের নাম শুনে ঘৃণায় রামঅওতারই নাকমুখ সিঁটকে 'রামজী'কে স্মরণ করে, আর স্মরণ করে বারিসাহেবকে!

হ্যাঁ অভিজিৎ সিং আছে, শিউকিষেণ শর্মা, সুবল দস্তিদার, প্রভৃতি ইউনিয়নের মুখিয়া আরও অনেক লোকই রামঅওতারের বিরুদ্ধে প্রচারের ভার নিয়েছে। যাদের সততার ওপর সন্দেহ হয় নি কস্মিন্‌কালে, যারা রামঅওতারের কাছে বিস্তর উপকার আদায় করে পদোন্নতি করেছে, ভালো কোয়ার্টার পেয়েছে তারাই আজ রামঅওতারের জনপ্রিয়তায় বিরক্ত। যাদের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের উপর রামঅওতারের অসীম আস্থা তারা এইভাবে তাকে অপদস্থ করবার কাজে অগ্রণী!

ভেবে পায় না রামঅওতার, এখন কি তার কর্তব্য। প্রথমে যে মানুষটা সদম্ভে অবজ্ঞাভরে বিরোধের ধোঁয়াকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার স্পর্ধা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল সে হঠাৎ এখন নিজেকে বড় অসহায় ভাবতে শুরু করে।

এই দুঃসময়ে রামঅওতারের মনে পড়ল একটি মানুষের কথা—দেবজ্যোতি। অনেকদিন পরে সে নূতন করে দেবজ্যোতির কথা ভাবতে আরম্ভ করল। না, দেবজ্যোতি কখনো তাকে অবহেলা করে নি। বরং সে-ই দেবজ্যোতিকে এড়িয়ে চল্‌তে শুরু করেছে। দেবজ্যোতির সাবধানবাণীকে ঈর্ষাপ্রসূত মনে করে কখনও বা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। নইলে, দেবজ্যোতি ত বহুবার তাকে বলেছে—বুঢ়াও সাম্‌লে চলো! হুঁশিয়ার হয়ে পা ফ্যালো। যারা তোমাকে মাথায় তুলে নাচছে তাদের দেমাক বিগড়ে দিয়ো না। অন্যায়কে অন্যায় বলে বুঝতে দাও।······আরও অনেক কথাই দেবজ্যোতি বলেছে। শোনে নি রামঅওতার। শোনবার মতো মানসিক স্থৈর্য সে হারিয়েছিল। সে যেন একটা কড়া মদের নেশার ঝোঁকে চলে এসেছে হু-হু বেগে কয়েকটা বছর। নিজেকে রুখবার কোনো উপায় ছিল না। পিছন থেকে জনমত তাকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। আর সে জনমত গঠনের মূলেও রামঅওতারের প্রচ্ছন্ন প্ররোচনা ছিল। গ্রাহ্য সে করে নি কাউকেই—তার প্রয়োজনও বোধ

করে নি। এমন কি গোমেজ সাহেবকেও নিজের মতে পরিচালিত করেছে। মতান্তরের সম্ভাবনা দেখা দিলে জোর গলায় জানিয়ে দিয়েছে, মানিকপুরের পরিস্থিতির সঙ্গে গোমেজের পরিচয় কতটুকু? পক্ষান্তরে রামঅওতার সিং নিজে একজন মজতুর, সবসময় মজতুরের সঙ্গে ওঠাবসা করছে সারাটা জীবন—অতএব গোমেজের চেয়ে মানিকপুরের সমস্যাটা রামঅওতার গোমেজের চেয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে জানে। স্পষ্টভাবে না বল্‌লেও তার হাবভাবে যেন এমনও প্রকাশ হয়ে পড়েছে যে, রামঅওতারের হাতেই গোমেজের অস্তিত্ব নির্ভর করছে।

আজ এতদিন পরে রামঅওতার যেন বুঝতে পারে সে মস্ত বড় একটা ভুল করেছে। নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে সংশয় নিয়ে মানিকপুরের নেতৃত্ব হাতে নিয়েছিল সে সংশয় কবেই ধূলিসাৎ হয়ে গিয়ে একটু-একটু ক'রে নায়কত্বের মূঢ় প্রত্যয় তাকে গ্রাস করে বসেছে!

নায়কত্বের নেশায় উন্মত্ত হয়ে তুনিয়ার সব কিছুকেই সেই রঙে রাঙিয়ে দেখেছে। তলিয়ে বোঝবার অভ্যাসটা তাকে কবেই পরিহার ক'রে একান্ত একাকীত্বে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। রামঅওতার একলা! তার দোসর কেউ নেই। তার যতো অনুচর-সাগ্‌রেদ তারা অন্য মাথায় মুকুট পরাবার জন্য ব্যস্ত। তাকে ওরা আর চায় না! কেন? কেন—সে ত স্বার্থপরতা করে নি! সে ত আর পাঁচজন মুখিয়ার মত লজ্জার মাথা খেয়ে মজুরী বাড়িয়ে নেয় নি নিজের, সে ত কুলী-মহল্লার ঘর ছেড়ে বাবু বাংলো কিম্বা মিস্ত্রী কোয়ার্টারের আরাম গ্রহণ করে নি। অথচ এ সবই তার হাতের মুঠোয় ছিল! যতটা পেরেছে সে উদার হস্তে—তু-হাতে বিলিয়েছে। পাছে লোকে বলে, রামঅওতার সিং নিজের আখের গুছিয়ে নিল, সেই আশঙ্কায় তার ন্যায্য পাওনাটুকুও গ্রহণ করে নি। তবু ওরা কী মিথ্যে কলঙ্কের কালি তার সর্বাঙ্গে মাখিয়ে দিল। কেন? কোনো উত্তর খুঁজে পায় না রামঅওতার।

সমস্যার মেঘ যতো ঘনিয়ে আসে ততই দেবজ্যোতির অভাববোধটা রামঅওতারকে অস্থির ক'রে তোলে। একবার দেখা করতে যাবে নাকি রামঅওতার?

যাবার ত মুখ নেই। সে পথ রামঅওতার নিজে হাতে বন্ধ ক'রে দিয়েছে। দেবজ্যোতির মুখের ওপর সে বলে বসেছে – তুমি বুদ্ধু! তোমার মতো মানুষ কস্মিন কালে সংসারের কাজে লাগতে পারবে না।

কথাটা অবশ্য তখনকার হিসেবে রামঅওতার খুব ভুল বলে নি।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই ঃ

দীনদয়ালের মৃত্যুর কিছুদিন পরের ঘটনা। রামঅওতার নিজে উপযাজক হয়ে বাদলের একটা চাকরী জুটিয়ে দিল কারখানাতে। তখন দেবজ্যোতি কিছু বলে নি। কিন্তু তারপর যখন কোম্পানী নোটিশ দিল দীনদয়ালের কোয়ার্টার ছেড়ে দেবার জন্য, তখনই গোলমালটা পাকিয়ে উঠল। দেবজ্যোতি এসে রামঅওতারকে বল্‌ল, অন্ততঃ একখানা ঘরের 'কে' টাইপ কোয়ার্টার না পেলে যে চল্‌ছে না। তার জবাবে রামঅওতার বল্‌লে—তুমি কিছু ভেবো না, সান্যালবাবুর কোয়ার্টার এখন কোম্পানী ফেরৎ পাবে না। আগে ওঁর এ্যাকসিডেন্টের খেসারৎ আদায় হবে, তারপর ত উঠে যাওয়ার কথা!

দেবজ্যোতি বিরক্ত হয়ে বলে—তোমার কাছে আমি যেটা এতদিন ধরে চাইছি সেটার জন্যে কোনো চেষ্টাই তুমি করো নি, করতে চাও না। আমার সঙ্গে খাতিরদারি ছাড়াও একটা সম্পর্ক তোমার রয়েছে, সেটা হ'ল তুমি ইউনিয়নের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট, আমি ইউনিয়নের একজন সভ্য। সেই সম্পর্ক নিয়েই তোমার কাছে এই দাবি!

রামঅওতার হেসে উঠেছিল—গুরু, তুমি নাহক্ রাগ করছ! তোমার জন্যে আমি একখানা 'ফোরম্যান' টাইপ কোয়ার্টার দিতে রাজি আছি। কিন্তু আজ যদি সেটা দিই কাল তুমি নিজের কোয়ার্টারে চলে যাবে, তখন ওই নাবালক ছেলেটা আর বাচ্চা মেয়েটাকে দেখবে কে?

ক্ষুণ্ণ দেবজ্যোতি বলেছিল—আমার বিবেচনার ওপর এতটুকু ভরসা নেই? আমি ত বল্‌ছি 'কে' টাইপ কোয়ার্টার আমার হকের পাওনা, আমি সেখানেই ওদের রাখবো!

—তা হয় না। ওদের অভিশাপ আমি কুড়োতে পারবো না। সান্যাল

মশাই চলে যাবার পর থেকে তুমি যেমন রয়েছ ওদের মাথায় তেমনি থাকবে—আমি রামঅওতার সিং বল্‌ছি তোমাদের কেউ ওখান থেকে একচুল হঠাতে পারবে না! যাও আর কথা বাড়িয়ো না। সান্যাল আমাদের সবার মাথার মাথা, তাঁর ছেলেমেয়ে 'কে' টাইপের যন্ত্রণায় পচবে, এ আমি বেঁচে থাকতে হবে না। তা ছাড়া সান্যালের মামলা হলো আমাদের বাড়ীর মামলা। লড়াই সবে শুরু, এই সময়ে কোয়ার্টার 'ভেকেট্' করে দিলে কোম্পানী ভাববে যে আমরা কম্‌জোরী হয়ে, ঘাব্‌ড়ে গিয়েছি। তা হয় না। যতদিন পর্যন্ত কোম্পানী দশ হাজার টাকা লাইফের ক্ষতিপূরণ না দেবে, ততদিন আমরা লড়ে যাবো, তাতে জানের পরোয়া করি না।

দেবজ্যোতি বেশ চড়া মেজাজেই জবাব দিয়েছিল—রামঅওতার সিং তোমার মধ্যে ডিক্‌টেটার জন্মেছে! সাবধান হও। আর আমার কথা শুনবে, তাহলে বলি এই 'কে' টাইপ কোয়ার্টার আমি আদায় ক'রব, এর জন্যে তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যায় যাক!

তারই জবাবে রামঅওতার বলেছিল—গুরু তুমি বুদ্ধু, জানো না রামঅওতারের জোর কতখানি। তবে তোমার সঙ্গে লড়াই আমি করব না। তোমাকে মুখে যখন গুরু মেনেছি তখন বেঈমানী করব না। লেকিন এও বল্‌ছি, তোমাকে দিয়ে সংসারের ভালাই হবে না। কেবল ভেবে-ভেবেই একদিন তুমি ফুরিয়ে যাবে। এটাই বড় আপসোস। তুমি পড়ালিখা অনেক করেছ, করছ—লেকিন ও হচ্ছে দোসরা দুনিয়ার ব্যাপার। সংসারের কথা হ'ল গিয়ে প্র্যাকটিক্যাল নজর।

অবশেষে দেবজ্যোতি ফিরেই গিয়েছিল। তার কাছ থেকে রামঅওতার একথাও আদায় করেছিল যে, যতদিন দীনদয়ালের অপমৃত্যুর ক্ষতিপূরণ না দিচ্ছে কোম্পানী, ততদিন দেবজ্যোতি দীনদয়ালের কোয়ার্টারেই থাকবে। আর রামঅওতারকে দেবজ্যোতি বলেছিল—ভবিষ্যতে ইউনিয়ন সম্পর্কিত কোনো আলোচনাতে সে দেবজ্যোতির কাছে পরামর্শ চায় না যেন।

সেও হয়ে গেছে ক'বছর। সম্পর্ক একটা রয়েছে—সরু সুতোর মত।

তবে তার বেশি কিছু নেই। দেবজ্যোতিই রাখে নি। রামঅওতারও নয়।

আজ আবার রামঅওতার, একান্ত বিপন্ন রামঅওতার, দেবজ্যোতি ছাড়া আর কারুর কথাই ভাবতে পারছে না। আর যার কথাই সে ভাবতে চেষ্টা করে, থম্‌কে গিয়ে তার সংশয়াপন্ন মন সন্দেহ করে, বুঝিবা সেখানেও ষড়যন্ত্রের কোনো বিষ ঢুকে রয়েছে।

পঁচাশি

বৈশাখের জড়িমাশূন্য প্রভাত। সূর্য ওঠে নি এখনো। কিন্তু শহর জেগেছে। কুলি লাইনে সাজ-সাজ আয়োজন। পাঁচটার বাঁশীতে ঘুমের ছুটি হয়ে গেছে।

রামঅওতার দরজাটা ছোট করে খুলে রেখে বাইরে গাছতলায় ছোট্ট টুলের ওপর বসে বসে দাঁতন করছিল। বাড়ির ভেতরে তখন যমুনার বাসিপাট সারা হয়ে গেছে, ও ঢুকেছে রান্নাঘরে, বুড়োর আবার সাতসকালে চা নইলে চলে না।

ওপাশের কোয়ার্টারের সামনে পথের ওপর বসে গরু দুইছে মুন্নীর মা। ওরা পাঞ্জাবী।

পথ দিয়ে চলেছে এক ফকীর, আপন মেজাজে সেই গাইছে :

চল্‌তী চক্কী দেখিকে, দিয়া কবীরা রোয়।......

গানের সুরটুকু কানে যেতেই রামঅওতার চমকে উঠে পড়ল টুল ছেড়ে। তারপর ব্যস্ত ভাবে হাঁকলো—এ মহারাজ! এ মহারাজ শুনো ভাই—

ফকীর ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকালো। গান তার থেমে গেছে। সে বল্‌ল—ক্যা, আপ বোলাতে, মহারাজ! ম্যয় তো মহারাজ নহী, হাম দাস হো!

রামঅওতার বিষণ্ন হাসি হেসে বল্‌ল—জরুর! আপ তো মহারাজহি। আইয়ে ইধর, কৃপা সে আপ্‌কা গানা শুনাইয়ে—

—ফির ভি আপ কহ্‌তে হেঁ কি হামারা গানা, ইয়ে তো কবীর মহাজন কী দোহাঁ হৈ! খ্যয়র শুনিয়ে—

ব'লে ফকীর চোখ বুজে গাইতে শুরু করল—

চল্‌তী চক্কী দেখিকে, দিয়া কবীরা রোয়।
দুই পট ভীতর আয়কে, সাখিত গয়া ন কোঈ॥
ভাঈ বীর বটাউআ, ভরি ভরি নৈন ন রোয়।
জা কা থা সে লে লিয়া, দীন্‌হা থা দিন দোই॥

গান শেষ করে ফকীর চুপ করে গেল। তার দৃষ্টি রামঅওতারের বিষণ্ন

গম্ভীর তন্ময়তায় আকৃষ্ট হয়েছে। রামঅওতার চোখ বুজে বসে ছিল। হঠাৎ হুঁশ হতেই সে করুণ আবেদনের সুরে অনুরোধ করে—আর একবার গাইবে ?

ফকীর তার আবিষ্ট ভাব দেখে খুশী হয়ে হেসে বল্‌ল—মহারাজ তুমি ত যে-সে লোক নও। তুম্ তো প্রেমী! এই পথের পথিক, সংসার সাজিয়ে বসে রয়েছ বটে, কিন্তু তোমার মন এখানে নেই। তা তোমাকে গান শুনিয়ে আনন্দ আছে। শোনো তবে অন্য একটা গান :—

সাধো, দেখো জগ বৌরানা।
সাঁচী কহৌ তৌ মারণ ধারৈ ঝুঁঠে জগ পতিয়ানা।
হিন্দু কহত হৈ রাম হমারা, মুসলমান রহমানা।
আপসমেঁ দোউ লড়ে মরতু হৈঁ, মরম কোই নহিঁ জানা।
বহুত মিলে মোহিঁ নেমী ধর্মী প্রাত করৈঁ অসনানা।
আতম্-ছোড়ি পষানৈঁ পূজৈ তিনকা থোথা জ্ঞানা।
আসন মারি ডিঁভ ধরি বৈঠে মনমেঁ বহুত গুমানা।
পীপর-পাথর পূজন লাগে তীরথ-বর্ত ভুলানা।

গান বেশ জমে উঠেছে। গায়ক-শ্রোতা দুজনেই মশগুল। এমন সময়ে ভিতর থেকে যমুনা জোর গলায় হেঁকে উঠল—দ্যাখো আক্কেলটা। হ্যাঁ গো, বলি আজ কি কারখানায় যেতে হবে না ? নাকি গান শুনলেই পেট ভরবে ? দুই ছাতুতে এখন জমিয়ে বসলে যে—

রামঅওতার মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বল্‌ল—চা হয়েছে ? ত নিয়ে এস সাধুবাবার সঙ্গে প্রসাদ পাই।

হাতজোড় করে সাধু বল্‌ল—আহা থাক!

যমুনা মোটেই খুশী হয় নি—কোথা থেকে এক ভিখারীকে জুটিয়ে এখন তার সঙ্গে চা খেতে হবে। এর পর ত সারা দিনে টিকিটি দেখা যাবে না। দুপুর রাতে যখন বুড়ো ঘরে ফিরবে তখনও কথা কইবে না, ইউনিয়নের কাজে ভীষণ খাটুনী পড়েছে! যা সময় পায় যমুনা তা এই সকালটুকু—আজ সেটুকুও বরবাদ হল!···অবশ্য চা দুজনের মতই হয়েছিল। দুটি পেয়ালা নিয়ে দরজা

পর্যন্ত এসে যমুনা একগলা ঘোমটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হেসে রামঅওতার বল্ল—আরে লজ্জা কি, এসোই না!

চায়ের পাত্র পড়ে রইল, সাধু তার গান গেয়ে চলেছে :—

হিন্দুকী দয়া মেহর তুরকন্‌কী দোনোঁ ঘরসে ভাগী।
উহ্ করৈ জিবহ্ বাঁ ঝটকা মারে আগ দোউ ঘর লাগী।...

সাধুবাবাকে রামঅওতার হাত তুলে নমস্কার করে বলে—আর একবার ওই প্রথম গানটি গাইবে বাবা? ওই চলতী চক্কী দেখিকে—

প্রসন্ন হাসিটি সাধুবাবার মুখে মাখানো। সে গাইতে শুরু করল। ওদিকে তখন পৌনে ছটার ভেঁা বাজতে শুরু করেছে। নিমেষের তরে রামঅওতার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরক্ষণে আপন মনে হেসে নিজেকেই বলে—জাকা থা সো লে লিয়া, দীন্‌হা থা দিন দোই! দুদিনের জন্যেই ত সব! তবে আর এত ভাবনা কিসের।...

সাধুবাবা বিদায় হল। কিন্তু রামঅওতারের নড়বার কোনো লক্ষণই নেই। যমুনা মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে, যে মানুষ একদিনের তরেও কারখানায় যেতে এতটুকু দেরি করে না—ঝড়জল, অসুখবিসুখ কোনো কিছুতেই যার হাজিরাতে দাগ পড়ে না, আজ হঠাৎ সেই মানুষ এমন ভাবে বসে রয়েছে কেন? কি হল!

অবশেষে বলেই ফেল্‌ল—তোমার আজ হয়েছে কি বলো তো! সবাই ত কাজে বেরিয়ে গ্যালো—। শরীর খারাপ?

—না শরীর ঠিকই আছে।

—তবে, কি হয়েছে?

—কিছু না, আজ আর কারখানায় যাবো না!

—শুধুশুধু কারখানা কামাই করবে? সেটা কেমন কথা!

মুখে বল্‌ল বটে যমুনা 'কেমন কথা' কিন্তু এমনটাই যেন ও চাইছিল, আজ নয় অনেক দিন ধ'রে। চেয়েছে অথচ টের পায় নি যে ঠিক এটাই চেয়ে এসেছে ও। আজ যখন রামঅওতার নিজে থেকেই কারখানা কামাই করবে বল্‌ল তখনই যেন ওর মন হাজার খুশীতে ফেটে পড়তে চাইল। সত্যি,

রোজ রোজ একঘেয়ে কারখানাতে যাওয়া এ যেন অসহ্য! কেনই বা যায় মানুষ? কেন এমনি মাঝে মাঝে ডুব দেয় না—শুধু নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রমাণ দিতে। অকারণেই কামাই করতে হয়।

ইচ্ছে করছিল রামঅওতারকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে অজস্র আদরে ছেয়ে দিতে। কিন্তু কি ভেবে নিজের কাছেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে যমুনা।

রামঅওতার ওর দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—চলো আজ একবার গুরুর ওখানে যাই।

আরও বিস্মিত হ'ল যমুনা। বুড়োর নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়েছে, নইলে এমন অসম্ভব প্রস্তাব করে কেউ। এই যে এত বছর ধরে যমুনা মানিকপুরে রয়েছে, কোথাও কোনোদিন ও গিয়েছে নাকি—না রামঅওতারই যাবার কথা বলেছে!

রামঅওতারের মুখের পানে চেয়ে যমুনা বুঝতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। কোনো দিনই পারে নি ও রামঅওতারকে বুঝতে। আজ যেন সে আরও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। যমুনা ওর দুনিয়াকে ছোট্ট এই একখানি ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছে। সমাজের সঙ্গে ওর অনেকদিনের আড়ি। আর কাউকেই চায় না ও, কিছুই নয়—রামঅওতারকে নিয়েই ও বেশ খুশী, আর রয়েছে ওর অসংখ্য দেব-দেবীর পট্। আরও আছে বস্তীর সেই সব অবাধ্য দুরন্ত ছেলেমেয়ে, যারা বাপ-মায়ের চোখে ধুলো দিয়ে বুড়িয়ার হাতের মুড়ির মোয়া আর নাড়ু খেতে আসে। মুখে তাদের আসতে বারণ করেও আবার মনে মনে চায় ওরা আসুক। ওরা তা বোঝে। আবার বাপমায়ের কাছে মারধরও খায় ধরা পড়ে গেলে। ওরা অত বোঝে না, এমন মিষ্টি মানুষটার ওপর গুরুজনদের এত আক্রোশ কেন। কথায়-কথায় তাঁরা বুড়িয়াকে মন্দ বলেন, নষ্ট বলেন—কিন্তু ওরা জানে সেটা কি নিদারুণ অসত্য। মন্দ হ'লে কেউ এমন আদর করতে পারে, না সেধে সেধে খাওয়ায়! তবু যমুনা বাইরে বেরোয় না। রামঅওতার এতখানি না চাইলেও বিশেষ অভিযোগ কখনো করে নি! আজ হঠাৎ সে এমন কথা কেন বল্‌ল—কেন সে বল্‌ল, 'চলো যাই!' অমনি যমুনার রাগ হয়ে গেল,—এত দিন পরে? কই এর আগে ত এমন ক'রে তুমি বলো নি! কেন এতদিন বলো নি?

তবু যমুনা মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে পারে না, বলে—সত্যি বল্‌ছ ?

—কেন, এর মধ্যে সত্যি না থাকার কি দেখলে ? গুরুর কাছে যেতে বড় ইচ্ছা করছে।

—সত্যি, সেও ত অনেক দিন আসে নি !

—সেই জন্যেই ত যেতে হবে।

—আমিও যাবো ?

—একা-একা আর ভালো লাগে না, তুমি চলো সঙ্গে !

—চলো। তবে একটা তালা চাই যে, তালাচাবী নেই যে।

—দরকার নেই। শেকল তুলে দিয়েই চলো।

যমুনার বিস্ময়ের অবধি নেই। একদিকে ও যেমন খুশী, অন্যদিকে তেমনি শঙ্কিত। এত ঔদাসীন্য কেন রামঅওতারের ! তবে কি সে বাঁধন ছিঁড়তে চাইছে ? মনের শঙ্কাকে ধুলোর মত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যমুনা বল্‌ল—চলো !

পথ চল্‌তে চল্‌তে রামঅওতারকে মাঝে মাঝেই থমকে দাঁড়াতে হয়। একগলা ঘোমটা দিয়ে যমুনা যেন হাঁটতেই পারছে না। তা ছাড়া এভাবে ত দিনের বেলা মানিকপুরের পথে যমুনাকে সঙ্গে নিয়ে রামঅওতার কখনো বেরোয় নি, সম্ভবতঃ সেজন্যও খানিকটা সঙ্কোচ রয়েছে যমুনার পায়ে জড়িয়ে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সে বিড়ি ধরায়। আশপাশে তাকিয়ে ছাখে। ব্যাচিলরদের মেসের পাশে একটা রেডিয়ো বাজছে। তাকে দেখে কোম্পানীর দারোয়ানটি টুল ছেড়ে উঠে সেলাম করল। শিম্পগাছের নীচে একটি মুচি জুতো সারাচ্ছে, তার ওপাশে একটি পানবিড়ির দোকান। দু-একটি খরিদ্দার উপু হয়ে বসে বাচ্ছা দোকানীর সঙ্গে গল্প করছে। রামঅওতার পিছন ফিরে দেখল যমুনা কত দূরে ! মুখ ফেরাতেই একটি লোক 'জয় রাম জী কী !' ব'লে অভিবাদন করল। রামঅওতার হেসে বল্‌ল—'ক্যা সব আচ্ছা ত !'

মামুলী কথা বলতে হয় তাই বলা।

লোকটি বল্‌ল—আমার দোকানের একটা পান আপনাকে খেতে হবে সিংজী !

রামঅওতার প্রশ্ন করে—কোনটা তোমার দোকান ?

—এই যে।

ব'লে লোকটি বেশ মালিকোচিত ভঙ্গীতে দোকানের ছোকরাকে হুকুম করল—এ রন্‌জিৎ, পান সিগ্রেট আন্ জল্‌দি !

রামঅওতার চিন্‌তে পারে না লোকটিকে। বলে—আহা ওসব আবার কেন। থাক থাক !

—না, না, তা হয় না। আমার দোকানে পায়ের ধূলো পড়ল আপনার !

ওদিকে যমুনা এসে পড়েছে। রামঅওতারের পিছনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পানটা যমুনাকে দিয়ে রামঅওতার সিগারেটটা ধরালো। লোকটি উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার হাতে দেশলাইটা ফেরৎ দিতেই সে কাঁচুমাচু হয়ে বল্‌ল—একটা আর্জি ছিল সিংজী।

—কি ?

চল্‌তে চল্‌তেই রামঅওতার প্রশ্ন করে।

লোকটিও সঙ্গ নিল। তার আর্জিটা শোনানো দরকার—বাজারের মধ্যে একটা ঘরের পারমিট চাই। তা আমাদের সেনিটারী বাবুর ত হাতে বড় ভারি। পাঁচশো টাকার কমে তিনি কথাই কন্ না। আমি গরীব মানুষ, সবই ত আপনি জানেন।

রামঅওতার কিছুই জানে না। লোকটিকে এর আগে চোখেও দেখেছে বলে মনে পড়ে না। তবু বিজ্ঞের মত চুপ ক'রে থাকে। লোকটি বলেই চলে—আইনে ত পাই ষাট টাকা। তা স্যানিটারীবাবু ত আমাদেরই বড়বাবু, একদিন কথাটা তুলেও ছিলাম। ঝেড়ে জবাব দিলেন। ঘর নেই। আবার আমার চোখের ওপর দিয়ে ত পাঁচখানা ঘর বিলি করলেন।

—তাঁকে বল্‌লে না কেন সেকথা।

জিভ কেটে স্যানিটারীবাবুর উদ্দেশে নমস্কার ক'রে লোকটি বল্‌ল—পাঁচটা বাল্‌বাচ্ছা নিয়ে সংসার ! বল্‌তে গিয়ে যদি চাকরীটাই চলে যায়, তখন কি করব ? উনিই ত আমাদের রাখনেবালা, মারনেবালা !

—তা আমাকে কি করতে বলো ?

—আপনার কৃপা হ'লে আর ভাবনা কি। যদি একবার মুখে ব'লে ছান, তাহলে বুঝলেন না, সব হয়ে যায়। আর ওই যে ছোকরাকে দেখলেন, বাজারে ঘর পেলে ওরও একটা হিল্লে হয়। বেচারা রিফুজী, বিধবার ছেলে। খেতে পাচ্ছিল না, তাই এনে বসিয়ে দিয়েছি। তা দেখলেন তো দোকানের বহর, ওথেকে ক'টা টাকাই বা পাই—ওকে খেতে দিতে হয়।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে মন্দ লাগে না রামঅওতারের। এর মধ্যে তিন চার জন তাকে অভিবাদন জানিয়ে নিজের পথে চলে গেছে। ভাবছিল সে ওই ছেলেটার কথা। বয়স ওর কতই বা হবে, বড় জোর বারো! এখন থেকেই পয়সার ধান্দায় পথে বেরুতে হয়েছে।

লোকটিকে সে প্রশ্ন করল—তা ছেলেটিকে মাইনে দাও কতো ?

হাসলো লোকটি—মাইনে ? আপনি বলেছেন ভালো, দিন গেলে সাত-আট টাকা ত বিক্রী ! তা ওকে খেতে-পরতে দিতে হয়, সেটাও খরচ। আজকালকার বাজারে একটা মানুষের খোরাকী ত কম নয়। এখন দিই না, তবে বাজারে জমিয়ে বসতে পারলে তখন দেবো বইকি !

—ওর মায়ের চলে কি ক'রে ?

—সে আর বল্‌বেন না। মাগী মুখেই গেয়ে বেড়ায় বিধবা ব'লে, বাজে কথা ! আমারই এক আপ্‌না আদ্‌মীর ঘরে থাকে, সবকিছুই দেখাশুনো করে। আর আছে ওর দুই মেয়ে। এমন বেঈমান মাগী, মেয়ে দুটোকে বেচে দিয়েছে দুশো টাকায় !

বিস্মিত আহত দৃষ্টিতে রামঅওতার থম্‌কে দাঁড়ালো—বেচে দিয়েছে মানে ?

—তবে আর বলছি কি ? সোমত্ত মেয়ে পেলে কে আর একশ টাকা দেবে না, আপনিই বলুন ! আর বেচে না দিয়েই বা কি উপায় ছিল—খেতে দিতে পারে না, পরতে দিতে পারে না।

রামঅওতারের আর ভালো লাগে না সিগারেট টানতে। ওদিকে লোকটি বুঝতে পেরেছে যে তার আর্জির চেয়ে এখন ওই উদ্বাস্তদের সমস্যা নিয়েই রামঅওতার মাথা ঘামাচ্ছে। তাই ও প্রসঙ্গ চাপা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে,

বল্‌ল—এ সবই ওই রন্‌জিতের কাছে শোনা। সত্যি মিথ্যে রামজীই জানেন। ছোঁড়াটা ভারি মিথ্যে কথা বলে। প্রথম যখন এসেছিল তখন বেশ ভালো ছিল, আজকাল পয়সা চুরি করে। তা মা-বোনের নামে মিথ্যে কথা বল্‌বে সে আর এমন আশ্চর্য কী। তা ছাড়া, আমি ওকে বলে দিয়েছি, বাজারে ঘর পেলে দোকানের আয় বাড়বে, তখন ওকে ছু-শো আড়াই-শো যা লাগে দিয়ে দেবো, তখন ও আবার বোনেদের ফিরিয়ে আনতে পারবে। সেই ভরসাতেই ছোঁড়া এখানে পড়ে রয়েছে, নইলে ওর মা ত নিত্য ছুবেলা দোকানে এসে কান্নাকাটি করে ছেলেকে নিয়ে যাবার জন্যে। আর যত দোষই থাক ছেলেটার মন খুব ভালো, ও যেতে নারাজ। বোনেদের একটা ব্যবস্থা ও করবেই, এই সংকল্প। এখন আপনি যদি ঘর করিয়ে ছান তাহলে ত সব দিক দিয়েই ভালো হয়। ওরাও বাঁচে, আমিও বাঁচি।

রামঅওতার বল্‌ল—আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব। তোমাকে কোথায় পাবো, কি করে খবর দেবো ?

—আজ্ঞে আমার নাম হরিপদ, স্যানিটারীর মশামারা-তেল, ব্লিচিং-পাউডার দেওয়ার আমি সর্দার। খবর আপনার কাছ থেকেই নেবো। কিন্তু দোহাই দেখবেন, বড়বাবুর কাছে আগে আমার নামটি করবেন না। তাহলে নোক্‌রী চলে যাবে। ওই রন্‌জিতের নাম করে পারমিট বার করতে হবে—তারপর আমি টাকা পয়সা যা লাগে যোগাড় করে ফেলবো।

—আচ্ছা, দেখা যাক !

লোকটি রাস্তার মধ্যেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বসল। যমুনাকেও বাদ দিল না সে।

রামঅওতার অব্যাহতি পেয়ে আকাশের দিকে তাকায়—বেলা গড়িয়ে চলেছে, রোদ উঠেছে প্রথম থেকেই চড়া মেজাজ নিয়ে। রামঅওতারের নজর পড়ল কারখানার উগ্‌রে দেওয়া ধূমপুঞ্জের দিকে। বুকের মধ্যে কেমন একটা ভয়ের মতো অস্বস্তি জাগে, যেন সে ইস্কুল পালানো ছেলে, হঠাৎ গুরুজনের কাছে ধরা পড়ে গেছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো তাকে চোখ পাকিয়ে শাসাতে আসছে !

আবার বাধা। কোন্ এক জমাদারণী মিশিমাখা কালো দাঁত বার করে বাজখাঁই গলা ছেড়ে বল্‌ল—আহা, সাহেব মেমসাহেব আজ কোথায় চলেছেন। সেলাম—

যমুনা ফিস্‌ফিস্ করে বলে—গ্যাখো রঙ্গ।

জমাদারণী পথের মধ্যেই ফস্ করে বল্‌ল—ওই ঘুঘুটা কি বল্‌ছিল সাহেবকে? দেখো বাবা, ওটা পয়লা নম্বরের হারামী। খবরদার ওর খপ্পরে পড় না বাবা,—

রামঅওতার ভ্রূকুঞ্চিত করে বল্‌ল—কেন?

—ক্যানো আবার! অত কথা বল্‌বার সময় নেই, এখন ত ডিউটি করছি। তবে শুনে রাখো ওটা একনম্বর মতলববাজ। আরে তা যদি নাই হবে ত, ডিউটির সময় কেউ কাজ ফেলে রেখে দোকান চালায়?

কথাটা ঠিক। স্যানিটারী বিভাগে কাজ করে, অথচ দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে লোকটা ঘুরে বেড়াচ্ছে!

রামঅওতার আর কিছু বল্‌ল না।

কুলী মহল্লা থেকে দীনদয়ালের কোয়ার্টারে যেতে বড় জোর সাত মিনিট লাগতে পারে, সে জায়গায় ওদের প্রায় আধঘণ্টা লেগে গেল। রামঅওতারকে অসময়ে এপথে যে দেখছে সে-ই দু'চার কথা না বলে ছাড়ছে না। তবু ত সঙ্গে যমুনা রয়েছে, নইলে কী যে হত!

দীপু খুব সাজগোজ করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ওদের কোয়ার্টারের সাম্‌নে চক্‌চকে নতুন মডেলের মোটর দাঁড়িয়ে। রামঅওতারকে দেখে ও বল্‌ল—চাচাজী, খবর ভালো? আরে ইনি কে?

রামঅওতার বুড়ো বয়সেও যেন লজ্জা পেল, বল্‌ল—আপনার চাচী হচ্ছে!

দীপু স-কলরবে অভ্যর্থনা করল—আরে তা বল্‌তে হয় আগে! আসুন, আসুন। বসুন। যাই, দিদিকে খবর দিই গিয়ে।

রামঅওতার যমুনাকে বল্‌ল—যাও, ওঁর সঙ্গে ভেতরে গিয়ে বস!

যমুনা ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল। চেয়ার টেবল,—চারদিকে

গোছগাছের এমন একটা শ্রী রয়েছে যে, তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। রামঅওতারের কথাটা কানে যেতে ও চাইল একবার, যেন, বুঝতেই পারে নি।

দীপুর সঙ্গে মিণ্টু এসে ঢুকল ঘরে।

রামঅওতার হেসে বল্ল—বাঃ, আমরা যে নবকুমারকে দেখতে এলাম, সে কোথায়? তার পিতাজী কোথায়! আমার গুরু—

দীপু নিজের সাজগোজের দিকে তাকিয়ে কুণ্ঠিত ভাবে দিদির দিকে তাকালো। তার পর বল্ল—আমিই নিয়ে আসি। দিদির আবার ছেলে কোলে করে কারুর সামনে বেরুতে লজ্জা করে। দেবুদা থাকলে অবিশ্যি কোনো কথাই উঠত না, আপনি পথ থেকেই দেখতে পেতেন ষষ্ঠীবুড়ির মতো ছেলে কোলে করে বসে রয়েছে!

ওর এ কথায় সকলেই মুক্ত কণ্ঠে হেসে উঠল। মিণ্টু কপট তিরস্কারের স্বরে বলে—খুব হয়েছে। ওঁর নিন্দে পেলে তুই আর কিছু চাস নে।

যমুনা এক কোণে কুণ্ঠিতভাবে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। মিণ্টু বল্ল—ও কী, বসুন আপনি!

—ওঁকে চেয়ারে বসতে বল্‌বেন না। বরং হেঁসেলে নিয়ে যান, সেখানে উনুনের আঁচে উনি একটু আরাম পাবেন।

এবার যমুনা ঘোমটার মধ্যে থেকেই বেশ জোর গলায় বল্ল—কেউ ইন্‌কিলাব দিয়ে আরাম পায়, কেউ আগুন তাতে সুখে থাকে। এ নিয়ে বলার কোনো মানে হয় না!

—তা ত বটেই। চলুন কাকীমা ভেতরে গিয়ে বসবেন। চাচা আপনিও চলুন—এখানে একা-একা কি করবেন। উনি বাজারে গিয়েছেন।

সুন্দর কাজ করা একটি কাঁথায় জড়িয়ে মাস কয়েকের একটি শিশুকে আলগাভাবে কোলে নিয়ে দীপু ঢুকল। যমুনা ব্যগ্রভাবে হাত বাড়িয়ে দিল—আমাকে দাও ভাই!

ছোট্ট ফুট্‌ফুটে বাচ্চাকে দেখে যমুনার দু চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লোভার্ত উজ্জ্বল উৎসুক দুটি চোখে আর কোনো সংজ্ঞা নেই। ঘোমটা সরে

গেছে। হাসিতে মুখখানা সহজ সুন্দর দেখাচ্ছে। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে যমুনা একাগ্র ভাবে তাকিয়ে থাকে।

দীপু ব্যস্ত ভাবে বল্‌ল—আপনারা বসুন, আমাকে একটু বাইরে যেতে হচ্ছে। কি করি, গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে, না গেলে খারাপ দেখায়। নইলে আপনারা—

মিণ্টু ধমকের সুরে বল্‌ল—যাও, তোমাকে আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। ওঁরা কিছু মনে করবেন না। ওদিকে কাজ্‌লীরা হাঁ ক'রে বসে রয়েছে।

যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে দীপু গ্রীবা বাঁকিয়ে বল্‌ল—চাচাজী তাহলে আমি যাই! চাচী, ভাই কিছু মনে ক'র না, আবার এসো কিন্তু!

বাচ্চাটার গাল টিপে দিয়ে দুষ্টু মেয়ের মতো চোখ নাচিয়ে হাসলো দীপু—বাপী চলি!

বাচ্চাকে কোলে নিয়ে যমুনা মেঝেতে বসে পড়েছে। রামঅওতার পকেট থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে শিশুটির হাতে গুঁজে দেবার চেষ্টা করে। মিণ্টু মাথা নেড়ে আপত্তি করল,—না, চাচাজী ওসব চলবে না!

দেবজ্যোতি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হাঁক দিল—কি চলবে না?

রামঅওতার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বল্‌ল—আমাদের আজ নেমতন্ন এখানে, তাই বল্‌ছে মা জননী যে, এটুকু বাজারে চল্‌বে না।

মিণ্টু বাজারের থলেটা হাতে নিয়ে প্রশ্ন করল—আবার লাউ কেন? রোজ-রোজ এই সব আনবে অথচ খাবে না!

দেবজ্যোতি হেসে উঠল—আরে বাপু সব জিনিস কি সবার কাজে লাগে? ওটা তোমার জন্যে।

—আহা আমি যেন খুব ভালোবাসি লাউ খেতে!

দেবজ্যোতি গম্ভীরভাবে জবাব দিল—মুকুল ব'লে দিয়েছে এখন তোমাকে এসব খেতেই হবে, নইলে বাচ্চাটা দুধ পাবে না যে!

লজ্জায় মিণ্টুর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল, আর একটিও কথা না-বলে ও বাজারের থলে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

দেবজ্যোতি রামঅওতারের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে দিল—কী সিংজী, আজ হঠাৎ সপরিবারে, ব্যাপার কী!

পরপুরুষের সামনে যমুনা কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। বাচ্চাটা ছট্‌ফট করছে, দেবজ্যোতির সাড়া পেয়ে, ঘনঘন এদিক ওদিক চোখ ঘোরাচ্ছে।

রামঅওতার বল্‌ল—নাগা করে দিলাম। ডিউটি যাই নি। তোমার জন্যে মনটা কেমন ক'রে উঠল। তাই বুঢ়িয়াকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়েছি।

—তা ভালোই করেছ। তাহলে দুপুরে এখানেই অন্নপ্রাশন করে যাও।

রামঅওতার বল্‌ল—তোমার আপত্তি না থাকলেই প্রসাদ পাবো, নইলে বুঢ়িয়ার হাতের একঘেয়ে রান্না খেতে হবে।

এবার ছেলেটা কান্না জুড়ে দিয়েছে। অসহিষ্ণুভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে আর ঠোঁট ফুলিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—আমার কাছে আসতে চাচ্ছে ও। একবার গলা পেলে আর কারুর কাছে থাকতে চায় না। অথচ ছেলেপুলে আমি যে পছন্দ করি তা নয়—তবে, কান্নাকাটি আরো অপছন্দ!

যমুনার হাত থেকে ছেলেকে নিয়ে দেবজ্যোতি রামঅওতারের সঙ্গে কথা কইতে লাগলো। যমুনা আস্তে আস্তে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

দু-চার কথার পরই রামঅওতার আসল সমস্যাটা তুলল।

দেবজ্যোতির মুখখানা অস্বাভাবিক রকমের গাম্ভীর্যে ভারি হয়ে ওঠে, সে বলে—বুঢ়াউ, আজ তুমি এলে, কিন্তু বড় বেশি দেরি করে ফেলেছ! অবিশ্যি, আগে এলেও যে খুব বেশি সুবিধে হ'ত তা নয়—তবে বিপদটা হয়তো আরও কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখা যেত।

রামঅওতার ছেলেমানুষের মতো বল্‌ল—তা, তুমি ত পারতে সাবধান ক'রে দিতে! দাও নি কেন?

—আমি? তার চেষ্টা ত করেছি, কিন্তু তুমি সে সময়ে বদলে গিয়েছিলে। ক্ষমতার নেশা তোমায় বদ্‌লে দিয়েছিল। একটা কথা কি জানো? এক-এক সময়ে আমার নিজেরও লোভ হয়েছে তোমার মতো লীডারী করবার, তোমার জনপ্রিয়তা দেখে হিংসেও কম হয় নি! কিন্তু আমি অনেক

ভেবেছি—যতই ভেবেছি ততই আশা আমার শুকিয়ে গেছে। এখানকার মানুষের মনের কথা আমি আয়নার মতো দেখতে পাই। চোখ-থাকলে তুমিও দেখতে পেতে। কিন্তু দেখে শুনে চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে। সে হিসেবে না দেখতে পাওয়া একটা আশীর্বাদ। কল্যাণ বুদ্ধির পবিত্র বেগ তোমাকে ঠেলে নিয়ে গেছে। আমাকে পারে নি, কারণ আমার মধ্যে সমালোচকের চুলচেরা বিশ্লেষণই বাধা হয়ে দাঁড়ালো। যখন আমি বুঝতে পারলাম, এই বিরাট শ্রমিক-শক্তি একটা অখণ্ড দৃষ্টিহীন আচ্ছন্নতায় ঢাকা, তখনই আমি ঘাবড়ে গেলাম। তুমি সরো নি, তোমার মনে আস্থা ছিল, জাতভাই-এর ভালো করতে পারবে ব'লে। কিন্তু তোমার একার ইচ্ছেই ত এখানে কাজ করছে না। কারখানার মাথার ওপর বসে যারা ভাগ্যের চাকা ঘোরাচ্ছে, সেই মালিকদের স্বার্থ তোমার পথে বাধা। তার চেয়েও বড় বাধা, আমাদের অজ্ঞতা। আমরা হাতে-হাতিয়ারে কাজ করি। তার বাইরের খবর রাখি না—রাখবার ইচ্ছে নেই, সময় নেই, সুযোগ আরও কম।

রামঅওতার হাঁপিয়ে উঠেছে, সে একটা বিড়ি ধরিয়ে বল্‌ল—একটু চা হবে না?

—হ'লেই পৌঁছবে! দাঁড়াও এ ব্যাটার বুঝি ক্ষিদে পেয়েছে, আঙুল চুষছে! ছাখো কেমন মজা—ও জানে না যে আঙুলের মধ্যে কোনো খাগ্য নেই। তবু পরম আরামে চুষছে, যেদিন টের পাবে যে এতে কিছু নেই সেদিন আর আঙুল চুষে খুশী থাকতে পারবে না। তেমনি আমাদের এইটুকু ধারণা হয়েছে যে, সামান্য ধড়-আর-প্রাণকে কোনোরকমে টিকিয়ে রাখাটাই বেঁচে থাকা নয়। এখন আমরা যথার্থ মানুষের মতো বাঁচার পথ খুঁজছি!

—হ্যাঁ, তা নয় বুঝলাম। এখন বাচ্চাকে খাওয়ালে হ'ত না!

—ওর মা এখুনি আসবে, নিয়ে যাবে ঠিক সময়ে। মায়েরও একটা হিসেব আছে ত। যাক, যে কথা হচ্ছিল—তুমি ধরেই নিয়েছিলে যে, শুভবুদ্ধির বশে তুমি যা করবে তাতেই শ্রমিকদের মঙ্গল হবে। আর সেইজন্যেই নিজের যেটা ভালো মনে হয়েছে সেটাই করতে গিয়েছ—কারুর সঙ্গে পরামর্শ করো নি, কেউ কোনো যুক্তি দিতে গেলে সেটা বিবেচনা করে দেখারও দরকার ভাবো

নি! তোমার ভুল সেইখানে। আর সেইজন্তেই আমরা শ্রমিকরা যদি ধরে নিই যে, তোমাকে দিয়ে আমাদের কাজ এগোচ্ছে না, তাহলে আমাদের দোষ দিতে পারো না। এখানে আরও একটা কথা আছে, সামনের লোকসভা আর রাজ্যসভার ইলেক্‌শনে যারা দাঁড়াতে চাইছে তারা মই হিসেবে আমাদের কাজে লাগাতে চেষ্টা করবে বই কি! তারা এখানে-ওখানে ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্ছে—একটা মুঠোর মধ্যে এতগুলো ভোট দখল করতে পারলে কেউ কি ছেড়ে দেয় নাকি!

দেবজ্যোতির কথায় বাধা পড়ল। মিণ্টু ঢুকলো চায়ের পেয়ালা নিয়ে, তার পিছনে যমুনার হাতে চিঁড়ে ভাজার রেকাব। ওদের দেখেই দেবজ্যোতি বল্‌ল—খোকার খিদে পেয়েছে যে!

মিণ্টু প্রায় ধমকের স্বরে উত্তর দিল—তোমার ওই এক বাতিক হয়েছে। সব সময়ে ওর খিদে পেতেই ছাখো!

—বাঃ, দেখছ না আঙুল চুষছে যে—

—ছোট ছেলেরা ওরকম ক'রেই থাকে। এই ত একটু আগেই ওকে খাইয়েছি। দাও, ওকে আমার কাছে দাও।

চিঁড়ে ভাজা দেখে রামঅওতার খুব খুশী। এক মুঠো তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে বল্‌ল—ছাখো গুরুয়াইন্! তুমি কিন্তু দুপুরে আমাদের প্রসাদ দিয়ো!

মিণ্টু অভিযোগ করে—আচ্ছা চাচাজী, এতদিন কেন কাকীমাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন?

হো-হো ক'রে উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল রামঅওতার।

দেবজ্যোতি সকলের অলক্ষ্যে ছেলের মুখের দিকে তাকাচ্ছে—এ আচম্‌কা আওয়াজে ছেলেটা বড় ভয় পায়! কারখানার বাঁশীর শব্দে ও চম্‌কে কেঁদে ওঠে। যেখানেই থাক না কেন 'ভোঁ' বাজলেই দেবজ্যোতি অন্যমনস্ক হয়ে ভাবে ছেলেটা কাঁদছে!

তার কোল থেকে মিণ্টু ছেলেকে তুলে নিতেই যমুনা হাত বাড়ালো।

চায়ে চুমুক দিয়ে দেবজ্যোতি আবার শুরু করল—এখন কথা হচ্ছে যে, তুমি এ ঢেউ রুখতে পারবে না। শ্রমিকের মন ভাঙে নদীর পাড়ের মতো, একবার

ভাঙতে শুরু করলে তাকে আর কেউ ঠেকাতে পারে না। সব বুঝে, জেনেও সরে দাঁড়াতে হবে। ভাঙনের পালা চুকলে তখন আবার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

উত্তেজিত ভাবে রামঅওতার বল্‌ল—এ তুমি বল্‌ছ কি গুরু? কিছুতেই রুখে দেওয়া যাবে না?

—হ্যাঁ, তাই। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোমাদের নামে অনাস্থা প্রস্তাব এসে গেছে। ভুল হচ্ছে জেনেও শোধরাবার কোনো উপায় খুঁজে পাবে না তুমি। এই হ'ল আমাদের অবস্থার চরম পরিহাস। আমরা চেয়েছিলাম শ্রমিকের নিজের হাতে তাদের কল্যাণের, উন্নতির পথ তৈরীর ক্ষমতা আসুক—এলোও! কিন্তু এ সুযোগটা কাজে লাগানো গেল না। এক দিকে আমাদের শিক্ষার অভাব আর অন্য দিকে বিপক্ষের চক্রান্তবুদ্ধি আর টাকার জোর—দুয়ে মিলেই আমাদের এই তিমিরে টেনে এনে ফেল্‌ল।

সকালবেলা যে রামঅওতার কবীরের দোঁহা শুনে উদাস বৈরাগ্যের স্পর্শে অভিভূত হয়ে পড়েছিল সেই রামঅওতার এখন আবার ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ সঙ্কটের কালো ছায়া দেখে শঙ্কিত! এখন সে ভাবতেই পারছে না যে, দুদিনের এই সংসার খেলাঘরে মানুষ বিধাতার হাতের খেল্‌না! জাঁতার চাপে পড়ে মানুষ চেপ্টে মরবে—এই আশঙ্কাই তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। অস্থির ভাবে পায়চারী করতে করতে সে বল্‌ল—একবার শেষ চেষ্টা করতেই হবে! তুমি পরামর্শ দাও গুরু।

দেবজ্যোতি হতাশভাবে হাত উল্টে জবাব দিল—আমাকে যা হুকুম করবে আমি তাই করব। কিন্তু পরামর্শ দেবার মতো কিছু দেখছি না। তবে একটা কাজ করতে পারো, ইউনিয়নের একটা ইলেক্‌শন্ ক'রে ছাখো, তাতে যদি কিছু হয়।

—সত্যি বল্‌ছি, আমার নিজের জন্যে খেদ হচ্ছে না। কিন্তু ইউনিয়ন ডুবে যাবে সেটা ভাবতে পারি না। আমাকে ওরা বাদ দিতে চায় দিক—কিন্তু সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখার যোগ্য লোককে মাথায় বসিয়ে 'আগে বেড়ে' যাক, তাহালই আমি খুশী।

—তবে ওরা তোমায় হাটিয়ে দেবার আগেই জাহির ক'রে দাও—ইউনিয়নের নির্বাচনী ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু এটা ঠিক জেনে রাখো যে, তোমাকে ওরা আর ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট রাখবে না। অবিশ্যি এমনিতেও রাখতো না।

—আমি কি সেই মোহেই কাজ করেছি গুরু! আমার মজদুর-ভাইএর ভালাই কি আমার কাছে কিছুই নয়?

অভিমানাহত স্বরে রামঅওতার বল্‌ল।

দেবজ্যোতি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলে—আমাদের যতো দুঃখদুর্দশা তার ষাট ভাগই হ'ল গিয়ে আমাদের ভুলের মাশুল।

ঘামে ভেজা মুখ নিয়ে দীপু ফিরল। ওর ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে। দেবজ্যোতি আর রামঅওতারের সামনে দিয়ে কোনোরকমে ঘরখানা পার হয়ে চলে গেল। ওরা দু'জনে শ্রমিক-সমস্যা নিয়ে চিন্তাক্রান্ত না থাকলে দীপুর এই অস্বাভাবিক চেহারা কিছুতেই নজর এড়াতো না। ভেতরের ঘরে ঢুকে দীপু বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করল। ছি-ছি-ছি, ও নিজে কি ক'রে পারল এইভাবে আপনাকে বিলিয়ে দিতে? একবারও তখন মনে পড়ল না যে, আবার ফিরে আসতে হবে আর সকলের সামনে—যে মুখ নিয়ে ও বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল এ যেন সে মুখ নয়। এখানে অন্যের তীব্র কামনাতপ্ত পীড়নের চিহ্ন আঁকা রয়েছে।

বাইরের কাপড়চোপড় বদলালো না, রান্নাঘরে গেল না দিদিকে সাহায্য করতে। বিছানা ছেড়ে দীপু উঠতে পারল না বারেকের তরে! দীপু কি আদৌ অনুমান করতে পারে নি এরকম একটা সম্ভাবনা? নিজের কাছে নিজেকে ঠকিয়ে এসেছে গত কয়েক মাস এক নাগাড়ে! কোনো নিশ্চিত প্রশ্রয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত না পেলে অম্লানের মতো শান্ত, ধীর যুবক কিছুতেই এতখানি এগোতে পারতো না। দীপুর আরও খারাপ লাগছে এই ভেবে যে, অম্লানের মুখে এতটুকু কলঙ্কের কালি মাখাতে পারছে না; ও—সবটুকুর জন্যই ও নিজেকে দায়ী করছে। কেন, কেন রোজই ও ছুটে গিয়েছে! যদি ও না যেতো, তাহলে কিছুতেই উজ্জলা আর কজ্জলী গাড়ি

পাঠাতো না। ও যায় বলেই না গাড়ি আসে! ইদানীং উজ্জ্বলা আর কজ্জলী হয়ে দাঁড়িয়েছিল অছিলামাত্র—আসলে অম্লানের সঙ্গেই দীপু গল্পগুজব করত। সবাই যখন অন্যদিকে ব্যস্ত থাকে ওরা তখন নিজেদের নির্জনতা রচনা করত। ...তবে, যদি আজ অম্লান ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, ঠোঁট এগিয়ে দেয়, গালে গাল ছোঁয়ায় ত দীপু কি করে বাধা দেবে। আর বাধা দিতে গেলেই বা অম্লান গ্রাহ্য করবে কেন! নিতান্ত চোখের লজ্জা, মনের নয়—এ ত সহজেই মনে করতে পারে অম্লান।

না, দীপু অম্লানকে দোষ দিচ্ছে না। যাকে দুষছে সে হয়ত এখনও বিলেত যাবার জন্য কোনো সাহেব-সুবোর পিছনে হ্যাংলার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই নিখিল, এতদিন ধরে দম দেওয়া কলের মতো এ বাড়িতে আসা-যাওয়া করে। ক্লাব-লাইব্রেরীতে বই পড়ে গাদাগাদা, যতগুলো কাগজ আসে গোগ্রাসে গেলে, থিয়েটারের সময় উইংস-এর পাশে দাঁড়িয়ে প্রম্পটারের কাজ করে, আর বিলেত যাবার স্বপ্ন ছ্যাখে। ও কি চিরকালটাই স্টেজের পিছনে থাকবে—ধারাটুকু বজায় রাখাই কি ওর জীবনের চরম উদ্দেশ্য! থাক, যে প্রম্প্‌টার হয়েই খুশী থাকতে চায়, সে তাই থাক! ভাবতে ভাবতে দীপু ভুলে গিয়েছিল সব কিছু। এই ঘর ভুলেছে ও, ভুলেছে বিছানাটাকেও। ওর গায়ে লাগছে দামোদরের গরম আগুন ছড়ানো হু-হু হাওয়া। আর চোখের সামনে ধূ-ধূ চিক্‌চিকে বালির চর—দূরে যেখানে জলের ওপর রোদ পড়ে পালিশ-শানানো ইস্পাতের মত আলো ঠিকরে পড়ছে সেদিকে চাওয়া যায় না। চোখ ফিরে আসে, নতুন পাতার শ্যামল সবুজে শালশিশুগুলি যেন তৃষ্ণার শান্তি—ওখানে চোখ রেখে দুদণ্ড আরাম আছে। গাড়িতে ওরা দু-জন পাশাপাশি। আর কেউ নেই। অম্লান গাড়ি নিয়ে একাই বেরুচ্ছিল, আসানসোলে কি কাজ আছে—যাবার পথে দীপুকে বাড়ি পৌঁছে দেবার কথা। গাড়ি যখন নদীর দিকে বাঁক নিল দীপু কিছুই বলে নি। বেশ লাগছিল গাড়ির মসৃণ, তরল গতিবেগ—! এপাশ-ওপাশে দু-চার খানা বাড়ি, ক্রমে সেগুলোও ফুরিয়ে গেছে। এখন এখানে শুধু বালির সমারোহ, আর শাল-পলাশের উদ্ধত অস্তিত্ব। পিছনে পড়ে রয়েছে শ্মশানযাত্রীদের আশ্রয়স্থল জীর্ণ কুঁড়ে ঘরখানা!

অম্লান ওর দিকে কেমন ভাবে তাকাচ্ছে। দীপুর লজ্জা করে। একটু ভয়—হয়তো ভয়েই ওর কান তেতে ওঠে, গলার কাছ থেকে শুরু ক'রে আবরণের তলাতে সারা শরীর ঘামে ভিজে ওঠে, শির-শিরে শিহরণে ও যেন কেঁপেছিল তখন। এখন মনে হচ্ছে শুধু ভয়ই নয়, তার সঙ্গে হয়তো আরো কিছু ছিল।……

মিণ্টু ঘরে ঢুকে বিছানায় ঘুমন্ত ছেলেকে শুইয়ে দিতে এসে দীপুকে ওইভাবে পড়ে থাকতে দেখে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে—ওমা, তুই! কখন এলি? কি হয়েছে রে? অমন করে শুয়ে যে! শরীর খারাপ নাকি!

দীপুর সাড়া দিতে ইচ্ছে করে না। কথা কইতে ওর ভয়, পাছে গলার স্বরে কিছু ধরা পড়ে যায়।

বোনের কপালে হাত রেখে মিণ্টু আপন মনেই বলে—না, জ্বর হয় নি। তা হলে রোদ লেগেছে। যা হৈ-হুল্লোড় করিস! বল্‌লে ত কথা গ্রাহ্যি হবে না—বলি, একটা ট্যুইশন ছেড়ে দে! এদিকে সারা দুপুর ইস্কুলে পড়ানো। আবার বিকেল সন্ধ্যে তিনটে মেয়ের সঙ্গে সমানে বক্‌-বক্‌। মানুষের শরীর ত।

দীপু বাধা দিল, বল্‌ল—কিছু হয় নি ত! তোমার রান্না হল? কটা বেজেছে গো?

—এগারোটা বাজতে পাঁচ। দুপুরে ওঁরা খাবেন। রান্না হতে দেরি আছে। আজ আর স্কুলে না-ই গেলি।

—না, না, তা হয় না।

প্রবল বেগে মাথা নেড়ে দীপু প্রতিবাদ করে। বাড়িতে এদের চোখের সামনে সারাদিন হাজির থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখা ওর পক্ষে অসম্ভব। তার চেয়ে স্কুল ঢের ভালো। সেখানে কে আর কার মনের কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে! না, দীপুকে এখনই স্কুলে যেতে হবে, বরং খাওয়া দাওয়াটা টিফিনে এসেই করবে ও।

যমুনার সঙ্গে মিণ্টু অনেক গল্প করল। সর্বক্ষণ যমুনা ওর সঙ্গে ছায়া হয়ে

ঘোরে-ফেরে। এদিকে রামঅওতারের সঙ্গে দেবজ্যোতি অনেকদিন পরে মন-উজাড় করে আলাপের সুযোগ পেয়ে অবিশ্রাম বকে চলেছে। এমনিতে আজকাল সে কারুর সঙ্গে কথা বলে না, কাজের কথা ছাড়া। আর বাড়িতে থাকলে ত খোকনই রয়েছে তার সঙ্গী! কিন্তু আজ আবার সে মনের বন্ধ দরজাটা খুলে দিয়েছে রামঅওতারের সাম্‌নে।

দুপুরে বাদল এলে ওরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসল।

সেই সময়ে কোয়ার্টার নিয়ে কথা ওঠে। বাদলই বল্‌ল—শমন এসেছে, আমরা নাকি বেআইনী ভাবে কোম্পানীর কোয়ার্টার দখল করে রয়েছি! সাত দিনের মধ্যে কোয়ার্টার ছেড়ে না দিলে আইনানুসারে দণ্ডভোগ করতে হবে।

আমের চাট্‌নী শেষ করে রামঅওতার আঁটি চুষতে চুষতে বলে—রহে দো ভাই! আর ভাবনা নেই, এবার কেস্‌ ঘুরিয়ে দিয়েছে ট্রাফিক সুপার। সে বলেছে যে, এরকম মাঝে মাঝেই সান্যাল বাবুকে কাজের জন্যেই আসতে হয় ট্রাফিকে। আমাদের কাজ হাসিল হয়ে যাবে। অন্‌ ডিউটি লোকটা যখন মরল তখন দায়িত্ব ত কোম্পানীর! আর কম্‌পেন্‌সেসন্‌ না দিয়ে বাছাধন যাবে কোথায়! ওরাও তা টের পেয়েছে, শুধু দিন নিয়ে চলেছে। যতটা হ্যারাস করতে পারে, করে নিচ্ছে। শালা মল্লিকের যে এতে কি ফয়দা জানি না। তবে যতো দেরি হয় একদিক দিয়ে ততোই ভালো—কোয়ার্টারটা হাত ছাড়া হবে না। কিন্তু তার পরই মুশকিল—।

বাদল বল্‌ল—আপনি ত বল্‌লেন রহে যাও—এদিকে দেবুদা ছট্‌ফট্‌ করছে, এখান-ওখানে বাড়ি দেখতে শুরু করেছে।

রামঅওতার আহত স্বরে বলে—ক্যা গুরু, এইস্যা? না, না আমি সেসব ঠিক করে দেবো। যাবার আগে অন্ততঃ গুরুর আস্তানার ব্যবস্থা করতেই হবে। এখন ত আর সীতানাথ মুখুয্যের কোয়ার্টার নাই যে—! হ্যাঁ ভালো কথা, তোমার বাবার খবর কি গুরু?

দেবজ্যোতি বল্‌ল—বৃন্দাবন থেকে দিন বারো আগে শেষ চিঠি পেয়েছি, ভালোই আছেন।

—আর তোমার সেই লীডার বোন দেবিকা, ঝাঁসী-কি-রাণী? সে কি করছে?

—কলকাতায়, অমলা বৌদির সঙ্গে পার্টি নিয়ে মশগুল। হয়তো দেখবে ইলেক্‌শনের সময় এখানে হাজির হবে। মাস খানেক আগে যখন এল তখনও পার্টি পার্টি ক'রে জ্বালিয়েছে।

রামঅওতার গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—তা এবার ওর সাদীটাদি দাও! আজকাল তোমাদের এই লিখাপড়ি আর সিনেমার দৌলতে বিয়ে ব্যাপারটা কেমন যেন ফিকে হয়ে পড়ছে। আমার কিন্তু এসব ভালো মনে হয় না গুরু।

দেবজ্যোতি চুপ করে থাকে। না থেকেই বা উপায় কী!

বাইরের পথে ব্যাণ্ড পিটিয়ে মুখে চোঙা লাগিয়ে কারা চিৎকার করে হেঁকে গেল—আজ সন্ধ্যা সাড়ে-ছটাতে মানিকপুর প্লে গ্রাউণ্ডে, সিন্‌মা শো হবে। এক আনা দর্শনী। আপনারা আসুন—। আজ সামকো সাড়ে-ছ বাজে ভারি জবর খেল—।

ছিয়াশি

শহর আরও হাত বাড়িয়েছে। নতুন নতুন কলকারখানাও এপাশ-ওপাশে গড়ে উঠ্‌ছে। সবটুকু জড়িয়ে এ অঞ্চলটাই কলকারখানার চিম্‌নীতে ধোঁয়াতে শ্রমিকে পল্লী বাংলার রূপ পরিহার করে অন্য বেশে সেজে উঠছে। শহর মানিকপুরের দেখাদেখি কাপড়ের কল, ইটের ভাটা, দড়ির কল, বেতের ঝুড়ি তৈরীর আস্তানা, নানাধরনের মাঝারি-ছোট কারখানার চাপে পড়ে—নগদ পয়সার লোভে চাষ-আবাদের পালা চুকিয়ে অনেকেই মজুর বনে যাচ্ছে। একে ত এ অঞ্চলের মাটি বড় কৃপণ—তার ওপর লোকজনের অভাবে ক্ষেতখামার এখন খাঁ-খাঁ করে। মাটির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এমনি করেই বদলাতে শুরু করেছে।

মাটিকে যারা ভালোবাসে তারা মনের খেদ মনে মনেই পুষে রাখে। নিজেরা খেটেখুটে যেটুকু পারে চাষ আবাদ করে। প্রতিদানে ফসলও পায়। সুখেদুঃখে জড়িয়ে তাদের দিনও যে খুব মন্দ কাটে তা নয়। তবে নতুন যারা, যাদের চোখে শহরের চাকচিক্য মায়ালোকের হাতছানির মতো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, তাদের কে রুখবে! তারা পঙ্গপালের মতো ছুটে চলে যায়। সিনেমার পর্দায় উজ্জ্বল তারকাদের চটুল চাহনী ওদের উন্মত্ত করে তুলেছে। ওরা আর কিছু বোঝে না, তারুণ্যের কল্পনারথে উধাও হয়ে ওই তারকাদের সন্ধানে ওরা উড়ে চলে। পানাভর্তি ডোবাতে গা ঢেলে দিয়ে ওরা সমুদ্রের তৃষ্ণা মেটাতে চায়। ফেঁপে ওঠে বারাঙ্গনাদের বেসাতীর হাট। বিলিতী ছেড়ে দিশী মাদকের চোলাই বেড়ে যায়। দিনমান যন্ত্রের পেষণে নিরক্ত হয়ে ওরা ছুটে আসে একটু রসের আশায়, রঙের নেশায়। বেহুঁশ ক্লান্তির ঘোরে যা পায় তা-ই অমৃতের মতো নিঃশেষে পান করে।…

কিন্তু পরিপূর্ণ জীবন ত এইটুকুই নয়। তার অস্তিত্বের পরিধি বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত ঘিরে। প্রত্যেক মানুষের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে জীবনের স্বাক্ষর চিহ্নিত হয়ে চলেছে।

মানিকপুরের হাজার-হাজার শ্রমিক, কোটি-কোটি টাকার যন্ত্রপাতি, অসংখ্য ধুলিকনা দিয়ে রচিত যে পরিবেশ তাকে যে ভালোবেসেছে, তার প্রকৃতির ঋতুবদলের সঙ্গে যার শ্বাসপ্রশ্বাসে স্বাদ পাল্টেছে সে কখনো পরিত্রাণ পাবে না। দুঃসহ যন্ত্রণায়ও তার মৃত্যু নেই, অবিমিশ্র আনন্দেও তার মুক্তি নেই। সে যে নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে মানিকপুরকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে।

শুধু দেবজ্যোতি নয়, তার মতো আরো অনেক বুদ্ধিমান মানুষ নিজের ব্যর্থতার বিনিময়েই এই মানিকপুরে বেঁচে রয়েছে। প্রত্যেকটি শ্রমিকের সন্তান, যারা এই আবহাওয়াতে পৃথিবীর আলো দেখেছে তাদের নিষ্কৃতি নেই। তারা এই আওতায় ছেলেবেলা কাটিয়ে অন্যত্র গেলেও প্রাকৃত আকর্ষণে আবার ফিরে এসেছে। কলকাতায় গিয়েছে, এখানে ওখানে পালিয়েছে—লেখাপড়া তাদের হয় না, হলেও এমন শিক্ষা তারা পায় না যার ফলে মানিকপুরকে মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে অন্য জীবিকায়, অন্য আবহাওয়ায় তাঁরা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে।—তুমি টাউন এঞ্জিনিয়ারের ছেলে—কলকাতায় বি-এস-সি পড়তে গেলে ? যাও, ফেল করবে! পাশ করতে না পেরে তুমি মানিকপুরে ফিরে এসো,—হ্যাঁ এখানে তোমার জন্যে কাজ প্রতীক্ষা করছে! ঢুকে পড়ো এ্যাপ্রেন্টিশ হয়ে। তারপর যা হবার তা হবে। তুমি যদি ফোরম্যানের ছেলে হও তাহলেও ওই এক কথা—বেশ ত, আর্টস্ পড়ার শখ ? যাও শহরে। পাশ করে অন্য কোথাও কাজ খোঁজ করবার আগে শুনবে তোমার বাবা এখানেই কেরানির চাকরী যোগাড় করে রেখেছেন। এখানকার বড় ডাক্তারের ছেলে চাকরী করে ড্রইং অফিসে—প্ল্যান আঁকে সে। বাপের প্রচুর পয়সা ? তা থাক না,—নিজের রুটি তা বলে তুমি নিজে রোজগার করবে না! ও বিজ্‌নেস করতে চাও। করলে। কিন্তু তাতে লোকসান দিয়ে ঠিক কারখানাতেই চাকরীটি নেবে তুমি। তোমার বাবা নেই, দাদা আছেন বুঝি! তিনি এখানকার সামান্য একজন মিস্ত্রী! তাহলে আর কি করবে বলো, তোমাকে অফিস-বয় হয়ে ঢুকতে হবে—সাহেবের চা-সিগ্রেট এনে দাও, টেবিল ঝাড়ো, হ্যাঁ অফিস-ঘর ঝাঁট দিতে হবে বইকি! কি বল্‌লে ? ভদ্দরলোকের ছেলে! জানো, কতো বি-এস-সি পাশ দেওয়া ছেলে এই কাজটার জন্যে গেটের বাইরে

নিত্য টহল দিচ্ছে—নেহাৎ তোমার দাদা এখানে চাকরা করেন তাই এমন দুর্লভ সুযোগ পেয়ে গেছ। অতএব তুমি অফিস-বয়, তোমার কাজ অফিসঘর ঝাঁট দেওয়া।

একখানা পাখা টাঙিয়ে দিয়েও কি সহানুভূতি দেখিয়েছে কেউ! ক্যান্টিনের চালচুলোটুকু পর্যন্ত নেই!

সুবল বল্‌ল—আরে আমাদের আবার লাইফ? শালা, নেহাৎ মরি নি যে সেটাই মায়ের বুকের দুধের জোর বল্‌তে হবে।

হুট মিলের এক ছোকরা সেতার নিয়ে টুং-টাং করছিল, সে মন্তব্য করল—কেন, আপনার ইউনিয়নকে বলুন না। শপ্‌গুলো এয়ার কণ্ডিশন করিয়ে দিতে!

তিক্ত বিকৃতিতে মুখখানা কুঁচ্‌কে সুবল বল্‌ল—সব শালা চুথিয়াকে চিনে নিয়েছি। যে যার আখের হাসিল করবার তালে ইউনিয়নের মোড়লী করতে আসে। তলে তলে কোয়ার্টার বাগিয়ে, মাইনে বাড়িয়ে, দালালের খাতায় নাম লিখিয়ে, বাইরে খুব ওস্তাদী করে। কাকে দোষ দোব ভাই—মাথাই যদি বিগড়ে বসে থাকে ত কি করবে বলো। ওই শালা গোমেজ, মল্লিকের সঙ্গে বসে ত মদের ভুট্টি নাশ করে! আর এই যে চক্‌চকে ক্যাডিলাক গাড়ি চড়ে, সে কি ইউনিনের পয়সায় না শালার বাপের পয়সায়! সব বুঝি ভাই! আচ্ছা দাদা, এ্যায়সা দিন নেহি রহে গা। শালা রামঅওতার জবাই হয়েছে, এবার তোমার পালা।

ক্ষুদিরামদা হাসলেন—বলি, অত তড়পাচ্ছিস ক্যানো! দেখে যা—

—না দাদা অনেক ত দেখেছি! এবার একচোট দেখিয়ে দিতে চাই। শালা আমরা বানের জলে ভেসে যাবো, আর তোমরা মজা লুটবে! আগুন জ্বালিয়ে দেবো, তবে আমি বাপের ব্যাটা!

সুবল সেই অসন্তোষ বিক্ষুব্ধ শ্রমিক সমাজেরই একটি প্রাণী। তারই মতো অসংখ্য শ্রমিকের মনোভাব এক সূত্রে বাঁধা। ইউনিয়নের ওপর তাদের আর ভরসা থাকছে না। কবে বারি সাহেবের আমলে যে চুক্তি হয়েছে কোম্পানীর সঙ্গে, আর আজ পর্য্যন্ত তা ফাইলপত্রেই আটক রইল? ইউনিয়ন করছে কি?

একটা নির্বাচনী তাও নামমাত্র করল, তলে তলে জেনারেল কাউন্সিল থেকে কিছু নতুন লোক নিয়ে এক্‌জিকিউটিভ কমিটিতে সামান্য অদলবদল করল। জেনারেল ইলেক্‌শন কই হ'ল ? যাতে প্রত্যেক মেম্বার ভোট দিয়ে জেনারেল কাউন্সিল তৈরী করে! ওরা কি এতই বোকা যে, যা বোঝাবে তাই বুঝবে? তা নয়।

ঠিক এর পরই একটা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। করোগেট শীট যে মিলে তৈরী হয় সেই বারো নম্বর ভাটার শ্রমিকদের ওভারটাইম থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। গরমে কাজ করার খেসারতি বোনাস তাদের দিচ্ছে না কোম্পানী। ইউনিয়নের কাছে দরবার ক'রেই বারো নম্বর মিলের লোকেরা হাত-পা গুটিয়ে বসে রইল না। তাদের দলপতি-পঞ্চায়েৎ তৈরী হয়ে গেল। পাঁচজন শ্রমিক সরাসরি শপ্‌ ম্যানেজারের দপ্তরে হাজির হ'ল দাবি নিয়ে। ওভারটাইম চাই, হট বোনাস চাই, ক্যান্টিনের ঢাকা শেড্‌ চাই।

শপ্‌ ম্যানেজারের সোজা জবাব তিনি বল্‌লেন—ইউনিয়নের কাছে তোমাদের দাবি পেশ করো, তারপর আমি কোম্পানীর জবাব জানাবো ইউনিয়নকে।

সুবল দস্তিদার, তমিজুদ্দিন, অমর সেন, যোগজীবন দোবে আর ইউসুফ; পাঁচ মাতব্বরে স্পষ্ট বলে দিল—আমাদের দাবি আমরা জানাচ্ছি। এমনি না মানো, আমরা আন্দোলন করব। ও দালালদের ইউনিয়ন আমরা মানি না।

শপ্‌ ম্যানেজার বল্‌লেন—তোমরা বেআইনী কাজ করছ। এর ফল তোমাদের ভোগ করতে হবে।

সুবল উত্তর দিল—সে জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা আজই কাজ বন্ধ করলাম। দ্যাখো তোমার ইউনিয়ন যদি পারে এই স্ট্রাইক রুখতে—।

জ্যাকসন ঘাড় বাঁকিয়ে বলল—ওয়েল! কিন্তু এরকম ভুল তোমরা করবে না আশা করি।

—আমাদের দাবি না মানলে, বাধ্য হয়েই তার প্রতিবাদ জানাবো আমরা। এক ঘণ্টার জন্যে বারো নম্বর মিলে একটি শ্রমিকও হাতিয়ার ধরবে না আজ।

আমাদের প্রাণও মানুষের প্রাণ। চাকরী করতে এসেছি ব'লে আত্মহত্যা করাতে পারো না তুমি।

—ডোণ্ট ডু ইট। ইউ নো দি গ্র্যাভিটি অফ দিস্ লাইট্‌নিং স্ট্রাইক। ইল্‌লিগ্যাল এ্যাণ্ড ব্রিচ অফ্ ডিসিপ্লিন মিন্‌স্ ভেরি সিরিয়াস অফেন্স। এর জন্যে তোমাদের চাকরী চলে যেতে পারে।

তার জবাবে তমিজুদ্দিন হাসলো—সাহেব, চাকরীই চিনেছ, মানুষকে চিনতে শিখলে না। তুমি কজনের চাকরী খেতে পারো? পাঁচ-দশ, একশ' হাজার—যদি কারখানা ধর্মঘট করে তাহলে তুমি কি করবে?

জ্যাক্‌সন তাচ্ছিল্যের হাসিতে ক্রোধের উত্তেজনা চাপা দিতে চেষ্টা করে, বলে—ওয়েল, দেন ট্রাই ছাট ম্যাজিক!

বারো নম্বর ভাটার খবর কারখানাময় ছড়িয়ে পড়ল। এবং সত্যি একঘণ্টা কাল সব বিভাগেই হাতিয়ার বন্ধ রইল। বারো নম্বর ভাটা ত কারখানারই অংশ, সেখানকার মজতুরদের জন্য সবাই সহানুভূতি জানাবে বই কি!

এমনি করেই শুরু হ'ল আবার গোলমাল। অন্যান্য বারের মতো এবার একদিনের আচম্‌কা ধর্মঘটেই হাঙ্গামার নিষ্পত্তি হ'ল না। বারো নম্বর মিলের দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াই করবার জন্য তৈরী হ'ল নতুন এক শ্রমিক-সংস্থা, যার নামও এর আগে কেউ জানে নি, সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রণোদিত সংগঠন। এই নবজাত সংস্থার নাম হ'ল এ্যাক্‌শন বডি! এদের আন্দোলনের পথই আলাদা—কারখানার হাজিরা বজায় রেখে, কাজ-না-করা!

প্রথমে শুরু হ'ল বারো নম্বর ভাটাতে পরীক্ষামূলক ভাবে। আটঘণ্টা ডিউটিতে দৈহিকভাবে উপস্থিত থেকেও চারঘণ্টার মেহনৎ খরচ করা,—বেশ শক্ত ব্যাপার। তবে আস্তে আস্তে সকলেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে আন্দোলনের মূল পাণ্ডা হিসেবে যে পাঁচ জন শ্রমিক জ্যাক্‌সনের ঘরে হানা দিয়েছিল সেই সুবল দস্তিদার, তমিজুদ্দিন, অমর সেন, দোবে আর ইউসুফকে কোম্পানী বরখাস্ত করল।

চাকরী যেতেই তারা সুতোছাড়া ঘুড়ির মতো খুশী হয়ে মানিকপুরময় দিনরাত ঘুরপাক খেতে লাগলো। এ্যাকশন বডির সভ্য সংখ্যা বাড়াতে হবে,

এই আন্দোলনকে আরো জোরালো ক'রে তুলতে হবে। ওদের দৃঢ়-প্রত্যয় জন্মে গেছে, লেবার ইউনিয়নকে দিয়ে শ্রমিকদের পাইকারী কোনো সমস্যার সমাধান ঘটবে না। মূলতঃ ইউনিয়নের অস্তিত্বে জড়তা জন্মেছে। বিশেষ ক'রে পুরনো কাউন্সিল আঁকড়ে যারা পড়ে রয়েছে তারা যে কোম্পানীর দালাল এতে আর ওদের সন্দেহ নেই। প্রত্যেক বস্তিতে, মেসে, কারখানার প্রত্যেক গেটে এ্যাক্‌শন বডির লোক মোতায়েন থাকে হপ্তার মাইনের তারিখে। চাঁদা আদায় করে। রসিদও দেয়, দস্তুরমতো ইউনিয়নের নামাঙ্কিত রসিদ বই, বন্ধনীর মধ্যে লেখা থাকে (এ্যাক্‌শন বডি)।

বারো নম্বর ভাটা থেকে আরও আটজনের নামে হুম্‌কী এল—সাবধান হও, নইলে চাকরী থাকবে না। রইলও না।

তোমাদের কাছে ঠুন্‌কো প্রেস্টিজেরই দাম বেশী। শ্রমের মূল্য তোমরা বুঝতে চাও না। নইলে এই আখো তেজা সিং, দামোদর দোবে, পাঁড়ে—সবাই কারখানাতে গোটা জীবন খেটে মরছে। কারখানার ডিউটি বজায় রেখে, লরীর কারবার, দুধের ব্যবসা, হাটে গাঁমছার-কাপড়ের বেসাতি—সবই করে ওরা। ওরা বাড়ি তৈরী করে, ভাড়াটে বসায়, দেশ-মূলুক থেকে গাঁও-ভাইদের এখানে আনিয়ে রামায়ণ, সত্যনারায়ণের বৈঠক বসিয়ে লোক নেমন্তন্ন ক'রে প্রণামী আদায় ক'রে উপরী পয়সা কামায়!

বাঙালীর ছেলেদের দিয়ে কী হয়! ওরা যদি লেখাপড়া একটু শিখল ত, দফা রফা হয়ে গেল। ললিতের মতো ছেলে আর কটা দেখা যায়! সে-ই হ'ল দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, কারখানার ভেতরে ক্যান্টিন ফেঁদে বেশ জমিয়ে ফেলেছে ললিত। দু-হাতে পয়সা লুটছে—ছোকরা মল্লিক সাহেবের সঙ্গে ভারি খাতির জমিয়েছে, আবার এদিকে ইউনিয়নের মুখিয়াদেরও সে তোয়াক্কের ওপর রাখে। তবে, ললিত ত দুটো হয় নি মানিকপুরে।

বাঙালীর ছেলে একটি জিনিস পারে—তা হ'ল ঘোঁট পাকানো। তারা ঘোঁট পাকিয়ে কারখানার ভিতরে আবহাওয়া ঘোলাটে করে তুলে শেষ পর্যন্ত ইউনিয়নের নির্বাচন ঘটিয়ে ছাড়ল।

রামঅওতার নিজে জোর গলায় সর্বত্র ব'লে বেড়ালো—আর নয়, এবার

সে কমিটিতে থাকবে না। মুখে যতই বলুক, মনেমনে সে আশা করেছিল তাকে ওরা জোর করে ধরে রাখতে চাইবে। কিন্তু তা হ'ল না। আগে থেকেই মোটামুটি একটা কমিটি তৈরী হয়ে ছিল। সর্বসম্মতিক্রমে সেই তালিকার সকলে গিয়ে কমিটিতে ঢুকল। গোমেজ সাহেবই প্রেসিডেন্ট রইলেন। আর ভাইস প্রেসিডেন্ট হ'ল রামকিষণ শর্মা! এবার অনেকগুলি বাঙালী এলো কমিটিতে তাদের অপবাদ যে মিথ্যা সেটা প্রমাণ করবার জন্যই যেন এই ব্যবস্থা।

নতুন কমিটি প্রথমেই রামঅওতারের কাছে হিসেব চেয়ে বসল। তাদের দৃষ্টে রামঅওতারের কাছে ইউনিয়ন আড়াই হাজার টাকা পাবে। মুখেমুখে রটে গেল যে, এই টাকা তছরুপ হয়েছে। কিন্তু পরে যখন যথাযথ হিসাব দাখিল করল রামঅওতার তখন মাত্র পনর আনা একপয়সা গরমিল হ'ল। শেষের সংবাদটা আর বড় কেউ জানলো না।

এরপর শুরু হ'ল গোমেজ সাহেবের বিরুদ্ধে আন্দোলন। গোমেজ সাহেব দালাল, শর্মায়াদার, ইত্যাদি জিগির শহরময় ছড়ালো। সেই ফাঁকে সাধারণ নির্বাচনে বামপন্থী যতীন বসু বিধানসভাতে দাঁড়িয়ে জিতে গেলেন। কংগ্রেসের মদন রায়, স্বতন্ত্র প্রার্থী হনুমান আলুওয়ালা কেউই তাঁর ধারে কাছে পৌঁছলো না।…

…গোমেজ সাহেব এখানকার শ্রমিকদের ব্যবহারে মর্মাহত! নতুন কার্যকরী সমিতির আচার-আচরণে একটা অসহিষ্ণুতা ফুটে ওঠে। তাঁরা এক দফায় দেড়শ' শ্রমিককে সাময়িকভাবে বেকার বানিয়ে দিলেন। যে সব শ্রমিক 'রেল ব্যাঙ্ক' তৈরী করত তাদের হাতে কাজ নেই—সরকারী অর্ডার হাতে না থাকলে কোম্পানী এই সব অস্থায়ী শ্রমিকদের পুষতে বাধ্য নয়।… ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতি কোম্পানীর একাজের প্রতিবাদ করে নি। শ্রমিকেরা আবেদন করেও ইউনিয়নের সহায়তা পায় নি। তারা শেষে গোমেজের সঙ্গে দেখা করল। তিনি কয়েকদিন পরে মানিকপুরে এসে কৈফিয়ৎ তলব করলেন। বাঙালী সভ্যরা বলল কোম্পানীর সঙ্গে ইউনিয়নের যা চুক্তি তাতে করে 'রেলব্যাঙ্ক' কুলীদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করা চলে না। গোমেজ বললেন, কই সেরকম চুক্তি কিছু হয় নি ত! মেম্বাররা বলল—

'হয়েছে। তবে সেটা লিখিত ভাবে হয় নি, মৌখিক চুক্তি সেটা।' গোমেজ বল্‌লেন—'এরকম চুক্তি আমি মানি না। এর মধ্যে গলদ আছে।' একটি দুটি করে বাঙালী মেম্বাররা বেরিয়ে গেল। তাদের নাকি গোমেজ সাহেব অপমান করেছেন। ওদিকে সভার কাজ চল্‌তে থাকে। গোমেজ আরও কতকগুলি বিষয়ে কার্যকরী সমিতিকে শাসালেন—ইউনিয়নের খরচ ও বরাদ্দ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ঠিক-ঠিক চাঁদা আদায় করা হচ্ছে না। অধিকাংশ সাধারণ সভ্যেরই ছ-আট মাস পর্যন্ত চাঁদা আদায় হয় নি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওদিকে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের ওপর চাপ দিতে শুরু করেছেন। প্রোডাক্‌শন কম্‌ছে দিনকে-দিন। অথচ শ্রমিকদের মজুরী বাড়ছে, ওভারটাইম চল্‌ছে পুরোদমে। এর একটাই অর্থ হয়,—শ্রমিকেরা কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। এভাবে বেশিদিন চল্‌বে না। হয় ইউনিয়ন তার শ্রমিককে সাবধান করে কর্মিষ্ঠ করে তুলুক, নতুবা কোম্পানীকে অন্য পথ দেখতে হয়। এর মধ্যে দিয়েই গোমেজ সাহেব মালিক পক্ষের সঙ্গে ঝগড়া বচসা ক'রে রেলব্যাঙ্কের বেকার শ্রমিকদের অন্যান্য বিভাগে চাকরীতে বহাল করলেন। গোমেজ তাঁর সাধ্যমত কোম্পানী এবং শ্রমিক দু-তরফের মধ্যে হৃদ্য-সম্পর্ক বজায় রাখতে উৎসুক। আর ইউনিয়নের বাকী সব শ্রমিক প্রতিনিধিই কর্তৃপক্ষকে সংশয়-সন্দিগ্ধতার দৃষ্টি দিয়ে দেখে থাকে। এতকালের পীড়নের প্রতিক্রিয়া তাদের মনে এই বদ্ধমূল ধারণা গেঁথে তুলেছে। তারা গোমেজের মধ্য পন্থাকে মোটেই মেনে নিতে পারে না। তাদের কথাই হ'ল—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ। 'ডবল ইউনিট কোয়ার্টার' অর্থাৎ দু-কামরার শ্রমিক আবাস, ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক আলো, অন্ততঃ দশটা প্রাইমারী স্কুল বানানো, এবং চারটে হাইস্কুল স্থাপন করা, মজুরীর হার বাড়ানো ইত্যাদি অনেক ফিরিস্তি ইউনিয়নের দপ্তরে জমা হয়ে উঠেছে। এছাড়া ছোট-খাটো অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধেও একগাদা অভিযোগ, অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। গোমেজ সাহেবকে এগুলির যথাযথ বিহিত করবার জন্য কার্যকরী সমিতি চাপ দিতে লাগলো। আর গোমেজ তাঁর কালো পুরু ঠোঁটে চুরুট গুঁজে গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন—ধীরে ভাই, ধীরে! লেতে চলো, ম্যাংতে চলো!

বাদামতলার মেস বাড়িতে আজও তেমনি আসর-গরম-করা বৈঠক বসছে। ক্ষুদিরাম-দা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি নিয়ে চুপ করে বসে থাকেন।

সুবল দস্তিদার আজ সবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। তাকে ঘিরেই আলোচনা চল্‌ছিল। এভাবে জানোয়ারের মতো কারখানার ফার্ণেশে কাজ করা চলে না। এই যে সুবল বেচারী একশ' পঁচিশ ডিগ্রী গরম সইতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে টুলের ওপর থেকে ঠকাস্ ক'রে মাটিতে শুয়ে পড়ল, তার জন্য ওপরওয়ালাদের কি মাথা ব্যথা আছে? অবিনাশ চাটুয্যে দিব্যি মাথার ওপরে পাখা ঘুরিয়ে খস্‌খসের পর্দাঢাকা অফিস ঘরে আরামে রইল। রবিন্‌সন, জ্যাক্‌সন, লেসলী সকলেরই আফিস ঘর এয়ার কণ্ডিশন করা! আর যারা ১২৫।৩০ ডিগ্রী গরমের মধ্যে আটঘণ্টা ঝল্‌সাচ্ছে তাদের জন্যে কি বন্দোবস্ত?

ব্যাপার দিন দিন ঘোরালো দাঁড়াচ্ছে। এই পনেরো দিনের মধ্যে বারো নম্বর মিলের প্রোডাক্‌শন সিকিতে গিয়ে পৌঁছলো।

ইউনিয়নের তরফ থেকে তমিজুদ্দিনকে একদিন ডেকে পাঠিয়ে রামকিষণ শর্ম্মা বল্‌ল—ভাই, লড়াই ত জরুর হওয়া দরকার। কিন্তু এভাবে ইউনিয়নকে ছেঁটে বাদ দিয়ে বেশি দূর ত যেতে পারবে না। কেন খামোখা আপোসে ঝগড়া করছ, চলে এসো, ইউনিয়ন মদৎ দেবে।

তমিজুদ্দিন হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার জুড়ে দিল—শালা দালাল, শর্‌মায়াদায়, মল্লিককা জুত্তি চাট্‌নেবালা। তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সাথ নাই! খবরদার এর মধ্যে নাক গলাতে এসো না।

তমিজুদ্দিনের একজন সাক্‌রেদ ত রামকিষণের মুখের ওপর থুথুই দিয়ে বসল। নেহাৎ রামকিষণ নরম মেজাজের মানুষ তাই বিশেষ কিছু বল্‌ল না। ঘাড়ের গামছা দিয়ে থুথু মুছে ফেলে বল্‌ল—নিজের গায়ে থুথু ছিটিয়ো না, লোকে দেখলে হাসবে।

সুবল দস্তিদার ঘুষি পাকিয়ে আস্ফালন করে—আমরা কারুর পীরিতের পরোয়া করি না। এই চৌদ্দ হাজার মজদুর, যারা একদিন ইউনিয়ন বানিয়েছিল, তারাই তোমাদের তাড়াবে। খাঁটী কাজের লোক নিয়ে আমরা লেবার মুভ্‌মেণ্ট চালাবো। আর ধোঁকাবাজী চলবে না।

তারপর এপাশ-ওপাশে ঘুরে নিয়ে সে গলা ফাটিয়ে জিগির দিল—বলো ভাই, ইয়ে ইউনিয়ন খিলাফ হ্যায়।

কোথা থেকে যে আশপাশে এত লোক জুটে গিয়েছে রামকিষণ লক্ষ্য করে নি। সুবলের সুরে সুর মিলিয়ে তারা সাড়া দিল—ইয়ে ইউনিয়ন খিলাফ হ্যায়।

সুবল আবার বল্‌ল—তব্ লেবার লোক ক্যা মাংতা?

সাড়া উঠ্‌ল—এ্যাক্‌শন বডি।

তমিজুদ্দিন দাড়ি দুলিয়ে হাঁকলো—এ্যাক্‌শন বডি—

সাড়া এল—জিন্দাবাদ।

—দালাল ইউনিয়ন—

—মুর্দাবাদ!

রফা হ'ল না।

বারো নম্বর মিলের সাড়ে-তিনশ' লোক বরখাস্ত হয়ে গেল। কোম্পানীর বিস্তর লোকসান হচ্ছে। অবাধ্য লোকগুলির অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠেছে। অতএব তাদের নামে প্রথমে চার্জশীট এল। কিছুই উন্নতি হ'ল না তাতেও। বারবার সতর্ক করার পরও মিলের ফলন প্রায় এক অষ্টমাংশে গিয়ে পৌছলো। কৈফিয়ৎ চাইলে সবারই এক জবাব—এর বেশি আমাকে দিয়ে কাজ হবে না। চেষ্টা ত করছি—

এ্যাক্‌শন বডির উপর সাধারণ শ্রমিকদের আস্থা গড়ে উঠেছে এই অল্প-দিনের মধ্যেই। নূতনের প্রশংসায় অনেকেই মুখর হয়ে উঠেছে।

একজোটে সাড়ে-তিনশ' বেকার শ্রমিক উঠে পড়ে লাগলো—এখন এ্যাক্‌শন বডির শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। এ না হলে তাদের অস্তিত্বই লোপ পেয়ে যাবে। কর্মচ্যুত শ্রমিকদের জীবনপণ সংকল্প হয়ে উঠল ইউনিয়ন দখল করতে হবে, শ্রমিক আন্দোলন জাগিয়ে তুলতে হবে।

সাতাশি

দু-চাকার একখানা ঠেলা গাড়িতে হিন্দী সিনেমার ছবি সেঁটে নিয়ে চলেছে সন্দর্শন টকীর প্রচারকর্মী। আর আগের মতো বোল্‌বোলাও নেই সন্দর্শন টকীর। পট্‌লা নিজেই গাড়ি ঠেল্‌ছে এক হাতে আর এক হাতে টিনের চোঙাতে মুখ লাগিয়ে হাঁক পাড়ছে, লায়লা-মজ্‌নু, মহব্বৎ কি জাদু দেখো, আও ভাই লায়লা-মজ্‌নু!

শিরিষ গাছের তলায় পান বিড়ির দোকানে কুলী-কামীনেরা ফষ্টি-নষ্টি করছিল। তসবির-বালার আওয়াজ পেয়ে ওরা একটু চন্‌মনিয়ে উঠল। এপাশে ধোবী মহল্লাতে কাপড় কাচা চল্‌ছে পুরোদমে। একটি অল্প বয়সী বৌ একগাদা কাচা কাপড় ঘাড়ে নিয়ে রাস্তা পেরিয়ে কোণের কোয়ার্টারের বাগানের বেড়ার গায়ে মেলে দিতে আসে। হ্যাঁ, কুলী কোয়ার্টারেরও বাগান হয় বইকি। বিশেষ ক'রে, যারা সৌভাগ্যক্রমে রাস্তার পাশে এক প্রান্তের কামরা পেয়ে গেছে তাদের বরাত খুব ভালো, মানতেই হয়। প্রতি সারিতে এরকম ভাগ্যবান দু'জন থাকে। এক নম্বর, আর দশ নম্বর—শুরু আর শেষ! তা এ-অঞ্চলের সৌভাগ্যবানেরা স্বভাবতঃই এই বাড়তি জায়গাতে চালা তুলে গরু মহিষ পুষে থাকে। দৈবাৎ কোনো শৌখীন মেজাজের মজদুর যদি প্রাণের উদগ্র বাসনার বশে গোয়াল ঘর না বানিয়ে বাগান করে তাহলে হঠাৎ সেটা চোখে পড়ে। কিন্তু এরকম দু' একজন খেয়ালী লোকও থাকে ত! বাগান অবশ্য বরবটি, লঙ্কা, লাউ, ধুঁধুলের লতাগাছে ছাওয়া!...বৌটি কাপড় মেলতে মেলতে সিনেমার ছবি আঁটা গাড়িখানার দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে! পট্‌লার নজর এড়ায় না, সে আড়চোখে তাকিয়ে আবার গলার শিরা ফুলিয়ে হাঁকে—মুহব্বত কি জাদু, আঁখো কী আঁসু, লায়লা মজনু সব্‌সে দিলখোশ তসবির—আইয়ে।

মেয়েটির চোখের সামনে পট্‌লার গাড়ি এসে পড়ে। গাড়িটা তাচ্ছিল্যভরে

রেখে, পট্‌লা টিনের খাঁজ থেকে খান কয়েক রঙীন কাগজে ছাপা হ্যাণ্ডবিল বার ক'রে নিল—তারপর, সেই বৌটির হাতে গুঁজে দিল খান কয়েক।

এরকম খাতির বোধ হয় বৌটি জীবনে বড় একটা পায় নি। পট্‌লার দিকে খুশীর চাহনী মেলে দিয়ে বল্‌ল—ফোকটিয়া ?

পট্‌লার মেজাজ এতে শরীফ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ওর দৃষ্টি ততক্ষণে বৌটির দেহের মধ্যদেশে গিয়ে থেমেছে, আসন্ন মাতৃত্বের লক্ষণে দেহের মধ্যদেশ ভারাক্রান্ত। এতে পট্‌লার মেজাজ খিঁচড়ে গেল। সে মুখ ভেংচে বল্‌ল—ফোকটিয়া—ইঃ! মুফতী ওঃ! যাঃ যাঃ, কম্পনী কা ময়দান মে লক্কড় খেল্‌ হোগা। সন্দর্শন টকীকা খেল্‌, আচ্ছি কিস্‌সা! কিম্মৎ ছে ছে আনা। ফোকটিয়া মুহব্বত কভী মিল্‌তি ক্যা ?

মেয়েটি পট্‌লার অভব্য ভঙ্গীতে বিরক্ত হয়। পট্‌লার চোখের চাহনী এমন বিশ্রী, যেন কাপড় জামার আবরণ অগ্রাহ্য ক'রে ভেতরের সবকিছু দেখে নিচ্ছে। মুখ ফিরিয়ে মেয়েটি ঘোমটা টেনে আপন কাজ করতে থাকে।

কিন্তু মিনিট কয়েকের মধ্যে পথটা গালি গালাজ, গরম গরম বাৎ-চিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। কোন্‌ এক বাচ্ছা ছোঁড়া লায়লা মজনু'র যুগল ছবিটা ছিঁড়ে দিয়েছে। পট্‌লা হাতেনাতে ধরে ফেলেই দু' ঘা বসিয়ে দিয়েছে। আর যায় কোথায়! পাঞ্জাবী হিন্দুস্তানী যে যেখানে ছিল হৈ হৈ ক'রে তেড়ে এল। ওদিকে দুপুরে 'খাবার' ছুটি পাওয়া শ্রমিকরা বাড়ি ফিরছিল, হল্লা দেখে তারাও জমে গেল। প্রথম দিকে পট্‌লা গলাবাজি করছিল,—লোকসান করেছে অতএব সে মেরেছে, বেশ করেছে! কিন্তু জনমত খুব জোরালো—সবাই তার বিপক্ষে। এক প্রৌঢ়া ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে সরাসরি পট্‌লার কান দুটো সজোরে ম'লে দিয়ে গম্ভীরভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল। চারিদিকে হাসির হল্লোড় পড়ে যায়। বেশ হয়েছে।...এখন কোম্পানীর দৌলতে সপ্তাহে দু'দিন সিনেমা দেখা যায়, মাত্র এক আনার টিকিট! খেলার মাঠে সিনেমার ছবি দেখানো হয়, মাত্র এক-আনা ক'রে দর্শনী! সন্দর্শন টকীর মালিকটা আস্ত চোর, নইলে ছ' আনা নেয় কেন ?

পটলা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে কোনোরকমে এগিয়ে চলে। তার ভাগ্যটাই

মন্দ, নইলে আজও ওই ম্যানেজারের লাথি হজম ক'রে পড়ে থাকতে হয়! তামাম্ দুনিয়ার ওপর এক তিক্ত বিদ্বেষ তাকে ক্ষেপিয়ে তোলে।

কুলী মহল্লার শেষ প্রান্তে এক আইসক্রীমওয়ালাকে ঘিরে ছেলেমেয়েদের ভিড়। রাস্তার কলে সারবন্দী স্নানপ্রার্থী দাঁড়িয়ে রয়েছে বালতি গামছা ঘটি নিয়ে। মাথার ওপর রোদের প্রখর তেজ।

আরও এগিয়ে বারি-ময়দানটা খাঁ-খাঁ করছে। রুক্ষ মাটি যেন ক্ষোভের ভ্রূকুটি-রুষ্ট দৃষ্টি নিয়ে কিছু বল্‌ছে, পটলা দেখল একটি ঘাসও নেই। গোটা মাঠখানা ন্যাড়া—কাঁকর আর শুক্‌নো লাল ধুলো হু হু বেগে উড়ছে। লু উঠলো। হাওয়ায় আগুন ছুটছে, তার সঙ্গে ঘুরপাক খাচ্ছে চূর্ণ ধুলিরাশি। চোখ বাঁচিয়ে চলা দায়। হয়ত বাড়ি ফিরে পটলা দেখবে মঙ্গলা তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে বসে আছে। বাড়িটা অবশ্য মঙ্গলার, পটলা ভাড়াটে। নামেই ভাড়াটে, আজ পর্যন্ত ভাড়া সে এক পয়সাও দেয় নি। মঙ্গলা এককালে পটলাকে নেক্‌নজরে দেখত—সেই সময়ের ভাড়াটে পটলা। তখন মঙ্গলা প্রায়ই ওকে খাওয়াতো। তখন দিন ছিল ভালো। দু-হাতে পয়সা উড়ে এসেছে। কিন্তু এখন মঙ্গলারও ব্যবসায়ে মন্দা পড়েছে। বাজারে এখন অনেক নতুন মেয়ে নেমেছে। তাদের ছিরি ছাঁদও আলাদা। একেই জোটে না, তারওপর এই এক পুষ্যি পটলা। মঙ্গলা মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে। ওরই বা এত গরজ কিসের! সোমত্ত মদ্দ, পারে না নিজেরটা খুঁটে খেতে! কিন্তু না, কারখানার খাটুনী পটলার ভাল লাগে না—সে পারে না ওই কলকব্জার সামনে চাকরের মত দাঁড়িয়ে থাকতে। ছেলেবেলা থেকে এই হাওয়াতে মানুষ—কিন্তু পটলা যেন অন্য রকম। বার বার এখানে-ওখানে কাজ সে যোগাড় করেছে, কিন্তু কোথাও টিকতে পারে নি। সিনেমার হাওয়ায় যেন জীবনের যথাসর্বস্ব লুকোনো আছে। মঙ্গলার জন্যেও কম কষ্ট হয় না পটলার। সত্যি সে ত আর ইচ্ছে করে মঙ্গলার গলগ্রহ হয়ে থাকতে চায় না। এক-একদিন ওই ভয়ে পটলা বাড়িই ফেরে না। পকেটে পয়সা না থাকলে ওর বাড়ি যেতে লজ্জা করে। কিন্তু না গিয়েই বা করবে কি—হয়তো মঙ্গলা না খেয়ে বসে থাকে। ফিরলেও মেজাজ

সপ্তমে ফলাও করে, নিজের ভাততরকারী সবটুকু পটলার সামনে ধরে দেবে!...

আজ পটলার পকেট ফাঁকা, কালও তাই ছিল, পরশুও তাই—পর-পর ক'দিন এইভাবে চলছে। ম্যানেজারকেই বা বল্‌বে কি—সিনেমাতে একদম লোক হচ্ছে না। দেবে কোথা থেকে সে—আমদানী নেই যে!

—দুত্তোর। বলে পটলা ঠেলাগাড়িটা ইউনিয়ন আপিসের সামনে রেখে আপিসের বারান্দায় গিয়ে উঠল। পেটে চাঁই-চাঁই ক্ষিদে, মাথার ওপর চন্‌চনে রোদ এর ওপর আর সয় না। আপিসের সাম্‌নের উঠোনে বিরাট চক্‌-চকে একখানা গাড়ি।

পটলা শুয়ে পড়ল বারান্দার মেঝেতে। এটা ওর বিশ্রামের বাঁধা ঠাঁই। দুপুরে বড় কেউ থাকে না এখানে—এক-আধটা কুকুর, আর দারোয়ান। দারোয়ানের সঙ্গে পটলার দোস্তী—সিনেমার পাস দেয় মাঝে-মাঝে।

অসময়ে আপিস ঘরটা আজ খোলা, ভেতরে বেশ জোর গলায় কারা কথাবার্তা কইছে।

পটলা চুপচাপ শুয়ে থাকে। মনে মনে সে বিরক্ত। যেন তার অধিকারের ওপর বেআইনী হামলা করছে ঘরের ওই লোকগুলি। একটা বিড়ি পেলে বেশ হ'ত!

শুয়ে থাকতে থাকতে কথোপকথনের টুকরো কানে এসে পৌঁছচ্ছে।

—বেশ ত, ওদের বলো দোসরা ইউনিয়ন খাড়া না করে ওরা এই ইউনিয়নটাই নিয়ে নিক। হাঁ আমার জন্যেই ত যত হাঙ্গামা! আমি ইস্তফা দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা ফ্রেশ ইলেকশন করো, করে নয়া কমিটি বানাও। একসঙ্গে কাজ করো। এদিকে ইউনিয়ন, ওদিকে এ্যাকশন বডি—দুটো সংগঠন, দুরকম মতলব নিয়ে কোনো কাজই করতে পারবে না। মাঝে থেকে নিজেদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগে যাবে। তখন মালিকের মওকা মিলে যাবে। না, না, রামকিষণ শর্মা এ আমি ভাল মনে করি না।

অপেক্ষাকৃত মোটা গলায় আর একজন বল্‌ছে—উহুঁ, ঐসা কাম করনা ঠিক নেহি। কেঁউ কি ওই এ্যাকশন বডিতে বিস্তর দালাল ঘুষে গিয়েছে।

ওদের মতলব খারাপ সাহেব। আপনি বুঝছেন না, এটা হচ্ছে মল্লিক সাহেবের ভাঁওতা। আপনা ঠাটে আপনি বসে থাকুন। এদিকের জন্যে কিছু ভাববেন না, এখানকার লেবার অত বুরু না—দুদিনেই ওদের ছক্করবাজী ফেঁসে যাবে। তখন আবার জোর কদমে ইউনিয়ন চলবে।

—চলছে আর কোথায়! ওদের ত শুনছি আট হাজার মেম্বার হয়েছে, চাঁদাও বেশ রেগুলার আদায় হচ্ছে। এদিকে তোমার ইউনিয়নে ত চাঁদা শয়ের নীচে চলে যাবার দাখিল। না, শর্মা আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, তোমাদের তাতে ভাল হবে। লেবার যখন আমাকে চায়ই না তখন গদী আঁকড়ে থাকা বেহুদা বেওকুফী!

—না সাহেব আপনি গেলে ইউনিয়ন চূরমার হয়ে যাবে।

পটলা মনে মনে হাসে, এদের এই ইউনিয়ন নিয়ে মারামারি আর কতো কাল চলবে? জন্মে ইস্তক পটলা দেখছে এরা আজ একজনের মাথায় টুপী পরালো, কাল তাকে লাথি মেরে তাড়ালো! একদল লোক আছে যারা এই নিয়েই মেতে থাকে। এরা কেন যে লয়লা মজনু, কি জাদুয়ে লেড়কীর মতো ভালো ভালো ছবি ছাখে না! তাহলে অযথা এ্যাকশন বডি আর ইউনিয়ন নিয়ে মাতামাতি করত না। আহা ওদের মতো যদি পয়সা থাকত পটলার তবে আর ভাবনা ছিল কি! সে একবার কলকাতায় যেত, বোম্বাই যেত একবার 'এস্টার'দের স্বচক্ষে দেখে আসতে পারত। পয়সা যাদের থাকে তাদের বুঝি নজর থাকতে নেই! পটলা খুশী মনে নিজের পিঠ থাবড়ায়, তাহলে সে বেশ আছে, কি হবে পয়সা নিয়ে? তার চেয়ে এবার বাড়ীই যাওয়া যাক, মঙ্গলার মুখ ঝামটার টালটুকু সামলাতে পারলে পেটের জ্বালাটা চুকিয়ে ফেলা যাবে,—তারপর ত সন্ধ্যে, নিয়ম বাতি। গেট্ কীপার পটলা তখন মাতব্বরীর মেজাজ চড়াতে পারবে, টিকিট নিতে গিয়ে একটু হাতের ছোঁয়া, মালিকের চোখ এড়িয়ে কাউকে ভেতরে বসিয়ে দিতে পারলে আরও বেশি কিছু মিলে যাওয়া—ভাবতে ভাবতেই সে উঠে পড়ল। কানের কাছে ভ্যাজর-ভ্যাজর করলে কি আরাম-বিরাম হয়!

পথে দেখা হ'ল জিলানীর সঙ্গে। পটলা চলেই যেত, নেহাৎ ভেষ্টায় ঠোঁট শুড়-শুড় করছে তাই হাঁকলো—আরে ইয়ার, হালচাল আচ্ছা ত!

জিলানী চলেছে টিফিনের পর কারখানায়, হাতে সময় নেই। তাড়াতাড়ি সাইকেল চালাতে চালাতে পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা সিগারেট বার করে পট্‌লার দিকে ছুঁড়ে দিলে। চট্ করে লুফে নিয়ে পট্‌লা অবাক হয়ে গেল—আরে এ যে খাশ বিলিতি সাহেব! এঁ্যা সিগ্রেট? শালা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। মনে মনেই বল্‌ল, তা এতদিন ইউনিয়ন করছে, মোটর সাইকেলে যে চড়ে না জিলানী, সেই ঢের।

দেখা হল তমিজুদ্দিনের সঙ্গে। সেও সাইকেলেই যাচ্ছে, তবে তার গতি তেমন ক্ষিপ্র নয়। পট্‌লাকে দেখে তমিজুদ্দিন সাইকেল থেকে নেমে পড়ল—এই যে ওস্তাদ! তারপর, তোমাদের সব খবর ভালো? অনেকদিন ওদিকে যেতে পারি না, ভয়ানক কাজ পড়েছে। মনু দিদিমনিকে বলো যাবো!

তমিজুদ্দিন মঙ্গলাকে 'মনু' বলে ডাকে। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধে করতে পারে না—রামছাগলের মত দাড়ি দেখলেই মঙ্গলার কাঁচপোকার টিপ্-পরা কপালটা কুঁচকে উঠে!

পট্‌লাকে একটা বিড়ি দিয়ে তমিজুদ্দিন নিজেও একটা ধরালো। ব্যস্তভাবে পট্‌লা বল্‌ল—মিয়াজানের ডিউটি নেই?

—বুঝলে ওস্তাদ আর পারি না, কারখানার চাকরীর চেয়ে বড় ডিউটি পড়েছে ভাই। তোমার ওই এ্যাক্‌শন বডির সেক্রেটারী করে দিয়েছে। খাটতে খাটতে জান্ লবেজান। নইলে, ভাবি যে একবার মনুদিদিকে দেখে আসি। লেবারদের চাঙ্গা করতে কতো যে মেহনৎ কি বল্‌ব ভাই। কতো কাজ। হ্যাঁ, ওই দালালটা গেল এই দিক দিয়ে, দেখেছ নাকি?

—দালাল?

পট্‌লা অবাক হয়ে তাকালো। তারপর হেসে বল্‌ল—জিলানীর কথা বলছ? হ্যাঁ—

—কি বল্‌ছিল হারামী?

একটু ভেবে নিয়ে পট্‌লা শুরু করল—এই খোশগল্প আর কি! বলে কি, কারখানায় ঢুকে পড়ো না ওস্তাদ। তা আমি বলি কি, বেশ আছি বাবা স্বাধীন কারবার নিয়ে। তোমাদের ওখানে কুলীমজুরের কাজ, এই বুড়োকালে

আমাকে দিয়ে হবে না। হ্যাঁ লেখাপড়ার কাজ হত, চেয়ার টেবিলে বসে বসে ত না হয় ভেবে দেখতাম!

তমিজুদ্দীন দাড়ির বনে আঙ্গুল চালিয়ে বল্‌ল—শালার ভারি মুরোদ চাকরী দেবে! আরে তোর হাপা সাম্‌লা। যাক ওস্তাদ ওসব বাজে কথা রেখে বলো দেখি—সত্যি চেয়ারটেবিলের কাজ করতে রাজি আছো না কি?

পট্‌লা বিস্ময়ের ঢোকটা কোনোরকমে সামলে নির্লিপ্তভাবে বল্‌ল—কেন, তুমিও চাকরী দেবে নাকি?

—তুমি বুঝি ভাবছো যে, মনুদিদির কাছে ভিজে বেড়ালটি সেজে থাকি বলে আমার কিছুই কদর নাই। আরে সাড়ে আট হাজার লেবার আমার হাতের মুঠোতে—বুঝলে! এখন তোমার রামনামে আর কারখানার চাকা বন্ধ হয় না, এই আমি এখন লেবার-ফেবারের মাথা। চাকরী অমন দু-দশটা হেলা-ফেলা করে জুটিয়ে দিতে পারি। তা তুমি ত আর যে-সে নও, দিলে একটা খাতিরের কাজই দিতে হয়—যাতে মনুদিদির কাছে মুখ থাকে।

পট্‌লা কষে কয়েকটা টান দিয়ে বিড়িটা ফেলে বল্‌ল—তা কি রকম কাজ শুনি!

—যেমনটি তুমি চাও। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ানো, মানে চাঁদা আদায়, মিটিং-এর ইস্তাহার বিলোনো, শহরে চোঙা ফুঁকে বেড়ানো। আবার হিসেবপত্তর লেখা—এই সব আর কি।

—কত মাইনে?

—মাইনে এখন তেমন নয়। যা হয় একটা আপোসে ঠিক করা যাবে। মানে আমাদের এ্যাকশন বডির প্রচার বিভাগ বুঝলে না—পাবলিসিটি! সেটা তোমার হাতে থাকবে। কোম্পানীর চাকরী নয়, কমিটির! আমার হয়েছে সব গোলা লেবার নিয়ে কাজ—একটু এলেমদার লোক খুঁজছি!

—তোমাদের ত তিনদিন পরে আর চাটিবাটি উঠবে। তখন?

—ক্ষেপেছ? এ একেবারে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা। এখানে দালালদের ঠাঁই নাই। খাশ লেবারের ব্যাপার। আরে এখন ত এটাই ইউনিয়নের ঘাড়ে পেচ্ছাপ করছে, এর পর দেখে নিয়ো কি কাণ্ড হয় তোমার ওই হারামী

গোমেজ কাফেরকে যদি না ছ্যাপ গিলিয়ে ছাড়ি ত আমার বাপের নাম মফিজুদ্দীন নয়! সব শালা আখেরের খোয়াব নিয়ে পটাপট ডিগবাজী খেয়ে পচা ইউনিয়ন ছেড়ে এ্যাক্‌শন বডির খাতায় নাম লেখাচ্ছে। জানো তো এখন তামাম কারখানাতে শ্লো-ডাউন চালু করে দিয়েছি।

পট্‌লা হাঁ করে থাকে। এসব কথা সে কিছুই বুঝতে পারে না।

তার অবাক চোখের দিকে তাকিয়ে তমিজুদ্দিনের উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যায়, সে বলে—আরে ওস্তাদ তোমার আর কি বলো, আছো মন্নুদিদির আঁচলের তলায় দিব্যি, কিন্তু এদিকে দুনিয়া যে ওলট্‌ পালট্‌ হয়ে যাচ্ছে, সে খবর ত রাখো না! বলি, এখনও বুঝলে?—

পট্‌লা বেকুবের মতো হেসে উঠল।

তমিজুদ্দিন গম্ভীরভাবে বল্‌ল—না, না, হাসির ব্যাপার নয়! বুঝে ছাখো, বড় সাহেব গাড়ি চড়ে কারখানার দপ্তরে গিয়ে বসেছেন। ঘণ্টা বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন। মনে করো দরজার বাইরে দু-দুটো বেয়ারা মোতায়েন। সাহেবের ঘণ্টা বেজেই চলেছে। কিন্তু কোনো সাড়া নাই—বেয়ারা এল না। সাহেব তখন কি করবে?

—বেয়ারাকে লাথ ঝাড়বে।

—অত সস্তা। একবার লাথ ঝেড়ে দেখুক না। আমরা এ্যাক্‌শন বডি কি ঘাস কাটতে বসে আছি? ওই যে তোমার অবিনাশ চাটুয্যে, মুখে শুধু বলেছিল জুতিয়ে মুখ ভেঙে দেবো—ব্যস্‌, তারপর কি হ'ল? যাও না গিয়ে দেখে এস হাসপাতালে! যে পায়ে জুতো পরবে সে পা দুটোই ভাঙা, বুঝলে!

পট্‌লার ক্ষিদেতেষ্টা ঘুচে গিয়েছে—বলো কি মিয়াজান, তোমাদের হাতে তাহলে গুণ্ডাটুণ্ডা রয়েছে?

তমিজুদ্দিন থামে না, বলেই চল্‌ল—তা মনে করো সাহেব ত বিরক্ত হয়ে বাইরে এল পর্দা সরিয়ে—কি দেখল? বেয়ারা তখন এক পা এগিয়ে হাঁট্‌ছে ত চার পা পিছিয়ে যাচ্ছে। সাহেব যদি কৈফিয়ৎ চায় ত জবাব তৈরিই আছে, যানে কা কোশিস করতা হুঁ, গোর মে দরদ হুয়া সাব! সাহেব ত সবই জানে। কি বলবে? বেশি কিছু বলতে গেলেই কখন আঁধারে প্যাঁদান খাবে। মনে

করো এ রকম সব জায়গায়। ট্রাফিক সেক্শনের ড্রাইভারদের ইঞ্জিনের স্পিড ক'রেছে গরুর গাড়ির চেয়েও স্লো। তা মনে করো ওস্তাদ, এই হচ্ছে স্লো-ডাউন।

—তা বেশ মজার খেলা বার করেছো মিয়াজান, তোমার মাথা আছে বটে। কিন্তু এ দিয়ে কি হবে?

—তবে আর এতক্ষণ কি বকলাম? এই করে কোম্পানীর রস মারবো। আর তোমার পেয়ারের দোস্ত ওই দালালটারে বলে দিয়ো কোনদিন ওর মাথায় ডাণ্ডা পড়বে। কারখানার মধ্যে এখন হাওয়া ভারি গরম হয়ে উঠেছে।

পট্‌লা প্রশ্ন করে—জিলানীর কথা বল্‌ছ? ও কি দোষ করেছে? আমি ত জানি যে লেবার ইউনিয়নের পয়লা নম্বর ওয়ার্কার ও!

—তুমিও যেমন, ওস্তাদ! ইউনিয়ন মানেই ত দালালীর খুপরী! সব ব্যাটা টাকা খায়। না হলে মনে করো অমন বেঈমানী করতে পারে। তুমিই বলো ওস্তাদ!

পটলার মাথাটার মধ্যে সব ঘুলিয়ে যায়। এ্যাকশন আর ইউনিয়নের বিবাদের মূল সূত্রটাই তার মগজে ঢোকে না। সে আর শুনতেও চায় না,—অনেক ত শুনে নিয়েছে। স্লো-ডাউনের পদ্ধতিটুকুই তার কাছে খুব মজাদার লেগেছে। ব্যস এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে মঙ্গলাকে এই গল্পটা করতে পারলে তবে পটলার শান্তি হবে। সে বল্‌ল—আচ্ছা মিয়াজান এখন যাই, তোমার আবার অনেক কাজ!

তমিজুদ্দিন আর একটা বিড়ি দিয়ে বল্‌ল—আরে যাবানে—। তা কি হ'ল, কাজটা তুমি করবা কি?

পটলা বল্‌ল—হুস্! ওসব হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে শেষে ফ্যাসাদে পড়ব? তার চেয়ে আমি বরং আমাদের সিনেমাতে স্লো-ডাউন চালু করি গিয়ে। ম্যানেজার হারামী বড্ড ভোগাচ্ছে। অপারেটারকে বলব, শালা খুব আস্তে যন্তর চালাবি! আর গেটের সামনে খদ্দেরদের আট্‌কে রাখবো, শুনতে পাবো না, ঢুকতে দেবো না—খুব মজা হবে। বেশ মতলব দিয়েছ মিয়াজান।

তমিজুদ্দিন মনে মনে পটলার ওপর অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে, মুখে বলে—তাহলে

এখন আসি, সালাম ওস্তাদ। মনুদিদিকে বলো খুব শীগগির যাবো একদিন। আমাদের লীডার আসছে জামালপুর থেকে। তাকেও নিয়ে যাবো, বুঝলে—

—বেশ ত!

পটলা আর দাঁড়ায় না। খামোখা বাজে কথায় বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। হয়তো মঙ্গলা না খেয়ে বসে রয়েছে। বিয়ে না করেও নিস্তার নেই পটলার— এ এক বিচিত্র অবস্থা। চল্‌তে চল্‌তে আপন মনেই সে হেসে ওঠে।

বাড়ি ফিরে পটলা অবাক হয়ে গেল, তার ঘরের দরজা খোলা। আর ঘরের মধ্যে কে ও? দাওয়াতে উঠে সে দেখল, তার ঘরে মঙ্গলা বসে আছে এলোচুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে, আর ওর পিছনে একটি অল্পবয়সী 'ছুঁড়িগোছের' মেয়ে মঙ্গলার চুলের বনে কি যেন খুঁজছে। উকুন বাছছে মেয়েটা। কিন্তু মঙ্গলা একে কোথা থেকে আমদানী করল? পটলা কিছু বল্‌বার আগেই মঙ্গলা নরম সুরে বলে—কে? পটু এসেছ? এস! আমি বলি, বুঝি এবেলা আর এলে না। তাই মন্দিরাকে ডাকলাম, মাথায় পোকা পড়েছে।

পটলা আড়চোখে মেয়েটিকে দেখছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

মঙ্গলা বল্‌ল—কি গো, চুপ মেরে গেলে যে! মন্দিরা আমাদের ঘরের লোক, বুঝলে! ওকে আমি এ ঘরেই বসাবো। হ্যাঁ, তুমি ভাই একটা ঘরটর দেখে নাও। নইলে—

পটলার মেজাজ গরম হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে কবেই সে ভুলে বসেছিল এঘর তার সম্পত্তি নয়, সে এ ঘরের ভাড়াটেও নয়, নেহাৎ মঙ্গলা দয়া করে তাড়িয়ে দেয় না বলেই আশ্রয়টুকু বজায় রয়েছে। মঙ্গলার কথার জের টেনে সে পাল্টা প্রশ্ন করে—নইলে কি করবে শুনি?

মঙ্গলা এবার ঘাড় বাঁকিয়ে পটলাকে দেখে নিল, একটু হেসে বল্‌ল—নইলে তোমাদের দু-জনকে এই ঘরেই থাকতে হবে! অসুবিধে আর কি, তোমার ত সেই রাত একটায় ঘরে ফেরা, ততক্ষণে খদ্দেরও বিদেয় হবে।

বলেই মঙ্গলা খিল-খিল ক'রে হেসে গড়িয়ে পড়ল। হাসতে হাসতেই বলল—তা তোমার আপত্তি থাকে ত পথ ভাখো ভাই। মন্দিরাকে আমি

রাখবোই, ওর মায়ের আবস্তা! রিফুজী হ'লে যা হাড়ীর হাল হয়! আহা শুনলেও চোখে জল আসে।

একটু আগে যে এই মঙ্গলাই হাসিতে ঢলে পড়েছিল এখন তা কে বলবে—চোখ মুছচে মঙ্গলা। ও সত্যিই কেঁদে ফেলেছিল। পটলার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—রাগ করলে পটু! তোমাকে জিজ্ঞেস করব সে সময় আর পেলাম কই! জোর করে ওর মা গছিয়ে দিয়ে গ্যালো কি না। আমার স্বভাব ত জানো, দুঃখু কষ্টে মানুষ হইচি, তাই পরের দুঃখ দেখলে বুকটা আন্‌চান্‌ করে ওঠে। নইলে তুমিই বা আমার কে, মন্দিরাই বা কে!

বাইরের একটা মেয়ের সামনে এইভাবে অপমান হজম করা পটলার পক্ষে মর্মান্তিক। ইচ্ছে করছে এখনই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। হয়তো তাই যেত কিন্তু মঙ্গলা আবার স্বর ঘুরিয়ে বল্‌ল—ওমা, তোমার বুঝি খাওয়া হয় নি? বসো দেখি, হাঁড়িতে হয়তো দুমুঠো পড়ে রয়েছে!

মঙ্গলা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই পটলা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে মেয়েটিকে বল্‌ল—এই খুকী এখানে কি জন্যে এইচিস্‌? গলায় দড়ি জোটে নি? যাঃ পালা!

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে মেয়েটি একবার পটলার মাংসহীন, চোয়াড়ে মুখের দিকে তাকালো।

পটলা গায়ের জামাটা খুলে পেরেকে আটকে রাখতে রাখতে খাটো গলায় বল্‌ল—বারো ভাতারী কারবারে কেন এলি! চলে যা, দামোদরে অনেক জল আছে। না পারিস, কোম্পানীর বাঙালী সায়েবদের বাড়ি আয়ার চাকরী অনেক পাবি। এখানে থাকলে মরণও হবে না, বাঁচতেও পারবি না।

সরল অসহায় চোখ দুটি মেলে দিয়ে মেয়েটি প্রায় অস্ফুট স্বরে বলে—আমি যে কিছু চিনি না।

—তবে আর কি, থাকো এই নরকে। আমার ভারি বয়ে গিয়েছে, ঘর আমি ছাড়ছি না। মন্দ হবে না হাতের কাছে থাকলে, তাজা মাংস চেখেচুখে দেখা যাবে।

মাটির দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বল্‌ল—আপনি যা হয় একটা কাজ জুটিয়ে দ্যান না!

—আমি ? হুঁঃ, আপনি খেতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।

কথাটা বলেই পটলা মেঝেতে বসে দু হাত মাথার রুখু চুলের বনে চালিয়ে দিয়ে চুলকোতে লাগলো।

মঙ্গলা হাঁক দিয়েছে—কই! অখানে বসে বসে খুব ত মস্করা হচ্ছে! বলি ও পটু—পটল—!

—এই যাই।

মঙ্গলার গলায় ঝাঁঝ—বলি পুজোর ফুলের দিকে নজর দিয়ো না পোড়ারমুখো। এসো। অনেক পয়সা খরচ হয়েছে আমার, বুঝলে—

পটলা জবাব দিল—তুইও যেমন মুংলী! আমার কি সেদিন আছে ?

বলতে বলতে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। তার আগে ঘর থেকে বেরুবার মুখে সে মন্দিরাকে সতর্ক করে দিয়ে এসেছে—খবরদার! ও মাগী যেন এসব টের না পায়। তাহলে তোমার আখের অন্ধকার। আমাকেও ঝাঁটা পেটা ক'রে তাড়াবে।

খেতে বসে পটলা আপনমনেই ভাবছিল মন্দিরার জন্যে কি ব্যবস্থা করা যায়। মেয়েটাকে দেখেই কেমন মায়া পড়ে গিয়েছে। মেয়েদের প্রতি লোভ আর লালসাই পটলার চরিত্রে স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছে। কেবলই মনে হচ্ছে, নেহাৎ গেরস্থঘরের আটপৌরে অনভিজ্ঞ বালিকা এই মন্দিরা। ওর জন্য কিছু একটা করতেই হবে। হয়ত জিলানীকে বললে সে কোনো সদুপায় বাতলে দিতে পারে। অতএব পটলা খেতে খেতেই ঠিক ক'রে ফেলল, বিকেলের ভোঁ বাজবার আগে কোম্পানীর গেটের সামনে হাজির থাকবে সে।

মঙ্গলা বলল—বাবু যে আজ বড় গম্ভীর!

—নাঃ, এখানে আর থাকবো না। তোমাকে বড় কষ্ট দেওয়া হয়।

—ও, রাগ হয়েছে বুঝি!

—তা নয়, সত্যিই ত আমি তোমার কেউ নই!

—ও মা, সে আবার কি কথা গো! তুমিই ত আমার সগ্গের সিঁড়ি, নইলে আদরে-গোবরে এতকাল পুষছি কি জন্যে, বলো।

—দ্যাখো মঙ্গলা, সব সময় খোঁটা দিলে মরা মানুষেও সইতে পারে না। যা হয় দুমুঠো খেতেই দাও, তা না দিলেই ত চুকে যায়। আমি ত তোমার কাছে চাই নি কখনো।

—আহা রাগ করো ক্যানো ভাই। সত্যি ত আর তোমাকে কিছু বলি নি! মুখের কথা কি ধরতে আছে? একটু আচার নেবে!

—দাও।

—এই ত ভালো মানুষের মতো কথা। তা বুঝলে, ছুঁড়িটা বেশ নজরসই মাল। রোজগারপাতি ভালোই হবে! সত্যি বলতে কি, আমার আর গতরে কুলোয় না।

পটলা আচার দিয়ে শেষ পাতের ভাত ক'টা খেয়ে উঠে গেল। এখনই তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে মন্দিরার একটা ব্যবস্থার জন্য। কারণ ওর নিজের ওপরও খুব ভরসা নেই—দেরী হয়ে গেলে হয়তো নিজেই মন্দিরার মায়ায় আটকা পড়ে যাবে, তখন মেয়েটাকে হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হবে না।

অষ্টআশি

শিউকিষেণ ফোরম্যান দেবজ্যোতিকে বার কয়েক বলেছে—গুরু, আভি ইউনিয়ন ছোড়কে এ্যাক্‌শন্‌মে মদৎ দিজিয়ে। ইউনিয়ন ত কম্‌জোর হো গয়া,—

দেবজ্যোতি বরাবর একই জবাব দিয়ে এসেছে—এ্যাক্‌শন বডি খুব তেজেই বেড়ে চলেছে। কিন্তু ফোরম্যান সাহেব, আমার মনে কেমন ধোঁকা লাগছে—এর পিছনে অন্য কোনো লোকের মতলব ঢুকে রয়েছে।

সেদিনও এমনি কথায় কথায় তর্ক শুরু হয়ে গেল।

শিউকিষেণ বল্‌ল—মতলব, কিস্‌কা মতলব বলিয়ে?

দেবজ্যোতি প্রথমে কথাটা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ পারল না। শিউকিষেণের সঙ্গে হেল্‌পার মাধব, ওয়্যারম্যান ইউনুস এবং আরও দু-একজন জুটে গিয়েছে। তাকে আজ এরা সহজে ছাড়বে না।

অবশেষে নিরুপায় দেবজ্যোতি বল্‌ল—আমার ওপর তোমরা রাগ করতে পারবে না। কারণ সবটাই আমার অনুমান। হয়তো ভুলচুক থাকতে পারে—

—কোই বাৎ নেহি, আপ লাগাইয়ে—

—তোমাদের মনে আছে একটা কথা? আমাদের এখানকার নতুন জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার ম্যাকডোনেল সাহেব প্রথমে এখানে পা দিয়েই বাজেট নিয়ে বলেছিল—বছরে ফালতু খরচ বলে যে সওয়া-লাখ টাকা খরচ হয় সে টাকাটা অন্যভাবে খরচ করা হোক।

মাধব অল্পবয়সী ছোক্‌রা, সে বল্‌ল—এ্যাকসন-ইউনিয়নের মধ্যে ম্যাক্‌-ডোনেল সাহেবের কথা ওঠে না।

দেবজ্যোতি হাসলো—আগে শোনো, তারপর আমার শেষ হ'লে তোমাদের কথা বলো।

—হাঁ-হাঁ, আপ বাড় যাইয়ে।

শিউকিষেণ বিড়ি ধরালো।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—ফালতু খরচটা সম্পূর্ণ মল্লিক সাহেবের হাত দিয়ে হয়। এবং এর কোনো হিসেব দাখিল করে না মল্লিক। সবাই জানে, এটা ষোলআনাই মল্লিকের গুণ্ডা পোষার খাতে ব্যয় হয়। এখন ম্যাক্‌ডোনেল বল্‌লেন গুণ্ডা বাহিনীর প্রয়োজনই হয় না, যদি শ্রমিকদের যথেষ্ট মজুরী দেওয়া হয়! আপাততঃ এই সওয়া-লাখ টাকা মজদুরদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশী কাজ দেখাতে পারবে তাদের বোনাস হিসেবে বেঁটে দেওয়া হোক। এ কথাটা হয় ১৯৫২ সালের জুন মাসে।

শিউকিষেণ বল্‌ল—হাঁ, ওই সময়ই হবে।

—তাতে মল্লিক সাহেব নারাজ হয়ে গেলেন। বল্‌লেন—গুণ্ডা ছাড়া এই ব্রুট ফোর্স, মানে অন্ধ দানবদের জব্দ রাখা যায় না। তাই নিয়ে ম্যাক্‌ডোনেলের সঙ্গে বিস্তর বচসা হয়ে গেল। ম্যাক্‌ডোনেল হচ্ছে আমাদের নতুন মালিক, মানে যে আমেরিকা আমাদের কারখানাকে আরও বাড়িয়ে প্রোডাক্‌সন মুনাফা সব বাড়িয়ে ফেলার জন্যে কোটি কোটি ডলার ধার দিয়েছে সেই আমেরিকার বহাল করা লোক। সে কেন হার মানবে মল্লিকের কাছে। আবার এদিকে মল্লিকের পোজিশানও সামান্য নয়, কারখানায় আজন্ম রাজত্ব করে আসছে সে—তাছাড়া সওয়া-লাখ টাকা সবটুকুই ত গুণ্ডাদের পেটে যায় না। মল্লিকেরও এতে ভাগ আছে।

ওয়্যারম্যান ইউনুস এবার ফোঁস করে উঠল—গুরু আপনার কথার খেই খুঁজে পাওয়া ভার।

—র'স যাই! এবার এসে গেছি। মল্লিক তখনও মগজ ঘামিয়ে চলেছেন, কি করে ম্যাকডোনেলকে ঘায়েল করা যায়! এমন সময় বারো নম্বর মিলে একটু একটু ধোঁয়া জমছে। মল্লিক চর লাগিয়ে সেটা বেশ ক'রে উস্কে দিলেন। ব্যস্, লেগে গেল! তমিজুদ্দিনের সঙ্গে আব্দুলের পুরনো প্রেম তোমরা জানো। তমিজুদ্দিন দিল সুবলের মাথা খারাপ ক'রে। তার আগে সুবলের সদ্য এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সে ক্ষেপে উঠল। তারপর এখন ত বেকার মজদুর তার প্রাণের দায়ে এ্যাকশনের জোর বাড়িয়ে চলেছে। মল্লিকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। ম্যাক-

ডোনেল সেই রাগে ছ মাসের ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেল। এখন আবার মল্লিকের গুণ্ডা-খাতে কোম্পানী টাকা ঢালছে।

মাধব বল্‌ল—আমাদের এ্যাকশনের ক্ষমতা কি কম? আর মল্লিক যে এ্যাকশনের মধ্যে তার পেটোয়া গুণ্ডা ঢুকিয়ে দিয়েছে তেমন কোনো প্রমাণ দিতে পারেন আপনি?

দেবজ্যোতি সকলের মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর শুরু করল—আমি ভাই লীডার নই, আমার মগজে পলিটিক্‌স্ ঢোকে না। তবে ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে ভেবে যা মনে হয়েছে তা বল্‌তে পারি। মল্লিকই বলো আর কোম্পানীই বলো, কথা একই। ধরা যাক কোম্পানীর কথা, কারণ কোনোদিন হয়তো মল্লিক চলে যাবে, তখনো কোম্পানী থাকবে এবং তার স্বার্থও থাকবে। এখন, কোম্পানী বুঝেছে যে, মজদুরের সংগঠন যদি নিখুঁত হয়, সমস্ত শ্রমিক যদি একতায় জোট বাঁধে তাহলে সেই সংস্থার প্রচণ্ড ক্ষমতা দাঁড়িয়ে যাবে। আর সরকারের যা আইনকানুন তৈরী হচ্ছে, তাতে বেশি দিন ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতাশালী শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখা যাবে না। সেক্ষেত্রে যদি মজদুরের একতাকে দু-টুক্‌রো ক'রে ফেলা যায়, তাহলে শ্রমিকেরা নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি ক'রে শক্তি নষ্ট করবে! তাদের নিজেদের ঝগড়া নিয়ে মেতে থাকলে কোম্পানীর সর্বৈব সুবিধে। বুঝে ছাখো, আমাদের এখানেও সেই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ইউনিয়নকে এ্যাক্‌শনবালারা গালিগালাজ দিচ্ছে, তেমন-তেমন অবস্থায় দাঙ্গাও করছে উভয় পক্ষ। আর দূরে দাঁড়িয়ে মালিকেরা মজা দেখছে।

শিউকিষেণ বল্‌ল—গুরু, রাগ না করো তো একটা বাৎ বলি!

—বলো।

—ইউনিয়ন ত পচে গেছে। কৈঁউ কি, আজ অবধি আমাদের কোনো মাঙ্গ-কে আদায় করতে পারল না। ওই শালা গোমেজটা দালাল আছে জরুর। এখন ওটাকে বাতিল ক'রে আমরা নয়া সংগঠন বানিয়ে ফেলেছি, করিব্‌ ন হাজার মেম্বারও হয়ে গেছে। আমার কথা কি, তোমার মতো মুখিয়া আদমি আগর এ্যাক্‌শনের মেম্বর বনে যায় আজ, ত কাল দু হাজার ঢাই হাজার নয়া মেম্বার সামিল হবে এ্যাকশনে।

দেবজ্যোতি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌ল—আচ্ছা ভেবে দেখি। আমার কথা কি জানো, মজদুরের অবস্থা এমনিতেই ভালো নয়। মালিকের হাতে টাকা আছে, পুলিস আছে, তার সঙ্গে লড়াই করতে হলে মজদুর একাট্‌ঠা হওয়া জরুর দরকার। নইলে আমাদের দলাদলিই সর্বনাশের মূল হবে।

ইউসুফ হাতের পেশী ফুলিয়ে হাঁক দিয়ে উঠ্‌ল—আমরা ইউনিয়ন দখল করব। আরে ওতো ছোট কথা! গোমেজ শালা রিজাইন করলেই, দফারফা ইউনিয়নের। তখন ত কায়েম হবে এ্যাকশন বডির জমানা।

—তা যদি করতে পারো, মানে, আমাদের একটিই সংগঠন থাকবে—তার নিশানের তলায় তামাম মানিকপুরের মজদুর শামিল হবে, এমন হ'লেই হ'ল। আমার কথা হ'ল, কাজ করতে হবে—দলাদলি নয়!

—ব্যস, এ তো খাশ বাৎ ভাই।

ব'লে শিউকিষেণ দেবজ্যোতির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

কথাটা রাষ্ট্র হ'তে আদৌ সময় লাগে নি। তার প্রমাণ দেবজ্যোতি ছুটির পর গেটের সামনেই পেল। রামকিষণ শর্মা, রামঅওতার, জিলানী সকলেই জটলা করছিল, তাকে আসতে দেখে সবাই থেমে যায়। আরও কাছে আসতে রামঅওতার এগিয়ে এসে তার হাত ধরল—ক্যা গুরু, ইয়ে বাৎ ঝুটা হ্যায় ত?

দেবজ্যোতি প্রশ্ন করে—কৌন বাৎ?

—এই যে শুনছি, তুমি এ্যাক্‌শনে নাম দিয়েছ? আমি ত জিলানীর মুখে শুনে উড়িয়েই দিলাম। কিন্তু আরও দশবারো জন যখন বল্‌ল, তখন সন্দেহ হ'ল। কি জানি, এ্যাক্‌শনবালারা সব পারে, হয়তো তোমার নাম ভাঙিয়ে দু-পাঁচশো লোককে দলে ভিড়িয়ে নিচ্ছে!

দেবজ্যোতি রামঅওতারের মুখের দিকে তাকালো, বল্‌ল—আমি এ্যাক্‌শনে যোগ দেবো বলেছি।

—ইউনিয়ন ছেড়ে দেবে তুমি?

—আরও ন হাজার ত ছেড়েছে বুঢ্‌ঢাউ, আমি তার ওপর মাত্র একটি যোগ দিলাম। আমার মনে হয়, একটা সংগঠনই মজদুরের থাকুক—যদি—

তার কথা শেষ হবার আগেই রামঅওতার বাধা দিয়ে বল্‌ল—তোমার কথা খুব খাঁটী। কিন্তু ইউনিয়ন, যে ইউনিয়ন বারী সাহেব গড়ে দিয়ে গেলেন সেটা আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারবো না! ভাবা যায় না, গুরু। ছাখো দেখি, আমি বুড়ো বয়সে কী গালিগালাজ খেয়েছি, কতো অপমান হজম করেছি—কার জন্যে, বলো! সংগঠনকে নিজের চেয়ে বড়ো ভাবি, ভালোবাসি, তাই না আজও, যারা আমাকে দ'লে পিষে মারতে চেয়েছিল, তাদেরই সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইউনিয়নের ঝাণ্ডা উঁচা রাখতে কৌশিস করছি। আর, তুমি আমাদের ত্যাগ করতে চাও—

চল্‌তে চল্‌তে দেবজ্যোতি বল্‌ল—মান অভিমানের কথা নয় বুঢ়াউ, এর মধ্যে লেবারের ভবিষ্যৎ ভাগ্য জড়ানো রয়েছে। আমি অনেক ভেবেছি, কিন্তু এ ছাড়া পথ কিছু নেই দেখেই এদিকে পা বাড়িয়েছি। এখন আমাকে বাধা দিয়ে লাভ হবে না। এটুকু জেনো, কারুর কথায় আমি মত পাণ্টাই না,—তবে এও ঠিক যে, যদি বুঝি, এ্যাক্‌শনে ঢুকে ভুল করেছি, তখনও, আজকের মতই সহজে শুধ্‌রে নেবার চেষ্টা করবো।

রামকিষণ শর্মা মুখের বিড়িটা ফেলে দিয়ে বল্‌ল—লেকিন, গুরু কাজটা ভালো হচ্ছে না।

হাসলো দেবজ্যোতি। একবার জিলানীর দিকে তাকালো,—জিলানী একটিও কথা বলে নি এতক্ষণের মধ্যে। তার দিকে তাকাতেই সে মুখ নামিয়ে নিল।

এ্যাক্‌শন আর ইউনিয়নে বিপদটা বিষম আকার ধারণ করল। দিনে দিনে ইউনিয়ন ভেঙে মজদুরেরা এ্যাক্‌শনে নাম লেখাচ্ছে! দশ, এগারো, বারো হাজার—প্রতি দিনই সংখ্যায় ক্ষমতাশালী হচ্ছে এ্যাক্‌শন। সেই সঙ্গে ইউনিয়নের সমর্থকদের দুর্দশা বাড়ছে। প্রকাশ্য পথে এ্যাক্‌শনের উৎসাহী কর্মীরা রামকিষণ সিং-এর গায়ে থুথু দিল, কিম্বা জিলানীকে সাইকেল থেকে নামিয়ে তার গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা ঝুলিয়ে, বাজারময় ঘুরে বেড়ালো শোভাযাত্রা ক'রে—এই পর্যায়ে পৌছলো আকচা-আকচি! গোমেজ সাহেব সভাপতিত্বে ইস্তফা দিয়ে বসলেন।

ওদিকে কর্তৃপক্ষ অবশ্য হাত গুটিয়ে বসে নেই। তাঁদের তরফ থেকে মীমাংসার আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। প্রথমে কোম্পানীর কর্তারা আপোস আলোচনার জন্য এ্যাক্‌শনের পাণ্ডাদের ডাকলেন। তারা ঝেড়ে জবাব দিল—আগে আমাদের লীডারদের জেল থেকে মুক্তি দিতে হবে। আর ওই সাথে তিনশো বেকারকে কাজে বহাল করতে হবে, তবে আপোসের কথা শুরু হতে পারে, তার আগে নয়।

কলকাতা থেকে এ'লেন লেবার কমিশনার। তাঁকেও এ্যাক্‌শনের তরফ থেকে একই উত্তর দেওয়া হ'ল। রাজনৈতিক দলের শ্রমিক নেতাদের আনা-গোনা বেড়েই চলেছে। কোন্ দল নেতৃত্ব বাগিয়ে নেবে সেই রেশারেশি চলছে হরদম। এখনও আসন শূন্য। কোনো নেতাকে এ্যাক্‌শন কমিটি আমন্ত্রণ ক'রে তার হাতে সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেয় নি। কার্যকরী কমিটি তৈরী হয়েছে—কমিটির প্রত্যেক সভাই কারখানার শ্রমিক।

কিন্তু এ ভাবে বেশি দিন চল্‌বে না, সবাই বুঝতে পারে। শীগ্‌গির একজন লীডার চাই—যে নাকি সংগঠনের হয়ে বক্তৃতা দিতে পারবে, সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতে পারবে, এমন লোক না-হলে কাজ চল্‌বে কি করে!

তমিজুদ্দিনের সাগরেদদের ইচ্ছে, আব্দুল বারি সাহেবের পুত্র সালাউদ্দীন বারিকে এ্যাক্‌শনের চেয়ারম্যান করা হোক। সুবল দস্তিদারের পার্শ্বচরদের মত কমিউনিস্ট কোনো নেতা ছাড়া আর কেউ এই গুরুত্বপূর্ণ 'পরিস্থিতিকে' সাফল্যমণ্ডিত করতে পারবে না। আরও দুটো ভাগ রয়েছে, এক দল বল্‌ছে কোনো প্রজা সোস্যালিস্ট নেতাকে আনো, বাকী যারা তারা বল্‌ছে ওসব নয়, গোয়েঙ্কের সঙ্গে যার ঝগড়া আছে এমন কোনো লোক বেছে নেওয়াই ভালো—কেন রামপদরথ বর্মা (ওরফে ভার্মা সাহেব) হচ্ছেন এদিক দিয়ে যোগ্যতম লোক।

প্রথমে এই সমস্যাটা প্রকট হয়ে ওঠে নি।

যেদিন কারখানা-শহরে একশ চুয়াল্লিশ ধারা আবার জারি হ'ল সেদিনেই এ্যাক্‌শন বডির লোকেরা জিপ্‌গাড়ি হাঁকিয়ে চোঙ লাগিয়ে তামাম শহরের পথে পথে হেঁকে গেল—ভাইসব, কাল বিকেল চারটেতে কারখানার এক নম্বর

গেট থেকে মজদুরদের এক মিছিল বেরুবে। মিছিল মানিকপুর চক্কর দেবে—এ্যাক্‌শন বডির দাবি জনতার কাছে পৌঁছানো হবে। আর কোম্পানীর দুষমণীর প্রতিবাদ জানাবে এই মিছিল।…'আপলোগ শামিল হো যাইয়ে—!'

মিছিল বেরুলো একশ চুয়াল্লিশ ধারা অগ্রাহ্য ক'রে। পুলিস কি ক'রবে! শুধু মানিকপুর নয়, দূরদূরান্তর থেকে শ্রমিক আন্দোলনকে জয়যুক্ত করবার শুভেচ্ছা নিয়ে আরও বিভিন্ন কারখানার বিস্তর শ্রমিক এসে শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছে। কেবল শ্রমিকই নয়, ছাত্ররাও ভিড়ে গিয়েছে। মিছিলের অগ্রবর্তী পতাকাবাহীরা যখন কারখানার এক নম্বর গেটের সাম্‌নে, তখন পিছনের দিকে তাকিয়ে শেষ সারিটা দেখা যাচ্ছে না। কেউ বল্‌ল আধ মাইল লম্বা হবে, কেউ আন্দাজ করল পঞ্চাশ হাজার লোক এতে যোগ দিয়েছে। এই বিরাট জনতার সামনে মানিকপুরের সামান্য পুলিসবাহিনী দাঁড়াবে কি ক'রে!

শিউকিষেণকে দেবজ্যোতি বলেছিল—মিছিল ত বার করলে। তারপর?

ফোড়ন দেওয়া মাধবের অভ্যেস, সে বল্‌ল—তারপর আর কি! লোকে টের পাক্ এ্যাক্‌শনের হিম্মৎখানা! বুঝুক ওই শালা কুত্তারা যে, আমরা দালালীর জোরে টিকে নেই, দস্তুরমতো আপন মুঠোর দৌলতে জিতে নেবো!

দেবজ্যোতি বল্‌ল—তা নয়, আমি বলছি কি, আজই চলো সোজা ইউনিয়ন অফিস দখল করি আমরা!

শিউকিষেণ হেসে উঠল—উসমে ক্যা ফায়দা উঠেগা গুরু!

উত্তেজিত দেবজ্যোতি চল্‌তে চল্‌তে হাতের মুঠো শক্ত ক'রে জবাব দেয়—তাহলে সংগঠন একই থাকবে। দুটো পার্টি আর থাকবে না!

আশপাশে আরও দু-একজন মাতব্বর ছিল, তারা তাচ্ছিল্যভরে বল্‌ল—মিছিল হচ্ছে মিছিল হোক। ইউনিয়ন আপিসের সামনে দিয়ে গেলেই জুজুর ভয়ে ওই ইঁদুরগুলো গর্তে মুখ ঢুকিয়ে পালাবে। না, না, আপিস-টাপিস দখল করা একটা কাজের কথাই নয়।

কারখানার উদ্ধত, উঁচু চিম্‌নীটা আজ উপেক্ষিত। জনতা পথে পথে হাজার-হাজার কণ্ঠের ক্ষুব্ধ, উচ্চ ধ্বনি তুলে ঘণ্টা তিনেক ঘুরে ঘুরে শেষে বারি ময়দানে জমায়েৎ হ'ল। সেখান থেকে যে যার বাড়ি রওনা হ'ল। পুলিসের লরীগুলো

সব শেষে থানায় ফিরে গেল। আর এই উত্তেজনার অব্যবহিত প্রতিফল স্বরূপ রামঅওতারের মাথায় 'কে বা কাহারা' পিছন দিক থেকে লোহার ডাণ্ডা মেরে ফাটিয়ে দিয়ে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। পথের ওপর সে যে কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল তা কেউ বল্‌তে পারে না। পথেরই লোকে তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে। অবশ্য যারা পৌঁছে দিয়েছে তারাই যে আহত রামঅওতারকে প্রথম দেখেছে তা নয়—এ্যাক্‌শন বডির সমর্থক যারা তারা দেখেছে এবং মৃদু হেসে আপন পথে চলে গিয়েছে। শেষে যারা হাসপাতালে পৌঁছে দিল তারাও এ্যাক্‌শনেরই সভ্য, হয়তো ততো উগ্রপন্থী নয়! হ্যাঁ, এ্যাক্‌শনের সভ্য এমন অনেকই আছে, যারা ঝগড়া বিবাদের মধ্যে নিজেকে জড়াতে চায় না, শুধু প্রতিবেশী বা সহকর্মীদের দাপটে পড়েই এ্যাক্‌শনে নাম দিয়েছে। এরকম সভ্যের সংখ্যা খুব অল্প নয়।

উননব্বই

সীতানাথ লিখছেন বৃন্দাবন থেকে : বাপাজীবন, পরে অনেকদিন গত হয় তোমাদিগের কুশলাভাবে বড়ই চিন্তিতাছি। সংবাদপত্রে দেখিলাম, মানিক পুরে ভারি হাঙ্গামহুজ্জত চলিতেছে। তাহাতে বৈষ্ণবীও ভাবিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ভাইপো বারো নম্বর মিলে খালাসীর কর্ম করে।—বাপাজী। বৈষ্ণবী এতই উদ্বিগ্ন যে, তাহার সাধনভজন পর্যন্ত বন্ধ হইল। তাই লিখি যে, ভাইপোকে একটু দেখিয়ো। আর তোমার কথা কি লিখিব, রামঅবতার সিংহ যখন জখম হইয়াছে তখন তুমি হাত পা গুটাইয়া বসিয়া নাই বুঝিতেছি। বাপাজী, জীবনে রাধাকৃষ্ণই একমাত্র ভরসা, সবই তাঁর লীলা। তবু আমি তোমার পিতা, হাজার হোক গুরুজন—তাই পুনঃপুনঃ আদেশ করিতেছি, এমতাবস্থায় গোলমাল হইতে দূরে সরিয়া থাকিও। এক্ষণে তোমার দায়িত্ব অনেক, বধূমাতা এবং নবকুমার ভায়ার কথা ভাবিতে হইবে। তাহার উপর তোমার শ্বশুরের অনূঢ়া কন্যা, নাবালকতুল্য পুত্র (যাহাদের তুমি নিজের বোন-বাপের চেয়ে আপন করিয়া দেখ) সবই তোমার ঘাড়ে! যাই হোক, পত্রোত্তরে সবিশেষ লিখিবা। বৈষ্ণবী যেরূপ উতলা হইয়াছে তাহাতে হয়তো রাধাকৃষ্ণের চরণ-যুগল শীঘ্রই ছাড়িয়া মানিকপুরে ফিরিতে হইবে। অবশ্য ভাইপোর ভার যদি তুমি গ্রহণ করো তবেই ঈশ্বরেচ্ছায় এখানে ঠাকুরের শ্রীচরণে পড়িয়া থাকিতে পাই। ইতি—

নিয়ত আশীর্বাদক
সীতানাথ শর্মনঃ

চিঠিখানা পড়েই দীপু খুব একচোট হেসে নিল। তারপর দিদির হাতে পোষ্ট-কার্ডখানা দিয়ে বল্‌ল,—তোমার শ্বশুর মহাশয়ের পত্র। ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি হয়ত মানিকপুরে এসে পড়ছেন। বুঝলে দিদি, আর ভাবনা নেই।

তাই নাকি! বেশ ত, ভালোই হবে। আমি তাহলে শ্বশুরবাড়ি যেতে

পারি বাবা! এ সংসারের আর দুর্ভোগ পোয়াতে হয় না। খানিকটা শ্বশুর-সেবার পুণ্যিও হয়ে যাবে!

কথাগুলো মোটেই কথার কথা নয়, তা দীপুও বোঝে। সম্প্রতি এ্যাক্‌শন বডি আর ইউনিয়ন নিয়ে ঘরে ঘরে অশান্তি চল্‌ছে। বাদল খুব চটেছে দেবজ্যোতির ওপর। সাম্‌নাসাম্‌নি এ নিয়ে তেমন কোনো অপ্রীতির স্বষ্টি না হ'লেও, গুমোট জমেছে বিস্তর। দেবজ্যোতি যখন বাড়ী থাকে না, এবং বাদল থাকে, তখনই সে দিদির কাছে এ্যাক্‌শন বডির মহিমা কাহিনী শোনাতে বসে। মিণ্টু কখনও বা মুখ বুজে শোনে, কখনো প্রসঙ্গটা বন্ধ করবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এতে বাদল আরও বিরক্ত হয়। আর দীপু নিজেও এ্যাক্‌শন বডির পক্ষপাতী। তাই দেবজ্যোতি যখন ইউনিয়ন ছেড়ে এ্যাকশনে যোগ দিয়েছিল তখন দীপু বাদল দু'জনেই উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ওদের সে উৎসাহকে ভরাগাঙে ডুবিয়ে দিয়েছে দেবজ্যোতি পুনরায় দল বদল করে। আবার সে এই দিন তিনেক হ'ল এ্যাকশনওয়ালাদের সঙ্গে ঝগড়া করে ইউনিয়নে ফিরে গিয়েছে। কাজটা মিণ্টুর মতে সমুচিতই হয়েছে। রামঅওতারের মতো মানুষকে যারা মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করে তারা মিণ্টুর চোখে অমানুষ ছাড়া বেশি কিছু নয়।...সেইদিন থেকেই এই বাড়ীতে অশান্তি শুরু হয়েছে। কাজেই, এখন যে যা কথাই বলুক না কেন সে কথাকে অপরে বেশ ওজন ক'রেই দেখে থাকে।

দিদির কথায় দীপুর মুখখানা রীতিমত গম্ভীর হয়ে ওঠে। ও ঢোক গিলে আস্তে আস্তে বল্‌লে—তাহলে তাহে মশাই মিথ্যে লেখেন নি!

মিণ্টু বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে—কি? মিথ্যে, সত্যি এসব কথার মানে কি রে?

—দ্যাখো না, চিঠি পড়লেই বুঝবে! উনি একাই মনে করেন না তোমাদেরও হয়তো সেই ধারণা!

—দ্যাখ দীপু সব সময় হেঁয়ালী ভালো লাগে না।

—হেঁয়ালী আবার কোথায়—জলের মতো পরিষ্কার, আমরা দু' ভাইবোন তোমাদের গলগ্রহ!

মিণ্টু হাসলো, ও বল্‌ল—তুই কি কোঁদল করবি নাকি কোমর বেঁধে? আমার ভাই অত ক্ষমতা নেই—

—ঝগড়া না ক'রেও ত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা যায়!

মিণ্টু বল্‌ল—তোর নয় ইস্কুলের ছুটি রয়েছে, আমার সংসারে ত ছুটি নেই। কাজগুলো সারবো, না, তোর বাঁকা বাঁকা কথা শুনবো? যা, এখন দিক্‌ করিস নে, খোকনকে চানটান করিয়ে দে। রোদ গড়িয়ে গেছে, এখন ভোঁ বাজলেই ওরা হাজির হবে। ওঁকে দেখলে ত ছেলের আর দিশে থাকে না, বাপের সঙ্গে বসে খেতে চাইবে।

তখনও সীতানাথের চিঠিখানা মিণ্টু পড়ে নি, কাজেই দীপুর কথার খোঁচ-গুলো ধরতে পারে নি। তরকারীতে জল ঢেলে দিয়ে শ্বশুরের চিঠি পড়তে বসল। এবং একটু পরে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তরকারীতে নুন দিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। দীনদয়াল যে ঘরে থাকতেন এখন সেটাই মিণ্টুর ঘর। দীপু দিদির কথামতো কাজ কিছুই করে নি, সাপ্তাহিক কাগজের সিনেমা বিভাগ পড়তে ও ব্যস্ত। দিদিকে দেখেও মুখ তুলল না। মিণ্টুও গম্ভীরভাবে ছেলের হাত ধরল, —চলো খোকন চান করবে!

খোকন তখন এক মনে খেলা করছিল, হঠাৎ বাধা পেয়ে চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করল।

মিণ্টু বিরক্তিভরা চাপা গলায় বলে—আঃ, জ্বালিয়ো না! নিজের গু-মূত গায়ে মাখতে ঘেন্না করে না? ছি-ছি-ছি—সারা গায়েই লেপে বসে আছিস!

দিদির কথায় দীপু মুখ তুল্‌ল। চোখের ওপর যে দৃশ্য দেখল তাতে হাসি চেপে রাখা শক্ত, হেসেও ফেল্‌ল দীপু। পরক্ষণে বল্‌ল—তুমি যাও দিদি, ওকে আমি নাইয়ে ধুইয়ে দিচ্ছি!

দীপু এগিয়ে হাত বাড়ালো, কিন্তু মিণ্টুর মেজাজ ততক্ষণে তিক্ত হয়ে উঠেছে। শ্বশুরের চিঠি, বোনের কথা, ছেলের অভব্যতা, সব কিছুই এই বিরক্তিকে সহায়তা করেছে। দীপুর হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, ছেলের ডানা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে যেতে মিণ্টু বল্‌ল—থাক, আর আদি-খ্যেতা করতে হবে না।

নিজের ব্যবহারে দীপু খুব লজ্জিত। কিন্তু ছেলেটা যে এরকম অঘটন ঘটিয়ে বসে থাকবে তা কি দীপু জানতো? নাকি চোখের ওপর ওকে নোংরা ঘাঁটতে দেখলে দীপু সরিয়ে নিত না?

ছেলেটা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে। আর তার মা নির্মমভাবে তার গায়ে সাবান ঘষছে। দীপু বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছে সবই, দু-একবার ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদের চেষ্টাও করেছে—যদিও বেশ ভালো ক'রেই জানে যে এতে কোনো লাভ নেই। মিণ্টুর আজকাল শরীর ভালো নেই, আবার ছেলেপুলে হবে—হয়তো সেই কারণেও মেজাজ খিটখিটে হয়ে উঠেছে।

সাড়ে এগারোটার ভোঁ বাজার আওয়াজে খোকন হাততালি দিয়ে উঠল—মা, বাবা! বাবা—মা—!

কোথায় গেল কান্নার দাপট, নিমেষে খুশি হয়ে খোকন সাবানমাখা গায়েই মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল—মা—বাবা—মা—

মিণ্টু তাকে নামিয়ে দিয়ে বলে—হ্যাঁ,-হ্যাঁ হয়েছে! বাবা আর কারুর হয় না! এখন নাও, ওদিকে তরকারীটা ধরে না গেলে বাঁচি।

দীপু চট ক'রে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, তরকারী শুকিয়ে চর্‌-চর্‌ করছে। কড়াটা নামিয়ে রেখে ওখান থেকেই হেঁকে বল্‌ল—দিদি উনুনে কি বসাবো?

মিণ্টু জবাব দিল—জল বসাতে হবে, আমি যাচ্ছি।

খেতে বসে চিঠির কথা উঠল। এখন দেবজ্যোতিরও জেনারেল ডিউটি, কাজেই বাদল আর সে একসঙ্গেই খেতে বসে।

কথাটা তুলেছে মিণ্টু—জ্যাঠামশাই এক-একটা কথা লেখেন যার কোনো মানে হয় না। অথচ তাই নিয়ে তোমার শালা-শালীদের গায়ে ছ্যাঁকা লাগে। আজকাল ওরা বড় হয়েছে, বেশি বোঝে—

—কি, হ'ল কি?

দেবজ্যোতি মুখ তুলল।

মিণ্টু গম্ভীর [illegible] বলল—চিঠিখানা তুমিও তো পড়েছ। ছাখো নি, কি লিখেছেন—

হাসতে হাসতে দেবজ্যোতি জবাব দেয়—আরে হ্যাঁ, আচ্ছা কাণ্ড—

বৈষ্ণবীর ভাইপোকে যে আমি দেখবো, তার নামটা যে কি সেটা ত লিখতে হয়! বুড়ো বয়সে লোকটার ভীমরতি ধরেছে।

বাধা দিয়ে মিণ্টু বলে—না, সেকথা নয়। ওই যে লিখেছেন না তোমার শ্বশুরের পুত্রকন্যা তোমার ঘাড়ে বসে খাচ্ছে, তাদের তুমি নিজের সহোদরাদের চেয়ে আপন ভাবো!

মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে দেবজ্যোতি বাদলের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—বাঃ, তা কেন হ'তে যাবে, বাদলও রোজগার করে, দীপুও আমার চেয়ে কম আয় করে না। আরে বাবার কথা কি ধরতে আছে—তুমিও যেমন!

—তুমি নয় ধরলে না। কিন্তু ধরবার লোকের অভাব কি? এই যে দীপু ফোঁস করে উঠল।

বাদল ধমকের ভঙ্গীতে বলে—তুই থাম দিদি! আর ছুটো ভাত দে—

মিণ্টু উঠে যেতেই বাদল দেবজ্যোতিকে উদ্দেশ করে বল্লে—তা নয়, অন্য কথা দেবুদা!

—কি?

—আপনাকে বল্‌বো?

দেবজ্যোতি হেসে বলে—কি বলবে জানি। ইউনিয়ন—

—হ্যাঁ! আমাদের সেকশনে সবাই যা-তা বল্‌ছে। আমিও নাকি তলে তলে ইউনিয়নের মধ্যে রয়েছি। তা ওদেরই বা দোষ কি—বল্‌তেই পারে।

—বললেই বা, তোমার তাতে কি এসে যায়?

—বাঃ, এসে যায় না? দস্তুরমতো আপত্তি আছে এতে। আমি ওরকম দু-নৌকোয় দুলতে চাই নে।

মিণ্টু ভাত দিয়ে বাদলকে বলে—আর একটু ঝোল নিবি?

—না।

—ভাত কটা কি দিয়ে খাবি রে?

দিদির কথার জবাব না দিয়ে দেবজ্যোতিকে সে বলে—আমি একটা প্রিন্সিপ্‌ল্ নিয়ে চলি। সেখানে কোনো রকম কম্প্রোমাইজ চলে না।

দেবজ্যোতি খেতে খেতেই জবাব দিল—বেশ তো বলো না তোমার কথা। তাতে কেউ বাধা দেয় নি।

ওদের খাওয়া শেষ হলেও কথা শেষ হয় না। বাদল বারবার বলতে চায় যে এ্যাক্‌শন বডি ঠিক পথেই চল্‌ছে—আর যদি ঠিক পথে না-ও চলে তবু সে যখন একবারও দলে ঢুকেছে তখন সে বরাবর এ্যাকশনকেই সমর্থন ক'রে যাবে। আর দেবজ্যোতির প্রতিপাদ্য হচ্ছে অন্য রকম—সে বল্‌ছে, যেহেতু শ্রমিকের স্বার্থের খাতিরেই শ্রমিকসংস্থা সেহেতু প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে সততার। যদি কোনো সংস্থা কেবল দলাদলি করতেই ব্যস্ত থাকে তবে তার আসল উদ্দেশ্যটাই বরবাদ হয়ে গেল যে! সে যে এ্যাকশনে যোগ দিয়েছিল তার প্রধান কারণই সে চেয়েছিল যে শ্রমিক স্বার্থকে জয়যুক্ত করার জন্য একটিমাত্র সংস্থাই টিকে থাকুক। কিন্তু এ্যাকশন বডির গতিবিধি থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, তার প্রধান লক্ষ্য ইউনিয়নের সঙ্গে ঝগড়া পাকানো। নইলে ইউনিয়নের মুখিয়াদের উপর হিংসামূলক আচরণ করার আর কি যুক্তি থাকতে পারে!

বাদল বল্‌ল—বাঃ, মানুষ ত দেবতা নয়! তার শরীরে রাগঝাল, ভালোবাসা, দুঃখ, সুখ সবই থাকবে ত! যদি ইউনিয়নের লোকের ওপর আমার তেমন রাগ থাকে ত তার মাথা ফাটিয়ে দিতে পারি বই কি! সেটা অন্যায় হতে পারে, তবে অস্বাভাবিক ত নয়!

দেবজ্যোতির চোখমুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

বাদল বল্‌ল—কি, চুপ করে গেলেন কেন?

—তোমার এ কথার জবাব হয় না বাদল!

বাদল খুব বিস্মিত হয়েছে, দেবজ্যোতির মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে সে তাকিয়ে থাকল কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলো না। আবার সে প্রশ্ন করে—আপনি কি রেগে গেলেন নাকি?

—না, রাগ নয়। খুব দুঃখিত হয়েছি। যাক, আর নয়—এবার তৈরী হতে হবে। সময় নেই।

দীপু আর মিণ্টু একসঙ্গেই খেতে বসেছে। খোকনকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা ক'রে পরাস্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে দীপু। এখন সে আল্না থেকে টেনে টেনে সমস্ত জামা-কাপড় নামিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে পরমানন্দে তার ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে, মাঝে মাছে অকারণ পুলকে গলা ছেড়ে 'ভোঁ-ও-ও-ওঃ' শব্দ করছে। কারখানার বাঁশীর আওয়াজের অনুকরণ।

দিদির মনের মেঘটুকু কাটাবার উপায় খুঁজছে দীপু। রান্নার সুখ্যাতি, ছেলের দুষ্টুমীর তারিফ—কোনো কিছুতেই সুবিধা হচ্ছে না দেখে দীপু প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েই শেষ চেষ্টা হিসেবে বাদলের নিন্দে শুরু করল—আজকাল বাদলটা কিরকম মুখে মুখে তর্ক করতে শিখেছে দেখেছো দিদি!

মিণ্টু প্রথমে আমল দিতে চাই নি, মুখ বুজে শুনেই যাচ্ছিল। দীপু কিন্তু অল্প কথায় থামল না। বলেই চল্‌ল—যাই বলো; দেবুদার সঙ্গে এরকম মুখোমুখি করা কিন্তু আমার ভালো লাগে নি। কি দরকার বাপু—

এবার মিণ্টু চুপ করে থাকতে পারে না, বলে—আজকাল ত এরকমই হচ্ছে ভাই, নইলে যে রামঅওতারের চেষ্টায় কোম্পানীর কাছ থেকে দশ হাজার টাকা খেসারৎ আদায় হচ্ছে, যার দৌলতে আজও তুই বাবু কোয়ার্টারে তোফা আরামে রয়েছিস—সে হ'ল দালাল! তার মাথা ফাটানো খুব উচিত কাজ হয়েছে ব'লে বড়াই করিস! গায়ে মানুষের চামড়া থাকলে এমন অবিচার কেউ বরদাস্ত করতে পারে?

—তা যা বলেছ।

—আমার বলা না বলাতে আর কার কি এসে যাচ্ছে? তুমি কি মনে করো যে বাদলই মন্দ, তুমি খুব ভালো?

অতর্কিত আক্রমণে দীপু প্রথমে বেসামাল হয়ে যায়, কিন্তু সেটা মিনিট খানেকের মধ্যেই শুধরে নিয়ে বলে—বাঃ, তা আবার কখন বলেছি? আমার ত সবই দোষ, তবে ওরকম মুখফোঁড় আমি নই!

মিণ্টু হেসে ফেল্‌ল, আর গম্ভীর হয়ে থাকা যায় না। হাসতে হাসতেই বল্‌ল—খুব হয়েছে। এবার কিন্তু তোমরা নিজের নিজের গুছিয়ে নাও, আমি আর পারছি না। সত্যি, চিরকাল ত এইভাবে চল্‌তে পারে না!

দীপুর যেন সন্দেহ হয়, দিদি মোটেই লঘুভাবে কথাগুলো বলছে না। এর মধ্যে যথার্থই একটা সংকল্পের ছায়া রয়েছে। তবু, ও বলল—আমাদের ওপর রাগ করলে দিদি?

—না রে, রাগের কথাই নয়। আজকাল উনি যে রকম পরের মুখ না চেয়ে চল্‌তে শুরু করেছেন তাতে কারুর সঙ্গে খুব বেশি দিন বনিয়ে চলা শক্ত। আর, কেনই বা সবাই সব সময় ওঁকে মেনে চল্‌বে! তা ছাড়া, অম্লান ত বলেছে কজ্জলীর বিয়ের পরই ও বিয়ে করবে—ওর জন্যে পাত্তরও প্রায় ঠিক হয়ে গেছে।

—তার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক? কজ্জলীর বিয়ে হোক, অম্লানের বিয়ে হতে বাধা নেই, কিন্তু—

—কিন্তু আবার কি? অম্লানকে তুইও ভালোবাসিস, আর ও-বাড়ির সবাই তোকে পছন্দই করে।

—সবাই ত আর বিয়ে করবে না!

—আহা, ন্যাকামী রাখ! যার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা—সে তো আগেই—

—থামো দিদি, যা জানো না তা নিয়ে কথা বল্‌তে এসো না। ওরা বড়লোক, ওদের সবই শোভা পায়।

মিণ্টু বোনের মুখের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—কি হয়েছে রে দীপু? কই, তুই ত সেরকম কিছু বলিস নি!

দীপু ঘাড় হেঁট ক'রে থালার ওপর আঙ্গুল দিয়ে রেখা টানে। মিণ্টুর অনুরোধ-উৎপীড়নে বিপর্যস্ত হয়ে শেষে বলে—আমাকে একটু সামলে নিতে সময় দাও। বল্‌ব, তবে এক্ষুনি নয়—আর সবটুকু বলাও যায় না!

মিণ্টু স্তম্ভিত হয়ে গেল বোনের এ কথায়। নিমেষে দীপু যেন গম্ভীর রহস্যের আড়ালে নিজেকে ঢেকে ফেলেছে, মাত্র ক'টি কথা ছড়িয়ে! অথচ একটু আগেও মিণ্টুর বিশ্বাস ছিল, দীপুকে ও চেনে। আর এখন মনে হচ্ছে দীপুর-মধ্যে অনেক অজানা-সঞ্চয় রয়েছে!

হাসপাতাল থেকে রামঅওতারকে দেখে দেবজ্যোতি ফিরতেই বাদল বলল—সিংজী কেমন আছেন?

—ভালোই। মাথায় টুপীটা থাকার জন্যেই হয়তো চোটটা কিছু কম লেগেছে। তোমার ব্রাদাররা একটুর জন্যে মনুষ্যত্বকে কায়েম করতে পারল না, এই যা আপসোস!

—আপনি কি মনে করেন যে রামঅওতার একটাই আছে মানিকপুরে—ওরকম দালালের অভাব নেই। ক' জনকে আর খুন করা যায়! যাক, এবার আর ভাবনা নেই, রামপদরথজী রাজী হয়েছেন, এখানে আসতে। অবিশ্যি ওঁর সময় বড় কম, ভীষণ কাজের চাপ—তবু লেবারের জন্যে তিনি মদৎ দিতে চেষ্টাও করবেন বলেছেন!

দেবজ্যোতি হাসলো—তা ভালোই হবে, তোমাদের যোগ্য লীডার জুটেছে বটে! সত্যি কথা বলতে কি বাদল, তোমাদের মধ্যে নানা মুনির নানা মত দেখেই অনেকে হাত গুটিয়ে ফেলেছে। প্রথমে এ্যাক্‌শন বডির ওপর আস্থা ক'রে যারা উৎসাহ নিয়ে এগিয়েছিল তারা চট্‌ করে ফিরতে পারছে না বটে—তবে মওকা পেলেই সরে পড়বে, এ তুমি দেখে নিয়ো!

বাদল উত্তেজিত ভাবে বলে—ক্যানো, ক্যানো একথা বলছেন?

—রামপদরথ, মানে ওই চোট্টা বর্মাকে সবাই চেনে।

—দেবুদা, অযথা বাজে কথা বলবেন না।

—বাজে আমি বলি না। যারা ট্রেড ইউনিয়ন মুভ্‌মেণ্টের কিছু খবর রাখে তারা সবাই জানে যে, জামসেদ্‌পুরে জনতা প্রেসের শেয়ারের টাকা ভার্মা গজব করেছে। তার নামে মামলাও হয়েছিল। গোমেজ সাহেব তখন ওখানকার প্রেসিডেণ্ট, তিনিই ওকে ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি থেকে তাড়িয়ে দ্যান।

রাগে বাদলের হাত কাঁপছে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, তার চোখের দৃষ্টিতে বন্য হিংস্রতা ফুটে উঠেছে। কথা বলতে গিয়ে সে গর্জন ক'রে ওঠে—খবরদার! মিথ্যে—মিথ্যেবাদী। দালাল, হ্যাঁ আপনি একটা নির্লজ্জ দালাল!

দেবজ্যোতি প্রথমে বাদলের কথাগুলো হাল্কাভাবেই নিয়েছিল। কোনো জবাব নয়, একটু হাসির উপেক্ষায় উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল দেবজ্যোতি। কিন্তু

বাদলের উষ্মা আরও বেড়ে গেছে ইত্যবসরে। সে পাগলের মত চিৎকার ক'রে ওঠে—আপনি ইতর, আপনার প্রিন্সিপ্‌লের ঠিক নেই।

যদি মিন্টু এসে না পড়ত তাহলে হয়তো বাদলের তর্জনগর্জন থামতোই না।

হঠাৎ মিণ্টু এসে দেবজ্যোতির হাত ধরে বল্‌ল—আর এক মুহূর্তও এখানে নয়, চলো—চলো!

অপ্রতিভ দেবজ্যোতি একবার ভাই-এর মুখের পানে তাকায়, একবার তার বড় বোনের দিকে ; অবশেষে বল্‌ল—কোন্ চুলোয় যাবো ?

—গাছতলা ত কেউ কেড়ে নেয় নি। এ ভাবে লাথি ঝাঁটা হজম করার চেয়ে সে ঢের ভালো।

বাদল হাঁপাচ্ছিল,—এক্সারসাইজ করা চওড়া বুকের ছাতিটা তার ঘন ঘন উঠ্‌ছে পড়ছে! সে ফস করে জবাব দিল—তোমরা কি দুঃখে যাবে, আমিই যাচ্ছি।

মিণ্টু ধমকে উঠ্‌ল—তুই যদি যাস, আমার দিব্যি রইল! তুমি যা ছেলে, তা তুমি পারো!

বাদল এবার ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বলে—দিব্যি দিস্ নে দিদি, ওসব ভালোবাসি না আমি।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—খোকাকে দেখচি না যে!

—নিতাই এসেছিল, ওদের দুজনকে নিয়ে দীপু গিয়েছে সিনিয়র ক্লাবে টেনিস খেলতে।

ব'লে মিণ্টু দেবজ্যোতির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। অর্থাৎ ও চোখের চাহনীতে লেখা আছে যে, অম্লান গাড়ি নিয়ে এসেছিল।

দেবজ্যোতির মগজে এসব সূক্ষ্ম ইশারা ইঙ্গিত ঢোকে না। সে প্রশ্ন করে—নিতাই এল কার সঙ্গে ?

—কেন ওর মার সঙ্গে।

—অ, মল্লি এসেছে! তা কোথায় গেল ও ?

মিণ্টু এবার হেসে উঠল—তোমাদের শালা-ভগ্নীপতির এখন যা মধুর

আলাপ চল্‌ছে তাতে সে বেচারী কোন্‌ ভরসায় সামনে আসে। আমি না হয় ডাল ভাত করে ফেলেছি।

—হুঁ!

গম্ভীরভাবে বাদল স্বগতোক্তি ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

মিণ্টু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে—কি রে কোথায় চল্লি?

—যাই আজ আবার মিছিল বেরুবার কথা। ইউনিয়ন অফিস দখল করতে যেতে হবে।

দেবজ্যোতি তাকালো একবার বাদলের দিকে।

মিণ্টু বল্‌ল—যা-ই দখল করো একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরো যেন।

—ভয় নেই। ফিরবো ঠিকই। কিন্তু ওই সব গাছতলাটলা বেশি বলো না, ওসব আমার ভালো লাগে না দিদি।

কথাগুলো বাদল চল্‌তে চল্‌তেই বলে, পিছন দিকে না ফিরেই। যদি একবার ঘুরে তাকাতো তাহলে সে দেখতে পেতো—দেবজ্যোতি আর মিণ্টু দু'জনেই হাসছে। আর তাদের পিছনে সকলের অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে মল্লিকাও সকৌতুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

মুখ ঘুরিয়ে দেবজ্যোতি বল্‌ল—তোমরা হাসছ বটে, ব্যাপারটা কিন্তু খুব বিশ্রী! এইসব ছেলে-ছোকরাকে কি ভাবে মিথ্যে ভাঁওতা দিয়ে তাতিয়ে মাতিয়ে তুলেছে। ভাবলে বড় কষ্ট হয়।

নব্বই

সে সময়ে মানিকপুরে যারা উপস্থিত ছিল একমাত্র তারাই জানে যে কি সাংঘাতিক অস্বস্তি এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষের দিন কেটেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, প্রত্যেকেই অপরকে সন্দিগ্ধভাবে লক্ষ্য করে। পাশাপাশি ব'সে বা দাঁড়িয়ে কাজ করে, প্রত্যহ আট থেকে বারো ঘণ্টা কাল একই সঙ্গে ওঠাবসা করছে—তবু ভরসা ক'রে মনের কথা কেউ কাউকে খুলে বলতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে এ্যাক্‌শন বডির সভ্য সে-ই হয়তো গোপনে ইউনিয়নের গুপ্তচরের কাজ করছে।

হয়ত সেই কারণেই এ্যাক্‌শন বডির পক্ষে ইউনিয়ন অফিস দখল করা সম্ভব হ'ল না। বিরাট জনতা যখন ইউনিয়নের সম্মুখের পথে জিগির তুলে হাজির হ'ল তার আগেই পুলিসের অনেক লরী সেখানে জমায়েৎ হয়েছে। চেঁচামেচি, হৈ-হল্লায় বাতাস তোল্‌পাড় হয়ে ওঠে। এই তুমুল তাণ্ডবের মধ্যে মহকুমার এস-ডি-ও হাজির হলেন। জনতা তাঁর গাড়ী আটক করল। পুলিসের চোখ রাঙানী এবং হাকিমের জোর গলার সান্ত্বনা বাণীতে অশান্ত জনতা সাময়িকভাবে নিরস্ত হ'ল। কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। হুল্লোড়, জিগির, গলাবাজী। এস-ডি-ও ততক্ষণে ইউনিয়ন অফিসের চত্বরে পৌছে গেছেন। সেখান থেকে তিনি লাউড্‌ স্পীকারের সাহায্যে জনতাকে বল্লেন—আপনারা কি চান?

—আমরা ইউনিয়ন দখল করতে চাই। এ অফিস আমাদের—মজদুরের—

—হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। তবে আরও একটা কথা—

আর চাই কি উত্তাল জনসমুদ্রের ঢেউ উঠল, কায়েম করো, দখল করো। জনতার মধ্যে প্রবল বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। পুলিস বাহিনী এই প্রচণ্ড বেগকে রুখে রাখতে পারছে না। এস-ডি-ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন—আপনারা শান্ত হোন্‌। আপলোগ শান্ত হো যাইয়ে! আমার কথাটা শুনুন! দেখুন,

এ ভাবে হাঙ্গামা করলে বড্ড মুশকিল হবে। এ কী? ইউনিয়ন-এলাকায় ঢুকবেন না। বারণ করছি! খবরদার!

এরপর পুলিস যেন নিরুপায় হয়েই লাঠি চার্জ করল। প্রথমে জনতা থমকে যায়। কিন্তু পুনরুদ্যমে আবার সামনে ঠেলে এগিয়ে যায়। অসম্ভব! লাঠির চোট দিয়ে সামলানো যাবে না। অতএব টিয়ার গ্যাস—হ্যাঁ, দুম্—দুম্—দুম—! সাম্‌নে যারা এগোচ্ছিল, আচমকা আওয়াজে তারা উচ্চকিত হয়ে এদিক ওদিক তাকালো। তারপর চোখ জ্বালা! বাতাস কি কমে গিয়েছে? হাঁপ ধরছে। চোখ চুলকাচ্ছে। সাম্‌নের দিক থেকে পিছনে ধাক্কা, এপাশ ওপাশ চারিদিক থেকে কে কাকে ঠেল্‌ছে, কে জানে। অন্ধ, অবোধ্য অবস্থা। সব এলোমেলো হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে যায়।

আবার লাউড স্পীকারটা ঘর্‌র্ শব্দ করে, ওই যন্ত্রটা যেন বিধাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বল্‌ছে—আপনাদের সাবধান ক'রে দেওয়া হচ্ছে। শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা আছে। অথচ সে আইন আপনারা ভেঙেছেন। তবু পুলিস আপনাদের কিছুই বলে নি। কিন্তু ইউনিয়ন অফিসে জবরদখল চালাতে গেলে পুলিস বরদাস্ত করবে না। বারণ করেও দেখা গেল যে, কথা শুনতে নারাজ আপনারা, তা ব'লে পুলিস ত চুপ করে থাকতে পারে না—আইন রক্ষা করা পুলিসের দায়িত্ব। এখানে একটা কথা ভুল্‌লে চলবে না—ইউনিয়নের বর্তমান কমিটি পুলিসের সাহায্য চেয়েছে। আপনারা যে যাই বলুন, পুলিসের কাজ শান্তি বজায় রাখা। এবং পুলিস তা রাখবে। এ কাজে আপনারা সহযোগিতা করুন। গোলমাল বন্ধ করুন। আপোস আলোচনায় অনেক বেশি লাভ হতে পারে।···

যেহেতু পুরনো ইউনিয়ন অধিকার ছাড়তে নারাজ, এবং যেহেতু এ্যাক্‌শন বডি দাবি করছে যে এ্যাক্‌শনই সংখ্যাগরিষ্ঠদের সংস্থা, সেহেতু এস-ডি-ও স্থির করলেন আপাততঃ ইউনিয়ন অফিসটা পুলিসের দখলে থাকুক। এ্যাক্‌শন বডির বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তিনি ইউনিয়নের সেক্রেটারী এবং হিসাব রক্ষককে গ্রেপ্তার ক'রে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। ইউনিয়ন অফিসে তালা শীলমোহর পড়ল, সরকারী!

আপোসের চেষ্টায় অনেক দিন কাটলো, বিভিন্ন জায়গায় তিন পক্ষের প্রতিনিধিরা মিলিত হলেন—এমন কি ওই যে এঁদো জলার পাশে যেখানে শ্লাগ ফেলা হয় সেই ছাই-মাটি-কয়লার ঢিবিতে পর্যন্ত সরকারী প্রতিনিধি, মালিকের প্রতিনিধি আর এ্যাকশন বডির মুখপাত্ররা মিলিত হয়ে হাজার কথা খরচ করেও কোনো চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌছতে পারলেন না।

মালিকদের বক্তব্য—স্লো-ডাউন পদ্ধতি বন্ধ করো। আমরা বেকার শ্রমিকদের আবার কাজে নিয়োগ করছি। অথবা কথা দাও যে পুরোদস্তুর কাজ করবে, প্রোডাকৃশন স্বাভাবিক হারে হবে—তাহলেই আমরা সব বিবাদ ভুলে গিয়ে কর্মচ্যুতদের বহাল করছি। পরে বন্দী-কর্মীদের ছাড়া হবে এবং অনুকূল অবস্থা এলে তাদেরও বহাল করা হবে।

শ্রমিকের দাবি—সর্বাগ্রে বন্দী-কর্মীদের মুক্ত করতে হবে। তাদের কাজে নিযুক্ত করতে হবে। আর সব সর্ত ঠিক আছে। অবশ্য যাদের কাজ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে তাদের পুরনো কর্মী হিসেবেই বহাল করতে হবে।

সরকার পক্ষে কমিশনার এবং মন্ত্রীসভার সভ্যের ভূমিকা এখানে অধিক-পরিমানে গৌণ—কতকটা দর্শকের মত। মালিকেরা বন্দী কর্মীদের সম্বন্ধে বিবেচনা করতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাদের সর্বাগ্রে কর্মে নিয়োগেই তাঁদের আপত্তি। অনেক বাকবিতণ্ডার পর তাঁরা এ পর্যন্ত রাজি হলেন যে, আগের দিন ছাটাই কর্মীদের বহাল ক'রে, পরের দিন (বিদ্রোহের সূত্রপাতকারী) বন্দী কর্মীদের বহাল করবেন। কিন্তু শ্রমিক পক্ষের সিদ্ধান্ত অনমনীয়।

একাধিকবার আপোসের চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। খবরের কাগজে উভয় পক্ষেরই বিবৃতি ছাপা হ'ল ফলাও করে। কেন্দ্রীয় দপ্তর পর্যন্ত এই বিরোধের ঢেউ পৌছালো। অনেক অনেক গবেষণা চল্‌ল। পরিশেষে সরকার রায় দিলেন, যেহেতু লোহা এবং ইস্পাত জাতীয় রাষ্ট্রীয় আবশ্যিক বস্তু, তার উৎপাদন ব্যাপারে ভারত সরকার উদাসীন থাকতে পারেন না। এবং যেহেতু মালিক পক্ষের সর্বপ্রকার আপোস-চেষ্টা উপেক্ষিত হয়েছে, সেহেতু এক্ষেত্রে আশু সতর্কতার প্রয়োজন। সেহেতু মানিকপুর কারখানার কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করলে সরকারের তাতে অনুমোদন আছে।

মানিকপুর এখন বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রধান খবরের খনি হয়ে দাঁড়ালো। নিত্যই বিবৃতি এবং তার পাল্টা বিবৃতি খবরের কাগজের স্তম্ভে প্রাধান্য পাচ্ছে। কখনো এ্যাক্‌শন, কখনো ইউনিয়ন আবার কখনো বা কোম্পানীর মালিকের বিবৃতি প্রকাশিত হচ্ছে।

এদিকে খুন জখম বেড়েই চলেছে। পুলিসের তৎপরতা পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছে না। দু-তরফের চাঁদা আদায়ের দাপটে সাধারণ শ্রমিকের অবস্থাসঙ্কট উপস্থিত। বেশির ভাগ শান্তিপ্রিয় লোক দু-তরফেই চাঁদা দিয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চেষ্টা করে। কি জানি, দিনদিন পরিস্থিতি যেরকম ঘোরালো হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাতে ঠাওর পাওয়া দায়—শেষ পর্যন্ত কাদের হাতে ভাগ্য নিরূপনের ভার পড়বে। এদিকে ইউনিয়নের কর্মীরা গোমেজ সাহেব ইস্তফা দেবার পরই পুনর্নির্বাচনে গোমেজকেই সভাপতি পদে প্রতিষ্টিত করেছে। অবশ্য এটা খুব সঙ্গোপনেই হয়েছে এবং এ্যাক্‌শন বডি ইউনিয়ন দখলের চেষ্টা করার আগেই এ কাজটা সেরে রেখেছিল।

যেদিন সকালে ডিউটিগামী হাজার হাজার লোকের চোখের সামনেই একজন ইউনিয়ন-বাদী শ্রমিকের পাঁজরায় ছোরা মেরে আততায়ী অনায়াসে ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিল সেদিন সকলেই হতবাক, অভিভূত হয়ে পড়ল। তা ছাড়া আর কীই বা করতে পারে তারা!

সেদিন বিকেলেই ওয়েপন ক্যারিয়ারে বোঝাই দিয়ে খাকী পোশাক পরা সৈন্যরা এল, শহরের খবরদারীর ভার নিয়ে। গৃহস্থের বাড়ির এপাশ ওপাশে এক একটা সেনাশিবির হ'ল। দরকার মতো বসত-কোয়ার্টার খালি করিয়ে সৈন্যদের ঘাঁটি বানানো চল্‌ল। রাতারাতি মানিকপুর শহরের চেহারা বদলে গেল! এবার আর পুলিস নয়, লাঠি নয়,—সৈন্য আর রাইফেল। কারখানার মধ্যেও বসে গেল সৈন্যদের আস্তানা, খবরদারী শুরু হয়ে গেল দস্তুর মত।

পরদিন কোম্পানী 'লক্ আউট' ঘোষণা করল। একেবারে অতর্কিত আক্রমণ। রাত্রেই 'ওভেন' গুলো গরম রাখার জন্য বিশ্বস্ত শ্রমিকদের সাহায্যে ইট গেঁথে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। কোনো রকম গণ্ডগোল হবার পথ বন্ধ করেছে কোম্পানী সৈন্যদের হাতে রক্ষার ভার সঁপে দিয়ে।

অতএব কারখানা বন্ধ। কোম্পানী আর লোকসান বইতে পারছে না। তার চেয়ে অনির্দিষ্ট কাল কারখানা বন্ধই থাকবে। সপ্তাহের মজুরীও কেউ পায় নি। গত সপ্তাহের বেতনটা না দিয়েই যে কারখানা বন্ধ করা হ'তে পারে এটা শ্রমিকদের অনুমানের বাইরে!

চব্বিশ ঘণ্টা এই ভাবেই কাটলো। বাইরে যারা আছে তারা জানতে পারছে না যে, কারখানার মধ্যে কত লোক কাজ করছে। না, এখন কাউকেই কোম্পানী ভেতরে ঢুকতে দেবে না। একমাত্র শ্রমিক ইউনিয়নের অনুমোদন-পত্র সঙ্গে করে যারা জরুরী কাজের ভার নিয়ে আসবে, তাদেরই প্রবেশাধিকার আছে। অপরিহার্য কাজ চালু রাখার জন্য কোম্পানী লোক চেয়েছে ইউনিয়নের কাছে। আপাততঃ জরুরী কাজের জন্য ছশো লোক চাই। ইউনিয়ন লাল কার্ড দিয়ে লোক পাঠাচ্ছে।

প্রচ্ছন্ন আতঙ্কের ছায়া পড়েছে শ্রমিকের মনে।

এরপর কি হবে?

ইউনিয়নের লোক ছুটে চলেছে এখানে-ওখানে। কানে কানে খবর রটছে, এবার আর অল্পে পার পাওয়া যাবে না। যারা ইউনিয়নকে মানতে রাজী আছে তাদের অবশ্য ভাবনা নেই, কিন্তু যারা এ্যাক্‌শনের ভরসায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবে তাদের আখের স্রেফ ঝর্‌-ঝরে। তা নয় ত কী! ইউনিয়নের অনুমোদনের বাইরে একটি পিঁপড়েও কারখানার গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারবে না। তাহলে? তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, কোম্পানী ইউনিয়নকেই চায়, আর যেহেতু কোম্পানী চায় সেহেতু সরকারেরও আপত্তি নেই। হ্যাঁ, যাদের ছাঁটাই করা হয়েছে তারা যদি ইউনিয়নের শরণাপন্ন হয় ত ইউনিয়ন তাদের হয়েও লড়াই করবে বই কি। আরে মজদুরের দেখ্‌ ভাল্‌ করার জন্যেই ত ইউনিয়ন! গোমেজ সাহেব নিজেও একথা হাজারো বার হেঁকে বলেছেন।

কিন্তু, না, মানিকপুরের মজদুর অত ভয়তরাসে নয়। তাদের কলিজায় জোর আছে, তারা হাতে-হাতিয়ারে কাজ করে, পরোয়া তোয়াক্কা থোড়াই রাখে। ইউনিয়ন ত দালাল আছে। না হলে কোম্পানীই বা এত পেয়ার

করবে কেন ইউনিয়নকে! ইউনিয়ন খেলাফ, ইউনিয়ন দালাল, ইউনিয়ন মুর্দাবাদ। কে, কে, কাজে যাবার মতলব করেছে? তাদের কোয়ার্টারে এ্যাকশনের লোক ছুটল। প্রথমে ভালো কথায় বোঝাও, তাতে কাজ হ'ল না, ত ভয় দেখাও, জানের ভয় কে না করে? এতেই অনেক কাজ হাসিল হচ্ছে।

নিতান্ত নির্লজ্জ, বেপরোয়া যারা তাদের জন্যে আপসোস করা বেকার। মওকা পেলে দু-চারঘা জুতো-পেটা বকশিস—তার জন্য এ্যাকশনের অনুমতি কেউ নেয় না, হকের পাওনা শোধ করে দাও। তবে হ্যাঁ, খুব হুঁশিয়ার—শহরে পল্টন মোতায়েন আছে!

এখন লড়াই চল্‌ল এ্যাক্‌শন আর ইউনিয়নে।

কাজে যারা যাবে, আগে বকেয়া চাঁদার কড়ি জমা দাও, তারপর পাবে লাল কার্ড। কার্ডে সই আছে কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আর আছে ইউনিয়নের সেক্রেটারীর! ওই কার্ড নিয়ে সকালে রওনা হয় দল বেঁধে যোগদানকারী মজ্‌দুরেরা এক সঙ্গে। ভেতরে গিয়ে কাজ বিশেষ করতে হয় না। খাবারদাবার বন্দোবস্ত সেখানেই। সারাদিনের মধ্যে গল্পগুজব আড্ডা খাওয়া, ফাঁক পেলে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া। আবার সন্ধ্যের সময় গেট পেরিয়ে যে যার খোপে ঢুকে পড়া। ব্যস।

ঘরে বসে শুনতে পাওয়া যাবে এ্যাক্‌শনবালাদের গালিগালাজ, আস্ফালন। গভীর রাত্রে যখন চারদিক নিঝুম, কুকুরের ডাকও থেমে গেছে, তখনও যদি কোনো ইউনিয়ন সমর্থক বাইরে বেরোয় ত তার প্রাণ সংশয় হওয়া বিচিত্র নয়। আছে, প্রতিশোধ নেবার জন্য শত্রু আছে ওৎ পেতে।

ছশো থেকে হাজার, হাজার থেকে দুই-তিন-চার হাজার। [illegible] দলে কারখানার মধ্যে কাজের লোক বাড়ছে। সবাই ওই এসেন্শিয়াল কার্ড নিয়ে ভেতরে ঢুকছে। ইউনিয়নের সে বিশ্বস্ত সভ্য, ইউনিয়নের উপর সে আস্থাবান, নিয়মিত চাঁদা দিয়ে এসেছে বরাবর ইত্যাদি ইত্যাদি!

ভেতরে যত লোক বাড়ছে বাইরে ততই বিক্ষোভের তেজ উদ্দীপ্ত হচ্ছে। হরদম বর্মা সাহেব মিটিং করছেন। বক্তৃতার তোড়ে গলা ফাটাচ্ছে অন্যান্য লীডাররা। চিম্‌নী হিলা দেগা! শয়তানকা খোপ্ড়ী তোড়না চাহি!

এমন খবরও রটিয়ে দিলেন যতীন মজুমদার যে, কারখানার চিম্‌নী থেকে যে ধোঁয়া দেখা যায় আজকাল, সে ধোঁয়াটা ভুয়ো। লোক ত কারখানার মধ্যে কেউ ঢোকে নি। ধোঁকা দেবার জন্যে কোম্পানী 'টন্‌-টন্‌' বিচালী নিয়ে গিয়ে, সেই বিচালীতে আগুন ধরিয়ে ধোঁয়া দেখাচ্ছে। অতএব ঘাবড়াবার কিছু নেই, তোমরা সব আপনা ঠাটে রহো। কোম্পানীর ধোঁকাবাজী আর ক' দিন!

রামপদরথ বর্মা কলকাতায় আসা-যাওয়া করছেন। আর শহর এলাকার বাইরে জনসভাতে ভাষণ দিচ্ছেন, বিধান রায় নাকি তাঁর কথা শুনেছেন। এরপরই শ্রমমন্ত্রী কালীপদ মুখুয্যে মশাই মানিকপুরে হাজির হয়েই একটা সুবন্দোবস্ত করবেন। আরও অনেক খাশ খবর বর্মা সাহেব জোর গলায় জাহির করেন।

অবিনাশ চাটুয্যেও কাজে যাচ্ছিল না। অথচ সে একজন পদস্থ কর্মচারী, যাকে বলে ফার্স্ট স্টাফ সে হচ্ছে তাই। কিন্তু তার যাবার উপায় নেই। গিন্নী বেঁকে বসেছেন, তিনি বলেন যে, চুলোয় যাক পোড়া চাকরী তোমার। যেতে হবে না। গুণ্ডারা যদি একটা অঘটন ঘটিয়ে দেয় তখন কি হবে? কে দেখবে তোমার তিনতিনটে এ্যাণ্ডা বাচ্ছা! আর অতোই বা ভাবনা কিসের, তোমার হাত ধরা মল্লিক সাহেব। চুপচাপ বসে থাকো ঘরে। এসো একটু ক্যারম খেলি!

প্রাণের ভয় অবিনাশের কম নেই। কাজেই গৃহিণীর সামান্য পীড়নকেই সে বেদবাক্যরূপে শিরে নিয়ে ক্যারম খেলতে বসে।

শুধু সে-ই নয়, ফার্স্ট স্টাফের আরও দু-চার জন কর্মচারী কারখানায় যান না। বিশেষ ক'রে লোকোমোটিভের ফোরম্যান রমাপতি চাটুয্যেকে কয়েকবার ডেকে পাঠিয়েও ঘরের বাইরে আনা গেল না। তার ডিপার্টমেণ্টের সব কটা পাকা গুণ্ডাই হচ্ছে এ্যাকশন কমিটির পাণ্ডা! সে যদি কাজে যায় তাহলে তারা দেখে নেবে, এরকম উক্তি বাড়ি বয়ে এসে শুনিয়ে গেছে।

দেবজ্যোতির ভাবনা এই রমাপতিকে নিয়ে, সে তার ছেলেবেলার বন্ধু।

অথচ কি করতে পারে দেবজ্যোতি। সে ত স্পষ্টই বুঝতে পারছে যে, আজ হোক কাল হোক এ্যাক্‌শন বডির দফারফা ক'রে কোম্পানী এবং ইউনিয়ন ক্ষান্ত হবে। এখন দেবজ্যোতির কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার। সে যা বোঝে তা হচ্ছে এই : এ্যাক্‌শন বডিকে মল্লিক সাহেব যখন তোয়াজ দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছিলেন তখন তিনি অনুমান করতে পারেন নি যে এ্যাক্‌শনের ক্ষমতা এতদূর বেড়ে যেতে পারে। আর সেটা যখন তিনি বুঝতে পারলেন তখন এ্যাকশনের মধ্যে সত্যিকার নিষ্ঠাবান কর্মীর সংখ্যা এত বেড়ে গিয়েছে যে তার অগ্রগতি রোধ করার কোনো উপায় মল্লিকের হাতে ছিল না। ভুলই করুক বা অন্যায়ই করুক, এ্যাকশন বডির প্রচণ্ড গতিবেগ আপন নিয়মে শ্রমিকদের হু হু বেগে সামনে ঠেলে নিয়ে গেছে।

এদিকে ইউনিয়নেরও জোর কমেছে সেই অনুপাতে। এখন যদি ইউনিয়নকে ক্ষমতাশালী করা না হয় তাহলে এ্যাক্‌শনের হাতেই শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ সমর্পন করতে হবে। অথচ রামঅওতারের দাপট থেকে কর্তৃপক্ষ এটুকু বুঝেছেন যে, শ্রমিকরাজ কি মর্মান্তিক বস্তু। আরও একটা প্রশ্ন আছে, তা হচ্ছে গোমেজকে হালে বসিয়ে রাখা। গোমেজ হল আই-এন্‌-টি-ইউ-সি-র একজন খ্যাতিমান নেতা। গোমেজের পরাজয় মানে মূলতঃ আই-এন্‌-টি-ইউ-সি-রই পরাভব। দেবজ্যোতি জানে যে, আই-এন্‌-টি-ইউ-সি খাশ কংগ্রেসের সৃষ্টি। কংগ্রেস সহজে এ পরাজয় হ'তে দেবে না। যেমন করেই হোক, দেবজ্যোতির ধারণা যে, প্রয়োজন হলে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নিয়েও, গোমেজকে মানিকপুরের ইউনিয়নে বহাল রাখবেই। অতএব ইউনিয়নের প্রতিপত্তি ভবিষ্যতে পুনরায় ফিরে আসবে। আর কিছু নয়, সে ভাবে, এই করে আর কতকাল মানুষ নিয়ে এরা জুয়া খেলবে!

তাকে দ্বিতীয় দিন থেকেই কারখানায় আসতে হচ্ছে। সে আসছে। না এসে তার উপায় নেই। আজকে হঠাৎ হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকারই বা কি অর্থ আছে। যখন সে মানিকপুর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবে না, যখন তার নিজের পরিবার পোষণ করাই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হয়ে পড়েছে, তখন আর কীই বা সে করতে পারে?

সে আসে সকালে। কাজ তার নিজের টুলে আবদ্ধ নেই। শ্রমিকদের চায়ের টিকিট বিলি করা, দুপুরে খাবারের টিকিট বিলি করা, এইসবই এখন কাজ। কে কে আসে নি, নতুন কে কে এল, তাদের খবরাখবর রাখা—এও ডিউটির মধ্যে পড়ছে।

হঠাৎ একদিন রামঅওতার এসে হাজির। টুপীর বদলে সার্জিক্যাল ব্যাণ্ডেজ তার মাথায় জড়ানো। তাকে দেখেই চারদিক থেকে হৈ-হৈ পড়ে গেল—আরে বুঢ়াউ আয়া—এ বুঢ়াউ ক্যা খবর। আচ্ছা! ইত্যাদি।

'একশ এগারো' তিলক কেটে·হনুমানজীর নাম নিয়ে আড্ডায় এসে বসে, আর তাকে নিয়ে সবাই মজা করে। একবার বিধান রায়, গান্ধী কিম্বা জহর-লালের নামে কিছু নিন্দা করলেই 'একশ এগারো'-বুড়ো গালাগালির তুব্‌ড়ি ছোটায়।

রামঅওতারকে টিফিনের টিকিট দিচ্ছিল দেবজ্যোতি, তার মুখের দিকে তাকিয়ে রামঅওতার গম্ভীরভাবে বল্‌ল—গুরু ইয়ে ঠিক নেহি হ্যায়!

বিস্মিত দেবজ্যোতি প্রশ্ন করে—কি, কি বেঠিক বুঢ়াউ?

—এই টিফিন-খানা। এ ত আমাদের মজুরীর মধ্যে পড়ছে না গুরু! কোম্পানীর সঙ্গে এভাবে আমাদের আঁতাত ভালো দেখায় না!

'একশ এগারো' বল্‌ল—আরে রাখ্ শালা! শয়তান হারামী কোম্পানীর পয়সা খরচ হচ্ছে, এটা ত ভালো!

রামঅওতার সবেগে মাথা নেড়ে বল্‌ল—রামকিষণকে বলে এটা বন্ধ করতে হবে গুরু। এতে ইউনিয়নের বদনামী হবে পরে। আরে এমনিই ত যারা কাজ করছে তাদের ওভারটাইম রেট্ দিচ্ছে কোম্পানী।

কথাটার মধ্যে যুক্তির অভাব নেই! তবে এমন একটা সুবন্দোবস্ত হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে একথা ভাবতেও অনেকের খারাপ লাগে!

রামঅওতার মাথায় হাত দিতে গিয়ে, নামিয়ে নিয়ে বলে—ভাই, যাই বলো, আজ যারা কারখানার বাইরে রয়েছে, তারা আমাদেরই আপনা আদমী, মজদুর ভাই! তাদের কথা ভাবো। লড়াই করছে। কতো কষ্ট, কতো মেহ্‌নৎ। আর আখের আঁধার! হয়তো তাদের সঙ্গে আমাদের মতের গরমিল

আছে তবু তারা যে লড়াই করছে সে তো মজদুরের ভালাই-এর জন্যেই। তারা যদি অত কষ্ট সইতে পারে, তোমরা এই দয়ার ওপর কেন ভরসা করবে?

কে যেন বল্‌ল—তাহলে আমরা খাবো না কিছু?

—আলবৎ খাবো। বাড়ি থেকে খাবার আনবো, কিম্বা ক্যান্টিন খুলিয়ে সেখান থেকে নগ্‌দা খাবার কিনে খাবো।

জিলানী ব্যস্তভাবে যাচ্ছিল শেডের পাশ দিয়ে, রামঅওতারকে দেখে একটু হেসে অভিবাদন জানিয়ে বল্‌ল—আব তো সব কাম পাক্কা চলে গা!

রামঅওতার বিড়ি ধরিয়ে টান দেয়—জিতা রহো বাহাদুর। আরে তোর গায়ে ত আঁচড় কাটে নি ওরা—ব্যাপার কি, তুই কি ওদের দলে ভিড়ে যাচ্ছিস নাকি?

হো হো করে হেসে উঠল সকলে। জিলানী বল্‌ল—হাঁ, এই দেখুন না। এই লিস্টি নিয়ে চল্‌লাম। এখন ব্ল্যাক লিস্ট তৈরী হবে।

—সে আবার কি?

অবাক হয়ে রামঅওতার প্রশ্ন করে।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—তুমি জানো না সিংজী! এসেন্সিয়াল ব'লে যেসব লোককে ডেকে পাঠানো হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকে গরহাজির—এখন সেই সব অবাধ্য কর্ম্মীদের বরখাস্ত করবে কোম্পানী। অবাধ্য হয়ে, কোম্পানীকে তারা অপমান করেছে, কাজে আসে নি ইচ্ছে ক'রে—এরপর আর কোম্পানী তাদের পুষবে না।

—দেখি দেখি জিলানী, ফর্দটা!

রামঅওতার আর দেবজ্যোতি দু'জনেই ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো—ফর্দে অনেক নাম, বেশির ভাগই ওদের পরিচিত। বাদলের নামও এর মধ্যে রয়েছে, আছে মাধব, অবিনাশ চাটুয্যে, রমাপতি চাটুয্যে, অভিজিৎ সিং, কতো চেনা মানুষ এই কালো ফর্দের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। শিউকিষেণ কাল থেকে কাজে আসছে। এবং কারখানাতে সকলের সামনেই ইউনিয়নের তাঁবেদারদের গালিগালাজ করছে।

ওরা দু'জনে ফর্দ দেখতে ব্যস্ত, সেই সময় জিলানী বিরসভাবে বল্ল—বুঢ়াউ তোমার গান্ধী টুপীর বদলে, এই টুপীটা বহুৎ আচ্ছা দেখাচ্ছে। তুমি আর কংগ্রেসের টুপী পর না।

রামঅওতার চশমা লাগিয়ে ফর্দ পড়তে পড়তে হঠাৎ জিলানীর কথা শুনে চশমাটা কপালে তুলে প্রশ্ন করে—কাহে বাহাদুর ?

জিলানী জবাব দিল—কাল সন্ধ্যেতে আসানসোলে তোমার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি এ্যাকৃশন্‌বালাদের এক ভাষণ দিয়েছেন। তাতে কি বলেছেন জানো ? বলেছেন যে, এ্যাকৃশনবালারা যা করেছে ঠিকই করেছে, কংগ্রেসের পুরা মদৎ থাকবে এতে—আগর এ্যাকৃশন চলে আসুক না কেন কংগ্রেসের নিশানের নীচে, তবে ত কংগ্রেস জোরসে পুরা মদৎ দিতে পারে !

রামঅওতার বিশ্বাস করে না, বলে—আরে ছোড়ো বাচ্ছা, এ ত এ্যাকৃশন-বালাদের প্রোপোগেণ্টা আছে ! অতুল্যবাবু কভি এ বাৎ বল্‌তে পারে না। আরে ইউনিয়ন দস্তুরমতো কংগ্রেসেরই হাতে আছে, আবার এ্যান্টী পার্টিকে অতুল্যবাবু মদৎ দেবেন কি জন্যে ?

দেবজ্যোতি ফর্দটা জিলানীর হাতে ফেরত দিয়ে বল্ল—আরে বুঢ়াউ তোমার মগজে এটা ঢুকবে না। অতুল্যবাবু ভালো লোক, কি মন্দ লোক সে কথা এখানে ওঠে না। কংগ্রেস যখন পলিটিক্স করছে তখন তাঁর পক্ষে এরকম কথা বলা খুব স্বাভাবিক। মনে করো যে, এ্যাকৃশনের দিকেই এখনো সাধারণ পাব্‌লিকের সিম্প্যাথি—তাদের হাতে বিস্তর লোকবল, এ অবস্থায় আর সব পার্টি যখন এ্যাকৃশনকে দখলে আনতে চাইছে, ও তোমার কমিউনিস্ট থেকে শুরু করে ফরোয়ার্ড-ব্লক্-মার্ক্সিস্ট পর্যন্ত সবাই যেখানে হাম্‌লে পড়েছে, সেখানে কংগ্রেসই বা চুপ থাকে কি ক'রে ?

—না গুরু ! যতই হোক, সাপের গালে আর বাঘের গালে একসঙ্গে চুমো খাওয়াটা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। হাজার হোক কংগ্রেসের একটা আদর্শবাদ আছে ত !

জিলানী অধীর ভাবে বলে—আমি চল্‌লাম ! তোমার কংগ্রেস ত এই ! আমি খোদ কাল সে মিটিং-এ হাজির ছিলাম। বিস্তর ভিড়।

দেবজ্যোতি থামিয়ে দিল জিলানীকে চোখ মট্‌কে! তারপর বল্‌ল—রামকিষণকে বলো জিলানী, এই গোটা কয়েক নাম আজই যেন গোমেজ সাহেবের কাছে দাখিল না করে। আর একবার চান্স ওদের দিয়ে দেখা যেতে পারে—

—কে, কে গুরু?

—রমাপতির অবস্থা জানি, সে গুণ্ডাদের ভয়ে আসতে পারে না। অথচ তার ত মোটরকার রয়েছে। তুমি একবার খবর দিয়ো তাকে, পারবে?

—জরুর, কাহে নেহি!

—বলো যে, দরকার হ'লে তার জন্যে পুলিস প্রোটেকশনও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর মাধব, বাদল—এদের আমি বলে রাজী করিয়ে নেবো।

—বেশ!

বলে জিলানী চলে গেল।

রামঅওতার বিমর্ষভাবে টুলের ওপর বসে পড়ে।

দেবজ্যোতি সেদিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকায়। তার বুঝতে কোনোই অসুবিধে হয় না যে, রামঅওতার মনে মনে অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করছে। বেচারী সরল, সহজ আদর্শবাদের ওপর গভীর শ্রদ্ধার শেকল বেঁধে নিশ্চিন্ত ছিল, হঠাৎ কে যেন এক ঝট্‌কায় সেই বন্ধনটুকু ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আচম্‌কা কোন অনিশ্চিতের অমঙ্গলকর চিন্তায় ঠেলে দিয়েছে রামঅওতারকে।

সে আস্তে আস্তে ডাকে—বুঢ়াউ! এ বুঢ়াউ—

রামঅওতার মুখ তুল্‌ল, গভীর বিষণ্ণতায় তার চোখের চাহনী ছেয়ে গেছে।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—কি হয়েছে তোমার, বুঢ়াউ?

—কিছু না তো! দিল্‌টা জুৎ নেই। কেঁউ কি অতুল্যবাবু এমন বুরা কাম করতে পারে, কংগ্রেসের নাম নিয়ে—

—আরে ভাই, সবই তো চক্করবাজির খেল্‌। তুমি একটু তলিয়ে ছাখো, তাহলেই বুঝবে।

—না গুরু আমার আর বুঝে কাজ নেই। বল্‌কি এটা বুঝছি যে তামাম দুনিয়াটা বিল্‌কুল ঝুটা বনে যাচ্ছে। না তো কি, এই ছাখো না—ওই

রামপদরথ বর্মা কিনা গোমেজ সাহেবের সঙ্গে লড়াই করছে। ও শালার আর কাজ ছিল না!

—আরে সেটুকু ত জলের মতোই পরিষ্কার! বর্মা ত আবার আই-এন-টি-ইউ-সিতে ঢুকেছে।

—হাঁ তা যদি ঢুকলো ত, আই-এন-টি-ইউ-সির সঙ্গে সে ঝগড়ায় নামলো কেন?

দেবজ্যোতি হাসে, বলে—তামাশা ত সেখানেই। যেদিক দিয়েই যাও না কেন, তুমি রয়েছ সেই আই-এন-টি-ইউ-সির দখলে। পলিটিক্স এমনই মজাদার চীজ যে, বাইরে বাইরে গরম বাৎচিং, লড়াই-এর জিগির, খিস্তী সবই হচ্ছে—কিন্তু ভেতরে আপনার ভাই ব্রাদাররা ঠিকই রয়েছে।

—ইস্‌মে ক্যা মতলব গুরু?

—মতলব আবার কি? তোমাদের আয়ু আর অর্থক্ষয় হচ্ছে হোক, ওদের তাতে কিছু এসে যায় না। দখল বজায় রাখবার জন্যে সাজানো লড়াই লড়ে যাচ্ছে।

—ফায়দাটা কি?

—এই নাও, ফায়দা ষোলো আনা। এ্যাক্‌শন যখন তেজী হয়ে উঠেছে তখন ত সে এক কথায় দমে যাবে না। তার লীডারশীপ যদি আমি না নিতে পারি, ত, আমার শত্রুরা নির্ঘাৎ নেবে। তার চেয়ে আমিই দখল করলাম। অন্যের হাত পড়ল না এ্যাকশনের মাতব্বরীতে। তারপর এখন শুধু দিন কাটিয়ে যাওয়া,—মাছকে গেঁথে খেলিয়ে তোলার মতো ব্যাপার আর কী। বড় মাছ হ'লে, তাকে বেশি খেলাতে হবে, ক্লান্ত অবসন্ন হবার মতো সময় দিতে হবে। সুতো ছেড়ে যেতে হবে। সোজা ব্যাপার।

—কিন্তু, গুরু এরা যারা লীডারী করে, তারা কি মজদুরের কথা ভাবে না? এই যে হাজার হাজার মানুষের জান-পরেশানী, তার জন্যে ওদের কোনো দুঃখ নেই বল্‌তে চাও তুমি। এই যে গোমেজ সাহেব দিনের পর দিন এখানে পড়ে আছে, হরদম খাটছে, বেচারী কাজের চাপে আজ পর্যন্ত শাদী করার ফুরসৎই পেলো না—এসবই কি লড়কপান-কী-খেল? না, তা হতে পারে না, গুরু!

দেবজ্যোতি দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল—ছেলেখেলা না হবারই কথা। গোমেজ সাহেবের মনের কথা আমি ঠিক জানি না, তবে দু তরফের এই লড়াইয়ের মধ্যে পড়ে যারা হিমসিম খাচ্ছে তাদের কথা ভেবে, এত কষ্ট হয় যে ব'লে বোঝানো যাবে না। হয়তো তোমার কথাই ঠিক। আমার মনটা আজকাল বড়ো নাস্তিক হয়ে পড়েছে। কিন্তু যা দেখছি, যা বুঝছি, সেটা কারুর কথায় উড়িয়ে দিতে পারবো না সিংজী। ওইজন্যে আজকাল এসব নিয়ে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছি।

রামঅওতার ম্লান হাসি হেসে বল্‌ল—গুরু, তুমি বড় নীরস জ্ঞানী! তোমার কথাগুলো বড় সত্যি হতে পারে, কিন্তু সে সত্যি এ্যায়সা ধাক্কা দেয় যে মনে হয় বুঝি সর্বনাশ হয়ে গেল। এই যে আমাদের জীবন, এ জীবন কি কেবলই শুকনো জ্ঞানের ছোবড়া চিবোবার জন্যে। এতটুকু মিষ্টিরস, একটু ভুলে থাকার নেশা, কিছুরই কি দাম দেবে না তুমি! বুঝি সব। কিন্তু সে বুঝাটা সবসময় বরদাস্ত লাগে না গুরু!

জবাব দিল না দেবজ্যোতি। রামঅওতারের মাথার দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সেদিকে তাকিয়ে দেবজ্যোতির মনে পড়ে, ইউনিয়নের মদৎদার মুখিয়া রামঅওতার, তাকে জখম করল এ্যাকশনের উগ্র চরমপন্থীর কঠিন দণ্ড—অথচ এই দুটো সংস্থার মূল পরিচালক এক এবং অদ্বিতীয় আই-এন-টি ইউ-সি! শ্রমিকদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে অসন্তুষ্ট মানুষ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে—এটা হ'ল এক সত্য। অন্যদিকে রাজনীতির দরবারে অধিকার বজায় রাখার জন্য বিচিত্র চক্রান্তের জাল বিছিয়ে অন্যপক্ষ এগিয়ে এসেছে—তাদের কাছে দখল কায়েম রাখাটাই প্রধান লক্ষ্য—আর এক সত্য। দুই সত্য পথের পথিক এরা দুই পক্ষ।

তার চিন্তায় ছেদ পড়ল রামঅওতারের কথায়—গুরু, রাগ করেছ আমার ওপর।

দেবজ্যোতি শান্ত স্নিগ্ধ হাসি হেসে বলে—কেন, রাগ কেন করব, সিংজী!

—ওই যে নীরস জ্ঞানী বল্‌লাম।

—ঠিকই ত বলেছ! তবে রসের তৃষ্ণাই আমাকে নীরস করেছে, বুঝলে!

হঠাৎ একটা হৈচৈ শুনে ওরা দুজনে ফিরে তাকালো। কি ব্যাপার?

পন্টনের লোকেরা তিনজন মজদুরকে গ্রেপ্তার করেছে। এরা নাকি যন্ত্রপাতি নষ্ট করে দেবার মতলবে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করছিল। সোরগোল পড়ে গেল, এ্যাকশনবালাদের গুপ্তচর তাহলে আশপাশেই থাকতে পারে ত! কিছুই বলা যায় না।...কারখানার মধ্যে অবিশ্বাসের অস্বস্তি প্রভাব বিস্তার করল আবার। সকলের চোখেই সন্দেহের কুটিল দৃষ্টি সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে গেল।

একানব্বই

কলকাতা শহরের অভিজাত অঞ্চল পার্ক স্ট্রীটের দক্ষিণ অংশ, এবং তার মধ্যে অভিজাততম টুক্‌রো পার্কিনসন প্লেস—স্যর রাধানাথের প্রসাদ। সেদিন সন্ধ্যায় যখন অনিরুদ্ধ মল্লিক নিখুঁত মহার্ঘ ইউরোপীয় পোশাকে স্যর রাধানাথের ড্রয়িং রুমে মোটা চুরুট ঠোঁটে লাগিয়ে ঢুকলেন তখন তাঁকে দেখে কেউ মনে করতে পারত না যে মালিকের সাম্‌নে আসামীর কাঠগড়ায় হাজির হবার নির্দেশ নিয়ে তিনি এখানে এসেছেন।

অভিযুক্ত আসামীর আচরণের সঙ্গে কোনো মিল নেই মল্লিক সাহেবের উদ্ধত, অভিজাত হাবভাবের।

লেডি সরযূ খবর পেয়েই ব্যস্তভাবে দেখা করতে এলেন—এই যে অনিদাদা! তোমার ব্যাপার কি বলো তো। কর্তার সঙ্গে কদিন ধরে ট্রাঙ্ক ফোনে কি এত শলাপরামর্শ? আর আমি বেচারী একটিবারও তোমার ডাক শুনতে পাই নে! আজকাল তোমার যা ব্যাভার দাঁড়িয়েছে, তাতে, আমার ত কথা না বলাই উচিত। নেহাৎ—

—তুমি ব'লেই তাই কৃপা করে করুণা ছেটাচ্ছো, এই ত! ধন্য এ দাস, দেবি!

সরযূ সুর্মাটানা চোখের ভ্রূধনু বাঁকিয়ে বল্‌লেন—সেই ঠাট্টা! না, না, ঠাট্টা তামাশা রাখো! কি খাবে বলো—

মল্লিক সাহেব পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আধবোজা চোখে, নিশ্চিন্ত ভঙ্গীতে চুরুট টানছিলেন, তাঁর ভরাট গলায় হাল্কা চালে উচ্চারিত হ'ল—অমৃত বলিয়া গরল করেছি পান! যা হাতে ক'রে দেবে তাই চাই—সোজা মানিক-পুর থেকে আসছি। ফ্ল্যাটে যাবারও ফুরসৎ পাই নি।

—তুমি বুঝি নিজের বাড়িতে থাকা ছেড়েই দিলে!

দুখানা হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে হতাশভাবে মল্লিক বল্‌লেন—আমি ত কিছুই ছাড়তে চাই নি। তবে, সবাই একে-একে আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে। এনি

ওয়ে, গলাটা শুকিয়ে উঠেছে, লগ্ন বয়ে যাচ্ছে, বন্ধু! বন্ধু! হ্যাঁ, জিন আছে তোমার ঘরে?

চোস্ত উর্দীশোভিত বয় এসে পানীয়ের বন্দোবস্ত করে দিল।

সরযূ একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলে—অনিদাদা তুমি একটু বসবে?—আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঘুরবো, আগে থেকে কথা দেওয়া আছে কিনা।

—অলরাইট! নিড্ নট বদার। তা তোমার স্বামীদেবতা, আমার 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের' বিধাতা, আমাকে আজ হাজির হবার হুকুম দিয়ে কোথায় আত্মগোপন করেছেন?

—আর ব'ল না। ফরেন ট্রেড ডেলিগেশন এসেছে, আমিও সেই রিশেপ্সনে ছিলাম। নেহাৎ একটা আর্ট একজিবিশন ওপ্ন্ করতে হবে তাই চলে আসা। ভাগ্যে আগে এলাম, নইলে তোমার সঙ্গে দেখাই হ'ত না!

শৌখীন পাত্রে মদ ঢালতে ঢালতে মল্লিক সাহেব বল্লেন—আচ্ছা, তাহলে আমি বাসর জাগিয়ে বসে আছি। যাও। ফেরার জন্য কিন্তু ভেবো না। দেখা ত হয়েই গেল।

সরযূর বেশবাসে সংযমের প্রলেপ থাকলেও অনিরুদ্ধর প্রতি ব্যবহারে মোটেই সেটা প্রমাণিত হ'ল না। চ'লে যাবার সময়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে, ঝুঁকে পড়ে তিনি অনিরুদ্ধর ঠোঁটের ওপর কামনার্ত চুম্বন এঁকে দিলেন। দীর্ঘ বিলম্বিত ওষ্ঠের আস্বাদে সরযূর দু'চোখ বুজে গেল।

তারপর তিনি চলে গেলেন।

অনিরুদ্ধ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েছিলেন ব'লে মনে হয় না।

মিনিট কয়েক পরে টুং টাং পিয়ানোর শব্দ ক'রে একটা ঘড়ি বেজে-বেজে আবার থেমে গেল। এবং তারপরেই স্যর রাধানাথ এসে ঢুকলেন। অনিরুদ্ধকে দেখে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। অনিরুদ্ধ সামনের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলেন। রাধানাথ যে ঘরের মধ্যে এসেছেন তা টেরও পান নি অনিরুদ্ধ।

সোফার ওপর গা ঢেলে দিয়ে রাধানাথ বল্লেন—সো ইউ হ্যাভ কাম!

অনিরুদ্ধ চম্‌কে উঠে বল্লেন—কে?

পরমুহূর্তে নিজের ভুল শুধ্‌রে নিলেন—এক্সকিউজ মি স্যর! স্রেফ ভুলেই গিয়েছিলাম যে আপনার ড্রয়িং রুমে বসে আছি।

রাধানাথ ঠোঁট বাঁকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন—আমারও তাই ধারণা। আজ, তোমার সঙ্গে সোজাসুজি বোঝাপড়া করব বলেই ডেকেছি। তোমার মধ্যে এই বদ্ধমূল ধারণা হয়ে উঠেছে অনিরুদ্ধ—তুমি আজকাল দুনিয়ার সবকিছুকেই নিজের ব'লে গ্রাস করতে চাইছ। কিন্তু তা যে হয় না, সেটা ভুলে বসে আছো।

—প্লিজ স্পীক্‌ টু ইওর ওয়ার্ড। খোলাখুলি ভাবে কথা বলুন, বুঝতে সুবিধে হয় তাতে।

—ও ইয়েস! অফ কোর্স ইউ ডোণ্ট ডিক্‌টেট মি—ডু ইউ?

রাধানাথের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

অনিরুদ্ধ হেসে ফেল্‌লেন—নিশ্চয় না, আপনার বেতনভুক কর্মচারী, আমি আপনাকে নির্দেশ দিতে পারি না।

—না ছাখো, অনিরুদ্ধ। তোমার সঙ্গে ত সে ধরনের সম্পর্ক কোনোদিনই ছিল না।

—অথচ, হতে তো পারতো!

—হয়তো পারতো। সে যাক, এখন কথা হচ্ছে যে—মানিকপুর জলে পুড়ে ধ্বংস হতে বসেছে।

—কে বল্‌ল?

—আহা, ডোণ্ট বিহেভ্‌ এ নিরো! তোমার 'লায়ার' থামিয়ে একবার তাকিয়ে ছাখো—! আমি এখান থেকে এত খবর পাচ্ছি, আর তুমি সেখানে ওই কাজে বহাল থেকেও কোনো খবরই রাখছ না! আই ওয়াণ্ডার।

রাধানাথ তিরস্কারের তীব্র কটাক্ষ হানলেন।

অনিরুদ্ধ সে দৃষ্টিকে যেন গ্রাহ্যই করলেন না, বল্‌লেন—উড়ো খবরে মাথাখারাপ করবেন না। হাজার হাজার বর্বর নিয়ে কাজ করতে গেলে গোলমাল একটু হয়েই থাকে।

রাধানাথ গর্জে উঠলেন—একটু গোলমাল? তুমি কি বলতে চাও? আজ

ছমাস ধরে প্রোডাক্সন প্রায় বন্ধ। শহরময় একটা বীভৎস অবস্থা। খুন-জখম লেগেই আছে! তার ওপর পুলিসের গুলীতে পনের জন লোক মরল! এর পরও তুমি এটাকে একটু গোলমাল বলে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছ—ইউ নিরো!

মল্লিক সাহেব মদের গ্লাসটা শক্ত মুঠোয় ধরে উত্তেজনার বেগ সম্বরণ করতে থাকেন, তাঁর চোয়ালের হাড় দুটো দাঁতের চাপে কঠিন হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে তিনি বলেন—আপনি ভুল করছেন। আমি নিরো নই, আমি সেই অভিশপ্ত সিসিফাস্! বার বার একটা ভারি পাথরকে পাহাড় বেয়ে ওপর দিকে ঠেলে তোলার চেষ্টা করছি, কিন্তু প্রতি বারই সেটা গড়িয়ে নীচে পড়ছে। অনবরত এই চেষ্টাই চল্‌ছে—আর সেই ব্যর্থতারই পুনরাবৃত্তি!

রাধানাথ গম্ভীর হয়ে গেছেন, বল্লেন—তোমার সঙ্গে বিদ্যের দৌড়ে আমি কোনোদিনই এঁটে উঠতে পারি নি অনিরুদ্ধ।

—কিন্তু বুদ্ধির দৌড়ই ত বিদ্যার চেয়ে বড়!

অসহিষ্ণু ভাবে রাধানাথ বল্‌লেন—ওসব থাক। শোনো, এই যে এতগুলো অপমৃত্যু ঘটলো এর জন্যে এ্যাসেমব্লিতে কোশ্চেন উঠবে। তখন এও চাউর হবে যে, মানিকপুরের অসন্তুষ্ট শ্রমিকেরা এস-ডি-ওর কাছে নিজেদের দুর্দশার কথা জানাতে গিয়েছিল—

—না, তারা এস-ডি-ওর বাড়িতে ইট পাটকেল ছুঁড়েছে, কাঁচের শার্সি ভেঙেছে, হাকিমের বাড়ির মেয়েদের জখম করেছে—অসভ্য বর্বরতারই ফলে পুলিস গুলী চালিয়েছে। জনতাকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারে নি,—অবশেষে বাধ্য হয়ে—

—থামো, ওসব কথা আমি খবরের কাগজে পড়েছি। আমি জানতে চাই, এ্যাট অল কেন হাঙ্গামা এতদূর গড়াবে?

—এ কথা মালিক হিসেবে জানতে চান, না, বন্ধু হিসেবে?

—জানাটা আমার প্রয়োজন, তা সে যেভাবেই হোক!

অনিরুদ্ধ গম্ভীর ভাবে উঠে পড়লেন, কার্পেটের উপর পায়চারী করতে করতে বল্‌লেন—স্যর রাধানাথ! আপনি আমার ওপর আস্থা হারিয়েছেন। আপনার পক্ষে সেটা খুব স্বাভাবিক হলেও আমার কাছে তা চরম আঘাত।

অথচ আপনার এই কারখানার সঙ্গে আমি জীবনের সবটুকু সত্তা জড়িয়ে ফেলেছি। কেন? না, আমার বুদ্ধি-বিদ্যার চরম স্বাক্ষর হিসেবে ভবিষ্যতের হাতে একে তুলি দিয়ে যাবো। পারিবারিক শান্তির দিকে তাকাই নি—তার চরম প্রমাণ, এই কারখানাকে বড় করবার জন্যে কষাই-এর মতো শ্রমিকদের নিংড়ে নিতাম ব'লে আমার একমাত্র সন্তান মন্দাকিনী আমাকে ছেড়ে চলে গেল। সে আমার কতো প্রিয় ছিল তা কেউ জানে না। কিন্তু কি হ'ল—না, মন্দাকিনী আমাকে ধিক্কার দিতেই আত্মহত্যা করল। বুঝলেন স্যর রাধানাথ? কিছুই বুঝলেন না। কারণ আপনার পক্ষে তা আদৌ সম্ভবপর নয়। আপনার চোখের সামনে থাকে লাভ লোকসানের হিসেব, আর আমার সামনে সব সময় মানিকপুরের প্রতিটি মানুষের মুখের ছবি, যন্ত্রের ছবি! একদা যখন অন্ধ শ্রমিক-শক্তি সংহত হয়ে কারখানা অচল করতে উদ্যত হয়ে উঠল, তখন তাকে দমন না করলে আমার এত সাধনার সব ফল ব্যর্থ হয়ে যায়, তাই তৈরী করলাম তাদের মারণাস্ত্র। তার জন্যে কতো নীচে নামতে হয়েছে, কী হীন চক্রান্তে লিপ্ত হতে হয়েছে, তা আপনার জানবার কথা নয়। তবে একটা জায়গায় আমার হিসেবে একটু গলদ থেকে গিয়েছিল—সেই ভুলটুকুর জন্যেই যা একটু সময় খরচ হয়ে যাচ্ছে, তারই জন্যে কয়েকটা বাজে বাড়তি মানুষ মরেছে। ওরা ম'রে কারুর ক্ষতি করে নি, আমি জানি। ওরা ত অসংখ্যের মধ্যে কয়েকটি সংখ্যা মাত্র। কিন্তু আমি জানি যে, আমাকে পাহাড়ের মাথায় পাথরটা তুলতেই হবে। স্যর রাধানাথ, আপনি আমার ওপর এতকাল নিশ্চিন্তে নির্ভর করেছেন, আরও কিছুদিন এইভাবে থাকুন, এই আমার একমাত্র অনুরোধ।

রাধানাথ তাকিয়ে ছিলেন অনিরুদ্ধের গতিশীল চেহারার দিকে। তাঁর চোখে বিস্ময় নেই, কোনো অভিব্যক্তিই যেন নেই। অনিরুদ্ধ ঘুরে দাঁড়ালেন, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন নিজের আসনের দিকে। বসবার আগে পানপাত্রটা পূর্ণ ক'রে নিয়ে বললেন—এ্যাসেম্ব্লি, রেপুটেশন; এসব ত ছায়া-ছবির খেলা। দুদিন বাদে সব ডুবে যাবে। মানিকপুরের কারখানা-শহর তা যাবে না, শ্রমিকের সংখ্যাও কমবে না।

রাধানাথ মাথা নেড়ে বল্লেন—কিন্তু একটা কথা অনিরুদ্ধ, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না! তুমি ম্যাক্‌ডোনেলর সঙ্গে ঝগড়া করেছ!

—তা করেছি। হি ইজ্ এ পিওর এ্যাণ্ড আনএ্যাডাণ্টারেটড্ ইডিয়ট!

—তা বল্লে ত চল্বে না। ওরা কতো টাকা ঢালছে আমাদের এই এন্‌টারপ্রাইজের পিছনে, সেটা তোমার জানা আছে আশা করি।

—তা ব'লে কি, সে যা বল্বে তাই মানতে হবে? টাকার সঙ্গে বুদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই। অনেক বিগ ইডিয়ট স্রেফ ভাগ্যের দৌলতে ফুলে ফেঁপে ওঠে!

চাপা রাগে রাধানাথের মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে, তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দেন—গোড়াতেই বলেছি যে, তোমার ভুল হচ্ছে নিজের গণ্ডীর খবর না রেখে বেপরোয়া ভাবে চলা। এ্যাণ্ড আনফরচুনেটলি আই হ্যাভ নো আদার অলটারনেটিভ্। ব্যাট টু—

রাধানাথের কথা লুফে নিয়ে মল্লিক বল্লেন—স্যাক মি! ওয়েল আই টু-উ রিয়্যালাইজ দ্যাট! পাথর গড়িয়ে পড়ল।

রাধানাথ একটু হাসলেন—মাই ফ্রেণ্ড! আমার কথাটুকু বল্বার অধিকারও কেড়ে নিতে চাও! আমি যা বলতে চাই তা বলতে দাও।

—আবার কি? আপনার কথা তো চোখে মুখে ফুটে উঠেছে!

—এবার আমি মালিকের ক্ষমতা হাতে নিতে চাই। আই টক। আই সে মিস্টার মল্লিক, তোমাকে পাঁচ মাসের জন্য সাসপেণ্ড করা হবে।

অনিরুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত ভঙ্গিতে বল্ল—তাহলে আমার নিবেদন, চিরদিনের মতোই বিদায় করুন। তাতে হয়তো কিছুটা সম্মান আমার বজায় থাকে।

রাধানাথ এবার হেসে বললেন—বসো অনিরুদ্ধ অতো উত্তেজিত হবার কিছু নেই। আমি তোমাকে এর চেয়েও বড় পদে বহাল করছি। পৃথিবীর যেখানে আমাদের যতো কারবার আছে, তোমাকে সেই সকলেরই মাথায় প্রধান পরামর্শ-দাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবো। তুমি সামনের মাসেই বিলেত চলে যাও।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনিরুদ্ধ বল্লেন—ঘুষ দিয়ে আমাকে ওখান থেকে সরাবে

আপনার লাভ হবে না। আমি—আমিও সুখী হতে পারবো না। এনি ওয়ে আই ওয়াণ্ট টু থিঙ্ক ইট ওভার।

—অবশ্য মদের মিতালি যখন করবে না, তখনই চিন্তা কর। এখন নয়।

—বাট ইউ নো, মদই আমার বন্ধু, পরামর্শদাতা! মাথায় আমার কিছু খ্যালে না উইদাওট ওয়াইন!

—সেটা ত মদের বিজ্ঞাপন, তোমার বুদ্ধির নয়।

—না, না, ওয়াইন ওয়ার্কস্ মাই ব্রেন!

—দেন দি ব্রেন মাস্ট বি ব্লেম্‌ড্।

রাধানাথের এ কথায় দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

তারপর দু'জনে মানিকপুর প্রসঙ্গে অনেক কথা হ'ল। রাধানাথ বুঝিয়ে বল্‌লেন যে, এখন গোমেজ সাহেবকে তিনি সুবিধা সুযোগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তার কারণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার হাবভাব ভালো নয়। সরকার সত্যিই শ্রমিকদের সুবিধা-সুযোগ দেবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি শুরু করছে। আর ঠিক এই সময়েই পুলিসের গুলীতে লোক মরাতে মানিকপুরের দিকে রকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়েছে। এ অবস্থায় রাধানাথের প্রকাশ্যভাবে মল্লিকের প্রতি বিরূপতা না দেখালে চল্‌বে না। অবশ্য আসলে মল্লিকের উপর রাধানাথ মোটেই অসন্তুষ্ট নন্। কিন্তু ডিরেক্টর বোর্ড, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারকে দেখানোর জন্য মল্লিকের এই শাস্তি রটনা একদিক দিয়ে একান্ত প্রয়োজনীয়।

অনিরুদ্ধ হাসলেন, মদ খেলেন এবং মদ খেয়ে আবার হাসলেন।

রাধানাথ নিজের জন্য 'কইন্যাক' ফরমাস করলেন। তারপর বল্‌লেন—সরযূর সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি নিশ্চয়। বসো, ওর সঙ্গে দেখা করে যাবে—

অনিরুদ্ধর হঠাৎ মনে পড়ে গেল—ওষ্ঠের ওপর সরযূর শেষ চুম্বনের স্মৃতি। নিমেষকাল তিনি চোখ বুজে সেই অনুভূতিটুকু স্মৃতি পথে আনতে চেষ্টা করেন। তারপর আবার মদের পাত্রে চুমুক দিলেন। নাঃ, কোনো স্বাদ নেই সে চুম্বনে—কিছুই অবশিষ্ট নেই তার।

বিরানব্বই

কোলের ছেলেটি বেশ ফুটফুটে হয়েছে। বুকের দুধ খাইয়ে ওকে ঘুম পাড়িয়ে মিণ্টু অলসভাবে চেয়ে দেখছিল। একমুঠো ফিকে চাঁপা রং-এর নরম ফুলের মতো ছেলেটা মিণ্টুর চোখের সামনে ঘুমিয়ে রয়েছে। বড় খোকাও ঘুমোচ্ছে। বাড়িখানা নিঝুম। কোথায় কোন গাছে একটা ঘুঘু একটানা ডেকে চলেছে ঘু—ঘু—ঘু—ঘু!

ছেলের দিকে তাকিয়ে মিণ্টু ভাবছিল, এবার উঠে পড়তে হবে। আর আলস্য করলে চল্‌বে না। বেড-কভারে কাশ্মিরী ফুলের কাজটায় হাত দিই-দিই ক'রে দেওয়াই হচ্ছে না। এদিকে ত দিনও কাছিয়ে আসছে। মনে মনে হিসেব ক'রে মিণ্টু দেখল, ওদের বিয়ের তারিখ আসতে আর মাত্র বার দিন বাকী। এর মধ্যে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে টেবিলক্লথের কাজটা শেষ করতেই হবে। করলে ত সময় বেশি লাগে না, তবে অবসর কোথায়—আর লোকচক্ষুর অগোচরে লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করার সময় বলতে ত এই দুপুরটুকু। বাদল, দেবজ্যোতি খাওয়াদাওয়া ক'রে কারখানায় চলে যাবার পর থেকে দীপুর স্কুল থেকে ফিরে আসার আগে যেটুকু অবসর মেলে। তার মধ্যে বড় খোকার ঘুম ভাঙা আছে, ছোট খোকার বায়না আছে।

নাঃ, আর শুয়ে শুয়ে ভাবলে চল্‌বে না। সেই কতকাল আগে দেবজ্যোতি প্রশংসা করেছিল এই কাজের। মিণ্টুও ভেবে রেখেছিল, অনেক রকমের হাতের কাজ দিয়ে নিজেদের ঘরদোর সাজিয়ে রাখবে। দু-একটা করেওছে। কিন্তু বেড্‌কভার করবার বাসনা ওর আর পূর্ণ হয় নি।

উঠে পড়ল মিণ্টু। বাক্স খুলে বেড কভারের শাদা কাপড়খানা বার করল। সেলাইতে হাত দিয়েই ও ভাবতে শুরু করে—এবার আর ভাবনা নেই, জুন মাসে নতুন কোয়ার্টারে যাবো। একখানা ঘর, তা হোক। তবু ত নিজের স্বাধীনতা সেখানে অটুট। অবশ্য এ বাড়ির কেউ দিদির কর্তৃত্বের অবমাননা করে নি এখনো। তা না করলেও মনে হয়, যদি ওরা কোনোদিন দিদির কথা

না শোনে! আর এ ত হামেশাই হয় যে, বাদল বা দীপু নিজেদের স্বাধীনতা খর্ব ক'রে বড় বোন বা ভগ্নিপতির নির্দেশ মাথা পেতে নিচ্ছে। তা-ই কি ভালো লাগে! হয়তো মনে মনে ওদের অসন্তোষের ধোঁয়া জমছে। সেলাই করছে মিণ্টু আর এইসব ভাবছে।

—টু—কী—ই! দিদি টুকী!

চমকে উঠল মিণ্টু।

—কে?

মুখ তুলে দেখল, দীপু বাগানের দিকে জানালায় মুখ রেখে হাসছে। হঠাৎ ছোট বোনের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে মিণ্টুর মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে। দীপুর দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভ হাসি হেসে বলল—কি রে এমন অসময়ে? ছুটি হয়ে গেল বুঝি?

দীপু চোখ নাচিয়ে বলে—অ মা! এইসব হচ্ছে বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে?

কি জবাব দেবে মিণ্টু! ওকে কি বলা যায় যে, বিবাহ-স্মরণীর দিনে দেবজ্যোতিকে এটা উপহার দেবে বলে তৈরী করছে।

অবশেষে দীপুই ওকে উদ্ধার করল, বলল—সারাটা দুপুর বুঝি এখানেই দাঁড় করিয়ে রাখবে?

—আয়, আয়। তা আমার কি দোষ বলো, তুমি যে চোরের মতো পা-টিপে ওই বনবাদাড়ে গিয়ে ঢুকবে তা কি ক'রে জানবো!

দরজা খুলেই দীপুর হাত ধরে মিণ্টু বলল—দোহাই তোর, কাউকে বলিস নে ভাই!

—বেশ, কি ঘুষ দেবে বলো?

—তোর বিয়ের পর তোদেরও এমনি একটা বেড কভারে কাজ করে দেবো।

—ধ্যাৎ! সবটুকু ত হুবহু এমনি হবে না! বেড্‌ম্যানও এইরকম হবে বলো—

—তুই আজকাল বেজায় ফাজিল হয়েছিস।

—বেশ ত, তাহলে একটা ছবি দেখাও! আজ ক্লাব সিনেমাতে নিম্মীর বই

আছে সেটা দেখাবে বলো। নইলে এখুনি ফোন ক'রে কারখানায় খবর দিচ্ছি।

—বেশ তাই দেখাবো। কিন্তু বেয়াড়া আবদার ক'রো না। আমাকে বাপু যাবার জন্যে টানাটানি ক'র না।

—বাঃ, তা কি ক'রে হয়!

—কোলের বাচ্ছাটাকে ফেলে যাবো কি করে বল্। তার চেয়ে তোরা তিনজনে যাস বরং।

—আহা দেবুদা যেদিন সিনেমা দেখবে সেদিন দুনিয়া উল্টে যাবে। আচ্ছা, সে যা হয় হবে। তুমি যা করছিলে করো না বাপু। বলো তো আমি তোমায় হেল্প্ করতে পারি।

—থাক, আমি একাই পারবো। হ্যাঁ, বল্লি নে ত ছুটি হয়ে গ্যালো কেন?

দীপু বাইরের কাপড় বদলাতে বদলাতে বল্ল—আর বল না। ইস্কুলের ছেলেগুলোও দিন দিন গোল্লায় যাচ্ছে। ওরা স্ট্রাইক করেছে। সারা শহর ঘুরে শেষে মেয়ে স্কুলে গিয়ে হাম্লা শুরু করেছে। গেট বন্ধ করে দেওয়াতে চেঁচামেচি করছিল। তারপর করেছে কি লোহার গেট টপ্‌কে সব ভেতরে ঢুকে পড়ে' হেড্‌মিস্ট্রেসের ঘরের সামনে হাজির হয়ে, যা তা গালিগালাজ করছে! সে দলের মধ্যে তোমার ভাগ্নেও রয়েছে দেখলাম।

মিণ্টু অবাক হয়ে বলে—কে? মুকুলের ছেলে? সে ত এইটুকু পুঁচকে রে—

—আজকাল আর পুঁচকে কেউ নয়। ওদের মুখের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্যি! মিনতিদি প্রথমে ভালো কথা বল্লেন, শেষে ভয় দেখালেন—কিছুতেই কিছু হ'ল না। বাধ্য হয়ে উনি ক্লাস ছুটি দিয়ে দিলেন। এরকম হ'লে ছেলে-গুলোর পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে। বুকের রক্ত জল করে বাপগুলো ছেলেদের পড়ার খরচ জুগিয়ে যাচ্ছে, আর ওরা এইরকম হুজুগে হুল্লোতে মেতে ওঠে—তা ওদেরই বা কি দোষ, মাস্টারগুলোই আসলে বদের ধাড়ী। আরে বাপু তোরা এ্যাক্‌শন নিয়ে মাতামাতি করবি কর, তার মধ্যে ছাত্রদের জড়াস কি জন্যে!

মিণ্টু বল্ল—এ্যাক্‌শন বস্তির হাঙ্গামা ত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে কবে! এখন আবার নতুন ক'রে কি শুরু হল?

—আর বলো না। এখনো যে পৌনে তিনশ' লোককে কোম্পানী কাজে নেয় নি। তাদের দরদে ওঁদের ঘুম হচ্ছে না। যতসব ফাঁকিবাজ মতলববাজ জুটেছে এই মানিকপুরে। তা ছেলেদের মাথা খেয়েও সুখ নেই, এখন মেয়ে-স্কুলের সর্বনাশ করতে হবে। একে ত একটা স্কুল, তাতেও যদি রাজনীতি ঢুকে পড়ে তাহলেই ফরসা।

কথা বলতে বলতে দীপুর মুখখানা কেমন যেন হয়ে যায়।

মিণ্টু সান্ত্বনা দেবার জন্য বলে—অনর্থক ভেবে কি হবে বল।

—কিছু হবে না ব'লে কি ভাববোও না! না, না, আমি মিনতিদিকে বলেছি, এসব ব্যাপারে গা এলিয়ে দিলে চল্‌বে না। সেক্রেটারীর কাছে অভিযোগ করতে হবে। আর অভিযোগই বা করা কার কাছে, উনি নিজে ত এখন বেকার! এ্যাক্‌শনের বড় পাণ্ডা কিনা।

—তাহলে?

—এসব ব্যাপারে মল্লিক সাহেব হচ্ছে মোক্ষম দাওয়াই। সেবার লক্-আউটের সময় এরকম অবস্থা হয়েছিল। খবর পেয়ে নিজে ছুটে এসেছিলেন, ছেলেরা ওঁকে দেখে সুড়্‌সুড় ক'রে ক্লাসে গিয়ে ঢুকল। আর মাস্টাররা একেবারে কেঁচো। মল্লিকের ওই একটা ক্ষমতা—আড়ালে সে যতই 'ডিং' হাঁকুক না কেন, সামনে কেউ মুখ তুলে কথাটি কইতে পারে না। তা মল্লিকও ত সাস্‌পেণ্ডেড্। কি যে করা যায়! শেষে কি ম্যাক্‌ডোনেলের কাছেই আমরা যাবো?

ঘুমন্ত বাচ্চাটার দিকে নজর পড়তে দীপুর দু-চোখ উল্লাসে নেচে ওঠে। হঠাৎ ও দিদির দিকে তাকিয়ে মিনতিভরা সুরে বলে—একটা কথা বল্‌ব দিদি?

—কি?

—বলো তুমি রাগ করবে না! আমি সিনেমার ফ্রেম তুলে নিচ্ছি, তার বদলে—

—আগে বল, নইলে আমি বুঝবো কি করে?

হাতের কাজ থামিয়ে দীপুর দিকে তাকালো মিণ্টু।

দীপু বল্ল—খোকনুয়াকে চটকাতে ইচ্ছে করছে। ওর ঘুম ভাঙিয়ে দেবো? চটে গিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে যখন ও কাঁদে না, কী যে মজা লাগে—। ভাঙাই—

মিণ্টুর সম্মতির অপেক্ষা না রেখে দীপু বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

—ছাখ্, শেষে আমি কিন্তু সাম্‌লাতে পারবো না দীপু!

—ওঃ, ছেলে আর কারুর হয় না! দেখিস্—।

ব'লেই দীপু ছোটখোকার গাল টিপে দিল।

মিনিট কয়েকের মধ্যে ঘরখানা কান্নায় ছেয়ে গেল। প্রথমে খোকার চিকন কান্না। আর সেই গোলমালে বড় ছেলেটার ঘুম ভেঙে যাওয়াতে সেও গলা ছেড়ে কাঁদতে শুরু করেছে।

মিণ্টু ধমক দিল—তুই কি আমাকে পাগল ক'রে ছাড়বি, হঁ্যা রে!

দীপু তাচ্ছিল্যভরে জবাব দেয়—একটু কান্নাকাটি না হ'লে ছেলেপুলের ঘর মানায় না। তা ছাড়া তুমি ছাই কি বোঝো? কাঁদলে বাচ্চাদের লাংসের জোর বাড়ে, তা জানো মশাই!

—খুব হয়েছে ভাই। তোমার নিজের যখন বাচ্চা হবে তখন যতো পারো তাদের লাংসের জোর বাড়িয়ো। এখন ক্ষ্যামা দাও—

দিদির কথার উত্তরে কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিল দীপু, এমন সময়ে পিওনের ডাক শোনা গেল—দীপালী সান্যাল, চিঠি আছে—

দীপু ঠোঁট বাঁকিয়ে বল্‌ল—যা দিদি নিয়ে আয় না! তোর পায়ে পড়ি।

মিণ্টু চিঠি হাতে ফিরে এল।

—কার চিঠি রে?

—মেয়েলি ছাঁদের লেখা, কিন্তু অমলা বৌদির ত নয়!

মিণ্টু আপন মনেই বল্‌ল।

দীপু বল্‌ল—দে দেখি।

খামখানা ছিঁড়ে চিঠি বার ক'রে নিয়ে দীপু পড়তে শুরু করল। ওদিকে বড় খোকা খামটি হস্তগত করল—মাছি নিই—মাছি নিচ্ছি!

—নাও বাবা!

ছোট ছেলেটির কান্না থামে নি, উত্তরোত্তর বাড়ছে দেখে মিণ্টু তাকে তুলে নিয়ে দুধ দিতে লাগলো।

দীপু প্রথমে জোরে জোরেই পড়তে শুরু করেছিল—

হঠাৎ এ চিঠি পেয়ে তুমি খুব অবাক হয়ে যাবে, তাই না দীপু! কিন্তু তোমাকে অবাক করাই আমার উদ্দেশ্য নয় ভাই। মানুষ বড় স্বার্থপর। আজ তোমাকে চিঠি লিখছি,—আমার একটা কাজ করে দেবে ভাই! না, তোমাকে করতেই হবে। মানিকপুরে তোমার চেয়ে আমার আপন বলতে আর কেউ নেই। দ্যাখো, আবার একটা ভুল হ'ল। তোমার চেয়ে আপন যে জন তার সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে তোমাকেই। হ্যাঁ, ভাই সেইজন্যেই তোমাকে চিঠি লেখা।

সে মানুষটি বড় বেহিসেবী। বিশেষ ক'রে নিজের সম্পর্কে প্রায় শিশু ভোলানাথ। নইলে কেউ ফেরারী আসামীকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয়? আরও বিপদ বাড়ে, সে আসামী যদি মেয়ে হয়! সত্যি, সে সময়ে যদি ও আমাকে ঠাঁই না দিত তাহলে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হ'ত। আমাকে ও মানিকপুর থেকে কলকাতায় আনলো, সেও বাধ্য হয়ে। ওদের বাড়ির লোকেরা কমিউনিস্ট বলতে বাঘভালুক ভাবেন। তাঁরা প্রথম দিন কোনোরকমে সয়ে ছিলেন। তারপর স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন যে, আত্মরক্ষার জন্য তাঁরা পুলিসে খবর দিতে বাধ্য হবেন। ও তখন আমায় নিয়ে কলকাতায় চলে এলো—এখানে ওর চেয়েও বড়লোক এক বন্ধুর বাড়িতে মাস্টারনীর পদে বহাল ক'রে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হ'ল। আমার জন্যে অনেক গঞ্জনা সয়েছে—বড় লোক বাপের একমাত্র ছেলে হয়েও এরকম যে ভালো মানুষ কি ক'রে হয় জানি নে। বিশেষ ক'রে যার বাপ-মা বোনেরা চূড়ান্ত স্নব, সে!

দীপু ভাই তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি মরেছি। ওকে অনেকদিন দেখি নি। ইচ্ছে করে মানিকপুরে গিয়ে দেখে আসি ওকে। কিন্তু সেখানে গিয়ে উঠি এমন ঠাঁই নেই। তোমাদের বাড়ি কাকামণি-শূন্য ভাবতেও পারি না। তার ওপর দাদা রয়েছেন, তাঁদের ঘর সংসার—সে যেন আরও অসহ্য! আমি বড় নিষ্ঠুর, তাই না? নইলে এসব কথা কেউ বলে? সত্যি,

মন্দাকিনীর আত্মহত্যার পর দাদার সংসারী হওয়া,—বাবার মতো সেই কারখানায় আসাযাওয়া—এসব ভাবলেও কষ্ট হয়।

ওসব থাক। যেকথা বলবার জন্যে তোমায় লিখতে বসা সেটা বলি।···

এই পর্যন্ত পড়ে দীপু থম্‌কে থেমে গেল। অম্লান, হ্যাঁ অম্লানের কথাই লিখছে দেবিকা। ওর বীরাঙ্গনা-হৃদয়ের সর্বস্বত্বের অধিকারী অম্লান! অম্লান দেবিকার অনেক বিনিদ্র রাত্রির মধুময় স্বপ্ন! এসব কি লিখেছে দেবিকা? প্রতিটি ছত্র সেই অনুরাগেরই ভিজে ভাবালুতা।

ইচ্ছে করছে চিঠিখানা ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেরৎ ডাকে দেবিকাকে পাঠিয়ে দেয়। ঠোঁট কামড়ে দীপু বসে থাকে।

হঠাৎ ওকে চুপ করে যেতে দেখে মিণ্টু প্রশ্ন করে—কি হল! কার এমন রসালো চিঠি রে?

জবাব না পেয়ে ও উঠে আসে।

দিদিকে কাছে আসতে দেখে দীপু চিঠিখানা গুটিয়ে মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে ফেল্‌ল, বল্‌ল—সরো।

অবাক হয়ে গেল মিণ্টু। সরল না একটুও, বল্‌ল—দেখি চিঠিখানা!

—না।

এ জবাবে গম্ভীর হয়ে গেল মিণ্টু।

দীপু উঠে চলে গেল পাশের ঘরে, বাকীটুকু পড়ে শেষ করতে হবে। যদিও আর বিশেষ কিছুই জানবার কৌতূহল নেই, তবু যেন কর্তব্য হিসেবেই চিঠিখানা পড়ে শেষ করতে হবে ওকে।

দেবিকার অনুরোধ সামান্যই। মাস কয়েক ধরে অম্লানকে চিঠি লিখেও কোনো জবাব পাচ্ছে না। ওর বিশ্বাস অম্লানের বাড়ির লোকেরা চিঠি 'গায়েব' করছে। আবার এমনও আশঙ্কা করছে, হয়তো বা অম্লানের কোনো সাংঘাতিক অসুখ-বিসুখ করে থাকতে পারে। নাকি, ওরা বাইরে কোথাও চলে গিয়েছে? যাই হোক, উজ্জ্বলা-কজ্জলীর মারফতে খোঁজ না নিয়ে, দীপু যেন একটু কষ্ট করে নিজেই অম্লানকে দেবিকার কথা জানায়। অম্লান কি কলকাতায় একবার যেতে পারে না? দীপু ইচ্ছে করে ত অম্লানকে এ চিঠি দেখাতেও পারে। আর দীপু

নিজে যেন একটা জবাব দেয়। বিয়ে-থা করবার বড় একটা ইচ্ছে দেবিকার নেই। ভালোবাসাকে সব কিছুর উপরে স্থান দেয়, ইত্যাদি।

বিকেল গড়িয়ে যায়। কারখানায় ছুটির বাঁশী বাজে। মিণ্টুর বড় ছেলে এসে ধরেছে,—বেড়াতে যাবার সময় হয়ে গেল, তবু কেন মাসী সেজে নিচ্ছে না। একটু পরেই ত মোটর আসবে, অম্বল কাকা আসবে (অম্লানকে সে অম্বল বলেই ডাকে)। মাসী কি রাগ করেছে ?

দীপু সাড়া দেয় না, সরিয়ে দিতে চায় ছেলেটাকে। কিন্তু সেটুকু জোরও যেন আর নেই ওর। মিণ্টু কাজের ফাঁকে একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেছে ওকে—কিছু বলে নি। শীতের বিকেল, রোদ পড়ে এসেছে। ঠাণ্ডায় গা শিরশিরিয়ে ওঠে। ঘরের মধ্যে ঝুপসী আঁধার গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়েছে।

অতি পরিচিত মোটরের হর্ণ বেজে উঠল। তারপরই গাড়ির দরজা খোলা আর বন্ধ হওয়ার শব্দ। দীপু ভাবছে, ভাবনার মধ্যেই গাড়ির দরজা-বন্ধটুকু কানে গেল। এবার এখানে আসবে অম্লান। সেই অম্লান, যার কথা দেবিকা লিখেছে। সেই অম্লান, যার পুরানো প্রেমের কাহিনী শুনিয়েছে অমিতা রায়। হ্যাঁ, অমিতাও অনেক কথা বলেছে দীপুকে। খারাপ—লোকটা সত্যিই খারাপ। দীপু ওর ওপর কিছুতেই ভরসা করবে না। অমিতার কাছে গল্প শুনেই মনেমনে অম্লানের উপর অশ্রদ্ধা হয়েছিল। কিন্তু, তারপরও দীপু অম্লানের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করতে পারে নি। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছে, হঠাৎ কিছু না-করে, আস্তে-আস্তে সম্পর্কটা কাটিয়ে দিলে কেউ টের পাবে না। কোথায় যেন মমতার সূক্ষ্ম মোহ জন্মেছে অম্লানের প্রতি, যার জন্যে, আচমকা অম্লানকে আঘাত দিতেও দীপু কষ্ট পায়। কিন্তু না, আর নয়—আজই সব শেষ করে দিতে হবে। দীপু নিজেকে তৈরী করে নিয়েছে। অম্লানের মুখের ওপর চিঠিখানা ছুঁড়ে দিয়ে দীপু বলবে—দূর হয়ে যাও! ··হ্যাঁ, আর সে মুহূর্তের বিলম্ব নেই। জুতোর শব্দ শুনতে পাচ্ছে। শব্দটা ক্রমশঃ কাছে আসছে, আরও কাছে। জুতোটা উঠে পড়ল সিঁড়ির ওপর—এবার বারান্দায়। বড় খোকা ছুটে গিয়েছে, জুতোটা থমকে গেল। ওদের দুজনের কথা। অম্লানের জবাব

নরম গলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। জুতোর শব্দ ঘরের চৌকাঠে ঠোক্কর খেতেই, দীপু চম্‌কে চিঠিখানা হঠাৎ ব্লাউসের মধ্যে লুকিয়ে ফেল্‌ল।

অম্লান ঘরে ঢুকতেই দীপু উঠে ভেতরে চলে গেল।

একটু অপ্রতিভ হয়ে অম্লান অবশেষে বড় খোকাকে বল্‌ল—তোমার মাছির কি হয়েছে ?

যে সমস্যার সমাধান বড়খোকা এতক্ষণেও করতে পারে নি, অম্বল কাকার মতো বড় মানুষও সেই ধাঁধায় পড়েছে দেখে খোকন খুশী হ'ল। মুখর কণ্ঠে বল্‌ল—এসো না, মাছিকে বল্‌বে, রাগ ক'র না ! লক্ষ্মী ছেলে, লজেন্‌স্ দেবো। চলো, বলবে চলো, অম্বল কাকা।

অম্লান এ বাড়ির বৈঠকখানা ডিঙিয়ে ভেতরে আজ অবধি যায় নি। খোকনের নির্বন্ধ-পীড়নে আজ সে অন্তঃপুরে ঢুকে পড়ল। জোর গলায় হাঁক দিল—বৌদি ! অ বৌদি—

মিণ্টু মিষ্টি স্বরে বল্‌ল—এই যাই ঠাকুরপো !

ভেতরের ঘরে ঢুকে সে থম্‌কে দাঁড়ালো, দীপু জামা বদল করছে, পিছন দিক থেকে পিঠের অনেকখানি ধবধবে মসৃণ ত্বক চুম্বকের মতো অম্লানের চোখের দৃষ্টিকে টান্‌ছে। তবু সে ইতস্ততঃ ক'রে বাইরে চলে আসে। বড়খোকা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, মাসীর রাগ ভাঙানো হ'ল না ব'লে।

দীপু টের পেয়েছিল সবই। ইচ্ছে করেই কিছু বলে নি। না কোনো কথা বল্‌বে না এখানে। একেবারে শেষ, চূড়ান্ত কথা শুনিয়ে দেবে আজ গাড়িতে বসে। সিনিয়র ক্লাবে যাবে না দীপু। আজ একেবারে রিভার রোড্ ধরে হুহু বেগে গাড়ি চলুক। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে যাবে, মুখ দেখা যাবে না তখন ভালো করে……মসৃণ ট্রপিক্যালের কমলা রং-এর ব্লাউসে বোতাম আঁটতে আঁটতে মনে মনে দীপু ছবি আঁকছিল আসন্ন চরম আঘাতের !

ওদিকে অম্লান কথা কইছে—বৌদি, দাদা এখনো এলেন না, ওভারটাইম খি ?

—না ঠাকুরপো, আজ যে বারি ময়দানে মিটিং আছে। অতুল্য ঘোষ আসছেন, আরও কারা সব আসবেন, তাই ফিরতে দেরী হবে বলে গেছেন।

—মানিকপুরের মজাই এই। সেদিন পর্যন্ত ইউনিয়নের মিটিং-এ যেতে কেউ ভরসা পেত না, আর আজ ঝাঁকে ঝাঁকে জুটছে গিয়ে।

—লোকে কি করবে বলুন ভাই! প্রাণের মায়া কার নেই? তবে হ্যাঁ, এও বলি, চাকা ঘুরিয়ে তবে ছাড়লো ত! রামেশ্বর যে মাইকে জোর গলায় বলে বেড়াতো, সে মিটিং করবেই—যদি একটিও লোক না জোটে ত গাছপালা আর গরুমোষকেই সে নিজের কথা শোনাবে! আজ সেই রামেশ্বরের কথায় হাজার হাজার মানুষ ত উঠছে বসছে!

বল্‌তে বল্‌তে মিণ্টু চায়ের পেয়ালা হাতে করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। অম্লানকে ভেতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বল্‌ল—চলুন ঠাকুরপো ঘরে বসবেন! একটু চা খান।

—তবু ভালো আপনি বসতে বল্‌ছেন, চা দিচ্ছেন। আর একজনের ত ভাবগতিক যা, তাতে মনে হয়, গলা ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দিতে পারলেই তিনি বাঁচেন।

—ওর কথা ব'ল না ভাই, কি যে হয়েছে আজ জানি না। আমার সঙ্গে সেই দুপুর থেকে একটিও কথা বলে নি।

—যাক্, বাঁচা গেল! তাহলে আমি একাই দুর্ভাগা নই!

—ষাট বালাই, আপনি দুর্ভাগা হতে যাবেন কেন!

যাকে লক্ষ্য ক'রে এত কথা, সে সম্পূর্ণ উদাসীন, নীরব। এই ভাবেই দীপু জলখাবার চা শেষ ক'রে, গাড়িতে উঠল।

পিছনের সীটে বসেছে দীপু আর খোকন। মাসীর ভাবগতিক দেখে খোকন চুপ করে থাকে। গাড়িখানা বড় রাস্তায় পড়তেই দীপু সংক্ষেপে বল্‌ল—ক্লাবে যাবো না।

ঘাড় ঘুরিয়ে অম্লান ওকে দেখল, চোখে চোখ পড়তেই দীপু মুখ নামালো। অম্লান বল্‌ল—সেটা না বল্‌লেও চল্‌তো। জানতাম।

সাম্‌নে থেকে কয়লা বোঝাই একখানা ট্রাক আসছিল, তার পাশ কাটালো অম্লান মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে। দীপু দেখছে ষ্টিয়ারিং-এর ওপর দু-খানা ফর্সা লোমশ পুষ্ট কব্জি। অম্লানের ঘাড়ের উদ্ধত ভাবটুকুও ভালই লাগছে। এমন মানুষকে

খারাপ লাগে না এমনিতে। সহজ, অন্তরঙ্গ, মিষ্টি মেজাজের মানুষ অম্লান। অনেক কথাই ও বলবার আগে বুঝে নিতে পারে। অম্লান যেন বড় কাছের মানুষ। ওর সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাবতে ভালো লাগছে না। ওকে শক্ত কথা বল্‌তে মায়া হচ্ছে। হয়তো সইতে পারবে না ও। কিম্বা সবই সহ্য ক'রে যাবে মুখ বুজে। প্রতিবাদ করবে না।···দীপুর সঙ্গেই দেবিকার চিঠিখানা রয়েছে। রয়েছে ওর বুকের সঙ্গে লেগে। দেবিকার সব কথাই সেখানে জমা হয়ে রয়েছে।

অম্লান সামনের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, এত অকরুণ কেন ভদ্রে!

—তোমার সঙ্গে কথা না কওয়াই উচিত!

—তা নয় বুঝলাম। কিন্তু কেন?

—জানি না।

—তা তো মনে হচ্ছে না। বরং বড় বেশি জানো—

—জানিই ত! এখন ভাবছি এর চেয়ে তোমার সঙ্গে পরিচয় না হওয়াই ভালো ছিল।

—তা, সেটা যখন দৈবক্রমে হয়েই গেছে, তখন সেটুকু ঘুচিয়ে ফেলার উপায়ও নেই।

গাড়ির গতিবেগ বেড়ে চলেছে। অম্লানের কথাগুলো লাফিয়ে দীপুর গালে গায়ে ছড়িয়ে আবার উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দীপু সামনে ঝুঁকে পড়ে বল্‌ল—উপায় হয়তো আছে, শুধ্‌রে নেবার।

—কেন, কোথাও কোনো ভুল হয়েছে বুঝি!

—সবটাই ভুল।

এবার অম্লান একহাতে ষ্টীয়ারিং ধরে, আর একটা হাত পিছন দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌ল—ভুল করা সহজ, কিন্তু সেটা শোধরানো কঠিন! কেন এই সন্ধ্যেটা মিছে তামাশায় খোয়াবে বন্ধু! আকাশের রঙ মনে মেখে নাও, আমাকেও দাও—!

—থাক! এরকম মিষ্টি কথা এর আগে তুমি কতোজনকেই শুনিয়েছ ত!

—ও, এই। তাই বলো, হিংসে—! তা যদি ধরতে চাও তো, এক হাতের

কটা আঙুলে কুলোবে না। তবে তার কতটার জন্যে আমি দায়ী, আর কতোটা যে শুধু সাড়া আর সায় দিয়ে যাওয়া, সে কথা তারা কেউ বলতে পারবে না।

অম্লান যেন জীবনকে গাড়ি চালাবার পথ হিসেবেই দেখছে। সে নিজে এই চলমান গাড়িখানার মতোই নির্বিকার। চলাটাই যেন ওর স্বভাব। পথ ওর কাছে সেই গতির আশ্রয় ছাড়া বাড়তি কিছু নয়। অম্লানের কথার ভঙ্গীতে এমন একটা অচেনা স্বাদ পাওয়া যায় যা দীপুর মনকে হঠাৎ খুশী ক'রে তোলে।

দীপুর প্রস্তুতি সব এলোমেলো করে দিয়েছে অম্লানের সহজ সান্নিধ্য। সত্যি, অনেক চেষ্টা করেও খোলাখুলি ভাবে অম্লানকে দীপু কোনো কথা বল্‌ল না। অম্লানও কোনো কৌতূহল দেখায় নি। সন্ধ্যার হাল্কা কুয়াসাকে একটু একটু ক'রে উপভোগের আমেজে মশগুল হয়ে আছে সে। গাড়ি রেখেছে নদীর ধারে। কন্‌কনে হাওয়া, আকাশে একটি দুটি তারা। দূরে পাম্প হাউসে সোঁ-সোঁ শব্দ উঠছে। অম্লানের মুঠোর মধ্যে দীপুর হাত, আর কোলের উপর দেবজ্যোতির বড় ছেলে শান্ত হয়ে বসে রয়েছে। কেউ কোনো কথা বল্‌ছে না।

এক সময় অম্লান বল্‌ল—একটা গান করবে?

দীপু জবাব দিল—না, ফিরে চলো।

বলা হ'ল না। নিজেকে দূরে সরিয়ে আনা যেন আরও সুদূরপরাহত—এইটুকুই বুঝল দীপু। নিজের ওপর ওর খুব রাগ হ'ল। এই ওর মনের জোর? এই ওর আত্ম-পরিচয়! এ এক অদ্ভুত অন্তর-সংঘাত। সংঘাতই বা বলা যায় কি ক'রে, মনের আগুনে কর্তব্যকে আহুতি দেওয়া! ···ফিরতি পথে অম্লানের পাশে বসেছে দীপু আর বাঁদিকের দরজার গায়ে বড়খোকা! দীপু অনুভব করছে অম্লানের হাঁটুর স্পর্শ। অদ্ভুত অসহায় অবসন্নতায় ওর কর্ম-চৈতন্য আচ্ছন্ন। সুখের আমেজে ও যেন সবকিছু ভুলে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। চেতনা আর আচ্ছন্নতার ঢেউ ওকে নিয়ে খেলা করছে। কখনো নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে, আবার পরমুহূর্তে কোথায় তলিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। এমনি আবর্তিত অস্থিরতা নিয়ে ও বাড়ি পৌঁছলো।

গাড়ি থেকে নামবার আগে দীপু টের পায় নি ছেলেটা বসে বসে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে বুকে তুলে নিয়ে বৈঠকখানায় দীপু ঢুকলো, দেখলো,

নিখিল বসে গল্প করছে বাদলের সঙ্গে। ওদের দেখেও দীপু যেন দেখ্‌লো না, বড়খোকাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে দিদির খোঁজে রান্না ঘরে চলে গেল।

মিণ্টু বল্‌ল—এই যে এসেছিস! বাঁচালি—জামাইবাবু যে ভেবেই অস্থির!

এ বাড়িতে অমলই এখনো জামাইবাবু রয়ে গেছে। দীপু বল্‌ল—কই জামাইবাবুকে ত দেখলাম না!

—তিনি অনেকক্ষণ বসে ছিলেন। ব'লে গেলেন, ঘণ্টাখানেক বাদে আবার আসবেন। তোর সঙ্গে খুব জরুরী কথা আছে।

দীপু ভেবে পায় না অমলের হঠাৎ কি দরকারী কথা থাকতে পারে। সে সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহলও অবশ্য ওর নেই।

মিণ্টু নিজেই বল্‌ল—কথা আর কি, ওঁর ছোট ভাই অনিলের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে মানিকপুরে। তা তোকে নিয়ে মেয়ে দেখতে যাবেন, কবে তোর সুবিধে হবে—এই আর কি।

—অ!

ব'লে দীপু খুশী পিঁড়ি টেনে নিয়ে ময়দা মাখতে বসল।

ওদিকে বাদল গলা ফাটিয়ে ডেকে চলেছে—দীপু—ওরে, এই দীপু!

সাড়া দিতেই হয়, নইলে বাদল থামবে না।

ময়দা মাখা হাতখানা ধোবারও ফুরসৎ দেবে না বাদল। ব্যস্তভাবে দীপু একমুখ বিরক্তি নিয়ে হাজির হ'ল—কি?

বাদল যেন ওকে ডাকেই নি এমন ভাব দেখিয়ে নিখিলের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—এই নাও, এবারে তোমার এডুকেশন, কালচার ইত্যাদি লেকচার যা দেবার দাও নিখিলদা। তুমি তো জানো, আমি আকাট গো-মুখ্যু!

দীপুর দিকে তাকিয়ে নিখিল বল্‌ল—একটু বসবার সময় হবে?

ময়দামাখা হাতখানা তুলে নিজেই দেখল দীপু, তারপর কি যেন ভেবে বল্‌ল—একটু বসুন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি!

বাদল বাধা দিল—অতো ইয়েতে কাজ কি। নিখিলদা, তুমি বরং রান্নাঘরেই যাও। দিদিকেও দুটো জ্ঞানের কথা শোনাতে পারবে—সেই ভালো, আমি চেয়ার পেতে দিচ্ছি চলো।

বাদলের সব বন্দোবস্তই পাকা। সে যা বোঝে না, সেরকম ব্যাপার বোঝবার সম্ভাবনা দেখলেই সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। চট্ করে একখানা চেয়ার তুলে নিয়ে সে ভেতরে চলে গেল, যাবার সময় পিছন ফিরে নিখিলের দিকে এমন ভাবে তাকালো যে,—নিখিল বেচারীকে পিছু পিছু যেতেই হয় এরপর।

নিখিলকে রান্নাঘরের দোর গোড়াতে বসিয়ে দিয়ে বাদল বল্‌ল—আমি এবার একটু বেরুবো।

দীপু প্রশ্ন করে—কোথায়?

—আঃ, জেনেশুনে তুই এসব কথা কেন জিগ্যেস করিস? জানিস ত যাবো একটু গীতাদের বাড়ি। ওখানে না গেলে মনটা বিচ্ছিরি লাগে।

মিণ্টু ধমক দিল—যা, যা, আর জ্যাঠামো করতে হবে না।

বাদল মাথা চুলকে জবাব দিল—জ্যাঠমো বল্‌ছিস তুই! এটা কতো বড়ো সিরিয়াস ব্যাপার তা যদি বুঝতিস দিদি।

মিণ্টু বিরসভাবে বলে—তবু যদি ও তোর সঙ্গে ভালো ভাবে কথা বল্‌তো! বড়লোকীর দেমাকেই মায়ে-ঝিয়ে গেল!

বাদল খুব চটে গিয়েছে, সে বল্‌ল—ছাখ দিদি, এভাবে পরের নিন্দে করিস নে। জানিস আমি কিরকম দুঃখু পাই! গীতা ছেলেমানুষ, ওর ব্যাভার কি সবসময় ওরকম ভাবে খুঁটিয়ে ধরতে আছে? তা ছাড়া, আমি ওকে ভালোবাসি সোজাসুজিই ব'লেছি; কই তাতে ত কোনো আপত্তি করে নি। তবে! তবে কেন তোর অতো রাগ দিদি? অথচ গীতার মা তোর কতোই প্রশংসা করে। তুই-ই কেবল ওদের দেখতে পারিস নে!

দীপু হাতের কাজ ফেলে রেখে হাসতে শুরু করল। ওর হাসি আর থামতেই চায় না। বাদল রাগে গর্‌-গর্‌ করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল।

নিখিল এতক্ষণ চুপ ক'রে বসে বসে এইসব দেখছিল। বাদল চলে যেতে সে বল্‌ল—ও আর বাড়লো না। কেবল চেহারাটাই ডেভেলপ্ করলো, মনটা সেই শিশুই রয়ে গেল। অবিশ্যি এক দিক দিয়ে ভালো।

দীপুর হাসি থেমে গেছে, ও হঠাৎ বলে বসলো—এর মধ্যে ভালোটা কি দেখলেন শুনি!

সিগারেট ধরিয়ে নিখিল জবাব দেয়—সরলতাও একটা বড় গুণ। মনের মধ্যে কোনো জঞ্জাল পুষে রাখার বালাই এদের নেই, মানে বাদলের জাতের মানুষের আর কি—। এরা হলো Extravert, যাকে বলে বহির্মুখী!

—তা নয় বুঝলাম। কিন্তু তাতে লাভটা কি হলো?

প্রশ্নটা করার মধ্যেও দীপুর মানসিক বিরূপতাই যেন প্রকাশ পায়। ও আজকাল নিখিলের উপস্থিতিটুকুও সইতে পারে না। তাকে দেখলেই ও বিরক্ত হয়।—একটা বাকসর্বস্ব. অসার্থক মানুষ, যার কোনো ক্ষমতাই নেই।

নিখিল পরম নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জবাব দেয়—লাভ এই যে, নিজের কথা সহজে অপরকে ওরা বোঝাতে পারে। এই ছাখো না, নিজের ভালোবাসার কথাটা কতো অনায়াসে বল্‌ল ও! কিন্তু যাদের মন অন্তরমুখী, তারা কেবল নিজের মনেই জাল বোনে। বাইরে কোথাও মনের কথা প্রকাশ পেয়ে গেলেই যেন মস্ত একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে, এই তাদের ভয়। তারা ছোটোখাটো খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালোবাসে, তাই নিয়েই সর্বদা তাদের মনে অশান্তি, অতৃপ্তি, ধোঁয়ালো ধ্যান!

দীপু আড়চোখে নিখিলের দিকে একবার তাকালো, ওর যেন সন্দেহ হচ্ছে যে, নিখিল ওকে লক্ষ্য ক'রেই এসব কথা বল্‌ছে। রান্নাঘরের দরজায় চেয়ার পেতে লোকটা বসে বসে যেন দীপুর মনের কথাগুলো পরিষ্কার আবৃত্তি ক'রে শুনিয়ে যাচ্ছে। অসহ্য!

মিণ্টু রুটি সেঁকতে সেঁকতে আপন মনেই বলে—এখনো ফিরল না। ভাখো দেখি আক্কেলটা!

দীপু অবাক হয়ে গেছে—সে কি, দেবুদা ফেরেনই নি? বাদলকে দেখে আমি ভাবলাম, বুঝি উনি এসে আগেই বেরিয়ে গেছেন।

—তা হলে আর ভাবনা ছিল না। মিটিং-এর পর নেতাদের সঙ্গে ইউনিয়ন আপিসে ধন্না না দিলে চল্‌বে কেন? এখন বাদলকে সাগ্‌রেদ পেয়ে ভারি সুবিধে হয়েছে, ওর মুখে খবর পাঠিয়েছেন। ব্যস, হয়ে গেল!

—তাহলে তুইও জলখাবার খাস নি দিদি ?

কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্যে মিণ্টু নিখিলকে বল্‌ল—কি, আর একবার চা হবে নাকি ?

—হ'লে ত মন্দ হ'ত না। তবে হাতে সময় নেই, এখুনি উঠতে হ'বে। তা দেবজ্যোতি বাবুও ত ফিরছেন না—

দীপু কাটা কাটা সুরে বল্‌ল—তাই বলুন, ওঁর জন্যে বসে আছেন ! আমি তাই ভাবছি, নিখিলদা হঠাৎ এতক্ষণ এখানে !

জবাব দিতে নিখিলের একটু সময় লাগে। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে সে আস্তে আস্তে বল্‌ল—হাঁ, জীবনে ত এই প্রথম এ বাড়িতে এতক্ষণ কাটানো।

—না। তবে, ইদানীং এরকমটা হয়েছে ব'লে মনে পড়ে না।

ছোট ছেলেটার ঘুম ভেঙেছে, তার কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। মিণ্টু ব্যস্তভাবে উঠে হাত ধুয়ে ফেল্‌ল, এখুনি ওঘরে যেতে হবে।—আজকাল ছোট খোকা ঘুম ভেঙেই উঠে বসে। তারপর খাটের ওপর থেকে দড়াম ক'রে আছড়ে মেঝেতে পড়বে হয়তো !

চেয়ার থেকে উঠে নিখিল পথ দিল মিণ্টুকে।

মিণ্টু চলে যাবার পরও সে আর বসলো না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বল্‌ল—সময় থাকতে সরে দাঁড়ালে আর ধাক্কা খাবার ভয় থাকে না। তা সেদিক থেকে ভালোই করা গিয়েছে, না কি বলো ?

দীপু ভ্রূকুঞ্চিত করল—তার মানে ?

—মানে ? সেটাও মুখ ফুটে বলার দরকার আছে নাকি ! নিজেকে জিগ্যেস করলেই ত জবাব পেতে পারো। না কি বলো ?

—দেখুন নিখিলদা, আপনার কথাগুলো ঠিক সোজা রাস্তায় চল্‌ছে বলে মনে হচ্ছে না।

নিখিল কিছুক্ষণ সাড়া দিল না। সে দাঁড়িয়েই আছে, মিণ্টু না ফেরা পর্যন্ত সে বসবে না।

কথার উত্তর না পেয়ে দীপু মুখ ফেরালো। নিখিল এদিকে তাকিয়ে

নেই, তার পাঞ্জাবী-ঢাকা পিঠখানা দেখা যাচ্ছে। দীপু আবার বল্‌ল—কই আমার কথার জবাব পেলাম না।

শান্ত, মৃদু স্বরে উত্তর এল—জবাব? কি হবে জবাব দিয়ে দীপু! আমি ত জবাব দেবার কেউ নই, ওটা তোমাদের একচেটে! আমরা আছি সুতো, কাপড় বয়ে আনা, আর পৌছে দেবার জন্যে। আমরা আছি শুভানুধ্যায়ীর উঁচু কেতায়। সেখানে থাকলে যা পাওয়া সম্ভব, তা পেয়েছি। ব্যস, ফুরিয়ে গেছে। এর চেয়ে বেশি কিছু, বা অন্য কিছু চাওয়া চলে না ত! আর মুখফুটে না চেয়ে, শুধু আশা করা মনে মনে সেও—যাক গে! ওসব বাজে কথা! I am getting sentimental. শোনো—

কঠিন ভঙ্গীতে দীপু বল্‌ল—শোনাচ্ছেনই ত, আবার শোনো বলার কি দরকার?

সম্পূর্ণ অন্য সুরে নিখিল বলে—শোনো, আজ যে কাজে এসেছিলাম। ইয়ে, মানে, আমরা এখানকার স্কুল ফাণ্ডে টাকা তোলবার জন্যে একটা ড্রাইভ্ দিচ্ছি। তা সেই ব্যাপারে, আমাদের প্রথম উদ্যোগ হিসেবে, উদয়শঙ্করের নাচের বন্দোবস্ত করছি। তোমরা নিজে ত সেই চ্যারিটি শোর টিকিট কিনবেই, আর, যতগুলো পারো সেল করে দাও, এই রিকোয়েস্ট!

হয়তো এই প্রসঙ্গে আরো মিনিট দশেক কথা কইতে পারতো নিখিল, কিন্তু দীপু তা হতে দিল না। বাধা দিল, বল্‌ল—এই চ্যারিটি, ওই কালীকেত্তন, সেই জলসা, এসব ছাই-পাঁশ নিয়ে মেতে থেকে কি লাভ হয় বল্‌তে পারেন?

—কি হবে আবার? পাঁচজনের সঙ্গে থেকে, কিছু একটা করা হয়! নিজের জন্যে অনেক ত চেষ্টা করলাম—বিলেত যাওয়াও যেমন হ'ল, তেমনি অন্য সব, আর কি। সে যাক, এটা কিন্তু তোমাকে করতেই হবে! তোমাদের স্কুলের ভারটা নাও না কেন!

এমনিতে দীপু নিখিলের এই খামখেয়ালগুলোকে প্রশ্রয় দেয় না, তবে এতদিন ভাবতো বুঝি হুজুগপ্রিয়তার বশেই নিখিল একটা-না-একটা কিছু ঝুঁকি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আজকের পূর্বাপর কথাগুলো ওকে চোখে আঙুল দিয়ে অন্তকথাই বোঝাতে চাইছে। নিখিলের প্রত্যেকটি কথা যেন

লোহার চেয়েও ওজনে ভারি, ইস্পাতের চেয়েও তীক্ষ্ণ তার ধার! মূক, মূঢ় সমবেদনায় দীপু অবশ হয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে নিখিল এক সময়ে বলে—আচ্ছা, এখন চলি!

চমকে উঠল দীপু। কিন্তু ওর কথা বলার সুযোগ হ'ল না। তার আগেই নিখিল সেখান থেকে চলে গেছে। ব্যস্ত ব্যগ্রভাবে তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরুবার পথে দীপু দরজার সামনে চেয়ারে ধাক্কা খেল। ওর তলপেটে চেয়ারের একটা কোণার খোঁচা লাগতেই মাথাটা ঘুরে গেল। অসহ্য কাতর যন্ত্রণায় অস্ফুট শব্দ ক'রে বসে পড়ল দীপু।

ছেলেকে উঠিয়ে নিয়ে মিণ্টু রান্নাঘরের মুখে আসতেই দেখল দীপু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। নিখিল নেই। কি হ'ল? দীপুকে ডেকে কোনো সাড়া পেল না মিণ্টু।

দেবজ্যোতি শ্রান্তদেহে কোয়ার্টারে ফিরছিল। পিছন থেকে তার নাম ধরে কে যেন ডাকছে। ইচ্ছে করছে না একটি কথা কইতে। কিন্তু সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। তাই সে দাঁড়ালো।

সামনে এসে নিখিল বলল—চলুন, পথে আর আটকে রাখবো না। এই একটু আগে আপনার ওখান থেকে ঘুরে এলাম।

অগত্যা নিখিলকে সঙ্গে নিয়েই দেবজ্যোতিকে বাড়ি ঢুকতে হ'ল। অমল আর মল্লিকা এসেছে, ওদের সঙ্গে মিণ্টু কথা কইছিল। দেবজ্যোতির গলা পেয়ে গম্ভীর হয়ে মিণ্টু বলল—এসেছেন!

নিখিলকে সঙ্গে দেখে মিণ্টু অনুযোগ করল—বেশ লোক যাহোক, চা খেতে চেয়ে চলে গেলেন?

—যেতে আর পারলাম কই। দাও, এবার চাও ভালো হবে।

অমল প্রশ্ন করে দেবজ্যোতিকে—তারপর, আজকের কমিটি মিটিং-এ কি কতদূর হ'ল?

দেবজ্যোতি হাতের তালু উল্টে হতাশার ভঙ্গীতে বলে—যা হবার তাই

হ'ল। এখন আর কমিটি মিটিং হয় না, ওই হাত তুলে প্রস্তাব সমর্থন করো, কিম্বা, না করতে চাও হাত তুলো না! মেম্বারই বলো, আর ভাইস্-প্রেসিডেণ্টই বলো সকলের এক দশা। সে সব জমানা আর নেই। এখন যা করবার ওই সেক্রেটারী রামেশ্বর, প্রেসিডেণ্ট গোমেজ, আর কোম্পানী। ওরা তোমাদের প্রস্তাবটুকু কোম্পানীর দপ্তরে পাঠাবে, সঙ্গে একটা ফরোয়ার্ডিং নোট দিয়ে—তারপর যা করে কোম্পানী দয়া ক'রে। ব্যস ফুরিয়ে গ্যালো।

অমল বল্ল—তবে যে শুনছিলাম, এবারে ডবল ইউনিট কোয়ার্টার বানানো শুরু হবে পুরো দমে।

হাসলো দেবজ্যোতি—হ্যাঁ, তা হ'তো। কিন্তু কন্‌ষ্ট্রাক্‌শন এ্যাণ্ড রিপেয়ারিং ফাণ্ডের বাজেট হচ্ছে তিরিশ লাখ টাকা, তার মধ্যে মেরামতী খরচই নাকি দশলাখ লেগে যাচ্ছে। মানে, ওই সিনিয়র ক্লাব, ডিরেক্টরের বাংলো সাহেবসুবোদের বাংলো ইত্যাদির পেছনেই প্রায় সবটা যাবে। তা বলে মনে ক'র না, তোমাদের ফাঁকি দিচ্ছে কোম্পানী। আরে ডবল ইউনিট না হলে কি হয়, তার বদলে 'কে' টাইপের প্রত্যেক ঘরের পিছন দিকে একটা করে দরজা বসিয়ে দিচ্ছে আর বারান্দাও একটা তৈরী ক'রে দিচ্ছে।

মিণ্টু বলে—তাতে কি লাভ হল?

—বাঃ লাভ হল না? কোয়ার্টারের পিছনে বারান্দা থাকলে তোমাদের কতো সুবিধে। অন্ততঃ বসতে পারবে ত! আর এই যে ঘরে ঘরে গরু পোষবার জন্যে লোকে এন্‌তার টিনের চালা তুলেছে, সেগুলো ভেঙেচুরে ফাঁকা করে দিতে পারবে কোম্পানী। দু-চার দিনের মধ্যেই অর্ডার বেরুচ্ছে এই ছাখো না—সমস্ত বেআইনী অননুমোদিত চালাঘর ভেঙে ফেলতে হবে, নইলে কোম্পানী নিজের খরচে সেগুলো ভাঙবে এবং ভাঙার খরচ আদায় করবে চালাপিছু পঞ্চাশ টাকা।

কথাটা শুনে মল্লিকার মুখ শুকিয়ে গেল। বেচারী দুধের খরচ বাঁচাবার জন্যে দুটো ছাগল পুষেছে, অমলকে দিয়েই কোয়ার্টারের সামনের জমিতে ছোট্ট একখানা টিনের চালা তুলিয়ে নিয়েছে। দেবজ্যোতির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মল্লিকা বলে—কি দরকার ছিল এইসব ইউনিয়ন করার। এতে

কার যে ভালো হচ্ছে জানিনে! কোথাও কিছু নেই, উট্‌কো বারান্দা দিয়ে ভারি উপকার করলেন ওঁরা। এ তোমাদের জুলুম দাদা, আচ্ছা বলো তো কতো লোকের সর্বনাশ হবে। আর তাতে কোম্পানীরই বা লাভ কি!

নিখিল বল্‌ল—হবে, আস্তে আস্তে সব হবে। তা বলে কোম্পানী কি আর নিজে থেকে কিছু করবে? আমাদেরই চেষ্টায় হবে, আদায়—

এই পর্যন্ত বল্‌তেই নিখিল ধমক খেলো অমলের কাছে—থামুন মশাই! আমাদের কথা আর বলবেন না। আমরা ত কেবল ঝগড়া করতে আর দল পাকাতেই পারি। নইলে আজ এই অবস্থা হয়! ইউনিয়ন আর এ্যাক্‌শন ক'রে এখন এই দাঁড়িয়েছে যে, কোম্পানীর হুকুমে আমাদের উঠতে বসতে হচ্ছে। মজদুরের নিজস্ব ইউনিয়নের অফিস, সেখানেও ত পুলিস পাহারা দিচ্ছে। আমরা কোথায় চলেছি?

দেবজ্যোতি বল্‌ল—দীপুকে দেখছি না। সে কি ক্লাব থেকে এখনো ফেরে নি, নাকি?

মিণ্টু জবাব দিল—কি জানি কি হয়েছে ওর। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল রান্নাঘরে।

—হুঁ! হিস্টিরিয়া। তা অতো ধানাইপানাই করছে ক্যানো। সোজাসুজি বিয়েটা করে ফেলুক না, তাহলে লোকের কাছে কথা শুনতে হয় না আমাকে!

মিণ্টু বল্‌ল—না গো, সত্যি ওর খুব চোট লেগেছে। নইলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে!

—না, না, এমন কিছু লাগে নি, তবে বেটপ্‌কা খোঁচা লেগে গ্যালো কি না, তাই—

এই কথা বল্‌তে বল্‌তে ঘরে ঢুকলো দীপু।

—ওমা, এই দেখলাম তুই ঘুমোচ্ছিস, আর এই উঠে পড়লি!

মল্লিকা বলল।

দীপু হাসলো—তোমাদের ত গলা নয়, ঢাকের বাদ্যি। ঘুম হবার জো কি?

কথার মধ্যেই ওর নজর গিয়ে পড়ল নিখিলের মুখের ওপর। বেচারীকে দেখে কেমন যেন কষ্ট হয়। দীপুর মনে হয়, এ মানুষটা ওদের জন্যে অনেক কষ্ট করেছে। এর জন্যে স্বার্থত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু—তার বেশি আর ওর চিন্তা এগোতে পারে না। নিখিল মহৎ, উদার, নিখিলের অনেক গুণ! এখানকার সকলের চেয়ে নিখিল বিদ্বান এবং গুণবান। দীপু নিখিলের কথাই ভাবছে।

এদিকে সকলেই একযোগে ওকে প্রশ্ন করে—কি হয়েছিল, কোথায় চোট লেগেছে। এখন কেমন আছে দীপু। ডাক্তারকে খবর দেওয়া দরকার থাকলে বলুক, সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আরও অনেক কথা। সবগুলো কানেও শোনে না দীপু, শুনলেও মন দেয় না। না ভেবেই জবাব দেয়—দায় সারা একটা-আধটা জবাব।

মিন্টু চা দিল। দেবজ্যোতি জলখাবার খেতে রাজী নয়, রামকিষণ শর্মা তাকে খুব খাইয়েছে।···সবই দীপুর চোখের সামনে ঘটছে। কিন্তু ওর মন এখানে নেই। নিজের মধ্যে নানা কথা আর স্মৃতির জটলা চলেছে।··· অনিলের বিয়ের কথা উঠল। দীপুকে সম্মত হ'তে হল—মেয়ে দেখতে যাবে ও।

নিখিলকে এক ফাঁকে দীপু বলল—আপনার চ্যারিটির টিকিট বই দিয়ে যাবেন, যতটা পারি পুশ্ করবো।

হাসল নিখিল—দশখানার বই, না, পঁচিশ খানার?

—একশো খানার বই থাকলে তাই দেবেন। অম্লানকে নিয়ে একটু চেষ্টা করলেই বিক্রী হয়ে যাবে।

নিখিল যেন খুব খুশী হয়েছে, বলে—তা খুব হবে। অম্লানবাবুর ত যথেষ্ট ইনফ্লুয়েন্স আছে।

দেবজ্যোতি বলল—কিসের টিকিট?

দীপু উত্তর দিল উৎসাহভরে—নিখিলদা এবার বিরাট ব্রত নিয়ে নেমেছেন। নতুন স্কুল-বিল্ডিং-এর জন্যে চ্যারিটি শো হবে, উদয়শঙ্করকে আনছেন।

—তা ভালো। এমনিতে চাইলে ত চাঁদা কেউ দেবে না। তবে ওইরকম

আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করলে টাকা আসবে জলের বেগে। এটা ভালো মতলব। কোম্পানী ত কিছুই করলে না!

দেবজ্যোতি খুশী হয়েছে। সে নিজেও পঞ্চাশখানা টিকিট বিক্রীর ভার নিল। অমল বল্‌ল—আমাকে দেবেন দশখানার একটা বই, দেখবো চেষ্টা ক'রে।

গল্পে গল্পে পৌনে দশটার ভোঁ বেজে গেল। সবাই হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। রাত হয়েছে। এবার যেতে হবে।

ওরা যখন চলে গেল তখনও দীপু ভাবছে, নিখিলের কথাই ভাবছে ও। বেচারী কতো খুশী আজ, চ্যারিটি শোয়ের টিকিট বিক্রীর প্রতিশ্রুতিতে। সত্যি ওরকম বিচিত্র সুন্দর মানুষ পৃথিবীতে দুর্লভ। তবু দীপু নিখিলকে ঠিক ষোলআনা মানুষের গণ্ডীতে ফেলতে পারে না। ওকে খুশী করবার জন্যে, অম্লানের সাহায্য নিয়ে দীপু অনেক টিকিট বিক্রী করে দিতে পারে। অম্লানের সাহায্য ছাড়া কিছুই যেন পৃথিবীতে ঘটতে পারে না। নিখিলকে খুশী করতেও দরকার হয় অম্লানের। দেবিকার চিঠিখানা মনে মনে ছিঁড়ে ফেলেছে কতোবার দীপু তার ঠিক নেই। ও চিঠি দেওয়া যায় না—দেখানো যায় না কাউকে। অতএব নিখিল করুক শিক্ষার উন্নতি, দেবিকা কলকাতায় পার্টির কাজ করছে, তাই করুক না কেন! দীপু মনকে শক্ত করে ফেলেছে—অম্লানকে এভাবে মাঝ পথে নামিয়ে দিতে পারবে না। ওর মনে হচ্ছে, দীপুর অভাবে অম্লানের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর কোনো কিছুই ও ভাবতে চায় না। অম্লানের মুখ চেয়েই নিখিলকে অস্বীকার করতে হবে, দেবিকার অনুরোধ উপেক্ষা করতে হবে দীপুকে।

ইউনিয়নের ষ্টেশন-ওয়াগনের লাউড্‌ স্পীকার হেঁকে চলেছে—যারা এখনো এ্যাক্‌শনের ভাঁওতায় ভুলে আছে, তারা যেন কালই ইউনিয়ন আপিসে গিয়ে নাম লিখিয়ে সভ্য হয়ে যায়। ইউনিয়ন বেকার মজদুর ভাইদের কাজে বহাল করিয়ে দেবেই দেবে। এ্যাকশনের সভাপতি রামপদরথ বর্মা পালিয়েছে। এ্যাক্‌শানবালারা হালে পানি পাচ্ছে না। তারা যে বলেছিল, কারখানায় [illegible] হিলা দেগা।' পেরেছে? পারে নি। তেমনি, এ্যাক্‌শন এই ভালো-

মানুষ সরলবিশ্বাসী মজদুরদের ভাগ্য নিয়ে তামাশা করছে। কিন্তু ইউনিয়ন এখনো মজদুরদের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজ বারি ময়দানের সভাতে কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ মশাই ভরসা দিয়েছেন, মজদুরের আখের ভারতের আখের,—আজাদীর ভিত্ হচ্ছে এই মজদুর। নইলে ইউনিয়ন আবার নিজের দখল কায়েম করতে পারতো না। নইলে, কোম্পানীর মালিকেরা জুলুম ক'রে যে কারখানা লক্ আউট করেছিল তাকে টলাতে পারতো না। নইলে আজ আবার মানিকপুরের বেকার মজদুরেরা কারখানায় কাজ করতে পারতো না। অতএব—'আপনা রোটি কো সওয়াল করো ভাই! ইউনিয়ন মে তুরন্ত শামিল হো যাও। আপনা বাল্-বাচ্চোঁকে আখের খেয়াল রাখো। ইউনিয়ন মে আও, বারি সাহেবকা ইউনিয়ন, তুম্হারে লিয়ে খুলা হায়। আপ্না রোটি কো সওয়াল করো,—

দেবজ্যোতি বিছানায় উঠে বসল। রামঅওতারের কণ্ঠস্বর। হাঁ রাম-অওতার আবার টুপী পরছে। গোমেজ সাহেবের অনুরোধে সে আবার ইউনিয়নের জন্যে উদয়াস্ত খাটছে। আসলে বুঢ়াউ লোকটা কাজ-ছাড়া থাকতেই পারে না। তাকে কাজ করতেই হবে। আর সে কাজ শ্রমিকের পক্ষে কল্যাণকর হওয়া চাই। রাত এগারোটার সময় মানিকপুরের পথে পথে সে হাঁক দিয়ে চলেছে—'আপনা রোটি কা সওয়াল করো।' এমনি ভাবে এর আগেও এই কণ্ঠস্বরে সে বারি সাহেবের আমলে ইউনিয়নে যোগ দিতে ডেকে ছিল মজ্দুরকে। সেদিন বলেছিল স্ট্রাইক করবার সংকল্প গ্রহণ করো। আজ সে বল্‌ছে, কাজে যোগ দাও, এসো। তখনও রুটিরই সওয়াল ছিল, আজও তাই রয়েছে। সেবারও সে কল্যাণকামনা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—এবারও সেই বিশ্বাসই রামঅওতারকে প্রবুদ্ধ করেছে।

তাকে ওরকম ভাবে উঠে বসতে দেখে মিণ্টু তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে ব'লে—নাও, শোও রাতদুপুরে জেগে বসে থেকো না, শরীর খারাপ হবে।

দেবজ্যোতি শুনতে পায় না। তার নিজের প্রতি করুণা হয়। সে কেন পারে না সবকিছু ভুলে গিয়ে আত্মভোলা হয়ে এমনিভাবে সকলের কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে। কেন সে কেবল দূরে বসে বিচার বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যস্ত

থাকে। কেবলই শ্রমিকের ভুলটুকু আর খুঁৎগুলো নিয়ে মাথাব্যথা করেই এতকাল কাটালো সে। কাজ করল কই!

মিণ্টু এবার হাত ধরে জোর করে টেনে শুইয়ে দিল দেবজ্যোতিকে। গায়ে লেপ ঢাকা দিয়ে মৃদু স্বরে বলে—আচ্ছা পাগল!

মিণ্টুর গা ঘেঁষে সরে এসে শুলো দেবজ্যোতি। ভারি ভালো লাগে ওর এই-ধরনের স্নেহপ্রশ্রয় জড়ানো তিরস্কার।

তিরানব্বই

আওয়াজটা রামকিষণ শুনেছিল। কিন্তু সেটা যে গুলীর শব্দ তা সে বুঝতে পারে নি। তা ছাড়া একটু অন্যমনস্কও ছিল সে। তার মাথায় এখন ইউনিয়নের শত সমস্যা। এ্যাক্‌শন বডির আনুগত্য কাটিয়ে হুড়-হুড় ক'রে শ্রমিকেরা ইউনিয়নের তাঁবে চলে আসছে। এক একটি মূর্তিমান সমস্যা। তাদের মধ্যে অনেকেই একদা রামকিষণকে 'বাপ-মা' উদ্ধার করে গালিগালাজ করেছে—আর জিলানী বা রামঅওতারকে প্রকাশ্যে মারধর করতেও কসুর করে নি। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলাই এখন তার কর্তব্য। প্রতিশোধ নেবার মতো মনোবৃত্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে।

বাজারে শিউশরণের দোকানে 'সত্‌নারায়ণ পূজো'তে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে রামকিষণ ব্যস্তভাবেই ইউনিয়ন অফিসে যাচ্ছিল। সেখানে সেক্রেটারী রামেশ্বর হাট সাজিয়ে বসে থাকবে। বাইরের বসবার ঘরে যতোসব তালবাজ মেম্বার আসর গরম করছে। রাত এখন আটটা। রাস্তাটা পার হয়ে রামকিষণ একটা বিড়ি ধরাচ্ছিল, এমন সময়ে দেখল একটা জিপ্‌ 'ভেঁপু' বাজাতে বাজাতে বেশ জোরে চলে আসছে। নিজের অজ্ঞাতেই সে একটু পাশে সরে আসে। ফট্‌-ফট্‌ শব্দ করে জিপটা চলে গেল। তারপরই হৈ-চৈ। 'মারডালা' 'গোলী কিয়া' 'জান্‌সে মারা' 'পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো'! কি ব্যাপার?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রামকিষণকে ফিরতে হল।

সারা বাজারের লোক ভেঙে পড়েছে। শিউশরণ বেচারী ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে।

রামকিষণ ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল—হঠ্‌ যাও ভাই—সরুন দাদা—!

ঠিক যে জায়গাতে রামকিষণ একটু আগে বসে ছিল, সেই জায়গাতেই কাৎ হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে লোকটি। রামকিষণ ভিড় সরাতে সরাতে বলল—কেউ ভাই সাইকেল করে হাসপাতালে যাও, এ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে এস চট্‌ করে। বলো, আমি রামকিষণ শর্মা এখানে আছি। জল্‌দি যাও ভাই!

বাজারময় সোরগোল পড়ে গিয়েছে। দলে দলে লোক আসছে। নানা লোকের হরেক প্রশ্ন। লোকটা কে? কোন্‌খানে গুলী লেগেছে? জিপ্‌টা কোথায় পালালো?

এই হট্টগোলের মধ্যেই শিউশরণকে থানাতে পাঠালো রামকিষণ—যাও খবর দাও, জিপ্‌টার পাত্তা লাগাতে হবে।

কন্‌কনে শীতের মধ্যেও রামকিষণ ঘেমে উঠল। তার চোখের সামনে একটা মানুষ একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পিঠে গুলী লেগেছে। তাজা রক্তে জামাটা ভিজে উঠেছে। বাজারের ডাক্তারখানাতে লোক পাঠানো হ'ল, কিন্তু ডাক্তারকে পাওয়া গেল না—তিনি 'কলে' বেরিয়ে গেছেন।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই এ্যাম্বুল্যান্সের গাড়ি এসে পৌছলো।

আশ্চর্য, এ লোকটিকে কেউ চেনে না। হাসপাতালে নাম লেখাবার সময় রামকিষণ নতুন চিন্তায় পড়ল—বিনা নামে চিকিৎসার কোনো অসুবিধে নেই বটে, কিন্তু জখম লোকটির বাড়িতে খবর দেওয়ার কি হবে?

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বল্‌লেন—বাঁচবার আশা নেই। তবে চেষ্টা ক'রে দেখা যাক।

হাসপাতাল থেকে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে রামকিষণ এসে পৌছয় ইউনিয়ন অফিসে। এখনই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ইউনিয়নের ভ্যানখানা নিয়ে শহরময় টহল দিতে হবে, লাউডস্পীকারে বল্‌তে হবে—মানিকপুর বাজারে শিউশরণের মুদী-দোকানের সামনে একজন মাঝবয়সী লোক গুলীতে জখম হয়েছে। তার গায়ের রং ময়লা, মাথায় পাগড়ী, গায়ে পুরোহাতা মিলিটারী খাকী সোয়েটার—পাঞ্জাবী কোনো মজদুর ভাই বলে মনে হয়। লোকটির নাম ধাম জানা যাচ্ছে না। যদি কোনো মজদুর ভাই-এর আপনা আদমী হয়, তাহলে হাসপাতালে কিম্বা ইউনিয়ন অফিসে খোঁজ করুন।

পথে আসতে আসতেই রামকিষণ এই মতলব ভেঁজে ফেল্‌ল।

পুলিস পাহারা দেওয়া ইউনিয়ন অফিসের গেট পেরিয়ে, সামনের ঘরে ঢুকে, অন্যদিন সে আব্দুল বারি সাহেবের ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় ক'রে

শ্রদ্ধা জানায়। তারপর জমায়েৎ লোকেদের দিকে এক নজর চোখ বুলিয়ে ছাখে। আজ কিন্তু সটান রামেশ্বরের খাশ দপ্তরে ঢুকে পড়ল সে। বারি সাহেব, গান্ধীজী, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র, প্যাটেল কারুর ছবির দিকে তাকাবার কথা মনেই নেই রামকিষণের। আর যারা সেই সন্ধ্যে থেকে বসে রয়েছে রামকিষণের আশাপথ চেয়ে, তারা ত দেয়ালে টাঙানো ফটো নয়—তাদের মুখচোখে বিষন্ন অপ্রসন্নতা ছেয়ে গেল। কেউ হয়তো ভাবলো, এবার রামকিষণ শর্মাও লীডারীর চাল রপ্ত করে ফেলেছে। সে আর মজদুর সাধারণের আপন লোক থাকতে চায় না—তাই এইরকম ভেবে সেক্রেটারীর ঘরে ঢুকে পড়ল।

একশ' এগারোর তিলক-কাটা কপালটা কুঁচ্‌কে উঠ্‌ল। সে এতক্ষণ বসে বসে জিলানীর সঙ্গে মস্করা করছিল। হঠাৎ রামকিষণকে ঢুকতে দেখে সরাসরি তার মুখের দিকে তাকিয়ে জোর গলায় সে ব'লে উঠল—আরে ভাই দেখো, আব কেয়া হুয়া! শালালোগ বহুৎ 'ডিং' হাঁকতা থা, কি, চিম্‌নী হিলা দেগা, কম্প্‌নী আ-কে গোড় পাকড়ে গা—

আশা করেছিল রামকিষণ খুশী হবে এতে। কিন্তু সে সব কিছুই হ'ল না, রামকিষণ যেন তাকে অপমান ক'রেই কমিটি রুম-এ চলে গেল। মনে মনে একশ' এগারো চটে গেল।

একমাত্র জিলানীই লক্ষ্য ক'রে ছিল রামকিষণের চিন্তাচ্ছন্নতা।

একশ' এগারোর কথার জের টেনে জিলানী বলে—চিম্‌নীতে বিচালীর ধোঁয়া উঠ্‌ছে এখন।

রামকিষণের উপর যতখানি রাগ হয়েছিল একশ' এগারোর সেটুকু সাম্‌লাতে গিয়ে বুড়ো একশ' এগারো তেড়ে গালিগালাজ শুরু করল এ্যাক্‌শন বডিকে আক্রমণ ক'রে। উত্তেজনায় সে হাত-পা ছুঁড়ে আস্ফালন করছে—তেরা বাপ্‌ তমিজুদ্দিন ক্যা কিয়া? আউর, উও বাপ্‌-কা-বাপ্‌ রামপদরথ চুথিয়ানন্দন কাঁহা গিয়া! আব আয়ে হো, ইউনিয়নমে!—কাহে?

জিলানী এক নজর তাকিয়ে দেখল, এ্যাক্‌শন বডির বিস্তর লোক রয়েছে এ ঘরে। ইউনিয়নে নাম লিখিয়ে, আনুগত্যের খৎ স্বাক্ষর ক'রে কারখানায় পুনরায় চাকরীতে বহাল হবার আশা নিয়ে এরা এসেছে। তা আসুক, এরাই

একদা জিলানীর গা থেকে জামা-প্যাণ্ট খুলে নিয়ে সবচেয়ে লজ্জাজনক প্রত্যঙ্গেও থুথু ছিটিয়ে দিয়ে অপমান করেছিল। এরা তার জীবননাশেরও চেষ্টা করেছিল! সেই সব স্মৃতি অন্ততঃ জিলানী এত সহজে মুছে ফেল্‌তে পারবে না। তাই সে বেশ রসিয়ে রসিয়ে বল্‌ল—হাঁ, হাঁ, জামাই, দস্তুর মতো দামাদ বটে! আহা, ওরা ত 'ডিং' হেঁকে বলে বেড়িয়েছে, শালা ইউনিয়ন,—শালা ইউনিয়নের দালাল মেম্বর। তা আমরা শালা হ'লে ওরা ত আমাদের বোনাই ভগিনপোত্‌ হচ্ছে। আরে এ দেখো দাদা একশ' এগারো, আমি বলে দিচ্ছি সাঁচ্‌ মুচ্‌—যতো শালা এ্যাক্‌শনবাজ কারখানাতে ঢুকবে, তাদের পহেলা রোজ হল্‌দে কাপড় পরিয়ে, হাতে হলুদ সুতো বেঁধে, ব্যাণ্ড বাজিয়ে তামাম মানিকপুর টহল দেওয়াবো—তারপর ডিউটির তক্‌তী গলায় লটকে ঢুকতে পাবে বোনাই-বান্‌চোৎরা! চুথিয়া বেঈমান—

এ কথায় একশ' এগারোর নিদন্ত ফোকলা ফর্সা বুড়ো মুখখানা অতিপক্ক কামরাঙা ফলের মতো রস-টুস্‌টুসে হয়ে উঠল।

যারা উমেদারী করতে এসেছে তাদের মুখের দিকে তাকাবার যেন কেউ নেই। তারা কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, এমনই মুখভার ক'রে বসে থাকে, বাধ্য হয়ে। এরা প্রত্যেকেই ত এক কারখানার শ্রমিক। একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সবাই কাজ করেছে। অথচ আজ দলাদলি ক'রে যেন পরমশত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ওকে সইতে পারে না। অথচ এমন ত হবার কথা নয়! তবে কেন হ'ল?

কমিটি রুম থেকে রামেশ্বর ডেকে পাঠিয়েছে জিলানীকে। রামকিষণ বিবর্ণ মুখে বেরিয়ে এসে বল্‌ল। বলা বাহুল্য সে কেবলমাত্র এ্যাক্‌শন বন্ডির প্রাক্তন সভ্যদের উদ্দেশ্য করেই বল্‌ছে।—নমস্তে ভদ্রমহোদয়! হাঁ আপলোগ এ্যায়সা আলাগ-আলাগ কাহে আতে হেঁ? আরে মশাই সবাই একাট্‌ঠা লড়াইতে মদৎ দিয়ে, শেষে কারখানায় ঢুকতে এ ওকে ছিপাচ্ছে, ও এর নামে চুকলী খাচ্ছে! দেখো ভাই, আগর যারা এখনো ইউনিয়নে জয়েন না-করে এ্যাক্‌শনের ঝাণ্ডা নিয়ে চিল্লা-চিল্লি করছে সেই একশো পঁচিশ জন একসঙ্গে এসে সারিণ্ডর্‌ (Surrender) করুক। না হ'লে আজ দুই—কাল পাঁচ,

ইউনিয়ন অপিসে—ভাইসপ্রেসিডেণ্টের টাট্টিখানিতে, কাউন্সিল মেম্বারের বেশ্যা-তলায়, আউর সেক্রেটারীর বাংলোতে দেখা করে, আর্জি করে, এভাবে তোমরা ঝামেলা কেন করছো ভাই। এ দিগ্‌দারী রংবাজী ছোড়্‌কে সিধাসিধী ফ্যায়স্‌লা কর লেও ভাঈ!

আজ যারা এসেছিল আর্জি নিয়ে তাদের মুখপাত্র হিসেবে খুব্‌লাল মিশির এগিয়ে এসে বল্‌ল—দেখুন শর্মাজী, আমাদের ওপর আর গোসা রাখবেন না! একটা কথা বুঝুন কি, আমার নিজের কথা বল্‌তে শরম আসে, তব্‌ ভি বল্‌তেই হচ্ছে, কেঁউ কি, না বল্‌লে শুকিয়ে মরতে হবে। সাধ ক'রে কে আর মরতে চায়। না, নিজের কথা বল্‌ছি না, তিনটে বাচ্চার মুখের দিকে তাকিয়ে ওদের মায়ের যখন আঁখে আঁশু ঝরে, কি বল্‌ব শর্মাজী সরমে মরে যেতে ইচ্ছে করে। আমি শালা মরদের বাচ্ছা না, জান্‌বর?

খুব্‌লালের দিকে তাকিয়ে রামকিষণ স্নেহসিক্ত স্বরে বলে—তা এ হাল তোমার একার নয় মিশ্রজী! আরও ত এ্যাক্‌শনবাজীর স্বামপুল আছে। তাদের বুঝ-সমঝ করিয়ে নিয়ে এসো! না-হলে ইউনিয়নই বা কি করবে ভাই! হররোজ দু-একটা কেস নিয়ে কম্পানীর সঙ্গে খজ্‌লা-খজলী হুজ্জৎ করবে কতদিন ধরে? এদিকে তোমরা সুট্‌-সুট্‌ ক'রে কারখানায় ঢুকে পড়বে, আর পয়সা কামিয়ে ওদের সঙ্গে শয়তানী করবে, তা হবে না।

খুব্‌লাল জবাব দিল—ও হারামীদের কথা ছাড়ুন, ওরা কি আমাদের কথায় কান দেয় না কি! আপ্‌না মতলব-সে ওরা চল্‌ছে। গোড় লাগি শর্মাজী, বিশোয়াস করুন, কোই এ্যাক্‌শনবালার সাথে সাথ রাখছি না আর! ও শালারা খালি লম্বাচওড়া বাং দিয়ে আমাদের ঠকিয়েই এসেছে।

একশ' এগারো মিট্‌মিটে চোখে তাকায়, বলে—সব শালা দালাল আছে, এ্যাক্‌শনের লীডারী করছে, বাৎ উড়াচ্ছে আর কল্‌কাতায় গিয়ে মাগবাজী ক'রে ফিরে এসে ধোঁকা দিচ্ছে কি, ফলানা বাৎ হুয়া বিধান বাবুসে, কালীবাবু মিনিস্টার নে কহা, কি, এ্যাক্‌শন বডি ইয়ে হোগা, উয়ো হোগা। আবে বাহান্‌-চোৎ, খালি দালালী—বিল্‌কুল্‌ ঝুটা বাৎ! বিধানবাবু, কালীবাবুর ঘণ্টা কেঁদেছে ওদের সাথে বাৎচিৎ করতে!

রামকিষণ মৃদু তিরস্কারের সুরে একশ' এগারোকে বলে—আরে ভাই সামাল্ যাও! ইউনিয়ন কখনো কাউকে গালাগালি করে নি, ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে থাকা তার কাজ নয়। আমার কথা হচ্ছে যে, কোই লেবারকা কুছ ভালাই কর্ শকো তো করো ভাই, নেহি ত চুপ-সে রহনা হি সব্‌সে আচ্ছা।

একশ' এগারো বিরস কণ্ঠে বলে—হাঁ-হাঁ ইয়ে ত খাশ বাৎ!

রামেশ্বরের কামরা থেকে বেরিয়ে এলো জিলানী, তার চোখেমুখে উত্তেজনা যেন ফেটে পড়তে চায়। এ ঘরে পা দিয়েই সে ফেটে পড়ল—দেখো ভাই, এহি হ্যায় হারামীকা ইয়াদ!

দু-চার জন কৌতূহলী লোক তার আশপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে—কি হয়েছে? ক্যা হুয়া ভাই?

জিলানী সরাসরি রামকিষণের দিকে তাকিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে—শালাদের ঘাড় ধরে বার ক'রে দাও শর্মাজী। না ত আমাকে শ্রিফ্ হুকুম করো, সব এ্যাক্‌শন্‌বালাদের গাঁড়ে ঠোক্কর দিয়ে জাহান্নামে পাঠাই!

রামকিষণ ডান হাত তুলে জিলানীকে নিরস্ত ক'রে বলে—মান্ যাও ভাই! চুপ রহো বাহাদুর।

জিলানী যেন এ কথায় আরও ক্ষেপে যায়, সে মাথা নেড়ে বল্‌ল—কভি নেহি! ওরা আমাদের বুকে ছুরি মারবে। ওরা ইব্‌লিসের সঙ্গে দোস্তী ক'রে আমাদের লীডারকে খুন করবার মতলবে ঘুরে বেড়াবে! আরে যদি আপনি শিউশরণের দোকানে আর একটু বসে থাকতেন শর্মাজী, তাহলে ত কাবার হয়েই যেতেন রিভল্‌বারের গুলীতে! সেটা ভাব্‌লে আমার খুন্ চড়ে যাচ্ছে।

সবাই সচকিত হয়ে ওঠে এ কথায়—কি ব্যাপার? কি হয়েছে?

রামকিষণ বল্‌ল—সে বড় লজ্জার কথা ভাই! ঝুটমুট একটা পাঞ্জাবী [illegible] জান চলে গ্যালো।

ঘটনার বিবরণ শুনে সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

রামকিষণ মূঢ় মূক মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে—বে-শরম, বেআক্কিল, [illegible]গুলো এটুকু বুঝছে না কেন যে, এ ভাবে কখনো লেবারের আসান হবে না। আরে ভাই, কার জন্যে তুই কি কাজ করছিস, বল্! আঃ! যাক্ যাবে

দেও ভাই। হাঁ, জিলানী তুমি চলে যাও কাজে, এখানে হাওয়া গরম ক'রে কি হবে? ফূর্তি করো ভাই।

জিলানীর ওপর ভার পড়েছে শহরে টহল দেবার। রামেশ্বর কিছুতেই রাজী হয় নি রামকিষণকে ছাড়তে। তার বিশ্বাস, যারা গুলী ক'রে পাঞ্জাবীটাকে মেরেছে, তাদের লক্ষ্য ছিল রামকিষণ। ঘটনার অল্পক্ষণ পূর্বে তারা বেশ ভালো ভাবে দেখে গিয়েছিল রামকিষণকে। এবং তার পরিত্যক্ত আসনে বসে থাকার ফলেই পাঞ্জাবীটা গুলী খেয়ে মরল, দু-মিনিটের তফাতে রামকিষণ খুব বেঁচে গেছে। এর পর আর এভাবে ঘোরাফেরা করা রামকিষণের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়।

জিলানী চলে যাবার পরক্ষণেই রামকিষণ খুব্‌লালের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে শুরু করল—আরে ভাই, দু-চারটে দুষমণ সব দলেই থাকে। তার জন্যে ত দলের সব মানুষই কিছু বরবাদ হয়ে যায় না! তবে, খুব্‌লাল ভাই, হুঁশিয়ার হয়ে যাও, তোমরা যারা এই দিকে ঝুঁকেছো তাদেরও রেহাই নেই!

খুব্‌লালের মুখে কথা সরছে না। এই একটু আগে যে কাহিনী সে শুনেছে তারপর যেন আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না,—এর পর ইউনিয়নের লোকেরা এ্যাক্‌শনবালাদের টুঁটি টিপে মারলেও আশ্চর্য হবে না সে।

সেরকম কিছু ঘটল না। একশ' এগারোর মতো দু-দশ জন ব্যক্তি সোরগোল তোলার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু মাঝ থেকে রামঅওতার এসে পড়াতে ঘরের চেহারা হঠাৎ বদলে গেল।

সে পয়লা চোটে একশ' এগারোকে নিয়েই পড়ল।

—আর তিলক্‌ধারী তুম্ আভি তক্ ক্যা করতে হো? ভাই, রামনাম লেতে যাও, ঘর্‌মে আরাম করো!

একশ' এগারোর আসল নাম তিলকধারী, তবে ও নামে কেউ তাকে ডাকে না। রামঅওতার নিজেও সাধারণতঃ একশ' এগারোই বলে। আজ বিশেষ কোনো কারণে রামঅওতার গম্ভীর ভাবভঙ্গী বজায় রাখতে চায়। তিলকধারী বাহ্যতঃ 'আলাভোলা' আমুদে মানুষ হলেও নিজের স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে বড় হুঁশিয়ার—বড় বেশি হুঁশিয়ার সে। কাজেই রামঅওতারের মুখের দিকে

একনজর তাকিয়েই অনুমান করতে পারে, হাওয়া সুবিধের নয়। হাসি-তামাশা দিয়ে রামঅওতারকে সামলানো অসম্ভব, অতএব অন্য অস্ত্র প্রয়োগ করল সে। গলা চড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে উঠল—ইউনিয়ন আপিস কোঈ কা খাশ শশুরাল নেহি। বহুৎ এ্যায়সা মতলব্‌বাজ—

রামঅওতার হেসে উঠল—সামাল লো ভাই, চিল্লাচিল্লি বেকার করনেকা কোঈ জরুরৎ নেহি হ্যয়! বল্‌ কি বাৎ শুন্‌ লো—

একশ' এগারো তেড়ে উঠল। রামঅওতার যে কি বল্‌তে চায়, তিলকধারীর তা জানতে বাকী নেই। সে কথা এই এত লোকের সামনে একবার উঠে পড়লে সব বানচাল হয়ে যাবে। অতএব, যেমন ক'রে হোক সেটা ঠেকিয়ে রাখতেই হবে।

একশ' এগারো তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে জাঁহাবাজ গলায় গর্জে চলল—দুনিয়াটা বেঈমান আর হিংসুটে মানুষে ভ'রে গিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর যারা ছিল তারা সকলেই তখন একশ' এগারো-কে শান্ত করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল। রামঅওতারকেও দু-একজন মৃদু তিরস্কার করল, অযথা বুড়ো পাগলকে ঘাঁটিয়ে ক্ষেপিয়ে দেওয়া উচিত হচ্ছে না, ব'লে।

ব্যাপারটা তখনকার মতো চাপা পড়ল। কিন্তু রামঅওতার এত সহজে হাল ছাড়তে প্রস্তুত নয়। এই তিলকধারীই তলেতলে ষড়যন্ত্র ক'রে রামঅওতারের নেতৃত্বের মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করেছিল। সামান্য স্বার্থের জন্য এ ধরনের মানুষ যে কত হীন হতে পারে রামঅওতারের তা জানা হয়ে গেছে। আজও যে তিলকধারী ইউনিয়নের মাটি কামড়ে পড়ে থাকে তার কারণ আর কিছুই নয়—চাকরীর আয়ু বাড়ানো। তার বয়স যথেষ্ট হয়েছে, কোম্পানীর নিয়ম অনুসারে সে বাতিল হয়ে গেছে বছর পাঁচেক আগেই—স্রেফ ফন্দিফিকিরের জোরে আজও সে টিকে যাচ্ছে। কিন্তু রামঅওতার আর ছাড়বে না। যেমন করেই হোক সে এবার তিলকধারীকে খতম করবেই।

চুরানব্বই

অবিনাশ চাটুয্যে বোকা বনে গিয়েছে। এ্যাকৃশন বডি গড়ে ওঠার প্রথম মুখে কতকটা আব্দুল শেখের পরামর্শেই সে ফার্স্ট স্টাফের লোক হয়েও বিদ্রোহীদের সমর্থন করেছিল। শুধুই আব্দুল নয়, অবিনাশের স্ত্রীরও এতে সায় ছিল। কিন্তু তারপর থেকে আজ পর্যন্ত অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও হারানো চাকরীতে বহাল হ'তে পারে নি। ইউনিয়নের মাতব্বরদের দ্বারস্থ হয়ে দেখেছে, তারা জবাব দিয়েছে—ফার্স্ট স্টাফ সম্পর্কে কোনো কথা কোম্পানীকে বলতে যাওয়া ইউনিয়নের হুদ্দোর বাইরে। আবার মল্লিক সাহেবের কাছে কথা তুলতে গিয়ে উল্টে ধমক খেয়েছে। আব্দুলও নারাজ হয়ে বসে আছে—তার নিজেরই যেখানে কক্কে নেই সেখানে কোনো 'শঙ্করাকে' স্তোক দিয়ে কি করবে? অতএব মামলা গড়িয়ে চলল শেষ পর্যন্ত কলকাতার হাইকোর্ট পর্যন্ত। হ্যাঁ এ ছাড়া উপায়ই বা কী! যতদিন মামলা চল্‌বে ততদিন ত আর কোম্পানী কোয়ার্টার কেড়ে নিতে পারছে না। তদুপরি শ্বশুর এখনো কোম্পানীর মোটা মাইনের চাকরী করেন। সে ভরসাটাও কম নয়। অবিনাশের স্ত্রী ত আজকাল এ বেলা এখানে থাকেন, ত ওবেলা বাপের বাড়ি। তাঁর এত সব ঝামেলা পোয়ানো পোষায় না। ছেলেবেলা থেকে বড়লোক মা-বাপের একমাত্র সন্তান হিসেবে বিস্তর আদরে-আবদারে মানুষ হয়েছেন। এখন এ সংসারে ঠাকুর নেই, চাকর নেই, আয়া ত কল্পনারও বাইরে—চারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে ক্যাংলাকাচের মতো তিনি থাকবেন কি করে? অবিনাশের শাশুড়ীও সেই সুরে সুর মিলিয়ে বলেন—মেয়ে-জামাই কি আমার পর?

ওই এক শ্বশুরকে নিয়েই যা মুশকিল। মেয়ের সিঙ্গার মেশিন চাই, তার বান্ধবীর নতুন ডিজাইনের যেমন শাড়ী এসেছে ঠিক সেইরকম শাড়ী নইলে সান্যাল সাহেবের মেয়ের জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রক্ষা একেবারেই সম্ভব নয় ইত্যাদি নিত্যনব ফরমাসের ধাক্কায় বৃদ্ধ পিতা জেরবার। আর নাতি-নাতনীদেরও সেইরকম ভাবেই রাখতে হয়। এখানে আবার এ বাড়ির গৃহিণীর হিসেব

অন্তরকম। পাছে মেয়ে মনে করে বাপের বাড়িতে থাকাতে তার মানসম্মান থাকছে না, তাহলেই হয়েছে আর কি। অতএব কুটুম্বের পুত্রকন্যাকে যেরকম তোয়াজে রাখা কর্তব্য ঠিক সেই মোতাবেক রাখতে হবে। এতসব বায়নাক্কার ধাক্কা সাম্‌লে তাঁর মেজাজ শরীফ রাখা সম্ভব হবে কি ক'রে!

অবিনাশ আর যাই হোক, একেবারে অন্ধ নয়। ইদানীং তার আত্মমর্যাদা যেন ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা হচ্ছে। মাঝে মাঝে বৌকে জোর করে নিজের সংসারেই আটক রাখতে চায়। অশান্তি বাড়ে বই কমে না!

এমনি ভাবেই অবিনাশের দিন কাটছে, চুল পাকছে এবং পড়ছে। কিন্তু কোনো সুরাহাই হলো না, বছর ঘুরে গেল—হাজার হাজার লোক নিত্য কারখানায় যাচ্ছে-আস্‌ছে তারই চোখের সামনে দিয়ে। রোজই ভোঁ বাজে। অবিনাশের কাছে এ বাঁশীর শব্দ যেন গোটা জীবনেরই ব্যর্থতাবোধকে নূতন করে জাগিয়ে দিয়ে যায়। কারখানাতে তার স্থান নেই, তার মতো দুর্ভাগা দিনে দিনে সংখ্যায় ক'মতে ক'মতে বর্তমানে পঁচিশ জনে এসে ঠেকেছে। রোজই ওরা মিলিত হয়, যারা কারখানার কাজ ফিরে পেয়েছে তাদের মধ্যেও অনেকে আসে, চাঁদা দেয়। আবার অপরের কাছ থেকেও চাঁদা আদায় ক'রে এনে জমা দেয়। সহানুভূতির অভাব নেই। কিন্তু অন্তরঙ্গতার মধ্যেও কোথায় যেন সুর হারিয়ে গেছে, ছন্দপতনের লক্ষণ ফুটে উঠতে চাইলেও সেটা চাপা দিতে চেষ্টা করে উভয় তরফই। অবশ্য কোনোরকমে একবার কোম্পানীকে গালিগালাজ শুরু করতে পারলেই সকলে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। কোম্পানী থেকে গালিগালাজের ঢেউটা সরাসরি ইউনিয়নের প্রসঙ্গে এসে পৌছায়—ইউনিয়ন, গোমেজ, দালাল, জুলুমবাজী সব কথারই যেন এক অর্থ। পাছে একা পড়ে যায় এই আশঙ্কায় অবিনাশ এইসব বৈঠকে গরহাজির হয় না। তমিজুদ্দিন, সুবল, ইউনুস—এদের মুখ দেখলেও খানিকটা ভরসা হয়। কিন্তু ওই পর্যন্তই—কাজের কাজ হচ্ছে কই।

এদিকে কোম্পানীর জুলুম দিনে দিনে প্রকটতর হচ্ছে। এই যে অবিনাশের স্ত্রীর পঞ্চম সন্তান হবার সময় হাসপাতালে ভর্তিই করলো না ডাক্তারেরা—কি, না, অবিনাশ নাকি কোম্পানীর কর্মচারী নয়! অথচ আদালত ত অন্যরকম

কথা বলছে না! এই সঙ্কটময় অবস্থায় কোম্পানী যে অভব্য আচরণ করল, তার প্রতিকার কি? অথচ মজার কথা এই যে, অবিনাশ চাটুয্যে এখনও মেয়ে স্কুলের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।…অবশেষে, অনেক তক্‌রার করার পর—অবিনাশের শ্বশুরের কন্যা হিসেবেই হাসপাতালে 'বেড্' পেল অবিনাশের স্ত্রী! আর আসন্ন প্রসবের যন্ত্রণায় অবিনাশের পঞ্চম সন্তানের মাতা স্বামীকে বল্‌ল—তুমি একটা জানোয়ার! খেতে দিতে পারো না, অথচ—!

অবিনাশ এখন প্রতি শনিবার উপবাস করে, 'শনিগ্রহে'র কোপকটাক্ষকে প্রসন্ন করবার মানসে 'বারের' পূজোও নিয়মিত শুরু করেছে। এটা তার শ্বশুরেরই সদুপদেশ!

এ্যাক্‌শনের উদ্যোক্তাদের পথে বসিয়ে দিয়ে রামপদরথ বর্মা সরে পড়েছেন। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। তমিজুদ্দিন এর মধ্যে আরও দু-বার সালাউদ্দীনকে এনে বক্তৃতা দেওয়াবার প্রস্তাব করেছে। তাতে তেমন সাড়া পাওয়া যায় নি।

মাঝে মাঝে অন্ধকারে ইউনিয়নের দু-একজন লোক জখম হয় এখনও।

তবে সম্প্রতি একটা খুনের ব্যাপার নিয়ে শহরময় হৈচৈ পড়ে গেল। অভিজিৎ সিংকে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর ছুরি মেরেছে একদল লোক। অভিজিৎ অবশ্য বাঁচলো না। বিপদ হ'ল এ্যাক্‌শন বডির। সাতজন পুরনো দাগীকে ধরে নিয়ে গেল পুলিসে। তাদের মধ্যে সুবল-ইউনুস্‌ও রয়েছে। শহরের বাজারে ইউনিয়নওয়ালারা গলাবাজি ক'রে ব'লে বেড়ালো,—এ্যাক্‌শন ওয়ালারা খ্যাপা কুকুরের মতো যাকে পাচ্ছে তাকেই কামড়ে দিচ্ছে। —এ্যাক্‌শন্‌সে তফাৎ রহো ভাই! অভিজিৎ সিংএর মতো মুখিয়া এবং জনপ্রিয় নির্বিবাদী মানুষকে যারা নৃশংসভাবে হত্যা করতে পারে, তারা সব পারে—তবে ইউনিয়নকে দমানো অত সহজ নয়।

শোকসভা আহূত হ'ল। নেতা অভিজিত সিংএর অকাল বিয়োগে অনেকেই দুঃখ সমবেদনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এরকম একজন নেতা হয় নি আর হবেও না! পরিশেষে বক্তারা সবাই এ্যাক্‌শনের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার করল! বল্‌ল অনায়াসেই বেআইনী এই গুণ্ডাদলকে পিঁপড়ের মতো টিপে মেরে

ফেলা যায়। কিন্তু ইউনিয়ন ত কখনো চায় নি কোন শ্রমিকের সর্বনাশ করতে, তাই এতদিন সব অত্যাচারই সহ্য করে এসেছে। এ্যাক্‌শনওয়ালারা ইউনিয়নের নামে রসিদ বই ছাপিয়ে হাজার হাজার টাকা চাঁদা আদায় করেছে, তাতে ইউনিয়ন বাধা দেয় নি—অথচ সে কাজটা বেআইনী। তারপর অনেক গালি-গালাজ খুনখারাবী এ্যাক্‌শনবালারা করে এসেছে, ইউনিয়ন গায়ে মাখে নি। অবশেষে যখন সরকারের অনুরোধে এবং আনুকূল্যে সাধারণ শ্রমিকেরা ইউনিয়নের প্রতিনিধি নির্বাচনে এগিয়ে এল, তখন প্রথম দিনে এ্যাক্‌শনবালারা বলল—'ঠিক আছে, এ নির্বাচন এ্যাক্‌শনবডি মেনে নেবে।' বরং বলা যায় যে, এ্যাক্‌শনবালাদের জুলুম, জবরদস্তি, জেদাজেদীতে পড়েই ইউনিয়নের নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। অথচ নির্বাচনের ঠিক তিন দিন আগে হঠাৎ বর্মা সভা ডেকে ফতোয়া দিল—দালালদের এই ইলেক্‌শন, একটা ভাঁওতা! এতে এ্যাক্‌শানবালারা মদৎ দেবে না, ইউনিয়ন আর এ্যাক্‌শন কখনো এক হতে পারে না।...এমনি করে ওরা মজদুরদের ঘোল খাইয়েছে। মজদুরের সর্বনাশ করেছে। ওরা কি চায়? কেন এসব করছে এখনো? যাই হোক, এরপর আর ইউনিয়নের লোকেরা পড়ে পড়ে মার খাবে না। এক-ঘা জুতো খেলে দশ-ঘা বদলা নেবে। অতএব গুণ্ডারা যেন সাবধান হ'য়ে চলে।

...এই হলো অভিজিৎ সিং-এর মৃত্যু উপলক্ষে শোক প্রকাশ!—ইউনিয়ন বদলা নেবে!

শোকসভার দু-দিন পরেই আসামীরা বেকসুর খালাস পেল। তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করা যায় নি।

ওদের এইভাবে ছেড়ে দেওয়াতে অনেকেই পুলিসের উপর চটে গেল।

সেদিন গভীর রাত্রে গোমেজ সাহেব কলকাতা থেকে মোটরে করে মানিকপুরে পৌঁছে দেখলেন বাংলোতে অনেক লোক।

বাংলোটা আসলে রামেশ্বরের। কোম্পানী থেকে ইউনিয়নের সেক্রেটারীকে এটা দেওয়া হয়েছে। গোমেজ অতিথি হিসেবেই এখানে ওঠেন।

ভিড় দেখে গোমেজ বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলেন না। ক্লান্তি এবং বিরক্তিতে তাঁর মুখখানা ঈষৎ অপ্রসন্ন। রাত এগারোটায় পৌছেও রেহাই নেই!

বুড়ো তিলকধারীই সর্বাগ্রে মুখ খুললো—অভিজিৎ সিং ত গেল, এবার কোন্‌দিন আমাকে না বেঈমানরা খতম করে!

রামঅওতার কথাটা লুফে নিয়ে জবাব দিল—আরে দাদা! তোমার অত ভাবনা কিসের! কপালে তিলক সেঁটে হনুমানজীর বিজ্ঞাপন না ক'রে, এখন ত ঘরে বসে আরামসে রামনাম করতে পারো! তোমার তিন ব্যাটা, তুই নাতী—ফলাও লরীর কারবার। নোকরীর কি দরকার বলো?

গোমেজ হাসলেন—ঠিক বাৎ!

তিলকধারী ক্ষেপে গেল—সব শালার চোখ টাটায়! আরে বাহান্‌চোৎ তোর উমর ত হাম্‌সে পাঁচ শাল জেয়াদা হোগা কম্‌সে-কম!

সবাই এ কথায় উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

তিলকধারী আরো চটে গেল—আরে রাখ, সব সাধুকে চিনি আমি, ওরকম বাউরী নিয়ে ঘর করে যারা তাদের জবান ত মুখ দিয়ে বেরোয় না—

রামকিষণ ধমক দিল—আঃ কি হচ্ছে, একশ' এগারো! তুমি ঝামেলা করো না, এখন ঘর যাও। দেখচ না সাহেব এখন থকে' গিয়েছেন। যাও ভাই ভিড় হঠাও কাল সকালে সব এসো।

একথায় অনেকেই চলে গেল। কিন্তু তিলকধারী নড়ল না।

আসামীরা বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে এখবর শুনে গোমেজ বল্‌লেন—আবার হুজ্জৎ করবে ওরা!

রামেশ্বর জবাব দিল—অন্ততঃ এ মামলার সঙ্গে ওদের কোনো যোগসাজস ছিল না। এটা স্রেফ্ ব্যক্তিগত আক্রোশের ব্যাপার।

—কি রকম?

রামেশ্বর বয়সে তরুণ, তাই আসল কথাটা খুলে বলতে একটু সঙ্কোচ বোধ করে। রামকিষণ ব্যাপারটা আন্দাজ ক'রে নিয়ে নিজেই বল্‌ল—অভিজিৎ কোনো কালেই চরিত্রবান লোক ছিল না। হাল্‌ফিল ও করেছিল কি, পটুলা ব'লে একটা লোকের অল্পবয়সী বৌকে গায়েব করে রেখেছিল

আসানসোলে। পট্‌লা বেপরোয়া লোক! আর ওর জানপছানা লোকেরও অভাব নেই। সে-ই অভিজিৎকে খুন করিয়েছে। জিলানী সব জানে।

গোমেজ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন, তারপর বল্‌লেন—যাক্, যা হয় হোক, তোমরা এর মধ্যে নাক গলাতে যেয়ো না। এ্যাক্‌শন-ইউনিয়নের আকচের মামলাই থাক।

এর পর কাজের কথা এসে পড়ল। ওরই মধ্যে গোমেজ প্রশ্ন করলেন—তা সেই পট্‌লার বৌএর কি হাল এখন ?

রামেশ্বর হাসতে হাসতে বলে—ঠিক যে ওরই বৌ তাও নয়, তবে—হ্যাঁ, এখন সব মিটে গিয়েছে।

—আর অভিজিতের বিধবা ?

—অভিজিতের গাঁও-ভাই রামস্বরথ তাকে দেশে রেখে এসেছে।

এই সময়ে বাদল এসে ঢুকল। তাকে দেখে সবাই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

রামঅওতার হেসে প্রশ্ন করে—কী চাচাজী, এত রাতে যে!

গোমেজকে হাত তুলে নমস্কার ক'রে বাদল রামঅওতারের কথার জবাব দেয়—একটু দরকার ছিল!

গোমেজ বল্‌লেন—বলুন ভাই!

রামঅওতার বল্‌ল—ও বুঝেছি।

বাদল কুণ্ঠিত ভাবে রামঅওতারের দিকে তাকিয়ে অনুনয়ের সুরে বলে—চাচাজী আপনি আমার হয়ে প্রেসিডেন্ট-সাহেবকে বলে দিলে ভালো হয়।

—আচ্ছা বেটা!

রামঅওতার বাদলের মুখচোরা স্বভাব বেশ ভালো ভাবেই চেনে। তাই উৎসাহভরে গোমেজের দিকে তাকিয়ে বল্‌তে শুরু করে—এই ছোকরার বাবা, সেই লুজ্‌ ওয়াগন এ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছিলেন,—

—ও, যে কেসটা নিয়ে আমরা খুব লড়েছি। তা সেটা ত শেষ হয়ে গেছে। আপনারা কম্‌পেন্‌সেসন পান নি ?

গোমেজ প্রশ্ন করলেন।

বাদল জবাব দিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, পরশুই টাকা পেয়েছি। আর আমাকে নতুন দু-কামরার কোয়ার্টারও দেওয়া হয়েছে, একমাস হ'ল।

গোমেজ ভ্রূকুঞ্চিত করেন—তবে, আর কি সমাচার?

রামঅওতার জবাব দিল—না সাহেব, বাদল কোনো আর্জি নিয়ে আসে নি। ওর ইচ্ছে, দীনদয়াল সান্যালের নামে দামোদরের শ্মশানঘাটে একটা ঘর বানায়। মানে স্মৃতিচিহ্ন।

—তা শ্মশানঘাট কেন?

বাদল আড়ষ্ট ভাবে বল্‌ল—শ্মশানযাত্রীদের জন্যে যে ঘরখানা ছিল সেটা ভেঙেচুরে গিয়েছে। সেটা বানিয়ে দিলে লোকের অনেক সুবিধে হয়। আর বাবার নামটাও থাকে।

গোমেজ অধীর ভাবে বলেন—আমরা ত ও কাজটা কোম্পানীকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারি। বরং তোমার যে টাকা খরচ হচ্ছিল সেটা ইউনিয়নের ফাণ্ডে দিলে ত পারো!

বাদল চুপ করে থাকে। রামঅওতার বল্‌ল—ইউনিয়নের ফাণ্ডে ও হাজার টাকা দেবে বলেছে। আর শ্মশানের ঘর কোম্পানী ক'রে দেবে না, এখনও ত জ্যান্ত লোকেদের বেঁচে থাকবার, মাথা গোঁজবার ব্যবস্থাই পূরো করতে পারলো না।—তাছাড়া ছেলেমানুষের একটা ইচ্ছে—

গোমেজ ঘাড় কাৎ ক'রে বল্‌লেন—অবিশ্যি তোমাদের এখানকার শবযাত্রীদের খুব কষ্ট, তা ঘরখানা হ'লে অনেকের উপকার হবে। বেশ ত ক'রে ফ্যালো। কিন্তু কমপেনসেশনের টাকাগুলো এই ভাবে খরচ করে ফেলছো যে, তারপর?

বাদল অগোছালো ভাবে উত্তর দেয়—বাবা মরার জন্যে আমার লাভ হয়েছে, এটা ভাবতেই কান্না পায়। উনি বেঁচে থাকলে ত এ টাকা আমার হাতে আসতো না! আমি তাঁর ছেলে হয়ে, সেই টাকা ভোগ করবো কি ক'রে? তাই প্রথমে শ্মশানের কথা মনে পড়লো। ইউনিয়ন, শ্মশান, ইস্কুল—এগুলো আমাদের সবার জন্যে কিনা। ইউনিয়ন এক হাজার, ইস্কুল ফাণ্ড হাজার, শ্মশানের বিশ্রামঘর করতে যা লাগবে তা খরচ ক'রে—বাকী টাকা—

গোমেজ বাধা দিলেন—ব্যস, বাকী টাকাটা যেন আর দাতব্য করো না। ওটা রেখে দাও বাপু।

বাদল এতক্ষণে খানিকটা সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠেছে, সে বল্ল—সকলের ইচ্ছে, যেদিন শ্মশানের ঘরের ভিৎপত্তন হবে সেদিন আপনি একবার দয়া করে যদি যান!

গোমেজ হেসে উঠলেন—জানো আমি একজন ক্রিশ্চান। তোমাদের তরফ থেকে যদি আপত্তি ওঠে? সেটা কি ভালো হবে।

ঘরের সকলেই সমস্বরে বল্লে—না, না, আপত্তি আবার কিসের?

বাদলও সায় দিল—সবাই বলছে, আপনি গেলেই ভালো হয়।

—বেশ তা যাওয়া যেতে পারে! আমাকে তারিখটা জানিয়ে দিয়ো।

—আপনার সুবিধে হ'লে এই রবিবারই—

—না, রবিবার মিটিং রয়েছে। তার চেয়ে উনি যেদিন মারা গিয়েছেন সেই তারিখেই করো না।

রামঅওতার সমর্থন করল—খুব ভালো হবে। সেও ত আর দেরী নেই, আজ হ'ল সাতাশ জানুয়ারী, আর উনি মারা যান ১৯ ফেব্রুয়ারী—।

—ব্যস সেই কথাই পাকা।

পঁচানব্বই

এ্যাকৃশন বডির পিছনে যে রাজনৈতিক কোনো দলের সমর্থন রয়েছে এ কথা বুঝতে এখন আর কারুর অসুবিধে হয় না। কমিউনিস্ট নেতা ডাঙ্গে আসছেন এ্যাকৃশন বডির আমন্ত্রণে। এ্যাকৃশনের মূল পাণ্ডাদের সঙ্গে আরো বিস্তর কর্মী যোগদান করেছে। চাকরী কায়েম হয়ে যাবার পর অনেক শ্রমিকই ইউনিয়নের খাতায় চাঁদা দিয়ে নামটুকু বজায় রেখে গেলেও, এ্যাক্শনের বশ্যতাই পছন্দ করে। প্রকাশ্যে সে-সব কথা বল্‌তেও তারা পিছ-পা নয়। অতএব শ্রমিক নেতা শ্রীডাঙ্গে যখন আসছেন তখন তারা পরমোৎসাহে প্রচার কার্যে নেমে পড়ল।

মানিকপুর আর গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের সংযোগস্থলে যে বিরাট কঙ্করাকীর্ণ মাঠখানা পড়ে রয়েছে—যেখানে এককালে গত মহাযুদ্ধে সৈন্যরা ছাউনি ক'রে বছরের-পর-বছর ধ'রে আশপাশের গ্রামবাসীদের বুকে ত্রাসের উদ্রেক করেছিল, যে ময়দানে একদা ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং তৎকালে ভারত কংগ্রেসের সভাপতি নেহেরুজী লাখ-লাখ শ্রোতার সাম্‌নে বক্তৃতা করে গিয়েছেন—সেই মাঠে শ্রীডাঙ্গে সভা করবেন।

এ্যাক্শন, ইউনিয়নের ঝগড়ার উর্ধ্বেই অনেক শ্রমিক এই নেতাকে স্থান দিতে প্রস্তুত। এমন কি ইউনিয়নের অনেক গোঁড়া সমর্থকও ডাঙ্গের সভায় যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তাঁর উপর আস্থার একটা কারণ, পুণাতে যে সর্বভারতীয় শ্রমিক-প্রতিনিধি সমাবেশ হয়েছিল, সেখানে ডাঙ্গে নির্ভীক, সর্বহারাদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনাসূচক বক্তৃতা দিয়ে সকলের মনেই শ্রদ্ধা সঞ্চার করে রেখেছেন।

এর সঙ্গে আরও একটা কারণ এই সভার অনুকূলে রয়েছে।

সভার আহ্বায়করা শহরময় 'চোঙা' মুখে দিয়ে হেঁকে বেড়াচ্ছে—মজ্‌দুর দুনিয়ার ওপর পুলিস জুলুমের প্রতিবাদ করতে হবে। যে মজ্‌দুর ভাইরা আপনাদের জন্যে পুলিসের গুলীতে শহীদ হয়েছে. তাদের কথা আপনারা [illegible]

যাবেন না। তাদের রক্ত দিয়ে আপনাদের আখের তৈরী হচ্ছে। আজ সেই শহীদদের শ্রদ্ধা জানানো আমাদের সকলের কর্তব্য। সেই মহাব্রত নিয়েই ডাঙ্গেজী এখানে আসতে সম্মত! আজ আপনারা কি সে কথা ভুলে গেলেন? এস ডি.ও-র বাংলোর সামনে যারা হাজার হাজার গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে মালিকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে গিয়েছিল, তাদের ওপর পুলিস কি অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে—লাঠি চার্জ, টিয়ার গ্যাস, গুলী! হায়, গোলামীর মায়ায় আপনারা শহীদকেও সম্মান করবেন না! না, তা হতেই পারে না। আমাদের অনেক ভরসা মজদুর দুনিয়ার ওপর। জানি, ১৯শে ফেব্রুয়ারীর সমাবেশে মজদুর ভাইরা দলে দলে যোগ দিয়ে পুলিস জুলুমের প্রতিবাদ জানাবেন, শহীদদের শ্রদ্ধা জানাবেন।

এ আবেদন ব্যর্থ হবার নয়। শ্রমিকদের তাতানোর পক্ষে এ কথাগুলো ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের মতই কার্যকরী।

মাঝখান থেকে বাদল বেচারী রীতিমত মুশকিলে পড়ে গেল।

ওই একই দিনে দামোদরের শ্মশানঘাটে দীনদয়ালের স্মৃতিরক্ষার জন্য অনুষ্ঠান হবার কথা যে! সব ভেস্তে দেবে নাকি এরা? বাদল রীতিমত চটে গেল এ্যাক্শন বডির ওপর, বিরক্ত হ'ল শ্রমিক নেতা শ্রীডাঙ্গের ওপর।

তা হবারই কথা, সে যে, সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে। এখন আর পিছিয়ে আসার কথা ভাবা যায় না। সে বেশ ঘটা করেই শ্মশানের বিশ্রামাগারের ভিত্তি-স্থাপনা করতে চায়। এমন কি কলকাতায় অমলাকেও খবর দিয়েছে আসবার জন্য। আর মানিকপুরের খ্যাত-বিশিষ্ট সব্বাইকেই নিমন্ত্রণ ক'রে ফেলেছে। দীনদয়াল সান্যালের পুত্র হিসেবে তারও যে সমাজে বিশিষ্ট স্থান রয়েছে একথা সে জাহির করতে চায়।

অথচ এরা মাঝখান থেকে হুট্ ক'রে ১৯ তারিখেই সভা ডেকে বসল!

এতদিন পর্যন্ত এ ব্যাপারে সে দেবজ্যোতির সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা কয় নি। কিন্তু আজ আর উপায় নেই। দেবজ্যোতিকে আজকাল সে বেশিক্ষণ বরদাস্ত করতে পারে না, তার কারণ বাদলের ধারণা দেবজ্যোতি যেন দীনদয়ালকে

ভাঙিয়েই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। অথচ সেরকম বিবেচক বন্ধু বলতে বাদলের আর কেউ নেই। এক্ষেত্রে দেবজ্যোতির কাছেই যেতে হয়।

দেবজ্যোতির সঙ্গে দেখা করতে ছুটলো বাদল। এখন ওদের দু'জনের আলাদা কোয়ার্টার। অবশ্য এমন কিছু দূরের ব্যাপার নয়, চারটে সারির তফাৎ। তবু যেন মনে হয় অনেক দূরে চলে গেছে ওরা। বাদলের কাছে দু-খানা ঘরই যেন বড় বাড়তি মনে হয় এখন। দীপুর বিয়ে হয়ে অবধি আর এখানে থাকে না। বাদল আর গীতা—গীতা আর বাদল। আমিটি আর তুমিটি—এই নিয়ে সংসার। সুখ আছে। আবার দুঃখও কম নয়। দু-জনেই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তারওপর বাদলের স্বভাবে ধৈর্যের বালাই নেই। কাজেই যে-কোনো ব্যাপারে তাকে ছুটতে হয় দিদি কিংবা দেবুদার কাছে পরামর্শ নিতে।

তাকে দেখে মিণ্টু হেসে প্রশ্ন করে—কি রে, আবার কি হ'ল?

দেবজ্যোতি বাড়িতেই ছিল, বড় খোকাকে পড়াচ্ছে সে। আর ছোট খোকা মাথা নেড়ে তেড়ে আসছে—আমি পব্বো বই দে—

বাদল ব্যস্তভাবে বল্ল—শুনুন মশাই! সব গুবলেট—

—কি হ'ল গুবলেটের?

—ওই ডাঙ্গে—

—হ্যাঁ, শুনেছি। ভাবছি একবার যাবো সভাতে।

বাদল ক্ষেপে গেল—তা যাবেন বই কি। এদিকে দীনু সাওেল চুলোয় যাক।

শান্ত, আত্মগত দৃষ্টিতে বাদলের দিকে তাকিয়ে দেবজ্যোতি বল্ল—অতো লাফালাফি করছ কেন? দীনদয়াল বেঁচে থাকলে তিনিও এ সভাতে যেতেন বোধ হয়।

—তিনি কি করতেন তা আমার দরকার নেই—আমি কি করব সেটাই ভাবা চাই।

—বেশ ত। তোমার ওখানে অনুষ্ঠান একঘণ্টা পিছিয়ে দাও।

—রাতদুপুরে, সেই শ্মশানে কে যাবে?

—যারা যাবার, তাদের কাছে দিনে-রাতে তফাৎ থাকার কথা নয়।

বাদল রেগে গেলে কথা বল্‌তে পারে না, থতিয়ে যায়। এখনও তার সেই অবস্থা—বেশ, বেশ কথা! বুঝলাম।

মিণ্টু চিড়েভাজার প্লেট ভাই-এর সাম্‌নে নামিয়ে দিয়ে বল্‌ল—কি হ'ল? আবার কি নিয়ে বাধলো?

বাদল কথার জবাব দেবার আগেই ছোটখোকা প্লেটে একটা থাবা মেরে খানিকটা চিড়েভাজা তুলে নিয়ে মুখের মধ্যে চালান ক'রে দেয়। মিণ্টু তার হাত চেপে ধরে বকুনী দেয়—দস্যি ছেলে, ছ্যাখ না ছ্যাখ অনথ বাধাবে। ওরে, তুই যে পেটের অসুখে ভুগছিস বাঁদর!

দিদির কবল থেকে আসামীকে খালাস করিয়ে নিয়ে বাদল এক গাল হেসে বল্‌ল—পুতু পুতু করেই তোরা ওকে বাড়তে দিবি না! আহা খাক্ না, কিছু হবে না।

আবহাওয়া একটু হাল্কা হয়েছে দেখে দেবজ্যোতি মুখ খুল্‌ল—ছাখো বাদল, জোর ক'রে আর সবই আদায় করা যায়, কিন্তু শ্রদ্ধা ভক্তি এসব মনের ব্যাপার। তাই বল্‌ছিলাম যে, তোমার কাজ তুমি করে যাও, অন্যের কর্তব্যের বিবেচনা তাদের হাতে ছেড়ে দাও। এখানে একটু ভে'বে দেখা দরকার—ডাঙ্গে ত রোজ আসছেন না। তাঁর মুখের কথা শোনবার জন্যে বহু লোকই উৎসুক। তারা মিটিং-এ যাবেই। অবশ্য গোমেজ সাহেব সেখানে যাচ্ছেন না, আরও কেউ কেউ হয়তো ডাঙ্গের মিটিং-এ না গিয়ে দামোদরেই যাবেন। তোমার কাজ তাঁদের দিয়েই হবে।

—আপনি কি করবেন?

—আমার কথা ছেড়ে দাও। মিটিং-এও যাবো, দামোদরেও যাবো। তা তোমরা যদি চলে আসো তবু তারপরও যাবো। কারণ এই দিনে আমি বরাবর ওখানে গিয়ে থাকি।

—গিয়ে থাকেন মানে?

—হ্যাঁ। এটা আমার ভুল হয় না।

—কই কখনো বলেন নি ত?

—বলবার কি আছে এতে! ব্যক্তিগত ব্যাপারকে আমি জনসভার বস্তু করতে চাই নে।

বাদল বুঝল না একথার তাৎপর্য। দেবজ্যোতি গোড়া থেকেই শ্মশান ঘাটের বিশ্রাম ঘর তৈরী নিয়ে হৈ চৈ করার পক্ষপাতী নয়। সে প্রথমে বলেছিল—'বেশ ত ঘর করতে হয় করে দাও, তা নিয়ে রব তোলার দরকার দেখি নে।' তখনও কথাটা বাদলের মনঃপুত হয় নি। সে তাই গীতার সঙ্গে পরামর্শ করেই একাজে এগিয়ে গেছে।

চিড়ে ভাজা ছুঁলো না সে। মিণ্টু উদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করে—কি রে, কি হ'ল খাচ্ছিস না যে!

—নাঃ, এ বাড়িতে আর জলগ্রহণ করবো না।

—আরে হলোটা কি, তাই বল্ পাগলা।

—ছ্যাখো দিদি, আমি এখন ছেলেমানুষ নই।

অত্যন্ত ভারিক্কী ভঙ্গীতে বাদল কথাগুলো বলে, কিন্তু মিণ্টু এমনভাবে হেসে উঠল যেন, বাদলের একথা আদৌ কেউ বিশ্বাস করবে না। মিণ্টু বল্ল—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। না হয় বিয়েই করেছিস, কিন্তু এইটুকু ছেলে বিয়েই কর আর ছেলের বাপই হ' না কেন—আমার কাছে তুই সেই পাগ্লা। নে খেয়ে নে।

বড়খোকা মামার গম্ভীর মুখের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে ছিল। মায়ের কথার পিঠে সেও মিষ্টি সুরে বলে—খাও না মামা! খাও, খুব সুন্দর খেতে—

মামাকে বড়খোকা খুব ভালোবাসে।

বাদল বল্ল—নাঃ, আমি বেশ বুঝতে পারছি, দেবুদা আসলে আমাকে দেখতে পারে না। নইলে—

দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। দেবজ্যোতি অন্য দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে।

মিণ্টু বল্ল—হ্যাঁ গো তুমি কি যাবে না বলেছ দামোদরে?

—না তো!

—তবে?

—তোমার ভাই জানে।

দেবজ্যোতির এ উক্তিতে বাদল ফেটে পড়ল, বল্‌ল—উনি আমাদের চেয়ে আলাদা কিনা, তাই একলা যাবেন। এদিকে ত এ্যাক্‌শনের নিন্দেতে পঞ্চমুখ, কিন্তু যেই আমরা দামোদরের মিটিং-এ যাবার কথা বললাম অমনি ওঁর এ্যাক্‌শনের মিটিং-এ যাওয়া দরকার হয়ে পড়ল!

মিণ্টু ভাইকে সমর্থন করে—তা বাপু, তাই যদি হয় ত, ও রাগ করতেই পারে। ছেলেমানুষ কতো উয্যুগ ক'রে একটা কাজে নামলো, আর তুমি গা এলিয়ে দিলে। সেই ছোটবেলা থেকে ত তোমাকেই জানে। বাবার পরেই এ বাড়িতে তুমি—সে ত আজকের কথা নয়।

দেবজ্যোতির কোলে ছোট খোকা চড়ে বসেছে। সেখান থেকে মায়ের দিকে কপট দৃষ্টি হেনে বল্‌ছে—বাবাকে বচ্ছো ক্যানো! এঁঃ, এ্যাই মা—দুত্তু! এঁঃ—

দেবজ্যোতি ছেলের পিঠে হাত বুলিয়ে বলে—ছিঃ, মাকে অমন বলে না বাপী!

বাপী ঠোঁট ফুলিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে। দেবজ্যোতির কাছ থেকে এতটুকু চড়া কথা হজম করতে প্রস্তুত নয় সে। তার গালে হাত দিয়ে আদর করে দেবজ্যোতি বল্‌ল—না রে বকি নি! কাঁদতে হবে না। একেবারে মামার ভাগ্‌নে!

তারপর মিণ্টুকে সে বল্‌ল—সে কথা মোটেই বলি নি। আর তুমি তো জানো মিনু আমি পারি নে, দল পাকিয়ে মনের কোনো কথা বল্‌তে। সেই দোষটাই আমার স্বভাবের সবচেয়ে বড় খুঁত্‌! তার জন্যেই আমাকে দিয়ে বড় কাজ কিছু হ'ল না। না, হয়তো আরো অনেক ঘাটতিই রয়ে গেছে আমার চরিত্রে, তবে এটাও কম বড় খুঁত নয়। হ্যাঁ, তাই আমি বলেছি যে, যদি তোমরা চলেও আসো আমি পৌঁছবার আগে তাতেও ক্ষতি নেই—আমি যাবো।

বাদলের দিকে তাকিয়ে দেবজ্যোতি নিজের কথায় জোর টানে—ছাখো এ্যাক্‌শন বডির সঙ্গে সমান তালে চলি নি বলে ভেবো না যে, ওদের প্রতি

আমার বিদ্বেষটা খুব পাকাপোক্ত! আমার অনাস্থা ওদের পদ্ধতিতে। কিন্তু যে সব সিন্‌শিয়ার মানুষ ও দলে কাজ করে তাদের নিষ্ঠার ওপর শ্রদ্ধা কিছু কম নেই আমার। আমার কাছে কোনদিনই দলটা বড় কথা নয়। আমি এমন একটি আশ্রয়ের সন্ধান করছি যার ওপর শ্রমিকের স্বার্থ, ভবিষ্যৎ সবকিছু ষোলো আনা নির্ভর করতে পারে। তা কোনো দলেই পুরোটা নেই। আর ডাঙ্গে এমন একজন মানুষ যে নাকি জীবনের অনেকখানিই এই চিন্তায় কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি কি বলেন, ভাবেন সেটা এতো কাছে পেয়েও জানতে চেষ্টা করব না—এ আমি ভাবতেই পারি না। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমার কাছে এ্যাক্‌শনও যা ইউনিয়নও তাই ভাই।

বাদল বল্‌ল—তবে যে আপনি দিনের পর দিন বুঝিয়ে, বকে, কতো রকম ক'রে আমাকে এ্যাক্‌শন ছাড়িয়ে ইউনিয়নে টেনে আনলেন,—কেন?

—তোমার ক্ষেত্রে সেটা প্রয়োজন ছিল।

—আপনার পক্ষে বুঝি যখন যেটা খুশি সেটা করাই প্রয়োজন। কোনো নীতির বালাই নেই, আনুগত্যের দরকার নেই?

—আছে বই কি। তবে, দাগ মেরে মজদুরকে দলে দলে ভাগ করে দিলেই বুঝি তারা আলাদা হয়ে যায়? আমি অন্ততঃ তা মনে করি না। যারা আজ দুর্ভোগ ভুগছে তারাও ত আমাদেরই মতো শ্রমিক। তারা আমার শত্রু নয়। মনটাকে খুলে রাখা দরকার বাদল। আর সেটাই আমরা পারি না। আমাদের সেখানেই গলদ। সেই গলদের ছিদ্র দিয়েই যতো শয়তান ঢুকে পড়ে। যারা আমাদের মাথার ওপর চড়ে ব'সে বলে, তোমাদের স্বার্থ আদায়ের জন্যে এই পথে যেতে হবে,—তারা তুমি-আমি নয়,—তারা অন্য জাতের মানুষ। তাই এত গোলমাল!

বাদল হাল ছেড়ে দিয়ে বল্‌ল—ওসব আমার বোঝা সাধ্য নয়। তার চেয়ে রাগ হজম করে চিড়েভাজা খেয়ে নেওয়া অনেক সোজা! লীডারকে লীডার বলে মানবো, আর তার হুকুম মানবো না, এ আমি ভাবতে পারি না।

দেবজ্যোতির মুখের ভাব দেখলে বোঝা যায় যে আরও অনেক কথাই সে বল্‌তে চায়।

মিণ্টুর দিকে তাকিয়ে বাদল বল্‌ল—কি রে দিদি, তুইও কি স্বামী দেবতার সঙ্গে যাবি ?

দেবজ্যোতি হাসলো—না, তা কেন, তোমরা সবাই একসঙ্গেই রওনা হয়ো। হয়তো তোমাদের পিছু পিছু আমিও পৌছবো।

ছিয়ানব্বই

যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু কালো কালো মাথা—মাথার মিছিল। দেবজ্যোতির পৌঁছতে একটু দেরী হয়ে গেছে। ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে যাবার স্পৃহা নেই, কি হবে! এখানে লাউড স্পীকার রয়েছে, বেশ শুনতে পাওয়া যাবে। তা ছাড়া ভেতরে ঢুকে পড়লে বেরুবার সময়ও দেরি হবেই। দেবজ্যোতির মন বড় বিক্ষিপ্ত।

দেবজ্যোতির চোখের সামনে যেন ছায়াচিত্রের অভিনয় ঘটছে। সে ভাবছে আশ্চর্য এক গোলকধাঁধায় পড়ে এরা সকলেই বিভ্রান্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। পথটা চোখের ওপর স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু সেখানে পৌঁছবার জন্য হাজার চেষ্টা করেও পারছে না!

অবশেষে ডাঙ্গে উঠলেন। তাঁকে এখান থেকে ভালো দেখা যাচ্ছে না। শীতশেষের পড়ন্ত বেলার রোদ ফুরিয়ে গেছে কখন, আলোটুকুকেও অন্ধকার শুষে নিচ্ছে। আবছা একটা মূর্তি শুধু ঝাপ্সা ভাবে নড়াচড়া করছে। লাউড স্পীকার থেকে শব্দ ভেসে আসছে। দেবজ্যোতি চোখ বুজলো, মন দিয়ে শুনতে ইচ্ছে করছে তার। হ্যাঁ, ঠিক এই কথাই ত সে ভেবেছে। ডাঙ্গে যা বললেন তার সঙ্গে দেবজ্যোতির মনের কথাগুলো জড়িয়ে গিয়ে এমন একটা অবস্থা দাঁড়ালো যে, কোনটা তার নিজের কথা আর কোন্‌টা ওই নেতার উক্তি, আলাদা ক'রে চেনা যাচ্ছে না।

তবু হাতড়ে হাতড়ে ভাবতে চেষ্টা করে সে। প্রথমে উঠেই তিনি বলেছেন—আজ একটা দায়িত্ব পালনের জন্য আমি এসেছি। কোনো পার্টিবাজীর মতলব নেই এতে। সারা শ্রমিক সমাজ এখানকার পুলিসী হত্যার বীভৎসতায় মর্মাহত। এখানকার শ্রমিকবন্ধুরা নিজের চেষ্টায় কিছু টাকা চাঁদা তুলেছেন, এঁদের ইচ্ছে সেই টাকাটা আমার মারফতে, পুলিসের গুলীতে নিহত, শহীদদের পরিবারকে পৌঁছে দেওয়া। মহা ব্রতের পরম শ্রদ্ধার অর্ঘ এটা। টাকার পরিমাণ সামান্য, কিন্তু এর পিছনের উদ্দেশ্য সাধু। আমি যে

এমন পবিত্র সঙ্কল্পের সঙ্গে নিজেকে জড়িত দেখতে পাচ্ছি সেজন্য আনন্দিত। এ আনন্দের পিছনে কিন্তু বিরাট দুঃখের ইতিহাস রয়েছে। আপনারা জানেন যে, মূল্যবান প্রাণগুলি কোন্ পীড়নের, অত্যাচারের পায়ের তলায় উৎসর্গ করতে হয়েছে! শ্রমিকের স্বার্থ কায়েম করতে গিয়ে, মালিকের-সরকারের জুলুমের প্রতিবাদ জানাতে গিয়েই এই অমূল্য মানুষগুলি মৃত্যুবরণ করেছেন।... এ পর্যন্ত দেবজ্যোতি বেশ বুঝতে পারে শ্রীডাঙ্গের কথা। কিন্তু তারপর যখন তিনি বললেন যে,.. রোগ সারাবার জন্যে আপনারা যে ডাক্তারকে ডেকেছেন সেই ডাক্তারই আপনাদের সর্বনাশ করছে। কিছুটা জেনে করছে, অনেকখানিই না জেনে করছে। দোষ তাদের নয়। দোষ আপনাদেরও নয়। তবে কেন অসুখ সারছে না? তার জবাবে আমি বলতে পারি যে, অসুখটা আপনাদের মনের মধ্যে শিকড় গেড়ে রয়েছে। এ অসুখ সারাতে পারেন আপনারা নিজেরা। বাইরের লোক কিছু করতে পারে না। আপনারা যদি সচেতন হন, আপনারা যদি এক হন, আপনারা যদি নিজেদের শক্তিকে বুঝতে পারেন, আপনারা যদি বাইরের সব বালাই দূর ক'রে দিতে পারেন, নিজেদের দায়িত্ব আপন হাতে তুলে দিতে পারেন—তবেই আপনাদের সুদিন আসবে। হ্যাঁ ঠিক তাই। আমাকে যদি জিগ্যেস করেন, বলেন যে, ডাঙ্গেজী আপনি আমাদের মধ্যে আসুন, এসে সব ঠিকঠাক করে দিন, আমি মাফ চেয়ে নেবো, বল্‌বো ইলাজ্-করা আমার সাধ্য নয়। না, মজ্‌দুর ভাইদের আমি নিজের চেয়ে কম ভালোবাসি না—সেইজন্যে এ ভার আমি নেবো না। বল্‌ব, মন পরিষ্কার করুন। ইলাজ আপনিই আসবে। কি ইউনিয়ন, কি এ্যাক্‌শন সবই এক। যেদিন মজদুর নিজের দায়িত্ব নিজে তুলে নিতে পারবে, আর সেদিন আসতেও বেশী দেরি নেই, সেইদিনই সূর্য উঠবে। হাঁ ভাই পার্টিবাজীর জন্যে সময় আছে, সুযোগ আছে—আজ সেসব নয়। আজ আমি বাইরের লোক দূর থেকে এসেছি, যে ব্রতে সাথী হতে ডেকেছেন আপনারা, সেটুকু ক'রেই আমার ছুটি। তবে আবার আমি আসবো, তখন দেখবো আপনারা কতখানি মূল্য দিয়েছেন সেই সব শহীদদের জীবনপাতের। ওঁরা ত আপনাদেরই জন্যে রক্ত দিয়ে, জীবন বলি দিয়ে গেলেন। এখন তাঁদের সেই স্মৃতিপূজায়

দু-চার হাজার টাকা উঠিয়ে তাঁদের পরিবারকে সাহায্য করাই বড় কথা নয়—তাঁরা যা চেয়েছিলেন সেই অসমাপ্ত ব্রতকে যাতে সিদ্ধ করতে পারেন, সেই চেষ্টাই হবে সত্যকার স্মৃতিপূজা!···দেবজ্যোতির দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে।··· হাততালি আর স্লোগানের ধাক্কায় তার চমক ভাঙলো। সে আর দাঁড়ালো না, টাকার তোড়া দেওয়া দেখবার জন্য। এর পর ডাঙ্গেজী টাকা দেবেন, তার পর কি হবে এখনো তা ঘোষণা হয় নি। তাকে এখনই রওনা হ'তে হবে দামোদরের শ্মশান ঘাটে। সেখানে সবাই গিয়েছে।

দেবজ্যোতি পিছন ফিরে অন্যমনস্কভাবে লোক ঠেলে পথের দিকে এগোচ্ছে। এমন সময়ে হঠাৎ বাধা পেয়ে থম্‌কে দাঁড়াতে হ'ল তাকে।

ডায়াসটুকুতে কেবল আলোর ব্যবস্থা, সভার বাকি অংশ অন্ধকারে ঢাকা। প্রথমে সে বুঝতে পারে নি, কে তার হাত চেপে ধরেছে পাশ থেকে। ঘাড় ঘুরিয়ে যুগপৎ বিস্ময় আর আনন্দে দেবজ্যোতির কণ্ঠস্বর স্তব্ধই রয়ে গেল—সে কথা খুঁজে পেল না।

দেবজ্যোতির নিমেষমুক্ত বিস্ময়ের চাহনী অমলার একঝলক হাসিতে নন্দিত হ'ল।

অমলা বল্‌ল হেসে—তুমি? এখানে!

দেবজ্যোতির গলা একটু কেঁপে যায়—হ্যাঁ! তুমি?

সচেতন হয়ে দেবজ্যোতি শুধ্‌রে নিল—আপনি বৌদি!

দেবজ্যোতির হাতে চাপ দিয়ে অমলা বল্‌ল—আমি একলা নই সঙ্গী রয়েছে। দাঁড়াও ডাকি।

মিনিটখানেকের মধ্যেই অমলা ফিরে এল, ওর সঙ্গে দেবিকা। দাদাকে দেখে দেবিকাও কম বিস্মিত হয় নি। কারণ ও জানে যে, দেবজ্যোতি আজ দীনদয়ালের স্মৃতি অনুষ্ঠানে যাবে। তা না হলেও কমিউনিস্ট ডাঙ্গের সভাতে দেবজ্যোতির থাকার কথা নয়।

দেবিকাকে দেখে দেবজ্যোতি আরও অবাক! সে বল্‌ল—তোকে দেখে মনে পড়ছে অনেকদিন কেউ আমাকে গালাগালি দেয় নি!

দেবিকা দাদার মুখের পানে তাকিয়ে হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিল। বল্‌ল—কেউ ত আমাকে খবর দাও নি, তবু চলে এলুম!

—বেশ করেছিস।

দেবিকা যেন একটু বদ্‌লে গিয়েছে। ওর চেহারায় একটা সুন্দর শ্রী ফুটে উঠেছে। দেবজ্যোতি বোনের ঘাড়ে হাত রেখে বল্‌ল—থাকবি ত এখন?

অমলা ওদের দুজনের কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বল্‌ল—আগে মানিকপুরে ঢুকতেই দাও, তারপর ত থাকা-না থাকা। মাঝে পড়ে' যেকাজে আসা সেটাই ভেস্তে গেল।

—কি? দামোদরে যাওয়া—! না ভেস্তে যাবে কেন, আমিও তো এখন সেখানেই যাচ্ছি।

দেবজ্যোতির সাজপোশাক কারখানার, পায়ে ভারী বুট—ওটা কারখানা থেকেই দেয়। অনেকে এই বুটগুলো মুচীকে বিক্রী ক'রে দু-পয়সা উপরি আয় করে। অমলা বল্‌ল—আমাদের ছোট দুটো এ্যাটাচী রয়েছে সাইকেল রিক্সাতে! সেগুলোর কি করা যায়?

দেবজ্যোতি বল্‌ল—বাড়ি যেতে গেলে আবার দেরী হবে! পাঞ্জাবীর দোকানে সাইকেল রেখে এসেছি। ইচ্ছে ছিল সোজা সাইকেলেই রওনা হবো।

হেসে উঠলো অমলা—তা মন্দ নয়! আমাদের চাকায় বেঁধে নিয়ো!

দেবিকা বল্‌লো—আমি পারি সাইকেল চালাতে।

দেবজ্যোতি এগিয়ে চল্‌ল—কই, কোথায় তোমাদের সাইকেল রিক্‌শা?

অমলা ত্বরিতে রাস্তায় পড়ে এদিকওদিক তাকিয়ে বলে—এই যে!

এ্যাটাচি কেস্ দুটো নামাতে নামাতে বল্‌ল অমলা—আমরা সীতারামপুর থেকে বাসে করে এই মোড়ে নেমে রিকশাটা নিয়েই শুনলাম, ডাক্তারজীর বক্তৃতা হবে! অমনি দেবিকা ঝোঁক ধরে বসলো, মিটিংটা না চুকিয়ে ও নড়বে না। তা প্রথমে ত একটু কিন্তু-কিন্তু লাগছিল। শেষে ওর যুক্তিতর্কের খাতিরে রয়েই গেছি।

—ভালোই করেছেন। আমিও সঙ্গী পেয়ে গেলাম।

দেবজ্যোতি রিকশাওয়ালার ভাড়া দিতে যাচ্ছিল, অমলা বাধা দিল—বাঃ, তা কি হয় নাকি! পুরুষ না হ'লেও আমাদের পৌরুষ থাকতে পারে ত!

মাঝখান থেকে রিক্‌শাওয়ালা বেঁকে বস্‌লো—আজ্ঞে, আপনারা ভাড়া দেবেন কেন! গাড়িতেই চড়লেন না! না, সে আমি নিতে পারবো না।

ওরা তিনজনে একদিকে আর রিকশওয়ালা একা আর একদিকে—খানিকক্ষণ বচসা চল্‌ল। অবশেষে রিকশওয়ালা গাড়ি চালিয়ে দিয়ে বল্‌ল—বাপের ব্যাটা বটি আমি পটলা! মানিকপুরের সব্বাইকে চিনি। আরে দেবুদাদা, আজই নয় রেক্‌শা চালাচ্ছি, তা ব'লে গায়ে ত সেই মানুষেরই চামড়া রয়েছে!

তাদের আর কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে পাঁই-পাঁই গাড়ি হাঁকিয়ে দিল।

দেবিকা প্রশ্ন করে—এখন?

দেবজ্যোতি বলে—মোড় থেকে একখানা ট্যাক্সিই নিই, কি বল্? নইলে—

দেবিকা বল্‌ল—কথাটা মন্দ নয়। তবে এখানে ট্যাক্সি পাবে কোথায়?

—সেদিন আর নেই রে, এখন মানিকপুরে ট্যাক্সির ছড়াছড়ি।

পাশাপাশি তিনজন। চুপচাপ! পথের ডান দিকে বাইরে তাকিয়ে দেখছে রাত্রের আকাশকে রাঙিয়ে তুলেছে গলিত লোহাঢালাই-এর আলো। হঠাৎ-ই এরকম গাঢ় লাল রক্তিমায় চমকে ওঠে আকাশের তারাদল, চাঁদ। চিম্‌নীর মাথায় লক্‌লকে আগুনের শিখা জ্বল্‌ছে, হাওয়ায় কাঁপছে, কেঁপে কেঁপে হেলে দুলে, এঁকেবেঁকে জ্বলেই চলেছে। অনেকদিন পরে ওই অগ্নি-শিখার দিকে তাকিয়ে দেবিকা যেন আত্মস্থতার গভীরে অবগাহন করে। দেবজ্যোতির এক পাশে দেবিকা, অন্য পাশে অমলা—দুজনের মাঝখানে সে। বাইরের কিছুই সে দেখছে না। যেন, কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। একটু অন্যমনস্ক। সামনে তাকিয়ে থাকলেও চোখ দুটো শূন্যদৃষ্টি। না, ঠিক তা নয়—মনের দিকেই চেয়ে আছে বলা চলে।

অমলা হঠাৎ কথা বল্‌ল। গাড়িখানা তখন মানিকপুর বাজারের আলো আর গোলমালের মধ্যে সাঁতার কেটে চলেছে। অমলা বল্‌ল—কেমন আছো?

ছোট্ট সাধারণ প্রশ্ন। এক টুকরো জিজ্ঞাসায় দেবজ্যোতি একটা বিরাট প্রশ্নেরই প্রতিধ্বনি আবিষ্কার করে। সে বলে—এক কথায় মন্দ কি!

—জবাবটা এড়ানোর মতো হলো, না, ঠাকুরপো?

—হয়তো তাই। যেখানে গোটা জীবনটাই এড়িয়ে, পাশ কাটিয়ে, কোনো রকমে গা-বাঁচিয়ে চলেছে—সেখানে এর চেয়ে সহজ জবাব বোধ হয় দেওয়া যায় না!

অমলা বল্‌ল—দাঁড়াও দাঁড়াও! ওঃ, এক দমে অনেকখানি ঠেলে দিয়েছ।

দেবিকা এতক্ষণ ধরে ওর চেনা মানিকপুরের পুরনো চেহারার সঙ্গে হাল আমলের শহরকে মিলিয়ে দেখতে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ অমলার শেষের কথা-গুলো কানে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে বলল—কি হ'ল? ঠেলাঠেলিটা কিসের!

ওর কথার জবাব দিল না কেউ। অমলা বিস্মিত স্বরে বল্‌ল—উঃ, সেই মানিকপুর! আগে সন্ধ্যের পর বেরুতেই গা ছম ছম করত!

—তাই না তাই। বাজারটাই কি বিরাট হয়েছে। স্টেশনের এধারে কতো কোয়ার্টার! নাঃ, একেবারে পাল্‌টে গিয়েছে।

দেবজ্যোতি হঠাৎ বলে বসলো—এটাই স্বাভাবিক। আমরা সবাই পাল্টে গেছি।

অমলা প্রতিবাদ করল—না, আমি অন্ততঃ ঠিক রয়েছি।

দেবিকা বলল—আমিই বা বদলালাম কোন্‌ খানে!

—তাহলে মানিকপুরও ঠিক রয়েছে। নতুন দু-চারখানা বাড়ী-ঘর হওয়া মানেই কিছু বদলে যাওয়া নয়।

দেবিকা বাধা দিল—তা তুমি বলতে পারো না। এখানকার জীবনধারাতে পরিবর্তনের স্বর এসেছে।

—আমি ত দেখছি না। আগেও যা ছিল এখনো তা-ই আছে। কারখানা আছে, শ্রমিক আছে, মালিক আছে, দলাদলিও রয়েছে। তফাৎটা কোথায় দেখছ, বলো?

গাড়িখানা প্রথম শ্রেণীর বাংলোগুলোর পথ ধরেছে। দেবিকা হঠাৎ একখানা বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন করে—মল্লিক সাহেব আগের মতোই ডিক্‌টেটরী করছে ত?

দেবজ্যোতি বলে—না তাঁর দিন ফুরিয়েছে। নামে মাত্র রয়েছেন। আব্দুলের অবস্থাও সুবিধের নয়। তবে তার বদলে ম্যাক্‌ডোনেল তার মার্কিনী প্যাচ কষছে, কিছুটা ইউনিয়ন মারফতে, অনেকটা পুরনো ধরনও ধরেছে। মল্লিক ছিল দিশী পালোয়ান, এ হ'লো বিদেশী ক্রুর দৈত্য!

অমলা বল্‌ল—সে আর কদিন। দিন বদলাবেই। এখন স্টেটও ত মালিকদের ওপর প্রেশার দিচ্ছে।

—হয়তো দিচ্ছে, জানি না। তবে আমার কি মনে হয়েছে জানেন বৌদি, যতদিন পর্যন্ত মালিকে আর শ্রমিকে একস্বার্থে মিলিত হয়ে যন্ত্রের কাছ থেকে কাজ আদায়ের চেষ্টা না করছে,—ততদিন পর্যন্ত সত্যিকার পরিবর্তন আসতে পারে না।

দেবিকা বিজ্ঞভাবে জবাব দিল—বর্তমান কাঠামোতে সেটা হয় না।

—খুব হতে পারে। এর জন্যে এমন কিছু ওলটপালটের দরকার হবে না।

—অসম্ভব। অসম্ভব!

দেবিকা, অমলা দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠল।

গাড়িখানা গর্জন করছে। সামনে চড়াই পথ। উল্টো দিক থেকে একখানা গাড়ি আসছে। গাড়িখানা দেখা যাচ্ছে না, তবে একটা আলোর মণ্ডল নড়াচড়া করছে দিগন্তে। তা দেখেই বেশ বোঝা যায় যে, গাড়ি আসছে। দেবজ্যোতি সেদিকে তাকিয়ে বল্‌ল—ওরা বোধ হয় ফিরছে।

—তাহলে?

দেবিকা প্রশ্ন করে।

—আমরাও ফিরবো?

অমলা জিজ্ঞাসা করল। দেবজ্যোতির হাতে নিবিড় স্পর্শের চাপ।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—ওরা ত আর শ্মশানঘাটটা সঙ্গে নিয়ে ফিরছে না। আমাদের কাজ সেখানে যাওয়া। সঙ্গী যদি না পাই, একাই যাবো আমি—তোমরা ফিরতে পারো।

দেবিকা ব্যস্তভাবে বলে—পেটি সেন্টিমেণ্ট! আমার কিন্তু অন্য কাজ রয়েছে। একবার দীপুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। আসলে সেইজন্তেই ত

এলাম। মানে আমাকে কলা দেখিয়ে ও অম্লানকে বিয়ে করল। তা করুক, আমার তাতে বলবার কিছু নেই। তবে খেসারৎটা আদায় করবোই।

বিস্মিত দেবজ্যোতি বোনের দিকে তাকিয়ে বলে—সে কি রে? খেসারৎ আবার কিসের?

—বাঃ, আমার পাতা আসনটা দিব্যি দখল করে বসলো, তার বদলে কাণা কড়িও খরচ করবে না! আমি অবিশ্যি সতীনপনা করতে চাই নে, হ্যাংলামী দু-চক্ষে দেখতে পারি নে কিনা। তবে, হাজার দুই টাকা আমার দরকার—সেটা অম্লানের কাছ থেকে আদায় করতে পারলেই ছুটী!

ধমক দিল দেব'জ্যোতি—কি বাজে বক্‌ছিস তুই!

দেবিকার স্বভাবসিদ্ধ উদ্ধত উত্তর এল—বাজে নয়, ক্যাশ, দুটি হাজার টাকা—সারা জীবনের প্রেম, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্যের বদলে মাত্র দু-হাজার ত কিছুই না! অথচ এই ক'টা টাকার জন্যে আমার ফরেনে যাওয়া আট্‌কে পড়বে! স্কলার্‌-শিপটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। স্রেফ প্যাসেঞ্জের কড়ি যোগাড় করতে পারলেই দেবিকা মুখার্জি সাত সমুদ্দুর ডিঙিয়ে দুনিয়াটা দেখে আসতে পারে।

অমলার দিকে অন্ধকারের স্তর ভেদ ক'রে দেবজ্যোতি তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিল, যেন দেবিকার এই হেঁয়ালী কথাগুলোর সম্পর্কে অমলা কিছুটা আলোর সঙ্কেত দিতে পারে!

এরই মধ্যে দেবিকা জোর গলায় বল্‌ল—ড্রাইভার গাড়ি রোখো! থামো—

থেমে গেল গাড়ি। দেবিকা ত্বরিতে নেমে পড়ল। তার পিছু পিছু দেবজ্যোতিকেও নামতে হ'ল, সে বল্‌ল—দাঁড়া, আগে দেখি—যদি অন্য কারুর গাড়ি হয়?

উল্টো দিক থেকে একখানা ট্রাক এসে দাঁড়িয়েছে,—সামনা-সামনি বাধা পেয়ে।

না, ওদের ভুল হয় নি। দেবজ্যোতিকে দেখে অমল নেমে এল ট্রাক থেকে।

দেবিকা ব্যগ্রভাবে বল্‌ল—দীপু কোথায় ছোটজামাইবাবু!

অবাক হয়ে গেছে অমল, তার কণ্ঠস্বরেও তা বেশ বোঝা গেল—আরে দেবি! তুমি হঠাৎ? কি ব্যাপার!

—ব্যাপার আবার কি, এসে পড়লাম।

—বেশ হয়েছে ভালোই করেছ।

বাদলও এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি থেকে মিণ্টু ডাকাডাকি করছে—এই যে দেবি, তোমার সঙ্গে বৌদি আসেন নি?

—না, বৌদির সঙ্গেই আমি এসেছি।

—তা এত দেরী করলে কেন? গোমেজ সাহেব এমন চমৎকার বক্তৃতা করলেন শুনতে পেলে না!

দেবিকা কোনো কথা বল্‌ছে না। দীপুকে দেখতে না পেয়ে ও যেন আশাহত।

মল্লিকা বল্‌ল—কি রে, তুই যে বোবা হয়ে গেলি। কথা বল্‌ছিস না যে—

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দেবিকা জবাব দিল—আমার কথা ত তোমরা ভুলেই যেতে চাও। নইলে ছেঁটে বাদ দেবে কেন! যাক্, সে আমি গায়ে মাখি না। এখন বলো তো দীপুকে দেখছি না কেন? বড়লোক হয়েছে বলে, ও কি আসে নি?

দীপুর প্রসঙ্গ সকলেই সযত্নে এড়াতে চাইছিল। তার কারণ অম্লান এবং দেবিকার প্রণয় কাহিনীটা সকলেরই জানা হয়ে গিয়েছে, দীপুর বিয়ের আগে। দীপুর বিয়েতে যখন দেবিকাকে কলকাতা থেকে আনানোর কথা উঠেছিল সেই সময় দীপুই আপত্তি করেছিল। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, কারণ ওদের দু-জনের অন্তরঙ্গতার কথাই সবাই জান্‌তো। হঠাৎ দীপুর এরকম ভাবান্তরে সবাই যেমন বিস্মিত হয়েছিল কৌতূহলী হয়েছিল তার চেয়ে ঢের বেশী। অবশেষে মিণ্টুর কাছে দীপু সব কথা খুলে বলতে বাধ্য হয়। তারপর যা স্বাভাবিক তাই হয়েছে। অর্থাৎ সবাই গোপনে জেনেছে এবং অপরকে জানিয়ে দিয়ে অনুরোধ করেছে গোপন রাখতে।……দীনদয়ালের স্মৃতিরক্ষার অনুষ্ঠানে অমলাকে বাদ দেওয়া চলে না, তাই দেবিকাকে বাদ দিয়েই অমলাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। হঠাৎ যে দেবিকা এভাবে হাজির হতে পারে, তা কেউ অনুমান করতে পারে নি। ও হঠাৎ এসে পড়াতে সবাই যেন নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী ভাবতে শুরু করেছে। একমাত্র দেবজ্যোতিই এদিক দিয়ে আত্মস্থতায় অটুট রাখতে

পেরেছে। আর বাদল, সে আজ নিজের মনের আনন্দেই নিজে পরিপূর্ণ। দেবিকার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ট্রাকের সামনে—যখন এসেছ তখন আমার বৌ দেখে নাও আগে।

দেবিকার সেই এক কথা—হবে-হবে। আগে দীপুর কথা বলো—

বাদল বল্‌ল—হ্যাঁ, ওরা পিছনে পিছনে আসছে। দীপুর গাড়ি মানিকপুরে গিয়েছে গোমেজ, রামঅওতারদের পৌঁছে দিতে। এই বোধ হয় আসছে গাড়িখানা। তা তোমরা আর এখানে দাঁড়িয়ে কি করবে, দামোদর থেকে ঘুরে এসো। রাত্রে আজ আমার ওখানেই খাওয়াদাওয়া, বুঝলে দেবি!

দেবিকা বল্‌ল—বাঃ বেশ ভালো কথা, তোমার বিয়ের এ্যাকাউন্টে খাওয়া ত পাওনাই রয়েছে। তাহলে তাড়াতাড়িই ফিরতে হয়।

ব'লে ও ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়ে দেখল অমলা, দেবজ্যোতি কেউ নেই। অমলা মিণ্টুর সঙ্গে গল্পে জমে গিয়েছে। আর দেবজ্যোতি পথের পাশে উঁচুদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল। দেবিকার সাড়া পেয়ে চলে এল। অমলাকে একটু তাগাদা দিয়ে তবে ফিরিয়ে আনা গেল। একখানা গাড়ি এসে দেবজ্যোতিদের ট্যাক্সির পিছনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বাদল হেঁকে প্রশ্ন করে—কে অম্লান বাবু নাকি ?

জবাব এল—অন্য কেউ হলে কি আর পোষা কুকুরের মতো চুপ করে থাকত! এতক্ষণে তোমাদের উদ্‌ব্যস্ত করত হর্ণ দিয়ে, গালাগালিও দিত।

অমলাকে প্রায় ঠেলেই দেবিকা নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। বল্‌ল—কিছু মনে ক'র না বৌদি, আমি অম্লানের সঙ্গে যাচ্ছি। কাজের কথা কইতে কইতেই যাবো।

সকলের বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে দেবিকা সোজাসুজি অম্লানের গাড়ির ড্রাইভারের বাঁ-পাশের দরজা খুলে উঠে পড়ল। ওর উচ্চ কণ্ঠ শোনা যায়—ভূতপেত্নী ভেবে মূর্চ্ছা যেয়ো না বন্ধু! তোমার একমাত্র সখী দেবিকা আমি। হ্যাঁ—

দেবজ্যোতির দিকে না তাকিয়ে অমলা স্বগতভাবে বলে—প্যাসেঞ্জার টাকার চিন্তায় মেয়েটা না পাগল হয়ে যায়।

দেবজ্যোতি ড্রাইভারকে গাড়িতে স্টার্ট দিতে ব'লে অমলাকে জিজ্ঞাসা করে—কি ব্যাপার বলো তো!

—বিদেশে গিয়ে সমাজ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক রূপ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে একটা স্কলারশিপ ও পেয়েছে। তা ওর মতো মেয়ে অবিশ্যি শিখেপড়ে এলে ভালোই হবে। এখন মুশকিল হয়েছে, গভর্ণমেণ্ট আর সব দেবে, শুধু যাতায়াতের গাড়িভাড়াটা নিজেকে দিতে হবে।

—ও! তা এসব ত কিছুই জানায় নি দেবি!

—তোমাদের ওপর ভরসা করা ছেড়ে দিয়েছে অনেক কাল। তা বেচারী দুঃখ করতেই পারে, ওকে তোমরা ছেঁটে বাদই দিয়েছ ত!

—আমরা বাদ দেবার অনেক আগে ও-ই ত আমাদের বাতিল করেছে। যাক, তবু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ও-ই যা কিছু করল। ভাবতে বেশ ভালো লাগে। সীতানাথ মুখুয্যের মেয়ে হয়ে এতবড় ধাপে পৌছনো,—কল্পনাই করা যায় না!

—তুমি অন্ততঃ একথা ব'ল না—এর চেয়ে অনেক বড় হতে পারতে তুমি।

—পারলে কি আর হতাম না?

—ছাখো, তোমার নিজের কিছু না হলেও, তোমাকে দিয়ে ত অনেক কিছুই হয়েছে মানিকপুরের।

হেসে উঠল দেবজ্যোতি। তার উঁচু, দরাজ গলার খোলা হাসিতে প্রান্তরের স্তব্ধতা হঠাৎ যেন চম্‌কে উঠ্‌ল। চম্‌কেছে সে নিজেও। হাসির মধ্যেই সে টের পেল অমলার একখানা হাত তার হাতকে মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরেছে। হাসি থেমে গেল। স্থির রিক্ত স্বরে দেবজ্যোতি বলে—ভালোবাসা ভালো, কিন্তু অন্ধ ভালোবাসার যন্ত্রণা বড় সাংঘাতিক অমলা। তুমি নিজেও বোঝো, আমার মতো অপদার্থ ত পথে ঘাটে অনেক পড়ে রয়েছে। তাই বল্‌ছিলাম, যদি ভালোই বাসো ত অপদার্থ জেনে, তারপরেও যদি পারো তো বেসো। নইলে বড় কষ্ট পাবে।

অমলার হাতের মুঠো শক্ত হয়ে আসে। ও যেন দেবজ্যোতিকে নিজের

কোলের কাছে আকর্ষণ করছে। প্রায় ফিস্‌ফিস্ ক'রে অমলা বল্‌ল—না, না, তুমি জানো না তোমাকে।

—জানি। খুব জানি।

—এই যে এখানে ফিরে এসে, নিজেকে এমনি ক'রে বিলিয়ে দিলে, তার দাম কে দিতে পারে? এত বড় ত্যাগ ক'জন স্বীকার করতে পারে!

দেবজ্যোতির হাতখানা নিজের গালের ওপর বুলোতে বুলোতে অমলা যেন নিজের মনের সঙ্গে কথা কয়ে চলেছে।

অমলার মুখের ওপর ডান পাশ থেকে শীতের কুয়াশা জড়ানো জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে দেবজ্যোতি বল্‌ল—খানিকদূর পর্যন্ত আমি ঠিকই এসেছিলাম। কিন্তু, তারপর সব গোলমাল হয়ে গ্যালো। মন্দাকিনী চলে যাবার পর,—আমি যে কী হারিয়েছি তা কাউকেই বল্‌তে পারি নি। ও যতদিন ছিল, ততদিন আমার মধ্যে একটা আগুন ছিল, আমি বেঁচে ছিলাম, বাঁচতে চেয়েছিলাম–সবাইকে নিয়ে সবার সঙ্গে মানুষের মতো বাঁচার স্বপ্ন ছিল মনে। বিরাট আশার ফানুষ! ও যেন হঠাৎ সবটুকু আলো আমার মন থেকে নিংড়ে শুষে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। তারপর থেকে ত হাতড়ে-হাতড়ে চলেই এসেছি। নিজের জোর যার নেই, সে কি করে আর সকলকে টেনে তুলবে? বুঝলে, আমি একান্তই একলা, নিঃসঙ্গ আমি। আমি রিক্ত। কতো চেষ্টা ক'রেও আর পুরনো উৎসাহ উদ্দীপনা, আশার স্বপ্ন, কিছুই ফিরে পাই নি।

অমলার হাত থম্‌কে দাঁড়িয়েছে, ওর দৃষ্টি দেবজ্যোতির বিষণ্ণ করুণ দুচোখের ওপর!

আস্তে আস্তে বল্‌ল—সেটুকুও বুঝি!

পাম্পিং স্টেশনের ধ্বক্ ধ্বক্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। একটা আলোর রেখা একটু একটু দুল্‌ছে, দূরে—নদীর চরে। সেইদিকে তাকিয়ে দেবজ্যোতি বল্‌ল—আমরা পৌঁছে গেছি। এবার বালির মধ্যে পথ। একটু হাঁটতে হবে। গাড়িটা এখানেই থাক।

নেমে পড়ল ওরা দু'জনে।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—দেবিকারা কোথায় গেল! ওদের গাড়িখানা এখনো এলো না ত?

অমলা উত্তর দিল—সেটা ত আগেই বেরিয়ে গেছে। আমাদের সামনে দিয়ে ওদের গাড়ি ফিরে গেল, ছাখো নি তুমি?

দেবজ্যোতি জবাব দিল—না ত!

পাম্পিং হাউসের সাম্‌নে একটি সশস্ত্র প্রহরী—ওদের দু'জনকে নির্লিপ্ত ভাবে এক নজর দেখে নিল।

ঠাণ্ডা বালিগুলো শিশিরে ভিজে উঠেছে। পা ডুবে যাচ্ছে ঠাণ্ডা কন্‌কনে বালির মধ্যে। অমলার চল্‌তে কষ্ট হচ্ছে দেখে দেবজ্যোতি হাত বাড়িয়ে দিল। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বল্‌ল—একদিন এইখানেই হারিয়ে গেছে ঘোষালদা। কাকামনির দেহটা অবশ্য এখানে পুড়েছে। একটা মজা দেখেছো, ঘোষালদার প্রাণটা এখানেই কোথাও শেষ করল ওরা, কিন্তু দেহটা পুড়ল না এখানে—আর কাকামণির বেলায় তার উল্টো হ'ল!

দেবজ্যোতির হাতের ওপর এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু 'টপ্‌' ক'রে পড়ল। আস্তে আস্তে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে সেটা জুড়িয়ে গেল, তারপর কন্‌কনে ঠাণ্ডা হয়ে এল—তবু শুকোলো না। ওরা বালি ভেঙে ভেঙে এগিয়ে চলেছে। সামনে শালজঙ্গলে জোনাকি জ্বল্‌ছে—হাজার হাজার ছোট ছোট আলো, জ্বল্‌ছে আর নিভ্‌ছে। অমলা এবার দেবজ্যোতির গা-ঘেঁষে চলে। ডান দিকে চওড়া নদী-বেলায় জ্যোৎস্না থৈ থৈ করছে। ওপরে আকাশ আর নীচে, উঁচু পাড় ভেঙে বেশ খানিকটা নীচে জলস্রোত—এই সমগ্র শূন্যমণ্ডল যেন জ্যোৎস্নার সমুদ্র। আকাশে ওগুলো কি জোনাকি? বনের মধ্যে ওই যে জ্বল্‌ছে নিভ্‌ছে অসংখ্য আলো—ওরা কি নক্ষত্র? আকাশে আর বনে যেন মিশে একাকার হয়ে গেছে। জ্যোৎস্নার সমুদ্রের সহস্রযোজন পারের দুই তীর—আকাশ আর নদী। অথচ এত সহজে এই দুস্তর ব্যবধানে অবস্থিত লোকান্তর দুটি ওদের দৃষ্টিসীমায় ধরা পড়ে গেছে!

দীর্ঘশ্বাস পড়ল, প্রথমে দেবজ্যোতির পরে অমলার।

প্রশ্ন করল অমলা—কি হলো?

—কিছু না। কিছুই হল না, কিছু হয় না—। দেখছো তো। এখানে দাঁড়ালে মানুষকে কতো ছোটো দেখায়।

—আমি ত দেখছি সুন্দর। একটু বসবে ?

—বসি। কিন্তু তার আগে ওদের স্মৃতিস্তম্ভের শুরুটা দেখে এলে হ'ত না ? বাদলের স্বপ্ন—

—একটু বসো। মনটাকে গুছিয়ে নিতে হবে তার আগে।

অমলার হাতের টানে দেবজ্যোতি বসে পড়ল ভিজে বালির ওপর।

পরক্ষণে, বালিতে হাত পড়তেই অমলা বল্‌ল—একটু ওঠো।

দেবজ্যোতি উঠতেই আঁচল বিছিয়ে দিয়ে অমলা বল্‌ল—বসো।

—আর, তুমি ?

—উপায় নেই। আমি বেশ আছি। এমন লগ্ন আর ত আসবে না। আমি ত অন্যের অধিকারে এক চুমুক ভাগ বসাতে ব্যস্ত। কিন্তু সেজন্যে তুমি কেন কষ্ট পাবে !

—তাই কি ? তোমার কোনোই অধিকার নেই !

—মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ো না।

দেবজ্যোতির কথা কইতে ইচ্ছে করে না। তর্কে তার আরও অনিচ্ছা। সে মৌন মনে এই অনন্ত জ্যোৎস্না সমুদ্রের স্বাদ গ্রহণে উন্মুখ। ওই বালু রেখা পেরিয়ে যেখানে নদীর জল চিক্ চিক্ করছে, সেখানে তার দৃষ্টি স্থির। বহমান নদীজলে আলোর রূপোলী ছিনিমিনি খেলার আর শেষ নেই। কী আলো, কি অপূর্ব আলোর নৃত্য !

শিশুর মতো ছুটে চলে যেতে চায় অবাধ্য মন।

অমলা বলে—তোমার চোখে সমুদ্র, দেবু !

হেসে ফিরে তাকালো দেবজ্যোতি। তার মনে হচ্ছে অমলা যেন বড় ছেলেমানুষ হয়ে পড়েছে হঠাৎ।

আহা ওর জীবনের রিক্ততা কম নয়। প্রথম অন্তরঙ্গ বেদনার্ত মুখের সে ছবি আজও দেবজ্যোতি মুছে ফেলতে পারে নি। মাণিকপুর থেকে অমলা যেদিন অসহায় শিশুকে নিয়ে মানিকপুর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল—

সেদিনের ছবি দেবজ্যোতির জীবনপটে অমরত্ব পেয়েছে। যখন দেবজ্যোতি জানতো না প্রেম কি, নারীর আকর্ষণ কাকে বলে—সেই কালেই অমলার দুঃখ-ক্লিষ্ট যুবতী মুখখানি তাকে মুগ্ধ করেছিল। আজ সে কথা বুঝতে তার এতটুকু অসুবিধে নেই। আর দেবজ্যোতি নিজেকেও দেখতে পায় পরিষ্কার। তার ইচ্ছে অমলাকে একটু আদর দিয়ে কাছে টানতে। যাকে ও একটু আগে মিছে সান্ত্বনা বলেছে সেটা ভুল প্রতিপন্ন না করতে পারলে দেবজ্যোতির স্বস্তি নেই। সামনে অনন্ত জ্যোৎস্নার সমুদ্র যেন বলছে বঞ্চনায় মুক্তি নেই। যাকে ভালো-বাসো তাকে কিছু না দিতে পারলে তোমার সার্থকতা নেই। মিথ্যে বাধার প্রাচীর ভাঙতে ইঙ্গিত করছে ওই অন্তহীন দিগঞ্চল।

দেবজ্যোতি হাত বাড়ালো। দু-হাত বাড়িয়ে সে অমলার কণ্ঠদেশ জড়াতে উদ্যত।

মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে অমলা স্নিগ্ধ হাসি হাসলো—নেই, কিছু নেই! কোন ভুলে যাওয়া যুগে শুরু হয়েছিল। পথ চেয়ে বসে থেকে থেকে আমার বসন্ত ফিরে গেছে দেবু। দেহে আমার জরা। তোমাকে খুশী করার মতো এক কণাও বাঁচিয়ে রাখতে পারি নি ভাই।

দেবজ্যোতির দুখানি হাত নিজের অঞ্জলিতে আঁকড়ে ধরে সেখানে মুখ গুঁজে অমলা কান্নায় নিজেকে ঢেলে দিল যেন। ওর কান্নায় কোনো তরঙ্গের দোলা নেই। দেহ কাঁপছে না। শান্ত কোমল একটা তৃপ্তির প্রবাহ এই কান্না।

দেবজ্যোতি প্রশ্ন করে—কি হল?

জবাব দিল না অমলা।

শেষে যখন ওর চোখের জল মুছিয়ে দেবার জন্য দেবজ্যোতি নিজের হাত মুক্ত করতে চায় তখন অমলা বল্ল—আমার জন্যে নিজেরই দুঃখ হয় দেবু! ভাবি, যাকে ভালোবাসি সেই মিণ্টুরই কি অমঙ্গল করতে চলেছি আমি? না, না, তা হয় না! কি পাগলামী বলো তো! তোমার ঘর-সংসার পরিবার রয়েছে—আমারও খোকন আছে।

থমকে একবার দেবজ্যোতির মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করে

অমলা আবার বলে—আছে। থাকবে। সব সত্যি! তবু এটাও সত্যি যে, তোমাকে আমি—

দেবজ্যোতি চুপ করে রইলো।

অমলা আবার বলে—আচ্ছা বল্‌তে পারো, দেহের রস মরে গেলেও মনের কামনা কেন বেঁচে থাকে? না, না,—থাকে না বল্‌লে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। এই ছাখো আমার বুক—এখানে কি দারুণ যন্ত্রণা। অথচ এমনিতে শুকিয়ে গেছে।

অমলা দেবজ্যোতির দু-খানা হাত নিজের দু-প্রস্থ জামার তলে টেনে নিল। না, ওর কথা একটুও মিথ্যে নয়। সত্যি কোনো সান্ত্বনার অবশেষ সেখানে নেই—সমতল। একান্ত প্রৌঢ়ত্বের শৈথিল্য ওর দুই স্তনে। সেখানে এতটুকু কামনার কাম্য বলে কিছু নেই। ইচ্ছে থাকলেও দেবজ্যোতি হাত টেনে সরিয়ে নিতে পারে না, পাছে অমলা ব্যথা পায়!

পরক্ষণে নিজেই হেসে উঠল অমলা—ছাখো, নিজে ত জানি যে, আমারি এই দীনদরিদ্র অবস্থা দেখলে তুমিও হাসবে। ভাবছো যে এই খালি কলসীটা তোমার গলায় ঝুলিয়ে দিতে চাই আমি। এ যে মেয়েদের কতো বড়ো লজ্জা, সে তুমি বুঝবে না দেবু! তবু, তবু পারলাম না তো নিজের কামনাকে সাম্‌লে রাখতে! তুমি আমার বুকে এই হাত রেখেছ, ও হাতের ছোঁয়া এখানে পেয়েছি—এ আনন্দ আমার লজ্জা, দৈন্য, সঙ্কোচ সব কিছুকেই হারিয়ে দিয়েছে। তাই বলছিলাম যে, কামনার বোধ হয় মৃত্যু নেই।

দেবজ্যোতির মুখের দিকে তাকিয়ে অমলা বল্‌লে—রাগ করলে?

—না।

—কষ্ট হচ্ছে?

—না।

—তাও নয়? তবে?

দেবজ্যোতি আস্তে আস্তে বলে—ভালো লাগছে।

—কি আছে ভালো লাগার? দেখলে ত আমার পুঁজি! এই দেহ নিয়ে—

—দেহ নয়। মন। তোমার মন যেন আমাকেও কিছু দিতে চাচ্ছে!

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল অমলার বুক নিংড়ে। ও বল্‌ল—মনের কথা আর বলো না। মাঝে মাঝে পাগল হয়ে উঠি। ইচ্ছে করে ছুটে আসি। কিন্তু নিজেকে বড় ভয়—যদি তোমার সুখের সংসারে অশান্তি ডেকে আনি। আবার ভাবি, অতটা ভয় করার কিছু নেই, তোমাদের দু'জনের বাঁধন অতো আল্‌গা নয়। ঠিকই ভাবি। তাই না?

একটুখানি চুপ করে থেকে দেবজ্যোতি বলে—মিণ্টু আমাকে অনেক দিয়েছে। দিয়েই গেলো শুধু। পেলো আর কতটুকু! তার আগেই ত ফুরিয়ে গেছি। তবু ওর শান্তি আর তৃপ্তির কাছেই আমার আত্মসমর্পণ। তা সে যতই রিক্ত আর ব্যর্থ হই না কেন!

—সামনে বাধা পেলে নদী বাঁকা পথ ধরে—তা বলে কি নতুন পথটা বঞ্চিত হয়? না, যে পথ দিয়ে নদী এতখানি চলে এসেছে সে পথেরই কিছু এসে যায় দেবু! ভালোবাসা নদীর মতো,—তার গতি আছে বলেই সে জীবন্ত!

বলতে বলতে অমলা দেবজ্যোতির মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে বসল—কই আমায় একটা চুমো খেলে না ত?

কথাটা শুনে দেবজ্যোতি ভেবেছিল যে অমলা আবার বুঝি হেসে উঠবে, বলবে 'দেখেচো কি কাঙালপনা?' কিন্তু, হাসির কোনো চিহ্ন নেই ও মুখে!

আর একবার চিক্‌চিকে রূপোলি জলের ওপর জ্যোৎস্নার ছিনিমিনি খেলা দেখতে দেখতে দেবজ্যোতি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ হাতে টান পড়তেই সে ফিরে তাকাল। অমলা ডাকছে—ওঠো, চলো, ফিরি!

—হুঁ!

কানে বেজে উঠল পাম্প হাউসের হিস্‌-হিস্ শব্দ। পরক্ষণে দিক্‌বিদিক কাঁপিয়ে শিবারব উঠলো। অমলা চমকে উঠে দেবজ্যোতিকে আঁকড়ে ধরল। দেবজ্যোতি বল্‌ল—কি হ'ল?

—কিছুই না। কিছু হয় নি—হয় না কিছুই। তাই না দেবু!

—তাই। চলো যেখানে যাবার কথা সেখানে যাই!

—যাবে সেখানে? মনে কোনো 'কিন্তু' ভাব হবে না? পারবে তোমার

[illegible]নির সামনে দাঁড়াতে এখন? আমার কেমন অস্বস্তি লাগছে। [illegible] পবিত্র আত্মার কাছে যাবার অধিকার কি আর আছে?

—আছে। কিছুই হয় নি, চলো।

সামনে কিছুটা এগিয়ে পুরনো শ্মশানঘাটের ভাঙা বিশ্রামঘর। এরই নীচে [illegible] ঢালু পথ ধরে নীচে নেমে গিয়েছে শ্মশান। অন্ধকার ঘরখানা যেন মৃত্যুর বিভীষিকা বুকে ক'রে বসে আছে।

কাছে এসে ওরা জ্যোৎস্নার আলোতে দেখতে পেল, সামনে বালির স্তূপ। [illegible] পাশে খানিকটা জায়গায় একটু গাঁথনী উঠেছে। সামনেই একটা থাম। থামের ওপরে প্রদীপ নিভে গেছে, প্রদীপে তেল ভর্তি—হাওয়াতেই হয়তো নিভেছে। যা কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়া!

অমলা বলল—এইখানে?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা দেবু, এসো না এখানে আমরা উৎসর্গ করে যাই কামনাকে। [illegible] আজকের যা-কিছু সুকৃতি-অকৃতি সব সঁপে দিয়ে গেলাম। এর পর, তুমি, আমি নিজের কক্ষ ঘিরেই চল্‌বো।

—না। আমি এমন শপথ করি না, যা নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে।

—নষ্ট হবে কি জন্যে! মনের ওপর দখল নেই তোমার?

আছে। তবে, যদি তোমার দিক থেকে বিচ্যুতি দেখি, স্থির থাকতে পারবো না। মন বলবে শপথের চেয়ে মানুষটা অনেক মূল্যবান। কাজেই মানুষকে নিজের বিবেচনার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকাই ভালো। একথা মিণ্টু আমাকে শিখিয়েছে, ওর গোটা জীবনের গতি দিয়ে!

মানুষের কণ্ঠস্বর পেয়েই হয়তো, একটি শেয়াল ভাঙা ঘরখানা থেকে বেরিয়ে গেল। খানিকটা গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে কি দেখলো—ওর চোখ দুটো সবুজ আর অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল! যেন মহার্ঘ কোনো রত্ন। অমলা সেদিকে তাকিয়ে বলে—কি সুন্দর, দেবু!

অমলা হাতজোড় করে প্রণতি জানালো। তারপর বলল—কই তুমি প্রার্থনা করলে না? নমস্কার করলে না।

—না! বিধাতার কাছে আমার কোনো [redacted] কারণ বিধাতা নেই।

—নেই? তুমি ঠিক জানো?

—হ্যাঁ জানি। থাকলে, কেন এত অবিচার আর অসমতায় দুনিয়া ভর্তি থাক[redacted]

[redacted]কে তুমি অবিচার বল্‌ছ দেবু, যাকে অসমতা বলছ—তা যে মানুষের স্বভাবেই রয়েছে! মানুষ তার স্বভাবকে বদলাতে পারে? না কি তুমি চাও যে বিধাতা যদি থেকে থাকেন ত তিনি মানুষের প্রকৃতিকে পাল্টে দিয়ে যান? কি চাও দেবু?

—আমি ছোটো মানুষ। আমার চাওয়াটা স্থূল। আর সে চাওয়ার জন্যে লোকোত্তর কিছুর ভরসা রাখতে চাই নে—আমার প্রার্থনা মানুষের দরবারে।

—তাহলে বলো, নিজের ওপর তোমার ভরসা আছে?

—দাঁড়াও। একটু ভেবে দেখি। না, ভাববারই বা কি আছে? ভরসা রাখতেই হবে নিজের ওপর, আমার আশপাশের শ্রমিকদের ওপর। আজো ত একজন শ্রমিককেই শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এখানে এসেছি।

—সেই প্রার্থনা।

দেবজ্যোতির দৃষ্টি সেই আকাশস্পর্শী দিগন্তকে ছুঁয়েছে।

অমলার কোনো কথাই সে যেন শুনতে পায় নি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে বলল—তাই বটে। তর্কে আর শ্রদ্ধায় তফাৎ অনেক। কি রকম জানো, এখন আমাদের মানিকপুরে মজদুরে আর কোম্পানীতে সম্পর্কটা যেরকম দাঁড়িয়েছে—এটা তর্কের মতো। আর যেটার দরকার, সেটা হ'ল শ্রদ্ধার সম্পর্ক।

—তার মানে? বুঝলাম না।

—চলো বলছি।

দেবজ্যোতি অমলার হাত ধরে উল্টো দিকে চলতে লাগলো।

অমলা তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলে—কি হ'ল?

—হবে, হবে। আশা আছে। শ্রদ্ধা, মানে,—

কোথায় কোন গাছে একটা রাতচরা পাখি ডাকছে। পাম্প হাউসের ওয়াজটা কাছিয়ে আসছে। দেবজ্যোতি বলে—তোমার কথায় আজ একটা নূতন শক্তির সঙ্কেত আমি ফিরে পাচ্ছি যেন। সে এই শ্রদ্ধা।

অমলা তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে। দেবজ্যোতি বলে—এই যে তুমি আজ বল্‌লে, কামনার কথা। সেটা খুব বড় সত্য। আজও ত আমি মানিকপুরের মানুষদের কথা ভুলতে পারি নি। নিজের কোনো শক্তি নেই, তবু আমি চাই আমাদের সকলের দিন বদ্‌লে যাক—আমরা মানুষের ষোলআনা অধিকার পাই! আমি শুধু মনে মনেই চাই—কিন্তু তোমার মতো অকপটে চাইতে পারি না কেন? কেন, তুমি যেমন ক'রে আমার দুহাত জড়িয়ে বুকে টেনে নিয়ে নিজের সবটুকু দেখিয়ে দিলে, তেমনি করে ওদের কাছে নিজেকে খুলে দিতে পারি না। লজ্জা ক'রে যে কিছুই দেওয়া হচ্ছে না! তোমার মনকে আমি ভালোবাসি, সেই মন যার মধ্যে সত্যই সব। আমি কেন তোমার মন পাই না! পাবো না, অমলা?

—আমার চেয়ে অনেক বড় তোমার মন দেবু!

পাম্পিং স্টেশনের প্রহরীটি এখনো একবার ওদের দিকে তাকালো। কিন্তু ওরা সেদিকে লক্ষ্য করে নি। গাড়িখানা অন্ধকারে আমগাছের নীচে রয়েছে।

দেবজ্যোতি শেষবারের মত দামোদরের স্রোতের দিকে তাকালো—চাঁদ উঠে গেছে অনেকটা উঁচুতে। তারাগুলো জ্বলছে। এখান থেকে ওই জ্যোৎস্নাসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেবজ্যোতির মনে হচ্ছে এখন—ওটা বুঝি নদ নয়। জলের ওপর আলোর ঝিক্‌মিক রূপোলি তরঙ্গ অবিরাম রচিত হচ্ছে। সে ভাবছে—আবার ফিরে যাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। সে আর একবার শ্রমিক সংস্থায় হাত লাগাবে। এবার নিজেকে উৎসারিত করে দেবে, নিজের দৈন্য গোপন না ক'রে। আর সেই সঙ্গে যদি থাকে তার মনের কোনো মাধুর্য, তার ওপর ভরসা রেখেই এগিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রদ্ধার পথই পথ। মালিক আর শ্রমিক যদি পাশাপাশি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে চল্‌তে পারে তাহলে জীবনছন্দ সুষম হবেই। আসল

যন্ত্রের কাছ থেকে কাজ আদায় করাটাই ত দু-তরফের উদ্দেশ্য। কিন্তু সেটা কেউ ভাবে না কেন? মালিক কেন ভাবে যে, শ্রমিকের কাছ থেকে কাজটা আদায় করতে হবে? শ্রমিকের স্বার্থকে মালিকের সঙ্গে সমান ছন্দে বাঁধতে পারলেই—আর তা পারার জন্যে বিশ্বাস চাই, শ্রদ্ধা চাই,—সকল বিরোধের অবসান তাতে হয়। পাশাপাশি চল্‌তে পারলেই অশান্তি ঘুচবে। এ কথা কি কোনোদিন দেবজ্যোতি নিজেদের বিশ্বাস করাতে পারবে না! পারবে। অন্ততঃ অভিমান মুছে ফেলে, সেই চেষ্টায় নিজেকে নিয়োগ করতে পারবে ত!

অমলা ডাকলো—দেবু, দেরি কর না আর—।

—না, চলো।

ঘুরে দাঁড়াতেই দেবজ্যোতির দৃষ্টি গিয়ে পড়ল অমলার মুখের ওপর। আর তারও ওপরে, অমলার মাথা ডিঙিয়ে যে আলোর মালা দেখা যাচ্ছে ওই ত মানিকপুর। আরও ওপরে জ্বল্‌ছে—হ্যাঁ অত্যন্ত স্পষ্ট, উজ্জ্বল, জ্বলন্ত চিম্‌নী। কারখানাটা এই এখান থেকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে। কয়েক মাইলের ব্যবধান পেরিয়ে দূর থেকে এমন সুন্দর দেখাচ্ছে, ওই কারখানা—যেখানে দেবজ্যোতি কাজ করছে, তার বাবা কাজ করে গিয়েছেন। আরও হাজার-হাজার মানুষ, লাখ লাখ ঘণ্টার জীবন ওইখানে খরচ করে দিয়ে গেছেন। সেই কারখানাকে আজ আর দানব মনে হচ্ছে না এখানে দাঁড়িয়ে।

দেবজ্যোতির বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে অমলা বল্‌ল—কি হল? কি দেখচ?

অমলার হাত ধরে কারখানার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে সে ব[illegible]এমন সুন্দর দেখায় এখান থেকে—এর আগে ত লক্ষ্য করি নি!

অমলা বুঝতে পারে না, ও প্রশ্ন করে —ওটা কিসের আলো?

দেবজ্যোতি সশ্রদ্ধ প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকিয়েই আত্মগত ভাবে জবাব দিল—কারখানার! মানিকপুরের।

অমলার চোখেও বিস্মিত, স্নিগ্ধ, তন্ময় দৃষ্টি।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—চলো। ওরা আমাদের জন্যে বসে থাকবে।

—শেষ—

একষট্টি

মল্লিকা ঘরে ঢুকে দেখল দেবজ্যোতি চিঠি পড়ছে। একটুখানি চুপ করে থেকে বল্‌ল—ও হো, তোমাকে বল্‌তে মনে ছিল না দাদা, কাল বিকেলে মিণ্টুদি এসে অনেকক্ষণ ছিল। ইস্‌ কী রোগা হয়ে গেছে! মুখের পানে চাওয়া যায় না! আর সে হাসিখুশীও নেই। কেমন যেন মনমরা-মনমরা ভাব! খুব কষ্ট হয় ওকে দেখলে।

চিঠির ওপর চোখ রেখেই দেবজ্যোতি সাড়া দিল—হুঁ!

চিঠিতেও যেন মিণ্টুর একটা বিষণ্ণ মুখচ্ছবি ভেসে বেড়াচ্ছে। ও লিখেছে, —এ চিঠিখানা না লিখলেই ভালো হতো। তবু লিখলাম। —আর, যখন লেখাই হলো তখন তোমার কাছে পৌঁছে দিতেই বা আপত্তি কি? সত্যি তুমি যে আমার জন্যে ভাবো না, সে আমি অনেক আগেই জেনেছি। তবু যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হ'ত না। সেই জন্যই নিজের অজান্তে তোমার পথ আগলে বসে ছিলাম। এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, যত কালই থাকি না কেন, ফাল্গুন আমার পথে আসবে না। সেদিন অমলা বৌদির চিঠিতে সব খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। তোমার পথে তুমি স্বচ্ছন্দে চল্‌বে, তাতে আমার বাধা দেবার অধিকার নেই,—রুচিও নয়! এটা অন্ততঃ অভিমান বলে ভুল ক'র না। আমি ক্ষুদ্র। তাই আমার মন হয়তো তোমাকে বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু এত ক্ষুদ্র নই যে, নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারবো না। তাই তোমাকে আমার ভাবনার দায় থেকে মুক্তি দিলাম। তোমার তরফে এই মুক্তির কোনো মূল্য না থাক, আমার প্রয়োজন ছিল। মন্দাকিনীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে সত্যি খুশী হবো—মনে হয় আঘাতের চেয়ে সে খুশীটুকু ছোটো নয়। আমার জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না। অযথা আর সকলের কৃপা কুড়োবার জন্যে চিরকাল কুমারীত্ব নিয়ে বসে থাকার প্রয়োজন কি! বাবা পাত্র খুঁজছেন—শুভবিবাহে নিমন্ত্রণও পাবে। কিন্তু দোহাই তোমার, সেদিন দয়া করে এসো না। প্রণাম করি। ইতি

তোমার স্নেহের মিণ্টু

চিঠিখানা বার তিনেক পড়ল দেবজ্যোতি। তারপর আবার খামের মধ্যে রেখে দিয়ে, দ্বিতীয় পত্রখানি খুলতে খুলতে বাইরের দিকে তাকালো। শিরীষ গাছটা আজও ফুলের সাজে, পাতার সবুজে, প্রাণপ্রাচুর্যমাখা!

বাইরে গোয়ালার সাইকেল এসে থামলো। বাবুমহল্লার দুধওয়ালার বেশবাসটুকু সাহেবী। সে হাফপ্যাণ্ট আর শার্ট পরে, মাথায় সোলার টুপী! বাহারের জন্য টুপী নয়, রোদ বাঁচাবার জন্য।

মন্দাকিনীর চিঠিতে গোবিন্দবাবুর খবর। তাঁর চোখ ক্রমশঃ ভালোর দিকে যাচ্ছে। আর হয়তো দিন দশেকের মধ্যেই ওঁকে ছেড়ে দেবে হাসপাতাল থেকে। অবশ্য ক্যাটারাক্ট অপারেশনের কাজটা বাকী থাকবে। মাস তিন-চার পরে শীতের মুখে ভর্তি হ'তে হবে। অমলার সঙ্গে প্রায়ই ওর দেখা হয়। ইদানীং যেন অমলা ওকে আরও বিরূপ দৃষ্টিতে দেখছে! কেন, তা সে বুঝতে পারে না। অথচ মন্দাকিনীর ত অমলাকে বেশ ভালো লাগে। একদিন গিয়েছিল অমলাদের বাড়ি।—অমলার ছেলের সুখ্যাতিই এক পৃষ্ঠা ধরে করেছে মন্দাকিনী। দেবপ্রিয় নামটিও ওর খুব ভালো লাগে!—দেবজ্যোতি কি ছুটি পাবে? নাহলে গোবিন্দবাবুকে মন্দাকিনী পৌঁছে দিতে পারে, অবশ্য স্টেশনে যেন দেবজ্যোতি থাকে। মানিকপুরের মধ্যে ও ঢুকতে চায় না এখন। মিস্টার মল্লিক নাকি আজকাল মন্দাকিনীর চরিত্র সম্পর্কেও যা-নয়-তাই রটিয়ে বেড়াচ্ছেন? আগের চিঠির জবাব কেন দেয় নি দেবজ্যোতি? এ চিঠিখানির উত্তর পেতে পাছে দেরী হয়, তাই মন্দাকিনী একখানা সরকারী খামও ভেতরে দিয়ে দিয়েছে।

দাঁতন করতে করতে দেবজ্যোতি ভাবতে শুরু করে। সে ভাবনার কোনো পারম্পর্য নেই। কখনও মন্দাকিনীর কখনও বা মিণ্টুর চিঠির কথার সূত্র জড়াজড়ি করে ঘিরে ধরে তাকে। মিণ্টুর নীরব নির্জন চিন্তা আর মন্দাকিনীর সুব্যক্ত সাগ্রহ আতিশয্য—দুয়ের কোনটিকে সে উপেক্ষা করবে! কে তার উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে?

কোয়ার্টারের সামনে এক টুকরো ঘাস বিছানো জমিতে দেবজ্যোতির অস্থির পদক্ষেপ। সকালের রোদকে সে নিজের অজ্ঞাতে পা দিয়ে মাড়িয়ে চলেছে

বার বার ! কি করবে দেবজ্যোতি ? বাল্যকালের অসংখ্য প্রীতিবিসারিত দিন-গুলির জের টেনে মালা গেঁথে গেঁথে মিণ্টু সকলের অগোচরে বসে আজও দেবজ্যোতিকে ধ্রুব করে রেখেছে। দেবজ্যোতির অলক্ষ্যে বার বার কাছে এসেছে মিণ্টু। চরম দুঃসময়েও পাশে এসে দাঁড়িয়ে এই পরিবারকে আপন সেবামাধুর্য অকৃপণ হাতে বিলিয়েছে। তার কি কোনো মূল্যই নেই ?

আবার অপর দিকে মন্দাকিনী এসেছে তরুণ যৌবনের দাবি নিয়ে। সেও ত সামান্য নয়। দেবজ্যোতির মানসলোকে মন্দাকিনী সহচরী। তার জন্য মন্দাকিনী ছেড়েছে অনেক কিছু—না, অনেক নয়, আর সব কিছুই ছেড়ে দিয়েছে মন্দাকিনী দেবজ্যোতির জন্য। সমাজ, সম্মান, সম্পদ—সব! এত বড় কথাটা দেবজ্যোতি ভাবতে গিয়ে মনে মনে এক অনাস্বাদিত তৃপ্তির স্বাদ অনুভব করে। তারই জন্য—হ্যাঁ, তার জন্যই মন্দাকিনী আজ আশাপথ চেয়ে আছে।

অথচ দেবজ্যোতি কি ? তার মূল্য কতটুকু ! নিজের কাছে স্বীকার করতে হয় তাকে—শাদা চোখে, পৃথিবীর সাধারণ পাল্লায় ওজন করলে দেবজ্যোতি মুখুয্যে একজন অসার্থক স্বপ্নবিলাসী যুবকমাত্র। তার নগদ মূল্য কানাকড়িও নয়। প্রতিষ্ঠা সে কোথাও পায় নি। নিজের এতগুলো বছরের জীবন দিয়ে কোনো মূল্যবান স্বাক্ষর আঁকতে সমর্থ হয় নি সে কোথাও। দেবজ্যোতির সবটুকুই ত ব্যর্থতার ইতিহাস ! সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ আদায় করতে পারে নি। রাজনীতির ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতা আরও সুস্পষ্ট। হয়তো আর দু-এক বছর লেগে থাকলে ডাক্তারীটা পাশ করতে পারত, কিন্তু দেশের কাজ তাকে দিয়ে কোনো কালে হ'ত না। না, সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। অর্থাৎ এই অযোগ্যতাটুকু বোঝবার মত শক্তি তার রয়েছে। তাই ত সে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এল রাজনীতির রাজ্য থেকে। তারপর এই বর্তমান অবস্থায় যদিচ সে আত্মপ্রত্যয়ের ওপর দাঁড়িয়েছে তবু এরই বা মূল্য কতটুকু ? ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সে নিঃসন্দেহ নয়। বর্তমানে সে মানিকপুরের সাড়ে তেরো হাজার শ্রমিকের একজন—এর বেশী কিছু নয়। আর ভবিষ্যতে বড়জোর একজন বিদ্রোহী শ্রমিক নেতা হতে পারে। হ্যাঁ, তাকে সেই পথেই

চল্‌তে হবে। সে পথের শেষ ত এখন দেখা যাচ্ছে না! অথচ সে পথের বাধাবিপত্তির পর্বতপ্রমাণ অস্তিত্ব সম্পর্কে সে সুনিশ্চিত।

দাঁতনের প্রায় অর্ধেকখানি কাঠি চর্বনের দৌলতে নিঃশেষিত হয়ে যায়, কিন্তু কোনো স্থির সীমান্তে পৌছতে পারে না দেবজ্যোতি।

এক সময়ে সে আপন মনে হেসে উঠল। এমনি একটা অসম্পূর্ণ মানুষের ওপর যে দুটি মেয়ে নির্ভর করে বসে রয়েছে, তাদের সম্বন্ধে দেবজ্যোতির করুণার শেষ নেই। ওরা এত ভালো, ওরা এত সুন্দর, ওদের মনের মাধুর্য এত মূল্যবান, ওদের চিত্তের উদার মহিমা সত্যিই বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলে দেবজ্যোতিকে। অথচ কী অকিঞ্চিৎকর একটা পাত্রে বিনষ্ট হবার জন্য ওরা বদ্ধপরিকর! ওরা তা বোঝে কই? ওরা না বুঝলেও দেবজ্যোতি ত সব জানে। তবে কেন সে এভাবে দুটি মেয়ের সুকুমার সুন্দর মনকে এই চরম ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করে না? কেন, কেন, কেন?

আচমকা ডাকে দেবজ্যোতি ফিরে তাকালো।

পথের ওপর থেকে চৌকস স্মার্ট-সুবেশ যুবক তার নাম ধরে ডাকছে—তাকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে হাত তুলে নমস্কার করে যুবকটি বল্‌ল—ভালো আছেন?

দেবজ্যোতি নমস্কার ফেরৎ দিল, কিন্তু যুবকটিকে চিন্‌তে পারল না।

সপ্রতিভ যুবকটি হাসলো—চিন্‌তে পারেন নি ত!

এবার দেবজ্যোতি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করল—আর ভুল হতে পারে না। ললিত! ইস্, তোর চেহারা একদম বদলে গেছে যে! তারপর, ছাড়া পেলি কবে?

আশপাশে একবার অস্বস্তিকর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ললিত ভ্রূকুঞ্চিত করল, তারপর বল্‌ল—চলুন ভেতরে যাই, এখানে বড্ড রোদ!

দেবজ্যোতি অতশত বোঝে না, সে সহজ ভাবেই দরাজ গলায় বলে চলে—যাক্, বাঁচালি ভাই! যা মুস্কিল হয়েছিল। এদিকে মুকু ত কান্নাকাটি করে অস্থির! বলে, যত টাকা লাগে তুমি একবার চেষ্টা করে ছাখো ওকে ছাড়িয়ে আনা যায় কি না। আবার ওদিকে মেসোমশাই কলকাতায় পড়ে রইলেন জখম হয়ে।

সমস্যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সে দ্বিগুণ উৎসাহে কথা বলছে। এক নিশ্বাসে দেবজ্যোতি নিজের মনেই বকে চলেছে, ললিতের ঘনায়মান অপ্রসন্ন মুখের দিকে তার নজর নেই। কিন্তু ললিত কেবলই বাধা দিতে চেষ্টা করে, বলে—আপনার কথা সব শুনেছি। সত্যি আমাদের এই বিপদের সময় যে এতটা করবেন এ যেন ধারণাই করা যায় না।

দেবজ্যোতি এবার অন্য সুরে কথা বলে—বাঃ, না করবার কি দেখলি তুই? আজ যদি আমার বিপদ হয় তুই করবি না?

ললিত জবাব দেয় না—এত সহজ কথার জবাব সে দিতে পারে না। দেবজ্যোতির সঙ্গে তার এইখানেই তফাৎ। সে বল্‌ল—আমার অনেক কাজ দাদা! তা ও বল্‌ল যে, একবার দেখা করা কর্তব্য—আমিও বলি ঠিক, কর্তব্য বই কি! চলে এলাম।

—চল্, চল্। ভালোই হয়েছে, চা খাওয়ার একটা সঙ্গী পাওয়া গেল।

—আপনার ত রোদের কামড় ছেড়ে নড়বার কোনো ইচ্ছে দেখছি না।

দেবজ্যোতি লজ্জিত ভাবে হাসলো,—কতকাল পরে তোকে দেখলাম, ললিত। বুঝে ছাখ, প্রথমে চিনতেই পারি নি। তুই একদম বদলে গিয়েছিস। তোর সেই বোকা-বোকা মিষ্টি চাউনীর বদলে এখন সম্পূর্ণ অন্যরকমের দৃষ্টি—এঁ্যা! তবু হাসির ভঙ্গীটা এখনও সে রকমই আছে—আশ্চর্য! তারপর তোর এগেন্স্টে ত সাংঘাতিক চার্জ সব, হ্যাঁ রে! সরকারকে ঠকিয়েছিস, বেআইনী ভাবে চাল-চিনির ব্ল্যাকমার্কেট করেছিস!

বাধা দিল ললিত—বোগাস!

বৈঠকখানায় চেয়ার দখল করে ললিত বল্‌ল—সব বোগাস চার্জ দাদা! আসল গোলমাল ইজ্ অল ওভার এ উওম্যান! ইয়েস, আপনার কাছে সব খোলাখুলি বলাতে কোনো লজ্জা নেই। আসলে কি হয়েছিল জানেন—

দেবজ্যোতির তরফ থেকে বিশেষ কৌতূহলের সাড়া আসে না। সে বল্‌ল—তুই বস ভাই, আমি মুখটা ধুয়ে আসি। তারপর কথাবার্তা হবে।

বাথরুমে যাবার মুখে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেবজ্যোতি হাঁক্‌লো—ওরে মল্লি, ইয়ে, ললিত এসেছে—

মল্লিকা গম্ভীর ভাবে জবাব দিল—কেন এসেছে ?

অবাক হয়ে দেবজ্যোতি বল্‌ল—বাঃ, কেন এসেছে ! কতদিন পরে এল—চা-টা খাওয়া। জানিস এমন বদলে গেছে, আমি চিনতেই পারি নি।

মল্লিকা বিরস কণ্ঠে উত্তর দেয়—না চেনাই উচিত ছিল তোমার।

তবু দেবজ্যোতি বুঝতে পারে না মল্লিকার এই বিরূপতার অর্থ। সে গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—তোর যেন আজকাল কি হয়েছে ! সব সময়ে মানুষকে হেনস্থা করাই যেন এ বাড়ির দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাক গে, আর ত কটা দিন, কোন রকমে মানিয়ে চালিয়ে নে, তারপর আর তোকে বিরক্ত হ'তে হবে না।

মল্লিকা পিছন ফিরে কি একটা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তার মুখখানা দেবজ্যোতি দেখতে পেল না, পেলেও হয়তো ভাবত যে, দেবজ্যোতির রূঢ় কথার আঘাতেই মল্লিকার চোখে অশ্রুবন্যা নেমেছে।

দেবজ্যোতি বাথরুমে ঢুকে পড়ল। মল্লিকা চোখের জল সামলাতে সামলাতে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ময়দা মাখতে বসল। ললিত কালোজিরে ছড়ানো কুচো নিম্‌কি খেতে খুব ভালবাসতো—আজ চায়ের সঙ্গে সেই নিম্‌কিই ভেজে দেবে, গরম-গরম। বাইরের অতিথিকে যেটুকু খাতির করতে হয়, মল্লিকা তাই করবে। তবে ললিতের সামনে নিজে বেরুবে না। দেবিকাকে দিয়ে চা-জলখাবার পাঠিয়ে দেবে। অথবা দাদাকে দিয়ে পাঠাবে—দেবিকাকেই বা বলবে কেন ? আরও একটা কথা মনে পড়ল। মল্লিকাদের পুরণো কোয়ার্টারের গলির মোড়ে যে পানের দোকান ছিল সেই দোকানের মিঠে পানও ললিতকে অনেক খাইয়েছে মল্লিকা। কিন্তু আজ মিঠে পান ত দেওয়া যাবে না। বাবু-মহল্লায় দোকানপাটের বালাই নেই। অবিশ্যি একটা দোকান রয়েছে—সেই অশত্থতলাতে কালা রসিকলালের দোকান। সেও বেশ খানিকটা দূরে। কাকেই বা পাঠানো যায় সেখানে !

একবার ভাবলো মল্লিকা, অতোই বা খাতির কিসের, যে, পান আনাতেই হবে !

দেবজ্যোতি বাথরুম থেকে বেরিয়ে বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলো।

ললিত এক মনে সিগারেট টানছিল, তাকে ফিরতে দেখে বল্‌ল—তা

বুঝলেন দেবুদা, এই সব ইয়েদের নিয়ে মহাফ্যাসাদ হয়েছে। বিজ্‌নেস ইজ্‌ বিজ্‌নেস, বেশ বাবা ঘুষ চাও টাকা নাও। তা নয়—টাকাও চাই, মদ-মেয়েমানুষও চাই। আরে বাবা, প্রত্যেক লাইনেই ত কিছু না কিছু আণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিং থাকবে! জানেন, এরা ওসব মানে না, একটি মেয়ে আমাকে পছন্দ করে, তার সঙ্গে আমার যেহেতু অন্তরঙ্গতা আছে, সেহেতু—বুঝলেন না, তাকেও ঘুষ বাবদে রাতে পাঠাতে হবে। সব সময়ে সব কিছুই ত বিলিয়ে দেওয়া যায় না!—তা এই নিয়েই হ'ল গোলমাল। জেলাসী! দুত্তোর, আর ভালো লাগে না।

দেবজ্যোতির কানে সব কিছুই পৌছয় কিন্তু সে যেন অসাড় একটা স্থাণু হ'য়ে পড়েছে! অম্লানবদনে ললিত যে কথাগুলো বলে গেল তা যে সত্যিই বাস্তবের জীবন্ত নমুনা, এ যেন দেবজ্যোতি বিশ্বাস করতে পারছে না।

আপন কথা চুকিয়ে ললিত বল্‌ল—আচ্ছা এখন উঠি দাদা! অনেক কাজ—

বাধা দিয়ে দেবজ্যোতি বলে—দাঁড়াও, চা হচ্ছে—

তারপর গলা চড়িয়ে হাঁক দিল—কই রে মল্লি—

অবাক হবার মতো মুখভঙ্গী করলেও ললিতের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের চেয়ে বিদ্রূপই ফুটে ওঠে, সে বল্‌ল—অ! ওরা বুঝি বাড়িতেই রয়েছে? আমি মনে করেছি, বুঝি আমার শালীরা সব চেঞ্জে গেছে।

জবাব দিল না দেবজ্যোতি। এতক্ষণ ধ'রে ললিত যেসব কথা শুনিয়েছে, তার অবিলম্ব প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে দেবজ্যোতির মনে। সমাজের মধ্যে যে নৈতিক অধোগতি হচ্ছে, কালোবাজারীর কাহিনী সে শুনেছে, যুদ্ধের দরুণ মানুষের চারিত্রিক শিথিলতার গল্পও সে কম শোনেনি—কিন্তু নিজের এতো কাছাকাছি সেই বাজারের সাক্ষাৎ নমুনা হিসেবে দেবজ্যোতি এই প্রথম দেখছে ললিতকে। সত্যি তাহলে নিছক গল্প নয় এসব! কোনো অজ্ঞাত দূর দুনিয়ার জীব নয় এরা। দেবজ্যোতির পাশে স্বচ্ছন্দে ললিত বসে বসে নিজের যে ছবি আঁকলো সেটা বর্ণে বর্ণে সত্য!

দেবিকা এলো একখানা বড় প্লেটে গরম গরম নিম্‌কী নিয়ে।

ওকে দেখে ললিত উঠে দাঁড়িয়ে বিদেশী কায়দায় বাউ করল—এই যে মিস্

মুখার্জি, আসুন! আসুন! সত্যি কি সৌভাগ্য আমার! ইয়াং উইথ হার ইউথ এ্যাণ্ড নিম্‌কি, হাও লাভ্‌লী!

দেবিকা কটাক্ষ করল—হ্যাঁ, তবে নিমকীটাই আপনার ভোগ্য! দাস ফার, এ্যাণ্ড নো ফার্‌দার। তারপর, ইংরেজদের হারেম কেমন লাগলো?

ললিত হো-হো করে হেসে উঠ্‌ল—সত্যি দেবি! তুমি বেশ স্মার্ট হয়ে উঠেছ ত। হবেই ত, এজুকেশনের গুণই আলাদা!

দেবিকা ভ্রূকুঞ্চিত করে আবার বলল—হারেমের গল্প শোনান। আপনি ত বেশ কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এলেন।

ললিত এড়িয়ে যেতে চায়—আহা অনেকদিন পরে এরকম নিম্‌কী খাচ্ছি। বুঝলেন দেবুদা, আমি ভাবছি ওসব ওঁছা কারবার ছেড়ে দেবো। একটা সোর্সে কারখানার মধ্যে বড় গোছের ক্যান্টিন খোলার চান্স পাচ্ছি। তবে মোটা খরচ আছে। তা থাক, উসুল করে নেবো ছ মাসেই—চান্সটা পাওয়ার ওয়াস্তা।

দেবিকা প্রশ্ন করে—আচ্ছা জামাইবাবু, দেশের লোকের রক্ত শুষে আপনি ক' লাখ টাকা হাতিয়েছেন?

—এই ছাখো, তুমিও এই সব কথা শিখেছো! কোথায় দুটো মিষ্টি কথা কইবে, তা নয়। এনি ওয়ে, টাকা কিছু হয়েছিল ঠিকই, তবে রইল আর কই! আচ্ছা দেবি, আজ সন্ধ্যের সময় তুমি ফ্রি আছো? চলো না একখানা ছবি দেখে আসা যাক।

দেবজ্যোতি করবার কিছু খুঁজে পায় না। ললিতের কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা বিরক্তিকর স্বর ফুটে উঠেছে যে সেটা বরদাস্ত করা প্রায় অসম্ভব মনে হয় তার। দেবিকা সেটা লক্ষ্য করে, ও বল্‌ল—দাদা তুমি খাচ্ছ না যে!

শোভনতার খাতিরে এক মুঠো নিম্‌কি তুলে নিয়ে দেবজ্যোতি চিবোতে লাগলো।

ওদিকে মল্লিকা কাপে চা ঢেলে দেবিকার জন্য কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করল। কিন্তু মেয়েটার আক্কেল-বিবেচনা বলে কিছু যদি থাকে! সেই যে ওঘরে গিয়ে ঢুকেছে আর বেরুবার নামটি নেই। ললিতের সঙ্গে ওর কিসের গল্প এত?

মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল মল্লিকা। কাপের ধূমায়িত চায়ের দিকে তাকিয়ে ও ভাবে—এমনি করে জুড়িয়ে যাবে। আর একটু কম-গরম হ'লেই ত দেবজ্যোতি ঠোঁটে ঠেকিয়েই চা নামিয়ে রাখবে।

অবশেষে বাধ্য হয়ে মল্লিকা চায়ের কাপ নিয়ে বৈঠকখানায় ঢোকে।

আগের বারের মত ললিত আর উঠে দাঁড়াল না, একবার মল্লিকার মুখের পানে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল সে।

মল্লিকাকে দেখে দেবিকা লজ্জিতভাবে জিভ-কেটে বল্‌ল—ইস্, একদম ভুলেই গিয়েছিলাম ছোট্‌দি! আচ্ছা, তুই বরং ব'স, তোর আর আমার চা-টা নিয়ে আসি।

দেবিকার কথায় মল্লিকা ভেতরে ভেতরে আরও চটে গেল কিন্তু মুখে কিছু বল্‌ল না।

ললিত স্তিমিতস্বরে বল্‌ল—ভালো আছো তো মল্লিকা!

ঘাড় কাৎ করে মল্লিকা জবাব দিল—হ্যাঁ! আপনি?

এবার যেন বলবার মত কিছু খুঁজে পায় ললিত—আছি। একরকম। তবে দিন যাচ্ছে আবার আসছে, আবার চলে যাচ্ছে। নানারকম ঝামেলা। এদিকে বাবার ব্যাপারটা নিয়ে ভারি ভাবনায় পড়েছি। ওদিকে কাল-পরশুর মধ্যে হয়ত একবার রেওয়া স্টেটে যেতে হবে—কিছু মাল আনবার পারমিট পেয়েছি। তা দ্যাখো না, বাবাকে আনারও বন্দোবস্ত করতে হবে। কী যে করি!

পুরোদস্তুর সাংসারিক সুর ললিতের কথায়!

চায়ে চুমুক দিয়ে দেবজ্যোতি যেন সহজ হবার অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে! সে বল্‌ল—বাবার কথাও ভাব তাহলে—এ্যাঁ!

অতর্কিত আক্রমণে ললিত বিস্মিত হ'ল। একটু ঢোক গিলে বল্‌ল—হ্যাঁ, তা ভাবতে হয়। সব কিছুই ত এই আমার একার ঘাড়ে এখন!

সে সিগারেট ধরালো।

দেবিকা ফিরে এসে বল্‌ল—ছোট্‌দি, আজ হঠাৎ চায়ের টেস্ট যেন ফার্স্ট ক্লাস মনে হচ্ছে!

দেবজ্যোতিও পরিহাস করে ফেল্ল—আমার তো একই রকম লাগলো রে! তবে তোর হয়তো স্পেশাল কারণে সব-কিছুই ভালো লাগছে।

এ কথায় মল্লিকাও মুখ টিপে হাসে।

দেবিকা সরাসরি ললিতের চেয়ারের হাতলে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো গিয়ে—তাহলে সিনেমার প্রোগ্রামটা পাকা ত জামাইবাবু?

—হ্যাঁ, সে আর বল্‌তে। আই হ্যাভ দি অনার টু বি ইওর মোস্ট—

ললিতের কথা শেষ হবার আগেই দেবিকা বল্‌ল—ব্যস-ব্যস, তাহলে ছোটদিকে দরখাস্তটা পেশ করুন।

মল্লিকা চমকে উঠল। হাতের কাপটা শক্ত করে ধরে বল্‌ল—কি আবার?

ললিত বল্‌ল—আজ সন্ধ্যের শোতে বড় শহরে সিনেমাতে যাওয়ার কথা হচ্ছে, তুমিও চলো না!

মল্লিকা গম্ভীরভাবে বল্‌ল—দিদি যাবেন ত?

ললিত হাসল—যেতে পারে, না-ও পারে। তার আবার ছেলেপুলে ঘর-সংসার অনেক হাঙ্গামা।

মল্লিকা আস্তে আস্তে জবাব দেয়—সংসারের বাইরে আমরা কেউই নই। দেবীর কথা বল্‌তে পারি না, তবে আমার অনেক কাজ রয়েছে।

পরমুহূর্ত্তে দেবিকার দিকে তাকিয়ে মল্লিকা বল্‌ল—হ্যাঁ রে, উনুনে চাট্টি কয়লা দিয়ে এসেছিস?

দেবিকা অবাক হ'ল—কই বলো নি ত সেকথা!

—যাক, আমিই যাচ্ছি। আঁচ একবার পড়ে গেলে, কাঁচা কয়লা ধরাতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়।—বল্‌তে বল্‌তে মল্লিকা চলে যাবার উদ্যোগ করে। ঘরের চৌকাঠে পা ঠেকতেই মল্লিকার ইচ্ছে করে ললিতকে এক নজর চোখের দেখা দেখতে। কিন্তু কিছুতেই ঘাড় ফেরাতে পারল না।

উনুনে আঁচ গন্‌-গন্‌ করছে। দু-দশ মিনিটের মধ্যে সে আঁচ নিভে যাবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তবু মল্লিকা একদফা কয়লা চাপিয়ে দিল। মিনিট দুয়ের মধ্যে তাজা কালো-কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে রান্নাঘরখানা ভরে যায়। ধোঁয়ার মধ্যে বসে বসে মল্লিকার মনে হয়, সেই ললিতের সঙ্গে আজকের এই

মানুষটার কোনই মিল নেই। সম্পূর্ণ অন্য একটি ব্যক্তির গায়ে ললিত নামটা সেঁটে দিয়ে বিধাতা যেন কঠিন পরিহাস করেছেন! এক দিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। মল্লিকার মনে এই নতুন লোকটার প্রতি এতটুকু মায়ামমতা রাখার গরজ নেই। ধোঁয়ার অসহ্য গ্যাসে মল্লিকার দম বন্ধ হয়ে আসে, তবু ওর নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ও বসে বসে ভাবে, এতদিন পরে সত্যিই সেই ললিতের মৃত্যুসংবাদ এনে দিয়েছে এই লোকটা। জমাটবাঁধা কান্নার বুঝি অশ্রুরূপ হয় না—হিমালয়ের চূড়ায় যে বরফ জমাট বেঁধে থাকে, তা কি কোনোদিন গলে জল হয়ে গড়িয়ে পড়ে? মল্লিকার মনেও বুঝি তেমনি কঠিন হয়ে গিয়েছে মর্মান্তিক শোকের অনুভূতিজাত ক্রন্দন।

দেবিকা আবদারের স্বরে বল্‌ল—জামাইবাবু, আপনি ত অনেক টাকা করেছেন, তার থেকে ছিটেফোঁটা দিয়ে আমাদের সাহায্য করুন না।

ললিত একটু সরে নড়ে দেবিকার গা-ঘেঁষে বসল—তোমাকে সাহায্য করতে আমি ত সর্বদাই তৈরী ভাই।

আড়চোখে ললিতের মুখের দিকে তাকিয়ে দেবিকা ঠোঁট বাঁকিয়ে বল্‌ল—সত্যি, ঠাট্টার কথা নয়। আমার নিজের পার্সোনাল্ কিছু দরকার নেই। আমাদের পার্টির জন্যে বল্‌ছি।

দেবজ্যোতি ধমকে উঠল—দেবি! দিস্ ইজ্ আনফেয়ার, তোমার জন্যে বাড়িতে লোকজন আসা বন্ধ হবে নাকি? না, না, এভাবে তুমি বাড়ির বাড়িত্ব নষ্ট করতে পারবে না। এটা তোমার পার্টির অফিস নয়। দরকার হয় তুমি ললিতের বাড়ি যাও—গো এ্যাণ্ড বেগ! ভিক্ষে করতে হয়, ভিখিরির মতো দোরে দোরে ঘোর গিয়ে!

দেবিকা সোজা হয়ে দাঁড়ালো—এবাড়িতে তোমার চেয়ে আমার অধিকার কিছু কম নেই দাদা! আর আমি ত এমন কিছু খারাপ কাজ করছি না। যে আদর্শে আমার আস্থা আছে, তার জন্যে সাহায্য চাওয়াটা অন্যায় নয়, ভিক্ষেও নয়। আশা করি এটা অন্তত স্বীকার করবে!

—কিন্তু তোমার অবজ্ঞার দম্ভ সকলের কাঁধে চেপে নৃত্য করবে এ-ই বা

কেমন কথা! ললিত এসেছে পারিবারিক সূত্রে। তাকে রাজনীতির মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া আমি সাপোর্ট করি না। তাছাড়া কম্যুনিস্টদের অত্যাচার দিনদিন অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছে।

—হোয়াট ডু ইউ মীন বাই ইট? তুমি কি বল্‌তে চাও খোলাখুলি বলো। অত্যাচার, অসহ্য—এসব কথার মানে কী?

—মানে খুবই সরল। এই ত ছ্যাখো না, তুমি নিজেকে কি ভাবে পার্টির জয়ঢাক করে তুলেছ। তোমাদের অত্যাচারে মানুষ স্বস্তিতে নিশ্বাসটুকুও ফেলতে পারবে না? বাড়িঘর সব মজাতে চাও?

ললিত মাঝখান থেকে বলে বসল—না, না, দেবুদা, দেবিকার কথায় আমি কিছুই মনে করি নি। সত্যি এই ধরণের আদর্শ আজকের দিনে সমাজের পক্ষে খুব দরকার হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে এই জাগরণের সাড়াটা খুবই আশার কথা। আর আদর্শ হিসেবে ত কম্যুনিজম্ উত্তম। আই লাইক টু সাপোর্ট দেবি!

দেবিকা হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠ্‌ল—রিয়েলী! সত্যি জামাইবাবু, আপনি আমাদের পার্টিকে ভালোবাসেন! ওঃ, কী যে আনন্দ হলো! হাউ লাভ্‌লী!

দেবজ্যোতি শ্লেষের হাসি হেসে বল্‌ল—তা হলে, ললিত আমার মনে হয় যেন, তুমি লেনিন কিম্বা স্ট্যালিনের মত কোন পদের আশায় পার্টিকে সমর্থন করো। তবে তাঁরাও আলটপকা গদীতে চড়বার চান্স পান নি। তাঁদের জীবনের সবটুকুই উৎসর্গ করে দিয়ে তবে ডিক্টেটর হতে পেরেছেন। অবশ্য আমাদের এখানে কি হবে, বলতে পারি না।

দেবিকার ওষ্ঠেও বিদ্রূপের বাণ কম তীক্ষ্ণ নয়—অন্ততঃ সুভাষ বোস হবার মতো ফিফথ্ কলামনিস্ট মনোবৃত্তি ওঁর নেই। তোমার কোন হিরোই ওঁকে ঠকাতে পারবে না। যথার্থ মানুষের মনের কথা যে আদর্শবাদের একমাত্র সম্বল, সেই আদর্শবাদকে দেখতে পায় না যারা তারা শুধু অন্ধ নয়, তারা মৃতই!

ললিত উল্লাসে প্রায় নেচে ওঠে—আশ্চর্য! দেবী, তোমার মধ্যে যেন আদ্যা শক্তির আবির্ভাব দেখছি! হাউ চার্মিং।

দেবিকা খুশির জোয়ারে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌ল—হাত মিলাও

কম্‌রেড্‌! জামাইবাবু, আপনি এরকম চমৎকার মানুষ, আগে কেন বুঝিনি!

দেবজ্যোতির সারা গায়ে দুঃসহ দহন-যন্ত্রণা—কিন্তু সে দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল। তার চোখের সাম্‌নেই ললিত ধরল দেবিকার হাত—দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল দেবিকার ডান হাতখানা। দেবজ্যোতি কিছু বল্‌তে পারল না। বাধা দিল না সে। অথচ তার মন বল্‌ছে—ললিতের এই রাজনৈতিক আদর্শ সমর্থনের মধ্যে নিষ্ঠা নেই, সত্য নেই, কিছুই নেই। যা আছে সেটা বিশ্বাস করতেও ঘৃণা হয়। আর তা নিয়ে কোনো কথা বল্‌তে গেলে দেবিকা এমন বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়ে বসবে, যা কল্পনা করতেও দেবজ্যোতির কুণ্ঠা হচ্ছে। দেবিকা যেন দাদাকে বিশ্বাস করে না! আপন ভাবা ত দূরের কথা, শত্রু ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। কেন? দেবজ্যোতি ত ভুলেও কখনো দেবিকার কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই চায় না। ওরই ভালোর জন্য দেবজ্যোতি দু-একটা কথা বল্‌তে যায়। অথচ দেবিকা ভুল বোঝে। আগে থেকেই একটা ধারণা পোষণ করে বসে রয়েছে দেবিকা।

দেবজ্যোতির বিশ্বাস, দেবিকা যে পথে চল্‌ছে সে পথের যাত্রীরা ওকে একদিন চরম আঘাত হানবে। কারণ, দেবিকার মধ্যে সরল সবল একটা মানুষের বাস। জটিলতার জঞ্জালকে দেবিকা কোনোদিনই বরদাস্ত করতে পারে না। আর ঠিক সেই কারণেই গণবাদের উদার আদর্শকে এমনভাবে দেবিকা আঁকড়ে ধরেছে। অথচ ও জানে না এ-পথের বাঁকে বাঁকে কী যান্ত্রিক যন্ত্রণা! মানুষকে মানুষের মতো দেখতে ভুলে গেছে—তারা শুধু জানে স্বজাতি অর্থাৎ দলের লোক, বিজাতীয় অর্থাৎ বাইরের লোক: মিত্র আর শত্রু! মানুষের ব্যক্তিত্বকে বলি দিয়ে তবে পার্টির স্নাতক হওয়া যায়। মানুষ এখানে কেউ নেই। ছাঁচে ঢালাই করা কম্‌রেড—একটুকু স্বাতন্ত্র্য থাকলেই বাতিল! দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেবজ্যোতি মাথায় হাত দিয়ে ভাবছিল।

আর ললিত সেই সময় দেবিকার সঙ্গে সিনেমা দেখার প্রোগ্রাম পাকা করে, পার্টি ফাণ্ডে উদার হস্তে সাহায্যের অঙ্গীকার দিয়ে, এক সময়ে বিদায় নিল, বল্‌ল—এখন আসি দেবু দা!

দেবজ্যোতি কতকটা অন্যমনস্কভাবেই জবাব দিল—আচ্ছা ভাই, এস।

দেবিকা বল্‌ল—চলুন আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি, কমরেড।

তার সামনে দিয়ে ওরা দু'জনে বেরিয়ে গেল—দেবজ্যোতি দেখেও যেন দেখতে পায় না! ভাবনার ঝড় উঠেছে তার মনে।

দেবজ্যোতির বিশ্বাস, দেবিকা যে পথে চল্‌ছে সে পথের সহযাত্রীরা ওকে একদিন চরম আঘাত হানবে। দেবিকার আদর্শ-নিষ্ঠা চড়া সুরে বাঁধা। ওর মধ্যে যে সরল, সবল ব্যক্তিত্বের বাস, সে ব্যক্তিত্ব অনন্যসাধারণ। তরুণ যৌবনের দুর্দম খরস্রোতা পাহাড়ী নদীর মত গতিবেগ নিয়ে দেবিকা চলেছে—সে বেগ ধারণ করবার মতো উদার বৃহৎ আধার কোথায়? অথচ ওর সামনে রুখে দাঁড়াবার জন্য যে প্রচণ্ড শক্তির দরকার তা দেবজ্যোতির আজ যেন নেই! আর ওই ছকে বাঁধা কম্যুনিজ্‌মের গণ্ডিতে দেবিকার মনের মুক্তি অসম্ভব। বিশেষ করে পার্টির কর্মধারার মধ্যে ব্যক্তির বিকাশের চেয়ে সঙ্কোচনই যে বেশী। তবে কি দেবিকার এই প্রাণ-প্রাচুর্য, এই প্রখর চরিত্র ওই পার্টির পাথরে ব্যর্থ আঘাতে অপমৃত হবে? এই অপমৃত্যুর সাক্ষী হয়ে থাকবে দেবজ্যোতি? নিজের ওপর সে বিরক্ত হয়—! এমনই এক স্বপ্নসাধ নিয়ে সে নিজেও চলেছিল, খেয়ালের নেশাকে প্রশ্রয় দিয়ে জীবনের অনেক সুন্দর আয়ুকে ক্ষইয়ে দিয়েছে। লভ্য কিছু হয় নি। আবার আর একটি জীবন সেই পরিণতির দিকে চলেছে, জেনে শুনেও সেই জীবনটাকে বাজে খরচের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে না! এই দায়িত্বহীনতার গ্লানি তাকে অস্থির করে তোলে।

নিজের অসার্থক অসম্পূর্ণ অসঙ্গতি দেবজ্যোতিকে ব্যথিত করেছে—নিজেকে আজ টুক্‌রো টুক্‌রো করে চিরে চিরে বিচার করবার জন্য কঠিন সংকল্প নিয়েছে সে। নিজেই সে আপনার বিচারক। দেবিকার কথা বাদ দিলেও আর দুটো জীবনের জন্য তাকে জবাবদীহি করতে হবে। মন্দাকিনী আর মিণ্টু! দু-খানি চিঠির মধ্যে তাদের মনের কথা। কাকে সে উড়িয়ে দেবে—সরিয়ে দেবে দূরত্বের দিগন্তপারে? মিণ্টুকে? আহা ওর ভীরু সসঙ্কোচ নিরালা তপস্যার এই কি মূল্য! যে আপনার প্রতিটি মুহূর্তের বেঁচে থাকার সঙ্গে দেবজ্যোতিকে জড়িয়ে রেখেছে—অথচ অধিকারের ফতোয়া জারি করে নি,

তার মনকে অবজ্ঞার তাচ্ছিল্য ছাড়া আর কিছুই কি দেবার নেই দেবজ্যোতির? মিণ্টু তাকে ছাড়পত্র লিখে দিয়ে গেছে, মুক্তির কবুলতি! মিণ্টু তাকে বাঁধতে চেয়েছিল, কখনও বাধা হতে চায় নি—তাই নিজে থেকে মুক্তি দিয়ে গেল। আর দেবজ্যোতি ওকে কি দিয়েছে? যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর পর মন্দাকিনীকেও কিছু দিতে পারবে না বোধ করি সে। অথচ এও ঠিক যে, সে মন্দাকিনীকে ছেড়ে দিতে পারবে না। না, তা সম্ভব নয়। মন্দাকিনীর মায়া বৃহতের স্বপ্নজালে নিবিড়। ওর মধ্যে যেন দেবজ্যোতি আশ্রয়-মুকুর আবিষ্কার করেছে! ওই আয়নাতে দেবজ্যোতির নিজেকে দেখার সাধ। সে যা হতে চেয়েছিল অথচ পারে নি, মন্দাকিনী যেন সেই সার্থক-স্বরূপ।

এর পরের কথাটা দেবজ্যোতি ভাবতে না চাইলেও, না ভেবে পারে না।

মন্দাকিনীর ব্যর্থতা আরও মর্মান্তিক হবে। দেবজ্যোতির নিজের এমন কিছু পুঁজি সঞ্চিত নেই যা দিয়ে সে মন্দাকিনীকে খুশী রাখতে পারে। দূরত্বের মায়াতে যে মানুষের কল্পনারূপ গড়ে রেখেছে মন্দাকিনী, একদিন অতি নিকটে এসে টের পাবে যে দেবজ্যোতি সেই স্বপ্নের অনুরূপ নয়। নিতান্ত সাধারণ ব্যর্থ স্বপ্নভরা ভাঙাচোরা মানুষ দেবজ্যোতি। অসংলগ্ন টুকরো নিয়ে মন্দাকিনীর মন ক্ষোভের প্রতিবাদে জর্জর হয়ে উঠবে। আশ্চর্য, তবু মন্দাকিনীর মুক্তি নেই। মুক্তি নেই মিণ্টুর। দেবজ্যোতিকে মুক্তি দিতে চাইলেও মিণ্টু নিজে হয়তো নিতে পারে না।

কারুরই পরিত্রাণ নেই! এ কেমন জীবন-পরিকল্পনা?

দেবিকার অপমৃত্যু হবে দেবজ্যোতি জানে। মিণ্টুর পরিণতি কল্পনা করাও তার পক্ষে শক্ত নয়—আর মন্দাকিনীর জীবন নিয়ে দেবজ্যোতি শেষ পর্যন্ত নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে যাবে!……এসব কি ভাবছে দেবজ্যোতি? আজ কেন ভাবছে সে? একদিন যেভাবে সবকিছু অস্বীকার করে আদর্শবাদের দিকে ছুটে চলেছিল তখনও নিজের অলক্ষ্যে জীবন-যৌবনের পূজা করে ছিল, এ কী তারই পুনরাবৃত্তি! অস্থিরতা ছাড়া আর কিছুই সে নয়?

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য যে এত ফিরিস্তি বকেয়া জমে ছিল, কে তা ভেবে দেখেছে! সকলেরই কি এমনি হয়!

এক দিকে কারখানার কাজ—কাজের পিছনে রয়েছে হাজার হাজার বঞ্চিত মানুষের বাঁচার দাবি। আর একদিকে নিজের মনের সমস্যা—যে সমস্যাকে দেবজ্যোতি এতদিন দেখতে পায় নি। এখন কোন্ দিকে সে চল্‌বে? কোন্ দেবতাকে দেবে অর্ঘ্য!

সহসা সে চিৎকার করে উঠ্‌ল—পারব না! পারব না! পারব না!

দেবিকা কখন ফিরে এসেছে দেবজ্যোতি লক্ষ্য করে নি।

তার উচ্চ চিৎকারের জবাবে দেবিকা হঠাৎ বলে উঠ্‌ল—পারবে না সে কথাটা বুঝতে তোমার এতদিন লাগলো?

চম্‌কে উঠ্‌ল দেবজ্যোতি। দেবিকার পানে তীক্ষ্ণ জ্বলন্ত দৃষ্টি প্রসারিত দিয়ে ধম্‌কে উঠ্‌ল—কি? কি বল্‌লি? কি পারবো না, তুই জানিস?

দেবিকা তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল—জানি। কোনো কিছুই পারবে না।

হঠাৎ যেন দেবজ্যোতির সারা দেহে কে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে মনে হ'ল। সে ওপর দিকে হাত ছুঁড়ে অস্বীকার করার ভঙ্গীতে গর্জন করে উঠ্‌ল—মিথ্যে কথা। ভুল। সব পারবো। দেখিস দেবী, আমি সব পারবো। তোর কথা মিথ্যে। হ্যাঁ মিথ্যেই ত!

মল্লিকা দরজার মুখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে ছিল।

আস্তে আস্তে বল্‌ল—বেলা গড়িয়ে গেল দাদা! একবার বাজারের দিকে যাবে না?

—হ্যাঁ, তাই ত রে! এতক্ষণ বলিস নি কেন? দে দে থলিটা দে।

দেবিকা কলহাস্যে ঘরখানা ভরিয়ে দিয়ে বল্‌ল—তা পারবে, থলে বোঝাই করে বাজারটা করতে পারবে। ব্যস, তাহলেই ঢের হ'ল।

দেবজ্যোতি থলেটা শূন্যে তুলিয়ে বল্‌ল—বাজারটা যদি ঠিক মতো করতে পারি তাই বা কম কি! আদর্শবাদ জীবনের বাইরের বস্তু নয়, বাজারের বাইরেরও নয় দেবি! এই কথাটা বুঝতে অনেক বছর কেটে গিয়েছে। আর একটুও বাজে খরচ হবে না দেখে নিস! কিন্তু তোর জন্যে

দুঃখু হয়, আমার কেনা সত্যটা তুই কাজে লাগাতে পারবি না। আস্থার বড়ো অভাব।

—থাক্, আর তোমার বোঝাটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ো না! আমি নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চাই।

—জানি রে, তা জানি বলেই ত এতদিন দেখে যাচ্ছি—কিছু বলি নি। আরও জানি যে, বল্লেও তুই শুনবি নে—কেউই তা শোনে না। অবিশ্যি মল্লির কথা আলাদা, ও দাদাকে-বাবাকে খাইয়ে সুস্থ রাখতে পারলেই খুশী—ও আমার লক্ষ্মী বোন, সব শোনে।

মল্লিকার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল—আহা বুঝেছি আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে, মুখ্যু বলে!

দেবজ্যোতি পরিচ্ছন্ন হাসি হেসে বল্‌ল—না ভাই তোকে ঠাট্টা করি এমন আস্পদ্দা আমার নেই! সত্যি বলছি।

মল্লিকা অসহিষ্ণুতার আবরণে খুশী ঢেকে বলল—থাক, থাক—বাজে কথা রেখে দিয়ে বাজারটা সেরে এসো তো। ইস্, রোদ যা কড়া হয়ে উঠেছে—ছাতাটা নিয়ে বেরিয়ো, বুঝলে!

বাষট্টি

বিমর্ষভাবে দত্তগুপ্ত হিসেবের খাতা নিয়ে অঙ্ক কষছিল। গ্রেট বেঙ্গলের শেয়ারের দর আরও পড়ে গেছে। ওদিকে কারখানার মধ্যে রোজই শ্রমিকদের ঘোঁট চলছে। এবার হট্ করে একদিন যদি হাতিয়ার বন্ধ করে বসে ওরা, তাহলে আর রক্ষা নেই। দীর্ঘশ্বাস পড়ল দত্তগুপ্তর। একেই ত ছেচল্লশ থেকে দর নেমেছে একুশ টাকায়—কোম্পানীর লাখ লাখ, কিম্বা কোটি কোটি টাকা লোকসান যাচ্ছে হয়তো! এর ওপর যদি প্রোডাক্‌শন বন্ধ হয়, তাহলে এতদিনের চালু কারবারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? এই ভয়ঙ্কর পরিণতির কল্পনায় দত্তগুপ্তর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। সে শঙ্কিতভাবে একবার দরজার দিকে তাকাল। আজকাল সে বাদামতলা মেসের কাউকে বিশ্বাস করে না। এরা সবাই দত্তগুপ্তর শত্রু হয়ে উঠেছে। সুবল থেকে শুরু করে বড়দা ক্ষুদিরাম পর্যন্ত প্রত্যেকটি মেম্বার ওই চক্রান্তকারীদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চলে। একা দত্তগুপ্ত ছাড়া কেউই কোম্পানীর আখেরের দিকে তাকায় না। ওরা সবাই নিজেদের স্বার্থ নিয়ে অস্থির। অথচ একবার ভাবে না যে, কোম্পানী যদি ডুবে যায় —নাঃ, এ ভাবে আর চলবে না। সময় থাকতে মল্লিক সাহেবকে সাবধান করে দিতে হবে। হাজার হোক, সে লোকটার ক্ষমতা আছে, মাথায় মগজ আছে। এসব চক্রান্তের কথা একটু আগে জানতে পারলে মল্লিক হয়তো একটা কিছু সুরাহার চেষ্টা করতে পারে। অন্ততঃ কোম্পানীর একজন অংশীদার হিসেবে এই কর্তব্যটা দত্তগুপ্তর করা প্রয়োজন। আটখানা শেয়ারের মালিকের ত হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা মোটেই উচিত নয়।

মল্লিক সাহেবের বাংলোতে আজই যাবে দত্তগুপ্ত।

খাতাপত্র গুটিয়ে তুলে রেখে, আধময়লা শার্টটা গেঞ্জির ওপর চড়িয়ে দত্তগুপ্ত বেরিয়ে পড়ল।

দরজার মুখে ক্ষুদিরাম ধরলেন—এই যে কোথায় চললে ভায়া!

দত্তগুপ্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষুদিরামের দিকে তাকাল। লোকটা টের পেয়েছে নাকি কিছু? একটু রুক্ষস্বরেই সে জবাব দিল—আর সব সইতে পারি দাদা, কিন্তু এই বেরুবার সময় পিছু ডাকাটা একদম বরদাস্ত করতে পারি না।

মুচ্‌কি হেসে ক্ষুদিরাম বল্‌লেন—আরে ওয়ার্কশপে ত যাচ্ছ না যে এ্যাক্‌সিডেন্ট হবে। ব্ল্যাক আউটও নেই যে, গাড়ি চাপা পড়বে। প্রেম-ট্রেম করতে যাচ্ছ না যে লাভার ভাগিয়ে দেবে। তবে এত খটাখটি কেন ভায়া? ক্লাবে যাচ্ছ? না সিনেমায়?—বলি ব্যাপারটা কি হে, নতুন বৌএর মতো গোম্‌সা মুখে ঠায় চুপ করে রইলে? মুখের কথাটা খসাও না মানিক!

দত্তগুপ্ত জবাব দিল—যেখানে খুশী আমি যেতে পারি, তাতে কার কি এসে যায়!

ক্ষুদিরাম বাদামতলা মেসের সবচেয়ে পুরণো মেম্বার। তাঁর চোখের সাম্‌নে কত এলো, কত গেল! তিনি অনেক দেখেছেন, আরও দেখবার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন নিজেকে। তাই হেসে বল্‌লেন—যাও যাও। রাগ কর না ভাই।

পথ চল্‌তে চল্‌তে দত্তগুপ্ত বার বার পিছন ফিরে ফিরে দেখতে লাগলো—তার কেবলই মনে হচ্ছে, শত্রুর কোন গুপ্তচর তাকে অনুসরণ করছে।

বাজারের মধ্যে আলোর জৌলুষ। পাঞ্জাবী রেস্তোরাঁতে এ্যাম্‌প্লিফায়ারের উৎকট উচ্চরোল গানের ঝালাপালা। দত্তগুপ্ত ঘাড় হেঁট করে বিড়ি টানতে টানতে চলেছে। স্টেশন রোড থেকে সদর সড়ক দিয়ে যাবে সে। অবশ্য সাহেব মহল্লার সব বাড়িগুলোই এক ধরণের, কোন্‌টা কার সে চেনেও না। তবে মল্লিক সাহেবের বাংলো খুঁজে বার করা শক্ত হবে না, সেটুকু ত জানে!

উঁচু কেতার এলাকার দিকে দত্তগুপ্ত যত এগোচ্ছে, পথ ততই জনশূন্য হয়ে আসছে। এদিকটা কেমন নিঝুম। হাওয়ার বেগে গাছের পাতাগুলো যেন নিজের মনে কথা কইছে। গাছে গাছে পথের দু পাশ ঢাকা। ওপর দিকে তাকালে আকাশের তারা দেখা যায় না। একটা জমাট বাঁধা নিবিড় অন্ধকার। অশরীরী প্রেতেরা—ওইখানে বসবাস করে নাকি? দত্তগুপ্তর গা ছম্‌ছম্‌ করে। একটা বাংলোর লনে কারা ব্যাড্‌মিণ্টন খেল্‌ছে—খুব উজ্জল আলো জ্বালিয়ে। মেয়েলী কণ্ঠের রিন্‌-রিনে কথার সুর এসে কানে বাজলো। থম্‌কে

একটু দাঁড়ালো সে। ঘন উঁচু কাঁটা-ঝোপের বেড়া, গলা পর্যন্ত উঁচু। কী সুন্দর সমানভাবে ছাঁটা বেড়ার গাছগুলো! ওপর দিয়ে দৃষ্টি গিয়ে পড়ে মাঠের মধ্যে। একটু ভয়ে ভয়েই সেদিকে তাকায় দত্তগুপ্ত। ভারি ভালো লাগে তার—হঠাৎ খুশী হয়ে ওঠে। ওরা কেমন আনন্দের আয়োজন করে নিয়েছে! ওরা আলাদা জগতের মানুষ। ওদের এই জীবনযাত্রার ছবিটুকু দেখতে পাওয়াই যেন দুর্লভ সৌভাগ্য মনে করে দত্তগুপ্ত। আজকের এই খেলা দেখার কথা দত্তগুপ্ত লিখবে স্ত্রীকে চিঠিতে। সত্যি, মানিকপুর কত সুন্দর! বারেকের জন্যও তার মনে হ'ল না যে, ওই যারা সান্ধ্য শখের খেলায় মশগুল, তারা দত্তগুপ্তর মতই মানুষ। হাজারো শ্রমিকের মেহনতের ওপর জবরদখল চালিয়ে, তাদের বঞ্চিত করেই, এদের বিলাসের মুহূর্তগুলি রচিত হয়েছে। দত্তগুপ্তর মনে সে চেতনা নেই। তাই বুঝি অপরের ঐশ্বর্য দেখে খুশী সে।

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে খেলা দেখল দত্তগুপ্ত। তারপর আবার এগিয়ে চল্‌ল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহেব মহল্লার পথে একটিও লোক নেই। এখানে পথের আলোগুলি অলস প্রহরীর মতো চোখ মেলে অবসর যাপন করছে। দত্তগুপ্তর ভয় করে। হঠাৎ বুঝি কোনো বাংলো থেকে একটা গুঁফো ভোজপুরী দারোয়ান এসে তার হাত চেপে ধরবে। তারপর জেরা শুরু করে দেবে—কী মতলবে তুমি এখানে ঘোরাফেরা করছ?

কিন্তু কেউ এল না। এক-আধ জায়গায় বিলেতী বাজনার সুর শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ বাংলোর মধ্যে মানুষ রয়েছে।

বুক টিপ্‌-টিপ্‌ করছে প্রথম শ্রেণীর কর্তা মহল্লায় ঢুকতে।

একবার সে ভাব্‌লো, আজ এই পর্যন্ত থাক্‌। কাল না হয় আবার আসা যাবে।······পথে যদি কোনো মানুষ না থাকে, তবে কাকেই বা সে জিজ্ঞাসা করে জানবে মল্লিক সাহেবের বাংলো কোন্‌টা! আরও ভাবনা হ'ল, যদি সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—সাম্‌না-সাম্‌নি কি কথা বল্‌বে দত্তগুপ্ত? কেন, ডিপার্টমেন্টের যতোগুলো লোক এই সব ঘোঁট পাকাচ্ছে তাদের নাম করে দেবে। আরও যাদের সে চেনে, সকলেরই নাম করবে। হ্যাঁ, সবগুলো লোকই

ত কোম্পানীকে ফাঁসাবার মতলবে জোট বেঁধেছে। মায় ওই নতুন আমদানী দেবু মুখুয্যে পর্যন্ত ওই দলে গিয়ে জুটেছে। দেড় দিনের জুগী ওই দেবু মুখুয্যে কিন্তু এমন চালে চলে যেন, কারখানার পেঁয়াজ-পয়জারের হর্তাকর্তা! আরে তুই হচ্ছিস শিফ্‌ট্‌ ডিউটির একটা তুচ্ছ হেল্‌পার, তোর বাপু জেনারেল ডিউটির লোকেদের সঙ্গে এত পীরিত কিসের? পাখা গজিয়েছে! আপন মনেই দত্তগুপ্ত হাসে—সব শালা শয়তানের আজ নিকেশ করবো।

কিন্তু এ পথটা আরও চওড়া—আরও বেশি যেন খাঁ-খাঁ করছে! হুস্‌ করে একখানা গাড়ী চলে গেল, তার হাওয়া লাগলো দত্তগুপ্তর গায়ে।

একটি বাংলোর সামনে সে দাঁড়ালো থম্‌কে।

গেটের লতাবিতানে ঝুমকো ফুল ফুটেছে, ভারি মিষ্টি গন্ধ। ছেলেবেলাতে এই একটি ফুল ও বড় ভালোবাসতো—কব্‌রেজ বাড়িতে ঝুম্‌কো ফুল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে কী নাকালই হয়েছিল! আর পড়বি ত পড় একেবারে ঝুন্টি দিদির হাতেই ধরা পড়ে গিয়েছিল—ছি-ছি কী লজ্জা! সেই থেকে শিক্ষা হয়ে গেছে, সে আর কখনো চুরি করে নি। কিন্তু আজ আবার লোভ হচ্ছে। ফুলগুলো দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু গন্ধ ত আর লুকিয়ে রাখা যায় না। এই মুহূর্তে দত্তগুপ্ত আর সব কথা ভুলে গেল—কোম্পানীর অংশীদারীর স্বপ্নটুকু পর্যন্ত সে ভুলে বসল। আস্তে আস্তে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে সে ওই গেটের মুখে।

এমন সময়ে একখানা মোটর-সাইকেল্‌ গর্জন করে উঠ্‌ল বাংলোর ভেতরে। ছুটতে ছুটতে একটা লোক এসে গেট খুলে দিল। মোটর-সাইকেলটা শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছে। দত্তগুপ্ত সন্ত্রস্ত ভাবে একপাশে সরে দাঁড়ায়। অবাক কাণ্ড, দত্তগুপ্ত নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না—এ যে অবিনাশ! নিজের অজ্ঞাতেই সে ডেকে বসল অবিনাশ চাটুয্যেকে! ব্রেক কষে অবিনাশ যখন থেমে পড়ল তখন ওরা দুজনেই চওড়া রাস্তার পথিক।

—তুমি এখানে?

প্রশ্নটা যদিচ অবিনাশই করল, দত্তগুপ্তর মুখেও ওইরকম একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

অবিনাশ হাসলো—তা কদ্দিন থেকে? হ্যাঁ রে?—থাক্-থাক্ আর লুকোতে হবে না। ব্রাদার, এ যে দেখি আমাদের টেক্কা মেরে বেরিয়ে যাওয়া! হ্যা হ্যা হ্যা! তা বেশ, তা বেশ। আরে, মল্লিক সাহেব হচ্ছেন সেই রামচন্দ্রের মতো আদর্শ মানুষ, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন, এই হ'ল ওঁর নীতি। যাক্ তোকে এখানে দেখে খুব খুশী হয়েছি। চালিয়ে যা, আখের তোর রোখে কার সাধ্যি!

অবিনাশ এক ঝটকায় কথাগুলো বলে গেল। দত্তগুপ্ত ঠিক খেই ধরতে পারে না, অবশেষে প্রশ্ন করল—এটা বুঝি তোমার শ্বশুর বাড়ি?

অবিনাশ হো-হো করে হেসে উঠ্‌ল—হ্যাঁ শ্বশুরের বাবার বাড়ি। আরে শালা আমার সঙ্গে এখনো চালাকী মারছিস—যেন কিছুই জানিস নে! মাইরী।

দত্তগুপ্ত অবিনাশের হাত ধরে বল্‌ল—মাইরী, তোকে কালীর দিব্যি করে বলছি—এখানকার একটা বাড়িও আমি চিনিনে।

কথাটা অত সহজে বিশ্বাস করবার মত বোকা নয় অবিনাশ। সে সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করল—চেনো না, ত, এখানে কি হাওয়া খেতে এয়েছ চাঁদ? মল্লিক সাহেবের বাংলোর দরজায় বড় মিঠে বাতাস, না!

দত্তগুপ্ত প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল, কিন্তু অবিনাশের বাঁকা বাঁকা কথার ঘা খেয়ে কেমন যেমন মরীয়া হয়ে বলে বস্‌ল—বেশ করেছি, তোর কি রে শালা! দালালী করে করে দুনিয়ার সব মানুষকেই নিজের মতো দেখবি বই কি!

অবিনাশ গম্ভীর হ'ল না, শক্ত কথাও সে বল্‌ল না—একটুখানি হেসে আবার মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে সশব্দে বেরিয়ে গেল।

আবার দত্তগুপ্ত একলা পড়ে রইল—এত বড় পথে।

মেজাজটা তার বিগড়ে গিয়েছে। খামোকা অবিনাশকে চটানো ঠিক হ'ল না। ওর মতো শয়তান লোক সব করতে পারে। কি জানি, হয়তো চুকলী খেয়ে চাকরীটাই খতম করে দেবে! বলা যায় না। অবিশ্যি তার আগে দত্তগুপ্ত যদি মল্লিক সাহেবের সঙ্গে দেখা করে চক্রান্ত সম্পর্কে একটা বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করে, তাহলে আর অবিনাশের চালাকী করার সাধ্য হবে না।

আর নয়, এবার সরাসরি দত্তগুপ্ত গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। সামান্য একটু এগোতেই আব্ছা অন্ধকারে কে যেন হাঁক দিল—এ বাবু, ক্যা চাহিয়ে ?

থতমত খেয়ে দত্তগুপ্ত বল্ল—মল্লিক সাহেবের সঙ্গে দেখা করব !

—আঃ, দেখা করব ! তা, এখন দেখা হবে না ত—সবেরে আইয়ে।

—আরে সবেরে আসব ত ডিউটি কে দেবে আমার ?

—সে কৌন জানে ! অন্দর যেতে মানা আছে—সাহেবের হুকুম।

—রাখো হুকুম। বলো দত্তগুপ্ত সাহেব এসেছেন, জরুরী কথা আছে।

—তো ইঁহা ঠারিয়ে, হুকুম হোনে সে—

কথাটা বল্তে বল্তেই লোকটা চলে গেল।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দত্তগুপ্ত নিজের উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করে। সোজা আঙ্গুলে কোথাও ঘি ওঠে না। বাঃ, বেশ বলা হয়েছে—দত্তগুপ্ত সাহেব।

ভোজবাজীর মতোই মল্লিক সাহেবের সঙ্গে দেখাটা ঘটে গেল। এভাবে যে সাহেব দর্শন মঞ্জুর করবেন দত্তগুপ্ত ভাবতেও পারে নি। বারান্দায় পাখা চল্ছে, সাহেবের টেবিলে বোতল, ছোট-বড় কাচের গ্লাস আর রেকাবে বরফ ! দেখেই দত্তগুপ্তর দম বন্ধ হবার উপক্রম। কী কাণ্ড, লোকটা মদ খায় ! তাও লুকিয়ে চুকিয়ে নয়—বাইরের লোকের সামনে ? খোলা বারান্দায় বসে !

দত্তগুপ্তর দিকে মল্লিক সাহেব তাকালেন না। তাঁর সামনে দাঁড়িয়েই যে লোকটা ভয়ে জড়সড় হয়ে ভেতরে ভেতরে ঘাম্ছে—তা তিনি দত্তগুপ্তর মুখের দিকে না তাকিয়েই বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। গম্ভীরভাবে বল্লেন—হুঁ ! এসময়ে কি জন্যে ? উঁ !

—আজ্ঞে, কথা ছিল।

—ছিল ত গেল কোথায়, বলা হোক !

—আজ্ঞে ইয়ে, ওয়ার্কশপে ভারি গোলমাল বেধেছে।

—বটে। কিরকম গোলমাল ?

সাহেব এক ঢোক জল খেলেন বোধ হয়; দত্তগুপ্ত ভাবে,—না হয় জলের মতোই একটা কোনো পানীয়। মদ নয় নিশ্চয়, মদ হলে ত রঙীন

হতো। দত্তগুপ্তর দিকে এবার তাকালেন মল্লিক সাহেব—নতুন মুখ যে। কে পাঠিয়েছে ?

—আজ্ঞে কেউ নয়। আমি অনেকদিনের পুরণো লোক। ইয়ে, মানে লেবারকে যেভাবে লোকে তাতাচ্ছে তাতে খুব শীগ্‌গির গোলমাল বাধবার ইয়ে আছে স্যার।

হাসলেন মল্লিক সাহেব—আচ্ছা ! তা তোমার এত মাথাব্যথা কি জন্যে ?

—আজ্ঞে কোম্পানীর নিমক ত অনেক খেয়েছি। আর ইয়ে, মানে আমিও কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার কি না—তাই।

—এ্যাঃ, কি বল্‌লে ? শেয়ার হোল্ডার ! আচ্ছা !

মল্লিক সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দত্তগুপ্তর আপাদমস্তক দেখে নিলেন।

দত্তগুপ্ত এবার যেন খানিকটা ভরসা পেল, তাড়াতাড়ি বলে বসল—সঙ্গে করে শেয়ারের কাগজপত্র সব এনেছি স্যার, দেখবেন ? আমি ধরতে গেলে কারখানার ছোটখাটো একটা মালিকও বলতে পারেন, নিদেন শরীক ত কোম্পানীর !

—থাক, ওগুলো যত্ন করে রেখে দিয়ো। এবার গেট আউট, ইয়েস—ইউ গো !

দত্তগুপ্ত অপমানে ক্ষোভে মনে মনে জ্বলে ওঠে। সে বল্‌ল—বার করে দিলে অবিশ্যি বেরিয়ে যাবো। কিন্তু স্যার একটা কথা বলে যাই, আমার মতো সাচ্চা মানুষ আপনি পাবেন না স্যার। আপনার কাছে যারা টাকা খায়, সুবিধে আদায় করে, তারা কেউ কোম্পানীর স্বার্থ দ্যাখে না, সব ব্যাটা মতলববাজ। আমার সেসব বালাই নেই। এতবড় একটা কোম্পানী সেরেফ ডুবে যাবে, এই ভেবেই বলতে আসা। নইলে আসতাম না।

—বটে, তোমার মতো মানুষ এতবড় সর্বনাশ থেকে কোম্পানীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে ? নইলে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে ! বেশ বেশ, তোমার দৌড়টা কতদূর দেখাই যাক। বলে ফ্যালো।

—নতুন ইউনিয়ন হচ্ছে সে খবর রাখেন স্যার ?

—হুঁ।

—তাতে কারা উস্কানী দিচ্ছে জানেন স্যার ?

—শুনি, বলে যাও।

—প্রত্যেক সেক্‌শনে কমিটির মেম্বার বহাল হয়েছে স্যার—প্রত্যেক সেক্‌শনে! আর কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এক দেবজ্যোতি মুখুয্যে। মাস কয়েক ঢুকেছে, বুঝলেন স্যার—সে ব্যাটা এরই মধ্যে কি না সব হাতের তেলোয় দখল করে নিয়েছে। পাণ্ডা হয়েছে দেবু মুখুয্যে—দেড় দিনের জুগী।

চম্‌কে উঠেছিলেন মল্লিক সাহেব, কিন্তু দত্তগুপ্ত সেটা লক্ষ্য করে নি। গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে নিয়ে টুক্‌রো টুকরো বরফ ছাড়তে ছাড়তে বল্‌লেন—হুঁ, দেবজ্যোতি মুখুয্যে—তারপর, বলো!

—এই যে স্যার এতে সব নাম, ধাম, সেক্‌শন লিখে এনেছি। আসি-আসি করছি ক'দিন থেকে, তা একবার ভাবি—আবার পিছিয়ে যাই।

—কই দেখি, কাগজটা! বাঃ তোমার কাজ তো বেশ পাকা হে! তা এবার আসল কথাটি পেড়ে ফ্যালো। মতলবটা ?

দত্তগুপ্ত সঙ্কোচে-লজ্জায় গুটিয়ে গেল—না না, কোনো মতলব নেই স্যার।

—হুঁ! নিতান্ত নিঃস্বার্থ পরোপকার ? এ যে ভগবানের বাচ্ছার মতো কথা বল্‌ছ হে! না কোনো ভয় নেই—ঝেড়ে কাশতে পারো। এখানে ঘোমটার খ্যাম্‌টা কেউ বোঝে না—ঘোমটা খোলো, বলে ফ্যালো। সময় কম।

দত্তগুপ্ত আরও বিব্রত ভাবে বলল—বিশ্বাস করুন স্যার, আমি মতলব নিয়ে আসি নি। তাছাড়া কারখানা বাঁচলেই আমার কাজ হাসিল হবে বুঝলেন না!

মল্লিক সাহেব গম্ভীরভাবে বল্‌লেন—বুঝিনি। তবে পরে সবই বুঝতে পারবো। ইয়ে, বর্তমান ইউনিয়নের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই ?

দত্তগুপ্ত জবাব দিল—আর সব সইতে পারি, কিন্তু ওই কথাটি বরদাস্ত হয় না স্যার! ইউনিয়ন মানেই সর্বনাশ। এর আগে ফেডারেশনের স্ট্রাইকে ত কম দুর্ভোগ হয় নি। ওসব বাজে মাতলামো। কোন ফল্‌ হয় না স্যার,

মালিকের কারখানা, তার যেমন মর্জি মজুরী দেবে। তোমার না পোষায় চলে যাও বাপু—তা নয়, বসে বসে ঘোঁট পাকানো মেয়েদের মতো—!

মল্লিক সাহেব মদ খেলেও মাতাল হন না—আজও তাঁর মাত্রাধিক্য ঘটে নি, কিন্তু দত্তগুপ্তর কথাগুলো ওঁর কানে কেমন বেসুরো শোনাচ্ছে! গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে বল্‌লেন—আচ্ছা-আচ্ছা! মালিকের কারখানা—কিন্তু দেবজ্যোতি মুখুয্যেরা ত সেকথা মানে না। তাদের অন্য যুক্তি, তারা বলে, মালিকের টাকা আর শ্রমিকের মেহনৎ—অতএব শ্রমিক টাকার বদলে দিচ্ছে মেহনৎ। তাদেরও মুনাফার ভাগ দিতে হবে।

দত্তগুপ্ত অবাক হয়ে যায়—আপনিও ওদের মতো বলেন নাকি তাই?

—আরে আমিও ত ভাই কোম্পানীর চাকর, তবে মাইনেটা পাই ভালো, থাকতে পাই বড়ো বাড়িতে—যতোই যা বলো না কেন, চাকর ত বটে! আর তোমরা হচ্ছো মালিক, শেয়ার কিনেছ, টাকা ঢেলেছ। তা দাও না কিছু মাইনে-টাইনে বাড়িয়ে!

বিমর্ষভাবে দত্তগুপ্ত বলে—কারখানার টালটুকু সামলে গেলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, মাইনেপত্র বাড়বে তখন—এখন ত মুনাফাই হচ্ছে না।

মল্লিক সাহেব এবার বুঝতে পারেন যে, দত্তগুপ্তর মাথার দোষ আছে। নইলে তাঁর সাম্‌নে এভাবে আপ্তবাক্য উচ্চারণ করা সাধারণ বুদ্ধিতে সম্ভবপর নয়। অথবা লোকটি অতি শয়তান। কিন্তু চেহারা দেখলে দত্তগুপ্তকে অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারী ব'লে আদৌ মনে হয় না। অতএব পাগল ছাড়া আর কী হতে পারে! সুরাপাত্র সাম্‌নে নিয়ে পাগলের প্রলাপ শুনতে মন্দ লাগছে না। মনে মনে মল্লিক সাহেব বেশ কৌতুক বোধ করেন। বাইরের গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রেখে বলেন—আচ্ছা ভাই এসব নিয়ে অনেক ত ভেবেছ! বল্‌তে পারো, কিভাবে এইসব শয়তানকে জব্দ করা যায়?

দত্তগুপ্ত মনের মতো শ্রোতা পেয়ে খুব খুশী, সে বল্‌ল—একধার থেকে ব্যাটাদের ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বিদেয় করাই হচ্ছে সোজা রাস্তা। ও আপনার দুষ্টু এঁড়ের চেয়ে শূন্য গোয়াল ঢের ভালো।

—তারপর?

—তারপর আবার কি, ফ্যা-ফ্যা ক'রে ঘুরে মরুক, উচিত শিক্ষা পাবে।

—আর বাইরে গিয়ে ভেতরের লোকদের উস্কানী দিয়ে ষ্ট্রাইক বাধাবে না, তা কি করে বুঝলে?

—ষ্ট্রাইক, হুঁঃ! অন্নচিন্তা করবে, না, বনের মোষ তাড়াবে স্যার!

—আরে চাকরী গেলেই ত বুনো মোষ হয়ে যাবে ওরা। তখন?

—অবিশ্যি এটা আপনি ঠিক বলেছেন। ন্যাংটার নেই বাটপারের ভয়। তাও বটে! তবে থাক, চাকরী নিয়ে টানাটানি করে কাজ নেই। তাই ত—

—কি হলো?

বলে মল্লিক আর একটা চুমুক দিলেন।

দত্তগুপ্ত মাথা চুল্‌কে বল্‌ল—একটু ভেবে নিই স্যার!

—আচ্ছা, ভেবে নাও দু-চার দিন, তারপর জবাব দিয়ে যেয়ো!

—চলে যাবো স্যার?

—স্বচ্ছন্দে। আবার এসো। কিন্তু জবাবটা তৈরী করে এনো।

—আচ্ছা।

ব'লে গড় হয়ে প্রণাম করল দত্তগুপ্ত।

মল্লিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—আরে, আরে, ভক্তি যেন বড় বেশি! লক্ষণ সুবিধের নয়।

দত্তগুপ্ত চলে যাবার পর মল্লিকসাহেবের মেজাজটা কেমন ঝিমিয়ে পড়ল। সুরা পানে যেন আসক্তি নেই। মৌজের আশায় পেগের-পর-পেগ হুইস্কি গলায় ঢেলেও মেজাজ বেত্‌রিন হ'ল না। কোথা দিয়ে কী যেন হয়ে গেল!

মিসেস্ মল্লিক এক সময়ে বেরিয়ে এসে বল্‌লেন—রাত যে অনেক হ'ল, হাঁ গো!

অনিরুদ্ধ সাড়া দিলেন—হুঁ এই যাই!

—যাই নয়, ওঠো।

—উঠ্‌লাম। কিন্তু, একটা কথা কি জানো লক্ষ্মী—আর ভালো লাগছে না।

কথাটা অনিরুদ্ধর মুখে নূতন। এমন হতাশার স্বর তাঁর কণ্ঠে কেউ কখনো শোনে নি। মিসেস মল্লিক মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌লেন—শরীর খারাপ হয়েছে তোমার? আর শরীরেরই বা দোষ কী!

বাধা দিলেন অনিরুদ্ধ—না, না, শরীর বেশ মজবুত আছে।

—তবে?

—মন। মনটা হাঁপিয়ে উঠেছে। ভেতরে ভেতরে বুড়ো হয়ে গেছে মনটা। সেই খবরটা পাওয়া গেল হঠাৎ।

মিসেস মল্লিক হাসলেন—আজ বুঝি একা একা, মাত্রা বেশী হয়ে গেছে! কেন যে এসব ছাইপাঁশ গেলো, জানি না!

হাসলেন অনিরুদ্ধ—ছাইপাশ বলো না, অপমান হবে বন্ধুর। ও-ই হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে আপন বন্ধু। রাগ করে না, বিশ্বাসঘাতকতা করে না, বিপদের সময় ফেলে পালিয়ে যায় না, বেয়াড়া আবদারও কিছু করে না—আমার এমন আপন আর কে আছে লক্ষ্মী! তোমার চেয়েও ধৈর্য বেশী, সহনশীলতার সীমা নেই ওর! ও না থাকলে হয়তো পাগলই হয়ে যেতাম।

মিসেস মল্লিক দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেন—ও-ই তোমাকে পর করে রেখেছে, নইলে এত ক'রেও আমি মন পেলাম না!

উচ্চহাস্যে অনিরুদ্ধ বাংলোর নিঝুম শান্ত পরিবেশকে সজাগ করে তুললেন—কিন্তু আজ কি হয়েছে লক্ষ্মী, আমার পুরণো বন্ধুর সঙ্গও যেন ভালো লাগছে না। মনটা বেয়াড়াপনা করছে। জানো, আজ—না, না, চলো উঠি অনেক রাত হয়েছে।

মিসেস মল্লিক চিন্তিতভাবে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে থাকেন। আস্তে আস্তে অনিরুদ্ধর মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে কতকটা স্বগতভাবে প্রশ্ন করলেন—এমন করে আরও কত কাল যে দূরে দূরে থাকতে হবে, কে জানে!

অনিরুদ্ধ স্ত্রীর হাতখানা ধরে বল্‌লেন—অবুঝের মতো অভিমান নিয়েই রইলে লক্ষ্মী, কখনও ক্ষমার শান্তিজল ত দিলে না! এত কাল পরে কেন অভিযোগ করছ?

—না, অভিযোগ ত করিনি। ভাবনাতে পড়েছি। সত্যি বলছি, তোমার মুখ চেয়ে কত বছর যে বসে আছি তার হিসেব আজ আর করতে পারব না। আশা ছিল, একদিন তুমি ডেকে নেবে, খুলে দেবে মনের দরজা। কিন্তু সে আশা ভুল—

—ভুল? কে বল্‌ল লক্ষ্মী! মুখ ফুটে বলাটাই কি সব? তুমি কি আমাকে জানো নি—চেনো নি, বোঝো নি?

—এতই যদি জানো তো লুকোবোর চেষ্টা কেন করো?

—চেষ্টা করি না ত। তবে হ্যাঁ, যে কথাটা নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধে, সেটা মুখ ফুটে বলা শক্ত বই কি!

—তবে ব লো না, জোর করা আমার নীতি নয়।

স্ত্রীর হাতখানা নিজের বুকের ওপর আবেগভরে চেপে ধরে অনিরুদ্ধ ফিস-ফিস্ করে বল্‌লেন—শুনতে পাচ্ছ? শোনো, আমি হেরে গেছি—তাই বল্‌ছে। মন্দাকিনীর কাছে আমার হার হয়েছে গো। মন বল্‌ছে, যেমন করে পারো ওকে ফিরিয়ে আনো। সত্যি তাই বল্‌ছে, তাই না লক্ষ্মী!

মিসেস মল্লিকের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠ্‌ল—না, না, সে হয় না গো। তুমি তাকে সইতে পারবে না। চোখের সাম্‌নে সে তোমার পরাজয় জাহির করে ঘুরে বেড়াবে, তোমার সহ্য হবে?

অনিরুদ্ধ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন—কিন্তু লক্ষ্মী, আমি ত নিজেকে কখনো ছলনা করি নি! মন্দাকিনীর কাছে হেরে গেছি, একথা লুকোনো নেই নিজের কাছে। এর পর যদি ও আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, বুকে জড়িয়ে ধরব। সত্যি বল্‌ছি, ও চলে যাবার পর থেকে আজ পর্যন্ত সব কিছুর আড়ালে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি—তার খবর কেউ পায়নি, অনেক সময় নিজেও পাইনি। আজ আর পারছি না, ওকে ফিরিয়েই আনতে হবে।

মিসেস মল্লিক চুপ করে স্বামীর মুখের পানে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। অনিরুদ্ধকে থামতে দেখে বল্‌লেন—কোথায় আছে, জানো?

—না। তবে ওর খবর জানে এমন মানুষ মানিকপুরে রয়েছে, তা জানি।

—কে? দেবজ্যোতি?

—হ্যাঁ গো। সে কারখানায় ঢুকেছে, আর—

চম্‌কে উঠ্‌লেন লক্ষ্মী দেবী—এ্যাঁ, দেবজ্যোতি শেষে কারখানাতে ঢুকেছে? সে কী গো! অমন চমৎকার ছেলে শেষে—

—চমৎকারই বটে! একটা মেয়ের পরকাল চিবিয়ে খেয়ে, এখন মানিকপুরের সর্বনাশ করবার জন্মে উঠে পড়ে লেগেছে। আশ্চর্য! মেয়েটার যে কী অবস্থা কে জানে? এতদিন তবু একটু সান্ত্বনা ছিল যে, আর যা-ই হোক খুকীর পাশে দেবুর মতো একটা ছেলে বল-ভরসা রয়েছে। মানুষের জীবনে টাকা-পয়সার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই একটি জিনিসই লড়াই করতে পারে,—সে হচ্ছে প্রেম! কিন্তু এ কী হ'ল? প্রেম নেই! খুকীর সেটুকু সম্বলও নেই!

—তবে তুমি খুকীর খবর ওর কাছে পাবে কি ক'রে?

—কি জানি, মনে হচ্ছে যেন ও জানে। হয়তো ওদের সম্বন্ধে আমার এ ধারণা ভুল।

—ভ্যাখো, যা ভালো বোঝো করো। কিন্তু—দেবু শেষে এত কাণ্ড ক'রে কারখানাতেই ঢুকলো?

—হ্যাঁ। তবে উমেদারী করতে আসে নি মল্লিক সাহেবের কাছে। তাছাড়া এরই মধ্যে লেবার বেগড়ানোর কাজে পসার জমিয়ে তুলেছে। আচ্ছা বেটা দেখা যাক।

—তোমার কারখানায় কাজ করছে, অথচ তোমাকে জানায় নি!

—হ্যাঁ! সে আসলে—আসলে আমার সঙ্গে পাঞ্জাটা লড়বেই দেখছি। কিন্তু খুকীর জন্যেই একটু ভাবনা। বেটীকে আগে ঘরে আনি—তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে লড়া যাবে। মেয়েটা ভাবিয়ে তুললো।

জিমি কুকুরটার বোধহয় ঘুম ভেঙেছে। সে অকারণে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। মল্লিকসাহেব তার কাছে গিয়ে, গলার শিকলটা খুলে দিলেন। আনন্দে জিমি তার সামনের দুটো পা অনিরুদ্ধর কোমরের উপর তুলে দিয়ে আদরের বিচিত্র শব্দে বাংলোটা ভরিয়ে তুল্‌ল। অনিরুদ্ধর শান্ত চোখে একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটে ওঠে।

তেষট্টি

দীনদয়ালের শরীর বেশ ভেঙ্গে পড়েছে। আজকাল কারখানা আর বাড়ি এই সার করেছেন, তার বাইরে কোথাও নড়াচড়া করলেই কেমন যেন হাঁপ ধরে! মিণ্টু যদি ডাক্তারকে খবর দেয়, উনি হেসে বলেন—এসব আর কেন মা, কল-কব্জা ক্ষয়ে-ক্ষয়ে ঝর্-ঝরে্ হয়ে গেছে—ডাক্তারের ওষুধে কিছু হবে না—এবার বাতিল করতে হবে। চোখের ওপরই ত দেখতে পাচ্ছিস মা, কারখানাতে পুরণো প্ল্যাণ্ট বরবাদ করে নতুন ব্যাটারী বস্ছে। তেমনি একদিন আমার এই পাওয়ার হাউসটা বরবাদ করতে হবে।

ধমকের স্বরে মিণ্টু বলে—হয় হবে, তার জন্যে এত মাথা-ব্যথা কিসের? কোম্পানী যখন বুঝবে পাল্টানো দরকার তখনই না যন্তরপাতির বদল হবে,—যন্ত্রের গরজে ত কিছু হয় না বাবা! তুমি হচ্ছ যন্ত্র। যন্ত্রীর মর্জি ছাড়া তোমার এক-পাও চলার মুরোদ নেই।

—তা যা বলেছিস মা। তুই আমার মহাজ্ঞানী জননী, তোর সঙ্গে ত জারিজুরি চলে না।

—ব্যস, আর কথাটি কইবে না। আমার কথা শুনে চল্‌বে।

—বেশ, বেশ। এখন তোদের পার করার কাজটুকু সারা হলেই আমার ছুটি।

—তা আর নয়। আমি না থাকলে তোমার ভারি সুবিধেই হয়—দিনরাত হটর-হটর করে এর ওর চরকায় তেল দিয়ে বেড়াতে পারো। তারপর একদিন ঝুপ করে বিছানায় পড়বে, তখন কে দেখবে শুনি? না বাবা, সেটি হবে না।

দীনদয়াল সস্নেহে মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন—ছাখ, পাগলামী করিস নে মিণ্টু। দুবরাজপুরের মৈত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে। ওরা সামনের মাসে তারিখ ঠিক করেছে, এবার আর নড়চড় হ'লে চলবে না।

—ইস্ চলবে না বল্‌লেই হ'ল। তাদের লিখে দাও আমাদের সুবিধে হবে

না। এত ব্যস্ত হবার কি আছে ? আমি ত আর ঘর ছেড়ে পালাচ্ছি না। বাদল একটু মানুষের মত হয়ে উঠুক, দীপু আর একটু বড় হোক—দেখবে, তখন আমি ঠিক সুড়সুড় করে মাথায় ঘোমটাটি টেনে, বৌ সেজে, শ্বশুর-বাড়ীতে ঢুকবো।

দীনদয়াল হাসলেন, প্রসন্ন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল হাসিতে বৃদ্ধের মুখখানি বড় সুন্দর দেখায়। বল্লেন—না রে, তা হয় না। আমি যে কথা দিয়ে ফেলেছি। শ্রাবণের গোড়াতে মল্লিকার বিয়ে লাগছে, কাজেই শেষের তারিখটা স্থির করতে লিখে দিলাম।

বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত দৃষ্টিতে মিণ্টু অন্য দিকে তাকালো। তার কণ্ঠে কোনো কথা নেই। এরপর আর কোন কথা বলতে ইচ্ছা হয় না। কি হবে বৃদ্ধ দীনদয়ালকে আঘাত দিয়ে? দুনিয়ার কারো মনে কোনো দুঃখই দেবে না মিণ্টু—যতো কিছু বেদনা, জ্বালা, যন্ত্রণা, সবই ও আত্মসাৎ করবে। উত্তুঙ্গ অভিমানের মহৎ সিংহাসনে নিজেকে বসিয়ে রাখবে, জীবনের বাকী দিনগুলো। না, তারই বা কি মূল্য ? কেউ বুঝবে না ওকে। যার ওপর ভরসা-আশার সব ভার নীরবে নির্ভর করে তুলে দিতে চেয়েছিল, সে-ই স্বচ্ছন্দে পাশ কাটাতে পারল, তখন আর কারুর কাছেই কোনো প্রত্যাশা মিণ্টু রাখে না।

দীনদয়াল বল্লেন—কি গো জননী, অমন বিমনা কেন ?

হেসে জবাব দিল মিণ্টু—বেশ তাই হবে। তুমি দায়মুক্ত হতে চাও, আমি তোমার সন্তান হয়ে তাতে বাধা দেবো কেন বাবা !

দীপু বীজগণিতের একটা 'সমস্যা'র অঙ্ক নিয়ে হাজির হ'ল—বাবা, এটা কিছুতেই মিলছে না, একটু ছাখো না !

মিণ্টু বল্ল—দেখি দে, 'সমস্যা'র অঙ্ক কষতে আমার খুব ভাল লাগে !

দীপু ঠোঁট উল্টে বল্ল—তোমার এক বাতিক, ফরমূলার অঙ্ক দেখলে ত বাঘ দেখার মতো ভয়ে পালাও! তুমি কষবে প্রব্লেম্! তাহলেই হয়েছে !

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ ! প্রব্লেমের সবচেয়ে শক্ত অঙ্কগুলো আমি বেশ জলের মত কষে যেতে পারি। কিন্তু তোদের ওই মুখস্থ বিদ্যের ফরম্যুলা আমার একটুও ভালো লাগে না।

কথা বল্‌তে বল্‌তে মিণ্টু অবলীলাক্রমে অঙ্কটা কষে ফেল্‌ল দেখে দীপুর আর বিস্ময়েব অবধি থাকে না।

দীনদয়াল হাসলেন।

খাতাখানা মিণ্টুর হাত থেকে নিয়ে দীপু বল্‌ল—জানো দিদি, নিখিলদা পর্যন্ত সমস্যার অঙ্ক দেখলেই মাথা চুলকে বলেন, ওটা কাল দেখিয়ে দেবো। অন্য কি আছে দাও!

—হ্যাঁ রে তোর নিখিলদার কি হয়েছে বল্‌তো? ক দিন আসছেন না কেন!

দীপু হাসলো—ওঁর কথা আর ব'লো না! নতুন কে এক সাহেব এসেছে তার বাড়ি এখন নিত্য হাঁটাহাঁটি করছেন। অনেক সাহেবেরই ত বেগার খাটলেন, কিন্তু বিলেত যাওয়া আর বেচারীর ভাগ্যে হচ্ছে না। এখন নতুন ধুয়ো হয়েছে বেরী সাহেব। বেরী সাহেবের হাসি-কাশি সব ভালো, তার চাকর-কুকুর যেন স্বর্গের জীব। বেরীর বছর সাতেকের এক মেয়ে. নিখিলদা তাকে নিয়ে রোজ বিকেলে পার্ক কর্ণারের বাগানে টেনিস বল খেল্‌ছেন। আহা বেচারীর বিলেত যাওয়ার বড়ো সাধ!

মিণ্টু গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—বিলেত গেলেই চারটে হাত গজাবে!

দীনদয়াল শুন্‌ছিলেন এতক্ষণ, এবার বল্‌লেন—ওর আর দোষ কী! চোখের ওপর যা দেখবে তাই ত বুঝবে? মানিকপুরের হাওয়াতে যে বিলেতের মদ মাখানো রয়েছে মা! একবার বিলেত ঘুরে আসতে পারলেই, ঝপ্‌ করে দেড়শোর জায়গায় সাড়ে ছ'শো সাতশো মাইনে হয়ে যায়—একথা ত মিথ্যে নয়। নিখিলের আমি দোষ দেখি নে মা। চেষ্টা করে নিজের আখের গুছোতে পারে, ভালোই ত!

—তাই বলে, এই দীনতা স্বীকার করতে হবে?

—দীনতাটা ত সমুদ্রপারে রেখে আসবে রে! দেখিস না, মিষ্টার হয়ে বাংলো থেকে যখন গাড়ী হাঁকিয়ে বেরুবে, তখন ওকে নিখিলদা বল্‌তে কেউ ভরসা করবে না।

দীপু বল্‌ল—নিখিলদা কিন্তু অনেক পড়াশুনো করেছে। মানুষটার অনেক

গুণ আছে দিদি। ওই এক বিলেত যাওয়ার স্বপ্নটা বাদ দিলে, মোটের ওপর লোকটা ভালোই।

—থাম-থাম, আর ব্যাখ্যানাতে কাজ নেই।

এমন সময় বাদল এসে ঢুকলো অত্যন্ত ব্যস্তভাবে, বল্‌ল—দিদি, এক গ্লাস জল দে তো! বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে!

হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌ল বাদল—সময় নেই, এক্ষুনি সীতারামপুর যেতে হবে, অমলদার মা আসছেন। ওঁর সঙ্গে অনেক জিনিসপত্তর। তাই আর গাড়ী বদল করে ছোট লাইনের ট্রেনে উঠবেন না। সোজা সীতারামপুর থেকে ট্যাক্সি করে আসবেন। অমলদা আবার সাইকেল চড়তে জানে না। এখানে এক-খানাও ট্যাক্সি পাওয়া যায় নি।

—বাঃ, তা মজা মন্দ নয়, খালি পেটে তুই এতখানি চড়াই-উৎরাই-এর পথ সাইকেল ঠেঙিয়ে যাবি? দাঁড়া দু-খানা রুটি খেয়ে যা—

প্রতিবাদের সুরে বাদল বল্‌ল—বা রে, ভরা পেটে বুঝি জোরে যাওয়া যায়?

—খুব যায়। দুখানা রুটি তো তোমার নস্যি ভাই। কেন জ্বালাতন করছ, খেয়ে নাও।

—দাও দাও, জল্‌দি করো। অমলদার যা মুখের অবস্থা হয়েছিল না,—ট্যাক্সি না পেয়ে,—দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল।

দীপু ফোড়ন কাটলো—তোর তো অমনি হাসি পায়। সেদিন অলকাকে মোষে তাড়া করেছে, বেচারীর মুখ ভয়ে শুকিয়ে এইটুকু হয়ে গেছে,—আর তুই হি-হি করে হাসছিস! দেখলে গা জ্বলে যায়।

বাদল বাহাদুরীর ভঙ্গীতে বল্‌ল—হাস্‌তে হাস্‌তে মোষটাকে কেমন রুখে দিলাম, সেটা ত বল্‌ছিস না!

দীপু ধমকের সুরে বলল্—ওঃ, গায়ে জোর থাকলে সবাই পারে! দিন দিন তুই যা গুণ্ডা হচ্ছিস। তেমনি সব সাগরেদ জুটিয়েছিস। আমার হয়েছে জ্বালা—তোর দলের জন্যে আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না। বন্ধুরা সব কথায় কথায় বলে, তুমি বাবা বাদল ওস্তাদের বোন্‌, তোমার সঙ্গে কার কথা!

যেন···আমি নিজেই বাদল ওস্তাদ। একটু যদি ভদ্দর লোকের মত হতিস তুই—

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে শিস্ দিয়ে বাদল বল্ল—ভদ্দরলোক, ছ্যাঃ! প্যাকাটির মতো লিক্লিকে চেহারা, গলা দিয়ে চিঁ-চিঁ করে মিহি স্বর বার করে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে নেকিয়ে নেকিয়ে কথা বলা! ইচ্ছে হয় একখানা রদ্দা মেরে সিধে করে দিই।

দীপু বল্ল—ওই জন্যেই ত ভদ্দরলোকের গায়ে জোর থাকে না। জোর থাকলেই তোর মত এখানে ওখানে মোড়লী দেখিয়ে, বাহবা কুড়িয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে। নইলে এখন এই রাতের বেলা সাইকেল নিয়ে কেউ সীতারামপুর দৌড়য়! কোথায় নিজের পড়াশুনো করবি তা নয়!

—পড়াশুনো করব! আর ওদিকে অমলদার মা—

বল্তে বল্তেই বাদল দেখ্ল মিণ্টু প্লেটে করে রুটি তরকারী নিয়ে আসছে। কথাটা সে আর শেষ করল না, তিন লাফে এগিয়ে গিয়ে প্লেটখানা দিদির হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে খেতে লাগল। খেতে খেতে বল্ল—সত্যি এমন মাই ডিয়ার দিদি হয়না রে, বড্ড ক্ষিদে লেগেছিল! এখন দিব্যি প্যাড্ল ঠেলে সাঁই-সাঁই সীতারামপুর! আরে চারখানা রুটি যে! অল রাইট, গুড় কই দিদি? গুড় দাও। হ্যাঁ। জল? ফউরন্ লাও। ইঞ্জিনে বাবা ভাল ক'রে লোড্ নিয়ে নিশ্চিন্দে চালাও—।

দীনদয়াল খবরের কাগজ মুখের সাম্নে ধরে বাদলের দিকে একটা কান রেখে ছিলেন। বাদল আহার সমাপ্ত করে বেরিয়ে যেতেই বল্লেন—ওর আর লেখাপড়া হবে না। কি আর করবে, এই কারখানাতেই ঢুকবে।

মিণ্টুর হাতে তখনো বাদলের এঁটো প্লেট আর গ্লাস। দীনদয়ালের কথা শুনে থম্কে দাঁড়িয়ে বল্ল—ওর জন্যে তোমার খুব ভাবনা, না, বাবা? লেখা-পড়ার দিকে ঝোঁকই নেই। নইলে বুদ্ধিসুদ্ধি ত কম ছিল না। মানুষটা কিন্তু ভালো।

বিমর্ষভাবে দীনদয়াল ছোট্ট জবাব দিলেন—হুঁ!

—হুঁ নয় বাবা, একেবারে খাঁটি মানুষ। ওই জন্যেই ত ওকে অনেকে

অপছন্দ করে। মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলে, অন্যায় দেখলে রুখে দাঁড়ায়।

—সব ভালো। কিন্তু সবটুকু ভালো নিয়ে চলা যায় না, এ ত তুই বুঝিস মা! ওর জন্যে আমার এই চিন্তা যে, পদে পদে বিপদ ডেকে আনবে। আখেরে ওর বিস্তর দুর্ভোগ জমা আছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দীনদয়াল আবার খবরের কাগজে মন দিলেন।

দীপু এসে আবদারের সুরে দীনদয়ালকে বল্‌ল—বাবা, আমার একটা পদ্য ছাপিয়ে দেবে?

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন দীনদয়াল—হঠাৎ পদ্য!

—বারে, হঠাৎ কেন, মল্লিকাদির বিয়েতে প্রীতি-উপহার লিখবো আমি। অবিশ্যি, দিদি আর বাদলেরও নাম থাকবে তাতে। কেমন হবে, বলো তো—বেশ ভালো হবে, তাই না বাবা!

—হ্যাঁ, তা ভালোই হবে।

নিরুত্তপ্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে দীনদয়াল দায়সারা গোছের জবাব দিলেন। মনে মনে তখনও বাদলের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি বেশি চিন্তিত। নিজের দিকে তাকিয়ে একটু ভীতও হয়ে পড়েছেন দীনদয়াল। সত্যি, আজ বাদে কাল হঠাৎ যদি চোখ বোজেন তাহলে দুই কুমারী কন্যা আর এক পুত্র কোথায় দাঁড়াবে? বাদল লেখাপড়ার দিকে গেল না। আর এই অল্প বয়সে তাকে কারখানার কাজে জুড়ে দিতেও ইচ্ছে করে না। নাঃ, মিণ্টুর বিয়েটা তাড়াতাড়িই চুকিয়ে ফেলতে হবে। যা সঞ্চিত অর্থ আছে তাতে দীপুরও মোটামুটি একটা বিয়ে দেওয়া যাবে। মুস্কিল হবে বাদলকে নিয়ে। হবে নয়—হয়েছে। পরীক্ষায় যে বাদল ফেল করে তা নয়, তবে তার প্রকৃতি বহির্মুখী। এর পর আরও বেশী চাপ পড়লে তখন বিদ্যাবিমুখ হওয়াটাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক। আর ছেলেবেলা থেকে বাইরে মানুষ হয়ে বাদল যে রসুলপুরে ফিরে গিয়ে চাষবাস নিয়ে থাকবে, তাও ভাবা চলে না। তাহলে?…এমন সময়ে দীপুর 'প্রীতি-উপহারের' বায়নাটা দীনদয়ালের মনে ঠাঁই না পাওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু দীপু কি করে তা বুঝবে! পিতার ঔদাসীন্যে সে রীতিমত ক্ষুণ্ণ হ'ল।

নিঃশব্দে ফিরে গিয়ে বীজগণিতের খাতা সাম্‌নে রেখে ঝর্‌-ঝর্‌ করে কেঁদে ফেল্‌ল। কান্নার মধ্যেই শুন্‌তে পেল, ওর বাবা বেশ সহজ উচ্চকণ্ঠে বল্‌ছেন—এস এস অমল বাবু! তারপর, সব ত শুন্‌লাম—

অমলদা এসেছেন, তবু দীপু ছুটে গেল না। না, কিছুতেই যাবে না ত। অন্যদিন হ'লে উঠে গিয়ে এতক্ষণে ঠাট্টা-তামাসায় অমলকে উদ্ব্যস্ত করে তুল্‌ত দীপু। কিন্তু আজ ওর পড়াশুনোতে গভীর অভিনিবেশ। চোখ মুছে, ঘাড় গুঁজে এক মনে 'সমস্যা'র অঙ্ক কষতে শুরু করল দীপু। ওর স্বভাবই এই—বকুনী, মার-ধর কিছুতেই কিছু হয় না, সব ও হজম করতে পারে, কিন্তু তাচ্ছিল্য-উপেক্ষা ওকে যেন মাড়িয়ে দেয়!

এভাবে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। অবশেষে দীনদয়ালই দীপুকে উদ্ধার করলেন, হাঁক দিলেন—দীপু, ও দীপু, এই ছাখ তোর অমলদা এসেছেন।

উঠ্‌তেই হয় দীপুকে, নইলে অমলদাই এঘরে এসে পড়বেন, তখন—না, তার চেয়ে গম্ভীর ভাবে দুটো কথা বলে চলে আসবে দীপু। দিদি রান্না-ঘরে ব্যস্ত—ওর এখন গল্পগুজবের সময় নেই। দীপুরই কি অবসর আছে? পড়াশুনো করতে হবে।

দীনদয়ালের উচ্চকণ্ঠে আলাপ শোনা যাচ্ছে—তারপর, তোমার মা ত এসে পড়ছেন। তা হাতে ত সময়ও নেই। এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হয়। মানিকপুর যা জায়গা—

অমলদা কেমন যেন বিয়ের ক'নের মত হয়ে পড়েন, দীনদয়ালের সামনে এ সব কথা উঠলে। অমন আসরে-বাসরে মানুষ কে বল্‌বে! এই যে এত কথা বল্‌ছেন দীনদয়াল, কিন্তু অমলদার গলাই শোনা যাচ্ছে না।

দীপু খাতাপত্র ছেড়ে চল্‌ল ওঘরে।

চৌষট্টি

কারখানার মধ্যে আজকাল আন্দোলনের আলোচনায় কোন পর্দার বালাই নেই। স্পষ্ট ফুটে উঠেছে শ্রমিকদের অসন্তোষ। ইউনিয়নের নিষ্কর্মতায় প্রাক্তন সমর্থকেরা রীতিমত বিরক্ত। বিরক্ত বল্‌লেই যথেষ্ট হয় না, নতুন করে ইউনিয়নকে ভেঙ্গে গড়ার কাজে বেশ তৎপর। মিষ্টি স্তোকবাক্যে আর পরিতৃপ্ত হতে চায় না কেউ। কথায় কথায় ব'লে ওঠে—'হামারা মাঙকো পুরা করনা হি চাহি।'

দাবির তুলনায় তারা কিছুই আদায় করতে পারে নি—ইউনিয়ন পারে নি কোম্পানীকে দোহন করতে। কেবল চাঁদা নিয়েছে, রসিদ দিছে। সে রসিদের উল্টো পিঠে স্পষ্টই ছাপা থাকে—'কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দাও'। তাও যোগ দিয়েছে অনেকে, কিন্তু তাতেও ত কিছু হ'ল না! অতএব বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। পুরণো ইউনিয়ন বাতিল করতে হবে, নতুন সংগঠন গড়ে তোলার ধুয়ো উঠেছে।

মহাবীর গুপ্ত আজ আসছেন ইউনিয়নের কাজকর্ম দেখতে। খবরটা কারখানাময় উত্তেজনার হাওয়া বইয়ে দিল। আজ রাত্রে মিটিং আছে। সেখানে মহাবীর গুপ্তকে সরাসরি কৈফিয়ৎ তলব করা হোক। নবজাগ্রত মজদুর সংগঠনের দলপতি রামঅওতার সিং প্রত্যেক সেক্‌শনে গিয়ে প্রতিনিধিদের জানিয়ে দিল—কৈফিয়ৎ চাও। হামরা মাঙ্ নেহি মিলা, কাহে? আপলোগ চলা যাইয়ে, মজদুরোঁ সে পার্টিকা কৈ সওয়াল নেহি হায়। ইয়ে ইউনিয়ন খিলাফ হায়। হাম্‌লোগ দুসরী ইউনিয়ন জরুর বানাকে ছোড়েঙ্গে। সাফ জবাব ভাই। কৈ ফিকর না করো।

সেদিন কাজের নামে কারখানার সর্বত্র গরম গরম বাত্‌চিৎ চল্‌ল।

সাহেবরা কয়েকবার ঘুরে ফিরে সবই দেখে গেলেন। ফোরম্যানদের ডাক পড়ল ডিপার্টমেন্টের কর্তাদের ঘরে। সেখানে টেবিল চাপড়ে সাহেবরা সবাই

এক সুরে কৈফিয়ৎ চাইলেন—এসব কি হচ্ছে? কারখানার মধ্যে আপনারা কাজ করতে আসেন, না আড্ডা মারতে?

ফোরম্যানদের মুখে কথা যোগায় না। কেউ কেউ বল্‌তে চেষ্টা করেন—স্যার, ধমক-ধামক দিচ্ছি ত কিন্তু ম্যানেজ করা যাচ্ছে না।

অবিনাশ একজন ফোরম্যানকে বলে দিল—ম্যানেজ করতে না পারেন, রিজাইন করতে ত পারেন! কোম্পানী নিশ্চয় আড্ডা দেবার জন্যে কারখানা খুলে বসে নি। আপনারা রয়েছেন অথচ কাজ হচ্ছে না, তবে কেন আপনারা আছেন?

ফোরম্যানটি মাথা চুলকে বল্‌ল—মিছিমিছি রাগ করছেন স্যার। আপনি যদি আমার জায়গায় থাকতেন তাহলে দেখতেন, ম্যানেজ করা যায় না।

—যায় না! যায় না বল্‌লেই হ'ল? ওসব শুনবো না, দিনের শেষে আপনার কাজের হিসেব বুঝে নেবো। আন্‌স্যাটিস্‌ফ্যাক্টরী হ'লে, আপনাকে তার ফল ভুগতে হবে। যান্‌।

বিমর্ষভাবে ফোরম্যানটি বেরিয়ে গেল।

নিজের সেক্‌শনে ফিরে গিয়ে সে ধমক দিল—বাৎ ছোড়কে কাম করো, বহুৎ গজল্লা হো গিয়া। আগর পুরা কাম না দেনে সকো তো চার্জশীট—!

একজন ছোকরা বল্‌ল—চার্জশীট! হাঁ।

দত্তগুপ্ত ফোঁস ক'রে উঠল—চার্জশীট হবে না ত কি, পূজো করবে! আরে বাবা, কাজের সময় কাজ। তা নয় খালি গপ্‌ উড়াবে, আমি আর সব সইতে পারি কিন্তু এইটা বরদাস্ত করতে পারি না।

ছোক্‌রা চোখ রাঙিয়ে বল্‌ল—চুপ রহো দালাল!

দত্তগুপ্ত রুখে উঠ্‌ল—দালাল! সত্যি কথা বল্‌লেই দালাল হয়, না রে?

তাড়াতাড়ি ফোরম্যান এসে বাধা দিল—কি হচ্ছে কি দত্তবাবু? আপনি আপনার কাজ করুন না। ওসব ফচ্‌কে ছোঁড়াদের সঙ্গে কথা কইতে যান কেন।

দত্তগুপ্ত হাত গুটিয়ে টুলের ওপর বসল—আরে মশাই, কথায় কথায় দালাল

বল্‌বে, আপনারা ত ওদের দোষ ধরবেন না। অথচ এর মধ্যে মাথা ঠিক রেখে কাজ—খুব শক্ত ব্যাপার।

ছোকরাটি চিমটি কেটে বল্‌ল—মাথা ঠাণ্ডা, ওঃ। মতলববাজী করতে গেলে ত চামড়া পুরু করতেই হয়। দাদা, তুদিন পেয়ারের আরাম খেয়ে লাও—লিকিন এক রোজ এ্যায়সা লাথ ঝাড়বে তোমার মল্লিক বাবা, যে, তখন সামলাতে পারবে না।

দত্তগুপ্ত যে মল্লিকের বাংলোতে গতায়াত করছে এ খবরটা কারুর আর জানতে বাকী নেই। অথচ সে নিজে কাউকে বলে নি। নিশ্চয় ওই অবিনাশটার কাজ। দত্তগুপ্ত চটে না এসব কথায়, কারণ ওর বিশ্বাস যে, একদিন ইউনিয়নের বুজ্‌কুরী থামবে তখন মল্লিক সাহেব তাকে একটা ভালো গোছের পুরস্কার দেবেন।

সে জবাব দেয়—যাই তো মল্লিকসাহেবের কাছে। বেশ করি। আমার যা খুশী তাই করবো, কারুর বাপের পরোয়া করি নাকি? দালাল সব শালাই, কেউ লুকিয়ে ডুবে ডুবে জল খায়—আমি নয় দোখয়ে খাই। কোন শালা বল্‌নেবালা দেখি, রুখনেবালা কোন মরদ রে!

ফোরম্যান তার পিঠে হাত রেখে বল্‌ল—আহা, চুপ করুন না মশাই। আপনারা হচ্ছেন সিনিয়র লোক। নিজের মান নিজের কাছে ভাই। চেপে যান।

সান্ধ্য সভাতে লোক বড় অল্প হ'ল না। কথা ছিল, ঘরোয়া বৈঠকে ইউনিয়নের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হবে। কিন্তু সন্ধ্যের আগে থেকে দু-চার জন করে লোক জমতে শুরু করল। সাড়ে সাতটায় সভা। ইউনিয়ন অফিসের সম্মুখে সন্ধ্যা নাগাদ প্রায় শ চারেক কৌতূহলী লোক জমা হয়ে গেছে। ভিড় ঠেলে কোনো রকমে বরেন মজুমদার অফিস-ঘর খুল্‌ল। জনতাকে সম্বোধন করে সে বুঝিয়ে দিল যে, কেবলমাত্র ইউনিয়নের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য যারা তাদেরই নিয়ে আজকের এ সভা, অতএব সমবেত মজদুর ভাইরা যেন শান্তভাবে বাইরে থাকেন। নইলে সভার কাজে বিঘ্ন ঘটবে। জনতা শান্তই ছিল। বরেন মজুমদারের কথা শুনে অনেকেএকেবারেই

চলে গেল—বেশী উৎসাহী এবং কৌতূহলী যারা তারা গেল না, পথেঘাটে বসে পড়ল। বিড়ি ধরিয়ে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করতে লাগল। মোটকথা, সাড়ে সাতটার সময় মহাবীর গুপ্ত সভাগৃহে প্রবেশের সময় এক নজরে দেখতে পেলেন অগণিত কালো কালো মাথা ইউনিয়ন অফিসকে ঘিরে রয়েছে। তাঁর উপস্থিতিতে সামান্য অস্বচ্ছ গুঞ্জন ধ্বনিত হ'ল মাত্র—উৎসাহের সাড়া নেই, অভিনন্দনের কোলাহল-কলরব নেই। তবু ওরই মধ্যে দু-একবার ধ্বনিত হ'ল—মহাবীর গুপ্ত জিন্দাবাদ, কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ !…তারপর আবার সব শান্ত।

রামঅওতার সিং এলো সব শেষে—প্রৌঢ়, মাথায় গান্ধা টুপা, হাতে একখানি মোটা ছড়ি। তাকে দেখে জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল, —সিংজী আ গিয়া ! বুঢ়াউ আয়া !

রামঅওতারের সঙ্গে কথা কইতে কইতে যাচ্ছিল দেবজ্যোতি, অফিসের দরজা পর্যন্ত গিয়ে সে দাঁড়ালো। সিং তাকে আহ্বান করল—রুখ গয়ো কাহে ভাই ? আইয়ে, ভিতর চলিয়ে ভাই !

দেবজ্যোতি একটু হেসে জবাব দিল—না, না, বাইরে বেশ থাকা যাবে।

রামঅওতার তার হাত ধরে বল্‌ল—আমি বল্‌ছি চলে আসুন দেবুবাবু। আপনি কাছে থাকলে সাহস বেড়ে যায়।

দেবজ্যোতি রামঅওতারেব মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—ছোট ভাইকে অপরাধী করবেন না দাদা। আজ হচ্ছে পুরণো সমিতির সভা, আজ নয়।

অভিজিৎ সিং বক্তৃতা দিচ্ছিল, রামঅওতারকে ঢুকতে দেখে হাত তুলে অভিবাদন জানিয়ে আবার বলে চল্‌ল অভিজিৎ—এই চার বছরের মধ্যে ইউনিয়ন আমাদের এমন কিছুই আদায় করে দিতে পারে নি। যখনই আমরা পুরণো দাবির কথা তুলেছি তখন ইউনিয়নের নেতারা আমাদের একটাই জবাব দিয়েছেন, ব্যস্ত হয়ো না, আস্তে আস্তে সব হবে। এমনি করে আর কতকাল আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবো ?

মহাবীর গুপ্ত স্মিতহাস্যে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপর গলা ঝেড়ে নিয়ে শুরু করলেন—আমার প্রিয় বন্ধু অভিজিৎ সিং যা বলেছেন তা

আপনারা সবাই শুনেছেন। তাঁর কথাগুলো খুব আন্তরিক। আজকে আমাদের সামনে মেহনতী জনতার জীবনসমস্যা মানে রুটির সওয়াল, বড় কঠিন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে—খুব সত্যি কথা। আমরা তুনিয়ার দিকে দিকে এই উৎপীড়িত, অত্যাচারিত মানুষেরা এক বিরাট চক্রান্তের জালে জড়িত। এ অবস্থার মূল শিকড়টা অনেক তলে রয়েছে। একটি যুগ নয়, যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠেছে এই চক্রান্ত। কাজেই দু-চার বছরে এতবড় এত দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হবে, তা আশা করা যায় না। বন্ধুগণ আপনারা, বুঝে দেখুন, আমরা সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্টদের পরাস্ত করেছি। আর সেটা পেরেছি তার কারণ বিপদের সম্মুখে একতার প্রচণ্ড শক্তিতে আমরা বলীয়ান হয়েছি। আজ আমাদের সাম্‌নে সাম্রাজ্যলোলুপ জার্মেণী বিধ্বস্ত, জাপান পরাস্ত। কেন? না, আমরা মিত্রশক্তি মিলিত হয়েছি। এখানে, আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করেন যে, আমরা সত্যিই অগ্রগামী হতে পেরেছি। এইবারে আসছে আমাদের রুটির শওয়াল। এতদিন চলেছে বাইরের শত্রুকে সংহার করার পর্ব—এখন আসছে লোহুশোষণেবালা কোম্পানীর সঙ্গে বোঝাপড়ার লড়াই। বন্ধুগণ, আপনারা অধীর হ'লে চল্‌বে না ত! পুরণো সমাজ-ব্যবস্থাকে ভাঙবো আমরা, ভেঙে নতুন তুনিয়া কায়েম করবো। কাজেই এই পুঁজিবাদীদের হঠাতে হ'লে চাই একতা। যে একতা দিয়ে আমরা বাইরের পুঁজিবাদীদের ঘায়েল করেছি সেই একতাই আমাদের আজও দরকার—নইলে জনতার জয় হবে কি করে? এই ত সবে শুরু হচ্ছে আমাদের কাজ, এখনই যদি অস্থির হয়ে পড়ি তাহলে এগোবো কি করে—আপনারাই বলুন! আশা করি আমার প্রিয় বন্ধু অভিজিৎ সিং কথাটা বুঝেছেন! কী, আপনার আর কিছু বলবার আছে সিংজী?

অভিজিৎ সিং ঘাড় নেড়ে জানালো—না, নেই।

মহাবীর গুপ্ত সহাস্যে সভ্যদের দিকে তাকালেন। তারপর তিনি বল্‌লেন—বন্ধুগণ, তাহলে আশা করি আমাদের নীতি এবং পথ সম্পর্কে যে ভুল হবার উপক্রম হয়েছিল, সেটা মিটে গেছে। আমি অবশ্যই জানি যে আদর্শের পথে আলো জ্বেলে চলবার যে কঠিন ও সুদৃঢ় সংকল্প আমরা নিয়েছি

চা একদিন সেই জনজাগরণের চরম সীমায় আমাদের পৌঁছে দেবেই!
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

সমস্বরে প্রতিধ্বনি উঠ্‌ল ভিতরে এবং বাইরে—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

কলরব একটু কমে আস্‌তেই রামঅওতার সিং সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো—মেরে প্যারে দোস্তোঁ ঔর ভ্যাইয়োঁ, হাম তো এক বুঢ্‌ঢ্‌া মজ্‌দুর! লেকিন আপলোগ্‌ বুরা না মানে ত হামারা কুছ কহ্‌নেকা হ্যায়!

মহাবীর গুপ্ত চেয়ারের উপর খাড়া হয়ে নিমেষে ভ্রূ-কুঞ্চনটুকু সাম্‌লে হাসি-মুখে ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানালেন—হাঁ, হাঁ কহিযে! মনমে খেদ না রাখিয়ে ভাই। দিল সাফা রাখনেকো লিয়ে কহনেই পড়তা।

রামঅওতার দাঁড়িয়ে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌তে শুরু করল—প্রথমেই আমি বলা দরকার মনে করি যে, গোড়াতে যখন এই ইউনিয়নের পত্তন হয় তখন আশা হয়েছিল গরীব মজদুরদের ভালাই-এর জন্যে ইউনিয়নের নেতারা কৌশিস্‌ করবে। এটা ঠিক যে আজ আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একসঙ্গে নিজেদের দাবি নিয়ে কথা বল্‌তে পারছি—তার জন্যে, এই সংগঠন এই ইউনিয়নকে হাজারো নমস্কার দিতেই হয়। ব্যস—কেবল এইটুকুই ইউনিয়নের কুদরতে পেয়েছি। কিন্তু তার বেশি কিছু পাই নি। এখন আমাদের আসল কথায় আস্‌তে হবে। সেটা হচ্ছে এই যে, আমরা আর একটি দিনও হাত গুটিয়ে বসে থাকতে রাজী নই।

মহাবীর গুপ্ত মুখের হাসি বজায় রেখে বল্‌লেন—আমরা ত বসে নেই, ছিলামও না,—কাজ করেছি, করছি—আর করেই চল্‌ব!

রামঅওতার হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে হাতের ছড়িখানা সাম্‌নের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল, বল্‌ল—না আপনারা বিপ্লবের নামে দালালী করেছেন। আপনারা লড়াইএর অস্ত্র মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিদেশী সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। যে সরকার সাম্রাজ্যবাদী, যারা পুঁজিবাদী, তাদের হয়ে আমাদের দিয়ে লড়াইএর কাজ করিয়ে নিয়েছেন। আপনারা হাতিয়ার ফেলে দিয়ে কি ভাবে লড়াই করলেন তা আমাদের জানবার দরকার নেই। তবে আমাদের 'মাঙ', আমাদের ইজ্জত, কায়েম করবার জন্যে এখন

আমরা নিজেরাই তৈরী। এখন সব চেয়ে ভালো হবে, আপনাদের সরে দাঁড়ানো।

মহাবীর গুপ্ত উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন—আপনি মজ্‌দুরের স্বার্থের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, আপনার ভ্রান্ত মতবাদ জোর করে শ্রমিক ভাইদের ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছেন—এ আমি সমর্থন করতে পারি না। এর পিছনে কোন দালাল পার্টির উস্কানী আছে, জরুর।

রামঅওতার হেসে উঠ্‌ল উচ্চ কণ্ঠে, বল্‌ল—যারা ইংরেজকে তাড়াবার কথা জোর গলায় বল্‌ল, যারা যুদ্ধের প্রতিবাদ জানিয়ে কয়েদ খাটলো, তারা যদি দালাল হয় গুপ্ত বাবু, তাহলে আপনারা কী? আপনারা যারা বর্তনিয়াদের জুলুমবাজীর লড়াইতে মদত্‌ দিলেন?

মহাবীর কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলা হল না—বাধা দিলেন বিমল চৌধুরী। মহাবীরের সাম্‌নাসাম্‌নি বসে ছিলেন বিমল চৌধুরী, এই ইউনিয়নেরই সহ-সভাপতি। চোখের ইশারায় মহাবীরকে থামিয়ে দিলেন বিমল চৌধুরী। তারপর চৌধুরী মশাই বল্‌লেন—আজকের মত সভা ভঙ্গ হ'ল। আপনাদের কথা শুন্‌লাম, কিন্তু কাজ আমরা করব ঠিকই। ভুল যদি কিছু হয়ে থাকে তবে সেটা স্বীকার করে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে—শোধরাবার মতো খোলা মন চাই তার জন্যে!

একজন সভ্য মেঝে থেকে ছড়িখানা কুড়িয়ে নিয়ে রামঅওতারের হাতে তুলে দিল। রামঅওতার হেসে সেটা ফেরত দিল—ওটা আর ছোঁবো না দোস্ত! মজদুরের জন্য এই হাত দুটো, দুটো হাত কেন আমার সবকিছু উৎসর্গ করলাম আজ থেকে। এ ইউনিয়ন আমাদের, এখানে কোনো পার্টিবাজী বরদাস্ত করব না। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

আবার বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত হ'ল—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

মহাবীর গুপ্ত, বিমল চৌধুরী, বরেন মজুমদার গম্ভীর ভাবে বেরিয়ে গেলেন।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠ্‌ল—বিলাত-ফেরৎ ব্যারিস্টার সাহেবকে শেষে বুঢ়াউ ঘায়েল করে দিল! কামাল্‌ কর্‌ দেলেসে!

রামঅওতারকে অনেকে অন্তরঙ্গতা দেখিয়ে 'বুঢ়াউ' বলে ডাকে।

সভা ভঙ্গের পর রামঅওতার হাঁকাহাঁকি শুরু করল—দেবুঁ ভাই! এ মুখার্জি বাবু!

দেবজ্যোতি আস্তে আস্তে গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালো।

রামঅওতার দেবজ্যোতিকে জড়িয়ে ধরল—আব তো সামাল্‌নে পড়েগা দাদা! তোমার কথা মতো সওয়াল ত করলাম। এখন কি করা যায়?

দেবজ্যোতি কতকটা আত্মগত ভাবে সাড়া দিল—হাঁ, এবার ফুল্‌ স্টীমে ইঞ্জিন চালাও! লেকিন এক বাৎ সিংজী, লেবার-এর মুখ রাখতে না পারলে চল্‌বে না, মনে থাকে যেন—চৌদ্দ হাজার মজদুর, তার বাপ-মা-ভাই-বোন-ছেলেমেয়ে তোমার মুখ চেয়ে আছে।

রামঅওতার ঘেমে উঠেছে, কপালের ঘাম মুছে সে বল্‌ল—আমি ত একা নই ভাই, আমার পাশে তারাও আছে, আমরা সবাই আছি একসঙ্গে।

আশপাশ থেকে ভিড় ঘিরে ধরল রামঅওতারকে—আরে বুঢ়াউ আজ জবর সওয়াল ক'রে হেঁ! সাবাস ভাই।

রামঅওতার গলা ছেড়ে হাঁক দিল—মজ্‌দুরকে মাঙ্গ পূরা করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে!

সমবেত জনতা উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিল—মজ্‌দুরকে মাঙ্গ্‌ পূরা করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

এক জন চিৎকার করে উঠল—ইয়ে ইউনিয়ন কিস্‌কা হায়?

আর সকলে বল্‌ল—হামারা হায়!

পঁয়ষট্টি

ট্রেণখানা ঠিক সময়েই আজ মানিকপুর স্টেশনে এসে পড়ল। মন্দাকিনী নামলো আগে, তারপর গোবিন্দকে হাত ধরে নামালো। মালপত্র সামান্যই, একটা কুলীর মাথায় চাপিয়ে দিয়ে মন্দাকিনী গোবিন্দ মুখুয্যেকে বল্‌ল—আপনি অমন হন্‌হন্‌ করে চল্‌বেন না, আমার হাত ধরুন।

হেসে গোবিন্দ বল্‌লেন—তুমি হাসলে মা, এ পথ ত সারাজীবন হেঁটে হেঁটে মুখস্ত হয়ে গিয়েছে। কিচ্ছু ভেবো না,—অন্ধ হয়ে গেলেও এ পথে ভুল হবে না।

—তা হোক, একটিমাত্র চোখের ওপর ভরসা করে রাতবিরেতে চলাফেরা করবেন না।

—উপায় কি বলো মা! এই এক চোখের ভরসাতেই এখন রোজগারের ধান্দায় বেরুতে হবে। তা ভগবান কি এটুকুই রাখবেন ভেবেছ? কত পাপ যে করেছিলাম!

বলতে বলতে গোবিন্দ ওভারব্রিজের সিঁড়িতে উঠতে শুরু করলেন। স্টেশনের সাম্‌নেই কারখানা। চিমনির মাথা দিয়ে দাউ-দাউ করে অগ্নিশিখা হাওয়াতে জ্বল্‌ছে, কম্‌ছে-বাড়ছে! কারখানার শ্বাসপ্রশ্বাসের সাঁই-সাঁই শব্দ কানে পৌঁছচ্ছে। পরিচিত শব্দটা কানে শুনে গোবিন্দ যেন জীবন ফিরে পেলেন!

গোবিন্দ প্রশ্ন করলেন—রাত এখন ক'টা হবে, মা জননী?

—সাড়ে আটটা।

—এখন বাড়ী গিয়ে হয়তো দেখব ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। হয়তো ললিত এর মধ্যেই বৌমাকে নিয়ে চলে গিয়েছে সীতারামপুরে। কী যে হচ্ছে, কিছুই জানতে পারি না। চিঠি দিলেও জবাব দেয় না। চাকরীটা আছে কি না কে জানে! দেবুরই বা কি হলো?—বুঝলে মা, দুনিয়ায় সব সমান! তবে হ্যাঁ তাও বলি, তোমার মতো এমন দেবী জীবনে আর দুটি দেখলাম না।

নইলে নিজের সব কাজ ফেলে রেখে কে এই কানা বুড়োকে ঘাড়ে করে দেড়শ মাইলের ঝুঁকি পোয়ায় বলো!

মন্দাকিনী মুখ বুজে শুনে যাচ্ছিল, গোবিন্দ একটু থামতেই বল্‌ল—জ্যোতিদাদা চিঠিতে লিখেছিলেন যে, কারখানাতে গোলমাল হচ্ছে, এখন ছুটি নেওয়া যাবে না। নইলে উনিই আনতে যেতেন আপনাকে।

দেবজ্যোতি আরও যেসব কথা লিখছিল, সেগুলো আর বল্‌ল না মন্দাকিনী।...ললিত কলকাতায় যেতে রাজী হয় নি—এ খবর পেলে গোবিন্দ অযথা দুঃখ পাবেন।

ওভারব্রিজের ওপরটায় কোন আলো নেই। শহরের আলোর দৌরাত্ম্যে তাড়া খেয়ে যত সব অন্ধকার এসে এখানেই জমা হয়েছে। কাজেই একটু আস্তে আস্তে চল্‌তে হয়। এ গাড়িতে লোকজন বিশেষ নামে নি। যারা নেমেছে, তারা সরাসরি লাইন ডিঙিয়ে উল্টো দিকের প্লাটফর্মে চলে গেছে। ওভারব্রিজের ওপর সামনের দিকে রেলিং ঘেঁসে দুটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে—তাদের একটি মেয়ে, অপরটি পুরুষ।

মন্দাকিনী অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেইদিকে তাকিয়ে থাকে। হয়তো এরা নিরালায় দুটো মনের কথা কইছে। গোবিন্দ বল্‌লেন—কি হ'ল মা, একটু পা চালিয়ে চলো! রাত অনেক হ'ল যে! ওদিকে গিয়ে আবার রাত্রের ব্যবস্থা করতে হবে—। গরীবের ঘরে একটু কষ্ট হবে খেতে, তা একদিন না হয় কষ্টই করবে—কি বলো!

ছায়ামূর্তি দুটির দিকে তাকিয়ে থেকেই মন্দাকিনী জবাব দিল—এখনো আমাকে পর ভাবেন দেখছি!

হঠাৎ ছায়া দুটো নড়ে উঠ্‌ল। বোধ হয় এত কাছাকাছি লোক দেখে ওরা বিব্রত বোধ করছে! কিন্তু একী—মেয়েটি যেন ওদের সামনের পথ আগলে দাঁড়িয়েছে!

মেয়েটি বল্‌ল—তাহৈ মশাই! মন্দাদি!

গোবিন্দ প্রশ্ন করেন—কে? কে গো, মা জননী!

দেবিকা হেঁট হয়ে পায়ের ধূলো নিয়ে বল্‌ল—আমি দোব!

—অ বেঁচে থাকো মা, সতী-সীমন্তিনী হও।

বলে গোবিন্দ একটু থমকে আবার প্রশ্ন করলেন—তা এত রাতে এখানে কি করছ দেবি ?

মন্দাকিনী ততক্ষণে অপর ছায়ামূর্তির দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করছিল। সে ছায়াটিও নড়ে-চড়ে এগিয়ে এসে গোবিন্দকে প্রণাম করল। গোবিন্দর মুখে বিস্ময় আর জিজ্ঞাসার অবধি নেই,—কে ?

—আমি ললিত।

দেবিকা বল্‌ল—জামাইবাবুর সঙ্গে একটু গল্প করছিলাম। এই নিরিবিলি জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগে।

গোবিন্দ আত্মগত হয়ে কি যেন ভাবছিলেন, দেবিকা জিজ্ঞাসা করল—আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন, তাঐ মশাই ?

—এঁ্যা, হ্যাঁ ! ছায়াছায়া-ভাব আর কি। আলোতে ঠিক দেখতে পাবো। বুঝলে না, বয়স হলে এমনিই দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। যাক্ তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হ'ল। মন্দা মা, কুলীটাকে এখন ছেড়ে দিলেই হয়—ললিত ত রয়েছে, স্যুট্‌কেসটা ওর হাতে চলে যাবে, আর বিছানার বাণ্ডিলটা আমি বেশ বইতে পারবো।

ললিত বাধা দিল—আপনাকে আর মিছে কষ্ট করতে হবে না। বরং একটা ট্যাক্সি করা যাক, সবাই বেশ একসঙ্গে চট্ করে বাড়ি পৌঁছানো যাবে।

গোবিন্দ চল্‌তে চল্‌তেই বল্‌লেন—ওঃ, ভারি লবাবের ব্যাটা লটবর হইচিস্ যে, এই তিন পা যেতে হাওয়া গাড়িতে উঠ্‌তে হবে ! পয়সা ত নয় খোলমকুচি। একটু সাম্‌লে চলো বাবা—সাম্‌লে চলো।

ট্যাক্সি আর করা হ'ল না। দেবিকা মন্দাকিনীর হাত ধরে গল্প জুড়েছে। ললিত পিতার পাশে চল্‌তে চল্‌তে প্রশ্ন করে—কই, আজ যে আসবেন একখানা চিঠিও দিয়ে জানান নি।

গোবিন্দ চাপা গলায় বল্‌লেন—আমি ত কবেই বলেছিলাম, একটা খবর দাও—তা পরের মর্জির ওপর ভরসা ত ! এই মেয়েটা, বুঝলি না, এই মেয়েটা—

গতিবেগ কমিয়ে দিয়ে গোবিন্দ আরও মৃদু স্বরে বল্‌লেন—কী যে মতলব

জানি না, তোদের কাউকে খবর দিতে দিল না। ও-ই আসে যায় দেখাশুনো করে, যদি বলি যে ললিতকে একখানা চিঠি দাও, ত মিন্‌মিনে ন্যাকা ঢঙে বলে—'দিইছি ত!' ভগবান জানেন। কেবল দেবু-দেবু-দেবু! দেবু বল্‌তে জিভ্ দিয়ে নাল ঝরে।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন গোবিন্দ—ছায় নি ত চিঠি! জানি সব জানি। আরে বাবা, ললিতকে চিঠি দিলি তুই, আর সে, জবাব দিল না!—একথা আর যে-ই বিশ্বাস করুক গোবিন্দ মুখুয্যে করবে না। আরে বাবা, আমি চিনিনে আমার ছেলেকে!

ললিত মুখ বুজে শুনছিল, পিতার উৎসাহের আতিশয্যকে বাধা দিয়ে রসভঙ্গ করতে চায় না সে। প্রাণের আবেগে গোবিন্দ যা খুশী বল্‌তে পারেন।

কথা ক'য়ে কাজ কি। বাধা পেলে হয়তো এখুনি প্রশ্ন করবেন গোবিন্দ তাহলে, নিরালাতে শুভারব্রিজের ওপর দেবিকার সঙ্গে কি করছিল ললিত!

গোবিন্দ মানিকপুরের মাটিতে পা দিয়ে যেন প্রাণ ভ'রে আরামের নিশ্বাস ফেলে বেঁচে উঠেছেন। তার ওপর ললিতকে কাছে পেয়ে আর সব ভুলে গিয়েছেন। বল্‌লেন—তুইও কেমন করে টের পেয়েছিলি যে আমি আসছি, নইলে হঠাৎ এভাবে দেখা হয়! মায়ের কৃপা একেই বলে।

ললিত শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকায়, এখনি বুঝি দেবিকার প্রসঙ্গ উঠবে। সে ব্যস্ত ভাবে বলল—বাবা, ওরা অনেক এগিয়ে গিয়েছে।

—যাক, যেতে দে! আমি বুড়ো মানুষ, চোখেও তেমন দেখতে পাই নে। আর মানিকপুর ত ওদের অচেনা জায়গা নয়।

গোবিন্দ ললিতের ডান হাতখানা ধরে আবেগভরে বল্‌লেন—ওঃ, কতকাল তোকে কাছে পাইনি রে লল্‌তে! ইদিকে কানে সবই আসে, বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্ করি! সবই গ্রহের ফের। যাক, এখন আর কোনো গোলমাল নেই ত? সব মিটেছে ত!

—হ্যাঁ, একরকম ক'র চাপাচুপো দেওয়া গিয়েছে। তবে, অনেক বেরিয়ে গেল!

—যাক্ বাবা! বেঁচে থাকলে টাকা অনেক রোজগার করতে পারবি—তোর যা বুদ্ধি, তাতে ভাবনার কিছু নেই।

গোবিন্দ যে কোনোরকম বেয়াড়া প্রশ্ন করে ললিতকে বিব্রত করতে চান না, ললিত সেটা ভালো করেই বুঝল। তবু একটা অস্বস্তি লাগে বই কি! প্রশ্নগুলো গোবিন্দ না করলেও ললিতের মনের মধ্যে কে যেন খুঁচিয়ে ঠেলে তুলে দেয়। সীতারামপুরে যে প্রতাপ-প্রতিপত্তি নিয়ে সে ছিল, এই এক হাঙ্গামার ধাক্কায় তাসের ঘরের মতোই সে-সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। এখন কিছুদিন এখানেই থাকা ভালো। নগদ যা জমেছিল তার বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই, তার ওপর বাজারে ধার বাকীও বিস্তর হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রেখে আবার নতুন কারবার গড়ে তুলতে হবে। চুরিচাপাটি ছাড়া হঠাৎ বড়লোক হওয়া যায় না ঠিকই—কিন্তু সম্প্রতি জেল-কয়েদের ভয়টা ওপথে যেতে বারণ করছে। এদিকে কোম্পানীর সঙ্গে ঠিকাদারীর বন্দোবস্তটা পাকাপাকি করে নিতে পারলে আর ভাবনা থাকে না।

ললিত আপন চিন্তায় একেবারে ডুবে গিয়েছিল। হঠাৎ দেবিকার উচ্চ কণ্ঠের ডাকে চম্‌কে উঠ্‌ল—জামাইবাবু! ও জামাইবাবু—

ললিত সাড়া দিল, কিন্তু এগিয়ে যেতে পারল না, গোবিন্দ বেশ শক্ত করেই তার হাতখানা ধরে রেখেছেন।

দেবিকা উচ্চগ্রামে কথা বল্‌ছে—আপনার সঙ্গে বুঝি মন্দাদির আলাপ নেই জামাইবাবু?

গোবিন্দর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ললিত সামনে এগোতে চেষ্টা করে। কিন্তু সদর রাস্তা, পথ জুড়ে লোকের যাতায়াত চল্‌ছে—অনেক লোক, খুব দ্রুত সে যেতে পারে না।

অতি কষ্টে ললিত ওদের কাছে গিয়ে হাত তুলে নমস্কার করল—আপনার কথা এত শুনেছি যে, আলাপ না থাকলেও পরিচয় আছে বল্‌তে পারি।

মন্দাকিনী যেন একটু আড়ষ্টভাবেই জবাব দিল—তা হবে।

দেবিকা উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্‌ল—জামাইবাবু খুব আলাপী লোক। দেখো মন্দাদি তিন মিনিটে এমন আপন করে নেবে যে মনেই হবে না নতুন চেনা।

ললিত হেসে উঠল—শালা-শালীদের সার্টিফিকেটকে সত্যি বলে ধরলে কিন্তু ঠকবেন।

—আচ্ছা, এই বলে বুঝি গালাগাল দিয়ে নিলেন!

দেবিকা আপন প্রাবল্যেই প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে—জানো ভাই মন্দাদি, ওঁকে দুচোখে দেখতে পারতাম না, কিন্তু এখন দেখছি খুব ঠকেছি।

শোভনতার খাতিরে মন্দাকিনীকে বল্‌তে হয়—তাই নাকি? এখন লোকসানটা তাই উসুল করছ বুঝি?

এমন কিছুই নয় কিন্তু মন্দাকিনীর কণ্ঠস্বরে বোধ হয় বিশেষ কিছু ছিল যার জন্য দেবিকা কথাটা হেসে উড়িয়ে না দিয়ে গম্ভীরভাবে বল্‌ল—ছিঃ, মন্দাদি, তুমি একথা ভাবতে পারলে?

মন্দাকিনী কিছু বলবার আগেই ললিত ব্যস্তভাবে বলে—ওঁর আর দোষ কি! অন্ধকার নির্জন ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমি যে নিছক মার্কসণ্ডীয় দর্শনের সমুদ্রে আমাকে সাঁতার শেখাচ্ছিলে তা কে ভাবতে পারে বলো?

তারপর মন্দাকিনীর দিকে তাকিয়ে ললিত কথার জের টানে—জানেন মন্দাদি, আমার শ্যালিকার আর সবই ভালো, কিন্তু ওঁর পার্টির কথা ছাড়া অন্য কিছু জানতে, মানতে, ভাবতে আদৌ রাজী নন উনি। এই যা গোলমাল। মানে, ছিট আর কি!

গোবিন্দ ওদের নাগাল ধরে ফেলে বল্‌লেন—কুলীটা আবার কোথায় শট্‌কে পড়ল?

বিরক্ত হয়ে ললিত জবাব দেয়—কোথাও পালায় নি, অত তড়বড় করছেন কেন?

মন্দাকিনী গোবিন্দকে বল্‌ল—এবার ত আর ভাবনা নেই, আপনার ছেলেকে পেয়ে গেছেন—ওঁর সঙ্গেই কোয়ার্টারে যেতে পারবেন। আমি তাহলে বিদায় নিই।

বলেই মন্দাকিনী দু-হাত জোড় করে নমস্কার করল গোবিন্দকে।

গোবিন্দ অবাক হলেন—সে কী মা জননী, এই রাতবিরেতে তুমি কোথায় যাবে?

—একটু কাজ রয়েছে, সেরেই কলকাতা রওনা হবো।

ললিত বাধা দিয়ে বল্‌ল—সে কি করে হয়! পথ থেকেই চলে যাবেন, তা হবে না।

মন্দাকিনী মৃদু কণ্ঠে উত্তর দেয়—আতিথ্যের জন্যে ব্যস্ত হবেন না। কাজ আছে, নইলে মুকুলদির কাছে গিয়ে গল্প করতাম। ওঁকে বলবেন আমার কথা।

ললিত আর কিছু বলে না। কারণ মন্দাকিনী সম্বন্ধে তার যা ধারণা তাতে এটুকু বেশ বুঝতে পারে যে, ওর সংকল্প সহজ এবং দৃঢ়। তাছাড়া মুকুলের কথা বলেও যেন মন্দাকিনী ললিতকে খানিকটা দমিয়ে দিয়েছে।

দেবিকাও বিদায় নিল, বল্‌ল—বাড়ি যাই জামাইবাবু। মন্দাদির সঙ্গে কত কাল পরে দেখা!

ললিত বল্‌ল—তুমিও যাবে?

দেবিকা হাসল—বারে যাবো না! দাদার ডিউটি অফ্ হ'তে এখনো ঘণ্টা খানেক দেরী রয়েছে, ততক্ষণ ত মন্দাদিকে একা একাই কাটাতে হতো।

ললিত বল্‌ল—ও, তাহলে উনি তোমাদের ওখানে যাচ্ছেন?

দেবিকা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি মেলে বল্‌ল—হ্যাঁ, আমাদের ওখানেই ওঁর কাজ।

দেবিকা আর মন্দাকিনী ডান দিকের চওড়া পথ ধরল।

চল্‌তে চল্‌তে দেবিকা বলে—আচ্ছা মন্দাদি, তোমার কোনো কষ্ট হয় না?

—কিসের কষ্ট ভাই!

—এই, সব কিছু ছেড়ে দিয়ে চল্‌তে!

—কি আর ছাড়তে পেরেছি?

—না, এটা তোমার মুখে মানায় না। তোমার মত ক'জন এ রকম বিরাট ত্যাগ করতে পারে! কই আমি ত দেখতে পাই না আর কাউকে—

মন্দাকিনী কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বল্‌ল—তোমার বাবা ভালো আছেন ত?

—আছেন। সেকথা ত একটু আগেই জিগ্যেস্ করেছ!

—তাই নাকি! ও, তোমার ছোট জামাইবাবু কেমন লোক হবেন ভাই

—আহা, আমার সঙ্গে চালাকি হচ্ছে! ছোট জামাইবাবু হবার অনেক আগে তোমার সঙ্গে অমলদার আলাপ, সে খবর বুঝি আমরা কেউ জানি না!

—ওমা সেকি কথা!

—ত্যাখো মন্দাদি, তুমি বরাবর আমাকে ছেলেমানুষ বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করো, এটা কিন্তু আর সইব না।

—তা কেন হবে, তুমি এখন কলেজে পড়ো, পলিটিক্স করো—তোমাকে ছেলেমানুষ মনে করা বোকামী, সে আমিও বুঝি। আচ্ছা, তোমার মিণ্টুদির খবর কী, ওঁর বাবা কেমন আছেন?

মন্দাকিনীর শেষের কথাটা চাপা দিয়ে একখানা ট্রাক সবেগে বেরিয়ে গেল।

দেবিকা প্রশ্ন করল—কি যেন বল্‌ছিলে?

—দীনদয়াল বাবুদের কথা জিগ্যেস করছিলাম।

দেবিকা বল্‌ল—কাকামনির শরীর ভালো যাচ্ছে না। মিণ্টুদির বিয়ের জন্যে উনি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। হয়তো শ্রাবণেই মিণ্টুদির বিয়ে লাগছে—ছোট্‌দির পরেই!

মন্দাকিনী কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে বলে—মিণ্টুর বিয়ে এই শ্রাবণেই! তাহলে পরপর দুটো নেমন্তন্ন খাচ্ছ তোমরা!

—আহা নেমন্তন্নই বটে! খাটুনির গুঁতোয় চোখে অন্ধকার দেখিয়ে ছাড়বে। তবে হ্যাঁ ছোট্‌দির বিয়েতে তোমারও রেহাই নেই।

মন্দাকিনী চিন্তিতভাবে বল্‌ল—আমি হচ্ছি হরিজন, আমাকে দেখলে তোমাদের মানিকপুরের লোকে আর সে বাড়িতে ঢুকবেই না।

—ইস্‌! বল্‌লেই অমনি হ'ল আর কি! তোমাকে দেখলে যে ঢুকতে না চায়, তার ঢুকে দরকার নেই। এই বলে তুমি ফাঁকি দিয়ে পালাতে পাচ্ছ না।

—সেটা নয় তোমার বিয়ের জন্যেই তোলা থাক।

—দূর, আমি বিয়েই করব না। তোমার মতো আমিও কেবল দেশের কাজ করব। আর যদি তেমন মনের মতো—না, না, আমার কাউকে পছন্দ হয় না, সত্যি বল্‌ছি মন্দা দি! কাউকে না। তোমার আর সবই আমি পছন্দ

করি, কিন্তু দাদার মতো একটি নিতান্ত সাধারণ মানুষকে তুমি ইয়ে করলে সেটাই আমার ভালো লাগে নি!

মন্দাকিনী পথের মধ্যে হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দেবিকাও থম্‌কে দাঁড়ালো—কি হলো, মন্দাদি!

—কিছু না!

নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে মন্দাকিনী বলে—জ্যোতিদা সাধারণ হতে শত চেষ্টা করলেও ওঁর অসাধারণত্বটুকু ঠিক ফুটে বেরিয়ে পড়ে। সত্যি দেবি, তোমার দুর্ভাগ্য যে ওঁকে তুমি চিনলে না!

দেবিকা কণ্ঠস্বরে রীতিমত জোর দিয়ে প্রতিবাদ করে—অসাধারণত্বটা কোথায় শুনি? বড়ো হবার সব কিছু সম্ভাবনাকে নিজে হাতে কেটে দিয়ে, বেঁড়ে সাজার চেষ্টা করা যদি অসাধারণত্ব হয় তবে অবশ্য আলাদা কথা।

মন্দাকিনী আবেগ-কম্পিত স্বরে বল্‌ল—উনি যে বিরাট আত্মত্যাগ করে এই পথ বেছে নিয়েছেন তার তাৎপর্য বুঝতে আমারও বেশ সময় লেগেছে।

—থামো। যেন ডাক্তার হ'লে আর দেশের সেবা করা যায় না! শুধু শুধু মামাদের সঙ্গে ঝগড়া করে, বাবাকে আঘাত দিয়ে উনি হলেন কারখানার মজদুর! বাহাদুরী নেবার কি সস্তা পথ! একে তুমি ত্যাগ বলো? তাও যদি মনেপ্রাণে মজদুর হতে পারতেন—

—মনেপ্রাণে মজদুর হননি কি করে বুঝলে?

—তা হলে ত কম্যুনিজমের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতো। যে আদর্শবাদ সর্বহারার স্বার্থকে সমর্থন করে সেই আদর্শবাদকেই উনি অস্বীকার করেন। অথচ ওঁর সাধ জনসাধারণের হয়ে লড়াই করবেন,—কি করে তা হয়? উল্টে উনি কম্যুনিস্ট পার্টির বিরোধী—রিঅ্যাক্‌শনারী!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মন্দাকিনী বল্‌ল—তর্ক দিয়ে তোমার এই ঘৃণাকে জয় করবার ক্ষমতা আমার নেই। শ্রদ্ধা দিয়ে যদি কোনোদিন বুঝতে পারো, তাহলে সেটাই স্থায়ী মূল্য পাবে। আজ বড়ো ক্লান্ত ভাই। আর সত্যি কথা, কী, আমি কাজই করতে পারি, তর্ক করবার মতো বুদ্ধি আমার হয়তো নেইও!

তবু এটা ঠিক যে, আমরা জনসাধারণের জন্যেই জীবনপণ করেছি—দেশ আমাদের টেনে নিয়েছে।

মুহূর্তের মধ্যে দেবিকার কণ্ঠস্বর বদ্‌লে গেল—তুমি দুঃখ পেলে মন্দাদি! আমাকে ক্ষমা করো। সত্যি তোমাকে আঘাত করতে চাইনি। কি জানি তোমাকে এতো ভালবাসি যে, তোমার জন্যে হয়তো আমি সবকিছু ছেড়ে দিতে পারি। একদিন ত তোমার সঙ্গে বেরুবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলাম। মনে পড়ে সে কথা?

—সব মনে পড়ে।

—সেদিন তুমি সঙ্গে নাওনি। কী যে কষ্ট হয়েছিল! আর সেই থেকেই আমার মন বদলাতে শুরু করল। আজকের এই আমির জন্যে তুমি দায়ী, তা আর কেউ না জানলেও আমি জানি। মন্দাদি, তোমাকে আমি গুরু বলে শ্রদ্ধা করি। তুমি বিশ্বাস করো, আমি মনে মনে যা ভাবি তা তোমার কাছে গোপন করতে পারবো না।

—কে বলেছে গোপন করতে ভাই!

—আবার, তুমি দুঃখ পাবে এমন কথাও বল্‌তে যে ইচ্ছে করে না!

এবার মন্দাকিনী হেসে ফেল্‌ল। স্নিগ্ধ করুণাসিক্ত অপূর্ব সে হাসি!

দেবিকা আস্তে করে মন্দাকিনীর ডান হাতখানা দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—দাদাকে বিয়ে করলে তুমি আমার আপন বৌদি হবে একথা জেনেও যেন বল্‌তে ইচ্ছে করে, তুমি এ কাজ কর না, তোমাকে মানায় না। না, না, এভাবে পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করবে তোমার মতো মেয়ে, এ যেন আমারই পরাজয় মন্দাদি!

[illegible] পরক্ষণে দু-হাত দিয়ে চোখ মুছে দেবিকা ভারি গলায় বল্‌ল—ছি, ছি, [illegible]মি কি আজে বাজে বকছি! ছাখো দেখি, তোমার ভাবের অন্দরমহলে [illegible]ত যাওয়ার স্পর্ধা! সত্যিই ত তোমার নিজের শুভবুদ্ধি দিয়ে যা [illegible]মি তাই করবে।

[illegible]স্মিত-বিহ্বল দৃষ্টিতে দেবিকার অশ্রুময়ী মুখের দিকে তাকি[illegible]ল. তারপর ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে

বল্‌ল—চলো চলো, পথের মধ্যে আর দেরি করে না। ঘরে বসে মন খুলে কথা হবে।

দেবিকা হেসে জবাব দিল—অন্ধকারকে আমি বড় ভালোবাসি মন্দাদি। কেমন মন খুলে কথা বলা যায়। পাশে যদি কেউ থাকে, তাকে ভাবি আমার নিজেরই মন। কিন্তু ঘর, আলো, এসব থাকলে তখন মনটা কিছুতেই পুরোপুরি দরজা খোলে না। তুমি দেখো, বাড়িতে আমি একটুও পাগলামি করব না। তাছাড়া সেখানে ছোট্‌দি, দাদা, বাবা—এদের আশে-পাশে থাকলে এখনও যেন মনে হয়, ওরা আমাকে ছোটো বলে করুণা করে। ভেতরে ভেতরে রেগে যাই। কতো চেষ্টা করি, ওদের সঙ্গে ভালো ভাবে কথা বল্‌তে! কিন্তু আমাকে ছাপিয়ে নতুন একটা ব্যক্তিত্ববোধ এসে বাধা দেয়—উগ্র হয়ে পড়ি। কেন যে এমন হয়! পরে যখন ভালো করে ভেবে দেখি, নিজেও কষ্ট পাই। সত্যি এভাবে আর চালানো যায় না। ওদেরও দোষ নেই—আমারও নয়, অথচ একটা বিশ্রী অবস্থা হয়ে পড়ছে। এর কি উপায় বলতে পারো মন্দাদি?

সামনের পথ জুড়ে একটা মহিষ আরামে শুয়ে রয়েছে। আর একটু হলেই দেবিকা তার ঘাড়ের উপর পড়ত! মন্দাকিনী ওর হাত ধরে আটকে দিয়ে বল্‌ল—দেখে চলো দেবি!

—হ্যাঁ! দেখে চল্‌তে হবে। আর নয়, অনেক বকেছি। তোমাকে কাছে পেয়ে আমি যেন সমস্যার ঝুড়িটা উজাড় করে দিচ্ছি। কি করব, আমার একথা কাউকে বল্‌তে পারি না যে!

মন্দাকিনী বল্‌ল—আমারও একসময়ে এরকম হ'ত! তবে ঠিক তোমার মতো হয় ত হ'ত না। সত্যি সে অবস্থায় যদি জ্যোতিদাদার দেখা না পেতাম তাহলে, কী যে হ'ত আমার!

—নাঃ, তোমার ওই জ্যোতিদাদাই তোমার কাছ থেকে আমাকে ভাগাবে দেখছি।

—রাগ করছ, কিন্তু আমি ত মিথ্যে বলতে পারব না ভাই তোমাকে খুশী করার জন্যে। তোমার ওই অন্ধকারকে ভালো লাগাটার নিন্দে করছি না—

কিন্তু আলোর সামনে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার অভ্যেস করো দেখি, অনেক জিনিষ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে।

—কি জানি, হয়ত তাতে লাভ হতে পারে!

দেবিকার সঙ্গে কথা কইতে কইতে একসময়ে মন্দাকিনী এসে পড়ল সীতানাথের কোয়ার্টারে।

ওকে দেখে মল্লিকা প্রশ্ন করে—হঠাৎ তুমি কোথা থেকে?

—এই এসে পড়লাম ভাই, লুচির গন্ধে-গন্ধে!

—আহা, ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি!

সীতানাথ খেতে বসেছিলেন, বল্‌লেন—দেবি, দুপুররাত পর্যন্ত কোথায় ছিলি, হ্যাঁ রে? আজ বাদে কাল মল্লি শ্বশুর-বাড়ী যাবে তখন কি আমাদের উপোস করতে হবে? বলি এদিকে একটু মনটন দিলে ত পারিস।

মল্লিকা কতকটা ঠেস দিয়ে বল্‌ল—লেখাপড়া শিখছে ও কি হাঁড়ি-হেঁসেল ঠেল্‌বে! রাঁধুনী-টাঁধুনীর ব্যবস্থা করতে গিয়েছিল হয়তো!

মন্দাকিনীর দিকে তাকিয়ে দেবিকা বল্‌ল—দেখচ ত! এর জবাবে কি বল্‌তে ইচ্ছে করে!

তারপর উচ্চকণ্ঠে বল্‌ল—মন্দাদি দুদণ্ড এসেছে, ওঁর সাম্‌নে এসব না বল্‌লেও চল্‌ত ছোটদি! আমাদের জন্যে তোমাকে সারা জীবন হাঁড়ি ঠেল্‌তে হবে এমন কথা কি কেউ বলেছে?

সীতানাথ বল্‌লেন—মন্দাকিনী? মানে মল্লিকসাহেবের মেয়ে—অ! তা বেশ। কই দেখি, এসো ইদিকে। কত বড়টা হলে মা, দেখি।

মন্দাকিনী ভেতরের দালানে গেল, ওকে দেখে সীতানাথ খুশী হলেন বলে মনে হয় না। প্রশ্ন করলেন—কবে এসেছ? তোমার বাবা কেমন আছেন?

মন্দাকিনী কিছু বলবার আগেই দেবিকা জবাব দিল—উনি এই ট্রেণেই তাহে মশাইকে নিয়ে কলকাতা থেকে এলেন। বড় জামাইবাবুর হাত থেকে জোর করে টেনে এনেছি—আজ আমাদের এখানে উনি থাকবেন, বুঝলে ছোটদি! তা তোমার যদি অসুবিধে হয়, ওঁর জন্য আমি ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিচ্ছি।

মল্লিকা বল্‌ল—থাক তোমাকে আর ঢং করে রং পোড়াতে হবে না।

সীতানাথ ভ্রূকুঞ্চিত করলেন—সেটা কিরকম হবে! মা-বাপের সন্তানকে মিছেমিছি এভাবে আটকে রাখা কেন বাপু!

যদি চ তিনি সবই জানেন তবু মন্দাকিনীর এই আত্মীয়তাটা প্রকাশ্যে মানতে রাজী নন্‌। তাঁর বিশ্বাস, বৃদ্ধ বয়সে তাঁর চাকরীর অধোগতির জন্য মন্দাকিনীই দায়ী। এক কালে এই মেয়েটির কাছে সীতানাথ পরাস্ত হয়েছেন, সে স্মৃতিও তাঁর মানসিক পীড়ার কারণ হয়ে রয়েছে। দেবজ্যোতির সঙ্গে মন্দাকিনীর মাখামাখিও তিনি কোন মতেই সমর্থন করবেন না।

দেবিকা জোর গলায় জবাব দিল—আমাদের সব কথায় তোমার থাকার দরকার কি বাবা! ভালো করেই জানো যে, মন্দাদি এখন তোমাদের কারখানার কর্তাদের এলাকায় পড়েন না। উনি একজন দেশনেত্রী! মিছামিছি বাজে বকছ কেন?

সীতানাথ ঘাড় হেঁট করে তরকারীর পোড়া ফোড়নগুলো বাছতে তৎপর হলেন। অপ্রসন্ন ভাবে মল্লিকার উদ্দেশে বল্‌লেন—মল্লি, তোকে কতদিন না বলিছি যে, জিরে-মেথী ঝাঁইপোড়া করবি নে, আজ ডাল্‌নাটা অখাদ্যি হয়েছে। থুঃ-থুঃ!

দেবিকা মন্দাকিনীর হাত ধরে আকর্ষণ করল—চলো, গাড়ীর কাপড়ে কতক্ষণ থাকবে! এই বেলায় গা ধুয়ে নাও, পৌনে দশটার ভোঁ বাজল বলে!

মন্দাকিনী বল্‌ল—এই যে বল্‌ছিলে গল্প করবে?

—হবে, হবে। সারারাত তোমার পাশে শুয়ে কত গল্প করব দেখো, তোমাকে আজ আর ঘুমোতে দিচ্ছি না। কি রং-এর শাড়ী পরবে? জাফরানী, না লাল? ইস্‌ লাল টুকটুকে শাড়ী পরলে তোমকে যা মানায় মন্দাদি! পরবে?

হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মন্দাকিনী হাত উল্টে বল্‌ল—যা ইচ্ছে করো ভাই, আমার কাছে সবই সমান।

পৌনে দশটার বাঁশী বাজলো। শান্ত, গৃহস্থ পরিবেশের সঙ্গে যেন সুর মিলিয়ে বাঁশীটা বাজে! গম্ভীর, অনুগ্র একটানা আওয়াজটা। অনেকদিন পরে

হঠাৎ এই মুহূর্তে মন্দাকিনীর মনে কী-এক করুণ সঙ্গীতের আবহ সূচিত করে! স্নানের ঘরে একান্ত একলা, গায়ে সাবান বুলোতে বুলোতে ও আনমনা হয়ে পড়ে। খুব আশ্চর্য লাগে। এই মানিকপুরে আজও তেমনি বাঁশী বাজে! জীবনের ছন্দে কিছুই পরিবর্তন ঘটে নি?

অথচ মন্দাকিনী পিয়ার্সের বদলে যমুনা সাবান মাখছে, মল্লিকসাহেবের কোয়ার্টারের শাওয়ার-বাথের জায়গায় এই চৌবাচ্ছা থেকে মগে করে গায়ে জল ঢালছে! তবু মানিকপুর মানিকপুরই রয়েছে। মন্দাকিনীও ত মন্দাকিনীই আছে! ······আচ্ছা এখন মন্দাকিনীর মা কি করছেন? আর, বাবা? জিমিটা বেঁচে আছে ত? মিঞাজান হয়তো প্রেতের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কে কোথায় কি করছে তার নির্ভুল খতিয়ান বানিয়ে চলেছে মন্দাকিনী। বাঁশী কখন থেমে গেছে। কিন্তু তার রেশটুকু মন্দাকিনীর মনে রয়ে গেল। অনেকদিন পরে অবসর মিলেছে আজ। কাজের হাত থেকে একটুখানি ছুটি নিয়ে মন্দাকিনী নিজের কাছে পালিয়ে এসেছে। নইলে ওর আজ আসবার কথা নয়, দেবজ্যোতিকে লিখেছিল আরও দিন-কয়েক পরে আসবে। সেদিন নিশ্চয় দেবজ্যোতি স্টেশনে থাকতো। মন্দাকিনী যেন আর থাকতে পারছিল না কলকাতায়। তাই চলে এল। আরও অস্থির করেছে ওকে অমলা। মিণ্টুর প্রসঙ্গ তুলে ওকে অনেক কথা শুনিয়েছে। মন্দাকিনী নাকি নিতান্ত স্বার্থপরের মতো দেবজ্যোতিকে দখল করে বসেছে! অথচ ন্যায়তঃ মিণ্টুরই দাবির জোর বেশি। কিন্তু দেবজ্যোতি ত সে কথা একবারও বলেনি! গায়ে জল ঢালতে ঢালতে মন্দাকিনী ভেবেই চলেছে।

লাল শাড়ীখানা পরতে গিয়ে কুণ্ঠায় জড়সড় হয়ে পড়ে মন্দাকিনী। না, না, এটা পরলে দেবজ্যোতির সাম্‌নে সহজভাবে দাঁড়াতে পারবে না। কি ভাববে ও! ছি, ছি, আগে একথা মনে হয়নি কেন?

নিরুপায় মন্দাকিনীকে লাল শাড়ী পরেই বেরুতে হ'ল। এসব ব্যাপার নিয়ে আতিশয্য দেখানো আরো লজ্জাকর ওর পক্ষে।

ছেষট্টি

—তোমার চেহারা কিন্তু বেশ খারাপ হয়ে গেছে জ্যোতিদাদা!

বল্‌তে বল্‌তে মন্দাকিনীর মুখখানা বেদনায় ম্লান হয়ে যায়।

তার জবাবে দেবজ্যোতি বল্‌ল—এটাই হ'ল আমার আসল চেহারা, বুঝলে! আর বললে্ যদি রাগ না করো ত একটা কথা—

আগ্রহে উৎসুক গ্রীবা বাড়িয়ে মন্দাকিনী বলে—তোমার কথায় রাগ করব আমি! এটা তুমি ভাবতে পারলে!

মন্দাকিনীর দিকে পূর্ণদৃষ্টি মেলে দিয়ে দেবজ্যোতি বল্‌ল—ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে! এত সুন্দর যে, আমারই তাকাতে লজ্জা করছে!

সঙ্কোচে, লজ্জায়, খুশীতে মন্দাকিনীর মুখখানা শাড়ীর রং-এর মতোই রাঙা হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে ও বল্‌ল—অমন নতুন অচেনা মানুষের মতো বলো না, ওরকম ভাবে তাকিয়ো না—দোহাই তোমার!

দেবজ্যোতি দরজার দিকে একবার নজর দিয়ে বল্‌ল—কী যে ভালো লাগছে, কি বল্‌ব! তুমি এমনি কাছে-কাছে থাকলে বড় ভালো হ'ত। জীবনের স্বাদ বুঝি তাতে নতুন করে ফিরে পাই মন্দা!

কথাগুলো সরাসরি মন্দাকিনীর বুকে ধাক্কা দিয়ে, ওর হৃদয়ের স্পন্দন যেন শতগুণ বাড়িয়ে দিল! মন্দাকিনীর মাথার মধ্যে এক অনাস্বাদিত মাদকতার উন্মাদনা! ওর মন কি এই কথাগুলো শোনবার জন্যই অধীর আগ্রহে কলকাতা থেকে ছুটে এসেছিল? সেটা এই মুহূর্তে হঠাৎ টের পেয়েছে মন্দাকিনী।

ও গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—কী পাগ্‌লামী শুরু করলে জ্যোতিদাদা!

—পাগলামী নয় মন্দা! সত্যি আমি আর পারছি না। কাজ আর কাজ, শুধু কাজ—হাঁপিয়ে পড়ি এক এক সময়ে। তোমাকে বড় বেশি মনে পড়ে। কিন্তু আবার ভাবি তোমার জীবনের মহৎ ব্রত, তাকে খর্ব করবার অধিকার আমার নেই। আমি কতো তুচ্ছ নগণ্য!

—আমি ত তা মনে করতে পারি না জ্যোতিদাদা। আমি জানি, মানুষ

ষোল আনাই মানুষ। তার জীবনে যেমন ব্রত আছে, তেমনি নিজের প্রতিও কর্তব্য রয়েছে। জীবাত্মার জন্যই যতো আয়োজন, পরমাত্মার দোহাই দিয়ে। তোমার এই নিজেকে খাটো করে দেখার কোনো মানে হয় না!

প্রায় ঝড়ের বেগে দেবিকা এসে ঢুকলো—আচ্ছা দাদা, তোমার শরীরে কি একটুও দয়ামায়া নেই? রাত সাড়ে বারোটা বাজতে চল্‌ল, মন্দাদি ট্রেণ জার্নি করেছে—ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে—তবু তোমার লেক্‌চার ফুরোয় না!

দেবজ্যোতি হেসে বল্‌ল—আমি কি ধরে রেখেছি নাকি? যাক না ও।

এবার আক্রমণটা মন্দার ওপর শুরু হ'ল—আর তোমারও ধৈর্য বলিহারি! দাদা যতক্ষণ বক্‌বক্ করবে ততক্ষণ ঠায় বসে থাকবে? আমাব বুঝি ঘুম পায় না!

মন্দাকিনী লজ্জিত ভাবে বল্‌ল—ও মা, তুমি জেগে বসে আছ তা কি জানি! চলো—চলো, যাচ্ছি ভাই।

দেবিকা ক্ষুণ্ণ হ'ল—বেশ! আমি বলি, দুটো কথা কইব বলে ঠায় বসে আছি—পাছে শুলে ঘুমিয়ে পড়ি, আর তুমি ভাবছো—এমনিই হয়। আচ্ছা আমি চল্লাম ঘুমোতে, তোমরা সারারাত বক্‌বক্ করে কাটাও।

দেবজ্যোতি হেসে উঠল—তবু ভালো যে, দেবীর সুনজরে পড়েছ মন্দা! যাও এখন ওর পার্টির মহিমাকীর্তন শুনতে শুনতে সুখে রাত ভোর করো গিয়ে।

—আচ্ছা হয়েছে, মন্দাদি তোমার মতো ওরকম ইয়ে নয়। ওর মত মন পেলে তুমিও আমার সুনজরে পড়তে—!

মন্দাকিনী বিব্রত বোধ করে। ব্যস্ত ভাবে বল্‌ল—সত্যি অনেক রাত হয়েছে, চলো যাই।

কিন্তু মন্দাকিনীর নড়বার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। দেবিকা মুখ ভার করে বল্‌ল—এসো!

দেবিকা চলে যেতে মন্দাকিনী এগিয়ে এসে চেয়ারের হাতল থেকে দেবজ্যোতির হাত তুলে নিয়ে ওষ্ঠে চেপে ধরল। বিবশ বিহ্বল দৃষ্টিতে দেবজ্যোতি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। মন্দাকিনী যেন নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—আসি তাহলে!

পরমুহূর্তে দেবজ্যোতি যেন সব হারার ভয়ে অন্ধ হয়ে মন্দাকিনীকে নিবিড় বাহুবেষ্টনে জড়িয়ে ধরল—না, না, তুমি যেয়ো না! মন্দা—মন্দাকিনী—! এইখানে থাকো।

দেবজ্যোতির আশ্রয়ে মন্দাকিনী আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত। ওর কোমল দেহ শিথিল হয়ে দেবজ্যোতির বক্ষলগ্ন থাকবার জন্য একান্ত আকুল। সে আকুলতা বাইরে বেষ্টনী অতিক্রম করে অন্তরতম লোককে আলিঙ্গন করতে চায়। এক পার্থিব আনন্দে মন্দাকিনীর আয়ত আঁখিপদ্ম ফুটে ওঠার আনন্দে আশায় অধীর আধবোজা কুঁড়ির মতো দেখায়। দেবজ্যোতির দু-চোখে বিস্ময়।

—তুমি কী সুন্দর!

মন্দাকিনীর কণ্ঠস্বরে দেবজ্যোতি চম্‌কে উঠল।

হঠাৎ যেন তাকে কে বাস্তবের কঠিন মাটিতে ফেলে দিল, এই কথার আঘাত দিয়ে। দীর্ঘশ্বাসকে শাসিয়ে শান্ত করে ধীরে ধীরে দেবজ্যোতি বল্‌ল—'তোমার হাতের কাছে আমার হাতখানা কতো কালো দেখাচ্ছে—ইস্!

লজ্জা পেল মন্দাকিনী, বল্‌ল—কিন্তু ও হাতখানা কতো শক্তি ধরে!

দেবজ্যোতি বল্‌ল—কড়ি ও কোমল, তাই না মন্দা!

মন্দাকিনী বল্‌ল—আর নয়, এখুনি আমার ভক্ত ফিরে এসে আবার জেরা শুরু করবে।

দেবজ্যোতি ম্লান হাসি হেসে মন্দাকিনীর চোখেমুখে সে হাসি ছুঁইয়ে বল্‌ল—এমনি করে চলে যাবে?

—অমন করলে কিন্তু পারবো না সামলাতে, ওগো বল না!

দেবজ্যোতির হঠাৎ মনে হয়, সে যেন বড়ই ছেলেমানুষী করে ফেলেছে! সহসা নিজের সাধারণ চেহারাটা খুঁজতে লাগলো। গম্ভীর হবার চেষ্টা করে দেবজ্যোতি বল্‌ল—ভালো কথা, তোমাকে একটা জরুরী খবর দেওয়া হয় নি।

—কী!

—তোমার বাবা এর মধ্যে হঠাৎ একদিন নেমন্তন্ন করেছিলেন।

—আর তুমি যাওনি—এই কথা ত?

—না, আমি গিয়েছিলাম।

মন্দাকিনী যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না—সত্যি গিয়েছিলে, তুমি? আর তারপরও বহাল তবিয়তে রয়েছ?

দেবজ্যোতি বিচলিত হয়ে পড়ল মন্দাকিনীর কথায়! ঘন ঘন মাথা নেড়ে সে বল্‌ল—ওইখানেই ভুল করলে মন্দাকিনী! অনিরুদ্ধ মল্লিকও একটা মানুষ।

মন্দাকিনী হঠাৎ যেন গর্জে উঠল—কখনই না! তিনি বড়লোক। মানুষকে দাবিয়ে রাখার আসুরিক নেশায় তিনি উন্মত্ত। He is a force personified! ব্যক্তিত্ব বলে কিছু তাঁর থাকতে পারে না।

কয়েক মিনিট আগে যে মেয়ের কোমল শিথিল দেহের মধুর অনির্বচনীয় স্পর্শ দেবজ্যোতি পেয়েছে, যে তরুণীর দুটি সুন্দর চোখকে পদ্মকুঁড়ি বলে মনে হয়েছে—এ যেন সেই রমণী নয়, এ আর এক শক্তিমতী নারী-মূর্তি। ওর লাল শাড়ী থেকে আগুন ঝরছে, ওর রাঙা গণ্ডদেশ অগ্নি-আভায় উজ্জ্বল! উত্তেজনায় মন্দাকিনী কাঁপছে। ওর যৌবনোদ্ধত বুক ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। দেবজ্যোতি মন্দাকিনীর হাত ধরে পাশের চেয়ারে বসিয়ে দিল। মন্দাকিনীর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না সে।

ওর দিকে তাকিয়ে সে বলতে শুরু করল—আগে আমার সব কথা শোনো, তারপর তোমার বিবেচনা দিয়ে হিসেব করে দেখো মন্দা!

—এ নিয়ে নতুন করে ভাবতে বসা কি বাজে সময় নষ্ট নয়?

—তবু আমার একটা অনুরোধে নয় কিছু বাজে খরচই করলে!

—কথাটা এ সময়ে উঠিয়ে তুমি ভালো করো নি। যাক, যখন উঠে পড়েছে, বলো!

—জানো মন্দা, ঝোঁকের মাথায় চলাটা আমার অভ্যেস ছিল। আর সেই অভ্যেসের দরুণ অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে গেছে, সে সবের পরিণামও ভুগতে হচ্ছে। হয়তো আরও হবে। তাই আমার মনে হয়, তোমার ভাগ্যে এ ধরণের কিছু যাতে না ঘটে সেদিকে আমারও লক্ষ্য রাখা দরকার। সেই দিক থেকেই বল্‌ছি।

দেবজ্যোতি একটু থেমে মন্দাকিনীর দিকে তাকালো, দেখল সে মন্দাকিনী তার দিকেই চেয়ে রয়েছে। তাকে থামতে দেখে মন্দাকিনী প্রশ্রয়ের হাসি এগিয়ে দিয়ে হেসে বল্‌ল—বেশ তো!

—হ্যাঁ। আব্দুল বলেছিল, পুরণো দিনের সম্পর্ক নিয়েই মল্লিক সাহেব আমাকে ডেকেছেন। এতদিন পরে—কথাটা নতুন। মুখের ওপর 'না'ও বল্‌তে প্যারি নি। গেলাম। আমাকে দেখেই হেসে দুটো হাত বাড়িয়ে দিলেন তোমার বাবা—'এস এস দেবু।' অনেকক্ষণ ছিলাম। উনি কেমন মৌন হয়ে মাটির দিকেই তাকিয়ে রইলেন। আধঘণ্টার মধ্যে মোট গোটা দশেক কথা হ'ল। কি জানি তবুও উঠে আসতে পারলাম না—অথচ আমার ত কিছুই বলবার ছিল না। অতক্ষণ ধরে সামনে বসে রয়েছি, কাজেই মানুষটার চেহারায় যে বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে সেটুকু নজরে পড়তে বাধ্য। চুলগুলো শনের মত শাদা হয়ে গেছে, পাত্‌লাও হয়েছে। বয়সের ছাপ ফুটে মুখে উঠেছে। গেঞ্জীর বাইরে দুটো হাতের মাংস শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে। একবার চোখ পড়ল স্যাণ্ডোর ভঙ্গীতে তোলানো ফটোটার দিকে—তফাৎ এত বেশি যে, মনেই হয় না ওই ফটোখানি এই মানুষটিরই!

মন্দাকিনী অধীর ভাবে বল্‌ল—উঃ, তোমার বর্ণনাটা একটু ছোটো করো, বক্তব্যটা শুনি! বাজে বকে কি কাজ!

দেবজ্যোতি ভাবনার মধ্যে থেকেই সাড়া দিল—হ্যাঁ, সেদিন আমারও ঠিক এই অবস্থাই হয়েছিল। না, এর চেয়েও কষ্টকর। বুঝে ত্যাখো, কত বছর পরে উনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। অথচ কেন যে ডেকেছেন সেটা মুখ ফুটে বল্‌ছেন না। ওই ভাবে আরও কিছুক্ষণ থাকতে হ'লে আমি হয়তো ছুটে বেরিয়ে আসতাম। যাক্‌, চা গরম সিঙাড়া আরও যেন কী কী এল! বল্‌লেন—'চা খাও দেবু!' দু'জনেই হাত দিলাম সিঙাড়াতে। এতক্ষণে একটা অবলম্বন খুঁজে পাওয়া গেল। বল্‌লাম—'আপনার সেই ফলের বারকোষ কোথায় গেল?' হাসলেন—'আছে। তবে ব্যবহার হয় না। আর কী হবে আয়ু বাড়িয়ে, গায়ের জোর বাড়িয়ে!' দু-জনে চোখাচোখি হ'ল। ওঁর সে পুরণো দৃষ্টিটুকুও নেই! শান্ত অবসন্ন চাহনী। হঠাৎ

বল্‌লেন, যেন বল্‌তে গিয়ে ভেঙে পড়লেন—'খুকীকে তুমি ফিরিয়ে এনে দাও দেবু!'

—কী বল্‌লে তুমি?

—তোমাকে যদি সে অবস্থায় পড়তে হ'ত তুমি কি জবাব দিতে মন্দা?

—সেটা পরে বল্‌ছি। আগে আমার প্রশ্ন, কাজেই উত্তরটা তুমি আগে দেবে ত?

—আমার নিজের ক্ষমতা না থাকলেও আমি বল্‌তে বাধ্য হ'তাম যে, চেষ্টা করব। আমি তা-ই বলেছি।

মন্দাকিনী বল্‌ল—মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—না, উনি রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন। তবে তাঁর অবস্থাটা অনুমান করা শক্ত নয়। তোমার বাবার মতো মানুষ যেখানে এইভাবে কথা বল্‌লেন, সেক্ষেত্রে তোমার মায়ের মন আরও ভেঙ্গে পড়াই স্বাভাবিক।

—এটা তোমার ভুল। কারণ মা কখনো মাথা হেঁট করেন নি, কারুর কাছেই নয়। বাবার সব অন্যায়ের বিরুদ্ধেই তিনি নীরব থেকে নিজের প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন। যদি বাবার মতের সঙ্গে ওঁর মতের সায় থাকতো, সেদিন ওঁকে নিশ্চয়ই দেখতে পেতে।

—তোমার মা-কে তুমি বেশি চেনো। কিন্তু কথা তা নয়—।

—কথাটা যে কী সেটা তুমি বোঝাতে পেরেছ, ভালো ভাবেই পেরেছ! কিন্তু একটু আগে জিগ্যেস করলে না, আমি হলে কি জবাব দিতাম? এবার সেটা শুনবে কি?

—না, আমার কথা এখনও বাকী রয়েছে। অনিরুদ্ধ মল্লিক আমাকে কোনো প্রলোভন দেখায় নি, চোখও রাঙায় নি—তার পরিবর্তে, কোনো মানুষ তার প্রিয় আত্মজনের কাছে যে ভাবে বেদনার কথা জানায়, সেই ভাবেই মন খুলে সত্যি কথাটি জানিয়েছে। অনিরুদ্ধ মল্লিক আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে মন্দাকিনী!

দেবজ্যোতির দিকে তাকিয়ে আঙুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে মন্দাকিনী বল্‌ল—ছাখো, তুমি মানুষকে ভালো বাসো, তোমার কথা আলাদা—তোমার

মতো সব মানুষকেই সহজ ক্ষমার দৃষ্টি দিয়ে দেখবার শক্তি আমার নেই। তাই যতো সহজে তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছ তত সহজে আমি পারছি না। যে মানুষটা হাজার হাজার মানুষকে এই ভাবে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, জীবনের প্রায় সবটুকুই যার মাত্র এই লক্ষ্যেই বদ্ধ, তার জন্যে আমার এতটুকু মমতা নেই। তুমি ত জানো জ্যোতিদাদা কী কষ্ট পেয়েছি! তোমাদের কুলীব্যারাক অথৈ জলে ভেসে যাচ্ছে দেখে আমি অসহায় ভাবে কেঁদেছি—কিন্তু উনি সেকথা শুনে আমার ওপর রাগ করেছেন। মিথ্যে স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন, সে ক ভুলতে পেরেছি? অমলাদির কথা ভাবো! নিজেদের অখণ্ড অত্যাচারকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে যারা অনায়াসে মানুষের প্রাণ নিতে পারে, তাদের ক্ষমা করা আমার সাধ্যের বাইরে। তারপর, ভাবো আমারই কথা! একমাত্র সন্তান আমি,—আমাকে সব ছেড়ে চলে আসতে হ'ল। কেন না, আমি ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করি। শুধু তাই নয়, কস্তুরবা মারা যাওয়ার পর এখানে হরতাল করতে এসেছিলাম, সে খবর পেয়ে আমার বাবা পাকা রকমের পুলিশের বন্দোবস্ত করে আমাদের দলকে জেলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। এ সব কি জীবনে ভুলতে পারবো কখনো?·· আজও এখানকার কুলীমহল্লায় কেরোসিনের বাতি জ্বলে, তাদের স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে ছাখো, তাদের শিক্ষার অবস্থা ছাখো, তাদের জীবন ধারণের দীন ভিখারীর মতো ব্যবস্থা ছাখো! কোথায় তিনি কি আত্মপরিচয় দিয়েছেন? কোন্ কারণে আমি মানুষের পক্ষ থেকে তাঁকে ক্ষমা করবো?

দেবজ্যোতি বল্‌ল—সবই সত্যি মন্দা, তবু—

—তবু কী! তুমি নিজে একজন সাধারণ শ্রমিক। আজ যদি তোমার বাবা না থাকতেন তাহলে কি অবস্থায় থাকতে হ'ত, ভেবে দেখেছ? না জ্যোতিদাদা, এর মধ্যে তবু নেই, কিন্তু নেই। তুমি আমাকে আর যা বলবে আমি বিনা দ্বিধায় তা মেনে নেবো, এই একটি ব্যাপারে আমাকে মাপ করো। আজ আমি যে দৃষ্টি পেয়েছি, তা একদিন তুমিই দিয়েছ। তোমার কাছ থেকে এই দেখার, বোঝার ধারা পেয়ে সত্যিই ধন্য আমি। তোমার সে দানের মর্যাদা আমি এভাবে নষ্ট করতে পারবো না।

—মন্দা, সেই আমিই তোমাকে অনুরোধ করছি, মানুষকে ভুল শোধরাবার সুযোগ দাও।

—ভুল যদি সত্যই শোধরায় তখন দেখা যাবে! আসুক সেদিন, আমি নিজে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করবো। কিন্তু আজও সংগ্রাম করতে হচ্ছে, কোম্পানী ত কিছুই সুযোগ-সুবিধে দিচ্ছে না, সে কথা তুমি নিজেও বলেছ।

—দীর্ঘদিনের অধিকারের মোহ কি এত সহজে কেউ ছাড়তে পারে?

—না পারলে বিরোধের মীমাংসাও হয় না।

—কিন্তু তুমি তাঁর মেয়ে।

—তার চেয়েও বড় কথা আছে, আমি মানুষ। তাঁর মেয়ে হয়েও যদি মানুষের মধ্যে থাকতে চাই ত আমার স্থান তাঁর প্রাসাদে হবার কথা নয়! দোহাই তোমার, আজকের এই রাতের মিষ্টি হাওয়াটাকে আমার মনে বাঁচতে দাও। এখানেই ও প্রশ্নের ইতি হোক!

দেবজ্যোতি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্‌ল—তাহলে তাঁকে বলাটা আমার মুখের কথাই রয়ে যাক, এই তোমার ইচ্ছে মন্দা?

ব্যথিত করুণ দৃষ্টিতে মন্দাকিনী আস্তে আস্তে বল্‌ল—তুমি কি তাঁকে কথা দিয়ে এসেছ যে, আমাকে তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেবেই?

—না, চেষ্টা করব বলেছি!

—তার আগে একটিবারও আমার কথা ভাবলে না! তোমার কাছে তাঁর বেদনাটুকুই বড় হ'ল?

—সে মুহূর্তে আমার আর কিছুই মনে পড়েনি। এখন বুঝতে পারছি খুব ভুল করে ফেলেছি। তোমার ওপর যে জোর খাটানো চলবে না, এটুকু বুঝি নি তখন।

দেবজ্যোতির মুখ থেকে কথাগুলো যেন চাবুকের মতো মন্দাকিনীর পিঠের ওপর আছড়ে পড়ছে—ওর চোখে-মুখে দুঃসহ যন্ত্রণার কাতরতা ফুটে ওঠে। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে মন্দাকিনী মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

কখন দেবজ্যোতির কথা থেমে গিয়েছে। কিন্তু মন্দাকিনী নিশ্চল যন্ত্রণার

প্রতিমূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখে কোনো কথা নেই। দেবজ্যোতিও কিছুক্ষণ ওর মুখের পানে তাকিয়ে থেকে এক সময়ে ঘাড় নামালো।

মন্দাকিনী অস্ফুট স্বরে বল্‌ল—তাহলে আমি যাই!

অভিমানাহত স্বরে জবাব দিল দেবজ্যোতি—সে তোমার ইচ্ছে।

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল, মন্দাকিনীর লাল শাড়ীখানা শিখার মতো কেঁপে উঠ্‌ল। অভিমান তারও কম হয় নি—তার চেয়েও বেশি বেজেছে ওর বুকে, দেবজ্যোতির নির্বিচার দাবি। অন্য সময় হ'লে মন্দাকিনী হয়তো দেবজ্যোতির সঙ্গে তর্ক করত, কিম্বা আবেদন দিয়ে নিজের পক্ষকে সমর্থনের চেষ্টা করত। কিন্তু এক্ষেত্রে যেন সে পথ বন্ধ করে দিয়েছে দেবজ্যোতি! মন্দাকিনীকে আঘাত দেবার জন্যেই যেন দেবজ্যোতি বলেছে—'তোমার ওপর জোর খাটানো চলে না, সেটুকু বুঝি নি!' সত্যিই কি তাই? এই দীর্ঘ দিনের আত্মনিগ্রহের মধ্যে দিয়ে মন্দাকিনী যদি নিজেকে না চেনাতে পেরে থাকে তবে কাজ কি দুটো মুখের কথা দিয়ে সেটা জানিয়ে?

নিঃশব্দে মন্দাকিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দেবজ্যোতি বাধা দিল না, চোখ তুলে তাকালো না, তার মনে তখনও নিজের কথারই পুনরাবৃত্তি চলেছে।

সাতষট্টি

—উঃ, তোমাদের আর কথা শেষই হয় না যে! যাক তবু আসতে পারলে—আমি ত ধরেই নিয়েছিলাম, মিথ্যে আমার জেগে থাকা!

দেবিকা ঠাট্টার সুরে আপন মনে বকে চলে।

মন্দাকিনী নিজেকে সামলাতে পারে নি এখনও, যেন সে চেষ্টাও ওর নেই। দেবিকার দিকে তাকিয়েই রুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌ল—মাথাটা কেমন করছে, আলোটা নিভিয়ে দেবে?

—মাথাটা তো মানুষেরই, না ধরলেই অন্যায় হ'ত!

বলে দেবিকা সুইচটা 'অফ্' করে দিল। তারপর বল্‌ল—তোমাকে কিন্তু আমার কাছে শুতে হবে মন্দাদি। ছোটদি অবিশ্যি বলেছিল, ওর বিছানাটা তোমার জন্যে ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে শোবে। কিন্তু আমি রাজী হই নি। ওর আর কী, বালিশে মাথা ঠেকাতে যা দেরী, অমনি ভোঁস-ভোঁস করে নাক ডাকাবে। এমনিতেই কেউ পাশে থাকলে আমার ঘুম হয় না, তার ওপর নাসিকা-গর্জন! বাব্বাঃ!

দেবিকা আশা করেছিল মন্দাকিনী একটা কিছু জবাব দেবে। কিন্তু ও পক্ষের নীরবতায় দমে গিয়ে বল্‌ল—শুয়ে পড়ো, আমি বরং একটু গুরুসেবা করি। জানো, আমি খুব ভালো মাথা টিপে দিতে পারি। বড় জামাইবাবু ত আমাকে দেখলেই মাথা বাড়িয়ে দেবেন। লোকটা এমনিতে মন্দ নয়, তবে বড় হ্যাংলা—কেবল গাল টিপবে, বুকের ওপর মুখ গুঁজে থাকবে।

অসহ্য বোধ হয় মন্দাকিনীর। কিন্তু কোনো কথা বল্‌তেও যেন রুচি নেই! দেবিকা ওর মাথায় হাত দিতেই বল্‌ল—থাক।

—কেন, থাকবে কেন? বড় জামাইবাবুর কথা শুনে রাগ করলে বুঝি?

—না, আমার মাথায় কেউ হাত দিলে কেমন শুড়শুড়ি লাগে। এমন ত কতোবার ধরে, আবার আপনিই কমে যায়!

একথায় হেসে উঠ্‌ল দেবিকা—বলো কি ভাই, তাহলে তুমি এক দেশের

কাজ করো কি করে? দিনরাত ত পুরুষদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হয়! আর ও জাতটাই কি রকম লোভী, একটু ফাঁক পেলেই হাত চেপে ধরে, কতো ভালোভালো কথা শোনায়! এতদিন রাজনীতি করছ, এখনো শুড়শুড়ি কাটাতে পারো নি!

মন্দাকিনী কোনো সাড়া দেয় না। ওর চোখের সাম্‌নে কয়েক মিনিট আগেকার পরিবেশটা এখনও জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

দেবিকার তাতে বিশেষ এসে যায় না, ও বলেই চলে—আমি আর ক মাসই বা পলিটিক্স করছি, এর মধ্যে খুব কম করে বারো-চোদ্দজন প্রাণের বাসনা উজাড় করে দিতে এসেছে। তা তোমার কিরকম লাগে বল্‌তে পারি না, আমার ভাই ওর মধ্যে তিন-চার জনকে খারাপ লাগে নি। ওদের ঠিক পোষা বেড়ালের মতো মনে হয়েছে। আর বড়জামাইবাবুর কথা অবিশ্যি আলাদা। —জানো মন্দাদি আজও ছোটদিকে উনি ভালোবাসেন, কিছুতেই ভুলতে পারেন নি। তবে বড়দিকে ভীষণ ভয় করেন ত—তাই। সত্যি—ওকী তুমি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

মন্দাকিনী বিরক্ত হয়ে উঠেছে, তাই বল্‌ল—তোমার পলিটিক্সের গল্প চল্‌লে ঘুম আর আসে কি করে!

—বুঝেছি রেগে গিয়েছ। থাক তাহলে ওসব বাজে কথা। আমি কেন বল্‌ছিলাম জানো, এই ত হচ্ছে পুরুষের পরিচয়। তাকে বিয়ে করলেই তুমি তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে বাধ্য। তবে এসব জেনেশুনেও যে তোমার মতো মেয়ে কেন বিয়ে করতে চায়, আমি বুঝতে পারি না।

অন্ধকারে কেউ কারুর মুখ দেখতে পায় না। মন্দাকিনী আস্তে আস্তে বলে—তা বটে, বিয়ে করলে মেয়েদের ব্যক্তিত্ব আর বজায় রাখা চলে না, সেকথা সত্যি। খুব সত্যি!

কথাগুলো বল্‌তে বল্‌তে ওর মনে দেবজ্যোতির কথাগুলো ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। বিয়ের আগেই দেবজ্যোতি ওকে ব্যক্তিগত অধিকারের আওতায় ফেলে বসে আছে। অনায়াসে অনিরুদ্ধ মল্লিককে ভরসা দিতে পেরেছে—মন্দাকিনীকে সে ফিরিয়ে দেবে তার পিতার কাছে! একবারও তার মনে হয় নি যে,

মন্দাকিনীর নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকতে পারে। এতদিন ধরে যে বিষাক্ত চক্রান্তের প্রতিবাদ নিয়ে মন্দাকিনী ছুটে-ছুটে বেড়িয়েছে, তার সমাপ্তি ঘটবে কি না দেবজ্যোতির অঙ্গুলি-সঙ্কেতে!

দেবিকা নিজের খুশীতে আর কি কথা বল্‌ছে, সেগুলো মন্দাকিনীর কানেও পৌঁছয় না। ও ভেবে চলেছে, নিজের নিগ্রহের কথা। এত নিগ্রহ কিসের জন্য? অনিরুদ্ধ মল্লিকের বেদনায় প্রলেপ দেবার জন্য কী! না, কি দেবজ্যোতির অনুরোধ রক্ষার জন্য? কই দেবজ্যোতি একটি বারও ত বল্‌ল না, মন্দাকিনী তুমি বিবেচনা করে দেখ। তোমার বিচার-বুদ্ধিতে যা ভালো বোঝো তাই করো! না কি দেবজ্যোতির নিজের শক্তির ওপর আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই কারখানার কর্তার সঙ্গে আপোষ করে, একটা শান্ত পারিবারিক নীড় রচনার জন্যই সে এই পথ ধরেছে? নাঃ, এটা মনে করা ঠিক নয়। আর যাই হোক, তার জ্যোতিদাদাকে অতো ছোট ভাবতে পারবে না মন্দাকিনী! তার আগে যেন ওর মৃত্যু হয়। তবে—তবে কি দেবজ্যোতি মন্দাকিনীকে মানুষ বলেই মনে করে না?

দেবিকা এবার ওর গায়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বল্‌ল—ঘুমোলে মন্দাদি!

কোনো সাড়া দিল না মন্দাকিনী।

চুপ করল দেবিকা।

রাত নিঝুম। খোলা জানালা দিয়ে পথের নিঃসঙ্গ আলোটা মন্দাকিনীর জাগ্রত চাহনীকে বার বার দেখছে। আজকের এই রাতটা যেন মন্দাকিনীর জীবনের সবকিছু ওলটপালট করে দিতে চায়! বিমুগ্ধ প্রিয়তমের বিবশ-বিহ্বল দৃষ্টির পাশে এক নিষ্ঠুর শাসকের রক্তচক্ষু কী যেন অস্থির দুর্নিবার জ্বালা ছড়িয়ে দিয়েছে মন্দাকিনীর সারা দেহে! দেহের আবরণ ভেদ করে অন্তরের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে সে যন্ত্রণা বিসারিত। জ্যোতিদাদা, জ্যোতিদাদা—তুমি আমাকে মানুষ হবার সোজা পথে পৌঁছে দিয়ে, কেন আজ উল্টে আবার ওই শয়তানের অন্ধ গুহার মধ্যে ঠেলে নিয়ে যেতে চাও? কেন, কেন, কেন?

সত্যি কি মুক্তি নেই! জোর করে তুমি আমাকে ওখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে? আমার সব কিছু মিথ্যে করে দিয়ে শুধু তোমার ইচ্ছের কপালেই

তিলক পরাতে হবে! নইলে তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না! নইলে তুমি বিশ্বাস করবে না যে, তোমারই অনুরাগে আমি সব বিসর্জন দিয়েছি!

কিন্তু তোমাকে আমি চাই। আজ যেমন বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছো তেমনি করেই তোমার কাছে থাকতে চাই—সে ত তুমি জানো! তবে কেন ওকথা বললে—কেন বললে যে, আমার ওপর তোমার কোনো জোর নেই! বলতে বলতে তোমার ওই প্রশান্ত সৌম্য মুখে ভয়ঙ্কর হিংসার ছাপ ফুটে উঠ্‌ল কেন? ওগো, তবে এত কথা, এত দুঃখ, স্বপ্নের জাল বোনা সব কি মিথ্যে? তুমি যে বলেছিলে, আমরা পাশাপাশি থেকে দেশের কাজ করবো! তুমি যে লিখেছিলে, তুমি শ্রমিক সংগঠনের কাজ করবে, আর আমি শিক্ষার দিকে ব্রতী হবো—এমনি করে মানিকপুরের মানুষকে আমরা আবার ফিরিয়ে আনবো—এ তোমারই কথা! সে সবই কি কথার ফুলঝুরি? আমি তবে তোমার ঘরণী হয়ে আর অনিরুদ্ধ মল্লিকের মেয়ে হয়ে জীবনের সব সাধনাতে জলাঞ্জলি দেবো—এই কি তোমার ইচ্ছে? দেবিকার কথাই তাহলে সত্যি!

মন্দাকিনীর পাঁজড় থেকে যন্ত্রণার মোচড় দিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস—বোধহয় ওর জীবনের কাতরতম দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল মন্দাকিনী। দেবিকা ঘুমিয়ে পড়েছে। নাসিকা-গর্জন দেবিকারও কম নয়। ঘরের দু'ধারে দুটি বিছানায় ঘুমে অচেতন দুটি মুখ আবছা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মন্দাকিনীর মন এখানে নয়। ওর দুচোখে একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রণার অভিব্যক্তি—পথের প্রহরী আলোটা বুঝি তা দেখতে পাচ্ছে! আস্তে আস্তে রাস্তার দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিল মন্দাকিনী। অন্ধকারে থাকলে হয়তো নিজেকে আর দেখতে পাবে না, এই দুশ্চিন্তাও ডুবে যাবে সেই আঁধারে!

তবু শান্তি নেই। কথাগুলো ঘুরে ঘুরে ওর চারদিকের বাতাসকে ঘিরে ধরছে। শুয়ে পড়ে চোখ বুজেও নিষ্কৃতি নেই। অধিকার নেই! মন্দাকিনীর ওপর দেবজ্যোতির অধিকার নেই?—নেই! তাহলে, তবে—তবে কি দেবজ্যোতির ওপরও মন্দাকিনীর অধিকার নেই? না, না, না! হ্যাঁ, তাই।

নইলে, দেবজ্যোতি একবার ডাকল না মন্দাকিনীকে! বল্‌ল না—'শোনো!' বল্‌ল না—'কি, চল্‌লে মন্দা!' কোনো কথাই বল্‌ল না? না, নেই অধিকার। অনেকক্ষণ ধরে মন্দাকিনী বিছানায় ছট্‌ফট্ করল। ইচ্ছে করছে দেবিকাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে ওর নাকডাকা বন্ধ করে দিতে।

সহসা সেই মধুর মুহূর্তের মনোরম ছবিটা ভেসে উঠল। যন্ত্রণার বিক্ষুব্ধ নিরাশ্রয় মহা-সমুদ্রে ওই একটি শাদা জাহাজ ভেসে চলেছে!

····· সত্যি তুমি কি সুন্দর! কত মধুর তোমার ও দুটি চোখের চাহনী! তোমার দু-হাতের আলিঙ্গনে আশ্চর্য পরম রমণীয় নিবিড়তা। আহা! তোমার বুকের কাছে এতো স্বস্তি তা ত এর আগে জানতে পারি নি! ওগো তুমি আমায় এমনি করে ধরে রাখো, ঘিরে থাকো আমার সবটুকুকে!······ মোহের অঞ্জনে মুহূর্ত যেন অমর চিরন্তনতার মায়াবতী রূপ নিয়ে মন্দাকিনীকে অবশ করে দেয়!

সমুদ্রের ঢেউএর মতোই মন্দাকিনীর মনে ভাবনার আলোড়ন শুরু হয়েছে।

···একান্ত সুখানুভূতির পরেই আবার ফিরে আসে সেই ঝড়ের ঝাপটা। দেবজ্যোতির অভিমানক্ষুব্ধ মুখখানা ওকে পুনরায় অস্থির করে তোলে।······ শয়তানের সঙ্গে সন্ধির অনুরোধ?—না, আদেশ! আর সে আদেশ দেবজ্যোতির! ভাবলেও মাথার মধ্যে দপ্ করে আগুন জলে ওঠে। এই জন্যেই মন্দাকিনী চায় নি দেবজ্যোতি কারখানার কাজে বিষিয়ে উঠুক! তবু জোর করে নি—কারণ দেবজ্যোতির ওপর ওর আস্থা ছিল অনেক বেশি! কিন্তু কী বিষ, উঃ! সেই দেবজ্যোতি—আজ কতো পাল্টে গিয়েছে! হবে না, মানিকপুরের হাওয়াতে যে বিষ রয়েছে!

মন্দাকিনীর চোখের সাম্‌নে জাহাজডুবি হচ্ছে। একটার পর একটা ঢেউএর ধাক্কায় শাদা জাহাজটা দুলে উঠ্‌ছে, টলে পড়ছে!—ও কী? সত্যিই কিছু নেই! জাহাজটা পারল না ঢেউএর আঘাত সহ্য করতে! ডুবে গেল? ডুবে গিয়েছে—! সাম্‌নে কিছু নেই, ঢেউ-এর পরে—শুধু ঢেউ, দিগন্তকে আচ্ছন্ন করে অপার অন্তহীন তরঙ্গের লাফালাফি। কিছু নেই—কোনো আশ্রয় নেই মন্দাকিনীর!

তবে কী দেবজ্যোতির আদেশই মাথা পেতে নিয়ে প্রথম শ্রেণীর সাহেব-বাংলোতে ফিরে যেতে হবে মন্দাকিনীকে? না।···তাহলে? প্রতিবাদ করলে দেবজ্যোতি বুঝবে না। নিজের অধিকার নিয়ে অভিমান করবে! বিষবায়ুতে নিয়ত যে শ্বাস নিচ্ছে, সে কি করে বুঝবে মন্দাকিনীর কথা? বুঝবে না দেবজ্যোতি। শেষে দেবজ্যোতির সঙ্গেও বোঝাপড়ার গলদ নিয়ে মীমাংসায় বসতে হবে—এ কথা মনে হ'তেই মন্দাকিনী সংকোচে, ঘৃণায়, দৈন্যের গ্লানিতে শিউরে উঠ্ল।—না, তাও পারবে না মন্দাকিনী।

তাহলে?

ভাবতে ভাবতে ওর সারাটা মন জীবনের প্রতি বিরূপতায় ভরে যায়।

এমন করে প্রতি পদে মালিন্যের ছোঁয়াচ বাঁচাতে বাঁচাতে কত কাল চলা যাবে? কি হবে এভাবে বেঁচে থেকে? নিতান্তই বাঁচবার জন্যে বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা আছে কি? জীবনের মূল্য কি দিন, মাস, বছরের অঙ্কে হিসেব কষা হয়? না, তার আলাদা হিসাব আছে? আছে।

চম্‌কে উঠল মন্দাকিনী। একটা সুন্দর জবাব খুঁজে পাওয়া গিয়েছে যেন! খুব কঠিন, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়—খুব লোভ হচ্ছে ওর। ওর মতো একটা জীবনের এমন অপরিণতিই যেন অনিবার্য, অবধারিত!···আজকের এই রাতে ওর জীবনের শেষচাঁদ দেখা। এর পর, পড়ে থাক সব কিছু। আর কিছু চায় না মন্দাকিনী, প্রিয়তমের বুকে নিজেকে সঁপে দেবার পরম সুখটুকু সম্বল করে এই পৃথিবীর কাছে বিদায় গ্রহণ করবে ও। সেই মুহূর্তেই ত সার্থক হয়েছে, ধন্য হয়েছে, মন্দাকিনী—'জীবনের স্বাদ নতুন করে পাই।' বলে যখন দেবজ্যোতি বিহ্বল তন্ময় দৃষ্টি মেলে ওকে দেখেছে! তারপর আর কি বাকী থাকে? এই ত ভালো। এর পর আর দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মান-অভিমানের হিসেব-নিকেশ নিয়ে কী হবে? ফিরেই যদি যেতে হয়, তবে এখনই যাবে মন্দাকিনী।

অনিরুদ্ধ মল্লিকের কোয়ার্টারে মন্দাকিনী প্রাণহীন দেহটা পৌছে দিয়ে দেবজ্যোতির কথা রক্ষা করবে। আর সেই সঙ্গে নিজের মর্যাদাও—!

ছবিটা মন্দাকিনীকে লোভে পাগল করে তুলল। ওর মন থেকে আর

সব মুছে গিয়েছে, পিতার প্রতি দুর্নিবার ঘৃণা ওকে উন্মাদ করে দিয়েছে। চরম আঘাত দিয়ে যাবে মন্দাকিনী। অনিরুদ্ধ মল্লিকের অজস্র অত্যাচারের ইতিহাসকে এমনি করেই চূড়ান্ত ভাবে স্তব্ধ করে দেবে মন্দাকিনী।

দেবজ্যোতির প্রতি করুণা হ'ল। কিন্তু তার চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে মৃত্যুর প্রতি আকর্ষণটা। মন্দাকিনীর বিশ্বাস হয়েছে, এর পর বেঁচে থাকাই তিলে তিলে অপমৃত্যু! আজ যদি মন্দাকিনী অর্ঘ্য দেয় নিজের জীবনকে, তাহলে দেবজ্যোতি কোনোদিনই অনিরুদ্ধ মল্লিকের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারবে না, বরং ঠিক তার বিপরীত মনোভাবই পুষে রাখবে। মন্দাকিনীও তাই চায়। এমনি করেই দেবজ্যোতির ব্রতকে, সংগ্রামকে শক্তিমান করে দিয়ে যাবে।

একবার নিজেকে প্রশ্ন করল মন্দাকিনী—আমি কি ভুল করছি?

নিঝুম রাতের সমস্ত স্তব্ধতা যেন প্রতিবাদের সাড়া তুল্‌ল—না, না, না।

ঘুমন্ত দেবিকার প্রতি কিছুক্ষণের জন্য ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল—হ্যাঁ, দেবিকা ঠিকই বলেছে। অধিকারের দুর্দম নেশাই পুরুষের প্রথম এবং শেষ দাবি! ওর ঘুমন্ত, শান্ত মুখখানা যেন মন্দাকিনীর এই সংকল্পকে সমর্থন জানাচ্ছে।···

আর নয়। এবার মন্দাকিনী যাত্রা করবে। শাড়ী—হ্যাঁ, নিজের শাড়ী-খানা গলায় কষে বাঁধবে। প্রথম যৌবনে যে কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে ডালে লাল ফুলের মেলা দেখতো মুগ্ধ ঔৎসুক্য দু-চোখে ঢেলে দিয়ে, সেই গাছে—সেই গাছেই মন্দাকিনী নিজেকে ঝুলিয়ে দেবে। রাঙা ফুল তো নেই এখন গাছে, ওর পরণের রাঙা শাড়ী সেই রঙেরই স্মৃতি হয়ে থাকবে। তারপর কি হবে? কি হবে, জানতে রুচি নেই মন্দাকিনীর। শবদেহের দিকে তাকাবার কথা কোনোদিন যে ভাবে নি, আজ সে কি পারে অনুমান করতে—কি হবে!

রাতের শেষ প্রহরে ওর চোখের দিকে তাকাবার কেউ থাকলে দেখতে পেত সে দুটি চোখে কি অপরিসীম ঔদ্ধত্য! সব কিছুকেই অগ্রাহ্য করবার মতো তীব্র, তীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতায় সুন্দর দুটি চোখ শিখার মত জ্বল্‌ছে।

বৈঠকখানার দরজাটা খুলে বাইরে বেরুবার সময় মন্দাকিনী মোটেই সতর্ক হয় নি, তবু কেউ টের পায় নি।

দেবজ্যোতির ঘর থেকে মন্দাকিনী চলে যাবার পর অনেকক্ষণ সেও জেগে বসে ছিল। বিছানায় যাবার আগে কতো বার পা বাড়িয়েছে মল্লিকাদের ঘরে যাবার জন্য—কিন্তু যেতে পারে নি, দেবিকার সামনে গিয়ে মন্দাকে কিছু বল্‌তে পারবে না, তাই যায় নি। মন্দাকিনী ব্যথিত হয়েছে ওর কথায়, সেটা টের পাবার পরও কেন দেবজ্যোতি একটু নরম হতে পারল না? কী এমন শক্ত কাজ সেটা? তা ছাড়া এখন যতই ভাবছে, দেবজ্যোতি ততই বুঝতে পারছে যে, তারই ভুল হয়েছে। মন্দাকিনীর পক্ষে সাহেব-বাংলোতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়—এটুকু আগেই বোঝা উচিত ছিল বই কি! আজকে রাতেই বা কেন এসব কথা তুলতে গেল সে? মন্দাকিনী সত্যিই সাধারণ মেয়ে নয়, ওর মর্যাদা ক'জন বোঝে? দেবজ্যোতির এখন সন্দেহ হচ্ছে, বুঝি বা সে নিজেও বোঝে না।·· নিরুপায়। আজ সারা রাতের মধ্যে ত ওকে কাছে পাওয়া যাবে না—নইলে দেবজ্যোতি ক্ষমা চেয়ে নিত। হ্যাঁ, তাই চাইত সে। কিন্তু রাতটুকু কষ্ট করে কাটাতে হবে তাকে—কাল প্রভাতে প্রথম দর্শনেই দেবজ্যোতি অকপটে নিজের ভুল স্বীকার করবে। আবার মনে হয় হয়তো মন্দাকিনী আবার ফিরে আসবে এ ঘরে! যদি আসে তাহলে বড় ভালো হয়। আশায় দেবজ্যোতি উৎকর্ণ হয়ে থাকে। এতটুকু শব্দ হ'লেই সে চম্‌কে ফিরে চায়!···এমনি করে কতক্ষণ কেটে যায়, কেউ আসে না! শুয়ে শুয়ে সে এপাশ-ওপাশ করছে, মন্দাকিনীর অভিমান-স্ফুরিত ওষ্ঠাধর দেখছে অন্ধকারের মধ্যে। নিজের কঠিন উক্তির জন্য বারবার আপনাকে লাঞ্ছিত করছে। এই ভাবেই একসময়ে পরিশ্রান্ত দেবজ্যোতি ঘুমিয়ে পড়েছিল। নইলে দরজা খোলার শব্দ সে ঠিকই পেত। মন্দাকিনীর গোটা জীবনটাই অসতর্ক মুহূর্তের পথ দিয়ে চলার আশ্চর্য যাদুকরী ইতিহাস! আর সে ইতিহাসে সংকল্পের শর কোথাও ব্যর্থ হয় নি—আজও হ'ল না।

আটষট্টি

পুরণো ইউনিয়নের বেশির ভাগ 'মুখিয়া' অর্থাৎ মুখ্যেরাই নতুন ইউনিয়নের হর্তাকর্তা হয়েছে। তবে এবার রামঅওতার সিং তার গরম গরম কথার দৌলতে প্রাধান্যের শীর্ষস্থানে পৌছে গেল। বিশেষ করে মহাবীর গুপ্তর মতো একজন নেতাকে পরাস্ত করার পুরস্কার স্বরূপ এই আসনটা তার 'হক' বলে একবাক্যে সবাই জোর গলায় জাহির করেছে।

কিন্তু রামঅওতারের অতখানি ভরসা নেই। সে বারবার নিজের দীনতার কথা জানাতে চেষ্টা করেছে। তাতে বিপরীত ফলই ফলেছে—সবাই ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ করে বলে, ওটা রামঅওতারের বিনয়। অথচ রামঅওতার নিজে ত ভালো করেই জানে, তা নয়। এরকম ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করলে কোনো সমাধান হতে পারে না, তাও সে বোঝে। অগত্যা তার একমাত্র ভরসাস্থল দেবজ্যোতিকে আঁকড়ে ধরে—ভাইজী, গুরুজী, তুমি এখন সামলাও। তোমার কথা শুনে আমি এই চক্করের ফেরে পড়েছি।

দেবজ্যোতি বিষণ্ণ হাসি হেসে হাত উল্টে বলে—আর কি, এবার সিধা শড়কে চল্‌তে থাকো। উঁচুতে চড়ে বস'।

দীর্ঘশ্বাসটা সে নিজের বুকেই দাবিয়ে রাখে।

—ওসব চল্‌বে না। তোমাকে মদত্ দিতে হবে।

—মদৎ, সে তো দিয়েই আছি। যেমন হুকুম করবে তেমনি চল্‌বো। তা ছাড়া মদৎ দেবার লোকের ত অভাব নেই।

রামঅওতার দেবজ্যোতিকে ভালোভাবেই জানে। তার বর্তমান মানসিক অবস্থার কথা যে দু-একজন জানে, রামঅওতার তাদের মধ্যে একজন। সব দিক থেকে বিবেচনা করে সে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছে যে, দেবজ্যোতকে কাজের মধ্যে ধরে রাখতে হবে—সেটাই তার পক্ষে সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। রামঅওতার মাথা চুলকে বলল—একটা পরামর্শ ছিল।

—বলো।

— ইউনিয়নের ত একজন প্রেসিডেণ্ট দরকার, তার কি করা যায়?

দেবজ্যোতি বল্‌ল—আবার কেন বাইরের লোক আনবে? তাতে কি সুবিধে?

—তাহলে কি করা যায়! তুমি প্রেসিডেণ্ট হতে রাজী আছ?

—মাথা খারাপ নাকি? লোকে মানবে কেন! তাছাড়া আমার যোগ্যতাই বা কী!

—যোগ্যতা ত পরে মালুম হয়। তবে মানামানির কথা যা বলেছ সেটাই আসল। তা কার নাম করতে পারো তুমি? আর বাইরের নামী লোক না হ'লে ত এই বুদ্ধু মজদুরদের বুঝ্-মান্ করানো যাবে না গুরুজী! তাই আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল। আমি একজনের কথা বল্‌তে পারি।

—বল্লেই ত হয়।

—আব্দুল বারি সাহেবের নাম শুনেছ ত?

—আমি কেন, অনেকেই তাঁকে জানে।

—আরে দাদা তুমি তো বল্‌লে ভালো—আমি এ্যায়সা বুদ্ধু যে এর আগে তাঁর কথা কিছু জানতাম না। এবার ছুটিতে মুল্লুকে গিয়ে এক পড়শীর কাছেই বারি সাহেবের কথা প্রথম শুনি। সে পড়শী টাটাতে নোকরী করে। সে-ই বললে যে, বারি সাহেব জবরদস্ত লীডার, বড়ি তেজবালা সাচ্চা আদমী। ব্যস!

—হ্যাঁ, ঠিকই, টাটানগরে উনি অনেক কাজের কাজ করেছেন—সাহসীও বটে, জানের পরোয়া করেন না। তাঁকে যদি প্রেসিডেণ্ট করা যায় ত খুব ভালো হয়।

রামঅওতার খুশীতে উদ্বেল হয়ে উঠ্‌ল—তাহলে কথাটা মুখিয়াদের সামনে উঠিয়ে দিই, কি বলো?

দেবজ্যোতি সায় দিল।

শ্রমিক মহলে নতুন উদ্যমের জোয়ার এসেছে! রামঅওতারকে তারা এখন সম্ভ্রম করে চলে। তার কথায় 'না' বলবার গরজ কারুর নেই। কথাটা

পড়তে না পড়তে সকলে সমস্বরে সমর্থন করল। আর সেই সুযোগে রামঅওতার জানাল যে, বারি সাহেব বর্তমানে টাটানগরেই রয়েছেন—ওখানকার ইউনিয়নের একটা বড় সভা রয়েছে আগামী কাল। অতএব আর বিলম্ব না করে আজই কাউকে সেখানে পাঠানো যাক। তাঁর সম্মতি আদায় করে নিয়েই এদিকের কাজে এগোনো যাবে।

সকলেই সম্মত।

অভিজিৎ সিং বল্‌লে—তাহলে তুমি একটা পত্র লিখে দাও, বারি সাহেবকে! সেই পুর্‌জা নিয়ে আমি দেখা করতে পারি।

অনেকেই অভিজিত সিংকে সুনজরে দেখে না। তাদের অনুমান, মল্লিক সাহেবের তাঁবেদারী করে অভিজিৎ সিং এখনও প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু সাম্‌নাসাম্‌নি সে সব কথা বলা অপ্রিয় কাজ। রামঅওতার বল্‌লে—বহুৎ আচ্ছা। আমি একটু ভেবে-চিন্তে গুছিয়ে লেখার কৌশিস্ করছি। আপনারা সবাই সেটা 'পাশ' করে দেবেন।

কারখানার ভেতরেই এসব কথাবার্তা হচ্ছে আজকাল। উপরওয়ালারা সব সময় দেখেও না-দেখার ভান করেন। চাকরী বাঁচাবার জন্য মাঝে-মাঝে হৈ-চৈ করেন, কিন্তু তার বেশি কিছু করতে ভরসা হয় না, প্রাণেরও মায়া আছে ত!

আব্দুল বারি সাহেবের কাছে অভিজিৎ সিংকে পাঠানোর ব্যাপার নিয়ে আড়ালে কেউ কেউ ভ্রূকুঞ্চিত করল। যারা বেশি গোঁড়া তাদের মধ্যে একজন বল্‌ল—এক কাজ করলেই ত হয়, ও শালা দালালের সঙ্গে দোসরা কাউকে ভেজে দিলেই ব্যাটা জব্দ হয়ে যাবে।

কিন্তু কে যাবে? কারখানা কামাই হবে। তা ছাড়া শুধু একদিনের মজুরী নষ্ট হয়েই যদি ব্যাপারটা না মেটে? এর জের যে কতদূর গড়াবে, কে তা বল্‌তে পারে? হয়তো নোকরীই খতম হয়ে যেতে পারে—কিছুই বলা যায় না ত!

অতএব অভিজিৎ একাই টাটানগর রওনা হ'ল। তাকে ট্রেণে তুলে দিয়ে সবাই নিশ্চিন্ত মনে ফিরল—যেন এতদিনের প্রতীক্ষিত সুদিন এসে পড়েছে

মুঠোর মধ্যে! কোন রকমে কালকের দিনটি কাটাতে পারলে পরশুই সব সংশয়ের অবসান ঘটবে।

রামঅওতার কিষণরামের ঘাড়ে হাত রেখে বল্‌ল—ভাই, ওসব দালালী জমানা বদল হয়ে যাবে, পুরণো ঝগড়ার ভেজাল পুষে রাখলে ত চলবে না। য্যায়সা নাকি ইস্পাত বনে, ওইসাই সাচ্চা সংগঠন বানাতে হবে। দেখলে ত অনেক, ধনীকে সাথ সাদী দোস্তী কভি নেহি বরাবর।—আরে তোমাকে আর কি বল্‌ব, নিজের মনকে পুছ্‌লেই মালুম হবে!

কিষণরাম তেওয়ারী হেসে জবাব দিল—দাদা তুমি বল্‌বে কি, আমি ত ভালোই বুঝেছি! ইমান্‌মে ইয়াদ, দালালী ঔর কভি নেহি।

দেবজ্যোতি স্টেশনে এদের সঙ্গে আসে নি। তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য রামঅওতার ছট্‌ফট্‌ করছে। কিষণরামের কথার মধ্যপথে ছেদ টেনে দিয়ে সে বল্‌লে—এই ত মেহ্‌মানের কথা। তুমি ভাই আগের সব কথা ভুলে যাও—আর যারা এখনো ভুল পথে চল্‌ছে, তাদেরও সম্‌ঝে দাও যে, মজ্‌দুরের কল্যাণ যদি চায় তবে কোম্পানীর দালালী ছেড়ে তারা এধারে চলে আসুক। তাতে তাদেরও ভালো হবে।

—জরুর। সব শালা হারামীকে সম্‌ঝে দিতে হবে।

হাসলো রামঅওতার—দেখো ভাই গরম হ'লে চল্‌বে না, তাতে উল্টো সম্‌ঝাবে। যাতে কথাটা বুদ্ধুদের মগজে যায় এমনি করে বল্‌তে হবে, তবেই বুঝবে!

কিষণরাম তাচ্ছিল্যভরে বল্‌ল—আরে তুম ছোড়ো পণ্ডিত, মিঠা সিধাসে কোই বুদ্ধু সম্‌ঝেগা নেহি। আমি ঠিক বল্‌ছি, যাতে কাজ হয় তাই করব।

—বেশ-বেশ! তাদের এটুকু বুঝিয়ে দিয়ো যে, এবার আমরা রামজীর কৃপায় সব্‌সে ইমান্‌দার নেতাকে আমাদের মাথার ওপর পাবো, আর,—আর জান দিয়ে মাঙ্‌কো পুরা করেঙ্গে! ব্যস।

অভিজিৎ সিং ফিরে এলো যথাসময়ে। তবে সে কারুর সঙ্গে একটি কথাও

কইছে না। তার মুখচোখের অবস্থা দেখে রামঅওতার উদ্বিগ্ন ভাবে প্রশ্ন করল—কী ব্যাপার ভাই, তোমার অসুখ-বিসুখ করে নি ত ?

রীতিমত রূঢ়স্বরে অভিজিৎ জবাব দিল—এই যদি তোমাদের মতলব ছিল ত ধাষ্টামো করতে পাঠালে কেন ?

কিষণরামের সঙ্গে অভিজিতের পুরণো দোস্তী, সেও অবাক হয়ে গিয়েছে—আরে বাহান্‌চোৎ দিল্‌লাগী রেখে সিধা বাতা ! ক্যা হুয়া ?

আলোচনা বৈঠক বসছে এক নম্বর পাওয়ার হাউসের মেশিন শেডে। অনেকেই এসে জুটেছে। সকলের সামনে অভিজিৎ এক অভাবনীয় কাণ্ড করে বসল। সে-দু-হাতে মুখ ঢেকে ছেলেমানুষের মতো ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। তার এই রহস্যজনক আচরণে সবাই মূক, স্তব্ধ!

রামঅওতার অভিজিৎকে একখানা টুলের ওপর বসিয়ে দিয়ে জটলাকারীদের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—ভাই সব, আপনা-আপনা কাজে চলে যান। সিংজী একটু সুস্থ হ'লে পরে সব আপনাকে বলবে। আর আপনাদেরও জানিয়ে দেবো কি হয়েছে ব্যাপারটা।

এমন একটা তাজা কৌতূহলের গন্ধ এ ভাবে মাঠে মারা যাওয়াতে বিশেষ কেউ খুশী হ'ল না, কিন্তু রামঅওতারের কথার ওপর কথা চলে না ত। তখনকার মত ভিড় হাল্কা হয়ে গেল।

রামঅওতার নরম সহানুভূতির সুরে বল্‌ল—একটু চা খাবেন সিংজী ?

—আর খাতিরে দরকার নেই ভাই। জীবনে এতবড় অপমান আমার হয় নি। আর এ ত আমার নয়, তামাম মানিকপুরের—মজ্‌দুর দুনিয়ার অপমান ! সে অপমান আপনারা কি করে করলেন রামঅওতার জী ? এর চেয়ে কেন আমায় ডাণ্ডা মেরে ফাঁসিয়ে দিলেন না একদম্‌ !

রামঅওতারের পাশে কিষণরাম তখনও দাঁড়িয়ে দেখছিল অভিজিতের কাণ্ড। এতক্ষণ পর্যন্ত তার মনে সন্দেহ ছিল যে, অভিজিৎ সিং পাকা খেলোয়াড়ের মতোই খাসা ছলনা করছে বুঝি বা ! কিন্তু অভিজিতের এখনকার মুখের চেহারা, কণ্ঠস্বরের বেদনার্তক অভিব্যক্তি, সব কিছুতেই অকৃত্রিম আর্তি ফেটে পড়ছে। কিষণরামও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল—আরে

ভাই কি হয়েছে সেটাই বলো তো! তোমার কথা যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

অভিজিৎ আবেগভরে আধঘণ্টা ধরে যা বল্‌ল তার মোটামুটি এই :

জাম্‌সেদ্‌পুরে পৌঁছে অভিজিৎ সিং অনেক চেষ্টা করেও বারি সাহেবকে ধরতে পারে নি। তিনি অনবরত এখান ওখান করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অবশেষে পরিশ্রান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে সোনেরি ময়দানে গিয়ে বসে পড়ল। সারাদিন স্নানাহার হয় নি, না হোক—সোনেরি ময়দানের সভাতে আব্দুল বারির সঙ্গে দেখা করে চিঠি দিয়ে অভিজিৎ জলগ্রহণ করবে, এই তার সংকল্প।

বিকেল হতে না হতে মাঠখানা মাথায় মাথায় ছেয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটার মতো ঠিক পাঁচটার সময় একখানা মোটরবাস থেকে নেতা নামলেন—জনতার মধ্যে বিপুল হর্ষধ্বনি! তিনি মঞ্চের দিকে এগোচ্ছেন, অভিজিৎ ভিড় ঠেলে সেদিকে ধাওয়া করল। একেবারে বারি সাহেবের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে চিঠিখানা তাঁর হাতে দিতে তিনি প্রশ্ন করলেন—'কি ব্যাপার?' 'মানিকপুর থেকে আসছি। ওখানকার ইউনিয়নের ভার আপনাকে নিতে হবে।' 'আচ্ছা, এখন বসো পরে কথা হবে।' বলে তিনি এগোতে এগোতে পার্শ্বস্থ একজনের হাতে চিঠিখানা দিয়ে বল্‌লেন—'দেখো তো গোপাল ইস্‌মে কেয়া হ্যায়!' গোপাল চলতে চল্‌তেই চিঠি শোনাতে লাগল। অভিজিৎ সিং পিছু পিছু চলেছে। চিঠি পড়া শেষ হতে বারি সাহেব বল্‌লেন—'ঠিক আছে, বহুৎ আচ্ছা!'

তারপর অবাক কাণ্ড! রামঅওতারের লেখা চিঠিখানা সমস্তই বারি সাহেব জনতাকে শুনিয়ে দিলেন। বল্‌লেন,—ভাইসব, এই টাটানগরের কাজ তোমাদেরই কাজ। আমি আছি তোমাদের সঙ্গে। তোমাদের মতো আরও একটা বড় কারখানার মজদুর ভাইরা আজ বিপদে পড়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। তাদের অবস্থা এখানকার চেয়ে অনেক খারাপ, সে খবর আমি রাখি, তোমরাও নিশ্চয় জানো। এখন কথা হচ্ছে যে, তোমরা তাদের পাশে দাঁড়াতে রাজী আছো কি না আমি জানতে চাই। তোমাদের সহায়তা না হলে তাদের এগোনো মুস্কিল। কী, তোমরা মানিকপুরের মজ্‌দুরদের সহায় হবে? মদৎ দেবে?

জনতা সায় দিল—জরুর পুরা মদৎ দেবে।

খুশী হয়ে বারি সাহেব বললেন—সাবাস! তাহলে বলো, আমি আজই মানিকপুরে রওনা হবো।

তারপর বারি সাহেব বক্তৃতায় কি বলেছেন না বলেছেন অভিজিৎ আর শোনেনি। খুশীর রোমাঞ্চে তার মন ভরে গিয়েছে। আজই যাবেন বারি সাহেব! আজই? কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

সভার পর অভিজিৎকে ডেকে বারি সাহেব বললেন—তোমার সঙ্গেই তাহলে আমি যাবো। তোমাদের চিঠি পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি। ঠিকই লিখেছ তোমরা।

অভিজিৎ বলল—আচ্ছা, তাহলে আমি এখুনি একটা তার করে দিই।

—হাঁ হাঁ! তোমাদের ওখানে সব তৈরী ত?

—জী, হাঁ।

অভিজিৎ টেলিগ্রাম করেছিল। কিন্তু মানিকপুর স্টেশনে সে যখন নামল তখন কাউকে দেখতে না পেয়ে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে রইল! একটি মানুষও কি মানিকপুরে নেই?

বারি সাহেব ট্রেণ থেকে নামেন নি—অভিজিৎ তাঁকে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে পারে নি। কী জবাব দেবে সে? তোমাদের আমন্ত্রণে নেতা এসে ঘরের দোরে দাঁড়ালেন, তোমরা যদি ঘুমোও, তিনি কি বুঝবেন যে এরা জেগে আছে, এরা তাঁকে চায়? অভিজিতের চোখের সামনে ট্রেণখানা বারি সাহেবকে নিয়ে বাঁশী বাজিয়ে চলে গেল।

রামঅওতার সব শুনলো। তারপর বলল—হায়-হায়! আপনি আসছেন এই ভেবেও যদি স্টেশনে যেতাম তাহলে ঠিক তাঁর পা জড়িয়ে ধরে নামিয়ে আনতাম আমি। কিন্তু সিংজী, কিছুই যে জানতে পারি নি। টেলিগ্রাম পেলে হাজারো লোক মালা নিয়ে খাড়া হয়ে থাকতো ইষ্টিশানে।

অভিজিৎ আকাশ থেকে পড়ল—টেলিগ্রাফ পান নি?

কিষণরাম বলল—আরে 'তার' পেয়েও আমরা কেউ হাজির হলাম না, এটা তুমি ভাবতে পারলে সিংজী!

—সে কী! আমি যে আর্জেণ্ট তার করেছি তেওয়ারী ভাই!

রামঅওতার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌ল—কোম্পানীর মেশিনারী বড় তেজ চল্‌ছে! ও আর দেখতে হবে না, পোস্টাপিসেই তার রুখে দিয়েছে। আচ্ছা ভাই দেখা যায়েগা, উস্কা সওয়াল পিছে হোগা! আব্‌ শোচো কিস্‌ রাস্তে সে চল্‌না।

কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ঘুমোচ্ছে না একথা সবাই জানলেও এটা অনুমান করতে পারে নি যে সরাসরি পোস্টঅফিসের টেলিগ্রাফটাও গায়েব করে দেবে ওরা।

রামঅওতার অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করল অভিজিৎ সিংকে। অবশেষে বল্‌ল—আচ্ছা ভাই, তাহলে বারি সাহেবকে আনবার জন্যে আর একবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তিনি যা খাতিরদারির নমুনা দেখে গেলেন, তাতে কি সহজে এমুখো হবেন?

দ্বিতীয় শিফ্‌টে দেবজ্যোতি কারখানাতে ঢুকেই খবরটা পেল। তাদের সেক্‌শনের ফোরম্যান থেকে শুরু করে সকলেই বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এতবড় অত্যাচারের বিচার করনেবালা কেউ নেই?

দেবজ্যোতি নিজের কাজ করতে লাগল এক মনে। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, একটু পরেই রামঅওতার এসে হাজির—ভাইজী, গুরুজী!

আর্মেচারের দিক থেকে দৃষ্টিটা তুলে আগন্তুককে দেখে দেবজ্যোতি হাসলো—শুনেছি দাদা, বলুন এখন কি করা যায়!

—আরে সেই কথাই ত পুছ্‌তে এলাম। বারি সাহেব ভারি গোসা হয়েছেন।

—এতে কি খুশী হয় কেউ সিংজী?

—কিন্তু তাঁকে খুশী করার উপায়টা এখন চাই যে গুরু।

—কি করবেন? কিছু ভেবেছেন?

অভিজিৎ বল্‌ল যে, বারি সাহেব গিয়েছেন আসানসোল, সেখান থেকে জসিডি যাবেন, তারপর টাটা হয়ে পাটনা ফিরবেন। তাঁর তবিয়ৎ খারাপ—বুখার রোজই হচ্ছে। একবার পাটনা গিয়ে বসলে, তখন তাঁকে টেনে বার

করা শক্ত হবে। তাই ভাবছিলাম যদি আজই কেউ জসিডি রওনা হয়ে যেত। সেখানে গিয়ে যেমন করে হোক বুঝিয়ে—আর বোঝাবার কীই বা আছে, কোম্পানী 'তার' গজব করে দিয়েছে, এ ত বেশ মালুমই হচ্ছে। তা সত্যি কথা বললে কি বারি জী বুঝবেন না ?

দেবজ্যোতি বল্‌ল—এ ছাড়া আর উপায়ই বা কী ? তা আমি বলি কি, কাজটা ত খুব সোজা হবে না! আপনি নিজে যেতে পারলেই ভালো হয়—আপনাকেই যেতে হবে।

রামঅওতার মাথা হেঁট করে একটু ভেবে নিয়ে বল্‌ল—ঠিক আছে, আমিই যাবো। একটা কথা, আপনার ভাবীজীর ক'দিন জ্বর হচ্ছে। একটু দেখাশুনো করবেন—ব্যস, তাহলে আমি তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ি।

দেবজ্যোতি বল্‌লে—জ্বর ? কই বলেন নি তো কিছু!

—আরে ভাই, মামুলি ম্যালেরিয়া, ওর আর বলবার কি আছে ? যা মচ্ছড়,—আবার পাশে-পাশে লাইনের সব লোকই দু'চারটে গরু-মোষ-ছাগল পুষছে। ঘরে আর গোশালাতে ফারাক তো থোড়াই! সে যাক, আপনি হচ্ছেন ছোটো ভাই, না বল্‌লেও দেখতেন আপনার বৌদিদি বুঢ়িয়াকে। বড় আফ্‌শোস হচ্ছে গুরু, এই ভাবে দেওতা এসে ফিরে গেলেন। হায়-হায়!

দেবজ্যোতি হাসলো—ঘাব্‌ড়ালে ত চল্‌বে না রামঅওতারজী! এরকম হরদম ঝড়-ঝগ্‌ড়া আসবে, সেসব ডিঙিয়ে যেতে হবে।

—জরুর!

রামঅওতারের চোখ দুটো জ্বলে উঠ্‌ল। দেবজ্যোতির চোখও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

জসিডি স্টেশনে গাড়ি থেকে নেমে রামঅওতার বুঝলো, শীত বেশ পড়েছে! তাড়াহুড়ো করে মানিকপুর থেকে বেরুবার সময় মনেই পড়ে নি যে, একটা কম্বলে দু-কাজ হবে না। কাজেই একটা কোণ বেছে নিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে সে বসে রইল কম্বল মুড়ি দিয়ে। এখন রাত তিনটে—বাকীটুকু বসে বসেই কাটাতে হবে। যা ঠাণ্ডা, একটা বিড়ি ধরাতে পারলে

দু-টান দিলে, গা-টা একটু গরম করা যায়। কিন্তু পকেটে বিড়ি থাকলেও দেশলাই নেই।

অগত্যা এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো রামঅওতার। যদি কারুর মুখে বিড়ি ধরানো জোনাকি আলো দেখা যায় ত সমস্যাটা মেটে। বেশি দূর নজর দিয়ে জরীপ করার দরকার হ'ল না। রামঅওতারের খুব কাছাকাছিই একটা বিড়ি ধরানো মুখ রয়েছে।

সে গলাটা একটু ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বল্‌ল—শালাইটা একবার দেবেন?

—হুঁ!

বলে পাশের লোকটি পকেট থেকে দিয়াশালাই বার করে একটা কাঠি জ্বালিয়ে হাত এগিয়ে দিল। এতটা আশা করে নি রামঅওতার। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বিড়ি বার করতে করতে অগ্নিদাতার মুখের পানে তাকিয়ে সে চম্‌কে উঠ্‌ল। চমকের চেয়ে ঢের বেশি জোরে ধমক দিল রামঅওতার—এখানে কেন এসেছো? শালা বেঈমান!

কাঠিটা জ্বলে-জ্বলে নিভে গেল। অন্ধকার।

আবার আর একটা কাঠি জ্বালিয়ে এগিয়ে দিয়ে লোকটি বল্‌ল—আরে দাদা, আগে ত বিড়ি খাও! চেঁচামেচি করো পরে। উঃ, এত শীত এখানে কে জান্‌তো! তোমার ত তবু মোটা একখানা কম্বল আছে, আমি আবার তাও আনি নি।

রামঅওতার একটা বিড়ি ধরালো। শুধু যদি গা-গরম করার জন্যেই বিড়ি ধরাবার প্রয়োজন হয়ে থাকে তবে সে কাজ আগেই হয়ে গেছে—ওই সি-আই-ডি'-র লোকটিকে দেখে। মানিকপুরে হামেশা রামঅওতার একে দেখে থাকে। দু-জনেই পরস্পরকে চেনে। কিন্তু আজ জসিডি স্টেশনেও এভাবে ওকে পাশে বসে থাকতে দেখে রামঅওতারের কান-মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠেছে। সে বল্‌ল ছাখো—হারামীকে খোপ্‌রী, এখানে তোমার কোন বাবা বাঁচাতে আসবে না। ধরে যদি আচ্ছাসে ধোলাই দিই, কেমন হয়?

লোকটি কিন্তু আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা মেজাজে জবাব দিল—অতো চটছো কেন

দাদা! আমি তোমার কোনো ক্ষতি করেছি কি? এই যে মুখেমুখে আগুন জুগিয়ে দিলাম, আমি না থাকলে কে দিত বলো!

—ওসব মিঠে কথায় আমি ভুলি না। আচ্ছা ভাই, এভাবে আমাদের পিছনে লেগে আমাদের ক্ষতি করে কি লাভ তোমার? বয়েস ত কম হয় নি, বোঝো তো, দেশের লোক হয়ে দেশের শত্রুতা করাটা কতখানি গুন্‌হা!

—সবই বুঝি। কিন্তু দাদা! তোমাদের ক্ষতি যেটুকু হবার তা কি আমি ঠেকাতে পারতাম? পেটের দায়ে করতে হয়। তবু যেটুকু পারি তোমাদের বাঁচিয়েই যাই। তবে হ্যাঁ, চাকরী রাখার জন্যে কিছু কাজ ত দেখাতেই হবে!

—আর কোনো ভালো কাজ পেলে না? শেষে টিক্‌টিকি হয়েই এই জিন্দগীটা বরবাদ করলে!

—এটা কম হ'ল কিসে? দেখ না, তোমাকে কেমন গার্ড দিচ্ছি! জানের জামিন আর কাকে বলে দাদা!

রামওতার যতোই কঠিন হতে চায়, এ লোকটা ততোই যেন হাল্কা-মিঠে কথায় গাম্ভীর্য ফিকে করে চলে। শেষ পর্যন্ত আর তিক্ততা বজায় রাখা চল্‌ল না। লোকটা হয় দস্তুর মতো রসিক অথবা অগাধজলের শয়তান! যাই হোক, আপাততঃ মন্দ লাগছে না। সে বল্‌লে—ত্থাখো দাদা, মিছে কেন রাগারাগিতে মেজাজ নষ্ট করবে? আমাকে দোস্ত বানিয়ে নাও না! তাতে লাভ বই লোকসান নেই। বরাবর নিরাপদে কাটিয়ে দিতে পারবে—একবার দোস্তী হয়ে গেলে পর তোমার ক্ষতি হয় এমন কাজ আমি ত করতেই পারবো না। তুমি নিশ্চিন্দি। আর আমিও রিপোর্টটা-আশটা দিয়ে খালাস।

—হুঁঃ!

বলে রামঅওতার আরো দুটো বিড়ি বার করে একটা টিক্‌টিকিকে দিল। লোকটি পরমানন্দে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বল্‌ল—তোমার কম্বলের একটু আঁচল মেলে দাও না দাদা, বড্ড ঠাণ্ডা।

এরকম নির্লজ্জ লোককে কতক্ষণ আর ঠেকিয়ে রাখা যায়?

এক সময়ে লোকটি বল্‌ল—মিছেমিছি এখানে কেন এলে? তোমার মক্কেল এখানে নেই। চলো সকালের ফিরতি গাড়িতে মানিকপুরে চলে যাই।

অবিশ্বাসের সুরে রামঅওতার জবাব দিল—তোমার কথায় কে বিশ্বাস করে? দরকার থাকে তুমি চলে যাও।

—এই দ্যাখো দোস্তের কথা শুন্‌ছ না, পরে পস্তাতে হবে। আরে দাদা, বল্‌ছি যা শোনো, বারি সাহেব জসিডিতে নেই।

—তবে কোথায় আছেন?

—দেওঘর গিয়েছেন। তাঁর শরীর খুব খারাপ, জ্বর বেড়েছে।

কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে ভরসা হ'ল না রামঅওতারের—টিকৃটিকির ওপর নির্ভর করার দরকারই বা কি? সকালে সে স্থানীয় কংগ্রেসের অফিসে খোঁজ করে ফিরল, তখনও লোকটির সঙ্গে স্টেশনে দেখা হয়ে গেল। সে মুচ্‌কি হেসে বল্‌ল—কী, দেখা হ'ল? খামোখা গেলে! তোমাকে হয়রানি থেকে বাঁচাতে চাইলাম। তবু ঝুটমুট ঘুরলে। এখন বুঝি বৈজ্‌নাথ ধাম যাচ্ছ? চলো চা খাওয়া যাক্।

রামঅওতার দেওঘর কংগ্রেস অফিসে গিয়েও বারি সাহেবের খোঁজ পেল না। সেখানে তিনি যান নি, তবে দেওঘরেই তাঁর কোনো বন্ধুর বাড়ীতে গতকাল এসেছিলেন—আজ ভোরেই রওনা হয়ে গেছেন—খুব সম্ভব দুম্‌কাতে।

অতএব রামঅওতার দুম্‌কা যাবে। বাস-স্ট্যাণ্ডে ইন্‌ফর্মারটির সঙ্গে দেখা হ'ল। রামঅওতার হেসে ফেল্‌ল—আরে ইঁহা ভি তুম!

সেও হেসে জবাব দিল—আরে দাদা, দেওঘরে পা দিয়েই আমি জেনে গিয়েছি, বেকার তুমি ঘুরবে। তা তখন আর বারণ করি নি। জানতাম যে, বল্‌লে ত বিশ্বাস করবে না। তা এখন দুম্‌কা যাচ্ছ তাহলে? আমি যাবো না, বুঝলে? যে কটা টাকা বাঁচে সেটুকুই ভালো।

—তুমি জানো ঠিক উনি দুম্‌কা গিয়েছেন?

—হাঁ দুম্‌কা গিয়েছেন। শোনো, তোমাকে ত এই পথেই ফিরতে হবে। আমি রয়ে গেলাম।

—বেশ-বেশ, রহো ভাই, আরাম করো। আবার দেখা হবে।

—আলবৎ আমার গরজে। তবে এরপর তুমি আমাকে দোস্ত ভাবলে খুব খুশী হই। তাতে আমার ঘোরাঘুরি ও পয়সা অনেক বেঁচে যাবে। আর মাইরি

বল্‌ছি, তোমারও লোকসান নেই। বুঝলে না, পেটের দায়ে একাজ করতে হয়। নইলে কি গরজ তোমাদের শাপ্‌মন্যি কুড়িয়ে?

রামঅওতার হাসিমুখে বাসে উঠ্‌ল।

তার দুম্‌কা যাওয়াও ব্যর্থ হ'ল। বারি সাহেব অসুস্থ অবস্থাতেই দুম্‌কা থেকে পাটনা যাত্রা করেছেন। এখন সেখানেই তিনি থাকবেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রামঅওতারকে ফিরতে হ'ল। পকেটের পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে, আর ছুটিও খতম। অতএব এ যাত্রায় এর বেশী কিছু হ'ল না। মন-মেজাজ তাব খুবই খারাপ।

কোম্পানীর কারচুপিতে তাদের এই দুর্ভোগ! অভিজিতের টেলিগ্রামটাকে আট্‌কে দিয়ে কতখানি ক্ষতি যে করেছে ওরা, তার হিসাব এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। বারি সাহেব যদি আসেনও, তাহলে সে কবে, কে জানে!

দীনদয়াল কয়েক মাস ভুগেভুগে একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। হাসপাতালের ভরসা তিনি কোনোদিনই করেন না। তবে তরুণ ডাক্তারদের চিকিৎসার ওপর কিছু আস্থা ছিল, এবারের অসুখে তাও ঘুচে গেছে। একমাত্র মিণ্টুর সেবাশুশ্রূষার জোরেই যেন তিনি টিকে রয়েছেন!

ওষুধপত্রে, সংসার-খরচে হাত শূন্য হয়ে গেছে। মাসের পর মাস বিনামাইনের ছুটি চল্‌ছে। এ ভাবে আর বেশী দিন চলবে না। কোন দিন হয়তো কোম্পানীর পরোয়ানা আসবে, your service is no longer required—আর তোমার কাজ করে দরকার নেই। খতম! অতএব পাওনাপত্র বুঝে নিয়ে কোয়ার্টার ছেড়ে বিদায় হও। খোলা জানালা দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছে। সকাল এখন আট কি সাড়ে আটটা হবে! সেদিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন দীনদয়াল—জীবনের কাছ থেকেই বিদায় নিতে চান তিনি। কিন্তু তার আগে মেয়ে দুটিকে পার করে যেতে পারলে ভালো হতো। আপন মনেই হাসেন তিনি। মনটা কত গুটিয়ে গিয়েছে! এক কালে দেশের ভাবনা নিয়ে যে মন মাতামাতি করেছে, যে চিন্তার উত্তেজনায় বহু [illegible]নিদ্র রাত্রি পার হয়েছে—সেই দেশের চিন্তা ত কই মনকে আর এতটুকু নাড়া দেয় না! দেশ

থেকে মন এসে কেন্দ্রিত হ'ল মানিকপুরের কারখানাতে—দেশ বাদ দিয়ে নয়, দেশের একটি খণ্ডের ওপর তাঁর কাজ আর চিন্তা জোর দিল। তাই নিয়ে বছরের পর বছর চল্‌ল। আজ সে সবও যেন অন্য লোকের অন্য জীবনের ছবি! এখন দীনদয়াল যেন শুক্‌নো খোশা!

মিণ্টু এসে তাঁর মাথায় হাত বুলিযে দিতে দিতে বল্‌ল—বাবা! ছানার জল এখনও পড়ে রয়েছে? ওই জন্যে তোমাকে না খাইয়ে ওদিকে যেতে চাইনি।

—আর কি হবে মা? এবার গরুটাকে বিদেয় করে দে! পাঁড়ে ত এক টাকা দিতেই চায়।

—তোমাকে সে ভাবনা ভাবতে হবে না। নাও এটুকু খেয়ে ফ্যালো।

—হ্যাঁরে, আজ সকালে অমল এসেছিল, না

—হুঁ!

—হুঁ, তা আমার কাছে এল না কেন?

—তাঁর ডিউটির দেরী হয়ে যাবে। তাই—

—তাও ত বটে! ডিউটি—। আর ডিউটি না থাকলেই বা কী, আমার সঙ্গ কেউ চায় না, বুঝেছি।

—তোমার যেন কি হয়েছে! সব সময়ে ওই এক কথা। অথচ লোক-জন আসার ত কামাই নেই। বিকেল থেকে রথদোলের ভিড়—ঘরে ঢোকাই দায়, তবু তুমি কি করে যে ভাবতে পারো!

—কি জানি মা। মনে হয়, বুঝি এই বুড়োটা সবারই বিড়ম্বনা! আসলে নিজেকেই ভালো লাগে না। তা হ্যাঁরে, সকালবেলা অমল কি জন্যে এসেছিল?

—দরকার ছিল, ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

—দরকার! কি দরকার—সেটা বুঝি আমাকে বলা চলে না। না। থাক, অত টিক্‌রি-টিকির করি কেন? টাকা-পয়সা বুঝি?

মিণ্টু গম্ভীর হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বল্‌ল—নাও, এটা খেয়ে নাও।

—বাজে খরচ কমিয়ে ফ্যালো মা। আমার কথাটা শোনো! তখন শ্রাবণে বিয়েটা চুকে গেলে কত ভালো হ'ত—তা তোমাদের কথা শুনে এই

াভ হ'ল যে, আমি আরও অক্ষম হয়ে পড়লাম। তখন তবু তো চলাফেরা করছিলাম।

—বাবা!

—ও। না, বৃথা খেদ করে কি হবে? তিনি যা করাবেন তাই ঠিক। ঠিক কথা। দাও তবে ছানার জলটা খেয়ে ফেলি।

আঁচল দিয়ে দীনদয়ালের মুখ মুছিয়ে মিণ্টু বল্ল—আজ যেন চোখ-মুখের চেহারা তোমার অনেকটা ভালো। বালিশে ঠেস দিয়ে বসবে?

—দাও। হ্যাঁ ছাখো মা, একটা কথা, শোনো।

মিণ্টু নিজের কাজ করতে করতে পিতার মুখের দিকে একবার তাকালো।

দীনদয়াল বল্লেন—অমলের ওপর বেশি বোঝা চাপিয়ো না। কতই বা মাইনে পায়, সেদিন বিয়ে-থা করে সংসারে জড়িয়েছে। নেহাৎ ভালোমানুষ সে, নিজের অসুবিধের কথা কস্মিনকালেও বল্বে না। অথচ, আমার জন্যে আর কারুকে ভুগতে হচ্ছে এটা ভাবলেও মৃত্যু ইচ্ছা হয়। তাই বল্ছি, এই ফলটল, দুধটুধ, ওযুধপত্তর এসব পাট চুকিয়ে দাও। অনেক ত করে দেখলে। কিছুতেই কিছু হবার নয়, অদৃষ্ট আর ভগবান রয়েছেন!

মিণ্টু জবাব দেয় না। এ কথাগুলো শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে ও। প্রথম প্রথম অন্তরালে দু-এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলত—এখন আর সেটুকুও দরকার হয় না, এমনিতেই সামলে নিতে পারে। নিজেকে সামলে নিয়ে পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে কাজের অছিলায় রান্নাঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল মিণ্টু।

মনের সহনক্ষমতা দেখে এক এক সময়ে মিণ্টু নিজেই বিস্মিত হয়ে যায়। একদা দেবজ্যোতির ঔদাসীন্যের চরম আঘাতে ভেবেছিল বুঝি ও আর সাম্‌লাতে পারবে না! কিন্তু কই কিছু ত হ'ল না? জীবন যেমন ছিল তেমনিই রইল। মাঝে মাঝে বুকের ভেতর দম-বন্ধ হয়ে আসার তীব্র দুঃসহ যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই হ'ল না। সে যন্ত্রণার তীব্রতাও ক্রমে মন্দীভূত হয়ে এল। মিণ্টু নিজেকে নূতন বর্মে ঢেকে নিয়ে বিয়ের জন্য তৈরী হচ্ছিল। বাকী জীবনটা এমনি একটা সহনশীল ভোঁতা অভ্যাস দিয়ে কাটিয়ে যাবার

সংকল্প। এ ছাড়া অন্য রাস্তা ওর মতো সাধারণ বিয়ের মেয়ের জন্য খোলা থাকবার কথা নয়।

না, ওকে ঘিরে অবাঞ্ছিত কোনো চাঞ্চল্য উঠ্‌বে, এটা ও কখনই চায় নি। সে বড় লজ্জার ব্যাপার। নিজের জন্য তুনিয়ার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে মিণ্টু প্রস্তুত নয়। ওর আপন কথা সে শুধু একান্তই আপনার জন্য। তা নিয়ে গলাবাজি করা যেন স্বকীয়তার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া। তাই যখন মন্দাকিনীর কথা মনে পড়ে তখন খুব অস্বস্তি বোধ করে মিণ্টু। কেন? কেন এমন কাজ করল মন্দাকিনী? কিসের অভাব ছিল তার? কি তুঃখ ওকে পৃথিবীর মুখে এই কলঙ্ক-কালিমা দিতে বাধ্য করল? দেবজ্যোতির প্রণয়ের দৈন্য? না অন্য কিছু? সঠিক উত্তর ও খুঁজে পায় না। অনেক সম্ভব-অসম্ভব প্রশ্ন মিণ্টুর মনে ওঠে। এর উত্তর আর কাউকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নেবার মতো রুচি নেই ওর। কেউ বল্‌তে ত দেবজ্যোতিই—তাকে একথা কেন, কোনো কথাই মিণ্টু জিজ্ঞাসা করতে চায় না। নিজে থেকে যদি কোনোদিন দেবজ্যোতি বলে তখন শোনা যাবে। তা কি দেবজ্যোতি বলবে? তেমন কোনো সম্ভাবনার কথা কল্পনা করতে ভরসা হয় না মিণ্টুর। ভরসা ওর কিছুতেই নেই আর। কল্পনার আকাশ অন্ধকারে মুখ ঢেকেছে অনেকদিন। অনেক দিন কি? সে কি অনেকদিনের কথা—যেদিন অমলার চিঠিতে সব কথা স্পষ্টভাবে জানতে পারল মিণ্টু! সূর্যচন্দ্রের উদয়াস্ত হিসেব ধরলে কতদিনই বা হবে, এক বছরও নয়। তবু যেন মনে হয়—সে কতকালের কথা!

রান্নায় তেমন গা নেই। তু-বোনের জন্যে এই ঝকমারি ভালো লাগে না।

বাদলটা যেন কী! কোথায় উধাও হয়ে গেছে—বলা নেই, কওয়া নেই, ওদের এই তুরবস্থায় ফেলে নিরুদ্দেশ হ'ল! অথচ সেকথা বাবার কাছ থেকে গোপন রাখতে হচ্ছে। দিনের পর দিন বাবার কাছে মিথ্যের জাল বুনে চল্‌তে হচ্ছে। নিরুপায় হয়ে মানুষ অনেক মিথ্যাকেই সত্যের ছদ্মবেশ পরায়, কিন্তু এমন কাজ মিণ্টু এর আগে কখনও করে নি। ছি-ছি-ছি!···

পোড়া গন্ধ নাকে এসে লাগতে মিণ্টু চম্‌কে উঠে ভাতে বেশ খানিকটা

জল ঢেলে দিল। ইস্, হাঁড়ির তলাটা এতখানি ধরে গেল—! নিজের উপর বিরক্ত হয়ে মিণ্টু কাজ করতে লাগল! না, এভাবে ভাবনা-বিলাসে নষ্ট করবার মত অবকাশ ওর নেই। দীপু ফিরবে জমিদারী ম্যানেজারের দুটো ছেলেমেয়েকে পড়িয়ে। বেচারী! এইটুকু বয়সেই ওকে পয়সা রোজগারের জন্য লোকের দোরে যেতে হচ্ছে! ওই নিখিলের কৃপাতে এ কাজটা না পেলে দুর্গতি আরও বাড়ত। কিন্তু এতক্ষণে দীপুর ত ফিরে আসার কথা—আজ যেন বড্ড দেরী হচ্ছে। কখনই বা গরুকে চুণিভুষি দেবে, কখন স্নানাহার করবে দীপু? অথচ মিণ্টু যদি বোনের কোন কাজে হাত দেয় তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। কথা বন্ধ। দীপুর এই একটি অস্ত্র—কথা বন্ধ! নইলে গোয়ালের কাজটুকু হাত-অবসরে মিণ্টুর করতে কতক্ষণই বা লাগে!

মিণ্টু যখন এই কথা ভাবছে, দীপু এসে ঢুকল ঠিক সেই মুহূর্তেই কোয়ার্টারের খিড়কী দোর দিয়ে। রোদে ওর মুখখানা রাঙা টক্ টক্ করছে। দীপুর মুখের দিকে তাকাতে মিণ্টুর কষ্ট হয়। ঘাড় নীচু করে আনাজের খোসাগুলো ঝুড়িতে তুল্‌তে তুল্‌তেই বল্‌ল—আজ এক অকর্ম্ম করে বসে আছি রে, তোর উপোসের নেমন্তন্ন!

কিছু বুঝতে না পেরে দীপু বল্‌ল—কি হ'ল রে দিদি, বাবা ভালো আছেন ত?

—হ্যাঁ! যেমন থাকেন, তবে ওরই মধ্যে একটু যেন ভালো মনে হচ্ছে।

—তা কাণ্ডটা কি করলি?

—ভাত পুড়িয়ে বসে আছি।

—হাত-টাত পুড়িয়ে বসিস নি তবু রক্ষে। আমার দেরি দেখে বুঝি খুব ভাবছিলি? কি অঘটন ঘটলো—আর সেই তক্কে ভাতটা বেয়াদপী করে—এ্যাঁ!

—ভাবতে গেলাম কোন্ দুঃখে। তুই ত আর বাদল নস!

—ত্যাখ্ দিদি অমন করে ছোট ভাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিস নে। আমার মন বল্‌ছে, সে কোনো ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই গেছে।

বিরক্ত হয়ে মিণ্টু বল্‌ল—ভালো হলেই ভালো। চারদিকের ব্যাপার

দেখে ভালোতে ঘেন্না ধরে গিয়েছে। তাই যদি হ'ত একটা খবরও ত দিতে পারতো এই আঠারো দিনের মধ্যে! যা-যা ঢের হয়েছে, মুখ হাত ধুয়ে আয়—ছানাটুকু খেয়ে নে।

দীপু বল্‌ল—উঁহু, আজ আপনার পালা মশাই। কাল তো আমি খেয়েছি।

—আমাকে আর ঘাঁটাস নে দীপু, যা বলি শোন্‌।

—ইস ভারি যে! অমন করলে ভালো হবে না দিদি। আমি রোজ রোজ ছানা খাবো না। তোমার কথাই কথা—আমি বুঝি মানুষ নই!

—আমি ত দেড় মাইল হেঁটে আসি নি। তোর খাওয়া দরকার। নইলে এত খাটুনি সইবে না রে!

—ওঃ, ভারি খাটুনি! তা ছাড়া ওখানে ত চা-বিস্কুট খেয়েছি আমি।

—তবে আয় দু-জনে ভাগাভাগি করি।

দীপু জানে এ প্রস্তাবে সম্মতি না দিলে, দিদি জোর করেই ওকে সব ছানাটুকু খাইয়ে ছাড়বে। দীনদয়ালকে সকালে ছানার জল দিতে হয়, তারই দরুণ এই ছানাটুকু ওদের প্রাতঃকালীন বিলাসভোজ্য—বর্তমান অর্থকষ্টের মধ্যে এটা যেন নিদারুণ পরিহাস!

প্লেট ধুয়ে তাকে তুলে রাখবার সময় দীপু মিণ্টুর দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—কেন দেরি হল জানিস দিদি?

মিণ্টু মুখ তুলল।

দীপু হেসে উঠল—আজ একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

মিণ্টু জানে, এর পরই দীপু নিখিলের গল্প জুড়ে দেবে। ভালো না লাগলেও এটুকু মিণ্টুকে শুনতেই হবে।

তাই ওকে বল্‌তেই হয়—তারপর? কি বল্‌ল নিখিল, ওর কোনো হিল্লে হয়েছে? না, নতুন কোনো সাহেবের কুকুরছানার তারিফ শোনালো—বল্‌!

—ধ্যাৎ, নিখিলদার কথা বল্‌তে আমার বয়েই গেছে!

—তবে?

—বলো তো কে? এক, দুই, তিন। বলো-বলো বলো।

—যাঃ! তোর সঙ্গে খোশগল্প করলেই আমার চল্‌বে! বলবি ত বল, নইলে আমি যাই ওঘরে—অনেক কাজ।

—তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ! এতবড় কাজটা করে এলাম, কোথায় বোনাস দেবে,—ওই জন্যে ত দু-পেয়ের ভালো কখনো করতে নেই!

—কি এমন ভালো করলে আমার বোনটি, আগে শোনাও ভাই। সত্যি তোর মতো লক্ষ্মী বোন ক'জনের থাকে!

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। দেবুদা এ বাড়িতে আসছেন আজ।

—কেন?

কথাটা বল্‌বার সময় একটা উত্তুঙ্গ অভিমান মিশ্রিত উত্তেজনা যেন মিণ্টুর কণ্ঠে ফেটে পড়ল। দুটি অক্ষরের উচ্চারণে এতখানি দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা, দীপুকে চম্‌কে দিল। মিণ্টুও নিজের এই বিরূপতায় কম বিস্মিত হয় নি।

দীপু আঘাত পেয়েছে, আহত স্বরে বল্‌ল—আসবেন না কেন?

—এতদিন না এসে যদি চলে থাকে ত, এর পরেও চলে যাবে। তোমার মাতব্বরীর কোনো দরকার ছিল না।

—বা রে কি মাতব্বরী করলাম! পথে হঠাৎ দেখা, সাইকেল থেকে নেমে পড়ে বল্‌লেন, কোথায় গিয়েছিলে?

—তুমি বুঝি বাহাদুরী নিলে, বল্‌লে ছেলে পড়িয়ে আসছো?

—তা দেবুদার মুখের সামনে মিথ্যে কথাটা কি করে বলি?

—হুঁ।

—শুনে খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। বল্‌লেন, আর সব খবরই ত জানি, কিন্তু এ কথা ত কেউ বলে নি!

—বটে, খুব শুক্‌নো আত্মীয়তা দেখালেন বুঝি?

—তা জানি নে। আমি বল্‌লাম, আর কেউ জানবার মতো কথা এটা নয়, কেউ জানেও না।

—ওঁরও না জানাই উচিত ছিল। কাজটা ভালো করো নি দীপু। ওঁরা হচ্ছেন মজদুর দুনিয়ার নেতা, আমাদের মতো গেরস্থর ঘরকন্নার কথায় কি কাজ? যাক্, তারপর খিচুড়ীটা কতখানি পাকিয়ে এসেছ দেখি!

দীপুর মনও দিদির এসব কথায় প্রসন্ন থাকে [illegible] ও বল্‌ল—খিচুড়ীটা কি এর মধ্যে ?

—সে আর তোমার বুঝে দরকার নেই। বাবার এতবড় একটা অসুখ, যমে-মানুষে টানাটানি, তা একবার উঁকি দিয়ে দেখাও দরকার বলে মনে করেন না যিনি, তাঁকে গায়ে পড়ে বাড়িতে আনা খুব বুদ্ধির পরিচয় নয় দীপু ! যাক্, এখন আর এসব বলেই বা কি হবে ! তোমরা সবাই আজকাল বড়ো হচ্ছো, মতামত নিয়ে চলার দরকার যখন মনে করো না তখন—

আবেগে মিণ্টুর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। দীপুর মুখের দিকে একবার তাকানোর কথা ওর মনেই হ'ল না। তাকালে মিণ্টু দেখতে পেত ওর কথাগুলো দীপুকে কী পর্যন্ত আঘাত করেছে !

—আগে থেকেই যা ইচ্ছে বলে যাচ্ছ, কিছুই শুনলে না। সত্যি দিদি, তোমার আজকাল মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে পড়ছে।

—মেজাজের কি দেখলি তুই এর মধ্যে ? উচিত কথা বল্‌লেই মেজাজ হয়, না !

—দেবুদাকে মোটেই আসবার জন্যে সাধি নি। আর সাধলেই বা কী, উনি ত আর পর নন্। কতো দুঃখ করলেন, বললেন, অনেকদিন আগেই উনি আসতেন, তুমি নাকি কবে বারণ করেছিলে তাই আসেন নি। এখন আর তোমার বারণ মানবেন না।

—ওঃ, আমাকে মেনে চলেন কতো ! আমি আবার বারণ করতে গেলাম কবে ? যেন আমার বাড়ি ! তা আজ হঠাৎ সে বারণ না মানার কারণটা কি কিছু শুনিয়ে দিয়েছেন ? তুই কি বাদলের কথাও বলেছিস নাকি ?

দীপু চুপ করে রইল। অভিমানে ওর মনটা গুমরে উঠেছে।

মিণ্টু দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ল—বুঝেছি। কিছু আর বাকী রাখো নি। তোমার পেট কামড়ে উঠেছিল। দেবুদাকে দেখেই বকোর-বকোর করে এক ঝুড়ি বকুনী উজোড় করে দিলে ! [illegible] আসুক, আমার কী !

জলে বালি গুল্‌তে গুল্‌তে [illegible]—তা ওঁর ত এখন 'বি' শিফ্‌ট্‌, এলে ত দুপুরেই আসবেন। [illegible] আর যেয়ো না।

দীপু মুচ্‌কি হেসে বলল—আমাকে ত এতক্ষণ খুব শোনানো হচ্ছিল। দেবুদার কোন্ ডিউটি সে হিসেব ত ঠিক আছে!

মিণ্টু ধমকে উঠল—যা-যা নিজের কাজ কর গিয়ে। কথায় কথায় ফোড়ন দিতে হবে না।

দীপু চলে যাচ্ছিল। মিণ্টু ডাক দিল—আর ছাখ, বাবার সঙ্গে একবার দেখা করে যাস। কতক্ষণ একলা রয়েছেন, কিছু দরকার হয় যদি—।

—আচ্ছা।

বলে দীপু লঘু পদে দীনদয়ালের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ফুটন্ত বার্লির দিকে অখণ্ড মনোযোগ না দিলে উথ্‌লে উনুনে পড়বে, মিণ্টু খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখে সেদিকে।

দেবু আসবে। কতদিন পরে দেবু আসবে! এতদিনের মধ্যে সে কেবল মিণ্টুর নির্দেশেই আসে নি! কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না মিণ্টু। হয়তো এর মধ্যে খানিকটা সত্য আছে। দীনদয়ালের প্রতি দেবজ্যোতির শ্রদ্ধা, প্রীতি অকৃত্রিম, একথা ত মিথ্যে নয়! কিন্তু তার চেয়েও কি মিণ্টুর নির্দেশ বড়ো? না কি, পূর্বাপর ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রভাবই দেবজ্যোতিকে এতদিন এ বাড়িতে আসতে দেয় নি?

সব কিছু ছাপিয়ে একটি কথাই মিণ্টুর মনে বড়ো হয়ে উঠেছে—দেবু আসছে। অনেক দিন পরে যেন এ বাড়ির জমাট বাঁধা একটানা দুঃখ-দুর্দশা অবসানের আলোক রেখারই ইঙ্গিত এটা! অভিমান, অস্বস্তি, অবিশ্বাস, হতাশা, সব কিছু উপেক্ষা করেই মিণ্টু আঁকড়ে ধরল ঘাসের কুটোর মত দেবজ্যোতির এই আগমন-বার্তাকে। অথচ কীই বা হবে? হয়তো কিছুই হবে না, তবু খানিকটা নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পারবে মিণ্টু। দেবজ্যোতি যে আছে, এই আশ্বাসটুকু সামান্য নয়, মিণ্টু হঠাৎ আজ আবিষ্কার করল। হ্যাঁ, এত ঘটনার ব্যবধান সত্ত্বেও এই বোধটুকু এখনও মিণ্টুর অস্বীকার করার উপায় নেই।

বার্লি ফুলে উথলে পড়বার অনেক আগেই মিণ্টু সাবধানে হাতা দিয়ে নাড়তে-

লাগল। ধূমায়িত বাষ্পের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে মিণ্টু পুরণো স্মৃতিকে ঝালিয়ে তোলে। কতো কথা, কতো দিনের মিষ্টি নরম ছবি!

ভারি মন নিয়েই দেবজ্যোতি রাঙাপাড়া থেকে ফিরছিল! বুড়ো ঝগ্‌ড়ু মাঝি আজও সোজা হয়ে উঠে বসতে পারে না।·· বেচারী! বুড়ো বয়সে বড় ব্যথা পেয়েছে। অথচ কারণটা কিছুই নয়—দু মুঠো কয়লা সে ইঞ্জিনের শেড থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গাম্‌ছাতে বাঁধছিল। আরও কত কুলী-কামীনই ত কয়লা নিয়ে যায়! ঝগ্‌ড়ু কোনো দিন এই নেওয়াটাকে চুরি ত মনেই করে নি, অন্যায়ও ভাবে নি। এমন কি রবিন্‌সন্ সাহেবের জুতোসমেত পায়ের লাথি যখন ওর কোমরের উপর দু-তিনটে পড়ল, যন্ত্রণায় কাৎ হয়ে ছাই আর ছাই আর কয়লার স্তূপে ঝগ্‌ড়ু মাঝি পড়ে গিয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠ্‌ল, তখনও সে অপরাধের গুরুত্ব সম্‌ঝাতে পারে নি। সে উঠে বসবার চেষ্টা করতে করতে সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে চলেছিল—সেলাম হুজুর!

তার জবাবে উপ্‌রি বক্‌শিস হিসেবে সাহেব আবার পা ঝেড়েছিলেন, এবার চোটগুলো বুকের ওপর। হাতখানা ঝগ্‌ড়ুর থেঁতলে যেত আর একটু হলে।

জেনারেল ডিউটির ছুটি হয়েছে। অনেক কৌতূহলী দর্শক এধার-ওধারে জুটেছিল। তাদের সাহসে কুলোয় নি রবিন্‌সনের সামনে গিয়ে বাধা দিতে। তা বলে, এমন একটা দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোনো হেতু নেই। দূরত্ব বাঁচিয়ে সবাই ভিড় জমিয়েছে। একটি দুঃসাহসী ছোক্‌রা ছুটে বেরিয়ে গিয়ে সাহেবের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ছিল—কাহে, কাহে আপ বুডঢে্‌কো লাথ মারতে হেঁ!

সাহেব গর্জে উঠে বলেছিলেন—সারে কারখানেমে বিল্‌কুল চোর ঔর ডাকু! All thieves! ভাগো। Caught red handed. A thief should be handed over to police!

ছোক্‌রা বোধ হয় পাগল হয়ে গিয়েছিল, নইলে সাহেবের মুখের ওপর এরকম ভাবে বল্‌তে পারে—আমরা সবাই চোর, আর তোমরা কালাপানি

ডিঙিয়ে খুব সাধু এসেছ! বুড়োমানুষ কতটুকুই বা কয়লা নিয়েছে ও! জানোয়ারের মতো ওকে মারতে তোমার শরম হ'ল না। আবার বল্ছ, চোর! তুমি কি? তুমি অমানুষ। জানো ঝগ্ড়ু মাঝির ছেলে আছে তোমার বইসী? তোমার বাপকে ধরে তুমি মারতে পারো সাহেব?

রবিন্সন সাহেবের গায়ে যেটুকু বিলিতি সৌজন্য আর মানবতার গন্ধ ছিল, মানিকপুরের মাটিতে কবে তা ঝরে পড়েছে! এখন তিনি এই কারখানার অন্য সাহেবদের সঙ্গে সমান পাল্লায় অত্যাচার করেন। কাজেই উৎসাহা তরুণটির দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বল্লেন—আর একটিও কথা নয়। তোমাকে এখুনি গলা ধাক্কা দিয়ে বার করছি রোসো। তোমার কি নাম? জল্দি বলো রাস্কেল্।

সাহেবের সামনে মাটিতে থুথু ফেলে ছোক্রা তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল—জিলানী! তোমার এ চাকরী গেলে আমার অমন দশটা জুটবে। কিন্তু তোমার গেলে কি হবে? জানো, তুমি ঝগ্ড়ু মাঝিকে যেভাবে মেরেছ সেটা ইংরেজের আইনেও অপরাধ? সাক্ষী জুটিয়ে মামলা করতে পারে ঝগ্ড়ু। দস্তুর মতো ক্রিমিন্যাল কেস্।

রাগে, অপমানে সাহেবের মুখ চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল। চারধারে লোকের ভিড় দেখে তিনি বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলেন। ধমক দিলেন—**Hold your foul tongue, you impertinent pig!**

সাহেব আর একদণ্ড না দাঁড়িয়ে সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। এই হ'ল ঝগড়ু মাঝির কয়লাচুরির ইতিহাস!

কারখানাতে এই নিয়ে কম সোরগোল হয় নি।

ঝগড়ু কিন্তু হাসপাতালের নামে নাকে কানে হাত দিয়ে বলেছিল—বাবু তুরা আর খোয়ার করিস না। বুড়িটা সেঁকতাপ দিবে, আর ওষুধ বেটে দিবে। লইলে আমি মরেই যাবো। দানো বদ্যির হাতে বাঁচব নাই রে—

ক'দিন ধরেই দেবজ্যোতি ঝগড়ুকে দেখতে 'যাব-যাব' করছিল—নানা কাজের ঝামেলাতে পেরে ওঠে নি। আজ সকালে উঠেই তার প্রথম কাজ হ'ল ঝগড়ু মাঝিকে দেখতে যাওয়া।

তাকে দেখে বুড়ো-বুড়ি, দুজনেই খুশী হয়েছে। কৃতজ্ঞতার এমন সহজ গভীর প্রকাশ দেবজ্যোতি এর আগে কখনও দেখেছে বলে মনেই পড়ে না। জিলানীর প্রসঙ্গ তুলে ঝগড়ু বল্‌ল—সেই ডাকাতটা কালও এসেছিল। শালো ব'ল কি জানিস বাবু, আর একটু হলে সাহেবকে ঠেঙ্গায়ে দিত। তা উ পারে! রোজদিন ডাকাত বেটা আসে—শালো ভারি ভালো ছেলে বটে। আর এই তুই এলি বাবু। কেউ ত আসে না রে!

বৌকে ডেকে চা কিনে আনবার ফরমাস করল ঝগড়ু। দেবজ্যোতি বাধা দিয়ে বলেছিল—তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো সর্দার, তাতেই হবে। চা কি যখন-তখন খায় নাকি?

ঝগ্‌ড়ুর বৌ বল্‌ল—বাবু যেন কী বটে, বাবুরা ত সব সময়েই চা খায়! ঠিক হাঁড়িয়ার পারা, আমরা সব জানি রে বাবু। তুকে খেতে হবে। হাঁড়িয়া ত খাবি নাই, ত চা কেনে না খাবি!

—বেশ, বেশ চা খাবো।

ঝগড়ুকে দেখে বাড়ি ফিরছিল দেবজ্যোতি। ওকে গোটা-চারেক টাকাও দিয়ে এসেছে। কিন্তু তাত মনের ভার আদৌ লাঘব হয় নি। কয়লার সঙ্গে যে কলঙ্ক জড়িয়ে রবিন্‌সন সাহেব থানায় কেস্ পাঠিয়েছেন সে খবর ঝগড়ু মাঝি রাখে না। আর জানলেই বা সে কী করতে পারতো? বেঙ্গল ষ্টীল ম্যানুফ্যাক্‌চারার্স কোম্পানীর খোদ কর্তার বিপক্ষে দাঁড়াবার সামর্থ্য আছে কি ওই বুড়ো সাঁওতাল কুলীর! ইউনিয়নের তরফ থেকে জিলানীর এবং আরও জন-কয়েকের সাক্ষী-সাবুদের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও যে খুব সুফল হবে, এমনটা আশা করা ভুল। তবু লড়তে হবে।⋯এই কথাগুলোই দেবজ্যোতি জানাতে গিয়েছিল ঝগড়ুকে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে কেন যেন মনে হ'ল আজ নয়—ঝগড়ু আর একটু সুস্থ হয়ে উঠুক, তারপর এ সব খবর দেবে। সেটাই সমীচীন। অতএব আবার যেতে হবে, কাল-পরশুর মধ্যে। তার আগে নিশ্চয় শমন পাঠাবে না থানা থেকে। সেদিকে রামঅওতারের দোস্ত রয়েছে, দু-চার দিন এদিক-ওদিক দেরি করানো তার দায়িত্ব।

এইসব ভাবতে ভাবতে সাইকেল চালাচ্ছিল সে,—এমন সময় হঠাৎ উল্টা দিক থেকে দীপুকে আসতে দেখে দেবজ্যোতি ঝুপ করে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। দীপু বেশ খানিকটা লম্বা হয়েছে।

ওকে চম্‌কে দিল দেবজ্যোতি—কি রে বেড়াল!

দীপু একগাল হেসে পথের একপাশে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—যান, আপনি বড় ইয়ে। কেউ শুনলে কি ভাববে? আচ্ছা দেবুদা, আমাদের এরকম ভাবে ভুলে গেলেন কি করে?

গম্ভীর ভাবে দেবজ্যোতি জবাব দিল—ভুলে গেলে বুঝি কেউ সেধে কথা বলে? তোরাই ত দেবুদাকে ভুলেছিস!

—জানেন না ত কি দিনই যাচ্ছে! তার ওপর বাদলটা আবার পালিয়ে গিয়েছে। সত্যি দেবুদা, এমন যে হবে কখনো ভাবতে পারি নি। বাবা মরো মরো, অথচ আপনি একটিবারও যান না! সবাই ত আসে—অমলদা, মল্লিকাদিও রোজ দুবেলা।

জ্যাঠামশাইও আসেন। মুকুলদিও ক'বার এসে গেলেন। মানিকপুরের বাকী কেউ নেই। আর আপনি?—সত্যি ঠিক করে বলুন তো কি হয়েছে?

দীপুর মুখ-চোখ ঐকান্তিকতায় আর্ত। সেদিকে তাকিয়ে দেবজ্যোতি যেন অতল গভীরের দুর্লভ অনুভূতির স্পর্শ পেল!

দীপু আরও কাছে সরে এসে ফিস্ ফিস্ করে বল্‌ল—বাবার কথা ভাবলে আমার কষ্ট হয়! আগে আগে আপনার কথা খুব বল্‌তেন উনি। এখন নিশ্চয় বুঝেচেন কিছু একটা আছে—আজকাল একদম নাম মুখে আনেন না। আচ্ছা দেবুদা, আপনার কষ্ট হয় না?

এ কথারও জবাব দেবজ্যোতি দেয় নি। প্রশ্ন করেছে—কাকামনি আজ সকালে কেমন আছেন?

—আগের [illegible] খানিকটা ভালো।

—না, কালকের তুলনায় আজ কেমন আছেন তাই বলো।

—দু-এক দিনে ত তফাৎ বিশেষ বোঝা যায় না।

—এখন কি ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরছো?

—না, ট্যুইশানী করি জেড-এমের বাংলোতে, সেখান থেকে ফিরছি।

—তার মানে? তুমি? ট্যুইশানী করছ! এইটুকু মেয়ে? কিন্তু একথা ত কেউ বলে নি দীপু!

কতকগুলো কাটাকাটা কথা দেবজ্যোতির মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—গভীর অস্থির চিন্তারই প্রচণ্ড আলোড়নতাড়িত খণ্ড-খণ্ড প্রকাশ যেন!

দীপু বলে—কেউ জানে না, আপনিই প্রথম জানলেন দেবুদা!

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দেবজ্যোতি। প্রচণ্ড আঘাতের ধাক্কায় সে বিপর্যস্ত। দীপুর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দেবজ্যোতি বল্‌ল—তোমার দিদিকে বলো। সে যেন রাগ না করে, এরপর ত আমি না গিয়ে থাকতে পারবো না। যেতেই হবে তোমাদের বাড়ি।

অবাক হয়ে গিয়েছিল দীপু। দেবজ্যোতির মুখের দিকে বিস্ময়ভরা দু'চোখের অকুণ্ঠ চাহনী মেলে দিয়ে বল্‌ল—যাবেন? আজ যাবেন দেবুদা! বেশ হয় তাহলে।

তারপর একটু ভেবে নিয়ে দীপু সাবধান করে দিল,—দীনদয়ালের সামনে যেন বাদলের কথা কিম্বা দীপুর মাষ্টারী করার কথা না তোলা হয়। এসব কিছুই তিনি জানেন না।

দেবজ্যোতি আর কোনো কথা বলে নি। সাইকেলে উঠে সোজা বেরিয়ে এসেছে। সাইকেলের চাকার পাকে-পাকে অনেক পিছনের স্মৃতিতরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

অনেক-অনেক কথা। যেসব চিন্তাকে এতদিন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল দেবজ্যোতি, তারা সবাই হঠাৎ এই তরঙ্গাঘাতে বিক্ষুব্ধ, জাগ্রত, বিদ্রোহী হয়ে মনকে অস্থির করে তুলেছে। মন্দাকিনীর রহস্যময় অপমৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত পারিবারিক সব-কিছু থেকেই সে নিজেকে দূরে-দূরে রেখে চলেছে। ইউনিয়নের কাজেও সে প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকায় নিজেকে নামতে দেয় নি। যেটুকু করতে হয়, মাত্র সেটুকুই করে যাচ্ছে। তবে শ্রমিক আন্দোলনের ব্রত থেকে সরে দাঁড়ালে ত চল্‌বে না, এরই জন্য তাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। যদি সে বলে যে, সবারই চেয়ে বেশি মূল্য দিতে সে বাধ্য হয়েছে—তাহলে কি

খুব ভুল হবে? অন্ততঃ তার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদই এই যজ্ঞে আহুতি দিতে হয়েছে, একথা ত মিথ্যে নয়! কাজেই এ থেকে সরে দাঁড়ালে বাঁচাটা বিড়ম্বনা, বাঁচার কোনো আশ্রয়ই দেবজ্যোতির থাকবে না—সেজন্যই চরম দুর্দশাগ্রস্ত মন নিয়েও ইউনিয়নের কাজ নিজেকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে।

বাদবাকী সব কিছুই এখন অন্য জগতের ব্যাপার। বিশেষ করে সেইসব পারিবারিক আবহাওয়া, যেখানে কিছুমাত্র পূর্বস্মৃতি জড়ানো রয়েছে, সেখানে দেবজ্যোতি তিলেকমুহূর্তের জন্যও যায় নি। তার মনে যেন একটা শঙ্কার কালো ছায়া পড়েছে—তার সংস্পর্শের মধ্যে কোনো একটা অমঙ্গলের দুষ্ট প্রভাব রয়েছে! তার গায়ের সঙ্গে অকল্যাণের জীবাণু মাখানো রয়েছে যেন! তাই যদি না হবে, তবে কেন মন্দাকিনীর মতো প্রতিভাময়ী মেয়ে এমন একটা সর্বনাশী সংকল্পে নিজেকে জলাঞ্জলি দিল? মন্দাকিনী ত কোন অন্যায় করে নি, দেবজ্যোতিই অন্যায় ভাবে তাকে আঘাত করেছিল। মন্দাকিনীর পরম সুন্দর ব্রতসাধনার গায়ে সে-ই কালি ছিটোবার জন্য উদ্যত হয়েছিল।

যতই সে ভেবেছে, এই বিশ্বাসটা মনের মধ্যে ততই গেঁথে বসেছে। অধিকারের অভিমান দিয়ে দেবজ্যোতি অযথা মন্দাকিনীর হোমাগ্নিশুদ্ধ আত্মবিপ্লবকে গ্রাস করতে এগিয়েছিল। যেহেতু সেই আগুন দিয়ে প্রিয়তমকে সংহার করার মতো নিষ্ঠুরতা মন্দাকিনীর ছিল না, তাই বাধ্য হয়ে নিজের জীবনপাত করেই প্রতিবাদ জানিয়ে গেল। জবাব! হ্যাঁ, জবাব বই কি! দেবজ্যোতি নিজের ব্যক্তিগত মোহকে প্রশ্রয় দিয়ে মন্দাকিনীকে পথভ্রষ্ট করতে চেয়েছিল,—তারই জবাব দিয়েছে মন্দাকিনী। কিন্তু কতখানি নিষ্ঠুর, কি মর্মান্তিক সে জবাব, মন্দাকিনী কেন একবার পিছন দিকে চেয়ে দেখল না? অভিমানের বিনিময়ে সর্বনাশই কি প্রেমের পরিচয়?…

এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে ফিরে আসবে না মন্দাকিনী। দেবজ্যোতির অনুনয়-অনুরোধ কোন কিছুরই আর মূল্য নেই। সব পাথর হয়ে গিয়েছে। একদিন প্রেমের প্রথম অঙ্কুরাভাষে মন্দাকিনীকে সাবধান করে দিয়েও শেষ পর্যন্ত দেবজ্যোতি নিজেই আপন মানসিক গঠনের স্বরূপটা ভুলে

বসেছিল। ভেবেছিল, সত্যিই বুঝি সে মন্দাকিনীকে গভীরভাবে ভালোবাসে। কিন্তু কই তার প্রমাণ দেবার মতো কোনো নজীরই ত দেবজ্যোতি আজ খুঁজে পায় না। নিজের সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ—মন্দাকিনীকে দেবার যোগ্য কোনো পুঁজিই হয়তো তার ছিল না। থাকলে মন্দাকিনী এভাবে ব্যর্থ হতাশার মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ্ কেন টানবে? মন্দাকিনীর মৃত্যু যেন দুনিয়ার কাছে জানিয়ে দিয়ে গেছে দেবজ্যোতি শুধু ব্যর্থতারই প্রতীক। তাই দেবজ্যোতি সংকল্প নিয়েছে, এই ব্যর্থতার বিষ যত কম ছড়াতে পারে ততটুকুই মঙ্গল।

এই ছিল আজ সকালে দীপালীর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত দেবজ্যোতির মানসিক অবস্থা। সেই মানসিক বীতস্পৃহা নিয়েই সে গত কয়েকমাস ঘাড় নামিয়ে চলেছিল। মুকুল, মল্লিকা থেকে শুরু করে মল্লিক সাহেবের পুনঃ পুনঃ আন্তরিক আহ্বান, সব-কিছুকেই সে পাশ কাটিয়ে গিয়েছে। দূব-দর্শকের ভূমিকা থেকেও দূরে—আরও দূরে, নিজের অস্পৃশ্য অশুচি সঙ্গকে সরিয়ে দিয়েছিল সে।

পারে নি কেবল ইউনিয়ন থেকে নিজেকে বাঁচাতে। সেখানেই যেন মন্দাকিনী প্রায়শ্চিত্তের সামান্যতম অবকাশ রেখে গিয়েছে! তবু নিজের প্রতি এতটা বিষণ্ণ করুণা ছিল যে, সে জানত একদিন হয়তো আর সকলে মিলে এই অধিকারটুকুও কেড়ে নিয়ে এই অস্পৃশ্য অমঙ্গলের জীবন্ত প্রতীকটিকে চরম নিঃসঙ্গতায় ঠেলে ফেলে দেবে! ইউনিয়ন থেকেও ওরা তাকে তাড়িয়ে দেবে।

নিজেকে সে বলেছে, যতদিন সুযোগ পাও কাজ করে যাও। তারপর তোমার সেই দুঃসহ মূর্তির প্রকাশ যদি ঘটে, ওরা যদি তাড়িয়ে দেয়, তখন মাটিতে এই পোকায় খাওয়া মাথা লুটিয়ে দিয়ে বিদায় নিও। তাই দেবজ্যোতির সব-কিছু করার মধ্যে দীনতাটাই প্রকট হয়ে উঠ্‌ত। নিজেকে কোনো কাজেই এগিয়ে দেয়নি সে। আর যেটুকু কাজের ভার এসে পড়ে, সেটুকু যতখানি সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব ততখানি যত্ন নিয়েই করে। তিলে তিলে প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হবে তাকে। তবেই যদি মন্দাকিনীর জীবন দানের বৃহৎ ঋণের কণামাত্রও শোধ হয়।

এই ভাবেই চল্‌ত। অন্ততঃ দেবজ্যোতি সেই ভেবেই নিজেকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু দীপালী যেন প্রচণ্ড ঝড়ের ধাক্কা দিয়ে গেল !···দীনদয়াল মৃত্যুশয্যায়, কথাটা এতদিন যে কত সহস্রবার সে কানে শুনেছে তার হিসেব নেই। কিন্তু এভাবে প্রত্যক্ষ অনুভবের সচেতনতা ছিল না। কিম্বা দীপালীর চোখেমুখে চেহারাতেই এমন একটা অসহায়তার অভিব্যক্তি ছিল—যার জন্য দেবজ্যোতির কঠিন নিস্পৃহতাকে ভেঙ্গেচূরে দিয়েছে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে ওদের অবস্থা! বাদল বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে, দীপালীর গায়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার গন্ধ লেগে রয়েছে, ওর বয়সই বা কত হবে? ষোলো, না, তাও হয়তো পূর্ণ হয়নি—এখনই ওকে ট্যুইশন নিতে হয়েছে, নিতান্ত সখ করে নয়,—কঠিন বাস্তব প্রয়োজনের তাড়নাতেই। দীনদয়ালের অবস্থা কোথায় এসে পৌঁছেছে! অথচ দেবজ্যোতি একবার চোখের দেখাও এতদিনের মধ্যে দেখতে যায় নি! নিজের অস্পৃশ্য সঙ্গ থেকে ওঁদের মুক্ত রেখে, সে কি দুর্দশা থেকে কিছুমাত্র বাঁচাতে পেরেছে? পারে নি। তবে?

আশ্চর্য, কি করে সে পারলো! শুধু কি মিণ্টুর সেই চিঠিখানার জন্যই এতদিন ওবাড়ির পথ মাড়ায় নি? আর যাকেই সে বলুক, দেবজ্যোতি নিজেকে এই অজুহাত দিয়ে ভোলাতে পারবে না! দুনিয়ার আর সব-কিছুর সঙ্গে গড় হিসেবে ফেলেই সে দীনদয়ালকে বাতিল করেছিল? হ্যাঁ, বাতিল ছাড়া আর কি বলা যায়! তাঁর কাছে দেবজ্যোতি অনেক পেয়েছে। প্রথম জীবনে চেতনার উন্মেষও সীতানাথের কাছে ঘটে নি। দীনদয়ালের মহান্‌, স্নেহময় অন্তরের স্পর্শই দেবজ্যোতির মনকে দেশের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। অথচ তার পরিবর্তে দেবজ্যোতি কি দিয়েছে? কিছু না! কিছুই নয়। না, এই মুহূর্তে স্বীকারে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করবে না দেবজ্যোতি। আদর্শের ক্ষেত্রে সে এমন কিছু যোগ্যতা দেখাতে পারেনি যার জন্য মৃত্যুর সময় দীনদয়াল তার নাম মনে রেখে তৃপ্তির সন্তোষ পেতে পারেন। নিতান্ত সাধারণ মানুষ হলেও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসেবে মিণ্টুর মতো মেয়েকে গ্রহণ করে অন্ততঃ পীড়িত, ক্লিষ্ট, কন্যাভারগ্রস্ত পিতার মানসিক ভার লাঘব করতো—কিন্তু

দেবজ্যোতি সেটুকুও ত করতে পারে নি। যদিচ মিণ্টু মেয়ে হিসেবে করুণার পাত্রী নয়, অন্য অনেক মেয়ের তুলনায় অসাধারণ, তবুও সে মিণ্টুকে প্রকারান্তরে বাতিল করেছে! ধরণীর বিপুল ঋণভারের অনুমাত্রও শোধ করবে না দেবজ্যোতি—কেবল স্বার্থসর্বস্বের মতো নিয়েই যাবে!

কয়েক মাসের স্তূপীকৃত অবহেলার গ্লানিকে ওজন করার কোনো দাঁড়িপাল্লা নেই, থাকলে দেবজ্যোতি একটা আঙ্কিক হিসেব পেতে পারত। কিন্তু তাতেও কোনো সান্ত্বনা মিলত না। এক্ষেত্রেও তাই হ'ল! বিষণ্ণ-বিরক্তির মধ্যে নিজের ওপর মানুষ যে শ্লেষের হাসি ছুড়ে দেয়, তাতে চরম তাচ্ছিল্যই ফুটে ওঠে—তেমনি একটা তীক্ষ্ণ হাসিই ফুটে উঠ্ল দেবজ্যোতির ওষ্ঠপ্রান্তে!

বিরাট একখানা ট্রাক সশব্দে আচম্কা ব্রেক-কষা আর্তনাদ নিয়ে থম্‌কে দাঁড়াল। সেই আওয়াজে দেবজ্যোতি চম্‌কে দু-হাতে সাইকেলের ব্রেক চেপে ধপ্ করে নেমে পড়ল। ট্রাকের ড্রাইভার দেবজ্যোতির মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে খতিয়ে দেখল, তারপর ধমকের সুরে বল্‌ল—ক্যা বাবু জী! বেহেস্ত-এর হুরীর খোয়াব দেখছিলেন! আরে বাবা, আর একটু হলেই ত বেহেস্ত চৌপাহে যেতেন!

দেবজ্যোতি এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়েছে। বড় রাস্তা, কাজেই লোক জমে গিয়েছে। সে দিকে আর তাকালো না দেবজ্যোতি। ড্রাইভারকে অস্ফুটস্বরে বল্‌ল—কিছু মনে করবেন না ভাই, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে বল্‌ল—ব্যস! আর যদি এক লহমার গোলগণ্ড হত ত চাকার তলায় চলে যেতেন যে! তখন ত শালা ড্রাইবর মাতোয়ারা, বেহুদা—বলে সব পাবলিক হামাকে ভি আপনার পিছ-পিছ পিটিয়ে বেহেস্তে ভেজে দিত! জরুর তগদির্‌সে বঁচ্ গ্যয়ে, আপভি হম্‌ভি!

গর্জন করে ট্রাকখানা বেরিয়ে গেল।

দেবজ্যোতি হতাশভাবে ঘাড়টা নেড়ে আবার সাইকেলে ওঠে। নাঃ, আর নিজেকে নিয়ে পারা যায় না! ছি-ছি, দিনদিন দেবজ্যোতি কি এমনি জড় হয়ে পড়বে? তার চেয়ে ওই ট্রাকের নীচে পড়লে বেশ হত! কীই

বা ক্ষতি হত—কিছু না, একটা বাজে বাতিল মালের হাত থেকে পৃথিবী মুক্তি পেতো। কেন তবে, ওই মূল্যবান লহমাটির সাম্‌নে এসেও ড্রাইভারটা থম্‌কে পড়ল! বিগতপ্রায় প্রাণটা ফেরৎ পাওয়ার অব্যবহিত পরমুহূর্তে ড্রাইভারটির প্রতি দেবজ্যোতির যে কৃতজ্ঞতা জেগে ছিল, সেটুকু লুপ্ত হয়ে এখন যেন মনে হচ্ছে শুভমুহূর্তে মরবার মতো যোগ্যতাটুকুও বুঝি তার নেই! সেখানেও তার জড়তাই যেন বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে পথ রোধ করেছিল!

দেবিকা কলেজে বেরিয়ে যাচ্ছিল। দেবজ্যোতিকে দেখে একটু দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকালো। এর পর চলেই যাবে দেবিকা। এই নিয়মেই মাসের পর মাস ওরা এক ছাদের তলায় দিন কাটাচ্ছে।

বোনের দিকে তাকিয়ে দেবজ্যোতি বল্‌ল—কিছু বল্‌বি, হ্যাঁ রে?

দেবিকা খুব বিস্মিত হয়েছে। আশাতীত একটা ঘটনা যেন! অবাক ভাবটা মুখে ফুটতে দিল না দেবিকা, একটু হেসে সেটা চাপা দিয়ে বল্‌ল—না, কিছু না! এত সকাল সকাল ঘুরে এলে, শরীর ভালো আছে ত?

—শরীর? হ্যাঁ ভালোই আছে।

দেবিকা চলে গেল। কলেজে যাচ্ছে দেবিকা, লেখাপড়া শিখছে—রাজনীতিও করছে। সুন্দর সহজ জীবনছন্দের জাজ্বল্যমান নিদর্শন দেবিকা! দেবজ্যোতিরই ছোট বোন। কতো আপন! কিন্তু 'আপন' কথাটার মর্যাদা দেবজ্যোতি কিছুই থাকতে দেয়নি। তাই দেবিকার কোনো কথা তাকে আজ বলবার মতো নেই! নিছক শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসাতে ওদের কথাবার্তা চুকে যায়। অথচ—।

দেবজ্যোতি আবার নিজের মনকে চাবুক মারতে থাকে।···কি তোমার হয়েছে? কেন এই অবজ্ঞা? দুনিয়ার সব-কিছুকে এড়িয়ে চল্‌বে,—আর তাদের কাছ থেকে নিজের পাওনা-গণ্ডা পুরোপুরি বজায় থাকে, সে আশাটুকু ছাড়তে পারো না! দেবিকা কেন, মানিকপুরের সবাই দেবজ্যোতিকে ছেড়ে দিয়েছে, দেবজ্যোতিই তাদের ছাড়তে বাধ্য করেছে। এ যেন নিজের মনের বিকারকেই ইস্তাহার ছাপিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া! ছি-ছি-ছি! এদিক দিয়ে ভেবে দেখবার

কথা এতদিন কেন মনে হয় নি? তবে সে কি নিজের নিভৃত শোকসন্তাপকেই বড় করে তুলেছে? এতই বড় করে তুলেছে যে, পৃথিবীর আর সব-কিছুই তুচ্ছ হয়ে দাঁড়ালো! অথচ সে মোটেই তা চায় নি। সে চেয়েছিল নিজেকে সম্পূর্ণ মুছে দিতে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, মস্ত বড় ভুল অর্থ নিয়ে তার আত্মবিলোপের চেষ্টাটা আত্মপ্রচারেরই নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেবিকা বিশেষ কোনো কথা ব'লে নি। আর এই না-বলার মধ্যে যেন অনেক বেশি বলা হয়ে যায়—তুমি যে কেন্দ্রটুকু ঘিরে চলেছ, তাই নিয়ে থাকাটাই তোমার কাছে সব, অতএব তাই নিয়েই থাকো।

দেবিকার মধ্য দিয়ে কি বাকী সকলের মনোভাব ব্যক্ত হচ্ছে? তা হচ্ছে বই কি! দেবজ্যোতি বেশ দেখতে পাচ্ছে, সবাই তাকে ভুল বুঝেছে। অথবা সবাইকেই সে ভুল বোঝার সুযোগ করে দিয়েছে। ওরা যেন বল্‌ছে, মন্দাকিনী আত্মহত্যা করাতে দেবজ্যোতি এমনই আঘাত পেয়েছে যে, সে আঘাত সামলাতে না পেরে দুনিয়ার সকলের উপর অযথা অভিমান করে বসে আছে!

নিজের মনে এই সিদ্ধান্তটা গড়ে দেবজ্যোতি একচোট হেসে নিল। কেউ নেই ঘরে। বাড়িতে অবশ্য প্রৌঢ়া রাঁধুনী আছে। কোনো এক শ্রমিকেরই বিধবা বড় বোন। তা তিনি থাকা না-থাকার কোনো চিহ্ন ছড়িয়ে পড়ে না। রান্নাঘরের চৌকাঠেই তাঁর সীমারেখা টানা। সেখানেই কাজকর্ম করেন। আর একটু আফিম খেয়ে ঝিমানোই তাঁর বিলাস।

দেবজ্যোতি জামা ছেড়ে খালি গায়ে হাত-পা ছড়িয়ে গা ঢেলে দিয়ে চৌকির ওপর শুয়ে শুয়ে ভাবছে। দুটো চড়ুই পাখী জানালা দিয়ে আসছে যাচ্ছে আর কিচির-কিচির খোশ-গল্প করছে।

দুটোয় ডিউটি। স্নানাহার চুকিয়ে কারখানার পোশাক পরেই দীনদয়ালের কোয়ার্টারটা ঘুরে যাবে দেবজ্যোতি। হ্যাঁ সেই ভালো।

অনেক হয়েছে। নিজের ওপর থেকে দুনিয়ার লোকের করুণাদৃষ্টিকে ফেরাতে হলে সহজ ভাবে চলাফেরা করা চাই। এই কথাটা এতদিন পরে বুঝলেও, বুঝতে যে পেরেছে দেবজ্যোতি এর জন্য দীপালিকে ধন্যবাদ!

দীপালির সঙ্গে দেখা না হলে, হয়তো এই চমক লেগে নিজেকে দেখার সুযোগটুকু আসতো না!

আর নয়, এবার উঠে পড়তে হচ্ছে।

একবার সে ভাবতে চেষ্টা করে—দীনদয়ালের বাড়িতে ঢোকার পর কি দেখতে হবে! বৃদ্ধ তাকে কি বলতে পারেন? মিণ্টুর আচরণই বা কি ধরণের হবে? কিন্তু সে ভাবনাটা আপাততঃ মুলতুবী রেখেই উঠে পড়ল।

দেবজ্যোতিকে অসময়ে স্নানের ঘরে ঢুকতে দেখে বামুনদিদিও বিস্মিত হলেন। এখনো ত সাড়ে এগারোটার ভোঁ বাজে নি!

একান্তর

দীপু কলেজ গেল না। অনেকদিন পরে দেবজ্যোতি আসবে। দিদির হাবভাবে ওর যেন মনে একটা শঙ্কা জেগেছে যে, দিদির সঙ্গে দেবুদার মনোমালিন্য ঘটেছে—এ অবস্থায় দীপু বাড়ি থাকলে দেবজ্যোতির দিক থেকে কিছু সুবিধে হতে পারে। দীপুর অনুপস্থিতিতে দিদি যদি দেবজ্যোতির সঙ্গে আরও ঝগড়া করে, ফল ভালো হবে না। সাম্‌নাসামনি থেকে দীপু অন্ততঃ খানিকটা ঠেকাতে পারবে। বয়স অল্প হলেও অভিজ্ঞতায় দীপু যেন অনেক বেড়ে গিয়েছে!

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর দীনদয়ালকে বাসি খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছিল দীপু।

মিণ্টু একটা সৌখীন টেবলক্লথে কাশ্মিরী কাজ করছে।

এক সময় দীনদয়াল বল্‌লেন—কাগজের খবর আর তেমন ভালো লাগে না রে! অনেক ত হ'ল, এবার মানিকপুরের খবর বল তো শুনি!

মিণ্টু বল্‌ল—মানিকপুরে আবার খবর কিছু থাকে নাকি বাবা! রোজ দু-বেলা তোমার ঘরে মানিকপুরের অর্ধেক লোক জোটে, তাদের চেয়ে বেশি কি বল্‌তে পারবো?

দীপু বল্‌ল—ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিট্যুটে এবার নাকি খুব জমকালো সাহিত্য-সভা হচ্ছে, কল্‌কাতা থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আসবেন, আরও অনেক সব সাহিত্যিক—!

—তাই নাকি? বিভূতিবাবু আসছেন?

—সেই কথাই ত শুনলাম অলকাদির কাছে।

দীনদয়াল খুশী হয়ে ওঠেন—লাইব্রেরীটা একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার কথা ওদের বল্‌তে হবে। নতুন বইও কিছু আনানোর জন্যে বলব,—আজকাল যা গোয়েন্দা-কাহিনীরই বই আসে। ভালো ভালো বই না আনালে ত সাহিত্যিকদের কাছে মুখ দেখানো যাবে না রে!

মিণ্টু এক নজর জানালা দিয়ে তাকিয়েই দীপুর পিঠে ঠেলা দিল। দীপু দিদির মুখের দিকে তাকালো সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে! তারপর মিণ্টুর দৃষ্টি অনুসরণ করে বাইরে চেয়ে অস্ফুট স্বরে বল্‌ল—ওমা, দেবু দা যে!

দীনদয়াল ভ্রূকুঞ্চিত করে বল্‌লেন—কে?

দীপু ততক্ষণ উঠে গিয়েছে দরজা খুলে দেবার জন্য।

মিণ্টু পিতার কথার জবাবে বল্‌ল—দেবজ্যোতির মত মনে হ'ল যেন!

দীনদয়াল স্খলিত কণ্ঠে বল্‌লেন—হ্যাঃ! সে আর এসেছে! কী যে হ'ল ছোঁড়াটার, জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করল! তার ওপর ওই এক মন্দাকিনী। মেয়েটা ত ভালোই ছিল—কিন্তু সাম্‌লাতে পারল না। সব তচ্‌নচ্‌ হয়ে যাচ্ছে, না রে মিণ্টু?

জবাব দেবার অবকাশ পেল না মিণ্টু।

দীপুর সঙ্গে কথা বলতে বল্‌তে দেবজ্যোতি এ ঘরে ঢুকে পড়ল। তার আগে ছায়া পড়ল—মিণ্টু নত দৃষ্টিতে থেকে সবই টের পায়, কিন্তু মুখ তুলতে পারে না।

চোখের সামনে দেবজ্যোতিকে দেখেও দীনদয়াল যেন বিশ্বাস করতে পারেন না,—প্রথমে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হাত নেড়ে বিছানায় তাঁর কাছে বসতে ইঙ্গিত করেন। দীনদয়ালের কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ। দুর্বল শরীরটা যেন উত্তেজনার আতিশয্যে এখনই নিথর হয়ে যাবে!

প্রথমে দীপু কথা কইল—বাবাঃ, কত কাল পরে!

দীনদয়ালের ঠোঁট নড়ল কিন্তু কোনো শব্দ ধ্বনিত হ'ল না।

দেবজ্যোতিও কেমন স্তব্ধ মূঢ়তায় আবিষ্ট! তবু তার মধ্যেই সে কোনো-রকমে বলে ফেলল—কাকামণি, চুপ করে শুয়ে থাকুন।

—হুঁ!

বলে দীনদয়াল তার দিকে তাকালেন, মৃদু কণ্ঠে বল্‌লেন—তোকেও এই সাজে দেখতে হ'ল!

নিজের পোষাকের দিকে নজর দিয়ে দেবজ্যোতি হেসে উঠ্‌ল—মন্দ কি! আপনাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া!

ক্ষীণ হাসির রেখায় দীনদয়ালের রক্তশূন্য মুখখানা বড় করুণ দেখায়। উনি বল্লেন—আর ত কিছুই দেবার সাধ্য ছিল না।

মাথা নেড়ে দেবজ্যোতি বল্‌ল—মর্যাদা রাখতে পারলে, রাজবেশও এর কাছে তুচ্ছ।

হতাশ স্বরে দীনদয়াল বল্‌লেন—হবে হয়তো!

তারপরই দীপুর দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—দীপু বল্‌ছিল, আমাদের ইন্‌স্টিট্যুটে নাকি সাহিত্যিকরা আসছেন। তাঁদের আদর-যত্নে কোনো অবহেলা না হয় দেখিস বাবা! আমি ত পড়ে রইলাম, এখন তোমরাই ভরসা।

দেবজ্যোতি বিস্মিত হ'ল খবরটা শুনে। এসব কথা সে শোনেওনি। একটু ব্যস্তভাবেই বল্‌ল—তাই নাকি? তাহলে ত উঠে পড়ে লাগতে হয়। কবে? ওঁরা কবে আসবেন দীপু?

—আমি ত সে সব জানি না। অলকার কাছে শুনছিলাম।

মিণ্টু হঠাৎ বল্‌ল—কবে আর হবে, রবীন্দ্রস্মৃতি-দিবসেই ত ফি বছর গান-টান হয়। এবারও তাই হবে।

আলাপ-আলোচনার ধারাটা যে এমন সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে বইবে সেটা কেউই আগে অনুমান করতে পারে নি। মান-অভিমানের বাধাপথে আড়ষ্ট একটা পরিবেশই সবাই কল্পনা করে রেখেছিল। দীনদয়ালের উপস্থিতি এবং প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের দরুণেই শঙ্কিত ঘোরালো জটিলতার সমস্যা যেন বিদূরিত হয়েছে!

দেবজ্যোতি উৎসাহিতভাবে আগামী সভার কর্তব্যাকর্তব্য নিয়ে আলোচনা জুড়ে দিল। দীনদয়াল শান্ত উৎসুক দৃষ্টিতে শুন্‌তে লাগলেন। মিণ্টু মাঝে মাঝে হাতের কাজে মন দিতে চেষ্টা করে। আর দীপুর যেন কোনো কাজ নেই—শুধু সকলের মুখের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে খুশী হয়ে ওঠাই একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু বেশিক্ষণ এভাবে চলে না। এক সময়ে দীনদয়াল বল্‌লেন—কেমন দেখছিস আমাকে, হ্যাঁরে ব্যাটা?

দেবজ্যোতি বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইল। জবাব অবশ্য তাকে দিত হ'ল না, দীনদয়াল নিজেই মৃদু অকম্পিত স্বরে বল্‌লেন—ডাক এসে

গিয়েছে রে! ভালোও লাগছে না এভাবে। এখন বাদলটার একটা কিছু গতি হয়েছে শুনতে পেলেই নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি। মেয়ে দুটোর জন্যেও যে ভাবনা হয় না, তা নয়! কিন্তু ভেবেই বা কি করা যায়! তোরা রইলি, দেখবি!

শেষের কথাগুলির উপর অস্বাভাবিক রকমের জোর দিলেন দীনদয়াল।

দেবজ্যোতির বল্‌তে ইচ্ছা করে, 'না আপনি সেরে উঠবেন।' কিন্তু কি যেন তার এই লৌকিকতার মৌখিক কথাকে আটকে দিল মাঝপথে। সে শুধু বল্‌ল—অত ভাববেন না কাকামণি ওতে শরীর খারাপ হয়!

হাসলেন দীনদয়াল—খারাপ হবার আর বাকী কি? কিড্‌নী শুকিয়েছে, ব্লাড প্রেশার যতদূর বাড়তে হয় তার শেষ সীমায় পৌছেছে, প্রাণটুকু বেরুচ্ছে না। এখন শেষ ষ্ট্রোকটার জন্যে পড়ে থাকা।

মিণ্টু তিরস্কারের ভঙ্গীতে বল্‌ল—তুমি আর একটি কথা কইলে আমরা সবাই এ ঘর থেকে চলে যাবো কিন্তু!

দীপু বল্‌ল—দেবুদা, চলুন আমরা ওঘরে যাই।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—আর কতক্ষণই বা এখুনি ছুট্‌তে হবে ভাই!

দীনদয়ালের ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির ছোঁয়া। তিনি দেবজ্যোতির দিকে অপলক-নেত্রে তাকিয়ে আছেন। ঘরখানা আশ্চর্যরকমের নীরবতায় আচ্ছন্ন। এ ভাবে বসে থাকতে দেবজ্যোতির খুব ভালো লাগছে। অনেককাল পরে সে যেন নতুন করে ঘরোয়া আবহাওয়ার স্বাদ পাচ্ছে! সেই পুরণো কৈশোরের ছায়া এসে পড়েছে তার মনের আয়নাতে। তখনকার দীন পারিপার্শ্বিকের ছবি আজ যেন নন্দনলোকের হাতছানি! দেবজ্যোতির তখন কতই বা বয়স, কিই বা বুঝতো এই পৃথিবীর! জানতো না বিশেষ কিছুই। নিছক ভালোলাগার, মুগ্ধ বিস্ময়ে সাগ্রহে সব-কিছু গ্রহণের স্পৃহা তার কিশলয়ের মত সবুজ মনকে নিয়তই উদ্ব্যস্ত করে রাখত। একখানি ঘরের এতটুকু মেঝেতে যেন দুনিয়ার ভালোবাসা ঢেলে উজাড় করে দিয়েছিল কোন্ উদার শিল্পী! চার দেয়ালে ঘেরা ঘর, ঘরের পরে টুক্‌রো একফালি বারান্দা, তারপর এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো উঠোন, সেটুকু ডিঙিয়ে দরজাটা খুলে বেরুলেই পথ—পথের সঙ্গে বিস্ময়ের

ঘনিষ্ঠ মিতালী! সেই পথে দেবজ্যোতি, মুকুল আর মিণ্টু তিনজনে মিলে কতো কিছুর মধ্যে বিস্ময়ের খোরাক আবিষ্কার করত! ধোপাদের ভাটিখানার পাশ দিয়ে বড় নর্দমার গা বেয়ে অচেনা সুন্দর হাল্কা সবুজ গাছ গজিয়ে উঠতো, সে গাছের পাতায় ওরা দেখতো লুচির সাদৃশ্য। পাতা ছিঁড়ে নিয়ে লুচি বানানো চল্‌ত। আরও অজস্র বিস্ময়—পিটুলি ফল, রাঙা টুক্‌টুকে পিটুলি, আধপাকা সব্‌জে-লাল্‌চে ছোটছোট ফল, এগুলোতে ওরা আঙ্গুরের স্বাদ পেতো অতি সহজে!

আজ হঠাৎ সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে যায়! কাকীমা হাসতেন, ওদের এইসব খেলাতে। হাসির কী যে তিনি পেতেন তখন কি আর ওরা তা বুঝতো! তবে সে হাসি মোটেই ওদের খুশী করতে পারতো না, বড়দের এই উপহাসকে ওরা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে যেন ক্ষমা করত—নইলে খেলা মাটি হয়।······সেই দিনগুলির সঙ্গে আজকের এই দুপুরের কোনো মিল নেই, এত গরমিলের মধ্যেও কোথায় তবু খুব নিবিড় একটা নিকট সাদৃশ্য রয়েছে। দেবজ্যোতি মুহূর্তের জন্য বর্তমানকে ভুলে চলে গিয়েছিল সেই রাজ্যে! অথচ চোখ দুটো তার এখানেই, দীনদয়ালের এই রুগ্ন মুখের ওপরেই মেলা রয়েছে।

দীনদয়াল হঠাৎ বল্‌লেন—কী এত ভাবছিস হ্যাঁ রে দেবু!

চম্‌কে উঠ্‌ল দেবজ্যোতি, নিজের দিবাস্বপ্নকে হাসি দিয়ে ঢাকতে গিয়ে যেন আরও বেশি করে দেখিয়ে ফেল্‌ল—কই, কিছু না ত!

—বুঝেছি, তোকে খুব ভাবনায় ফেলেছি, না রে!

—তা কেন হবে? আপনি বড় বেশি চিন্তা করছেন। একবারও যদি মনে করতেন যে, আমরা আপনার ভাবনার ভাগীদার, তাহলে কিছুতেই এসব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাছাড়া আমি ত মনে করি যে আপনি শীগ্‌গির সেরে উঠতে পারেন, যদি দুর্ভাবনাগুলো দূর করে ছান!

—হুঁ! পারি। তুই ত এতকাল দূরে দূরেই ছিলি রে! তোর কথাই কি কম ভাবিয়েছে এই বুড়োকে! তুই যে আমার কত বড় ভরসা তা আর কেউ না জানলেও তুই ত জানিস। তবে কেন আসিস নি?

চোখের জল দিয়ে এতবড় কলঙ্ককে ধুয়েমুছে ফেলা যায় না। কথার কৈফিয়ৎ আরও হাস্যকর। তাছাড়া দেবার মত কৈফিয়ৎই কি দেবজ্যোতির কিছু আছে নাকি? স্বীকার করতে গেলে নিজের অক্ষমতাকেই দুপুরের প্রখর আলোতে মেলে ধরতে হয়—বল্‌তে হয় দীনদয়ালের কল্পিত বিরাট মনুষ্যত্বের অধিকারী দেবজ্যোতির সঙ্গে শ্রমিক, ব্যর্থপ্রেমিক এই যুবকটির দূরতম মিলও নেই। কিন্তু এত বড় আঘাত ত সে জেনে শুনে দীনদয়ালকে দিতে পারে না। তাই রুদ্ধ বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠে বল্‌ল—ক্ষমা চাইছি। আর কখনও হবে না কাকামণি!

দীনদয়াল চোখের জল সামলাতে পারলেন না। শীর্ণ হাতখানা দেবজ্যোতির লোমশ শ্রমপুষ্ট পেশীবহুল হাতের উপর রেখে বল্‌লেন—পাগ্‌লা!

পিঠের ওপর মৃদু স্পর্শে দেবজ্যোতি ঘাড় ফেরালো। মিণ্টু দীনদয়ালের দৃষ্টি বাঁচিয়ে দেবজ্যোতিকে এ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ইঙ্গিত করছে।

পাশের ঘরে গিয়ে মিণ্টু বেশ সহজ ভাবেই বল্‌ল—ওঁকে সামলাতে সময় দেওয়া দরকার। এমনিতেই তোমাকে দেখে উনি মনে মনে অস্থির হয়ে পড়েছেন। এসময়ে মানসিক উত্তেজনা রোগীর ক্ষতি করে, বোঝো ত! তাই ডাকলাম।

দেবজ্যোতি জবাব দিল—হুঁ!

দুটো ঘর যেন সম্পূর্ণ আলাদা দুটো জগৎ। পাশের ঘরে বসে যে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছে দেবজ্যোতি, এ ঘরে তার বিপরীত একটা অপরিচিত অস্বস্তিকর মানসিক অবস্থা। একই বাড়ীতে, একই মানুষের সান্নিধ্য ত। মনে হচ্ছে, মিণ্টুকে সে যেন এর আগে কখনও দেখেনি! আজকের এই মিণ্টু নূতন মানুষ। ওর ব্যক্তিত্বের পাশে নিজেকে কেমন ছোট মনে হচ্ছে—দেবজ্যোতির মুখে কোনো কথাই জোগায় না।

মিণ্টুই বল্‌ল—আমার কথায় রাগ করলে নাকি? সত্যি আর কোন কিছু ভেবে তোমাকে সরিয়ে দিই নি।

বিব্রত হয়ে দেবজ্যোতি ব্যস্ত ভাবে বল্‌ল—না, না, তা মনে করবো কি জন্যে! আমারই সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

—সেটাই আশা করে নিশ্চিন্ত ছিলাম। যাক, এখন বলো কেমন আছো ?

—ভালো। এখন আমার থাকা-না-থাকায় কিছু ফারাক নেই। তুমি মানে তোমরা কেমন আছো সেটা শুনতে পেলে বাঁচি।

—শোনার চেয়ে দেখার সুযোগ বেশী। দেখতেই ত পেলে। আর কি শুনতে চাও ?

দেবজ্যোতি চমকে উঠল না, সরাসরি মিণ্টুর মুখের পানে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল, কী ওর বক্তব্য! ঠিক যে বুঝতে পারল তা নয়, তবে খানিকটা আন্দাজ করে নিয়ে বল্‌ল—কোনোদিনই তুমি কিছু শোনাতে চাও নি। জানাতে চেষ্টা করেছ তার চেয়েও অনেক অল্প। ভেবেছ, যার জানবার গরজ সে ঠিক জেনে নেবে। কিন্তু বারবার অক্ষমতারই প্রমাণ পেয়েছ মিণ্টু!

—ওসব বড় বড় কথা বোঝার মতো বুদ্ধি আমার কোনোদিনই ছিল না। এখনও হয় নি—বয়সেই কেবল বেড়েছি, বুদ্ধি বেড়েছে এমন কলঙ্ক কেউ দিতে পারবে না দেবুদা! তুমি দুটো সহজ কথা বলো।

সেলাইয়ের কাপড়ে তখনও কাশ্মিরী ফোঁড় তুলছে মিণ্টু, বেশ নৈপুণ্য-সহকারেই অভ্যাসের বশে দ্রুত হাত চল্‌ছে ওর। সেদিকে তাকিয়ে দেবজ্যোতি বল্‌ল—এখন উঠি। এবার থেকে রোজ আসবো।

—এসো। তোমার কাজের ক্ষতি হবে না ত ?

বলবার ভঙ্গীতে এতটুকু উত্তাপ বা শ্লেষ নেই ওর কণ্ঠে। দেবজ্যোতি আশ্চর্য হয়ে গেল। এতটুকু অভিমানের স্ফুলিঙ্গ ঝরল না!

দেবজ্যোতি উঠে দাঁড়াতেই মিণ্টু বল্‌ল—তোমার বোধহয় জলতেষ্টা পেয়েছে, দেবো ?

হাসলো দেবজ্যোতি, সত্যি মিণ্টু বলার পর এখন যেন মনে হচ্ছে গলাটা শুকিয়ে উঠেছে। হাঁ-না কিছুই বল্‌ল না সে। শুধু তাকিয়ে রইল মিণ্টুর অপস্রয়মান সহজ গতিভঙ্গীর দিকে। ও চলে যেতে, টেব্‌লক্লথ-খানা হাতে তুলে নিয়ে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। সূক্ষ্ম পরিচ্ছন্ন স্থচের কাজ। এক সারি গাছ সবুজ রেশমী সুতোর বুনুনিতে সতেজ হয়ে উঠেছে। কি গাছ ?

চনার হবে হয়তো! কিম্বা এমনি শিল্পীরই কল্পনা-প্রসূত গাছের ছবি। তা-ই হোক, নামে কিছু আসে যায় না।

মিণ্টু ফিরে আসতেই দেবজ্যোতি বল্‌ল—ভারি সুন্দর হয়েছে!

হাসিতে উদ্ভাসিত মিণ্টু বল্‌ল—তোমার পছন্দ? আচ্ছা, আমাকে কাপড় আর সুতো এনে দিয়ো, একটা সত্যিকার ভালো কাজ করে দেবো। এটা তো মোটা কাজ।

—এর চেয়েও ভালো? সে কি রকম?

—কাছে থাকলে দেখাতে পারতাম। সেটা ত বিক্রী হয়ে গেছে। রবিনসন সাহেবের একখানা বড়ো বেড্ কভারে খুব সুন্দর ডিজাইনের কাজ করে দিয়েছি!

বিস্মিত দেবজ্যোতি বল্‌ল—রবিনসন সাহেবের বেড্‌কভারের সঙ্গে তোমার হাতের কাজ? মানেটা বুঝলাম না!

হাসলো মিণ্টু—মানে আবার কি! ওদের অর্ডার মাফিক কাজ করে দিয়ে কিছু রোজগার করি। ঘরে বসে যদি কিছু রোজগার হয় ক্ষতি কী!

দেবজ্যোতির মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

সেদিকে তাকিয়ে মিণ্টু হাল্কাস্বরে বল্‌ল—না, আমাদের সঙ্গে তাদের কোনো পরিচয় নেই। নিখিল বাবুই যোগাযোগ বজায় রাখেন। তিনি মধ্যস্থ হয়ে সব-কিছু ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই ছাখো না, টেবিলক্লথটা ত দুটো দুপুরের কাজ—খাটুনী আর কতটুকু, অথচ পাঁচটা টাকা পাবো। কাপড়-সুতো ডিজাইন এসবের সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই। নিখিলবাবুর মাথা থেকেই এ মতলব বেরিয়েছে। তাঁরও লোকসান নেই, উল্টে সাহেব-সুবোদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা পাকিয়ে ফেল্‌ছেন।

দেবজ্যোতি আর শুনতে চায় না। তার সহনশীলনতার ওপরে এভাবে মিণ্টু আরও কতক্ষণ অত্যাচার চালাবে কে জানে! তার মনে কেবল এটাই বড় হয়ে বাজছে যে, মিণ্টুকেও এই পথে অর্থসংগ্রহের কাজে নামতে হয়েছে! মনস্তাপটা তার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ইচ্ছে করছে জোর গলায় চীৎকার করে বলে—'না, না, এ চল্‌বে না।'

কিন্তু মিণ্টুর মুখের পানে তাকিয়ে একটি কথাও বলতে পারে না সে। মিণ্টু যেন কার অসহযোগের জবাব দিতেই এ কাজ হাতে নিয়েছে। একটু আগে যে সূক্ষ্ম সূচীশিল্পের প্রশংসায় দেবজ্যোতি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল এখন সেই শিল্পের প্রতিটি ছুঁচের ফোঁড় তার মনে, চোখে বিঁধছে! চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেও, মনটা অবাধ্য—বার বার সেই তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতিতে দেবজ্যোতিকে বিদ্ধ করতে লাগল।

কারখানার গেটের মধ্যে ঢুকবার সময়ে পর্যন্ত সেই যন্ত্রণায় দেবজ্যোতির মুখখানা ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছিল। শ্রমের মর্যাদা, সময়ের সদ্ব্যবহার, অর্থের প্রয়োজন এবং আরো অনেক যুক্তিই সে মিণ্টুর সপক্ষে জড়ো করল। নিজের ভুলটুকু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। তবু তার মধ্যে যেন একটা অবুঝ মানুষ বার বার মাথা নেড়ে সব-কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্‌তে লাগল—এ সব কিছু নয়! মিণ্টুর উত্তুঙ্গ প্রতিশোধস্পৃহাই দীনদয়ালের পরিবারের প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে সংক্রামিত হয়ে দেবজ্যোতিকে অবজ্ঞা করতে উদ্যত!

তারপরও কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেই দুঃসহ যন্ত্রণায় থেকে থেকে সে কষ্টভোগ করল সেদিন। ঝগড়ু মাঝির মামলার ব্যাপার নিয়ে আলোচনাতেও সে যোগ দিল, সব-কিছুই করল—তবু যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ পেল না। একবারও তার মনে হ'ল না যে, দুনিয়ার ওপর মিথ্যে অভিমান না করে দুঃখের দুর্দশার কাঁদুনী না গেয়ে, এরা যা করছে তা সত্যিই সম্মানের যোগ্য।

বাহাত্তর

জুলাই-এর গোড়াতে রামঅওতার পাটনায় আবদুল বারি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে রওনা হ'ল। এর মধ্যে অবশ্য খান-দশবারো চিঠি আদান-প্রদান হয়ে গেছে। প্রত্যেক চিঠিতেই মানিকপুরের শ্রমিক-সংগঠন সম্পর্কে আশার কথা লিখেছে রামঅওতার। তার উত্তরে প্রথম দিকে বারি সাহেব জবাব দিতেন—হাতে সময় নেই, পরে যা হয় জানাবো। কিন্তু শেষ চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, 'একবার দেখা করো।'

আর যায় কোথায়! কারখানাময় রটে গেল, বারি সাহেব আসছেন।

রামঅওতারকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল হাজার খানেক লোক।

ওদিকে দত্তগুপ্ত ছুটলো মল্লিক সাহেবের বাংলোতে। ইদানীং তিনি যেন অন্যরকম হয়ে গেছেন! দত্তগুপ্ত যতই বকে যায় আপন মনে, মল্লিকসাহেব কোনো সাড়াশব্দ করেন না। এক সময়ে সে শ্রান্ত হয়ে উঠে পড়ে। বেরিয়ে আসবার সময় দত্তগুপ্ত খুব ক্ষুণ্ণ মনে স্থির করে—আর সে আসবে না। অযথা কারখানার কর্তৃপক্ষের জন্য তার একারই কেবল মাথাব্যথা। এত যে খোঁজ-খবর সরবরাহ করে, তার জন্য মৌখিক ধন্যবাদটুকুও মল্লিক দিতে নারাজ। এমনিই হয়, সর্বনাশ যখন শিয়রে এসে দাঁড়ায় তখন বুঝি সাধারণ শুভবুদ্ধিটুকুও মানুষের লোপ পায়!

কিন্তু পরের জন্য যারা মাথা ব্যথা করবেই, তাদের উৎসাহ যোগানোর প্রয়োজন হয় না—তারা নিজেরাই মাথার ব্যথা নিয়ে ছুটে বেড়ায়। দত্তগুপ্তরও সেই অবস্থা। মেসের আর সকলে যখন ইউনিয়ন আর বারি সাহেব নিয়ে ব্যস্ত, সে তখন মল্লিক সাহেবের দরজায় ছুটবে বই কি!

আজকের আসরে সে একা নয়: আগে থেকে অবিনাশ চাটুয্যে এসে বসে ছিল—আর জন-তিনেক প্রায়-অচেনা মুখ। সব দেখেশুনে দত্তগুপ্ত এককোণে বসে পড়ল।

এক সময়ে মল্লিক সাহেব বললেন—তাহলে তামাশা বেশ জমে উঠ্‌ছে, এ্যাঁ!

অচেনাদের মধ্যে একজন বলে বসল—আজ্ঞে হ্যাঁ, এর পেছনে সব পুরণো পাকা মাথা রয়েছে।

অবিনাশ তাচ্ছিল্যভরে প্রতিবাদ করে—হ্যাঁ, ভারি ত পাকা! সব ক'টা রোদ পাকা, না হয় টেসো! ওই তোমার দেবজ্যোতি, কি জিলানী—ওদের যদি পাকা বল্‌তে হয়, তবে আমাদের ছুয়ো দেবে সবাই।

মল্লিক সাহেব হাসলেন—তোমাদের আজকাল মুখেই বড়াই। যদি কাজের হতে তাহলে আর ভাবনা ছিল? রামঅওতারের মতো একটা পেটি লেবারকে তোমরা শায়েস্তা করতে পারো না? অল্‌ গুড ফর নাথিংস্‌!

—আজ্ঞে দু-একটা মানুষ হ'লে শায়েস্তা করতে আর কি লাগে? কিন্তু দল পাকিয়ে ফেলেছে, সেখানেই যে অসুবিধে!

—হুঁঃ! পাকানোর আগে কাঁচাতে পারো নি?

ব'লে মল্লিক সাহেব গ্লাসে চুমুক দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ হাতে মাথা রেখে টেবিলের উপর ঝুঁকে রইলেন।

আর সকলে চুপচাপ পুতুলের মতো বসে আছে তাঁর দিকে তাকিয়ে।

এক সময়ে মল্লিক সাহেব বল্‌লেন—এবার ওরা নীচে থেকে বনেদ শক্ত করে গেঁথে তুল্‌ছে। না? এক কাজ করো। সোজা রাস্তায় হবে না। এক-একটাকে ধরে আসামী বানাও।

—আজ্ঞে?

—আজ্ঞে নয়। এই হচ্ছে সোজা রাস্তা। হরদম থানায় ডায়েরী লাগাতে হবে। সে ব্যবস্থা করা যাচ্ছে। এখন তোমরা বিদেয় হও। আমার এখানে আর ঝামেলা বাড়িয়ো না। আব্‌দুলই জানিয়ে দেবে কাকে কি করতে হবে।

সবাই একসঙ্গে উঠে পড়ল—আজ্ঞে আচ্ছা।

ঘরখানা ফাঁকা হয়ে গেল। এককোণে দত্তগুপ্ত শুধু বসে রইল।

কিছুক্ষণ নীরবেই কাটলো। মল্লিক সাহেব আরও একটু সুরাপান করলেন। তারপর মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন—কি, মালিক মশাই-এর কি হুকুম! গেলে না যে—এ্যাঁঃ!

দত্তগুপ্ত একটু হাসলো।

মল্লিক শ্লেষের হাসি হেসে কটাক্ষ করলেন—চল্‌বে নাকি একটু।

—আজ্ঞে কী যে বলেন !

—বুঝেছি, কর্মচারীর সঙ্গে মদ খেলে তোমার মর্যাদা নষ্ট হবার ভয় আছে !

দত্তগুপ্ত উঠে পড়ল, বল্‌ল—আজ্ঞে, ঠাট্টা করছেন তা কি আর বুঝি না !

—হুঁ, বোঝো দেখছি সবই—তবে বড় দেরীতে। আমিই তোমাকে বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না। শুনেছি কম্যুনিষ্ট ইউনিয়ন পত্তনের সময়ে তুমি দল পাকানোর কাজে খুব উঠে পুড়ে লেগেছিলে! আর যখন সেটা ভেঙে এরা নতুন ইউনিয়ন গড়তে শুরু করল, তখনই ডিগ্‌বাজি খেয়ে এই আখড়াতে ফোঁটাতিলক কেটে ভেক্ নিলে ! এ থেকে কী বোঝা যায় বলো !

—সেসব ত অনেক কালের কথা স্যর ! আর যাই বলুন ওটা বল্‌বেন না স্যার, ইউনিয়নের নাম আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

—বটে! তা এখন বলো দেখি, তোমার পুরণো কেচ্ছাটা বিল্‌কুল্‌ ঝুটা কি না ?

—আজ্ঞে না। সব সত্যি। কিন্তু দেরীতে বুঝলেও, শেষ পর্যন্ত ঠিক বুঝেছি যে, ইউনিয়ন ফিউনিয়ন বোগাস—ও দিয়ে আমাদের কোনো ফয়দা উঠ্‌বে না।

—আ-চ্ছা! বাঃ, বেশ বুঝেছ। কিন্তু উল্টোটা কবে বুঝতে শুরু করবে ?

—স্যার আর ভুল হবে না। জানেন ত আমি এখন দাগমারা দালাল। আর এও ত জানেন যে, আজ পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে ফেবারও কিছু নিই নি।

—হুঁ। নাও নি নয়—বলো, পাও নি। তা তোমার ভাবগতিক যাচাই করতে কিছু সময় লেগেছে। এখন কথা হচ্ছে যে, সত্যি যদি আখের গোছাতে চাও ত চলে এস। বলে ফ্যালো তোমার কি কি চাই। সেটা জেনে নিয়ে তারপর বল্‌বো—তোমাকে কি কাজ করতে হবে। ফুঁকো দালালরা ধোপে টেকে না হে। চটপট মতলবটা ফাঁস করো।

—আজ্ঞে আমি কোম্পানীর উন্নতি চাই।

—নাঃ, চালটা দামী। বুঝলাম, তার বদলে কোম্পানী তোমার কি উন্নতি করতে পারে সেটা শুনতে চাও—এই ত!

—আমার উন্নতি স্যার, বিধাতা এসেও করতে পারবে না। নইলে এত বছর ফাঁকি না দিয়ে গাধার মতো খেটে গেলাম, কই কিছু হ'লো কি? ওই কথাটি বল্‌বেন না, ও বরদাস্ত হয় না।

—দোহাই তোমার ওই কথাটি বলো না, আমারও ওটা বরদাস্ত হয় না। আজ পর্যন্ত অনিরুদ্ধ মল্লিক কারুকে দিয়ে ফোকটে খাটিয়ে নেয় নি, নিজেও খাটে নি। হ্যাঁ কোম্পানী মাস গেলে এতগুলো করে টাকা দেয় বলেই তার স্বার্থ আমি দেখি। গিভ্ এণ্ড টেক—এই হ'লো নীতি, বুঝলে! তোমার পরিবার সন্তান আছে ত?

—আজ্ঞে তা আছে। তবে দেশে—

—তাদের কাছে রাখতে চাও?

—কে না চায় স্যার!

—পথে এসো। তাহলে চাও কোয়ার্টার। আর কি? কিছু কিছু নগদও পাবে, সেটা কাজের ওপর নির্ভর করছে। আজ যাবার আগে শ খানেক টাকা নিয়ে যাও—তাতেই ফ্যামিলি আনানোর খরচ চলে যাবে, কি বলো?

দত্তগুপ্ত নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। জীবনে এতবড় বিস্ময়কর কথা সে এর আগে শোনে নি। কাজেই মল্লিক সাহেবের কথার উত্তর দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো। কোয়ার্টার পাবে সে!

আর অনিরুদ্ধ মল্লিক পাকা জহুরীর মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি বল্‌লেন—এই হচ্ছে এদিকের দড়ি। আর তোমার দিক থেকে কাজ হচ্ছে, এই যে ক'জন এখানে এতক্ষণ বসে ছিল, তাদের উপর নজর রাখা। আরও কয়েকজনের ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে, তাদেরও চিনিয়ে দেব। শুধু একটি কথা মনে রাখবে—আব্দুলের সামনে আমার সঙ্গে ওসব নিয়ে আলোচনা করবে না। তখন শুধু পাগলামী করবে—ক্লিন

মালিকের মতো, এই যেমন এতদিন আমার সঙ্গে করে এসেছ। ঠিক সেই ধরনের।

—আজ্ঞে আচ্ছা। কিন্তু শেয়ার আমি সত্যিই কিনেছি স্যার। আর যাদের কথা বল্‌ছেন তাদের সকলের মুখ ত খুব ভালো করে দেখি নি!

—দেখে নেবে। কাল সকালে ওরা সবাই ডিউটির আগে, রাঙাপাড়াতে এগারোটা তালগাছ যেখানে রয়েছে সেই খানে গিয়ে জুটবে, আব্দুলের সঙ্গে ওরা দেখা করবে। তুমি কাছাকাছি থাকলেই ওদের দেখা পাবে—মানে যারাই ভোরবেলা চিম্‌নীর দিকে না হেঁটে তার উল্টো দিকে যাবে, তারাই আব্দুলের কাছে যাচ্ছে, বুঝবে—কী, পারবে?

—খুব পারবো স্যার।

—তাহলে এখন সরে পড়ো। দেখি তোমাকে দিয়ে কোম্পানীর উন্নতি কি ধাঁচের হয়!

—আচ্ছা চলি স্যার।

—দাঁড়াও, টাকাটা নিয়ে যাও। আর কোয়াটার্স সম্পর্কে তিনদিন পরে একটা দরখাস্ত দেবে, এস্‌টাব্‌লিশমেণ্টে। লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারকে বলে দেবো। পনেরো দিনের মধ্যে স্যাংশান পাবে। টাকাটা কিন্তু দেশে পাঠাতে ভুলো না—আর চিঠিও দিতে পারো, ওদের তৈরী হয়ে থাকবার জন্যে। হ্যাঁ, তা পারো। তবে এটা জেনে রেখো, বেচাল দেখলে রেহাই নেই—একেবারে স্বর্গ হইতে ঝেঁটিয়ে বিদায়। বিধাতাও কখনও ঠেকাতে পারে না আমার হুকুমকে।

হাসিমুখে দত্তগুপ্ত বল্‌ল—টাকাটা তাহলে এখন দেবেন না স্যার। এত আগে যদি পাঠাই ত শেষে ওদের আনবার সময়ে আবার ধার করতে হবে। বোঝেন ত অভাবের সংসার, গলা ডুবিয়ে বসে থাকতে হয়!

—সে ভাবনা আমার। বলি ধারদেনাও ত শোধ হওয়া চাই। এটা পাঠিয়ে দাও। তারপর দরকার হয়, আবার দেখা যাবে। আমার ভাণ্ডার আছে তোমা সবাকার তরে!

ব'লে মল্লিক সাহেব পানপাত্রে লম্বা চুমুক দিলেন।

টাকা নিয়ে দত্তগুপ্ত বেরিয়ে পড়ল খুশি মনে। সারাটা পথ তার মনে হ'ল, ভগবান আছেন! তার সাক্ষাৎ প্রমাণ ত দত্তগুপ্তর পকেটেই রয়েছে। আর বার-বার প্রণতি জানালো মল্লিক সাহেবের কূটবুদ্ধিকে—চরের পিছনেও তিনি চর লাগাবার কথা ভাবেন! লোকটার কতো বুদ্ধি!

রামঅওতারকে পাঠিয়ে দেবার পরেই দেবজ্যোতির ওপর 'মুখিয়ারা' প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। "আর দেরী করা চল্‌বে না 'গুরু'।" কোথা দিয়ে কি করে যে সে 'গুরু' হয়ে গেছে তা দেবজ্যোতি টের পায় নি। তাকে হিন্দুস্থানী পাণ্ডারা গুরু বলেই ডাকে। আর তাতে সাড়া না দিলে অনর্থ বেধে যাবার উপক্রম হয়। কাজেই দেবজ্যোতি গুরু! সেবারে বারি সাহেব চলে যাওয়া নিয়ে যে কেলেঙ্কারী হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে—সবাই সচেতন হয়ে রয়েছে এ সম্পর্কে।

সংগঠনটা আপনা থেকেই মোটামুটি গড়ে উঠেছে। যদিচ ইউনিয়নের সরকারী কোনো নূতন খাতাপত্র পত্তন হয় নি, চাঁদাও আদায় করা হচ্ছে না, তবু কাজ চল্‌ছে।

চাঁদা নেই কিন্তু আদায়পত্র আছে, অনেকে স্বেচ্ছায় মজুরী থেকে দু-চার টাকা ধার দিচ্ছে। একটা কাঁচা খাতা রামঅওতার করেছে—তাতে খরচ এবং জমার হিসেব রাখে। যেহেতু ইউনিয়নের প্রস্তাবিত সভাপতি পদার্পণ করেন নি, সেহেতু নতুন চাঁদার বইও ছাপা হয় নি। তবে সব কিছুরই খসড়া তৈরী রয়েছে। একবার সভাপতির সম্মতির অপেক্ষামাত্র—তারপর কাজ হবে তড়িৎগতিতে।

সকলেই আশা করছে বারি সাহেবকে সঙ্গে নিয়েই রামঅওতার ফিরবে। যেখানে সামরিক ছাউনি হয়েছিল—একশ' চুয়াল্লিশ ধারার এলাকা পেরিয়ে, বকুলপুর আর রাঙাপাড়ার মস্ত মাঠখানা পড়ে রয়েছে, সেখানেই বিরাট জনসভা হবে। তারপর ত কোম্পানীর সঙ্গে সদরেই লড়াই শুরু করা যাবে।

দেবজ্যোতিকে ওরা সবাই ইউনিয়ন অফিসে ধরে নিয়ে গেল। সম্মানিত অতিথিকে বরণ করার জন্যে কি কি দরকার তার একটা ফর্দও তৈরী হ'ল।

প্রত্যেকটি ট্রেনের সময়ে ষ্টেশনে যাতে লোক মোতায়েন থাকে তারও একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা হ'ল। যাদের কারখানাতে সে সময়ে ডিউটি থাকবে তারা বাদে সকলেই থাকতে রাজী। কিন্তু এরকমভাবে গড ধরে ত কাজ হয় না, অতএব যাতে প্রত্যেক ট্রেনে দুশো লোক অবশ্যই থাকে তার জন্য কয়েক জনের উপর ভার দিয়ে দেওয়া হ'ল। আরও অনেক ছোটখাট বন্দোবস্তের ব্যবস্থা চুকিয়ে দেবজ্যোতি যখন কোয়ার্টারে ফিরল তখন পথঘাট জনশূন্য।

অবশ্য একেবারে জনশূন্য নয়, ক্যাথলিক চার্চের সামনে একটি ছায়ামূর্তিকে যেন নড়াচড়া করতে দেখা যাচ্ছে। লোকটা কে? এত রাত্রে ওখানে কি করছে দাঁড়িয়ে? দেবজ্যোতি কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল। পথ ছেড়ে ঘাসের ওপর দিয়ে খুব কাছাকাছি এগোতে এগোতে দেবজ্যোতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছায়ামূর্তির উপর নজর রাখে। কিন্তু লোকটার ত বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখা যাচ্ছে না। একটু যেন টল্‌ছে। আর বিড় বিড় ক'রে কি যেন বল্‌ছে,—হ্যাঁ ইংরেজীতেই জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বল্‌ছে লোকটি। মাতাল! কিন্তু মদ খেয়ে উপাসনা মন্দিরে আসবে কেউ?

আরও একটু কাছে গিয়ে দেবজ্যোতি একটু উচ্চকণ্ঠেই প্রশ্ন করে—কে? কে ওখানে?

রাত্রির স্তব্ধতায় কথাগুলো দেবজ্যোতির নিজের কানেই খুব রূঢ় হয়ে বেজে ওঠে। ছায়ামূর্তি চমকে উঠ্‌ল। সাড়া এল যেন অনেক দূর থেকে—ওউ গড্‌। তুমি তাহলে আমার কথা শুন্‌তে পেয়েছ! হে ঈশ্বরের সন্তান, তুমি যখন পাপীকে দয়া করেছ, তখন সামনে এসে শোনো আমার দুঃখের কথা।

ছায়ামূর্তিটির কণ্ঠস্বর করুণ, কিন্তু তাতে শ্রদ্ধার অভাব নেই।

পিছনে দাঁড়িয়ে লোকটির পিঠে হাত দিয়ে দেবজ্যোতি বল্‌ল—মনে হচ্ছে তুমি ঠিক প্রকৃতিস্থ নও। বলো, তোমার কি কাজে আসতে পারি?

এবার মুখ ফিরিয়ে লোকটি দেবজ্যোতিকে দেখল। এতক্ষণ দেবজ্যোতি ঠিক বুঝতে পারে নি, ভেবেছিল কোন প্রৌঢ় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হবে হয়ত। কিন্তু সাম্‌নাসামনি মুখখানা দেখে সে অবাক হয়ে গেল—ছোকরার বয়স বড় জোর বাইশ তেইশ হবে। দেবজ্যোতিকে দেখে সে বল্‌ল—ওঃ, তুমি!

তুমি ত মানুষ! কিন্তু আমি মানুষের কাছে কোনো সাহায্য চাই না, ঈশ্বর ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে পারবে না আমাকে। তুমি চলে যাও পথিক!

দেবজ্যোতি ছোক্‌রার হাত ধরে বল্‌ল—এত রাত্রে এখানে কি জন্যে এসেছ ভাই?

—আমি? আমি এসেছি—আমার খুশী। বেশ করেছি। কিন্তু তুমি, একটা নেটিভ্‌ ইণ্ডিয়ান, তোমার কি দরকার তাতে?

দেবজ্যোতি একটুও চটল না। সে বলে—তোমার ঈশ্বরই আমাকে ডেকে এনেছেন।

—হাঃ, হাঃ, হাঃ! ঈশ্বর বুঝি তোমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন? ওয়েল-ওয়েল, সে লোকটার মতিগতি যেরকম তা যেতেও পারে। তা সেই হিদেনটা তোমাকে বুঝি বল্‌ল যে, জনকে একটু দেখো! থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু এবার তুমি যেতে পারো বন্ধু। কিছু মনে ক'র না! তোমাকে চটাতে চাই নে। আরে ভাই চটিয়ে কি লাভ বলো, ঈশ্বর এখন তোমাদের ক্যাম্পেই আশ্রয় নিয়েছে। তা নিয়ে ভালোই ক'রেছে। তার খুব বুদ্ধি! তোমাদের হাতে ভারতবর্ষ চলে যাচ্ছে—না গিয়েই বা করে কি গড্‌ বেচারা!

বল্‌তে বল্‌তে ছোকরা দেবজ্যোতির হাত ধরে ঝুঁকে পড়ল। একবার ওপর দিকে তাকালো। তারপর মাটিতে বসে পড়ল, বল্‌ল—বসো ব্রাদার! তোমার সঙ্গে যখন ঈশ্বরের এত খাতির তখন তোমাকেই বলি। আঃ, গলাটা শুকিয়ে আসছে। চলো না এডিথের দোকানে গিয়ে গলাটা ভিজিয়ে আসি।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—বাড়ি চলো, অনেক রাত হয়েছে।

—বাড়ি? না, না, ও কথা বলো না। সেখানে আমি আর ফিরব না। পেগী শালীর মুখ দেখব না। নেভার! সে কি করেছে জানো? সে বিশ্বাস-ঘাতক, সে আমাকে ঠকিয়েছে—She is a bitch! That damned hoar. ওই Bastard সিল্‌ভাকে নিয়ে আমার বিছানায় শুয়েছে! ওঃ, ওঃ—ও শয়তানকে আমি খুন করব! চলো আজই শালাকে জাহান্নামে পাঠাবো!

ছোকরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। দেবজ্যোতি তাড়াতাড়ি তাকে ধরে না ফেল্‌লে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ত। মনে মনে দেবজ্যোতি প্রমাদ গণল। এত

রাতে এই মাতালকে এখানে ফেলে রেখে সে চলে যায় কি করে? কিন্তু ওর সঙ্গে থেকেও ত কিছু করা যাচ্ছে না। সহজে ওকে এখান থেকে নড়ানো যাবে না। সে বল্‌ল—ছাখো ভাই, বাড়ি চলো। তোমার কোয়ার্টার নম্বর বলো, সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—ও, তুমি বুঝি পেগীর সঙ্গে লপ্‌টা-লপ্‌টি করতে চাও? You swine! হুঁ বুঝেছি। সেটি হচ্ছে না। সে বড় হুঁশিয়ার মেয়ে। ভাবছো যে, সিল্‌ভার সঙ্গে শুয়েছে বলে তোমাকেও মজা লুটতে দেবে! নেভার! পেগী হচ্ছে আমার প্রাণের পায়রা। নেহাৎ আমার ওপরওলা ব্যাটাচ্ছেলে সিল্‌ভা, তাই কি করবে, আমার উন্নতির মুখ চেয়েই—কিন্তু ওর এতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক হয় নি! মাইরী বল্‌ছি, পেগীর একটুও দোষ নেই। শালা সিল্‌ভা স্রেফ পোজিশনের সুযোগ নিচ্ছে। That son of a bitch!

কথাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে থেমে থেমে বল্‌ছে ছোক্‌রা।

দেবজ্যোতির ইচ্ছে করে চলে যেতে। শ্রান্তিতে তার চোখ দুটো জ্বালা করছে। কপালের শিরা দপ্‌দপ্‌ করছে। ছোক্‌রার শূন্য দৃষ্টির দিকে নজর পড়তেই সে আবার ভাবতে শুরু করল, ওকে ফেলে যাওয়া চলবে না।

ছোক্‌রা বকেই চলেছে—এই নোংরা আবহাওয়া থেকে মুক্ত করো ঈশ্বর! এখানে সব শালা শয়তান। যতো সব ওপরওয়ালা সব শালা লম্পট মাতাল। কেবল পরের বৌ-বোনকে নিয়ে ফূর্তি লুটে চলেছে। আর তুমি, তুমি এখানে এই ক্রশের দিকে তাকিয়ে কি দেখচ ঈশ্বর? ইচ্ছে করলে তুমি ত পারো মানুষকে বাঁচাতে! তবে কেন এই চ্যাংড়ামীর রং-তামাশা খেলাচ্ছ? নাকি তুমিও অনাচারকে মাথায় নিয়ে ধেই-ধেই ক'রে নাচতে ভালোবাসো? বলো, বলো-বলো!

ছোকরা এবার চেরা-ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করে উঠলো। তারপরই ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লো, দেবজ্যোতির গলা আঁকড়ে ধরে—গড্‌ হ্যাজ লেফ্‌ট আস। আমাদের পাপে বিরক্ত হয়ে তিনি তোমাদের ঘরে চলে গিয়েছেন। তিনি দয়া করবেন না। নইলে সাড়া মিল্‌ল না কেন? Oh brother, tell Him to come back! Please—

দেবজ্যোতি নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে ব্‌লল—হ্যাঁ, ঈশ্বর যখন আমাদের ঘরেই এসেছেন, তখন তুমি আমার কথা শোনো—তোমার ভালো হবে।

চক্‌চকে দুটো চোখ রাত্রির জ্যোৎস্নাতে বড় করুণ দেখাচ্ছে। সেই চোখ মেলে ছোক্‌রা বল্‌ল—বলো কি করতে হবে। আমি রাজী আছি।

—তোমার কোয়ার্টারে ফিরে যেতে হবে।

—বল্‌ছো। তুমি বল্‌ছো? ফিরে গেলে ঈশ্বর আমার কথা শুনবেন? তিনি আবার ফিরে আসবেন?

—আসবেন।

—বেশ যাচ্ছি! চলো। না, তোমার সঙ্গে গিয়ে দরকার নেই, আমি ঠিক চলে যেতে পারবো। তাছাড়া, পেগী মাগীর ওপর তোমারও নজর আছে।

—না, আমি পৌছে দিয়ে আসি।

—যাবে? নেহাতই যদি যেতে চাও, আমি বাধা দিতে পারবো না, ঈশ্বর যে তোমার হাতের মুঠোয়! আচ্ছা চলো। কিন্তু এখনো যদি গিয়ে দেখি সেই শয়তান* রয়েছে—তাহলে? না, না, আমি ফিরবো না। পেগী মরুক, ওই সিল্‌ভার সঙ্গে জাহান্নামে যাক! বাট্—কিন্তু তাই বা কেন? ওতো আমার স্ত্রী। ওকে আমি শায়েস্তা করবো। অল্‌ রাইট্। ছাখো, তোমার গিয়ে কাজ নেই, আমি একাই যাই—আজ ও শালীকে উলঙ্গ ক'রে পথে বার করে দিই, বুঝুক মজা! তা আমি পারি, আমার কোয়ার্টার—আলবৎ পারি!

দেবজ্যোতি এরকম নোংরামির কথা কখনো শোনে নি। থেকে থেকে সে শিউরে উঠ্‌ছে। ইচ্ছে হচ্ছে ছোকরার নাকে একটা ঘুষি মেরে মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে চলে যায়! কিন্তু পর মুহূর্তে সাম্‌লে নিচ্ছে অতি কষ্টে।

ছোক্‌রা এবার চল্‌তে শুরু করেছে। অসম পদক্ষেপে: কখনো এগিয়ে যাচ্ছে কখনো বা থম্‌কে দাঁড়াচ্ছে। এইভাবে ওরা পিচ্‌ ঢালা পথের ওপর এসে পড়ল। আলোর সাম্‌নে দেবজ্যোতি ছোক্‌রাকে ভালো করে দেখল,—লোকোমোটিভ সেক্‌শনে কাজ করে ছোক্‌রা। কারখানাতে বেশ ফূর্তিবাজ ব'লে সবাই ওকে ভালবাসে।

দেবজ্যোতি ওকে সজোরে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে বল্‌ল—জন্! জন্!

ছোক্‌রা এবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মুখ তুলে তাকালো—কে ? কি বল্‌ছ !

—বল্‌ছি, অনেক রাত হয়েছে। বাড়ি চলো।

একটু হেসে জবাব দিল—যাচ্ছি ত ভাই। কিন্তু তুমি বাড়ি যাও। কিচ্ছু ভেবো না। আমি মোটেই মাতাল হই নি। একটু বেশি মাত্রায় মদ খেয়েছি। বুঝলে? এখন ঠিক হয়ে গেছে। মদ বেশি খেলেই আমাকে কে যেন ঘাড় ধরে চার্চে নিয়ে আসে। আর ওই বাজে গির্জাটার চারপাশে যতো ভূতের আড্ডা—শালারা একা পেয়ে আমার ওপর ভর করে। কী যে হয়!

একখানা মোটর এসে পড়েছে ওদের পিছনে। জনের হাত ধরে পথের এক পাশে সরে দাঁড়াল দেবজ্যোতি। কিন্তু মোটরখানা ওদের কাছেই দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ি থেকে একটি মেয়ে নেমে এসে জনের আর একটি হাত ধরল। দেবজ্যোতির চোখেমুখে বিস্ময়ের সীমা নেই। আশ্চর্য সুন্দর একখানি মুখ।

মেয়েটি বল্‌ল—ওঃ, জন্‌ তোমাকে নিয়ে আর পারি না। রোজ এই রকম ক'রে জালিয়ে মারবে!

মেয়েটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল জন—পেগী-পেগী ডিয়ারী! তুমি এসেছ ?

পেগীর গলা জড়িয়ে ধরে জন গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল, দেবজ্যোতির বিস্মিত বিভ্রান্ত দৃষ্টির সাম্‌নে এক রাশ ধোঁয়া ফেলে রেখে গাড়িখানা সগর্জনে চলে গেল।

দেবজ্যোতিদের আশেপাশের সব কোয়ার্টারের আলো নিভে গেছে। পাড়া নিঝুম, নিশুতি। পথের আলো আর রাতচরা কুকুরেরা শুধু সজাগ। একটিমাত্র জানালা থেকে আলো এসে পড়েছে বাইরের বাগানে, সেটি দেবিকার ঘর। এখনও জেগে রয়েছে দেবিকা। আজকাল তাই থাকে ও। অথচ এ নিয়ে কোনো কথা বলতে গেলেই অনর্থ বেধে যাবে। যদি দেবজ্যোতি বলে—'তুই খেয়ে নিলেই পারিস।' অমনি জবাব আসবে—'কারুর জন্যে আমার বসে থাকতে বয়েই গেছে। ইচ্ছে হয় না তাই খাই না। বাবা যে পয়সা খরচ করছেন সেটা আমার লেখাপড়ারই জন্যে। আড্ডা ইয়ার্কি দিয়ে

শেষকালে ফেল করার ভয়ে দেশের-দশের কাজের দোহাই দিয়ে সবকিছু নষ্ট করবার ইচ্ছে নেই। তাই পড়াশুনো করতে হচ্ছে রাত জেগে।' আরও বক্রোক্তি মাঝে মাঝে দেবিকার ক্ষুরধার ওষ্ঠে প্রকাশ পায়, যখন ও বলে—আত্মহত্যা করলেই বড় প্রেমিক প্রমাণ করা যায় ইত্যাদি।······আলো দেখতে দেখতে দেবজ্যোতি নিজেদের কোয়ার্টারের দিকে এগিয়ে আসে। দেবিকার জন্য একটু বেদনাও বোধ করে। মুখে যা-ই বলুক মেয়েটা সত্যিই দেবজ্যোতিকে ভালোবাসে। আর দেবজ্যোতি যেমনটি হতে পারলে দেবিকা খুশী হতো, তেমনটি দেবজ্যোতি হতে পারে নি ব'লেই ওর সুস্পষ্ট অভিমান বিবিধ ভাবে ব্যক্ত করে ফেলে। শুধু দেবিকা কেন কেউই ত দেবজ্যোতিকে নিজের মানস কল্পনার অনুরূপ দেখতে পায় নি। দেবজ্যোতি নিজেই কি যেমনটি হতে চেয়েছে তেমনধারা হয়ে উঠতে পেরেছে? বারবার নিজেকে কাটাছেঁড়া ক'রেছে, বদলেছে—তবুও আশানুরূপ হবার সৌভাগ্য মিল্‌ছে না। চরম আঘাত দিয়ে যে মানুষটি চলে গেল সেও ওই কথাটাই জানিয়ে দিয়ে গেল ত!

না, দীর্ঘশ্বাস আর ফেলবে না দেবজ্যোতি। দুনিয়ার এই বিচিত্র ঘটনা-প্রবাহের বিরুদ্ধস্রোতে চলবার যোগ্যতা তার নেই। অযথা বাধার প্রাচীর তুল্‌তে চেষ্টা ক'রে, হাস্যাস্পদ হবার মতো অবাঞ্ছিত লাঞ্ছনা কুড়িয়ে কী লাভ! তার চেয়ে সহজ ভাবে সকলের মুখ চেয়ে চলুক সে। এদের সঙ্গে থেকে, এদের মতো হয়েই সে চলুক—অন্ততঃ প্রমাণ হোক যে দেবজ্যোতি নিছক সাধারণ মানুষ। কোনো আয়াস না ক'রে যা হওয়া যায় তাই হবে সে। নিজেকে সংস্কার করার চেষ্টায় কাজ নেই। সে শ্রমিক নয়, সে নেতা নয়, সে আদর্শবাদী নয়,—সে একটি মানুষ, এই পরিচয়টুকুই ত যথেষ্ট।

দরজা খুলে দিয়ে দেবিকা বল্‌ল—কী! মজ্‌দুরী দুনিয়া কায়েম ক'রে ফিরতে পারলে?

—আর বলিস কেন, পড়েছিলাম এক পাগলা মাতালের পাল্লায়।

—বটে? পাগল আবার মাতাল দুই একসঙ্গে! বলো কি?

—ঠাট্টা নয় রে, সত্যি।

—তোমাদের কংগ্রেসী ইউনিয়নে যে ও ছাড়া আর বেশি কিছু কাজের লোক জুটবে না সে ত জানা কথা।

দেবজ্যোতি হাসলো—তবু তো আমাদের ইউনিয়নে কাজের মানুষ আছে রে! কমিউনিস্ট ইউনিয়ন ত ছিল একটা ফসিলের মতো, সাড়াশব্দও হতো না।

—কাজ কোন্‌টাকে বলো, পাগলামী না মাত্‌লামীকে ?

—বাজে বকিস নে, ক্ষিদের সময় খাবার চাই, খেতে দেওয়াটাই কাজ। তার বদলে শুকনো পলিটিক্সের কচ্‌কচি হচ্ছে বদ্ধ পাগলামী। নে খাবার আন্‌ তো!

তিয়াত্তর

প্রথম যেদিন পুরণো ইউনিয়ন ভাঙা হয়েছিল তার ঠিক এক বছর পরে অর্থাৎ ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অগাষ্ট আজ। সাঁওতাল পল্লী ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তর এখনো বর্ষণের ধারাস্নান-প্রতীক্ষায় তৃষিত অন্তরে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেই প্রান্তরে প্রায় হাজার পাঁচেক শ্রমিক এবং সমর্থক সমবেত হয়েছে আব্দুল বারি সাহেবের মুখের কথা শোনবার জন্য।

রুক্ষ, রসহীন, নিদাঘদগ্ধ ধরণীর মত তারাও চায় জীবনের উষরতাকে স্নিগ্ধতায় পুনরুজ্জীবিত করতে। তাদেরও মনের কথা—দাও আমাদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের স্বস্তি, আমাদের অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, দাও সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষার দীপ জ্বালাও আমাদের অন্ধকার মনে, মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার দাও আমাদের সন্তান-সন্ততিকে।

বারি সাহেবের বক্তৃতায় আগুন ঝরে পড়তে লাগলো। তাঁর কণ্ঠে রণতূর্যের আহ্বান ধ্বনিত হয়ে উঠলো। আধ ঘণ্টা ধরে তিনি শ্রমিক জীবনের শোচনীয় সমস্যার কথা বল্‌লেন। আর বল্‌লেন, প্রথমে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এটা অবধারিত সত্য যে, কর্তৃপক্ষ সহজ পথে চল্‌তে সম্মত হবে না। এর আগে টাটানগরেও অনুরূপ অবস্থা হয়েছিল। সেখানে লড়াই ক'রে ক'রে বারি সাহেবের মনের হাত-পা জখম হয়েছে। তার জন্য তিনি মোটেই অনুতপ্ত বা ভীত নন্—বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর সেই মানসিক শক্তি রয়েছে যা দিয়ে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত অন্যায়-অত্যাচারের বিপক্ষে লড়াই চালিয়ে যেতে পারবেন। অতএব এই শ্রমিক সংস্থার পক্ষ সমর্থনে তিনি জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত আছেন।

এখন নব-গঠিত ইউনিয়নের কাজ হবে চাঁদা সংগ্রহ করা। অন্ততঃ এক লক্ষ টাকা তুলতে হবে এখান থেকে। আর তিনি আশা করেন অন্যান্য শ্রমিক সংস্থাও সাহায্য করবে। কোম্পানীর মতলব যে ভালো এমনটা মনে করবার কোনো হেতু নেই।

ইউনিয়নের সহসভাপতি নির্বাচিত হল রামঅওতার সিং। কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যদের নামও ঘোষিত হ'ল,—সমস্বরে সমর্থনের সাড়া এল। এই হ'ল সমারোহ সহকারে নতুন ইউনিয়নের উদ্বোধনী সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। শেষকালে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে উঠল রামঅওতার সিং। তার ভাষণেও অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গ।

ঝগড়ু মাঝির ওপর রবিনসন সাহেব যে অমানুষিক অত্যাচার করেছেন, তারপর মামলা রুজু ক'রে শ্রমিক নেতাদের অযথা হয়রানিতে ফেলেছেন সেকথা উঠল। প্রাক্তন ইউনিয়নের কর্মবিমুখতার উল্লেখ ক'রে সে কমিউনিজম্‌কে একচোট গালিগালাজ করল। তার আক্রমণের মূল লক্ষ্য হ'ল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি, যে রাজনৈতিক দল কংগ্রেসী নেতাদের বন্দীদশার সুযোগ নিয়ে আন্দোলনকে গ্রাস ক'রে ভুল পথে চালিত ক'রেছে, যারা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ স্বার্থের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তাদেরই প্রতি রামঅওতার সিং-এর বিদ্বেষবাণী! নতুবা সর্বহারার স্বার্থ এইভাবে অবহেলিত, অপমানিত হতে পারত কি? পরিশেষে বারি সাহেবকে হাজার হাজার শ্রমিকের, তাদের মা-বোন-ভাই-ছেলে-মেয়ের লাখো নমস্কার-সেলাম জানালো রামঅওতার!

আজ যে বারি সাহেব এদের মাথার ওপর এসে দাঁড়িয়ে সাহস এবং শক্তি যোগাবার দায়িত্ব নিলেন, পথ দেখাবার ভরসা দিলেন এটাই আজকের এবং আগামী দিনের আশার সূচনা। চলো ভাই আগে বাঢ়ো। চাঁদা উঠাও। মাঙ্গকো লেতে আও! আজদীকা সূরজ দর্শনমে আয়া হোগা, আঁখ খুল্‌ কর দেখো ভাই! আপ্‌না রোটীকে সাথ শিক্ষাকো ধ্যান্‌মে রাখথেঁ আও ভাই। মেরে প্যারে বহ্‌নো ঔর ভাইয়োঁ বারি সাহেবকা নামমে জোর সে 'হাঁ' বোলো। রামঅওতারের এ আহ্বানে সভার নারী পুরুষ সমবেত কণ্ঠে সমর্থনসূচক ধ্বনি তুলল।

সভার পর মাঠে এক দফা জটলা চল্‌ল। তারপর বারি সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে নেতারা ইউনিয়ন অফিসে রওনা হ'ল। সেখানে বারি সাহেব রামঅওতারকে বল্‌লেন,—কমিউনিস্টদের এভাবে ঠোক্কর মেরো না সিং,

কোন দিন হয়তো এইজন্যেই তোমাকে হাজতে পুরে দেবে! আর খামোকা গরম বুলি দিয়ে মজদুরের দিল্-দেমাক বিগড়ে লাভ কি। আমাদের সব সময়ে মনে রাখতে হবে, লড়াইটা কোম্পানীর সঙ্গে। রুটির সওয়ালটা আগে,—নিজেদের মধ্যে ঝগড়াটা আগে নয়। আগর মতলব দু-তরফা হয়ে যায় ত কাজ খারাব্ ঠিক হবে। কমিউনিস্টই হোক আর কংগ্রেসীই হোক, চাই যে-কিছু হোক,—মজদুর হচ্ছে মজদুর। তার পরিচয় মাত্র একটিই। এখানে কোনো রাজনীতির ঝগড়া ঢুকলেই সর্বনাশ, বুঝলে রামঅওতার তোমাদের ইউনিয়নের মিটিংএ লোক ত ভালোই দেখলাম। এখন লাখ টাকা তোলো। স্ট্রাইক হবেই। কৈঁউ কি ইয়ে কম্পনি বড়ি খচ্ড়া শয়তান হায়, ইসকো শায়েস্তা বনানে কে লিয়ে আচ্ছি তরেসে তৈয়ার হোনেই পড়েগা।

রামঅওতার মন দিয়ে তাঁর কথা শুনছিল। অভিজিৎ সিং তার পিছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ডোমন সর্দারও দলের মধ্যে রয়েছে, আছে রামকিষণ পাঁড়ে, আরও অনেক রয়েছে, যাদের সততার মোটেই সুনাম নেই। বরং কোম্পানীর পোষা দালাল বলেই এরা কুখ্যাত ছিল এতকাল। তবে সম্প্রতি এদের কার্যকলাপ থেকে বোঝা যায় যে, দালালীতে এরা মোটেই তৃপ্ত নয়। এরা এতবড় সংগঠনের বাইরে থাকতে চায় না। এদের মনে হাতে-হাত মিলিয়ে চলার উদ্দীপনা এসেছে।

প্রথমে অবশ্য একটা আপত্তির সুর তুলেছিল দু-চার জন, কিন্তু রামঅওতার এবং দেবজ্যোতি বলেছিল তার জবাবে,—পুরণো খোলস ফেলে দিয়ে যদি সত্যি শ্রমিকের স্বার্থে এরা হাত লাগায় তাতে ফল ভালো বই মন্দ হবে না। অতএব ওরা সব এসে জুটেছে।

ইউনিয়ন অফিস থেকে দেবজ্যোতি সোজা দীনদয়ালের কোয়ার্টারে হাজির হল। দীনদয়াল এখন অনেকটা সুস্থ। বাড়ির মধ্যে এক-আধটু চলাফেরাও করতে পারেন।

মিণ্টু ছিল রান্না ঘরে। দেবজ্যোতির গলা পেয়েই চায়ের জল চড়িয়ে দিল। দীনদয়াল গল্প করছিলেন অমলের সঙ্গে। অমলও সভাতে গিয়েছিল,

সেখান থেকে বাড়ি ফিরেছে সোজা। সীতানাথও নাকি এতক্ষণ এখানেই ছিলেন এবং ইউনিয়নের বিপক্ষে তক্‌রার করে চলে গিয়েছেন।

দেবজ্যোতিকে দেখেই দীনদয়াল বল্‌লেন—সীতানাথটা চিরকাল ভয়-তরাসে। ইউনিয়ন হওয়া মানেই যেন ওর চাকরী নিয়ে টানাটানি! আর তেমনি তার উল্টো হয়েছে এই ব্যাটা দেবু। হাওয়ার আগে ছোটে, লড়াইয়ের গন্ধ পেলেই হ'ল!

দেবজ্যোতি হেসে উঠল—কেন দেবু কি করল শুনি! স্লোগান দিল, না, সাহেব ঠ্যাঙালো?

—আরে বাবা, দেহটা বিছানায় পড়ে থাকলে কি হয়, মনটা ত সেই রাঙাপাড়ার ময়দানে গিয়েছিল! আবার তোরা গণ্ডগোল পাকালি তাহলে!

—কি করব বলুন কাকামনি!

—তা বটে। আজও যে তিমিরে সেই তিমিরেই! উপায় কি। যাক, যা হবার হবে। দেশ ত স্বাধীন হতে বসেছে, অথচ দিশী সাহেবদের দাপট রোখ্ এক কড়াও কমলো না। তার ফল ভালো হবে কি করে? বারি সাহেব ঠিকই বলেছে, লড়াই হবেই। স্বামী সাহেবকে নিয়ে মিটিং সেই বক্সী বাঁধে, ছবিটা আজও চোখের ওপর ভাসছে রে! নিরঞ্জন আজ কোথায়! সারথীর খবর কে জানে?

দেবজ্যোতির মুখের দিকে তাকিয়ে দীনদয়াল বল্‌লেন—মুখখানা তোর বড্ড শুকনো কেন রে? সারাদিন নাওয়া-খাওয়ার সময় পাস নি, বুঝেছি!

কি যেন সে বলতে চেষ্টা করে, দীনদয়াল বিজ্ঞভাবে ঘাড় নেড়ে হাসলেন—বুঝেছি, ও আর বল্‌তে হবে না। দেখে দেখে মুখস্থ, সব জানি রে!

তারপর হাঁক দিলেন—দীপু—

দীপালি এসে দাঁড়ালো। তার পিছনেই মিণ্টু এলো এক হাতে চায়ের পেয়ালা আর অন্য হাতে প্লেটে রুটি তরকারী। দীনদয়াল ব্যস্তভাবে মেয়েকে বল্‌লেন—ওরে ওতে হবে না। হতভাগা যে রাক্ষসের ক্ষিদে নিয়ে এসেছে। সারাদিন উপোসের পর দু-খানা রুটি, সমুদ্রে পাদ্যঅর্ঘ্য! শোন্ মিণ্টু এক কাজ কর—ও ঘরে ঠাঁই করে দে!

ততক্ষণে দেবজ্যোতি মিণ্টুর হাত থেকে চায়ের পাত্র নিয়ে চুমুক দিয়ে বসেছে।

মিণ্টু রুটির প্লেট নিয়ে ফিরে গেল।

দীনদয়াল বললেন—আচ্ছা বাবা, চা খেলে বেশ করলে। এবার নিশ্চিন্দি হয়ে চান করো, ভাত খাও—খেয়ে আমার মাথাটা কেনো। ওরে হতভাগা কাজের নেশায় কাজ করা এক, আর মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝে চলা অন্য কথা। তা বলে বলছিনে যে, কাজ করবি না। কিন্তু শরীরটাকে অবহেলা করলে অসময়ে কেউ দেখতে আসবে না, বলবেও না—কিন্তু শরীর তার প্রতিশোধ নেবে! বাবা, একটু নিজের দিকে নজর রেখে কাজ করে যাও, ব্যস!

দেবজ্যোতির হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আজ সারা দিনের মধ্যে বাড়ি যাওয়া হয় নি। সকালে ভালো করে আলো ফোটবার আগে সেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে তারপর আর কোনো কিছুই ভাববার অবকাশ মেলে নি। গত রাত্রেও ভালো করে ঘুম হয় নি,—পাটনা থেকে সন্ধ্যেবেলা টেলিগ্রাফ এসেছিল—'বর আসছে তের তারিখ বিকেলের গাড়িতে।' সাঙ্কেতিক খবর। আগে থেকে ঠিক ছিল যে তার করবে শান্তি দেবীর নাম দিয়ে রামঅওতার, একজন অখ্যাত শ্রমিকের ঠিকানাতে—বারি সাহেবের আসবার তারিখ সময় জানানো হবে বিবাহের ইঙ্গিতে। কে বুঝবে? যে জানে সে ছাড়া আর কেউ সন্দেহই করে নি। যদিও ডাক বিভাগের ওপর গোয়েন্দাদের হুঁশিয়ার নজর ছিল সর্বক্ষণ, তবু তার ভেতর দিয়ে আসল খবরটি ঠিক বেরিয়ে এসেছে। অবশ্য একটা প্রকাশ্য টেলিগ্রাফ করেছিল রামঅওতার, Bariji arriving 16th afternoon. Attend. সেটা যথারীতি আগের মতোই বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

খবরটা পেয়ে অবধি শান্তি ছিল না। মিটিংএর যাবতীয় প্রস্তুতির মধ্যে দেবজ্যোতিকে থাকতে হয়েছে। আবার কোন্ দিক দিয়ে কোম্পানীর নতুন আক্রমণ শুরু হবে, সে কথাও ভাবতে হয়েছে—না ভাবাটাই বোকামী! প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্টের প্রতিনিধির হরেক-রকম প্রশ্নের কৈফিয়ৎ দেওয়া, তাদের তৈরী রাখা—ঝামেলার অন্তও নেই। রাতারাতি শহরের আশপাশে

পোস্টার আঁটবার বন্দোবস্ত করা! অবশ্য লোকের অভাব ছিল না, কাজের লোকও ঢের জুটে গিয়েছে—কিন্তু তাদের ঠিক ভাবে চালানোর লোক বিশেষ নেই। যাই হোক—কাজ হয়েছে, এবং বেশ ভালো ভাবেই সভা হয়েছে। তাই খুশীর আনন্দে দেবজ্যোতি মশগুল ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ দীনদয়াল তাকে অন্য জগতে টেনে আনলেন। দেবজ্যোতিকে যেন কে আচম্‌কা প্রায় ভুলে-যাওয়া একটা পৃথিবীর দিকে টানছে।

বাড়াতে হয়তো দেবিকা ভাবছে। কি ভাবছে? যা খুশী ভাবতে পারে।

মিন্টু আবার ফিরে এসেছে। দেবজ্যোতির অন্যমনস্কতায় ধাক্কা দিয়ে বল্‌ল—কি হল, অমন বসে আছ যে? চলো স্নান সেরে নাও, আর কতো পিত্তি পড়াবে?

—অ্যাঁ, হ্যাঁ, এই যাই।

দেবজ্যোতি ভেতরে চলে যেতেই অমল বল্‌ল—আশ্চর্য মানুষ! কাকাবাবু, আপনার সম্বন্ধে ত গল্পই শুনেছি। কিন্তু দেবুদাকে যতো দেখছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি।

দীনদয়াল দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেন—আমি কিন্তু ভয় পাচ্ছি, ওর ভাবগতিক সুবিধের ঠেকছে না। কোন দিন না নিরঞ্জনের মতো মুছে যেতে হয় ওকে!

অমল বল্‌ল—এরকম মানুষের পাশে নিজেকে এত ছোট মনে হয়, কী বল্‌ব! ওঁর মতো মানুষকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় ত দেশেরই সর্বনাশ হবে! কত বড় আদর্শকে, কী সহজ ভঙ্গিতে আত্মসাৎ করেছেন! আজকের সভাতে সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম দেবুদার নিজেকে লুকিয়ে রাখার ব্যাপার দেখে। সবাই এগিয়ে আসতে চায়, নিজেকে জাহির করার জন্যে হ্যাংলামী করে—কিন্তু উনি এড়িয়ে গেলেন এগিয়ে দিলেন অন্য লোককে। অথচ আমরা ত জানি এ ইউনিয়নের মূলে ওই লোকটি প্রাণবস্তুর মতো।

স্নিগ্ধ হাসিতে দীনদয়ালের রোগমুক্ত মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওঁর দু-চোখে তৃপ্তির প্রশান্ত চাহনী। বল্‌লেন—বুড়ো হয়েছি বাবা! এখন যেন সব কিছুকেই আঁকড়ে ধরতে চাই। তাই ভয় হয়, যাকে ভালোবাসি তাকে যদি হারাই, তবে বুঝি বা বাঁচবো না! সেইজন্যে দেবুর এই হাঙ্গামায় জড়ানোটা

সায় পায় না আমার ছোটো মনে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, এরাই তোমার-আমার ভবিষ্যৎ। এদের সাধনার ফল কেউ না-কেউ ভোগ করবেই। সবচেয়ে চড়া দাম দিয়ে যাবে এরা, আর তার—। যাক, পারিনে ভাবতে। আচ্ছা, বাদলের কোন খবর পাচ্ছি নে কেন?

অমল অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে, একটু গলা ঝেড়ে নিয়ে বল্‌লে—কেন, সে ত ভালই আছে। ইটিলির বৌদির ওখানে থেকে একটা কাজের চেষ্টা করছে লিখেছিল এই ত কদিন আগে।

দীনদয়াল বললেন—তা হবে। কিন্তু সেও ত অনেক দিনের কথা। আর অমলা বৌমার অবস্থাও ত তেমন ভালো নয়, এ ভাবে ওর ঘাড়ে বসে বসে কতকাল খাবে বাঁদরটা! তার দুঃসময়ে কোথায় আমরা সাহায্য করব, তা নয়, বোঝা বাড়ানো। এ আমি মোটেই ভালো বলি না। ছোঁড়াটার আক্কেল ছাখো, লেখাপড়া ছেড়ে, হুট্ করে—

—তা চেষ্টা-চরিত্র করতে হবে বই কি!

—তা নয় বুঝলাম। হ্যাঁ, আমি আর ক দিন। কাজের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই, অথচ ওই অনাথা মেয়েটাকে বিপদে ফ্যালার কি দরকার ছিল! চলে এলেই ত পারে বাদল।

অমল বিষণ্ন হয়ে পড়ে। একের পর এক কতো মিথ্যেই বা বলা যায়! ইদানীং দীনদয়াল যেন বাদলের প্রসঙ্গ নিয়ে অত্যন্ত উতলা হয়ে উঠেছেন। রোজই তিনি অমলকে, মিণ্টুকে বলেন—ওকে এবার চলে আসতে লিখে দিই, কি বলো?

কিন্তু ওরা নানা ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে, ফিরে এসেই বা বাদল কি করবে? তবু কলকাতার মতো শহরে চাকরীর বাজার ভালো, চেষ্টা করতে করতেই লেগে যাবে একটা। আর এখানে ফেরা মানেই এই কারখানাতে চেষ্টা করা। এখানে কাজ পেলেও আখের নেই—বিশেষ করে বাদলের মতো উদ্ধত প্রকৃতির ছেলে মানিকপুরে চাকরী পেলেও রাখতে পারবে না। কোন্‌দিন কোন ওপরওয়ালাকে ধরে ধোলাই দিয়ে দেবে। অন্যায়, অত্যাচার সে আদৌ বরদাস্ত করতে পারে না। এবং তার অভিধানে অন্যায়ের প্রতিবিধানকল্পে

একটিমাত্র নৈতিক ব্যবস্থা আছে, তা হচ্ছে 'উচিত শিক্ষা' অর্থাৎ সমুচিত প্রহার!

আসল কথাটা বলা চলছে না,—বাদলের কোন খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এই সহজ মিথ্যাচার দিয়ে দীনদয়ালকে নিরস্ত করার প্রয়াস। এ ভাবে বুঝি আর চলে না!

দেবজ্যোতি খেতে বসেছে। মিণ্টু, দীপু দু'জনেই সামনে বসে। ঘাড় তুলে এক সময়ে দেবজ্যোতি বল্‌ল—কী রে বেড়াল, নজর দিচ্ছিস না কি?

দীপু হাসলো—যা চেহারার ছিরি করছেন দিনদিন, কেউ আর নজর দেবে না। মা গো, মুখের দিকে চাওয়া যায় না!

দেবজ্যোতি বল্‌ল—পাতের দিকেই তোর নজর, মুখের কথা তুলিস কেন?

দীপু বলল—সত্যি দেবুদা, আপনি এবার সাবধান হ'ন। বাবার অবস্থা ত চোখের ওপর দেখছি, ভাবনা হয়।

মিণ্টু বল্‌ল—তুই থাম দীপু, খাওয়ার সময় মানুষকে জ্বালাতন করতে নেই। শরীরের কথা আমাদেরই বা কি এক্তার আছে বলবার? কেউ ত নই!

দেবজ্যোতির গলায় যেন খাবার আটকে যায়। মুহূর্তের জন্য সে স্থির হয়ে বসে রইল। তারপর একবার মুখ তুলে মিণ্টুর দিকে তাকালো। কোনো রকম বিকার নেই সে মুখে, শান্ত গম্ভীর মুখ, স্থির অতল দু চোখের দৃষ্টি।

আবার সে এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে মাছের ঝোলে ডুবিয়ে দিল।

দীপু ঝাঁঝালো স্বরে বল্‌ল—তোর ওই মুখের জন্যেই আসা বন্ধ হয়েছিল দিদি! একটুও কি মায়াদয়া নেই রে তোর?

মিণ্টু নিজের কথার গুরুত্বটা যেন এখনও পরিপাক করতে পারে নি। বলে ফেলেই বুঝেছিল কথাটা শুধু দেবজ্যোতিকেই বিঁধেছে তা নয়, মিণ্টুরও নিজের দৈন্যকে নগ্ন ভাবে উদ্ঘাটিত করেছে। তার ওপর দেবজ্যোতির বিব্রত, ব্যথিত দৃষ্টি যেন আরও মর্মান্তিক!···সবটুকু জড়িয়ে এক দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণায় মিণ্টু অস্থির। দীপুর কথার কোনো জবাব দিতে ইচ্ছে হয় না। কী বল্‌বে মিণ্টু? কেবলই মনে হচ্ছে, এর পর কোনো কথা দিয়েই ঢাকা যাবে

না। স্বাভাবিক সহজ আবহাওয়াটুকু আর ফিরবে না আজ! অথচ মিণ্টু ত তা চায় নি। যেমন চল্‌ছে তেমনি চললেও জীবনের একটা সামঞ্জস্য বজায় থাকে। কিন্তু—! এভাবে দেবজ্যোতিকে বিব্রত করতে গেল কেন মিণ্টু? কি দরকার ছিল 'আপন-পর' এসব কথা তোলার?

দেবজ্যোতি নীরবেই আহার সমাপন করল। বাদ-প্রতিবাদ কোনো কিছুর মধ্যেই সে গেল না। তবে কি সে বুঝতে পারে নি? না, বুঝতে চায় না? অথবা মিণ্টুকে আজও সে উপেক্ষা করল? দেবজ্যোতির গম্ভীর মুখখানা দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

দীপুকে বল্‌ল মিণ্টু—যা ত একবার রান্নাঘরে, মাছটা ঢেকে রেখেছি কি না দেখে আয় ভাই!

খাওয়ার পর দেবজ্যোতি বৈঠকখানা ঘরে যাবার পথে বাধা পেল, মিণ্টু দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজা আগ্‌লে। ও বল্‌ল—শোনো, এ ধারে একবার!

দেবজ্যোতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এগিয়ে যেতেই মিণ্টু উপুড় হয়ে দেবজ্যোতির দুটি পায়ে মাথা ছুঁইয়ে কান্না-জড়ানো কাঁপা গলায় বল্‌ল—আমাকে ক্ষমা করো! বড় অপরাধ হয়েছে আমার।

হতচকিত দেবজ্যোতি হেঁট হয়ে মিণ্টুর হাত ধরে বল্‌ল—ও কী, ওঠো-ওঠো, ছেলেমানুষী করে না! দোষ তোমার নয় মিণ্টু, সব অপরাধ আমারই। জানি, এ অপরাধের ক্ষমা হয় না, তাই কোনো দিন ভরসা করে চাইতে পারি নি! এর ওপর ক্ষমা চেয়ে আর অপরাধের বোঝা বাড়িয়ো না। প্রণাম নেবার যোগ্যতা আমার নেই, তাও জানি।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে মিণ্টু, ওর দুচোখে বারান্দার আলো পড়েছে, ভিজে চোখে অশ্রু টলমল। ঠোঁট দুটো আবেগে থরথর, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে মিণ্টু। অনেক কথাই বলতে চায়, ওর দেহমন একসঙ্গে এত কথা বল্‌বার জন্য উন্মুখ—অথচ একটি কথাও কইতে পারছে না।

দেবজ্যোতির সামনে এভাবে কখনও দাঁড়ায় নি মিণ্টু। কী যে হল ওই হাতের সামান্য ছোঁয়াতে—একটুখানি হাতের টান যেন যুগযুগান্তরের পুঞ্জীভূত অভিমান, সঙ্কোচকে প্রবল বন্যাস্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে! অবিচার

উপেক্ষার বেদনা, আশ্চর্য সুধা-রস স্পর্শে পারিজাতের মধুগন্ধ বিস্তার করল মিণ্টুর অন্তরে! কত কালের রুদ্ধ রুক্ষ মনোভূমিতে প্লাবনের পর কথার কলিরা নতুন জীবন স্বাদের সরস উন্মেষে মুখর হয়ে উঠেছে! ওর ইচ্ছে হচ্ছে দেবজ্যোতির হাত ধরে পাশে বসিয়ে কথা কইতে। সারাটা মন যেন বাইরে চলে আসবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। যে কথা বলা হয় নি, যা সে নিজের কাছেও গোপন করতে চেয়েছে—সেই সব কথা, সব কিছুই উজাড় করে দেবার জন্য মিণ্টু উন্মুখ।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে দেবজ্যোতি বল্‌ল—এখন তাহলে যাই!

মিনতি-করুণ দুচোখের চাহনী মেলে দিয়ে মিণ্টু মৃদু স্বরে বল্‌ল—না।

চম্‌কে উঠল দেবজ্যোতি। মিণ্টুর মুখ দিয়ে যেন অন্য কোনো মানুষ কথা কয়ে উঠেছে! অনেকদিন আগে শোনা অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গিমা—যেন মন্দাকিনীর কণ্ঠস্বর!

মিণ্টুর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল দেবজ্যোতি—কিছু বল্‌বে?

—না বল্‌লে যখন তুমি বুঝবে না, তখন কষ্ট হলেও বলবো। তুমি যেতে পাবে না।

—আমি, যেতে পাবো না? যেতে পাবো না!

আবৃত্তির সুরে কথাগুলো দু বার দেবজ্যোতি নিজেকে শোনালো। কোনো দিকে তার দৃষ্টি নেই—না, মিণ্টুর মুখের ওপরও নয়, সে যেন নিজের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে! এতটুকু হাসির রেখা দেবজ্যোতির ওষ্ঠে চকিতে ফুটে উঠ্‌ল। তারপর সে বল্‌ল—তোমার ঋণ শোধ করবার সাধ্য আমার নেই মিণ্টু। ভালোবাসার এমন বাজে খরচ না করলেই পারতে! তুমি ত জানো, সবই জানো। তবে কেন এভাবে তোমার মতো মহৎ একটা জীবনকে ব্যর্থতায় জড়াতে চাও?

মিণ্টু রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ফিস ফিস স্বরে বলে—চুপ করো। কোনদিন ত আর কিছু চাই নি, চাইবও না। শুধু তোমাকে পেতে চেয়েছি। ভালবাসা পেতে সাধ নেই, দেবার মতো আমার দামী কিছু নেই—তাই একটুখানি আশ্রয় চাই তোমার কাছে। দিতে চাও বা না-চাও, এ আমি নেবোই।

মিণ্টু ত এ কথা বলতে চায় নি। যা বলতে চেয়েছিল, তার সঙ্গে এ কথাগুলোর কোনো মিলই হয়তো নেই। তবু এমন শোনালো যেন—এই ওর কথা! অথচ যা বলবে ভেবেছিল তার মধ্যে অনেক বেশী গাম্ভীর্য ছিল, গুরুত্ব ছিল, শোনাবার মত কথা সেগুলো। মন্দাকিনীর প্রতি দেবজ্যোতির গভীর প্রেম আজও তাকে ঘিরে রয়েছে, সে প্রেমের অংশীদার না হয়েও মিণ্টু চায় দেবজ্যোতিকে সেবা করতে। তার দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনের সাধিকা হয়েই থাকবার জন্য মিণ্টু নিজেকে উৎসর্গ করে ধন্য হতে চায়! দেবজ্যোতির তরফ থেকে বিন্দুমাত্র ভরসা না পেলেও মিণ্টুর ভালবেসে দিন কাটিয়ে যাওয়ার সার্থকতায় বিঘ্ন ঘটবে না। আরও অনেক কথা জমে ছিল দেবজ্যোতিকে শোনাবার জন্য। কিন্তু তার বদলে যা বলল মিণ্টু, সেগুলো এত তুচ্ছ এত সামান্য যে মিণ্টু নিজের অক্ষমতায় কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। থেমে গেল।

দেবজ্যোতির মুখের দিকে তাকালে দেখতে পেত মিণ্টু—কথার কলিগুলি আদৌ হাল্কা নয়, তুচ্ছ করার মতো সামান্যও নয়। আভরণ অলঙ্কার কিছুমাত্র বাহুল্য নেই বলেই হয়তো মিণ্টুর কথায় দেবজ্যোতি অতিমাত্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছে!

সে ঘাড় উঁচু করল না, মুখ তুলল না একবারও। স্পষ্ট গভীর স্বরে যেন আপন মনেই বলল—আজও তুমি আমাকে আশ্রয় দিতে চাও? তা তুমি পারো—তুমিই পারো! কিন্তু—নাঃ, কিন্তু নেই কিছু। যে ইচ্ছে করে ঠকবেই তাকে আমি ঠেকাবো কি করে! তবু বলি, ভালো করে ভেবে দেখলে পারতে মিণ্টু!

—নিজের ভাবনা অনেক কাল চুকেছে। শুধু তোমার দিকে তাকিয়ে ছিলাম এতকাল, কিন্তু সেটাই বাজে খরচ হয়েছে। আর পারছি না, তাই মুখ ফুটেছে। এ যে আমার কতবড় লজ্জা, সে তুমি বুঝবে না। সে যাক ভুল বুঝো না, দোহাই তোমার!

দেবজ্যোতি আবেগভরে মিণ্টুর ডানহাতখানা টেনে নিল, বলল—কষ্ট খুবই সইতে পারো। কিন্তু ভয় হয়, পাছে অপমান করে বসি তোমাকে! জানো না

ত আমি একটা সম্পূর্ণ মানুষ নই—আধখানাও পুরোপুরি নই, মনে হয় বুঝি বা মানুষই নই আমি! তাই ভাবছি আমাকে নিয়ে তোমার লোকসানই বাড়বে মিণ্টু!

—অনেক ত লাভ করেছি। লাভে আর রুচি নেই। লোকসানটুকুতেই লোভ, তাই দাও! তোমার কাছাকাছি থাকতে দাও।

বৈঠকখানা থেকে কথার টুকরো ভেসে আসছে। ওদিকে দীপুর উচ্চকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। এ ঘরের পিছনে গোয়াল ঘর—সেখানে বোধ হয় গরুকে রাতের খাবার দিচ্ছে দীপু। বাছুরটার সঙ্গে ওর সব সময় ঝগড়া চলে। দীপুকে দেখলেই বাছুরটা মাথা নেড়ে গুঁতো মারে—কচি কপালে নতুন শিং ওঠার প্রথম সাড়া সুড়-সুড়িয়ে ওঠে বোধহয়! দীপু ধমকে ওঠে—আঃ, কী হচ্ছে গণেশ, দাঁড়া বলছি। অমন করলে কিন্তু রাতভোর শুকিয়ে থাকতে হবে। সত্যি বল্‌ছি! এ্যাই এ্যাই—মুখ সরা, খোলের জলটা মাখাতে দে!

সব শোনা যাচ্ছে এখান থেকে।

হঠাৎ আর্তস্বরে দীপু চেঁচিয়ে উঠল—ও মা গো—ও!

মিণ্টু উচ্চকিত হয়ে ছুটে যায়—কি হল রে?

দেবজ্যোতিও ত্বরিতপদে বাগানের দিকে চল্‌ল মিণ্টুর পিছু পিছু।

দীপু ছুটে এসে মিণ্টুকে আঁকড়ে ধরল। মিণ্টু হাসতে হাসতে বোনকে টেনে নিয়ে বল্‌ল—কি হল রে! আরশোলা না ইঁদুর?

—না গো দিদি, সত্যি বল্‌ছি—এই এতবড় এক লতা! সড় সড় করে বিচুলির মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

—লতা?

মিণ্টু চম্‌কে উঠল—তুই ঠিক দেখেছিস লতা?

দীপুর চোখেমুখে ভয় মাখানো রয়েছে এখনো। দেবজ্যোতির দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—কী হবে দেবুদা! ওই ঘরে যে পার্বতী, গণেশ রয়েছে। রাত্রে যদি কামড়ে দেয়!

বল্‌তে বল্‌তে দীপু কেঁদে ফেল্‌ল। একটু আগে যে এই মেয়েই গণেশকে তাড়না করছিল কে তা বিশ্বাস করবে?

লতা! মানে, সাপ? কি সাপ? তা দীপু কি করে বল্‌বে! সে বল্‌তে পারতো বাদল। শুধু বলা নয়, এখনই ওই সাপকে খুঁচিয়ে বার করে তার ইহলীলার ল্যাঠা চুকিয়ে তবে অন্য কথা কইত।

কিন্তু দেবজ্যোতি কি করতে পারে? সাপ সম্বন্ধে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান সামান্যই। তবে মানিকপুরের ছেলে বলে ছোটবেলায় সাপ যে দু-দশটা না দেখেছে তা নয়।

ওদের আলোচনার মধ্যে অমলও এসে জুটল। সব শুনে সে বল্‌ল—এই রাত-বিরেতে সাপকে ঘাঁটিয়ে খুব সুবিধে হবে না। তার চেয়ে এক কাজ করা যেতে পারে।

মিণ্টু বল্‌ল—কী!

—আগে গরু দুটিকে ওখান থেকে সরানো দরকার।

দেবজ্যোতি গোয়ালে যাবার জন্য পা বাড়ায়—মিণ্টু পিছন থেকে তার হাত চেপে ধরে বল্‌ল—দাঁড়াও, তোমাকে যেতে হবে না। অচেনা মানুষ দেখলে পার্বতী শিং নেড়ে আসবে। আমি যাচ্ছি।

দীনদয়ালও ইতিমধ্যে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছেন—কি হ'ল রে?

অমল বল্‌ল—সাপ!

দীপুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, ও তাড়াতাড়ি বলল—অস্তি অস্তি গরুড় গরুড়! জামাইবাবু, রাত্রে ও নাম করতে নেই—বলুন লতা-লতা-লতা!

অমল হাসতে হাসতে বল্‌ল—সাপ বল্‌লে বুঝি কামড়ে দেবে?

—হাসিঠাট্টার কথা নয় জামাইবাবু! আপনার পায়ে পড়ি, তিনবার বলুন—লতা-লতা-লতা!

দীপুর গম্ভীর মুখখানা দেখে অমলের বড় মায়া হ'ল, বল্‌ল—আচ্ছা বল্‌ছি!

দীনদয়াল বল্‌লেন—ও, বুঝেছি! দুধ খেতে এসেছে রে! এ ত ভাল কথা নয়। গরুটার বাঁট কানা করে দেবে। একটা ব্যবস্থা করতে হবে কাল-পরশুর মধ্যে!

দীপু আর্তস্বরে বল্‌ল—কাল-পরশুর আগে কিছু করা যাবে না বাবা!

হাসলেন দীনদয়াল—তোর মেয়ে আর নাতির জন্যে যে ঘুম হবে না দেখছি! তাইতো—

তারপর বল্লেন - আছে একটা উপায়! ডাক্তারখানা থেকে খানিকটা কার্বলিক এ্যাসিড্ আনাতে পারলে হ'ত।

অমল বল্ল—কার্বলিক এ্যাসিড দিয়ে কি হবে? সে সাপ তো রইল বিচুলীর জঙ্গলে!

দীপু আবার আঁতকে উঠলো—ফের ওই দেবতার নাম করলেন জামাইবাবু!

অমল অপ্রতিভভাবে পুনরায় হাসলো—ওই যাঃ, মন্ত্রটা কী? লতা, লতা, লতা!

দেবজ্যোতি কার্বলিক এ্যাসিডের কথাতে আশান্বিত হয়ে উঠেছে। তার মনে পড়েছে। কার্বলিকের গন্ধ সাপে আদৌ সইতে পারে না, সে জানে তা, অথচ কথাটা একদম মনেই পড়েনি। সে বল্ল—এত রাতে ত কোনো ডাক্তারখানা খোলা নেই, তবে হাসপাতাল থেকে আনতে পারা যায়। আচ্ছা দেখি।

অমল বল্ল—অনেক হয়রান হয়েছেন, আপনি বরং ও কাজটা আমাকে দিলে পারতেন।

দীনদয়াল সায় দিলেন—সেই ভালো।

দেবজ্যোতি বল্ল—কিন্তু উনি গেলে কি ওরা দেবে? তার চেয়ে বরং দু'জনেই যাওয়া যাক। ওঁর হাতে ওষুধটা দিয়ে আমি বাড়ী চলে যাবো। আজকাল আবার হাসপাতালে হরেক রকমের আইনকানুন হয়েছে কি না! তবে, ইউনিয়নের খাতিরে আমরা খানিকটা স্থবিধে পাই, এই যা রক্ষে।

পৌনে দশটার 'ভোঁ' বেজে উঠল। সবাই যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে কারখানার বাঁশীর ডাকে। রাত হয়েছে!

দেবজ্যোতি অমলকে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশে যাত্রা করল।

চুয়াত্তর

কারখানার মধ্যে আজকাল ইউনিয়নের প্রকাশ্য সভা বেশ জোরালো ভাবেই জমে ওঠে। কথায় কথায় কোম্পানীকে গালিগালাজও চলে। সপ্তাহের মজুরী পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকেরা ইউনিয়নের চাঁদা দিচ্ছে। কেউ একদিনের বেতন, কেউ বা দুদিনের—হাসিমুখে চাঁদা দিয়ে খুশী হচ্ছে! তাতে সংসার-খরচে টান পড়ে, তা পড়লেই বা উপায় কী? মালিকের সঙ্গে লড়াই চালাতে গেলে ইউনিয়নকে শক্তিশালী করতেই হবে। অতএব, শ্রমিক পরিবারে ভাতের কোলে ডাল খাওয়ার মতো সৌখিন খরচটা বন্ধ হ'ল। ভাতের ফেন স্বাস্থ্যকর এ খবরটা মজদুর গৃহিণীর হেঁসেলে পৌঁছলো। না, কষ্ট কেউ পাচ্ছে না, হাসিমুখে 'মদত্' দিচ্ছে এমনি করে। যারা রাত্রে ঘরে হারিকেন জ্বালাতো, তারা বাড়তি খরচ হিসাবে কেরোসিন কেনা বন্ধ করে দিল—অন্ধকারে থাকাটা ত এমন কিছু ভয়ঙ্কর ব্যাপার নয়। একটু অভ্যাস করলেই বেশ থাকা যায়। অবশ্য একটু আধটু নেশা করে যারা চাঙ্গা হয়, তারা 'ধেনো' 'পচাই' খাওয়া বন্ধ করে না। ওটা নষ্ট হলে জীবনের আসল মজাটুকুই ঘুচে যাবে!

চাঁদা উঠেই চলেছে।

ওদিকে বারি সাহেব আসেন। ইউনিয়নের কাজ দেখে তিনি বেশ ভরসা পাচ্ছেন। এবার তাহলে কর্তৃপক্ষের কাছে দাবিপত্র পেশ করতে হয়। দফাওয়ারী ফিরিস্তি তৈরী হ'ল। সাবেক আমলের সনাতন দাবি। শ্রমিকরা যা কিছুতেই আদায় করতে পারে নি, সেগুলো ত রইলই, তার উপর আরও কতকগুলি নূতন দাবি সংযুক্ত হ'ল।

মানিকপুর শহরের বাইরে যে সব শ্রমিকের বাস, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা চাই। যুদ্ধের পরেও প্রতিটি ব্যবহার্য জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে, অথচ শ্রমিকের মজুরী বাড়ে নি, প্রত্যেক শ্রমিককে একুশ টাকা মাসিক মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে। প্রতি শ্রমিক পরিবারকে বসবাসের যোগ্য কোয়ার্টার দিতে হবে।

রানো আমলের এক খুপ্‌রী ঘর দিলে চল্‌বে না, অন্ততঃ দুখানা করে ঘর তে হবে। ইলেক্‌ট্রিক আলো, কলের জল প্রত্যেক কোয়ার্টারে থাকা চাই। র চাই শিক্ষার সুবন্দোবস্ত। শহরের জনসংখ্যা যে পরিমাণে বেড়ে চলেছে, অনুপাতে স্কুল-পাঠশালা বাড়ে নি। মাত্র একটি স্কুলে পনেরো হাজার মিকের ছেলেমেয়ের শিক্ষা অসম্ভব। অন্তত চারটে স্কুল তৈরী করতে হবে। ধারণ ছুটি যা সকলে পাচ্ছে বছরে পনেরো দিন, এ ছাড়া আরও দু-দিন ছুটি ড়াতে হবে। প্রত্যেক শ্রমিককে অসুস্থতার জন্য একমাস পুরো মাইনেতে টি দেওয়া হোক, এবং তারপরও যদি কোন শ্রমিকের অসুখ না সারে তাহলে নমাস পর্যন্ত অর্ধেক বেতনে এবং দরকার হ'লে, আরও ছয়মাস বিনা বেতনে টি পাবার অধিকার শ্রমিককে দিতে হবে। ছোটখাট আরও অনেক কিছুই াবির ফিরিস্তিতে সংযুক্ত হ'ল। মোট দাবির সংখ্যা হ'ল চব্বিশ দফা। গুলি যদি কোম্পানী দিতে নারাজ থাকে, তাহলে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করতে াধ্য হবে।

দাবিদাওয়ার ফর্দটি কোম্পানীর দপ্তরে পাঠিয়ে বারি সাহেব ইউনিয়নের ার্যকরী সমিতির বৈঠকে বল্‌লেন—ভাইসব, এবার স্ট্রাইকের জন্যে তোমরা তরী হয়ে যাও। কঠিন পরীক্ষা! করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! তিন সপ্তাহের নোটিশ ত পড়ল। ধরো, কোম্পানী দাবি মানবে না। আমরাও আর জুলুম বরদাস্ত করব না। এখন নাম-কা-বাস্তে, ওরা একটা আপসের আলোচনা-সভা ডাকবে। আমরা যাবো। সেখানে একচোট খাতিরদারী আর বাত্‌মহরম হবে। শেষে ঝগড়াও হবে ঠিকই। ও শালাদের গরম ত আমি বরদাস্ত করতে পারব না—হাঁ সাঁচমুচ পহেলাই বলে দিচ্ছি। দেখা যায়েগা। বল্‌কী তৈয়ার হো যাও ভাই! আর এক কথা, এই কদিন তোমরা কাজে ফাঁকি দিয়ো না। না, গাফিলতি করা আমি একদম না-পসন্দ করি। পূরা কাম পূরা ইজ্জৎ! পূরা মেহনৎ দিয়ে তবেই পূরা দাম নেবে—হাঁ, সে দাম জুতো মেরে আদায় করবে। ফাঁকি দিয়ে ইনাম চাইবে না ভাই!

লড়াই একবার শুরু হ'লে, তার নিষ্পত্তি কবে হবে কেউ বল্‌তে পারে না। সবাইকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হচ্ছে। এবার যুদ্ধ হবে, বিশৃঙ্খল ভাবে নয়,

এবারের যুদ্ধে শ্রমিকদের জিততেই হবে। সংঘবদ্ধভাবে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে—যতদিন পর্যন্ত জয় না হয় ততদিন ধরেই লড়াই করতে হবে।

সবাই জানে একথা। যাদের অভিজ্ঞতা আছে, তারা আগামী ভয়ঙ্কর দিনের ছবি দেখতে পাচ্ছে। কোয়ার্টার খালি করে দিয়ে স্ত্রী-পুত্রদের দেশে-ঘরে পাঠাতে হবে। আর যাদের দেশঘাট বলে আলাদা কিছু নেই, তাদের অন্য পথ খোলা নেই—এখানেই অর্ধাশনে-অনশনে কাটাবার জন্য মনকে তারা তৈরী করছে।

অসহায় মানুষ তার ধৈর্যের শেষ পরীক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে। তারা ভাবছে—এইভাবে সারাটা জীবন 'নেই-নেই' 'চাই-চাই' করে কোনো রকমে টিকে থাকার বিড়ম্বনা সহ্য হয় না। তার চেয়ে দেখাই যাক না বিদ্রোহ ক'রে যদি সুদিন আসে! হয়ত ষোল আনা পাওয়া যাবে না, তবু খানিকটা দুর্ভোগ ত ঘুচতে পারে! স্বামীসাহেবের আমলে লড়াই করে শ্রমিকেরা একেবার কিছুই যে পায় নি, তা নয়। খানিকটা সুবিধে পেয়েছে বই কি! হালফিল যারা কাজে ঢুকেছে তারা বুঝবে না, কিন্তু পুরনো আমলের লোকেরা জানে যে, শ্রমিকেরা আগের চেয়ে অনেক সুখী! তা বটে, তখন কিছুই ত ছিল না। না ছিল ছুটিছাটা, না ছিল চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত। কুলীদের বস্তীতে পায়খানাতে ছাদ ছিল না। আর বাসের ঘরগুলো ছিল পায়খানার চেয়েও জঘন্য—একটি মাত্র দরজা, জানালা তৈরী করে কোম্পানী পয়সা নষ্ট করে নি। দিনের বেলাতে পর্যন্ত সেসব ঘরে আলো ঢুকতে সাহস করে না। কিন্তু মানুষকে থাকতেই হ'ত। আর,—থাক সেসব কথা মনে না রাখাই ভালো।

এখন মনে রাখতে হবে, আরও চাই। মানুষের মতো আমরা বাঁচতে চাই। দুনিয়ার সমাজের সঙ্গে আমাদের সমতা চাই। কেনই বা চাইব না? আমরা কি মানুষ নই? তবে কেন আমাদের ছেলেমেয়ে মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে না? আমাদের সমাজ আর তোমাদের সমাজ আলাদা হয়ে থাকবে কি জন্যে? তোমাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ কোন্খানে? আমার আয়ুকে প্রতি

লে জ্বালিয়ে-গলিয়ে যে পণ্য তৈরী হয়, সে পণ্যের দাম ত কম দাও না! াটি নিংড়ে, আগুনে পুড়িয়ে, চুনে শোধন করে আমি যে ইস্পাত বানাই –সে ইস্পাত কেনার জন্যে তোমরা জলের মত টাকা খরচ করো। কিন্তু সে াকার কতটুকু আমি পাই? দাম আদায় করে কোম্পানী। মুনাফা খায় রিচালকেরা। আর বাদবাকী উদ্বৃত্ত বড়-মেজো-ছোট সাহেবদের গহ্বরে য়ে আটকে পড়ে। আমাদের ওপর তাঁদের দয়া অসীম—প্রাণটুকু বাঁচাবার ন্য তাঁরা যে মজুরী বরাদ্দ করেন, তাতে আমাদের পেট চলে যাচ্ছে! আবার ী চাই? ওই যে বাতিল করা ছাই-মাটির স্তূপ, 'শ্লাগ' মানিকপুরের প্রান্ত-দেশে পড়ে রয়েছে, তার কোনো দাম নেই! কারণ তা থেকে আর লোহা বেরুবে না, ইস্পাত তৈরী হবে না—সেটা বাতিল! আমাকে, আমার পরিশ্রমকে তুমি কি ওই 'শ্লাগ' মনে করো? অবশ্য আজ বাদে কাল আমি যখন অকেজো হয়ে পড়ব তখন ওই বাতিল করা 'শ্লাগে'র সঙ্গে আমার কোনো পার্থক্যই রাখবে না জানি। এর আগেকার হাজার-হাজার লাখ-লাখ শ্রমিককে 'শ্লাগ' হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ত আমরা হাতিয়ারের জোর থাকতে থাকতে নিজের বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে একটু মানুষের মতো দেখবার দাবি নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। আর সবুর সইছে না—এবার আমরা মানুষের দরবারে, মানুষের মতো হবার জেহাদ জানাচ্ছি!……এর মধ্যে অন্যায় নেই, একে যদি কেউ অসঙ্গত আবদার বলে মনে করে, তবে সেই অন্যায়ই করবে।……

দেবজ্যোতি লিখছিল বুকে বালিশ দিয়ে। সে ইস্তাহার বানাচ্ছে। রাত থাকতে ঘুম থেকে উঠেছে। এখনো চারিদিকে আলোর ইশারা স্পষ্ট হয়ে জাগে নি। তার চোখের সামনে হাজার হাজার কণ্ঠের আর্ত আবেদন ফেটে পড়ছে। লিখতে লিখতে কলম থেমে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, সামান্য ভাষা দিয়ে এই হিমালয়তুল্য বেদনাকে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। কলম থামিয়ে সে অস্থির ভাবে ঘরময় ছট্‌ফট্ করে বেড়াতে থাকে।

এত দীন, এত অসহায় কেন মনে হচ্ছে নিজেদের? সত্যিই কি কোনো শক্তি নেই তাদের? দেবজ্যোতির চেয়ে দীনতর অবস্থায় যারা দিনপাত

করছে, সেইসব শ্রমিক ত এতটুকু ভয় পাচ্ছে না স্ট্রাইকের কথা শুনে! তাদের হাতের মুঠো পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠেছে, চোখেমুখে সংকল্পের দৃঢ়তার ছাপ প্রকট হয়েছে! কপালের দুইপ্রান্তে ক্ষোভের, ক্রোধের প্রতীক শিরাগুলি সবুজ কৃমির মতো ফুলে থাকে শ্রমিকদের। তারা আজ উত্তেজনায় অধীর! তবে কেন এত সংশয় দেবজ্যোতির? সে ত এতদিন ধরে মজদুরের সুদিনের স্বপ্নই দেখেছে। আজ হঠাৎ ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে কেন তার মন?

শক্ত হাতে ইস্তাহারের খসড়া লিখতে হবে। এতক্ষণ ধরে সে যা লিখেছে সেটা নিতান্ত তত্ত্বকথা, ওতে হবে না। বজ্রের মতো সহজ কঠিন ভাষায় বল্‌তে হবে। যুদ্ধের ইঙ্গিত যেন সঙ্গীন উঁচিয়ে তেড়ে আসছে এমনই শব্দের বাঁধুনী চাই ইস্তাহারের! কথার মানুষ নয়—মানুষের নগ্ন, রূঢ় পীড়নের বীভৎস সত্য যে ভাষণে ফুটে উঠবে সেই ভাষা চাই!

এতক্ষণের পরিশ্রমকে এক মুহূর্তে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়ে সে আবার নতুন করে লিখতে বসল।

কখন সূর্য উঠেছে, কারখানার বাঁশী বেজে থেমে গেছে কখন, দেবিকা বন্ধ দরজার সামনে এসে ফিরে গেছে কতবার, দেবজ্যোতি কিছুই টের পায় নি। এক মনে কাজ করে চলেছে।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে সে দেখল কট্‌কটে রোদ তার দৃষ্টিকে আঘাত করছে। কত আলো! অনেক বেলা হয়ে গেছে।

দরজা খোলার শব্দ পেয়ে দেবিকা পড়া ছেড়ে উঠে এসে বল্‌ল—কী, শরীর খারাপ নাকি তোমার?

—উঁ! না ত!

—চা দিই?

—হুঁ।

দেবজ্যোতির মনের মধ্যে এখনো ইস্তাহারের অগ্নিময় ভাষার উত্তাপ পুরোদস্তুর রয়েছে। একটা উত্তেজনার ঘোর তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মনে হচ্ছে যেন সংগ্রামের উন্মাদ বাদ্য ধ্বনি তাকে প্রভাবিত করে তুলতে

উদ্যত! আশ্চর্য, নিজের কলম থেকে যে জড় কথাগুলির সৃষ্টি হয়েছে একটু আগে, সেই সদ্যোজাত কথার শক্তি কী সাংঘাতিক, কথারা কি জলন্ত জীবন?

দেবিকা দাদার ঘরে ঢুকেছিল একটু গোছগাছ করবার জন্য। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—ওমা, একী কাণ্ড! দাদা—

দেবজ্যোতি সুপ্তোত্থিতের মত সাড়া দিল—কি রে, কি হ'ল!

—বেলা দশটার সময় বাতি জ্বালিয়ে কি করছিলে? রাতে বুঝি আলো নিভোও নি!

—ও হো, ভুলে মেরে দিয়েছি।

ঘরে ফিরে এসে দেবজ্যোতি বোনের দিকে তাকিয়ে বেকুবের মতো হাসতে লাগলো।

দেবিকা ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বল্‌ল—দিনদিন তুমি কী যে হচ্ছ! আর পারি নে। নাওয়া-খাওয়া, ঘুম সব চুলোয় দিয়ে, ইউনিয়ন নিয়ে মাতামাতি যা জুড়েছ! আবার হাজতে ঢুকতে সাধ হয়েছে বুঝি?

—না রে! ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে একটু কাজ করছিলাম।

—হুঁ! এবার তুমি বাপু বিয়ে-থা করো, তোমার এত ঝুঁকি কে পোয়াবে?

—তোকে ত মাথার দিব্যি দিয়ে বলি নি।

—এক ছাদের তলায় থাকতে গেলেই করতে হয়। সবাই তোমার মতো উদাসীন হলে সংসার কবে উচ্ছন্নে চলে যেত!

দেবজ্যোতি বোনের গম্ভীর মুখখানার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেল্‌ল—তোর বুঝি বিয়ের সাধ হয়েছে?

—ধ্যাৎ! বাজে কথা। তাঁবেদারীর সখ আমার নেই বাপু।

—তবে যা চা নিয়ে আয়, ক্ষিদেও যেন পাচ্ছে রে একটু-একটু!

বামুনদিদি এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছেন। এক গলা ঘোমটা দিয়ে তিনি পঁয়তাল্লিশ বছরের মুখখানা ঢেকে রাখেন। দেবিকা তাঁর ছায়া দেখে সাড়া দিল—হয়ে গেছে বুঝি! আচ্ছা আমি যাচ্ছি! যা দেখছি, ফার্স্ট পিরিয়ডের ক্লাসই মাটি হবে আজ।

দেবজ্যোতি ব্যস্তভাবে বল্‌ল—না, না; তুই কলেজ যা দেবি! আমার একটুও অসুবিধে হবে না রে!

—থাক, হয়েছে!

বলে ঠোঁট বাঁকিয়ে দেবিকা রান্নাঘরে চলে গেল।

বারি সাহেব, রামঅওতার, বারির সাগরেদ গোমেজ্ সাহেব, ইউনিয়নের সেক্রেটারী গোবর্ধন ঠাকুর এবং ইউনিয়ন পক্ষের উকীল কালীকিঙ্কর দত্ত এক দিকে—আর কোম্পানীর তরফে রবিনসন সাহেব, অনিরুদ্ধ মল্লিক, ডিরেকটর বোর্ডের প্রতিনিধি মোরারজী মিল্‌বালা এবং তাঁদের পক্ষের উকীল, এই নিয়ে আপোষ পরিষদ তৈরী হয়েছে। পর-পর দু-দিন সকালে বিকেলে দুটো করে বৈঠক বসেছে। মীমাংসার আলো যেন দেখা যাচ্ছে!

দেবজ্যোতি কারখানায় ঢুকেই শুনলো—সকালের বৈঠকে কাজ এগিয়েছে অনেকখানি। চব্বিশ দফা দাবির মধ্যে দশটা দাবিই কোম্পানী সামান্য রদবদল করে মেনে নিয়েছে। বারি সাহেব অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছেন—আজকের মধ্যেই বৈঠকের আলোচনা চুকোতে হবে। মোরারজী মিল্‌বালা নাকি আজ আর বিকেলে বসতে রাজী ছিলেন না। তবুও বিকেল চারটেতে দ্বিতীয় বৈঠক বসবে ঠিক হয়েছে—বারি সাহেবের জবরদস্তীতে।

অভিজিৎ সিং বল্‌ল—কোম্পানীর সুবুদ্ধি হয়েছে, মিটমাট একটা হয়েই যাবে।

সুবল দস্তিদার ফোড়ন ছাড়লো—না আঁচালে বিশ্বাস নেই বাবা।

রামকিষণ তেওয়ারী পুরণো ঘুঘু, সে বল্‌ল—আরে ভাই কোম্পানীর চাল ধরা কি অতই সোজা? একটু নাচাচ্ছে। কোন্ ফাঁকে ফট্ করে ঝগড়া বাধিয়ে দেবে, তখন মজা দেখবে। হুঁশিয়ার রহো ভাই! খেয়াল রাখ্‌খো, আপ্‌না মতলব পর হুঁশিয়ার রহো।

দত্তগুপ্ত খুব দূরে ছিল না, কাজের ফাঁকে ফাঁকে এদিকে নজর রেখেছিল সে।

সুবল হঠাৎ মেঝেতে খানিকটা থুথু ফেলে চেঁচিয়ে উঠল—শালা নেড়ী

কুত্তার গায়ের বদ্‌বু আসছে! এ পাশে সরে আসুন দাদা, দালালের চোখ দিয়েও কী গন্ধ ছাড়ে—তওবা! রাম-রাম! মাই গড্‌।

সুবল সব ব্যাপারেই উদারনৈতিক পথাশ্রয়ী, ভগবানের নাম উচ্চারণ করার ক্ষেত্রেও সকল সম্প্রদায়কেই প্রতিনিধিত্ব দিয়ে থাকে।

দত্তগুপ্ত মুখ ফিরিয়ে হাসতে লাগলো।

এরাও সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

সন্ধ্যে সাড়ে ছটার সময় খবর এসে পৌছলো—প্রেসিডেণ্ট আব্দুল বারি টেবিল উল্টে দিয়ে গালিগালাজ করতে করতে বৈঠক থেকে রেগে বেরিয়ে এসেছেন। কারখানার মধ্যে যে যেখানে ছিল হাতের কাজ ফেলে জিলানীকে ছেঁকে ধরল। কি হয়েছে? আপোষ হবে না? জিলানী সাইকেল হাঁকিয়ে খবর এনেছে। তাজা গরম খবর!

—ক্যা হুয়া ভাই! বারি সাহেব নে ক্যা বোলেঁ?

জিলানী হাত-পা নেড়ে যা বল্‌ল তার সারমর্ম এই: বিকেলের বৈঠকে মোরারজি মিল্‌বালা বেশীমাত্রায় মদ্যপান করে বসেছিলেন। সভার মধ্যেই তিনি বেএক্তিয়ার হয়ে পড়েন। বারি সাহেব দু-একবার ধমক দিয়ে তাঁকে সতর্ক করেন। একসময়ে মিলবালা কি একটা অশ্লীল কথা বলেন, আর যায় কোথায়—বারি অগ্নিমূর্তি ধারণ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। বারির ধারণা যে, বারিকে অপমান করবার জন্যই রবিনসন সাহেব মিলবালাকে ঠেসে মদ গিলিয়ে সভায় হাজির করেছেন। আব্দুল বারি সভাস্থলে 'বিড়িটানা' পর্য্যন্ত বরদাস্ত করেন না—একথা ত সবাই জানে! কাজেই মাতালের গালিগালাজ হজম করা তাঁকে দিয়ে আদৌ অসম্ভব। অতএব মিলবালার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ বারির সিংহ-গর্জনে বৈঠকের সকলেই চম্‌কে উঠেছে। লহমার মধ্যে তিনি ধাক্কা দিয়ে টেবিল কাৎ করে ফেলে সবেগে সভাকক্ষের বাইরে চলে আসেন। চিৎকার করে বলেন যে, ষ্ট্রাইক হবে। যে তারিখে হবার নোটিশ আছে সেই তারিখেই হবে। আপোষের আর কোনো কথাই ওঠে না। ওদিকে গোমেজ আর অনিরুদ্ধ মল্লিক, বারির ছড়ানো-ছিটানো কাগজপত্র কুড়োতে ব্যস্ত ছিলেন। সোজা

গাড়িতে গিয়ে বসেই বারি আবার গর্জে উঠলেন—কি হলো, গোমেজ আসছে না কেন? গোমেজ—!

রামঅওতার বল্‌ল—কাগজপত্রগুলো মেঝেময় ছড়িয়ে পড়েছে, বোধহয় সেগুলো গুছোতে দেরী হচ্ছে গোমেজ সাহেবের।

মাথা নেড়ে বারি বল্‌লেন—গোমেজ যদি ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দালাল হয়ে থাকতে চায় ত থাকুক সে! হারামীদের হাওয়াতে আমি আর নিশ্বাস ফেলব না। চালাও গাড়ি!

সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তারা সকলেই বারি সাহেবের ভয়ে একেবারে থরহরি কম্পমান! কেউই বলতে পারে না যে, বারিই কাগজপত্র ছত্রাকার করে দিয়ে এসেছেন, সেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছিয়ে আনাটা অপরিহার্য্য! যাই হোক, মিনিট দুয়ের মধ্যেই গোমেজ সাহেব ঘাড় হেঁট ক'রে গাড়িতে এসে উঠলেন।

ইউনিয়ন অফিসে বারি সাহেবের গাড়ি এসে থামে। গাড়ি থেকে তিনি আর নামেন নি। বাকী সবাইকে নেমে যেতে আদেশ ক'রেই খালাস। মানিকপুরের ভাগ্যলিপি লিখে দিয়ে ওই গাড়িতেই তিনি পাটনা রওনা হয়ে গেছেন। শুধু বলেছেন যে, ঠিক সময়ে আবার তিনি আসবেন। সব কাজ যেন ঠিক মতো হয়। আপোষ হবে না। স্ট্রাইক হবেই!

সবাই চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে এই কাহিনী শুনছিল। জিলানীর কথা শেষ হয়ে যাবার পরও মিনিট কয়েক চুপচাপ দাঁড়িয়েই কেটে গেছে। কেউ একটি কথা বলে নি।

হঠাৎ অভিজিৎ জিগির দিল—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ! বারি সাহেব জিন্দাবাদ!

চমকে উঠে, চাঙ্গা হয়ে সকলেই তার প্রতিধ্বনি করল।

ফার্স্ট স্টাফের কর্তারা সবই চোখের ওপর দেখলেন, কানেও শুনলেন! কাজে এত গাফিলতী দেখেও তাঁরা কোনো কথা বল্‌লেন না। আজ কর্তৃত্ব ফলাবর মতো সাহস কারো নেই। বারুদের স্তূপের মধ্যে কে হাত দেবে?

এক সময়ে জিলানী বল্‌ল—আরে গুরুজী কোথায় গেল? বিলকুল না-পাত্তা!

দেবজ্যোতি নিজের টুলে বসে কাজ করছিল, জমায়েতে গিয়ে সে ভেড়ে নি।

জিলানী এসে ঢুকল ইলেকট্রিক্যাল রিপেয়ার শপে! দেবজ্যোতি নিবিষ্ট মনে একটা আর্মেচারে তার জড়াচ্ছিল। জিলানী কাছে আসতে মুখ তুলে দেবজ্যোতি বল্‌ল—কি খবর ভাই?

জিলানী বিস্মিত এবং ক্ষুণ্ণ—এ কী গুরুজী তামাম দুনিয়া উল্টে গেল আর আপনি এখানে বসে তার পাকাচ্ছেন? ক্যা তাজ্জব!

দেবজ্যোতি হাতের কাজ বন্ধ না ক'রেই বল্‌ল—পূরা কাম পূরা ইজ্জৎ! হ্যাঁ, কি হয়েছে বলো তো জিলানী জী! বারি সাহেব চলে গেলেন?

—জী হ্যাঁ!

—মিটলো না তাহলে?

—না।

—জানতাম।

—জানতেন? কিন্তু বারোটা পয়েণ্টে এগ্রিমেণ্ট হয়েছিল গুরুজী! ওই মিলবালা হারামীই সব পণ্ড করে দিল! শালা মাতোয়ালা কুত্তী কী পয়দা!

দেবজ্যোতির ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি ফুটে ওঠে—ওরা ভিক্ষে দিতে পারে, সম্মান ত দিতে শেখে নি ভাই। যাক, ইস্তাহারটা ছাপা হয়েছে?

—হাঁ।

—এবার বিলোতে শুরু করো। আর দেরীর দরকার নেই!

জিলানী চলে গেল। দেবজ্যোতি আবার নিজের কাজে মন দিল। দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেবজ্যোতির দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার ফোরম্যান নিজের মনেই বল্‌ল—আজব আদমী! আপনা কাজ বাজাচ্ছে! আরে বাপ্‌!

সেদিন কেউই কাজ করল না। আপন আপন ডিপার্টমেণ্টে মশগুল হয়ে পুরণো ধর্মঘট নিয়ে আসর গরম করে তুলল—আর ঘনঘটায় চা খেতে লাগলো। বিড়ির ধোঁয়াতে শেডগুলো ভরপুর হয়ে উঠল।

কদিন এই ভাবেই চলবে। শহরের হাটবাজারে, বাড়িতে বাড়িতে, মানুষের মুখে মুখে আসন্ন ধর্মঘটের কথা। অন্য কিছু নয়। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত এসব আলোচনায় গম্ভীরভাবে যোগ দেবে।

ধর্মঘট হবে, আবার! ব্যস্তবাগীশ অতিসাবধানীরা পরিবারবর্গকে ট্রেনে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল। কেউ বা আগামী দুর্দিনের দিকে তাকিয়ে আগাম ধারকর্জ করে চালডাল যতটা পারে কিনে ঘরে মজুত করল। এখানে ওখানে ঘরোয়া বৈঠকে প্রস্তুতির মহড়া। গানবাজনার আসরে লোক জোটে না। সন্দর্শন টকীর আসনগুলো ফাঁকা পড়ে থাকে। এমন কি দেহবিলাসিনীদেরও ব্যবসায়ে মন্দা পড়ে। থানাতে কাজের চাপ বেড়ে যায়। সদর থেকে প্রত্যহই আসছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। কর্তাব্যক্তিরা গাড়ি নিয়ে ব্যস্তভাবে ঘনঘন ছুটোছুটি করছেন। একদিন এস, ডি, ও, স্বয়ং এখানকার অবস্থা তদারক করে গেছেন। কলকাতা থেকে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের লোক শহরে বিস্তর এসেছে। গোয়েন্দারা শহরের এখানে ওখানে গা-ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শহরের এলাকা একশ' চুয়াল্লিশ ধারা মোতাবেক চল্‌ছে কি না, সে দিকে সরকারী নজর কড়া—এতটুকু এধার-ওধার হলেই আইন-ভঙ্গকারীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

কারখানাতে কেবল হাজিরা চল্‌ছে, কাজ কেউ করে না। প্রত্যেক সেক্‌শনের প্রতিনিধি চাঁদা তুলতে, পরামর্শ করতে ব্যস্ত। এবারের সংগঠন নিশ্ছিদ্র করা চাই।

আটানব্বই হাজার টাকা উঠেছে, এক লাখ হ'তে মাত্র দু'হাজার টাকা বাকী। টাটানগর, হীরাপুর, সীতারমপুর, আসানসোল, চারিদিক থেকে আশাভরসার খবর আসছে। সবাই সমর্থন জানাচ্ছে—সাহায্যের প্রতিশ্রুতি-পূর্ণ পত্র পাঠাচ্ছে। আগে বাঢ়ো ভাই, মজদুরসে মদৎ মিলেগা জরুর!

রামঅওতার মাথায় গান্ধী টুপী এঁটে ছুটোছুটি করছে। জিলানী সাইকেল নিয়ে কতবার এখান ওখানে দৌড়োচ্ছে তার হিসেব কে রাখে। তার বাড়িতে মায়ের অসুখ, বড় দিদি আসন্নপ্রসবা—কিন্তু ওসব দেখবার অবকাশ নেই। ভগবানের হাতে এই তুচ্ছ ব্যাপারগুলোর দায়িত্ব দিয়ে, পাগলের মতো দুনিয়ার মজদুরের ভালাই ক'রে বেড়াচ্ছে জিলানীর মতো আরও অনেক শ্রমিক।

আব্দুল তার অনুচরবৃন্দকে নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। সব শালা নেমকহারাম বেঈমান হয়ে গেছে—একদিকে যারা কোম্পানীর দালালী করছে, অন্য দিকে তারাই কোম্পানীর গোপন মতলব ইউনিয়নের চরেদের কাছে ফাঁস করে দিচ্ছে। কোনো হারামীকেই আর বিশ্বাস করে না আব্দুল। সব শয়তানের ছুটো ক'রে মুখ গজিয়েছে আব্দুল দেখতে পায়! ওদিকে মল্লিক সাহেবের কাছেও তার বেইজ্জতী। হামেশা তিনি কথায় কথায় গালিগালাজ করছেন। জলের মতো পয়সা খরচ করেও কোনো ফয়দা হচ্ছে না!

আশ্চর্য হয়ে গেল আব্দুল একটা ব্যাপারে। ধর্মঘটের মূল পাণ্ডাদের নামে নতুন ক'রে থানাতে কয়েক দফা ডায়েরী করার পরামর্শ হ'ল রাতদুপুরে—পরদিন থানাতে ডায়েরী লেখানোর জন্য যখন তারা পৌঁছলো তখন দেখল যে, উল্টে তাদের প্রত্যেকেরই বিপক্ষে নালিশ রুজু হয়ে বসে আছে। আব্দুলের প্রত্যেক অনুচরের বিরুদ্ধে অভিযোগ—মারপিট, দাঙ্গাহাঙ্গামা, পুরুষদের অনুপস্থিতিতে শ্রমিক-কোয়ার্টারে চরাও হয়ে মেয়েদের কাছে কুপ্রস্তাব, জোর-জুলুম করা ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ যে যে অভিযোগ দালালেরা করতে এসেছিল ঠিক সেই দোষে তারা নিজেরাই দোষী! ডায়েরী করে গেছে অন্য লোকে! যে কয়জন অভিযোগ করতে গিয়েছিল তারা প্রত্যেকেই অভিযুক্ত! এ ত ভয়ঙ্কর কাণ্ড। আব্দুল দাড়ির মধ্যে হরদম আঙুল চালায়। সরষের মধ্যেই ভূত ঢুকে বসে আছে! কাকে বাদ দিয়ে কাকে সন্দেহ করবে সে।

মল্লিক সাহেবের কাছে কি জবাব দেবে? অথচ এতবড় খবর চেপে রাখা অসম্ভব। মল্লিক সাহেব ঠিকই টের পাবেন। আর তখন আব্দুলকেও তিনি ষড়যন্ত্রকারী ব'লে সন্দেহ করবেন। দুশ্চিন্তায় আব্দুল মুষড়ে পড়ে।

কোনো পথ খুঁজে পায় না সে।

অবশেষে মানের বালাই ঘুচিয়ে, মল্লিক সাহেবের সামনে মাথা হেঁট ক'রে বল্‌ল—হুজুর, সামনে আঁধিয়ার! কিছুই সমঝাতে পারছি না।

সব শুনে অনিরুদ্ধ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠ্‌লেন। তাঁর হাসিতে আকৃষ্ট হয়ে জিমি কুকুরটা প্রায় দৌড়েই এল। আজকাল জিমি আগের মতো চটপটে নেই, দিনরাত সে শুয়ে বসেই কাটায়। ওর বয়স হচ্ছে, ওকে দেখলেই তা টের

পাওয়া যায়। অনিরুদ্ধ জিমিকে হাতের কাছে পেয়ে আদর করতে লাগলেন—কী রে, তোর আবার কি হ'ল। তুইও কি আঁধার দেখছিস? আহা রে, তোদের দেখলে বড় মায়া হয়। সত্যি আমিই কেন আলো দেখি। অন্তহীন আলোর রৌশন আমাকে এতটুকু আঁধার দেখতে দেয় না।

সঙ্কোচবিহ্বল কণ্ঠে আব্দুল বল্‌ল—হুজুর!

—ও হো তোমাকে বুঝি দাঁড় করিয়ে রেখেছি। ছ্যাখো আব্দুল, আমি একটু ভেবে নিচ্ছিলাম। হ্যাঁ, এ ছাড়া আর উপায় নেই।

—কি উপায় হুজুর?

—দু-মুখো সাপ কটাকে সাবড়ে দাও।

—মাফ করুন হুজুর, ঠিক বুঝলাম না।

—তোমার বুড়ী বুঝি খুব গোসা হয়েছে? আমি বলি কি আব্দুল, বুড়িকে বাতিল করো, একটা আঁটসাঁট তাজা মেয়েমানুষ রাখো। তোমার তো বেশ জওয়ানী রয়েছে হে!

—তওবা, তওবা! হুজুর আমি বুদ্ধু, বেওকুফ বটে, লেকিন—

—তোমার ওই লেকিনের মাথায় জুতো মারো। যা বলি শোনো, তাঁবেদারদের নামে যে ডারেরী আছে তার ওপর আরো গোটাকতক কেস্ ওদের ওপর রুজু করো জল্‌দি।

—তাহলে যে সব কটাই মরবে হুজুর!

—তারা যদি বাঁচে তবে তোমাকেই মরতে হবে। বুঝুক বদমায়েসরা বেঈমানীর মজা। ছেলেখেলার ব্যাপার নয়। কোটি কোটি টাকার কারবার। এর মধ্যে চালাকীর পথ নেই, সোনার চাঁদ। মতলব যারা ফাঁসিয়েছে, তাদের ফাঁসতেই হবে।

—কিন্তু হুজুর, সবাই ত বেঈমানী করে নি!

—কেউ ত করেছে!

—হ্যাঁ। তা বটে।

—সে লোকটা তোমার দলের মধ্যেই রয়েছে ত!

—জী হাঁ জরুর!

—অথচ আসল বদ্‌মাস্‌টাকে ধরতে পারছো না, এও ঠিক ?

—জী হুজুর ! তা পারলে ত কথাই ছিল না।

—তাহ্‌লে সব ক'টাকে বরবাদ করা ছাড়া উপায় কী ? বলো, আর কোনো পথ আছে ? নেই। দয়ামায়া দুখদরদ করবার মতো সময় বা অবস্থা এটা নয়। বিধাতার মতো কঠিন না হতে পারলে সব বান্‌চাল হয়ে যাবে। ক' জন ?

—হুজুর উনিশ জন।

—দোসরা দল বানাও। টাকা ফেললে কুত্তার অভাব হবে না আব্দুল। জল্‌দি এদের ফাঁসাতে হবে। এই হলো সিধা সড়ক।

আব্দুলের বিমর্ষতা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু সে নিরুপায়। উনিশটি লোকের সর্বনাশ তাকে করতেই হবে। নইলে সমূহ সঙ্কট !

কুকুরকে আদর করতে করতে অনিরুদ্ধ বল্‌লেন—কাজ একদম পাক্কা হওয়া চাই। একটা লোকও পাশ কাটালে চলবে না।

আব্দুলের মুখের দিকে তাকিয়ে অনিরুদ্ধ ধমকে উঠলেন—আব্দুল !

চমকে উঠল বুড়ো আবদুল শেখ—জী হুজুর !

—খবরদার ! হুঁশিয়ার।

—খোদার কশম হুজুর !

—খোদাকে আবার কেন এই কাফরের সামনে ডেকে আনছো ! বেহেস্তে তিনি আরাম করুন না। বুঝেছি, ওদের জন্যে তোমার কষ্ট হচ্ছে। আহা, এখন যদি ওদের মেয়াদ হয়ই তাহলে ওদের জরুবাল্‌বাচ্ছারা না খেয়ে মরবে না—সে ভরসা দিচ্ছি। ব্যস, এর বেশি কিছু নয়। তারপর আসল শয়তানকে পাকড়াতে পারলে তার জন্যে পুলিপোলাও বন্দোবস্ত হবে। বাকী সবাইকে খুশী করার কথা তখন ভাবলেই চলবে। কিন্তু জরুরী অবস্থার জন্যে জরুরী ব্যবস্থা, বুঝলে !

আবদুল সব বুঝেছে। এই একটা মানুষকে দুনিয়ার বাকী সকলের থেকে আলাদা করে দেখতে শিখেছে সে। কী যে আছে অনিরুদ্ধর চরিত্রে যার জন্যে কতবার ঘৃণা করতে গিয়েও তার সঙ্গে আবদুল শ্রদ্ধা মিশিয়ে ফেলেছে। আজও তাই হ'ল। নিষ্ঠুর কিন্তু দুর্বোধ্য নয় অনিরুদ্ধ।

দত্তগুপ্তকে ঢুকতে দেখে অনিরুদ্ধ উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন—এই যে আমার মালিক এসে গেছে। যাও আবদুল নিজের দাড়িতে মেহেদী মাখিয়ে, চোখে সুর্মা দিয়ে, কানে জুঁই ফুলের আতর মাখানো তুলো গুঁজে, কস্তুরী কিমাম দেওয়া পানের দোনা চিবিয়ে দিল খুসবু করে পিয়ারীর জরিদার নাগরাতে পহেলা কুর্নিশ হাজির করো। ভাগো।

বিমর্ষ আবদুল মন্থর গতিতে চলে গেল।

পঁচাত্তর

দীনদয়াল ধর্মঘটের দিনচারেক আগে বল্‌লেন—কাল থেকে কারখানায় যাবো।

মিণ্টু আপত্তি করল—সামনেই হাঙ্গামা আসছে বাবা। আর কটা দিন কেটে যাক না।

মাথা নেড়ে দীনদয়াল বল্‌লেন—না রে, শরীরটা ভালো হয়ে গেছে। আর এদিকেও অনেক দেনাপত্তর হলো। মিছেমিছি বসে থাকলে মনে হয় যেন মরেই গিয়েছি।

—আচ্ছা, দেবুদা আসুক ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখো উনি কি বলেন।

—এর মধ্যে আবার পরামর্শের কি আছে! আজকাল তোর ওই এক কথা হয়েছে, উনি কি বলেন, ওঁর সবটাই যেন মস্ত কিছু। আমি কি কচি খোকা!

মিণ্টু হাসলো—আচ্ছা বাবা, আমি বল্‌লেই সেটা দোষ হয়। অথচ তুমিই ত সব ব্যাপারে ওঁকে সালিশ মানো।

—আমি যা করি তা কি তোর সাজে? আমি নয় কিছু মনে করি নে, কিন্তু বাইরের লোকে এসব শুনলে বেহায়া বল্‌বে মিণ্টু!

মিণ্টু গম্ভীর হয়ে গেল—লোকের কথায় এসে যায় না বাবা!

—সে কি রে, সমাজকে তুই উড়িয়ে দিতে চাস?

মিণ্টু শান্ত ধীর ভঙ্গীতে ছুঁচের ফোঁড় তুলতে তুলতে বলে—সমাজ? মানিকপুরে সমাজটা কোথায় বাবা! তোমার এতবড় অসুখের সময় কোথায় ছিল সমাজ! ওই অমলবাবু-নিখিলবাবু ছাড়া আর কেউ একবার খোঁজও করে নি তোমার সংসার চল্‌ছে কি করে? তোমার অসামাজিক অনিরুদ্ধ মল্লিক, সমাজের চেয়ে অনেক বড় মানুষ। নিজে না এলেও লোক পাঠিয়ে খবর নিয়েছেন, একবার পাঁচশো টাকাও পাঠিয়েছেন! সে সব কথা তোমাকে এতদিন জানাই নি, পাছে তোমার মেজাজ খারাপ হয়।

—কি বললি? অনিরুদ্ধ মল্লিকের টাকায় আমার চিকিৎসা হয়েছে? সংসার চলেছে? সে টাকা তুই হাত পেতে নিয়েছিস আমার মেয়ে হয়ে!

—তখন আমি ঠিক জানতাম না বাবা। বাদল টাকাটা আমাকে একদিন এনে দিল, খরচ করবার জন্যেই দিয়ে ছিল। জিজ্ঞেস করেও জানতে পারি নি, এত টাকা হঠাৎ ও পেল কোথায়। অনেক পরে—প্রায় মাস দেড়েক বাদে একদিন ও সত্যি কথাটা বল্‌ল। তখন আর কি করব, সব ত খরচ হয়ে গেছে। সেই নিয়ে ওকে খুব বকেছিলাম।

হঠাৎ মিণ্টু থেমে গেল।

দীনদয়াল মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলেন। কতকটা আত্মগতভাবেই বল্‌লেন—এইভাবেই মানুষকে ও কিনতে চায়। তা কি হয়!

মিণ্টু বল্‌ল—কি হয় আর কি হয় না, তা আমার জানা নেই বাবা। কিন্তু দুঃসময়ে টাকাটা কাজে লেগেছিল। বাদলকে যে বকেছিলাম সেটা হয়ত আমার ভুলই হয়েছে বাবা।

—না মা, ঠিকই হয়েছে। আমারও কারখানাতে যোগ দেওয়াটা ঠিকই হবে। না, এর পর আর বসে থাকা চলে না। মল্লিক জানুক যে, মনুষ্যত্বকে টাকার ঘুষ দিয়ে কেনার অধিকার তার নেই। সবাই অবিনাশ চাটুয্যে, সীতানাথ মুখুয্যে নয়—এটা ওকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

মিণ্টু এই ধরণেরই একটা কিছু শুনতে পাবে আশা করে ছিল—আশা নয়, আশঙ্কা। দীনদয়ালের শরীরে এখনও ধকল সইবার মতো সামর্থ্য আসে নি। তারপর ধর্মঘটের মুখে তিনি কাজে যোগ দিয়েই ধর্মঘটের সময় কারখানা কামাই করবেন, প্রমাণ করবেন, ধর্মঘটকে তিনি সমর্থন করেন। অথচ এই তিনচার দিন কাজ না করলে, অসুখের অজুহাতটা স্বচ্ছন্দে বজায় থাকে। কোনো গোলমালেই পড়তে হয় না তাহলে।

একথাটা ত দীনদয়ালকে বলে বোঝানো যাবে না! দীনদয়ালের সমাজ—শ্রমিক সমাজ। আর মিণ্টুর সমাজ সেখানেই সীমাবদ্ধ নয়—শ্রমিককে বাদ না দিয়েও, তার সঙ্গে আরও একটা শ্রেণীর মানুষকে সংযুক্ত করে নিতে চায় মিণ্টু। ওর বর্তমান চিন্তাতে মল্লিক সাহেবও সমাজের একজন। নিখিলের মারফতে মিণ্টু সাহেবসুবোদের অন্তরের যে পরিচয়টুকু পরোক্ষভাবে পেয়েছে

সেটুকু উপেক্ষা করতে ওর মন চায় না। ওদের মধ্যে যে মানুষের বার্তা রয়েছে সে মানুষকে স্বীকার করতে মিণ্টু বাধ্য।

বিশেষ করে বাদল নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার পর থেকেই মিণ্টুর মনে এই প্রশ্নটা বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রথমে ও ভাবতো বাদল অন্যায় করেছে। না সে অন্যায় করে নি ভুল করেছে—আর অন্যায়কারী হচ্ছে অনিরুদ্ধ মল্লিক। সে জন্য অনিরুদ্ধর ওপর বিরক্ত হয়েছিল মিণ্টু, বিরক্তির আর একটা কারণ—মন্দাকিনী। অমন আদর্শবাদী মেয়ের অপমৃত্যুর জন্য মিণ্টু অনিরুদ্ধকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ওর মনের মধ্যে কোথা থেকে অনিরুদ্ধর জন্য সমবেদনা পুঞ্জিত হয়ে উঠেছে একটু একটু করে, তা টেরও পায় নি। হয়তো অনিরুদ্ধ দীনদয়ালকে শ্রদ্ধা করে সেইজন্যই টাকা পাঠিয়েছে। দীনদয়ালের চাকরীটা অনায়াসে ঘুচিয়ে দেবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা দেয় নি অনিরুদ্ধ। এই গুণটুকু কি মনুষ্যত্বের খতিয়ানে বাদ দিয়ে রাখার মতো? মোটেই তা মনে করে না মিণ্টু। কাজেই আজ যখন দীনদয়াল নীরস কণ্ঠে বললেন, অনিরুদ্ধ মনুষ্যত্বকে টাকার ঘুষ দিয়ে কিনতে চায়, তখন মিণ্টু আগের মতো সোৎসাহে সায় দিতে পারল না।

মিণ্টুর চুপ করে থাকার আরও একটা কারণ ছিল—দীনদয়াল দীর্ঘদিন অসুস্থতার পর যেমন একটু একটু আরোগ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন মিণ্টুও যেন তেমনি ভাবে স্বাভাবিক নিয়মে শ্রান্ত হয়ে পড়ছে। যেন এবার ওর বিশ্রামের সময় আসছে। দীর্ঘদিনের একটানা স্নায়ুযুদ্ধের পর স্বাভাবিক নিয়মেই মিণ্টু অবসন্ন। আর যেন অশান্তি, হাঙ্গামা ও সইতে পারছে না। এখন একটু শান্তি চাই। এবার ওকে মুক্তি দিতে হবে। ছোট্ট একটি নীড়ের নিশ্চিন্ত স্বপ্নে ওর খরতপ্ত কুমারী মন বিভোর হয়ে থাকতে উৎসুক। আর কিছু নয়, আসন্ন বর্ষাকে প্রার্থনা করছে মিণ্টু। বাইরের এই স্বার্থসংঘাতকে পাশ কাটিয়ে যাবার পথ খুঁজছে। এ সব আর সইতে পারে না ও।

দীনদয়াল বললেন—শোনো মিণ্টু, পরামর্শ তোমরা করতে পারো, কিন্তু আমার সংকল্প বদলাবে না!

দীনদয়ালের কথার ধাক্কায় মিণ্টু চমকে তাকালো—তুমি তাহলে সংসারকে অগ্রাহ্য করতে চাও বাবা!

দীনদয়াল বললেন—সমাজের জন্যে ব্যক্তিগত স্বার্থকে কখনো কখনো খাটো করা দরকার হয় বই কি মা।

—তর্ক করব না বাবা। কিন্তু সমাজের দায়িত্ব সমাজ পালন করছে কি? যাকে তুমি সমাজ বলছ তাদের একজনের পক্ষেও এতটুকু স্বার্থত্যাগ দেখাও।

—কেন অমল, দেবু সীতানাথ, জিলানী এরা সবাই আমাদের অসময়ে দেখেছে। আরও দশগণ্ডা লোকের নাম আমি করতে পারি।

—বেশ, তাহলে তাদের কথাই মানবে ত। তারা সবাই জানে তুমি এখনো সুস্থ নও। যদি তারা কাজ করতে বলে তোমায়, তবে যেয়ো।

দীনদয়াল বললেন—মিথ্যে নিজেকে ঠকাতে যাস নে মিণ্টু। তারা হয়তো আপত্তি তুলবে। কিন্তু আমার মন বলছে যে, এতবড় যজ্ঞে আমাকে কিছু অর্ঘ দিতেই হবে। না রে, এভাবে বুড়ো বয়সে মায়ার বশে জোচ্চুরী করতে বলিস নে। তুই বুঝছিস নে, কী একটা কাণ্ড হতে বসেছে—।

দীনদয়াল চোখের সামনে মহৎ একটা মিছিলের ছবি দেখছেন,—বিস্ফারিত বিস্ময়াবিষ্ট তন্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর চোখের তীব্র উজ্জলতা যেন রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানাকে অস্বীকার করতে চায়।

পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে মিণ্টু শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ওর আশা স্বপ্ন সফল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ও বেশ দেখতে পাচ্ছে দীনদয়াল পূর্ণাহুতির জন্যে প্রস্তুত! কথাটা মনে হ'তেই শিউরে উঠলো মিণ্টু। এ সব কী ভাবছে ও। দীনদয়ালের মৃত্যুর কামনা করছে না কি? না, ত! তবে কেন শিউরে উঠল মিণ্টু। কামনা না করলেও কল্পনা করেছে, আশঙ্কা করেছে যে দীনদয়াল এ ধাক্কা আর সামলে উঠ্‌তে পারবেন না। কেন এমন মর্মান্তিক কল্পনা ওর মনে এল? নিজের অজ্ঞাতেই আকুল কণ্ঠে মিণ্টু ডাকল—বাবা!

দীনদয়াল হতচকিত দৃষ্টিতে তাকালেন—কি রে, কি হ'ল মিণ্টু?

—না, কিছু না ত।

দীনদয়াল স্নেহাপ্লুত স্বরে বল্লেন—আমার কাছে লুকোস নে মা। বল—

—বাবা, আর ভালো লাগছে না।

—কি ভালো লাগছে না মা?

—কিছুই না। এমনিই যেন ভালো লাগে না—কোনো কিছুই ত হয় নি।

—কী-ই বা ভালো লাগার মতো পেয়েছিস। তবু যে এতকাল এই খোসা হয়ে যাওয়া সংসারটাকে হাসি মু[illegible]গলে রেখেছিস সেই ত যথেষ্ট।

একটু থেমে দীনদয়াল আবার বল্তে শুরু করলেন—আমি ত মা অনেক বার এখানে ওখানে চিঠি দিতে চেয়েছি, তুই বাধা দিয়েছিস। তোর হাবভাবে মনে হয়েছে, তুই চাসনে অন্য কোনোখানে বিয়ে হয়। এখন তোমার বয়স হয়েছে মা, লজ্জা করলে ত চল্বে না—খুলে বল্লেই ত পারো, কি চাও।

মিণ্টু অধোবদনে বসে থাকে, সেলাই থেমে গেছে ওর হাতে। বলে—তুমি কি কিছুই বোঝো না বাবা?

—আমি? আমি বুঝে কি করব বলো? সব বুঝলেও এক এক সময়ে বোকা সেজে বসে থাকতে হয়, বাধ্য হয়ে।

মিণ্টু গম্ভীর ভাবে বল্ল—তার দরকার নেই। তুমি কথাটা ভু[illegible] পারো।

দীনদয়ালের ভ্রূযুগল একটু কুঞ্চিত হয়। তিনি সেটুকু লুকোতেও চেষ্টা করেন না। ভারি গলায় তিনি বলেন—কিন্তু সে যদি মনে করে যে, আমরা স্বার্থের জন্যে তার ওপর জুলুম করছি?

এবার মিণ্টুর কণ্ঠে অধীরতা প্রকাশ পায়—সেরকম ভয় থাকলে তোমাকে বল্তাম না।

দীনদয়াল যেন অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুই আবিষ্কার করতে পারেন না। আস্তে আস্তে বলেন—এত অল্প দিনে অত বড় একটা শোক মন থেকে মুছে যেতে পারে?

মিণ্টু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। জবাব দেবার কিছুই নেই। দীনদয়াল কথাগুলো এমনভাবে [illegible] যেন তাতে দেবজ্যোতির মানসিক লঘুতার প্রতি

একটা কটাক্ষই পড়ল। সেই সঙ্গে মিণ্টুকেও তিনি যেন অপরাধী সাব্যস্ত করলেন।

দীনদয়াল নিজেই নিজের কথার জবাব দেন—হয়তো যায়। আর না গেলেই বা কী। তুই ওকে ভাল বুঝিস। তাহলে কথাটা অমলকে দিয়েই বলানো ভালো। কি রে?

মিণ্টুর স্বভাবে একটা নৈর্ব্যক্তিকতার আস্তরণ পড়েছে—দীর্ঘদিন একটা সংস্কারের ভার বইতে হ'লে বুঝি এই নিরপেক্ষতার ভঙ্গীটা আপনিই এসে পড়ে। ও বল্‌ল—তা যদি ভালো মনে করো তাও হতে পারে। অবিশ্যি তুমিও সরাসরি বল্‌তে পারো।

—না, না, সীতানাথকেই বলা ভালো। তা সীতানাথ যে রকম মানুষ, তাতে বেঁকে না বসে—বলবে স্বশ্রেণীর বাইরে কাজ করাতে সামাজিক বাধা আছে।

মিণ্টু ঠোঁট উল্টে বল্‌ল—তা আর বলতে সাহস হবে না। স্বজাতির মায়াই কাটাতে হ'তো হয়তো।

দীনদয়াল আর কিছু বল্‌লেন না। মেয়ের মুখের এতবড় স্পষ্ট কথাটা রূঢ় শোনালো তাঁর কানে।

মিণ্টু হঠাৎ সেলাই গুছিয়ে রেখে উঠে পড়ল—তোমার হরলিক্‌স খাবার সময় হ'ল।

দীনদয়াল বল্‌লেন—আজ একটু চা দিলে ত পারতিস মা।

সস্নেহ স্বরে মিণ্টু বল্‌ল—এটা খেয়ে নাও এখন। চা যদি দিই ত সেই সন্ধ্যের সময়।

পিওন এসে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। বিকেলের ডাক এসেছে। এর পরই আসবে সাইকেল হাঁকিয়ে খবরের কাগজ ওয়ালা। দীপু ফিরবে কলেজ থেকে। ওই বুঝি স্কুলের ছুটি হ'ল, পথে ছেলেদের কলরব উঠেছে। দীনদয়াল অন্যমনস্ক ভাবে খামখানা ছিঁড়তে ছিঁড়তে পথের দিকে তাকান একবার।

অমলার চিঠি। হ্যাঁ অমলারই চিঠি—বাদলের কথা কিছু লিখেছে না কি? ছেলেটা লেখাপড়া করল না, এই বয়সে পয়সা রোজগারের জন্যে বেরিয়ে পড়ল।

দীনদয়ালের একটিমাত্র ছেলে—মানুষ করতে পারলেন না। অথচ ছেলেটার অনেক সদ্‌গুণ ছিল। কিছুই হ'ল না। সে গুণগুলো কোনো কাজেই লাগবে না হয়তো। বাদলকেও এমনিভাবে গোটা জীবন দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে একদিন দাঁড়ি টেনে চলে যেতে হবে। ও-ই কি পারবে নিজের ছেলে-মেয়েকে মানুষ ক'রে যেতে? চিঠিখানা পড়বার আগেই তিনি ভাবনার রাজ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন।

এক সময়ে চমকে উঠ্‌লেন, দুটো চড়াই পাখী ফর্‌-ফর্‌ করে কড়ির খাঁজে উড়ে গিয়ে বসল। হ্যাঁ, অমলা কি লিখছে পড়া যাক। পড়তে পড়তে খুশী হয়ে ওঠেন দীনদয়াল। তাহলে অমলা এখনও মানিকপুরের কথা গভীরভাবে চিন্তা করে। ধর্মঘটের কথা ওর কানে পৌঁছেছে। মজ্‌দুরের দাবির সংগ্রামে অমলা নিজেও সামিল হতে চায়। মানিকপুরে চলে আসবার জন্য ও ব্যগ্র, দীনদয়ালের মতামত জানতে চেয়েছে। এখানকার সম্বন্ধে হাজারো খুঁটিনাটি প্রশ্ন। কিন্তু এ কী—'বাদলের খবর কী?'……এ প্রশ্নের তাৎপর্য দীনদয়াল বুঝতে পারেন না। চিঠিখানা আদ্যোপান্ত আবার পড়লেন। কিন্তু তা থেকে বাদল সম্পর্কে আর কোনো কথা খুঁজে পাওয়া গেল না—ওই একটি প্রশ্ন ছাড়া। তবে কি বাদল অমলার ওখান থেকে অন্যত্র চলে গেছে? কোথায় গেল সে?

দীনদয়ালের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল—বাবা।

তিনি মুখ তুলে, হাত বাড়িয়ে হরলিক্‌সের কাপটা নিয়ে বল্‌লেন—অমলার চিঠি।

কথাটা কানে যাবার আগে দীনদয়ালের বাঁ হাতের দিকে নজর পড়েছিল মিণ্টুর। কিন্তু তখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করে নি যে ওটা অমলারই চিঠি। তবু আশঙ্কার উঁকি ছিল বই কি। দীনদয়ালের মুখের কথাটা শুনেই মিণ্টু যেন বিবশ হয়ে জানালার পাল্লা ধরে নিজেকে সামলে নিল। অমলা কি লিখেছেন সে প্রশ্নটুকুও করবার মতো সামর্থ্য ওর ফুরিয়ে গেছে।

দীনদয়াল চিন্তিত ভাবে ধূমায়িত পেয়ালা থেকে পিরীচে হরলিক্‌স ঢালেন আর বলেন—অমলা আসতে চায় এখানে।

একটু নয় রীতিমত চেষ্টা করেই মিণ্টু বলে—বেশ তো ভালোই হবে। ছেলেটা কত বড় হয়েছে আমাদেরও দেখা হয়ে যাবে এই বারে।

—কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারা যাচ্ছে না—

এই পর্যন্ত বলে দীনদয়াল থেমে একটু ভেবে নিলেন, বাদল সম্পর্কে প্রশ্নটা তোলা সমীচীন হবে কী? অযথা মেয়ে দুটোকে দুর্ভাবনায় ফেলে লাভ কী? ওরা ত কিছুই করতে পারবে না, মাঝখান থেকে দিনরাত ভেবেই মরবে। এমনিতেই ওদের ওপর যথেষ্ট জুলুম হয়—এর ওপর আর কেন! থাক, বাদলের ব্যাপারটা আপাততঃ বল্‌বেন না মিণ্টুকে। হয়ত দুদিন বাদে বাদল নিজে থেকেই চিঠি লিখবে।

মিণ্টু প্রশ্ন করতে গিয়েও সাম্‌লে নেয়, যে কথাটা দীনদয়াল বুঝতে পারছেন না সেটা বল্‌তেই হবে, বোঝাতেও হবে, কিন্তু কি ক'রে ও বল্‌বে? মিথ্যের সহস্র মালা দিয়ে যে একরত্তি সত্যকে লুকোনো হয়েছে সেটা হঠাৎ এক মুহূর্তে প্রকাশ করার কী যে বেদনা তা একমাত্র মিণ্টুই জানে। পৃথিবীটা যেন কেঁপে উঠল, মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ আগুনে পুড়ছে। কর্ণমূলে অগ্নিদাহের তীব্র যন্ত্রণা। চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে মিণ্টুর।

দীনদয়াল হরলিক্‌স্ পান করছেন।

মিণ্টু বল্‌ল—আর কি লিখেছেন দেখি!

বাধা দিতে ইচ্ছে থাকলেও দীনদয়াল অসহায় ভাবে চিঠিখানা ওর হাতে তুলে দিলেন।

দীনদয়াল স্থির দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ওই ত মিণ্টুর মুখখানা তাঁর চোখের সামনে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আহা বেচারী এইটুকু বয়সে কত কষ্টই পেয়েছে। এতটুকু বয়স থেকে মাতৃহারা, তার ওপর ছোট বোনকে ভাইকে মানুষ করার সমস্ত ভারটুকু ওকে বড় গম্ভীর আর অকালবিজ্ঞ করে তুলেছে। মায়ের মতো সেজে ছোট ভাইবোনকে একটু একটু ক'রে মানুষ হতে সাহায্য করেছে এই মেয়ে। আজ হঠাৎ বাদলকে দুনিয়ার জনারণ্যে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যেতে দেখলে কী প্রচণ্ড ধাক্কা খাবে বেচারী। সে আঘাতের

কতটুকুই বা প্রকাশ পেতে পারে ওর মুখে। দীনদয়াল মনে মনে ব্যথিত কুণ্ঠিত —কিন্তু নিরুপায়।

তিনি বল্‌লেন—চাকরী-বাকরীর খোঁজে হয়তো, কোনো বন্ধুবান্ধবের আস্তানায় গিয়ে উঠেছে। বেশিদিন অমলার ঘাড়ে বসে বসে খেতে ওর লজ্জা করেছে হয়তো।

মিণ্টু হাসলো, তারপর বল্‌ল - তুমি আমাকে ক্ষমা কর বাবা।

মেয়ের মুখে এমন কথা প্রত্যাশা করেন নি দীনদয়াল—বরং আশঙ্কা করেছিলেন মিণ্টু অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়বে আর তিনি সান্ত্বনা'র জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবেন। হঠাৎ মিণ্টুর কথা শুনে তিনি অপ্রতিভভাবে বল্‌লেন—কি রে, কী হল ?

মিণ্টু পিতার পায়ের ওপর মাথা লুটিয়ে দিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌ল—মিথ্যে কথা বলেছি, তোমাকে মিথ্যে দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছি, বাবা।

মেয়ের হাত ধরে দীনদয়াল তোলেন—কি পাগলামী শুরু করেছিস! কি কি মিথ্যে ? ক্ষমা কেন ?

—না বাবা তুমি জানো না! বাদল অনেক দিন থেকে নিখোঁজ। এতদিন তোমাকে জানতে দিই নি।

দীনদয়াল খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করেন—এই কথা! তোরা জানতিস ? আমি জানতাম না! তাতে আর কি হয়েছে! জানা গেল। তার জন্যে এত কান্নাকাটির কি আছে!

—তা নয়। সে আমার ওপর অভিমান করে চলে গেছে। মল্লিক সাহেবের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্যে আমি তাকে অমানুষ বলেছিলাম। তাই বুঝি সে মানুষ হবার জন্যে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় গেল ? একটা খবর পর্যন্ত এতদিনে দিল না! বেঁচে আ[illegible]?

দীনদয়াল বিষণ্ণ হাসি হেসে আস্তে আস্তে বল্‌লেন—মানুষ হলেই খবর দেবে! সে জন্যে ভাবিস নে মা। ওর বাবাও ত একদিন ওই বয়েসেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সেই রক্তের ধারা—

কথাগুলো দীনদয়াল মেয়েকে সামনে রেখে যেন নিজেকেই শোনাচ্ছেন।

কথা বলতে বলতে তিনি দেখতে পান নিজের প্রথম যৌবনের সেই তরুণ মানুষটিকে। ঘুরতে ঘুরতে এই মানিকপুর শহরে এসে হাজির হ'লেন। সে আমলে কারখানার কাজকে কেউ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত না। বিশেষ ক'রে বাঙালীর ছেলেরা কুলী মজুরের জীবনকে ঘৃণার চোখে দেখত। কিন্তু দীনদয়াল এখানেই আস্তানা নিলেন।

চাকরী তখন মানুষকে খোঁজে—মানুষ চাকরীকে কৃপার বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে। দীনদয়ালের মনের জোর আর গায়ের জোর তখন পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলার নেশায় মশগুল। এক টাকা দু-আনা রোজের চাকরী পেয়েই দীনদয়াল খুশী। তখনকার দিনে লেখাপড়া জানা বাঙালীর ছেলে কারখানায় ক'টাই বা এসেছে! অতএব দীনদয়ালের খাতির আর বেতন বাড়তে লাগলো। তিনি প্রথম মাসেই মাইনে পেয়ে পিতৃদেবের চরণে মনিঅর্ডার পাঠালেন—যথাসময়ে সে টাকা ফেরৎ আসে। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পোস্টকার্ডে এল কড়া ধমক—'বারান্তরে এইরূপ টাকা পাঠাইয়া আমাকে অপমানিত করিবা না!' অবশ্য সে দুর্যোগের মেঘও কাটতে বছর দেড়েক মাত্র লেগেছিল। বাবাই উপযাচক হয়ে ছেলেকে পুনরায় চিঠি লেখেন, 'তোমার মাতৃদেবী মৃত্যুশয্যায়, তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব লিখি যে পত্রপাঠ মাত্র চলিয়া আসিবা, অন্যমত করিবা না।' সে যাত্রা মা সেরে উঠেছিলেন এবং পুত্রবধূর মুখদর্শন করবার জন্য ছেলেকে মাথার দিব্যি দিয়ে রসুলপুরেই ধরে রেখেছিলেন। ছেলের বিয়ে দিয়ে তিনি খুশী হলেন। সেবার ছমাসের ওপর দীনদয়াল দেশেই কাটান। তারপর কর্মস্থলে ফিরে আসেন। হ্যাঁ, চাকরী তখনকার কালে অত সহজে যেত না। ছুটি পাওয়াতেও বাধা কিছু ছিল না। কাজ করলে মাইনে, না করলে নয়। চাকরীর স্থায়িত্বও কিছু থাকতো না, কারখানাতে কাজ ক'মে গেলে কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিতেন অমুক-অমুক লোককে আপাততঃ বরখাস্ত করা হ'ল, আবার যখন প্রয়োজন হবে হাতের কাছে পাওয়া গেলে তাদের কাজে বহাল করা হবে। সে এক বিচিত্র অবস্থা। আর তাতে সবাই অভ্যস্ত ছিল। যার যখন ইচ্ছে কাজ ছেড়ে চলে যেত, বাধা দেবার কেউ ছিল না।

শ্রমিকের সমাজ-জীবন ব'লে তেমন কিছু ছিল না—বস্তীতে যারা থাকতো তারা কাঁচী মদে ডুবে থাকতো, সাঁওতাল বাউড়ী মেয়েদের সঙ্গে প্রকাশ্যেই সহবাস করত। দাঙ্গা খুনোখুনী লেগেই থাকতো। ·· শিউরে উঠলেন দীনদয়াল,—কী জীবনই ছিল। তার মধ্যেই মানিকপুরের বয়স বেড়েছে। একটু একটু করে সমাজ গড়ে উঠেছে—আদিম বর্বরতার কবল থেকে মানুষ নিজেকে মুক্ত করেছে। জাগিয়ে তুলেছে দাসত্বের জড়তা থেকে বিস্মৃত আত্ম-পরিচয়কে!

আজ দীনদয়ালের ভাগ্যে সেই অন্তিম নির্দেশ এসেছে। তাই বাদল মানুষ হবার জন্যে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেছে। যাক। সে মানুষ হয়ে উঠুক। নতুন রূপ নিয়ে সে আপন পায়ে দাঁড়িয়ে উঠুক। না, খেদ করবেন না—প্রাপ্য, হ্যাঁ, এ প্রাপ্যটুকু জমা ছিল বইকি! পিতাকে তিনিও এই আঘাতই দিয়েছিলেন—তার প্রতিদান ত পৃথিবী মিটিয়ে দেবে। বিদ্রোহ-বিপ্লব যাই করুন না কেন, তিনি ত বাপ-মায়ের মনে বেদনার কারণ হয়ে ছিলেন। বাদলের বেলাতে তাঁর চঞ্চলতা প্রকাশ করা সাজে কি? তবু দীর্ঘশ্বাস অবাধ্য, দুর্বল দেহটাকে মুচ্‌ড়ে বেরিয়ে এল—একটা মর্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু ওষ্ঠপ্রান্তে হাসিটুকু মোছে নি দীনদয়ালের।

দীপু এসে পড়ল। সারাদিনের রোদ যেন মুখে মেখে ও ঘরে ঢুকল। ওর কণ্ঠে আশ্চর্য কাকলি—বাবা, দেখ কে এসেছে!

মিণ্টু নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল—আরে দেবি! তুই কোত্থেকে?

—কেন কলেজ থেকে! আর ভাই, আসতে পারি না। যে যার নিজের সংসার নিয়ে কেটে পড়ল, এখন আমার ঘাড়ে সব। কখন আসি বলো? সেই জন্যে সোজা কলেজ থেকেই আজ—

—তা বেশ করেছিস। এখন মুখ হাত ধুয়ে আয়, খুব ক্ষিদে পেয়েছে ত!

—হুঁ! কতদিন তোমার হাতের আদর খাইনি মিণ্টুদি!

দীনদয়াল বল্‌লেন—পড়াশুনো কেমন হচ্ছে রে দেবি!

—ভালো হচ্ছে না। আসানসোলেও নাকি একশ' চুয়াল্লিশ জারি হবে।

কলকাতার মত দাঙ্গা শুরু হ'লেই হয়েছে আর কি। আচ্ছা কাকামনি কি আরম্ভ হ'ল বলুন তো—যুদ্ধ, ধর্মঘট, দাঙ্গা যতো কি আমাদেরই ভাগ্যে এসে জুটলো!

দীনদয়াল ডান হাতের তালু উল্টে এমন একটা ভঙ্গী করলেন যার সহজ অর্থ দাঁড়ায়, হ'লেই বা কী করা যাবে! মুখে বল্লেন—তা এর মধ্য দিয়েই নিজের কাজ করে যেতে হবে মা! ষোল আনা শান্তির মুখ চেয়ে হাতপা কোলে ক'রে বসে থাকা বৃথা!

দীপু ইতিমধ্যে কলেজের বেশ বদলে শাদা শাড়ী পরে এসে হাজির। দেবিকার হাত ধরে টান দিয়ে বল্ল—ভেতরে চলো না। এখানেও ছুনিয়ার সমস্যা নিয়ে লেকচার দেবে নাকি!

রান্নাঘরের দাওয়াতে আসন পড়েছে। দেবিকা বল্ল—আমি কিন্তু তেলনুন মেখে কাঁচালঙ্কা দিয়ে মুড়ি খাবো।

মিণ্টু ঘরের মধ্যে শসার খোসা ছাড়াচ্ছিল। দরজায় মুখ বাড়িয়ে বল্ল—লঙ্কার সঙ্গে শসাও দেবো।

দীপুর তাতে আপত্তি, ও বলে—শসার চেয়ে খানিকটা কলের জল খাওয়া ভালো! কী স্বাদে যে মানুষ শসা খায় বুঝি নে বাপু!

দেবিকা কিন্তু খুশী হয়ে ওঠে, বলে—আঃ এরকম খাবার পেলে দাদা যা খুশী হয়!

ছুটো শসাই কাটতে যাচ্ছিল মিণ্টু, কি মনে ক'রে একটা তুলে রেখে দিল।

মুড়ির বাটি নিয়ে বাইরে এসে বল্ল—দীপু কোথায়? ছাখো কাণ্ড, ঘরে ত টাটকা লঙ্কা রয়েছে—তা হবে না, গাছ থেকে ছেঁড়া চাই।

দেবিকা প্রশ্ন করে—মিণ্টুদি তুমি নিলে না?

—আমি ভাই বেলা গিয়ে খেয়েছি, এখনও ঢেকুর উঠছে!

—না, না, সে হবে না। সবাই মিলে একসঙ্গে কত কাল যে খাইনি! তবে তুমি আর আমি এই একবাটি থেকেই খাই—কি বলো।

মিণ্টু কপট তিরস্কারের সুরে বল্ল—তুই আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবি!

তিনজনের একজনও আসনে বসল না। মুড়ি চিবোতে চিবোতে দেবিকা একবার দীপুর দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—কি রে, সত্যি বলেছিস ত? জিগ্যেস করি!

একটা সবুজ লঙ্কায় কামড় দিয়ে দীপু আপন মনেই বলে—ইস্, কী কালই হ'লো! একেবারে ঘোর কলি, লঙ্কায় ঝাল নেই, লবণে মুন নেই, চিনিতে মিষ্টি নেই, তেঁতুলে টক নেই—

আরও হয়তো অনেক বস্তুর স্বভাবচ্যুতির ফিরিস্তি দিয়ে যেত দীপু—কিন্তু দেবিকার ধমকে থেমে গেল। দেবিকা অত হেঁয়ালী পছন্দ করে না। ওর প্রকৃতিতে বাহুল্যের বালাই নেই। দীপুর দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে ও বল্‌ল—থাম! আমার কথার জবাব দে। কেন তবে তুই কলেজে বানিয়ে বানিয়ে বাজে কথা বল্‌লি?

দীপু ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ল—কথা ত সব সময়ই বাজে। ফিস্‌ফিস চুপ চুপ, চোখেচোখে যে কথা হয় তাকে মশাই কথা বলে না, বার্তা বলে। আর এই তোমাকে আমি যা বল্‌ব, আর তুমি আমাকে যে কথা বলবে সে সবই ঝন্-ঝন্ করে বাজবে বই কি!

মিণ্টু ওদের দু'জনের ভাবগতিক দেখে কম অবাক হয় নি। তবে দেবিকার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু শঙ্কিত ভাবেই প্রশ্ন করল—কি হয়েছে রে দেবি?

দীপু এবার দিদির মুখে হাত চাপা দিয়ে বল্‌ল—ছি-ছি লজ্জা! তোমার আবার এতে মাথা গলানো কেন বাপু!

দেবিকা একটু ঝাঁঝালো সুরেই জবাব দিল—আহা এখন এই বলে চাপা দিচ্ছিস! আমি এত সহজে ছাড়ছি নে। মিণ্টুদিকে ব'লে তবে—

মিণ্টু বল্‌ল—কি, কি? ও পোড়ারমুখী কি করেছে বলো তো ভাই!

—আচ্ছা মিণ্টু দি, রাগ করো না—একটা কথা জিগ্যেস করব?

—এত কিন্তুর কি আছে বাপু। তখন থেকে কেবল ভণিতা করছিস, কেন?

—না। আর কিছু নয়। যদি সত্যি না হয়, তবে বড় বিশ্রী—সে ভারি হয়ে হবে।

ব'লে দেবিকা আবার দীপুর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝবার চেষ্টা করে।

দীপু ফস্ করে বল্‌ল—আমি পড়ি আই-এ, দিদির হবে বি-এ দেবুদার সঙ্গে ইয়ে।

মিণ্টু একটু হাসলো—থাম বাঁদরী। বড় ফাজিল হয়েছিস!

দীপুর থামার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে ও বলে চল্‌ল—আমি আজ সবিনয়ে করি নিবেদন! সেদিন রাত্তিরে মশাই পেয়েছি প্রমাণ দেওয়ালের আছে কিনা কান। গোয়াল ঘরেতে থেকে শুনি যতো কথোপকথন। আর কারো কাছে কিন্তু করি নাই ফাঁস। পাছে বেশি শুনে ফেলি সেই ভয়ে করিনু চিৎকার। সাপ সাপ রব তুলে, রোধ করি আনন্দ উল্লাস। না হলে যে হাসি পেত,—দেবু আর দিদি কথা এই পর্যন্ত হইল ক্ষান্ত।

দেবিকার সামনে মিণ্টু হাসতে পারে না কিন্তু দীপুর ভাবভঙ্গী দেখে ওর হাসি পায়। না, রাগ হচ্ছে না। অথচ একটু রাগ দেখাতে পারলেই যেন ভালো হ'ত! তাই বল্‌ল—কি এমন শুনেছ যে ছড়া কাটতে হবে?

—নাঃ, এই—কিছুই না। আরে সেসব কথা ত বলিই নি, আমি শুধু বলেছি দেবিকাকে যে, দেবুদার বৌকে বৌদি বলার বড় সাধ ছিল, তা আর হ'ল না, দিদিই বলতে হবে।

এবার দেবিকা বল্‌ল—জানো মিণ্টু দি, আমাকে জড়িয়ে ধরে কমনরুমে কি পেত্নী-কান্নাই না কাঁদলো! এত ঢঙও জানে! বলে কি, দাদার বিয়ে হ'ল কিন্তু বৌদি হ'ল না রে! কীর্তনের সুরে টেনে টেনে বলে, বৌদি দিদি হ'ল, দাদা হ'ল জামাইবাবু রে!

মিণ্টু হাসতে লাগলো। অর্গল আর রইল না। প্রাণ খোলা হাসিতে মিণ্ট দুলে দুলে উঠতে লাগল।

দীপু হঠাৎ তর্জনী তুলে বল্‌ল—দিদি! এমতাবস্থায় তোমার প্যাঁচার মতো গম্ভীর থাকা সমীচীন।

—কেন?

প্রশ্ন করে দেবিকা।

—আহা রে সমুখে তোমার ননদিনী হের হের। ননদিনী বড় দজ্জালিনী!

দীপুর কথা শুনতে শুনতে মিণ্টু গম্ভীর হয়ে বল্‌ল—দাঁড়াও বাবাকে বল্‌ছি।

—যাও না। বাবার কাছে ব'লে আর মুখ হাসায়ো না—আ—আ!

মিণ্টু আর দীপুর এই আড়াআড়ি দেখে দেবিকা মনে মনে ভাবে, এরা বেশ আছে। জীবনের এমন মহোৎসবের পরিচয় ও যেন ভুলেই গিয়েছিল। ওদের বাড়িতে একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন দিনরাতের টানাপোড়েন। বেঁচে থাকাতেই বাঁচার সার্থকতা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত। আর কলেজে শিখে আসা রাজনীতির কচ্‌কচিতে দেবজ্যোতিকে উত্যক্ত করা চলে মাত্র, পরাস্ত করা যায় না। নিজেও দেবিকা বিজয়িনী থাকতে চায়। আর সীতানাথ, তিনি যে কি করছেন তা কাউকে জানান্‌ না। দু-জায়গায় দু-খানা বাড়ি করেছেন, তার যাবতীয় আদায় উসুল নিজেই করেন। তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ হয় কেবলমাত্র হুঁকো টানার শব্দে। ছেলেমেয়েকে ইদানীং তিনি প্রায় কিছুই বলেন না। এমনও হয় যে, দু-তিন দিনের মধ্যে কেউ কারুর সঙ্গে কোনো কথাই বল্‌ল না—অথচ দিনগুলো কেটে গেল!

দেবিকা যেন জোয়ারের টানে ভেসে যাচ্ছিল, হঠাৎ মিণ্টুকে আশ্রয়ের মতো আঁকড়ে ধরে বল্‌ল—মিণ্টু দি তুমি চলো, নইলে পাগল হয়ে যাবো!

ওর অতর্কিত ভাবাবেগের স্পর্শে চম্‌কে উঠল মিণ্টু—ওমা সে কি! আমি আবার যাবো না বললাম কবে রে!

দেবিকা বল্‌ল—না তা নয়। সে যাওয়ার কথা বলি নি। একেবারে আপনার হয়ে যাবে।

দীপু ফোড়ন দিল—ঘোম্‌টা টানা, হাসতে মানা। গোমড়া পানা মুখটি নিয়ে, তুলসী তলায় প্রদীপ দিয়ে, বল্‌বে তুমি মিনমিনিয়ে ওহো, সুখের রাণী এই তো আমি সিঁথির পরে সিঁদুর—বিয়ে! বুঝলে দিদি—এই কথাটাই বল্‌ছে বিধি!

—থাম তোর ফষ্টিনষ্ট সব সময় ভালো লাগে না।

মিণ্টু ধমক দিল। সঙ্গে সঙ্গে দীপু মুখখানা গম্ভীর করে বল্‌ল—আচ্ছা তবে থাক। এবার আমরা একটু আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করি!

দীনদয়াল বৈঠকখানা থেকে হাঁক দিলেন—মিণ্টু, জামাই এসেছে রে!

জামাই বল্‌তে অমলকেই জানে সবাই।

দীপু হাসতে হাসতে দিদির দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—আর বেশিদিন জামাইকে আদর পেতে হবে না, নতুন জামাই এলে পুরোণোর কপাল পুড়বে।

দেবিকা বল্‌ল—আমি ভাই চলি, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ওদিকে কখন যে কি হবে জানি নে। বাড়ি যাই।

দীপুর দিকে তাকিয়ে মিণ্টু বল্‌ল—যা না ওর সঙ্গে!

—তারপর তোমার এদিকের কি হবে?

—একদিন নয় আমিই সব করব।

—ও, তারপর দেবুদার সঙ্গে ফিরবো, কি বলো? উনি ত সেই কবে, পরশু এসেছিলেন। খবরটা নেওয়া দরকার।

দেবিকা মুখ বাঁকিয়ে বল্‌ল—তাঁর খবর পেতে হ'লে ভাই রাত দশটা কি বারোটা বাজবে তার ঠিক নেই। দুদিন বাদে ধর্মঘট। সামনে যেতেই ভয় করে।

দীপু বল্‌ল—তাহলে? আমাকে তুমি এগিয়ে দিতে আসবে দেবি?

মিণ্টু চায়ের জল চড়াতে রান্নাঘরে ঢুকেছিল। বল্‌ল—তবে দেবি একটু বসেই যা চা খাওয়া হ'লে জামাইবাবুর সঙ্গেই যাস্।

ক'দিন ধরেই মানিকপুরের হাওয়াতে বিসর্জনের বিষণ্ণতা! পুরণো আমলের কুলী মহল্লা, নতুন প্ল্যাণ্টের মিস্ত্রী কোয়ার্টার সর্বত্রই বিদায়ের পালা চলেছে। পুরণো 'কে' টাইপ কোয়ার্টার্সের সারিগুলো দিনে-দুপুরে মনে হয় যেন প্রেতলোক। পথ প্রায় জনশূন্য। বন্ধ দরজার সামনে পা ছড়িয়ে কুকুরেরা আরাম করছে। ডিউটিতে যারা গেছে তাদের সদর (বা খিড়কী, মোট

একটিই ত দরজা) দরজায় তালা ঝুলছে! আর যাদের ডিউটি নেই তারা হয় ঘুমোচ্ছে, নতুবা ধর্মঘটের প্রস্তুতিতে এখানে-ওখানে বেরিয়ে পড়েছে। এখনও দু-চার ঘরের মেয়েদের যাওয়া হয়ে ওঠে নি। ধর্মঘট শুরু হ'লে তাদের পুরুষেরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। আর তার পরও যে কোয়ার্টারে মেয়েরা থাকবে, বুঝতে হবে তাদের কোনো চুলো নেই যাবার।

অবশ্য বাবু কোয়ার্টারের ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটে না। সেখানকার জীবনযাত্রায় বিশেষ কোনো বৈলক্ষণ্য নেই।

সেদিন সকাল সাড়ে নটার সময়ে সন্দর্শন টকীজের প্রচার বিভাগ ব্যাণ্ড ব্যাগ্‌পাইপ বাজনদারদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে হাল্লাক হয়ে গেলেন, কিন্তু হ্যাণ্ডবিল নেবার খরিদ্দার একটিও পেলেন না! কোনো বস্তী থেকে উলঙ্গ বা অর্দ্ধনগ্ন ছেলে মেয়ে একটিও বেরুলো না বাজ্‌না শুনে। ব্যাজার মুখে এক সময়ে ব্যাগপাইপ-ওয়ালা বাঁশী থামিয়ে বল্‌লে—ফুঁক্ পেড়ে পেড়ে কলিজা কাবাব বনে গেলেও কোই হারামিকা-পয়দা আজ নিকাল্‌বে না।

হ্যাণ্ডবিল বইছিল যে ছোক্‌রা সে মল্লিক সাহেবের পূর্বপুরুষকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌ল—এত বড় বদ্‌মাস বেঈমান আর হয় না। দেখ বে শালা সিন্‌মার কাগাজ ফিরিয়ে লিয়ে গেলে, মান্‌জার শালা এ্যায়সা লাথ ঝাড়বে, তাও যদি শালা পৈসা দিত ত দশবিশটা লাথ হজম ক'রে দিতাম! ফোকটে শালা মেজাজ ফলিয়ে লিবে।

ওরা রসুলকে ব্যাণ্ডমাস্টার বলে। মাথায় শৌখীন পাগড়ী চড়িয়ে, গোঁফটা ছুঁচের মতন সটান সোজা ক'রে ব্যাণ্ড পেটে রসুল। তার প্রপিতামহের সঙ্গে কোথাকার নবাবের মেয়ের (না, ঠিক আইনসঙ্গত কন্যা নয়) বিয়ে হয়েছিল। তাই রসুলের মেজাজ খানদানের খুশ্‌বুতে এখনও সরগরম। ব্যাণ্ডের কাঠি বাতাসে এক দফা নাচিয়ে সে বল্‌ল—তুই যে নওকর! নওকর-নফরের ভারি কষ্ট! আমি ত বলেছি, ওই লফন্‌দারি ছেড়ে আয় বাজনার আর্‌ট্‌খানা শিখে লে। আরে বাবা আজাদীর মতো কিছু নাই আছে।

চোখ দুটো গোল হয়ে গেল ছোক্‌রার। ব্যাণ্ডটা দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বল্‌ল—আরে বাস্। ওজনদার মাল সামলাবার ভয়ে,

অমন মজাদার বিয়েই করলুম না। আর তুই বেওকুফ্ মড়া চামড়ার ব্যাণ্ড বওয়াতে চাস্! যাঃ শালা—

তারপর চোখ কুঁচ্কে রস্থলের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্ল—বুঝলি, শালা, মল্লিকের এখন *টিকৃটিকির* চাহিদা খুব! তা কম্-সে-কম ত দো-ঢাই রূপেয়া রোজ মিলবে! মাইরী এই দিগ্দারী করে ফায়দাটা কী বল্! মান্জার শালা চার আনা দিতে বাই জম্মে ছাড়বে! উদিকে নেসাফেসা ত কম্নে গুটিয়ে ইয়ে।

রস্থলের দু-চোখে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। সে চোখ পাকিয়ে মাটিতে থুথু ফেলে হিসহিস্ শব্দ করে বল্ল—বেঈমান! পট্লা তু শালা জান্বর আছিস!

রস্থলের সঙ্গে জিলানীর খুব দোস্তী। যদি চ খুব ঘন ঘন ওদের দেখাসাক্ষাৎ হয় না, তবু বন্ধুত্বের বনিয়াদটা বেশ পাকা। ধর্মঘটের সমর্থনে রস্থল ইউনিয়নের স্ট্রাইক ফাণ্ডে যৎসামান্য চাঁদাও দিয়েছে।

পট্লা ঠোঁট বাঁকিয়ে বল্ল—বোল্নেবালা ত বহুৎ মিলে! লেকিন বিষয়টা সিরিয়াস ক'রে শোচো দোস্ত! কম্প্নীর কল থেকে রস না এলে তোমার ব্যাণ্ডের আওয়াজ ভি বন্দ হয়ে যাবে। সিন্মার গ্যাঁড়াকল ত সাত দিনে ঠাণ্ডা মেরে যাবে। তখন শালা ইমানের ইয়ে ধুয়ে জল খাবো। শালা হামাকে ত লফন্দার বল্লিস্, তোর শয়তান-কা-খোপ্ড়ী—আজ ইম্লী, কাল বিমলী এই ত চালিয়ে দিয়েচিস্! আর শাদীর জরুটা ঘরের গরু হয়েই মলো। ইমান্দার—হুঁঃ।

রস্থল গর্জন করে—খ—বরদার! হামার জরুর লিয়ে বল্নেবালা তু কৌন্ আছিস। শালা কাফের কুত্তা, চুপ্ যা।

পট্লা ভেংচী কেটে ন্যাকার মতো বল্ল—সত্যি দাদা, গোস্তাকী হয়েছে, মাফ করো। তোমার হচ্ছে সেই ইয়ে বাদ্শাহী খুন! ওসব থাক ভাই, নোক্রীর ব্যাণ্ড বাজাতে চলো। আপনা কাম করো।

বেশ চল্ছিল গল্প। হয়তো পট্লা চটে না গেলে অশথ তলাতে মৌজ ক'রে বিড়ি টেনেই বাড়ি ফেরা যেতো। যেহেতু সে চটেছে সেহেতু ব্যাণ্ড

ওয়ালা আর ব্যাগপাইপ বাদকদের কাজ করবার হুকুম দিল—হাঁ, সিনেমা কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে পট্‌লার এ এক্তিয়ার রয়েছে বইকি। এখন ও বদ্‌মাসটা তামাম মানিকপুরে চক্কর দিইয়ে ছাড়বে। ওর আর তক্‌লিফ কি আছে, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ইতিউতি চোখ ঠারবে। আর রসুলকে কলিজার সব হাওয়াটুকু ফুঁকে দিতে হবে ব্যাণ্ড পিটে পিটে।

রসুল রেগে টং। কিন্তু মুখে কিছু বল্‌বার বান্দা সে নয়। বিশেষ করে পট্‌লাটা ওর স্বভাবচরিত্রের ওপর যখন কটাক্ষ করেছে তখন ও শয়তানের বাচ্চার সঙ্গে রসুলের দিলচস্‌পী বিগড়ে গেল, চিরটাকালের মতো শত্রু হয়ে গেল পট্‌লা। রসুল ইয়ারবক্সীর সঙ্গে একটু ফুর্তিউর্তি করতে রাজী আছে, 'লেকিন্' নিজের ঘরের ব্যাপারটা ষোল আনা তার খাশ হুদ্দো, সেখানে কেউ নাক গলাতে চাইলে রসুল হাড়েহাড়ে চটে যায়।

যাচ্ছিল ওরা ধোবী মহল্লার পাশ দিয়ে। 'কে' টাইপ কোয়ার্টারগুলোর দরজা সব বন্ধ। পট্‌লা আড়চোখে একটা দরজার দিকে তাকিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো। একটা পাল্লা আধখানা খুলে গেছে, সেই ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে কালো একখানা মুখ, দু চোখে হাসি উপছে পড়ছে। মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে, সিঁথির সিঁদুর জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। বৌটির বয়সও বেশী নয়।

পটলা চট্‌ ক'রে নেমে এগিয়ে গেল। একখানা হ্যাণ্ডবিল এগিয়ে দিয়ে বল্‌ল—আসবো দুপুরে?

মেয়েটি ঠোঁট বাঁকিয়ে বল্‌ল—ইস্‌ বড্ড যে সাহস বেড়েছে!

পট্‌লা মিনতির সুরে টেনে টেনে বল্‌ল—মাইরী, কতো দিন আর দেখাই হবে না। তুমি ত চল্‌লে!

চোখ ঘুরিয়ে মেয়েটি বল্‌ল—আহা সেই ভাবনাতে যেন ঘুমই হবে না তোমার!

—যাবে আজ রাতের শোতে? বহুৎ মজাদার খেল্‌—!

—দুপুরে বল্‌ব। কিন্তু ও যদি জানতে পারে, তাহলে আর আস্ত রাখবে না। আজকাল সন্দ করছে তোমাকে।

পট্‌লা তার ঝাঁকড়া চুলগুলো ঝাঁকি দিয়ে বেপরোয়া ভাবে জবাব দিল—

বয়ে গেল। তুমি যদি প্রাণ আমার থাকো, তবে কোন্ শালার তোয়াক্কা! শালা শেয়ালের অতো দেমাক কিসের, ও শালাও তো ভাগিয়ে এনেছে। ভাগানো মাল, ভাগ করে খাচ্ছি, বেশ করছি!

মেয়েটি খিল্-খিল্ করে হেসে উঠ্ল—সেইজন্যেই ত এত টান, এতো ভয়! আর কেউ যদি কেড়ে নেয় আবার! জানো তো কেনা জিনিসের চেয়ে চোরাই মালের ওপর দম বেশি পড়ে।

পট্‌লাও হাসলো। আসলে হেসেই ব্যাপারটা হাল্কা করে দিতে চাইছে পট্‌লা। এই কালো ডাগর বাউড়ি মেয়েটার সঙ্গে পট্‌লার আশ্‌নাই খুব অল্প দিনের। সিনেমার 'পাস' দেওয়ার ব্যাপারেই ঘনিষ্ঠতাটা যথেষ্ট গাঢ় হয়ে উঠেছে। মেয়েটার এই কালো চেহারার মধ্যে কী যেন একটা জাদুকরী আকর্ষণী শক্তি আছে। সেই টানেই পট্‌লা ভিড়েছে। কিন্তু তার বেশী কিছুর মধ্যে সে নিজেকে জড়াতে নারাজ। মেয়েটার স্বভাবই এই রকমের। যদুপতির সঙ্গে ও পালিয়ে এসেছে, পলাশপুর কোলিয়ারী থেকে। এখন আবার পট্‌লাকে সেইরকম মতলব দিচ্ছে। আজই নয়, এর আগেও এ ধরণের কথা বলেছে ও। কিন্তু পট্‌লা ঝানু ছেলে, ঝামেলার মধ্যে সে নেই। গায়ে আঁচড় না লাগিয়ে যেটুকু মজা লুটে নেওয়া যায় সেটুকুই সে চায়।

মেয়েটি দরজা বন্ধ করবার ভাণ করল, পটলাও পথে উঠে এল। রসুল ব্যাণ্ড পেটানো বন্ধ করে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। মালিকের মেজাজে পটলা বলে—বাজাও হে!

একটা বাচ্চা মেয়ে এসে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছে, চারচাকার ঠেলাগাড়িতে আঁটা পোষ্টারের ছবি! ছবিতে একটি মেয়ে আর একটি পুরুষ পরস্পরের দিকে কামনার্ত চোখে তাকিয়ে রয়েছে। সিনেমার মার্কামারা পেটেণ্ট ছবি।

ব্যাগ্‌পাইপবালা পট্‌লাকে ঠোক্কর দিয়ে বল্‌ল—চিড়িয়া কা বোলিস আবে! সোনেকা জিঞ্জিরসে তেরা বাগিচামে আনে মাংতী ক্যা!

পটলা সে কথার জবাব দিল না! গলা চড়িয়ে টিনের চোঙায় মুখ লাগিয়ে হাঁক দিল—সন্দর্শন টকী মে-এ!

কারখানা চিম্‌নীতে ধোঁয়ার সমারোহ, অগ্নিশিখা উঠ্‌ছে আকাশের দিকে লক্‌লকে জিভ বার ক'রে। ডিউটির হাজিরা আজও বজায় আছে। দিনমান কাটলো। বাইরে গোলমালের কোনো লক্ষণ নেই। সন্ধ্যের পর অন্যদিনের মতো আজকের আকাশেও চাঁদ উঠলো। না, সব ঠিক-ঠিকই চল্‌ছে। উজ্জ্বল আলোর রোশন, কাবুলী কাফিখানায় হল্লার হুল্লোড়—কিছুই কমতি নেই। ভারতীয় এবং ইউরোপীয় ইন্‌ষ্টিটিট্যুটেও লোক জমেছে যথারীতি আনন্দোল্লাসের আশায়।

আসলে সবটুকু কিন্তু ঠিক চল্‌ছে না। রামঅওতার শুনলো, ইউনিয়নের সেক্রেটারী গোবর্ধন ঠাকুর হঠাৎ জরুরী কাজে আজই আদ্রাতে যেতে বাধ্য হয়েছে—অবশ্য কালকেই ফিরবে সে। অভিজিৎ সিং, রামজীবন, হরবন্‌স ইত্যাদি যারা এতদিন মাতব্বরী করছিল ইউনিয়নে, তারা সবাই এক-এক কাজের অছিলায় মানিকপুর থেকে এক-আধ দিনের জন্য চলে গেছে। আজ রাতের মধ্যে চরম উদ্যোগ আয়োজন শেষ করতেই হবে। বিশ্বকর্মার মতো নিশ্ছিদ্র করে ধর্মঘটের বাসর বানাতে হবে। কাল থেকে শুরু ধর্মঘট। প্রত্যেক গেটে পাহারা মোতায়েন রাখা, স্টেশনে, টাউনে ঢোকবার মুখে মুখে লোক হাজির রাখা, খবরাখবর দেওয়া নেওয়ার জন্য সাইকেলবাহিনী তৈরী করা, তাদের প্রত্যেকের ডিউটি ভাগ করে সময় বেঁধে দেওয়া—হরেক রকমের কাজের বিলিবন্দোবস্ত। কাজের কি শেষ আছে! এই সময়ে যদি নেতৃস্থানীয় লোকেরা ব্যক্তিগত জরুরী কাজের দোহাই দিয়ে দূরে সরে থাকে তাহলে শৃঙ্খলা রাখা কি সম্ভব? এভাবে প্রতিরোধের কাজ নিশ্ছিদ্র হবে কি?

রামঅওতারের পাশে আছে দেবজ্যোতি, রামকিষণ তেওয়ারী, জিলানী! ব্যস। আর বাদবাকী যারা রয়েছে তারা হুকুম তামিল করনেবালা। নিজের মাথা খাটিয়ে বিবেচনা বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজের তাল সামলাবার ক্ষমতা ওদের কারুর নেই। তাছাড়া সকলের ওপরও যে-সে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া চলে না! হাজার হাজার জীবনের, রুটীর সওয়াল—জানের জিম্মাদারী ত হেলাফেলার ব্যাপার নয়!

রামঅওতার একটু মুষড়ে পড়েছিল। তার মনে আশঙ্কা জেগেছে।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—ঘাবড়ালে চলবে না বুড়ুয়া! শির সিধা রাখো।

—হাঁ গুরু, শির ঠিক আছে। লাঠি পড়ে ত চূরমার হবে, কভি হেলবে না। লেকিন, শিরমে এত্‌না দরদ, ক্যা কহুঁ!

জিলানী হি-হি করে হেসে বল্‌ল—যাও না, বুঢ়িয়া আচ্ছা সে তোয়াজ করে দেবে!

রামঅওতার রেগে গেল—যাঃ, সব সময় দিল্লগী ভালো না লাগে।

তেওয়ারী গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, সে সহজে হাসে না। স্বাভাবিক গাম্ভীর্য বজায় রেখে সে বলল—সুবে ছ বাজে, মেন গেট পর হাজিরা। খেয়াল রাখ্‌খো ভাই—!

রামঅওতার সায় দিল—ঠিক। সেইখানে সব মিলবে। তখনই মতলব ঠিক করা যাবে। খবর ভেজো সব কোই কো।

জিলানী ঘাড় কাৎ করে জবাব দেয়—জরুর! খবর তো দেওয়াই আছে।

বাইরে একটি ছায়ামূর্ত্তি অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, গাছের নীচে। জানলা দিয়ে রামঅওতার তাকে দেখতে পেয়ে ইশারা করল। জিলানী কথা থামিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে রামঅওতারের দিকে তাকালো!

রামঅওতার বাইরে বেরিয়ে গেল।

লোকটা কে?

জিলানীও নেতাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে। প্রৌঢ় রামঅওতার সিং ভয়ডরের বালাই রাখে না। অথচ এই অবস্থায় কোম্পানীর গুণ্ডার চোরাগোপ্তা আক্রমণের আশঙ্কা খুব বেশী। এ নিয়ে রামঅওতারের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই, সে বলে যে, কপালে যদি মৃত্যু লেখা থাকে ত কেউ রুখতে পারবে না। সে ত আর অন্যায় কিছু করছে না, তাহলে জানের ভয়টাই বা কিসের! কোম্পানীর গুণ্ডারা যে ঈশ্বরের ধর্ম বজায় রাখার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হয় নি, তাদের ঈমানের, নিমকহালালশীর হিসেব অন্য ভাবে কষা হয় এ ত সবাই জানে। জিলানীরা বৃথা তর্ক করা ছেড়ে দিয়েছে। রামঅওতারের আপত্তিকে অগ্রাহ্য ক'রেই জিলানীর মতো কয়েকজন অনুগত কর্মী তাদের নেতার আশপাশে ছায়ার মত ঘোরাফেরা করে।

গাছতলায় ছায়ামূর্তিটি সন্দেহজনক ভাবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। রামঅওতার তার কাছে গিয়ে কোনরকম সোরগোল তুলল না।

জিলানীও একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রইল। প্রয়োজন হলে লাফিয়ে পড়বে আততায়ীর ঘাড়ে।

মিনিট দুয়ের মধ্যেই লোকটা চলে গেল। রামঅওতার ঘরে ফিরতেই রামকিষণ তেওয়ারী প্রশ্ন করল—কে?

রামঅওতার বল্‌ল—দোস্ত!

দোস্ত বল্‌লে আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

রামঅওতার বল্‌ল—আর দেখো জিলানী! সব কোই কো কহ্‌ দে না, কি হাজিরা ছ বাজে নেহি—জরুর সুবে চার বাজে! হ্যাঁ ভাই, চার বাজে উঁহা পাক্কা পৌছানে পড়ে গা।

কাজের কথা চুকিয়ে সবাই চলে গেল। দেবজ্যোতিও চলে যাচ্ছিল, রামঅওতার তাকে থাকতে বল্‌ল। একটা বিড়ি ধরিয়ে রামঅওতার রেখাঙ্কিত কপালটা আরও কুঞ্চিত করে বল্‌ল—গুরু, স্ট্রাইক হবে না।

দেবজ্যোতি চম্‌কে উঠ্‌ল—তার মানে?

—কোম্পানী লক্‌ আউট করবে। দোস্ত সেই খবরই দিতে এসেছিল।

খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে দেবজ্যোতি বল্‌ল—তাই বলো। তোমার সেই ডিটেক্‌টিভ দোস্ত বুঝি!

—হ্যাঁ। বল্‌ল কি: লকআউট হবে, সব ঠিকঠাক। আরে সকালেই সে খবর তোমরা পাবে, আমি না হয় একটু আগেই জানিয়ে দিলাম। এতে ক্ষতি ত করা হল না কারুর—যদি তোমাদের কিছু কাজের সুবিধে হয় তো হোক' এই বল্‌ল।

গালে হাত দিয়ে দেবজ্যোতি কি যেন ভাবতে শুরু করে।

রামঅওতার দেবজ্যোতির দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে।

একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে দেবজ্যোতি আরও সংক্ষিপ্ত ভাবে বলে—হুঁ!

রামঅওতার প্রশ্ন করে—ইসমে ক্যা মতলব! গুরু স্ট্রাইক ত হতোই, খামোকা লক্‌ আউট কেন করছে ওরা! পাওয়ার দেখাতে চায়?

—তা ত বটেই। আর কি করতে পারে, তা ওরাই জানে।

—যা হবার হোক। আমাদের তৈয়ার হয়ে থাকতে হবে।

ব'লে রামঅওতার দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল—আচ্ছা এবার তুমি যাও, একটু জিরিয়ে নাও রাতটুকু। নাকি এখন আবার দীনদয়াল বাবুর কোয়ার্টারে যেতে হবে।

ম্লান হাসি হেসে দেবজ্যোতি তাকালো, অর্থাৎ তা যেতে হবে বৈকি।

রামঅওতার বল্‌ল—গুরু গুড় ত চেলা চিনি! হ্যাঁ সান্যালবাবু একঠো চেলা বানিয়ে ছিলেন বটে! আরে বাস্‌, বুড়ো স্ট্রাইকের মুখে ডিউটি জয়েন করল—কি না, স্ট্রাইকার হবে।

দুহাত তুলে নমস্কার করল রামঅওতার দীনদয়ালের উদ্দেশে।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—এবার আর রক্ষে নেই। বুড়োর চাকরী কেউ রাখতে পারবে না।

—তা তুমি বারণ করলে না কেন?

—আমি বারণ করলে বুড়ো খুব কষ্ট পেতেন। অসুখে ভুগে ভুগে একেবারে ছেলেমানুষের মতো হয়ে গিয়েছেন। আর কী জান সিংজী, আমার মনে হয় এবারের যুদ্ধে আমরা জিতবোই। এই জেতার আনন্দ থেকে ওঁকে দূরে সরিয়ে দিলে বুড়োর জীবনভোর আফসোস থাকতো। তাই আর বারণ করি নি কতদিনই বা আর চাকরী করতেন!

আনন্দে উত্তেজনায় রামঅওতারের দু-চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জয়লাভের কথা শুনে সে আবেগভরে দেবজ্যোতির ডান হাতখানা জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠ্‌ল—তুমি বল্‌ছ আমরা জিতবো? তাহলে জিতবোই। হ্যাঁ জিতবোই ত! আর জিতলেই সান্যাল বাবুকে আমাদের মাথায় তুলে রাখবে —ও দেবতা আছে ভাই। ওঁর চাকরী যেতে দেবো না! মজদুরী জমান কায়েম হ'লে সান্যালবাবু জরুর থাকবেন আপ্‌না ঠাট্‌সে।

আস্তে আস্তে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে দেবজ্যোতি বল্‌ল—এবার চলি অনেক রাত হয়েছে।

সাতাত্তর

একশো এগারো দিনের ধর্মঘটে অনেক বিচিত্র ঘটনা জমে উঠেছে, অসংখ্য সাধারণ ঘটনার ছড়াছড়ি হয়েছে। বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এত লম্বা প্রতিরোধ আর কখনও হয় নি।

যে শহরের বুকে এতবড় ঐতিহাসিক সংগ্রাম চলেছে, আশ্চর্য সে শহরে শৃঙ্খলার বিচ্যুতি বড় একটা দেখা দিচ্ছে না। কলকাতা থেকে আমদানী করা সাম্প্রদায়িক-বিষ-বিস্তারী গুণ্ডার দল ব্যর্থ হ'ল। বাংলার অনেক শহর যখন ছে'চল্লিশের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার তাণ্ডবে উন্মত্ত মানিকপুর তখন বিস্ময়কর স্থৈর্যে সংহত! ইউনিয়নের শীর্ষদেশে এক মুসলমানকে বসিয়ে রাখার জন্য হিন্দুমহাসভার দু-একজন পাণ্ডা গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে গালিগালাজ করলেন—তাতেও কোনো ফল হ'ল না। আবার তার দু-দিন পরে মুসলীম লীগের ধ্বজাধারী কয়েকজন জাঁহাবাজ নেতা এসে নগরের উপকণ্ঠে গলাবাজী ক'রে বল্‌লেন—বারী সাহেব কংগ্রেসের তাঁবেদার, হিন্দুদের কংগ্রেস এই ভাবে মুশ্‌লীম ভাইদের ঠকাবার জন্যে কৌশলের পথ ধরেছে। অতএব এ চক্রান্তকে ভেঙে দিয়ে মুশ্‌লীম ভাইরা আপনা-আপনা কাজে লাগুক।······তবু মানিকপুরের শ্রমিক সমাজ অটল। দু-একজনকে চোরাগোপ্তা খুনজখমের চেষ্টা হ'ল, কিন্তু ধরা পড়ে নির্যাতিতই হ'ল।

ধর্মঘটের প্রথম থেকেই এবারে শ্রমিকেরা সতর্ক হয়ে পা ফেল্‌তে শুরু করেছে।

রাত চারটেতে কারখানার গেটের সামনে ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা তালা ঝুলতে দেখে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি। সকাল সাতটায় যখন গেটের মুখে হাজির হয়ে ভেতর থেকে স্বয়ং রবিনসন সাহেব এবং দোর্দণ্ড প্রতাপ মল্লিক সাহেব পাওয়ার হাউস আর কোক্‌ওভেনের লোকেদের কারখানায় ঢুকতে আদেশ করেন তখন কেউ সেকথা কানে তোলে নি। বাধ্য হয়ে মল্লিক

কম লোক নেই, ওরা যদি কাজে জয়েন করে তাহলে কারখানাতে প্রডাক্‌শন চলতে থাকবে। তাছাড়া ফার্ষ্ট স্টাফই নয় আমাদের ইউনিয়নের আওতায় পড়ে না। তা বলে সেকেণ্ড স্টাফকে হাত ছাড়া করা ঠিক নয়। ওরা ত চাঁদা দেয়।

গোবর্ধন ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তর্কের সুরে বল্‌ল—আরে চাঁদা ত অনেক ফার্স্ট স্টাফও দেয়, সিম্প্যাথি থাকলেই চাঁদা দেবে! তাই বলে আজ যদি মল্লিক সাহেব চাঁদা দেয়, আপনি তাকে ইউনিয়নের মেম্বার মেনে নেবেন? স্টাফ হচ্ছে স্টাফ। তার সঙ্গে লেবারের কোনো সম্পর্ক নাই। ওদের আটকানোর কি দরকার মশাই। আজ জোর ক'রে রুখবেন, কাল ওরা আপনার ইউনিয়নকে আন্‌টুসান্‌ট বলে ওয়ার্কশপে যদি ঢুকে পড়ে তখন ত আটকাতে পারবেন না। মাঝখান থেকে খামোকা বেইজ্জতী। তখন লেবারের মনে ধোঁকা লাগবে—ওরা ভাববে বুঝি বা ইউনিয়নের জোর কমে গিয়েছে। তার চেয়ে সেকেণ্ড স্টাফকে গোড়া থেকে ছেড়ে দিলে পাকা কাজ হবে।

রামঅওতার মাথা নেড়ে জবাব দিল—আমি তা মনে করতে পারি না ঠাকুর বাবু। যখন সেকেণ্ড স্টাফ আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তখন তারা আপন হয়েই গেছে। ওদের কেটে বাদ দিলে খারাপই হবে।

গম্ভীর ভাবে গোবর্ধন হাত উল্টে বল্‌ল—আপনি কি বুঝছেন জানি না, আমি মনে করি সেকেণ্ড স্টাফকে ছেড়ে দেওয়াই উচিত। ওরা বাবুভাই, বাবুভাইদের সঙ্গে লেবারের কোনো 'সাথ' নাই। জরুর ওদের বাতিল করা দরকার।

দৃঢ়ভাবে রামঅওতার গলা চড়িয়ে দিল—কখ্‌খনো না। আপনি ভুল বল্‌ছেন।

গোবর্ধনও সেক্রেটারীজনোচিত ভঙ্গীতে বলে—ভুল আপনার হচ্ছে। কাউকে পরামর্শ না করেই এরকম মতলব নেওয়া ঠিক হয় নাই।

—দেখুন ঠাকুরবাবু, পরামর্শ করবার মতো অবস্থা থাকলে অবশ্যই করতাম। কিন্তু কাকে করব পরামর্শ? আপনারা সবাই বিল্‌কুল গরহাজির!

—অপেক্ষা করা উচিত ছিল আপনার!

—আপনাদেরও হাজির থাকা উচিত ছিল।

কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি করবার পর রামঅওতার হতাশ হয়ে বল্‌ল—আচ্ছা সেক্রেটারী সাহেব আমার কাজ আমি করেছি—এবার আপনাদের দায়িত্ব আপনারা সামলান।

—আপনি কিন্তু ভুল করছেন ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট !

দেবজ্যোতি, রামকিষণ তেওয়ারী, অভিজিংসিং সবাই আশপাশে রয়েছে। এতক্ষণ তারা তর্কে অংশ গ্রহণ করে নি। কিন্তু আর চুপ করে থাকতে পারল না।

রামকিষণ বল্‌ল—আচ্ছা বেশ তো, প্রেসিডেণ্ট আজ এলে পরে এ ব্যাপারে কথা হবে। এখন আপনারা ওটা বাদ দিয়ে অন্য কাজ করুন না।

গোবর্ধন ঠাকুর বাধা দিয়ে বল্‌ল—তারই বা দরকার কী। প্রেসিডেণ্টকে এসব ছোটখাটো ঝামেলাতে টানার কোনো মানে হয় না। অযথা স্টাফকে আমার মতে লেবারের মধ্যে না টানাই বুদ্ধিমানের কাজ। ওরা আর কী করবে ভেতরে ঢুকে ? যাক না—! লেবার না এ্যাটেণ্ড করলে প্রোডাক্‌শন হওয়া অতই সোজা !

দেবজ্যোতি কতকটা নির্লিপ্তভাবে বল্‌ল—সেকেণ্ড স্টাফ ত ভেতরে যেতে চাচ্ছে না। জোর করে ওদের পাঠানোর জন্যে মাথা ব্যথাই বা কেন ?

গোবর্ধন অপ্রসন্ন ভঙ্গীতে ঠেস দিয়ে বলে—আপনি কি সেকেণ্ড স্টাফের লোক ?

দেবজ্যোতি হাসলো—না।

—তবে কি ক'রে জানলেন যে তারা ভেতরে যেতে চায়না ! আমি অন্ততঃ জন দশ-বারো ফোরম্যানকে বল্‌তে শুনেছি, ইউনিয়নের লোকেরা তাদের গেটে রুখে দিয়েছে—তারা যেতে চায়। তাই বল্‌ছিলাম, যে পলিসি হিসেবে ওদের বাদ দিয়েই আমাদের চলা উচিত।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—তাহলে কাল যদি জন বারো চৌদ্দ লেবার ভেতরে যেতে চায়, আপনি কি লেবারকেও বাদ দিয়ে ইউনিয়ন চালাবেন তখন ?

রাগে গোবর্ধনের মুখখানা রক্তিম হয়ে ওঠে, সে বলে—বাজে তর্ক করার

সময় এটা নয়। কথা হচ্ছে সেক্রেটারীর সঙ্গে ভাইস্ প্রেসিডেণ্টের, এর মধ্যে আপনি কেন নাক গলাতে আসেন মশাই ?

দেবজ্যোতি সরে দাঁড়ালো। রামঅওতারও বল্ল—আমরা সব 'আন্‌পড়' বুদ্ধু লেবার আছি! আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। আভি এ্যায়সাই চল্‌নে দি জিয়ে সেক্রেটারী জী! প্রেসিডেণ্ট এলেই এর মীমাংসা হবে।

রামঅওতার কিছুক্ষণের মধ্যে বিদায় নিয়ে নিজের কোয়ার্টারে চলে গেল। তার মুখখানা মেঘে ঢাকা শ্রাবণের আকাশের মতো আঁধার! গোবর্ধন ঠাকুর অন্যান্য সহকারীদের নিয়ে ব্যস্ত ভাবে কাজের খবরদারী করছিল, রামঅওতারের চলে যাওয়াটা সে যেন দেখতেই পেল না।

রামঅওতার সেই যে কোয়ার্টারে গিয়ে ঢুকেছে তারপর আর সে বেরোয় নি। যত বার তাকে ডাকতে পাঠানো হয়েছে, সে আসে নি।

কী এক অবোধ যন্ত্রণায় সে শিশুর মতো ফুলে-ফুলে কেঁদেছে। হ্যাঁ, এই বুড়ো বয়সে তাকে যেন কান্নার পাগলামী পেয়ে বসেছে। একা-একা খাটিয়ার ওপর বসে সে অনেক কথাই ভেবেছে। একটিমাত্র দিন নয়, শুধু এই ইউনিয়নের সংগঠনের কথাটুকুই নয়, তার চিন্তার ব্যাপ্তি আরও অনেক দূরে প্রসারিত! গোটা জীবনের যতো ঘটনা, সব তাকে ঘিরে ধরেছে। সেই তরুণ যুবক যে প্রথম মহাযুদ্ধে সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেই রামঅওতার, তারপর বেকার ছন্নছাড়া হ'য়ে কলকাতা শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতো যে রামঅওতার, তারও পরে ডিব্বা তৈরীর বিলেতী কারখানাতে দৈনিক বারো আনা মজুরীতে চাকরী করত যে রামঅওতার, তারও পরে গ্রেট বেঙ্গল স্টীল ম্যানুফ্যাক্‌চারারস্-এ পেণ্টার হিসেবে এক টাকা এক-আনা রোজে যে রামঅওতার চাকরী নিয়েছে সেই রামঅওতার—এরা সবাই আজ একসঙ্গে এসে জুটেছে। তারা সবাই যেন বল্‌ছে রামঅওতারের নেতা হওয়ার কোনো যোগ্যতা নেই! সত্যিই ত যেখানে হাজার হাজার মানুষের ভাগ্য এক সূক্ষ্ম অদৃশ্য সূতোর ওপর ঝুল্‌ছে সেখানে একটি মাত্র ভুলের দরুন কি বিরাট বিপর্যয় হয়ে যাবে! সে বিপর্যয় কী রামঅওতার সাধন করেছে? পরাভূত ব্যক্তিত্বের অতি দীন নৈরাশ্য তাকে কোন্ অতলে ছুড়ে ফেলে দিতে উদ্যত হয়েছে!···

প্রৌঢ় রামঅওতার ছেলেমানুষের মতো আকুল আবেগে কান্নায় ডুকরে ওঠে।

এক সময়ে তার পাশে এসে যমুনা বসল, নিঃশব্দে মাথায় পিঠে কতোবার হাত বুলিয়ে দিল—কিন্তু মুখে কোনো সান্ত্বনার কথা আনলো না যমুনা। ওর যেন মনে হয় এমনি করে খানিকটা কাঁদলে রামঅওতারের মন অনেকটা হাল্কা হয়ে যাবে। যমুনার নিজের ত আগে আগে এই রকমটাই হ্ত। যখন বুড়ো বাবা আর ছোট ভাই-এর জন্যে মনটা আকুলিবিকুলি করত তখন রামঅওতারের দৃষ্টির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতো যমুনা, আর যত পারত কেঁদে নিত! আশ্চর্য, রামঅওতারকে যমুনা কখনো কাঁদতে ভাখে নি। ওদের সতের বছরের যৌথ জীবনে যমুনা এ-ই প্রথম দেখ্‌ছে 'মিস্তিরি'র চোখে জল। আহা, কতো কাল পরে ভগবান যেন মেঘের বুকে জলের আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন—যমুনার মন খুশিতে ভরে ওঠে। এই দিনটির আশাতেই যেন ও এতকাল বসে ছিল—রামঅওতারের দুঃখের লগ্নে ও থাকবে জীবন্ত সান্ত্বনার মতো।

দুপুর থেকে সন্ধ্যে যেন একটা অখণ্ড বন্যার বেগ। রামঅওতার নিজেকে চিরে চিরে দেখেছে আর বুঝেছে যে তাকে দিয়ে নেতৃত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতে পারে না। সামান্য একজন লেখাপড়া না জানা 'আন্‌পর্ঢ় আদ্‌মী' সে!—সেই স্তরের এক শ্রমিক বৃদ্ধ বয়সে যার মূল্য দৈনিক দুটাকা চৌদ্দ আনা!

সন্ধ্যের সময় জিলানীর সাইকেল এসে থামলো রামঅওতারের একান্তবর্তী এক-কামরার কোয়ার্টারের সামনে—হ্যাঁ এও কুলীবস্তীরই অন্তর্গত।

—বুঢ়াউ! এ বুঢ়াউ!

—কে?

—বারি সাহেব আভি বুঢ়াউসে মিল্‌নে চাহেতে হৈ। চলিয়ে।

সাড়া দিয়েছে যমুনা। রামঅওতার এখনও খাটিয়ার ওপর বসে রয়েছে। যমুনা দরজা খুলে দিল। জিলানী ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকে পড়ল। সে যেন মূর্তিমান গতিবেগ। ঘরের মধ্যে প্রদীপ জল্‌ছে। দীপবর্তিকার সম্মুখে মাটির

ছোট্ট একটি লক্ষ্মীর মূর্তি—আশপাশে কালীর পট, হনুমানের ছবি ক্যালেণ্ডার থেকে কেটে নিয়ে বাঁধানো, আরও দেবদেবীর ছবিতে দেয়ালের একটা পাশ ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

জিলানী জড়িয়ে ধরল রামঅওতারকে—ক্যা আপ রোতে হেঁ বুঢ়াউ! ইয়ে ক্যা বাত!

রামঅওতার মাথা নাড়লো—হাঁ ভাই, তুমি চলে যাও!

এক নজর যমুনার দিকে দেখে জিলানী বল্‌ল—বুড়িয়া মাঈজী! তুমি আমাদের বুঢ়াউকে জিন্দা ক'রে দাও। এ কী কাণ্ড, এই সময়ে কান্নাকাটি? আর ওদিকে বারি সাহেব রামঅওতার-রামঅওতার ব'লে কতো বার ফুকারছে! চলো-চলো।

খাটিয়া থেকে কোল-পাঁজা ক'রে রামঅওতারকে মাটিতে নামিয়ে সোজা দাঁড় করিয়ে দিয়ে জিলানী বল্‌ল—নাও টুপী পরো, চলো।

যমুনা আঁচলে রামঅওতারের চোখ মুছিয়ে দিয়ে বল্‌ল—এসো গিয়ে। বারি সাহেব মুখপোড়ার জ্বালায় মানুষটা দুদণ্ড থির হয়ে শুতে-বসতে পারবে না!

রামঅওতার এতক্ষণে জিলানীকে প্রশ্ন করে—বারি সাহেব খুব গোসা হয়েছেন? ছাখো দেখি, আমি কী ভুলটাই করলাম—ছি-ছি-ছি!

জিলানী বল্‌ল—এক কাম করো, সাইকিল লিয়ে তুরন্ত চলে যাও তুমি। আমি পয়দল যাচ্ছি। হ্যাঁ, বারিজী তোমাকে না দেখতে পেয়ে খুব খাপা হয়েছিলেন।

অতএব রামঅওতার সাইকেল হাঁকিয়ে রওনা দিল।

বারি সাহেবের সামনে সে যেতেই তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন—কী এতক্ষণ নাকি তুমি মেয়েছেলের মত কাঁদছিলে? এসব কী শুনছি! তোমার ওপর এত বড় দায়িত্ব, এখন মুষড়ে পড়লে চলবে কী করে? শির উঁচা রাখো মজ্‌দুর!

রামঅওতার চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে—মাথা তার হেঁট। চারিদিকে কৌতূহলী জনতা ঘিরে রয়েছে।

পুনরায় বারি সাহেব ধমক দিলেন—কি হয়েছে বলো!

মাটির দিকে তাকিয়েই রামঅওতার বল্‌ল—সেকেণ্ড স্টাফকে ভেতরে ছেড়ে দিতে চাই নি। কাউকে পরামর্শ করি নি—এটা খুব অন্যায় হয়ে গিয়েছে। তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না—পরামর্শর কথা মনেই হয় নি।

বারির চোখ জলে উঠল—কে বলেছে তুমি ভুল করেছ?

—সেক্রেটারী।

—ক্যা গোবর্ধন, তুম এ্যায়সা বাত কিয়া?

গোবর্ধন ঠাকুর সগর্বে জবাব দিল—হাঁ। স্টাফকে লেবারের সঙ্গে সাথ করিয়ে কী করে!

দাঁতে দাঁত চেপে বারি সাহেব বল্‌লেন—রামঅওতার যো কিয়া ঠিক কিয়া।

তিনি বল্‌লেন যে, রামঅওতার যা করবে তা কখনও অন্যায় হতে পারে না। আর গোবর্ধন ঠাকুর মজদুরের স্বার্থহানির চক্রান্তে কোম্পানীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে—তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। তার মতো বেঈমানকে সেক্রেটারীর পদে কোনোমতেই রাখা চলে না আর। জরুর, ইউনিয়ন চল্‌বে রামঅওতারের মতো সাচ্চা কর্মীর জোরে।

বারি সাহেব গোবর্ধনকে বল্‌লেন—তুমি আজকেই মানিকপুরের এলাকা ছেড়ে চলে যাবে। আর যদি তা না যাও তাহলে, আমার হাতে যেসব নজীর আছে সেগুলো লেবারদের সামনে হাজির করবো। যদি আখেরের আশা রাখতে চাও ত যতদিন স্ট্রাইক চলবে তোমার গাঁয়ে চুপচাপ বসে থাকবে—তারপরে কারখানা খুললে এসে রুটির সওয়াল করবে, বুঝেছ! সেক্রেটারীশিপ থেকে তুমি রিজাইন করো।

গোবর্ধন ঠাকুর মাথা হেঁট করে ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টায় সরে গেল।

বারি সাহেব গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন—ভাই সব, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এখনো কোম্পানীর টাকা খেয়ে মজদুর ভাইয়ের গলায় ছুরি বসাবার মতলব নিয়ে চল্‌তে চেষ্টা করো তবে তার ছেলেমেয়ের আখের আঁধার হতে বাধ্য। আজ তুমি দু-দশটা কাঁচা টাকার লোভে যে বিরাট সর্বনাশ করতে চলেছ সে

সর্বনাশের ফল বড় সাংঘাতিক। একজনের বেঈমানী হাজার হাজার মানুষের জান পরেশান করতে পারে। এটা ভুলো না। তাই বল্‌ছি এখন এক সংকল্প নিয়ে মজদুরী দুনিয়ার ভালাই করতে চেষ্টা করো। আর না পারো তো মানিকপুর থেকে মুলুকে চলে যাও। মিটমাটের আগে সেখানে খবর পাঠানো হবে। আর যারা ইউনিয়নের কাজের জন্য এখানে থাকতে বাধ্য হবে তাদের নিজের নিজের খরচ চালাতে হবে—যখন একেবারে অচল অবস্থা দাঁড়াবে কেবল তখনই ইউনিয়নের তহবিল থেকে টাকা দেওয়া হবে, তা ছাড়া নয়। খরচ আমাদের বিস্তর। মজ্‌দুরের লড়াই-এর কাজে কতো টাকা যে খরচ হবে তা আগে কেউ বল্‌তে পারে না। এই ধর্মঘট এক দিন দু-দিনের মামলা নয়, মাসের পর মাস ধরে যুঝতে হবে। বড়া শয়তান এই কোম্পানীর তাগৎ কম নয়, সম্‌ঝে না চল্‌লে বিল্‌কুল বরবাদ হবে, বুঝলে!

প্রতি দিনের বৈচিত্র্যহীন প্রতিটি মুহূর্তকে কেউ মনে রাখে না। তবে তার স্মৃতি থাকে—পিণ্ডবৎ অব্যক্ত যন্ত্রণার স্মৃতি। মানিকপুরের প্রতিটি প্রাণী এই বৈচিত্র্যবর্জিত দিনগুলিকে তিলে তিলে অতিক্রম করছে। তাদের এই যাত্রার পথে আশাই একমাত্র সম্বল—যে-সময়টার কণ্টকবিসারিত বুকের ওপর তারা পা ফেলছে সেটা যেন অবাস্তব, সত্য শুধু ওই আশা। এই সংগ্রাম পেরিয়ে যে সুদিনের প্রতিশ্রুতি ভবিষ্যতের গর্ভে ভ্রূণের মতো রয়েছে তারই ওপর হাজার হাজার ক্ষুধার্ত উৎসুক দৃষ্টির ভরসা।

কোম্পানীর অর্থপুষ্ট ঠিকাদারেরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক আমদানী করছে কারখানা চালাবার জন্যে—কিন্তু শ্রমিক স্বেচ্ছাসেবকদের সনির্বন্ধ অনুরোধকে পদাঘাত করে নবাগত মজুরেরা কারখানার দরজার মধ্যে আর ঢুকতে পারে না। মজুরেরা মানুষের মন নিয়ে বেঁচে থাকে, অন্নের প্রয়োজন তাদের কাছে যত বড়োই হোক, পরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজের জীবনকে টিকিয়ে রাখার মতো লজ্জাহীনতা তারা স্বীকার করতে পারে না—বিশেষ ক'রে সেই নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি যখন তোমার বিবেকের

কাছে নতজানু হয়ে আবেদন জানাচ্ছে তখন তুমি সেই আবেদনকে অমর্যাদা করতে পারো না! কাজেই বাইরের মজুরেরা ফিরে যায়।

দলের পর দল ট্রেনে ক'রে, ট্রাকে ক'রে লোক আসে কিন্তু ফিরে যায় ব্যর্থ হয়ে। ব্যর্থ তাদের অন্নের আশা—মনে তবু তৃপ্তির আমেজ থাকে। শ্রমিক সংস্থার তরফ থেকে এইসব কর্মবিমুখ বেকারদের ঘরে ফিরে যাবার জন্য রাহাখরচ দেওয়া হয়। কারণ ঠিকাদারেরা চুক্তিভঙ্গকারী মজুরদের চোখ রাঙিয়ে, আইনের ভয় দেখিয়েও যখন কাজে নিয়োগ করতে অক্ষম হয় তখন ঠিকাদারের দরাজ হাতখানা কোথায় লুকিয়ে যায়—একটি কপর্দকও সেখান থেকে আর ঝ'রে পড়ে না। আর সে দায়িত্ব এসে পড়ে শ্রমিকদের উপর। অবশ্য সবাই রাহাখরচ নেয় না, বলে—তোমাদের দিন চল্‌বে কি ক'রে!

ইউনিয়নের স্বেচ্ছসেবক মহলের প্রধান সচিব দরিয়া খাঁ কাজের চমকে সবাইকে হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছে। কথাবার্তা বিশেষ বলে না সে, বাজে কথা তো আদৌ নয়। সে যেন ঐ পাওয়ার হাউসের মতো অসীম শক্তির আধার। তার অঙ্গুলি নির্দেশে স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ চলে নিভু[illegible] নিয়মে। তার শাসনও বড় কঠোর। একদা কোনো এক চক্রান্তকারী ধরা পড়ল সাম্প্রদায়িকতা রটনার গুরুতর অপরাধে। দরিয়া খাঁর আদেশে তাকে গাধার পিঠে চড়তে হ'ল আর তার মাথার অর্ধেকটা ধারালো ক্ষুর দিয়ে কামিয়ে ফেলা হ'ল—তারপর তাকে নিয়ে চল্‌ল নগর পরিক্রমা!

দরিয়া খাঁর শাসনে বেঈমানের দল প্রকাশ্যে কোন কাজ করতে পারে না। ইউনিয়নের চর কোথায় কী ভাবে কাজ করছে, মূষিকবুদ্ধি আবদুলও সব সময় তা ধরতে পারে না। ফার্স্ট স্টাফের সাহেব সুবোদের সঙ্গে দরিয়া খাঁর ঘনিষ্ঠতা আছে। তাঁরা নিজ নিজ জীবনের নিরাপত্তার জন্য দরিয়া খাঁকে নগদ টাকা খাইয়ে থাকেন। এবং আর্থিক বিনিময়টা গোপন ব্যাপার নয়—দরিয়া খাঁ সে টাকা নিজের পকেটে জমা করে না, ইউনিয়নেই জমা দিয়ে সংগঠনকে সাহায্য করে।

মাঝে মাঝে আপসের কথা শোনা যায়। কিন্তু সত্যিকার আপসের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না তিন মাসের আগে। বারি সাহেব প্রায়ই আসেন, আর তাঁর সহকারী গোমেজ সাহেব ত এখানেই রয়েছেন। রামঅওতারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে গোমেজ ইউনিয়নের তহবিল থেকে শ্রমিকদের 'রিলিফ' দেন—সপ্তাহে সাত-আট-নশো টাকা পর্যন্ত রিলিফের জন্য ব্যয় হয়ে যায়! বাইরে থেকে যে পরিমাণ প্রতিশ্রুতি এসেছিল সে হারে টাকা আসছে না—তবে একেবারেই যে কিছু আসে নি তা নয়, দু-শো, পাঁচশো ক'রে এসেছে। একমাত্র সাকৃচি থেকেই পাঁচ হাজার টাকা এসেছে মানিকপুরের সংগ্রামে আনুকূল্যের জন্য।

ওদিকে সরকারী হুমকী এল। কোম্পানী এবং ইউনিয়ন যদি এই বিরোধের মীমাংসা না করতে পারে তাহলে সরকার হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হবে। আইনের জোরে সরকার এই বিরোধের অবসান ঘটাবে। বারি সাহেব কলকাতায় ছুটলেন, শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের দোস্তী। সরাসরি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বল্‌লেন, মানিকপুরের শ্রমিকদের মেরুদণ্ড এখনও শক্ত আছে। কোম্পানীর অনমনীয় মনোভাবও অটুট। এ অবস্থায় কোনো পক্ষই আত্ম-সমর্পণ করতে প্রস্তুত নয়। আর সত্যিই ত মানিকপুরে এমন কোনো আইনভঙ্গের নজীর নেই। অতএব মন্ত্রী মশাই যেন আরও কিছুদিন ধর্মঘটে হস্তক্ষেপের প্রতি সরকারী কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। ইতিমধ্যে যদি কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সদ্‌বুদ্ধির উদয় হয়, তাহলে শ্রমিকপক্ষ মোচড় দিয়ে খানিকটা বেশি সুবিধা আদায় করতে পারবে। আর বারি সাহেব স্পষ্টই বল্‌লেন যে, সরকারী ছকে গিয়ে মামলা একবার পড়লে শ্রমিকের প্রতি সুবিচার না হবারই আশঙ্কা বেশী! পরন্তু কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিরা যেহেতু ধনবান এবং প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, সেহেতু তাঁরা নানাচক্রে যথোপযুক্ত তৈল দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সহজেই সপারগ হবেন এরকমও অনুমান হচ্ছে! যাই হোক বারি সাহেবের অনুরোধে শ্রমমন্ত্রী আরও কয়েকদিন সময় দিতে সম্মত হ'লেন।

এমনি ক'রেই তিন মাস কেটে গেল। মানিকপুরে এখন মোট শ্রমিক

বাসিন্দার সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশি নয়। ইউনিয়নের মজুত তহবিল থেকে টাকা নেওয়া তাদের কাছে অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। প্রয়োজন থাকলেও সবাই সঙ্কোচ কাটিয়ে হাত পাততে পারে না। নিজের সামান্য আসবাবপত্র যা আছে সেগুলি একে একে বিক্রী ক'রে বাজারে যতটা পাওয়া যায় ধার-দেনা ক'রেই এরা নিজের দিন চালায়।

না, দিন পড়ে থাকে না। অলস, মন্থর, বিষণ্ণ শূন্যপ্রায় দিনগুলো আপন নিয়মে কেটে যায়। একটা দিন গেলে আবার আর একটা দিনের প্রভাত আসে। সংগ্রাম ত নয়, যেন, ধৈর্যের, সহনশীলতার, কঠোর পরীক্ষা! মহাভারতের অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্যের সংগ্রাম সমাপ্ত হয়েছিল অষ্টাদশ দিনের মধ্যে, কিন্তু মানিকপুরে মাত্র সাড়ে চৌদ্দ হাজার শ্রমিকের সংগ্রাম যে কতো কাল চল্‌বে কেউ তা বল্‌তে পারে না।

আটাত্তর

মানিকপুরের আকাশে বাতাসে বিজয়ী শ্রমিকদের শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে।

তিন মাস একুশ দিনের রণক্ষেত্র এখন মজদুরের জয়োল্লাসে মুখরিত। নতুন পাতার হাল্কা সবুজ রংএ পথপাশের গাছগুলি সেজেছে। ঝরাপাতার দল ঝাড়ুদারের বিধাতাহস্তে নির্বাসিত। বসন্ত এসেছে আর এসেছেন কলকাতা শহর থেকে হুকার সাহেব। সাহেব হলেও হুকার একজন নিরপেক্ষ বিচারক। তিনি শ্রমিক-মালিক বিরোধ মামলার বিচারক-পরিষদের মনোনীত সভাপতি। কলকতার দপ্তরে বসে এতদিন নথীপত্র দেখেছেন, কিন্তু এখনই রায় দিতে তিনি নারাজ। তিনি স্বচক্ষে মানিকপুরের অবস্থা দেখবেন, তারপর রায়—তাই তাঁর ইচ্ছাক্রমে তাঁকে মানিকপুরে নিয়ে আসা হয়েছে। যদিচ হুকার সাহেব নিজের নিরপেক্ষতার কথা স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন তবু কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ একেবারে হাল ছাড়ে নি। গ্রেট বেঙ্গল ষ্টীল ম্যানুফ্যাক্‌চারার্স কোম্পানী হুকারকে তুষ্ট করবার সর্ববিধ উপায় অবলম্বন করেছে। ডিরেক্টরের বাংলোতেই দু-দিন রইলেন। শহরের সর্বত্র অবাধ বিচরণে তিনি নগরবাসীকে উদ্ব্যস্ত রাখলেন। 'কে' টাইপ কোয়ার্টার্স দেখে মল্লিক এবং রবিনসন সাহেবের মুখের সামনেই মন্তব্য করলেন—এগুলোতে মানুষ বাস করতে পারে না। এরা যে কি করে বেঁচে রয়েছে, তাই ভেবেই আমি অবাক! গরুভেড়াও স্বেচ্ছায় এমন জায়গায় থাকবে না।

হুকার সাহেবের এই উক্তি মুখে মুখে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। শ্রমিকদের দাবি ছাপিয়েও তিনি বাড়তি বরাদ্দ মঞ্জুর করে বসলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—শ্রমিকের সর্বনিম্ন মহার্ঘ ভাতার দাবি ছিল একুশ টাকা, কোম্পানী উনিশ টাকা পর্যন্ত দিতে রাজী ছিল, আর হুকারের মতে সেখানে বরাদ্দ হ'ল তেইশ টাকা আট আনা। তিনি শ্রমিক পরিবারের কোয়ার্টার সম্পর্কে লিখলেন, প্রত্যেক কোয়ার্টারে অন্ততঃ দুখানা ঘর থাকবে, জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো থাকবে। প্রতিটি শ্রমিক পরিবারের জন্য কোম্পানীকে কোয়ার্টার দিতে হবে। ছুটির ব্যাপারেও হুকার সাহেব দরাজ দিল্! বেতন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের যে দাবি

ছিল সেটাও বিচার পরিষদের সভাপতি ষোল আনা মঞ্জুর করেছেন। এর পর আর চাই কি। তবে শ্রমিকেরা ধর্মঘটের সময়টার মাইনে পাবে না। তার বদলে কোম্পানী অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আরও কত কিছু দিতে প্রস্তুত আছে। অতএব এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে গোলমাল করা ঠিক নয়। আর সত্যিকথা, এই দীর্ঘ দিন কারখানা বন্ধ থাকাতে কোম্পানীরও কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে ত।

অতএব মজদুর রাজ কায়েম হ'ল। বারি সাহেব জিন্দাবাদ! হুকার সাহেব জিন্দাবাদ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

খাতায় কলমে শ্রমিকের জয়জয়কার। তবে সব বৃহৎ ব্যাপারেই কিছু সময় লাগে। সভাপতি মহাশয়ের রায়কে কার্যকরী ভাবে প্রয়োগের পথেও সেই সময়ের প্রশ্ন উঠল। অর্থাৎ কোম্পানী সময়কেই প্রধান সুযোগ ব'লে ধরল। রায় দেবার মালিক হুকার সাহেব, কিন্তু আসল মালিক ত গ্রেট বেঙ্গলের পরিচালকেরা। কালক্ষেপ করতে করতে যতটা কাটাতে পারা যায় কোম্পানী ততদিনই কাটাবে।

প্রথম চোটে শ্রমিকেরা উল্লসিত হয়ে উঠেছিল, ক্রমে সেই উল্লাসে ভাট পড়তে লাগল। যারা ভেবেছিল, রায় বেরুলেই তাদের দিন ফিরে যাবে, তার একটু-একটু ক'রে অধীর এবং অবশেষে নিরাশ হয়ে পড়তে লাগল। তাদে মনের অসন্তোষ প্রকাশ পেতে শুরু করল কাজের মধ্যে। ধর্মঘটের সময় যা নানাদিক থেকে অর্থ সংগ্রহ ক'রে জীবনটুকু দেহের সঙ্গে সংযুক্ত রেখে তাদের ভরসা ছিল যে রায় বেরুলে হাতে কিছু টাকা পাওয়া যাবে—সেই টাক দিয়ে অবরোধ কালের ঋণের গুরুভার কিছুটা লঘু করা সম্ভব হবে। কিন্তু কোথায় সেই আশার ফল!

কোম্পানী বল্ল, সব হবে—একটু সবুর করতে হবে। এ্যাড্জুডি-কেশনের পরেও যেসব ব্যাপার মীমাংসা হবে না সেগুলো যাবে এ্যানোম্যালি কমিটিতে। সর্ব-ব্যাপারেই এখন থেকে শ্রমিক পক্ষেরও প্রতিনিধি থাকবে। কাজেই শ্রমিকদের আর দুশ্চিন্তা কী!

…ধর্মঘটের শেষের দিকে ষাট সত্তর জন নির্লজ্জ গুণ্ডা প্রকৃতির শ্রমিক নিজেদের স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাসেবক ব'লে জাহির ক'রে শহরময় ঘুরে বেড়াতো। তাদের কী যে কাজ কেউ জানতো না—হাফশার্টের ওপর নীল ব্যাজ্ লাগিয়ে ওরা মাথায় গামছার পাগড়ী বেঁধে একসঙ্গে চার পাঁচ জনে দল পাকিয়ে ঘুরতো। প্রকাশ্যে কোম্পানীকে গালিগালাজ দিত, আবার সেই সঙ্গেই ইউনিয়নেরও নিন্দা করত —ইউনিয়ন নাকি কোম্পানীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, ধর্মঘট করিয়ে মজদুরের শিড়দাঁড়া ভেঙে দিয়ে জব্দ করবার মতলব নিয়েই ইউনিয়ন চল্‌ছে! একথা শুনে অনেক দুর্বলচিত্ত শ্রমিকের মনে সন্দেহ জেগেছিল বই কি। তবে রামঅওতার বকুলপুরে এবং বক্সীবাঁধের সভাতে শ্রমিকদের কাছে জোড়হাতে নিবেদন করেছিল—প্যারে ভাইয়োঁ! খুব হুঁশিয়ার, দুশমন দালালরা হাটে-বাজারে বিষ ছড়াচ্ছে! ওদের মতলব মজদুরের মনে ধোঁকা ধরিয়ে দেওয়া। একবার ধোঁকা ঢুকলে মজদুরের একতায় চিড়্ ধরবে। ব্যস, তাহলেই ওদের কেল্লা ফতে। আরও একটা কথা ভাই মনে রাখবে—ওই সব দুশমন দালালদের সঙ্গে ঝগড়া ঝঞ্ঝাটে কেউ যেয়ো না। কেঁউ কি, ওরা যদি কোনোরকমে একটা দাঙ্গা লাগাতে পারে তাহলে কোম্পানীর বড় সুবিধে হবে—পুলিসের সঙ্গে খাতিরদারি ত আছেই। তোমাদের হাজতে চালান করে দেবে। সংগঠন তখন চুলোয় যাক! রামঅওতারের কথা ওরা সবাই বুঝেছিল, তার প্রমাণ এই যে, 'নীল ব্যজওয়ালা'রা বিনা বাধায় মানিকপুরে ঘুরে বেড়াতো—দরিয়া খাঁর কোনো শিষ্যই তাদের সঙ্গে হাঙ্গামা পাকাতে চেষ্টা করে নি।……এখন এতদিন পরে সেই নীল ব্যাজ্ওয়ালা ভলাণ্টিয়াররা প্রথম সুযোগ পেয়েছে।

কারণ, বর্তমানে জনসাধারণের মনে একটা সন্দেহের ধোঁয়া জম্‌তে শুরু করেছে। তারা যেন নিজের মনে এমনই একটা ধারণা পোষণ করছে যে, কোম্পানী কোনো সুবিধেই দেবে না। আস্তে আস্তে আন্দোলনের ঢেউটা কমে যাবে এবং আগের মতোই অসুবিধের মধ্যে তাদের কাজ করতে হবে। হয়তো ইউনিয়নের প্রতিনিধিদেরও কোম্পানী টাকা দিয়ে বশ করেছে। নইলে সেই ডিসেম্বর মাসে স্ট্রাইক মিটেছে আর আজ মার্চ পেরিয়ে যেতে চল্‌ল তবু কোনো সুরাহার মুখ দেখা যাচ্ছে না! কেবল কন্‌ফারেন্স বসছে, আলোচনা

হচ্ছে। এরকম করে আর কতকাল কাটবে? তারা কেউ কেউ প্রাক্তন 'নীল ব্যাজ্‌ওয়ালা'দের কাছে গোপনে জিজ্ঞাসাবাদও করে, সত্যি কি ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোম্পানীর যোগসাজশ আছে নাকি? নীল ব্যাজের খাতিরদারেরা বিজ্ঞভাবে অর্থপূর্ণ হাসির জাল বিছিয়ে রহস্য সৃষ্টি করে বলে—'ভাই ক্যা জানে, হাম তো আন্‌পঢ় আদমী।' অর্থাৎ, সম্পর্কে আছে—তবে সেকথা তোমরা যদি না বোঝো ত কি করা যাবে!

বারি সাহেব একবার এলেন,—এবার আর একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারি নেই মানিকপুরে। সভা হ'ল হাটতলার মাঠে। তিনি মজদুরদের যা তা ব'লে ধমক দিলেন। তারা নাকি বেঈমান হয়ে পড়েছে—তন্‌খা নেবার ফিকিরেই উন্মত্ত। কাজকর্মে বিল্‌কুল গাফিলতি করছে। পূরা কাম পূরা ঈজ্জৎ, কথাটা তারা ভুল্‌তে বসেছে। সভার মধ্যে একজন বুঝি বিড়ি টানছিল, বারি সাহেবের নজরে পড়তেই তিনি মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নেমে, ভিড় ঠেলে সেই লোকটার ঘাড় ধরে সভা থেকে বার ক'রে দিলেন। যে সভাতে মজদুরের জীবন সমস্যা নিয়ে সবাই সমবেত সে সভাকে ইয়ার্কির আখড়া বানালে বারি সাহেব তা বরদাস্ত করবেন না। অনেকেই হতচকিত হয়ে যায় ইউনিয়নের সভাপতির এই কড়া মেজাজের নমুনা দেখে।······তিনি বল্‌লেন যে, শ্রমিকের স্বার্থ জয়যুক্ত হয়েছে একথা যেমন সত্য—তেমনি এও সত্য যে, শ্রমিকের বেঈমানীতেই তার সর্বনাশ হওয়া বিচিত্র নয়। অতএব ইউনিয়ন যখন হুকার সাহেবের রায়কে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে তখন শ্রমিকেরা কারখানার প্রোডাক্‌শন পুরোদমে করে যাক। মজদুর যদি মনে ক'রে থাকে যে, চাকরীর টুলে বসে ঘুমোবে সে, আর কোম্পানী তন্‌খা গুণে চল্‌বে—তাহলে খুব ভুল করেছে। এরকম ফাঁকি-বাজদের সঙ্গে বারি সাহেব হাত মিলিয়ে চল্‌তে পারবেন না। অতএব মজদুর ভাইরা যেন সাবধান হয়, নইলে বারি সাহেব ইস্তফা দেবেন। তিনি বল্‌লেন যে, আজাদীর সূর্য উঠ্‌ছে। আজাদ-ভারতের শ্রমিক এখন স্বাধীন দেশের কাজ করছে। ইংরেজের তাঁবেদারী সে করছে না আর। অতএব কাজ না করলে পয়সা দাবি করা চলবে না।

প্রথম সুবিধে বল্‌তে শ্রমিকেরা পেল 'ডি, এ,' অর্থাৎ মহার্ঘভাতা। কিন্তু

সেটা আদৌ কোনো সুবিধে বলে তারা মনে করতে পারে না। যেহেতু সস্তার রেশন বন্ধ হয়ে গেছে, এখন সবকিছুই বাজারদরে কিনতে হচ্ছে, সেহেতু সাড়ে তেইশ টাকা উপরি পাওনা যা মিলছে খরচ তার চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে।

আর খবর বেরুলো যে, মজুরী বাড়াবার আগে প্রত্যেক বিভাগের শ্রমিকের বেতনের হার নির্ধারণ ইত্যাদি কতকগুলি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা এবং নিষ্পত্তি হওয়ার প্রয়োজন—তাতেও সময় লাগবে।

দুনিয়ার রাজনীতিক্ষেত্রে কত বিচিত্র ঘটনার ঢেউ উঠল পড়ল। তাতে মানিকপুরের কিছু এসে যায় না। এখানে এখনও শ্রমিক পক্ষের সঙ্গে মালিক পক্ষের দ্বন্দ্ব যথাপূর্ব চলেছে। তার বাইরের কোনো ব্যাপারে এখানকার মানুষ মগজ ঘামাতে নারাজ। তবে একটি দুর্ঘটনার ধাক্কায় মানিকপুর স্তম্ভিত হয়ে গেল কয়েক দিনের জন্য। পাটনার কাছে বারি সাহেব আততায়ীর গুলিতে মারা গেছেন। বজ্রপাত! ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮ মার্চ বারি সাহেব ইউনিয়নের সব কাজ ফেলে রেখে পরলোকে চলে গেলেন! খবরের কাগজে এই রহস্যময় চাঞ্চল্যকর সংবাদটি সকলের মনে কেমন যেন বিষণ্ণ সন্দেহের ছায়া ফেলে যায়। অনেকে বিজ্ঞ হাসি হেসে বল্‌ল, মালিকবর্গের মিলিত চক্রান্ত রয়েছে অপমৃত্যুর পিছনে!

রামঅওতার সিং শোকসভা আহ্বান করল। বক্সী বাঁধের সভাতে আর লোক ধরে না। শান্ত বিষণ্ণ পরিবেশ। আজ গোমেজ্ সাহেবও অনুপস্থিত। সভাতে বক্তৃতা করবার মত মানসিক অবস্থা কারুর নেই। রামঅওতার আবেগ-কম্পিত স্বরে বল্‌ল,—আজ মানিকপুরের মজদুরের বাপ মরেছে—তার জন্যে বিধাতার কাছে নালিশ জানিয়ে কি হবে! যারা এখন বেঁচে রইল তাদের ঘাড়েই সব দায়িত্ব এসে পড়ল। এখন আর কেউ এসে বল্‌বে না, 'মু্ সে বিড়ি ফেঁকো'। আজ থেকে আমরা পিতৃহারা! কিন্তু দুনিয়ার দেখ্ ভাল্ করনে-বালা যেন সেই জানোয়ারদের বিচার করেন যারা বারি সাহেবের মতো দেওতার বুকে গুলির ঘা মেরেছে। আর বেশি কিছু বলবার নেই ভাইসব। আজ থেকে এই ময়দানের নাম বারি ময়দান হ'ল। বল সবাই, সব মজদুর ভাই

'হাঁ' লাগাও! সবাই 'হাঁ' বলে চোখ মুছল। বক্সী বাঁধের মিটিং বারি ময়দানে শেষ হ'ল।

তারপরই গোমেজ সাহেবকে ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট পদে বরণ করা হ'ল।

ভারতবর্ষের মানচিত্র বদ্‌লে গেল—স্বাধীনতার সঙ্গে বাংলার অঙ্গচ্ছেদ আর সিন্ধু, পাঞ্জাব সীমান্তের পাকিস্তান-ভুক্তিতে। ছোট শহর মানিকপুর এসব বড় বড় ব্যাপারে মাথা গলাতে নারাজ। তার নিজের ঘরোয়া সমস্থার মীমাংসা নিয়েই উদ্ব্যস্ত।

কারখানার মধ্যে অসন্তোষের ভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে। যে যার খুশী মত কাজ করে। ওপরওয়ালারা উত্যক্ত হয়ে উঠেছেন। তাদের চোখের সামনে হেল্‌পার থেকে শুরু ক'রে সকল স্তরের শ্রমিকই ক্যাণ্টিনে যায় আসে, আড্ডা দেয়। কাজে হাত লাগোনাটা যেন মর্জির ব্যাপার। কারুর নামে চার্জ শীট দিলে তাই নিয়ে তুমুল হট্টগোল বেধে যায়। পরিণামে ওপরওয়ালাকে চার্জ শীট তুলে নিতে হয়—নতুবা শ্রমিকেরা যে যার সেক্‌শন থেকে বেরিয়ে আসে। 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!' কাজ বন্ধ হয়ে গেল। তখন আবার ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের ডেকে কোম্পানীর প্রতিনিধিরা পরামর্শ করতে বসেন। গোলমাল মিটতে পারে, ইউনিয়নের লোকেরা বলে, তার আগে চার্জ শীট উঠিয়ে নেওয়া হোক। কোম্পানী রাজী? কোম্পানীর প্রতিনিধিরা বলেন, কিন্তু তার আগে তোমরা গ্যাখো শ্রমিকের অন্যায় হয়েছে কিনা! ইউনিয়ন মাথা নাড়ে, বেশ ত অন্যায় হয়ে থাকে বিচার পরে হবে, কিন্তু তার আগে চার্জ শীট উঠিয়ে নেওয়া হোক।

সাড়ে চৌদ্দ হাজার মানুষ একজোট হয়ে বসেছে। তার বিপক্ষে মুষ্টিমেয় একশ' কি দেড়শ' জন ওপরওয়ালা কতটুকু লড়াই করতে পারে। বিশেষ ক'রে হুকার সাহেবের বরাদ্দ ষোল আনা এখনো কোম্পানী দিয়ে উঠতে পারে নি যেক্ষেত্রে, সেখানে ওপরওয়ালাদের বড়মুখে কিছু বলবার জোর নেই।

এমনি করেই চলছিল শ্রমিকদের স্বেচ্ছাচার। একদা শোভনতা কল্পনার সীমা ছাড়িয়ে গেল।

কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস্টার জ্যাকসনের আফিস ঘেরাও করল একদল শ্রমিক। তাদের মধ্যে যারা দুঃসাহসী তারা আফিস ঘরে ঢুকে পড়ে চেয়ার টেবিল উল্টে দিল। জ্যাকসন সাহেব টেলিফোন করবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে আটকে ফেলে—তিনচার জনে টেলিফোনের তার ছিঁড়ে ফেল্ল। আর গালি-গালাজের কিছু বাকী রাখল না।

খবর পেয়ে রামঅওতার হাতের কাজ ফেলে ছুটে এল।—ক্যা ভাই, ক্যা হুয়া?

একজন হেসে জবাব দিল—আরে বুঢ়াউ তুম ইঁহাসে চলে যাও। লেবর লোগ উও কুত্তীজী বাচ্ছে কো সিধা বানায়ে রহেঁ!

জ্যাক্সন সহজে ভয় পাবার লোক নন্। দীর্ঘদিন তিনি এই কারখানার শ্রমিক চরিয়ে আসছেন। কিন্তু এমন অভাবনীয় ব্যাপার কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেন নি। রামঅওতারের গলা পেয়ে তিনি তাকে ভেতরে ডাকলেন।

ভিড় ঠেলে রামঅওতার ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে শ্রমিকদের হুঁশিয়ার ক'রে দিল,—শালে লোক আভি ভাগ্—নেহী ত রোটী খতম হোগা! ভাগ—ভাগ।

ব্যাপারটা খুব গুরুতর। জ্যাক্সনের গোল মুখখানা আগুনে রাঙানো তাতালের মত গন্গনে হয়ে উঠেছে। রামঅওতারকে দেখে জ্যাক্সন গম্ভীর ভাবে মেঝে থেকে একপাটি স্যাণ্ডেল তুলে দেখালেন—ডেখো সিং তুম্হারে লেবর ভাই হামকো জুত্তি প্রেজেণ্ট কিয়া হায়! হাউ নাইস অফ দেম, দিজ সন্স্ অব বিচ্! ওউঃ হাউ আই ওয়াণ্ট টু কিক্ দিজ্ র‍্যাস্ক্যাল্স্!

রামঅওতার মুখাখানা যথাসম্ভব ভাবলেশহীন করে রেখে বল্ল—সাহেব ওদের ওপর রাগ ক'র না। ওরা হচ্ছে ব্লাইণ্ড ফোর্স।

—নো, নো, দে আর মেকিং হেল, হিয়ার ইন মাই অফিস্। আজাদী মিল্নে কে বাদ ইয়ে তুম্হারে দস্তুর হুয়া কি বড়াছোটা কুছ না মানেঙ্গে! দেখো ইয়ে হুয়া কি, ও লোগ ওভার টাইম মাংতা থা, আরে ভাই কুছ কামভি নেহী করো গে, খালি পৈসা খিঁচ লেনে কা মতলব কিয়ে হো—বেকার বৈঠাকে

পৈসা কিস্ লিয়ে কৌন্ দেতা ? ওভার টাইম স্যাংশন্ নেহি কিয়া। ত ইয়ে হামারা হাল্লাৎ হোনে লাগা। দে হ্যাভ্ টর্ন টেলিফোন্ ওয়্যারস্, এ্যাণ্ড সী হোয়াট দে আর নট ডুইং। সবকুছ্ সিং তোমার দোষ আছে। দিস্ ইউনিয়ন—!

রামঅওতার মজতুরদের চলে যেতে বল্‌ল, নতুবা তাদের নামে রিপোর্ট করতে হয়।—কারখানার মধ্যে এভাবে অরাজক অবস্থা-সৃষ্টি গুরুতর অপরাধ বই কি! ইউনিয়নের পাণ্ডা হয়ে রামঅওতার এ ধরনের অত্যাচার কিছুতেই প্রকাশ্যে সমর্থন করতে পারে না।

তারপর জ্যাক্‌সনকে সে বিনীতভাবে বল্‌ল—ওরা তোমার ছেলের মতো। ও:দের কোনো ক্ষতি ক'র না সাহেব।

জ্যাক্‌সন ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বল্‌ল—হোয়াট এ্যাবাউট দেয়ার গু-ইং! হাউ ক্যান আই সাপোর্ট রাউডিজম্। ইউ নো, দিস ইন্‌সিডেণ্ট হ্যাজ অল্‌রেডি রিচ্‌ড্ মাল্লিক, এ্যাণ্ড হি ইজ সিওর টু রিপোর্ট দি অথরিটিজ্। নো প্লিজ্, নো রিকোয়েস্ট! ইওর লেবার কুড্ এ্যাপ্রোচ ইউনিয়ন,—আই মিন ইউ,—ইয়েস!

রামঅওতার হাসলো—সাহেব, ওরা তোমার কাছে আবদার করেছে। রাগ করা ভুল। একটা কথা ভেবে ছাখো, তোমার ছেলে কিম্বা মেয়ে যদি মনে করে যে, তোমার কাছে তার কোনো কিছু প্রাপ্য রয়েছে, তাহলে সে কি তোমার কাছে দাবি করবে না?

—অফ কোর্স!

জ্যাক্‌সন ঘাড় কাৎ করলেন।

রামঅওতার বল্‌ল—সে কি তোমার সঙ্গে তর্ক না ক'রে সোজাসুজি আদালতে গিয়ে মাম্‌লা ক'রে প্রাপ্য আদায়ের চেষ্টা করবে?

—সার্টেন্‌লি নট!

—তাহলে সাহেব তোমার লেবার, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবে বই কি! তাতে যদি মীমাংসা না হয় তখনই সে ইউনিয়নের মারফতে দাবি পেশ করবে—তাই ত উচিত। না হ'লে কথায় কথায় ইউনিয়নকে টেনে আনিলে ফল

ভালো হ'তে পারে না আর তোমরা ত ইউনিয়নকে নিরপেক্ষ ব'লে মনে করো না।

—ও সিং, তুমি জরুর রাইট স্পিরিট ইন্‌কারনেট! নাউ আই ওয়াণ্ট টু আস্ক, হোয়াট এ্যাম আই টু ডু উইথ্‌ দিজ্‌ রেবেল্‌স্‌—এঃ।

রামঅওতার চিন্তান্বিত ভাবে ঘরের চারিদিকে তাকালো। টেবিলের কাগজপত্র মেঝেতে ছড়ানো, একখানা চেয়ার কাৎ হয়ে পড়ে রয়েছে, পেপার ওয়েট আর কলম পেন্সিল সব গুলো দরজার পাশে ছিটিয়ে। সে বল্‌ল—সাহেব, আমি বলি কি ওদের তুমি ডেকে বুঝিয়ে বলো, এভাবে অসভ্যতা করলে কাজ অচল হয়ে যাবে। তাদের কোনো লাভ নেই এতে। একটু শাসিয়ে ছেড়ে দাও।

—হোয়াট এ্যাবাউট ওভারটাইম! আই ডোণ্ট এগ্রি দেয়ার, ইউ সী দে কাণ্ট হ্যাচ্‌ দেয়ার গ্রিড্‌ দিস ওয়ে!

—সে ব্যাপারে আমি কি বল্‌ব—তবে কারখানার সব সেক্‌শনে ওভার টাইম থাকলে কেবল ট্রাফিক সেক্‌শনকে বঞ্চিত করার কি গ্রাউণ্ড আছে বলো!

—বাট আই ডোণ্ট সী হোয়াই এনি ওভারটাইম শুড স্টে! আই লাইক টু স্টপ অল্‌ গ্র্যাজুয়ালী!

—সেটা এ অবস্থায় করলে আবার স্ট্রাইক হবে। শান্তি বজায় রাখতে হলে তুমি তা করতে পারো না। যতদিন পর্যন্ত লেবারের ডিমাণ্ডগুলো দিতে পারছ না, ততদিন ওভারটাইম রাখতে হবে বুঝেছ।

—ইউ সে দিস এ্যাজ ইউনিয়ন মাস্টার?

—না সাহেব, এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা।

—অল রাইট দেন!

—আচ্ছা সাহেব আমি এখন চলি। জয়হিন্দ্‌!

—জয়হিন্দ্‌!

রামঅওতার যাবার আগে দু'জন বেয়ারাকে পাঠিয়ে দিল সাহেবের ঘরখানা গুছিয়ে তোলার জন্য!

একটু দূরে কয়েকজন সাঁওতাল কুলী অপেক্ষা করছিল, রামঅওতারকে দেখে তারা এগিয়ে এলো—কি রে কি বলে এলি শালাকে ?

রামঅওতার বল্‌ল—যা, যা, ওভারটাইম হবেক। আর ত্থাখ, শপের মধ্যে এরকম হাঙ্গামা করিস না রে, তাহলে পুলিস এসে ধরবে। ইউনিয়ন ঠেকাতে পারবে না।

সরল কুলিগুলোর কালো মুখ গহ্বরে সাদা দাঁত চক্‌চক করে, তারা হেসে উঠল—হঁ রে, ইউনিয়ন পারবেক নাই—তাম্‌শা করছিস আপনি। আরে সিং বলে কি। ইউনিয়ন ত রাজা আছে রে, সাহেবশালাদের মুখে মুতে দিইছে !

রামঅওতার গম্ভীরভাবে বল্‌ল—যা ব্যাটারা! খবরদার হাঙ্গামা করবি না, তাহলে আমি আর সাম্‌লাতে পারব না বলে দিচ্ছি। অন্যায় করলে ইউনিয়নও গোঁসা হবে কিন্তু।

—অন্যায় বটে ? শালা সাহেব যখন আমাদের মাগীগুলাকে গাড়িতে নিয়ে মদ খেঁয়ে লষ্ট ক'রে ত্থায় সিটার বেলা কি অন্যায় হয় না বটে ? ওই শালা জ্যাক্‌সন যি সোমত্ত ছুঁড়িগুলোকে মট্‌ মট্‌ ক'রে খেছে, তার কি বিহিত তুই বল্‌ ক্যানে সিং বাবা।

রামঅওতার এসব যে কিছুই জানে না তা নয়। গোলমালের পিছনে শুধু যে ওভারটাইমের ব্যাপারই মাত্র নেই, আরও অন্য কথা রয়েছে তাও সে জানতো। সাঁওতালদের কার্যকলাপে সে মনে মনে খুশীই হয়েছে।

আস্তে আস্তে বলল্‌—কারখানার মধ্যে গোলমাল করিস না। তাতে তোদের বিপদ আছে। এরিয়ার বাইরে যা পারিস করবি।

ঊনআশি

সেদিন ছুটির পর দেবজ্যোতি গেটে দাঁড়িয়ে ছিল। একের পর এক লোক বেরুচ্ছে। অভিজিৎ সিং তাকে দেখে নমস্কার করল। এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল—কি ব্যাপার মুখার্জি মশাই এখানে দাঁড়িয়ে যে?

হাসলো দেবজ্যোতি—কাজ আছে।

জবাব শুনে অভিজিৎ বল্‌ল—যেতে দেরী আছে? তাহলে আমি এগোই এঁ্যা!

—আচ্ছা, নমস্তে।

অনেক দেরী করে রামঅওতার বেরুলো। তার সঙ্গে আরও সাত আট জন রয়েছে। প্রায় সকলেই একসঙ্গে বকে চলেছে। দেবজ্যোতি ওদের সঙ্গ নিল। রামঅওতার দেবজ্যোতিকে দেখেছে তার প্রমাণস্বরূপ এক টুকরো হাসি যেন উপহার দিল, তার বেশি কিছু নয়।

চল্‌তে চল্‌তে দেবজ্যোতি যা শোনে তার সারার্থ হচ্ছে এই যে, কারুর কোয়ার্টার চাই, কারুর বা এক কামরার কোয়ার্টারে কুলোচ্ছে না, অতএব দু-কামরাবালা কোয়ার্টার প্রয়োজন এবং রামঅওতার ইচ্ছে করলে এই সামান্য উপকারটুকু করতে পারে, কেউ বা পদোন্নতির জন্য ব্যস্ত—যেহেতু ডিপার্টমেণ্টের একজন মারা গিয়েছে সেহেতু এই পদোন্নতি অত্যন্ত সহজসাধ্য ব্যাপার।… এদের প্রত্যেকেরই কথায় যথেষ্ট তোষামুদির রঙ রয়েছে। রামঅওতার ইচ্ছে করলেই মজদুরদের উপকার করতে পারে। আর দেশোয়ালী ভাইদের জন্য সে এর আগেও অনেক তদবির ক'রে এসেছে, আজও সে যে নিজের প্রভাব প্রয়োগ ক'রে এদের উপকার করবে সেটুকু নাকি এদের জানতে বাকি নেই, ইত্যাদি।

রামঅওতার প্রত্যেককেই বল্‌ছে—কৌশিস কিয়া যায়েগা! হাঁ ভাই শান্তি সে রহো।

ওরা সবাই বিদায় হ'লে রামঅওতার পিছন ফিরে দেবজ্যোতিকে বল্‌ল—কি আচার্য, কি সমাচার!

—সমাচার ভালোই সিংজী! তোমার রাজ্যে প্রজাদের সুখ সুবিধের ছড়াছড়ি, দেখে খুশি হওয়াই উচিত।

—কাহে গুরু, কেয়া কুছ গড়বড হুয়া কঁহী?

দেবজ্যোতি পরিহাসছলে বল্‌ল—জী কুছ ভী নেহী। বাৎ এহি হ্যায় এক বুঙ্ক্‌ নে শাদী করনেকা ইন্তজাম কর রহে—ইয়া।

রামঅওতার বাধা দিয়ে দেবজ্যোতির হাত ধরে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল—হাঁ-হাঁ! গুরু একথা ত শুনেইছি। তোমার জন্যে একটা কোয়ার্টারের দরবার ভি করেছি। হয়তো হয়েই যেত এতদিনে, কিন্তু মুশকিল কি জানো পয়েন্টের জোরে দোসরা একজন পেয়ে গেল। আর সে জন্যে তোমার শাদী ত ঠেকে যাবে না। তোমার বাপের সঙ্গে ঝগড়া, তাতে কী আছে—সান্যাল মশাইয়ের ঘরের ছেলের মত আছো—বিয়ের পর না হয় কিছুদিন সেখানেই থাক্‌লে। তারপর তোমার মওকা এলেই নিজের কোয়ার্টারে চলে যাবে।

দেবজ্যোতি তাচ্ছিল্যের হাসিতে রামঅওতারের কথার গুরুত্ব উড়িয়ে দিল—কোয়ার্টারের জন্যে দরবার করতে আসি নি সিংজী। আজকের ব্যাপার নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা ছিল।

রামঅওতারের সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জীবন্ত জিজ্ঞাসা—ব্যাপার? কী ব্যাপার!

—জ্যাক্‌সনের ঘরে ঢুকে তাকে মারপিট করার কথা কী ভুলে গেলে এর মধ্যে?

রামঅওতার খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বল্‌ল—ও, হাঁ, একটা তক্‌রার হয়েছিল বটে। তা সে ত তখনি মিটে গিয়েছে।

—তকরার মাত্র? আমি আরও অনেক কথা শুনেছি যে! জুতো মেরেছে নাকি জ্যাক্‌সনকে?

—তুমিও যেমন, দালালদের কথায় কান দিতে আছে! হাঁ একটু গোলমাল ত হয়েই ছিল—লেকিন সে রকম কিছু না।

—সিংজী, কিছু না হলে ভালো কথা। কিন্তু আমি দালালদের কথা বিশ্বাস করি না। এমন লোক আমাকে বলেছে, সে, মিথ্যে বলবার বান্দা নয়।

—তুমি গোসা হচ্ছ গুরু! যদি বুরা না মানো তো একটা কথা বলি—

—বলো, যদি সাঁচ্চা কথা হয়, তা আমি হাজার রাগ করলেও তোমার বলা উচিত।

—খাশ বাং! কি জানো গুরু, তোমরা পড়ালিখা আদমী, বুঝে-সমঝে বাৎচিং করতে পারো। বল্‌কি, আন্‌পঢ় বেহুদা কুলীকাবারীরা ত দোসরা কথাতেই মা-বোন তুলে বসে,—তব্‌ভি ফয়সালা না হয় ত হাঁথ উঠায়। ত কথা কী জানো, জ্যাক্‌সন সাহেব হচ্ছে পয়লা নম্বর টেঁঠিয়া শয়তান—ও একটু শায়েস্তা হয়েছে কিছু মন্দ হয় নি।

দেবজ্যোতি গম্ভীরভাবে 'হুঁ' ব'লে থমকে দাঁড়ালো।

রামঅওতারকেও দাঁড়াতে হয়। সে বলে—কি হ'ল, দাঁড়ালে যে?

—তোমার আর আমার রাস্তা এক নয় সিংজী! আমাকে কোনো-না কোনো জায়গায় সরে দাঁড়াতেই হবে, তা নইলে তোমার চলতে অসুবিধে হবে।

রামঅওতার বুদ্ধির সীমান্তে পৌঁছেও দেবজ্যোতির কথা বুঝতে পারে না। সে বিহ্বল অসহায় ভাবে প্রশ্ন করে—গুরু, মূর্খকে সমঝে দাও একটু।

দেবজ্যোতি বলল—লেখাপড়া শেখাটা আমার অপরাধ হয়েছে এমন কথা তুমি আজো বিশ্বাস করো সিংজী। কিন্তু আমি তা মনে করি না।

—আরে সে কথা কখন বললাম?

—তা যদি না-ই হবে ত লেখাপড়ার দোহাই তোলো কেন? কেনই বা —আমার কাছ থেকে জ্যাক্‌সনের ঘরের হামলাটা ঢাকবার চেষ্টা করছিলে? যাক, যে জন্যেই তুমি এটা ক'রে থাকো—করেছ! তোমাদের এই ঢাকাচাপা আমি পছন্দ করছি না। অথচ ইউনিয়নের স্বার্থে এই ভাবে চলার প্রয়োজন আছে ব'লে তুমি মনে করছ। আর আমি যা দেখছি তাতে দিনদিনই ধারণা হচ্ছে যে, আমরা নিজেদের নতুন পাওয়া ক্ষমতার বড় বাজে খরচ করছি।

আজকের কথাই বলি, যারা অনায়াসে জ্যাক্সনকে অপমান করলে তারা নিজেদের ক্ষমতাকেও অপমান কম করল না।

রামঅওতার মাথা নেড়ে উত্তেজিত ভাবে জবাব দিল—কভি নেহী! আচ্ছা গুরু পথের মাঝে দাঁড়িয়ে ঝগড়া না ক'রে চলো গরীবের খাটিয়াতে বসে বুঢ়িয়ার হাতে চা খেতে খেতে কথা কইবে। জানো বুঢ়িয়া আমার কি রকম ভাবনা করে, দেরী হ'লেই ধরে নেয় মরদটা বুঝি মরেছে।

দেবজ্যোতির মুখে হাসি ফোটাতে পেরে রামঅওতার মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করে।

দেবজ্যোতি বলল—আমাকে একবার অমলের কোয়ার্টারে যেতে হবে। মেজো বোনের ছেলেপুলে হবে কি না! বেচারী অমলের আবার ডিউটি বদলে দিয়েছে, খোঁজটা নেওয়া দরকার। এখন চলি।

—আচ্ছা লেকিন গুরু তুমি আমাকে উল্টা সম্‌ঝে দরিয়াতে ফেলে দিয়ে কেটে পড়ো না। দোহাই রামজীর।

—আর এই দরিয়ার কথাতে মনে পড়ল—হাঁ, দরিয়া খাঁ!

রামঅওতারের দু চোখে আগুন জ্বলে ওঠে—আঃ, ওই এক ঝামেলা হয়েছে। সত্যি গুরু ওকে নিয়ে কি করি বলো তো। হররোজ হরেক মতলবে শালা পয়সা খিঁচে নিচ্ছে—আর এ্যায়সা ওর দাপট দাঁড়িয়েছে যে, কাউকে গ্রাহ্যই করে না। পথ দিয়ে হাঁটে যেন তামাম দুনিয়ার বাদ্‌শাহী ওর পায়ে বাঁধা রয়েছে। ভলান্টিয়ার জি-ও-সি, সব গুণ্ডাকে মালিক হয়ে বসেছে।

বলতে বলতে রামঅওতার চারিদিকে নজর দিয়ে গলাটা নামিয়ে বলল—আমার সেই দোস্ত খবর দিয়েছে, দরিয়া খাঁ মাহিনামে কম্‌সে কম পাঁন্‌-ছশো রুপেয়া খাক্‌সার পার্টির চাঁদা পাঠাচ্ছে। হুঁশিয়ারীসে চল্‌নে হোগা গুরু!

অবাক হয়ে যায় দেবজ্যোতি—এত টাকা পায় কোথায়?

বিজ্ঞ ভাবে হেসে রামঅওতার আকাশের দিকে তাকায়—খোদার কুদ্‌রতে! ও শালা করে কি, ওরা চেলাদের ভিড়িয়ে ভয় দেখায় সব ফার্স্ট স্টাফের বুদ্ধুদের। বলে কি খুন করবে, জখম করবে—আঁধারে সাবাড় করে দেবে, তারপর না হয় ফাটকে যাবে, পরোয়া নেই।

—কেন ?

—কেন, সাহেবসুবোরা ইন্‌ক্রিমেন্ট দিচ্ছে না, কি ফলানা কোই কারণে ধমক দিয়েছে। ব্যস। তা বুদ্ধু স্টাফগুলোর ত প্রাণের বড় ভয়! ওরা ছোটে দরিয়া খাঁর কাছে। দরিয়া খাঁ বলে, জানের জিম্মা সে নিতে পারে, তবে তার জন্য দশ কি বিশ রুপেয়া ক'রে মাসে মাসে বক্‌শিস চাই। ব্যস! তা পঁহেলা পহেলা ইউনিয়নেও টাকা জমা দিত বেশ মোটা রকম। আজকাল শালা হাত গুটিয়ে ফেলেছে। আর ওকে সবাই ভয়ে ভয়ে চলে কি না—

দেবজ্যোতি বলল—তাহলে রোজার ঘাড়ে ভূত চেপেছে বলো!

—যা বলো তাই। যাক, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, এসো না একবার। আজকাল ত সান্যাল মশায়ের ওখানেই তোমার সময় বরাদ্দ করেছ—এ্যাঁ! হাঃ হাঃ—বলে রামঅওতার হাসতে লাগলো।

দীনদয়াল আগেই এসেছেন অমলের কোয়ার্টারে। আর সঙ্গে এসেছে মিণ্টু। দেবজ্যোতিকে দেখে দীনদয়াল বললেন—খুব সময়ে এসে পড়েছ বাবা। এখনই তো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার মনে হচ্ছে।

মিণ্টু দরজার সামনে থেকে ইশারায় দেবজ্যোতিকে বাইরে ডেকে বলল—কিন্তু ও যে একেবারে বেঁকে বসেছে হাসপাতালে যাবে না!

—তাহলে উপায় ?

দেবজ্যোতি বিব্রত ভাবে মিণ্টুর মুখের পানে তাকায়।

মিণ্টু কুণ্ঠিতভাবে বলে—তাই ত ভাবছি। একটা ইয়ে আছে, মঙ্গলা দাইকে খবর দেওয়া। কিন্তু এখানে সব সময় দেখাশুনো করার কি ব্যবস্থা হবে? মানে লোকের অভাব যদি নাও হয় তবু—এই ত একখানি ঘর! আঁতুড় হবে কোথায়—কোথায়ই বা জামাইবাবু থাকবেন ?

দেবজ্যোতির মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে—আঁতুড়, প্রসূত, গৃহস্থ, এ সব কথা কতকাল পরে যেন গভীর সমস্যার আকার নিয়ে তার সামনে হাজির হয়েছে। আরও অস্বস্তি বোধ করে সে,—মিণ্টুর সঙ্গে এ সম্পর্কে মুখোমুখি আলোচনা করতে হচ্ছে। কিন্তু সমস্যার গুরুত্ব যে রকম প্রকট, তাতে সঙ্কোচ

পোষা চলে না। সে সহজ হবার চেষ্টা ক'রে বলে—তা বটে : আর মঙ্গলা কোথায় থাকে তাও ত আমি জানি না। হাসপাতালে যেতে ওর এত আপত্তিই বা কেন ?

ওদিকে মল্লিকার চাপা কাত্‌রানি কানে এসে দেবজ্যোতিকে আরও অশান্ত অস্থির ক'রে তুলেছে। সে বলল—ত্যাখো মিণ্টু, এখানে রাখা আমি আদৌ ভালো বুঝছি না। হাসপাতালে নার্স, ডাক্তার ওষুধপত্র লোকজন কিছুরই অভাব হবে না—আপত্তি শুনতে গেলে হয়তো বিপদে পড়তে হবে।

—তুমি একটু বুঝিয়ে বলো তাহলে !

—আমি ? আচ্ছা !

দেবজ্যোতি ঘরে ঢুকে মল্লিকার বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মল্লিকার মুখখানা কেমন অন্য রকম হয়ে গেছে। চোখ বুজে, ঠোঁট কামড়ে যেন দম বন্ধ ক'রে পড়ে রয়েছে। আস্তে আস্তে কপালে হাত রেখে দেবজ্যোতি বলল—মল্লি !

—কে ? দাদা !

মল্লিকা ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টি নিয়ে চোখ মেলল—দাদা, বড্ড কষ্ট হচ্ছে ! আঃ, আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন। উঃ !

ব'লেই মল্লিকা আবার চোখ বুজল।

দেবজ্যোতি বোনের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে। সে বল্‌ল—শোন্‌, ওরে !

দেবজ্যোতি টের পাচ্ছে না যে তার দিকেও একজন সাগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে। তার কপালের প্রতিটি কুঞ্চনরেখাতে কী বেদনাময় রহস্য রয়েছে সেটুকু পড়তে চেষ্টা করছে মিণ্টু সকলের অলক্ষ্যে।

মল্লিকা হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে—মাগো ! ওঃ—

দীনদয়াল ব্যস্ত ভাবে বললেন—দেবু, এভাবে চুপ ক'রে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার সময় নেই, তুমি হাসপাতালের গাড়ি আনো—যাও !

মল্লিকা বোধ করি দীনদয়ালের কথাটা শুনে থাকবে, এই যন্ত্রণার মধ্যেও সে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করে—না, না, আমি হাসপাতালে না, ওখানে

গেলে আমি মরে যাবো। দিদিকে খবর দাও না দাদা! দিদি সব বোঝে—

দিদি? দেবজ্যোতি বিস্মিত হয়,—মল্লিকা আজ এই চরম সঙ্কটে মুকুলের সাহায্য চাইছে! মুকুল অবশ্য তিনটি সন্তানের জননী। সত্যি ত, একথা আগে তার মনে পড়ে নি।

দেবজ্যোতি ভাবলো মুকুলকে খবর দিলে ও হয়তো আসবে, কিন্তু তাতেই বা লাভ কী? মুকুল দেখাশুনোই বা কি করবে! তার চেয়ে দীনদয়ালের কথাটাই শোনা সমীচীন।

সে বেরিয়ে পড়ল। চল্‌তে চল্‌তে ভাবলো,—মুকুলকে একটা খবর দিয়ে গেলে মন্দ হয় না। ও বরং মল্লিকাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সঙ্গে করে হাসপাতালে আনতে পারবে। তাহলে গোবিন্দ মুখুয্যের কোয়ার্টারে আগে যাওয়া যাক।

হঠাৎ দেবজ্যোতিকে দেখে মুকুল খুব অবাক হয়ে গেল—ব্যাপার কি, দাদা তুমি?

—হ্যাঁ, তোকে একবার মল্লিকার ওখানে যেতে হবে।

—আমাকে? না, না, তুমি ঠাট্টা করছ দাদা।

—না রে, হাসিঠাট্টার সময় এটা নয়। মল্লির ব্যথা উঠেছে, তোর কথা বার বার বল্‌ছে।

মুকুল যেন খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—তাই নাকি? তুমি কার কাছে শুনলে?

—নে এখন ইয়ার্কি রেখে তৈরী হয়ে অমলের ওখানে চলে যা। আমি হাসপাতালে যাচ্ছি। ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরবো। আর ছাখ, একটা কথা বলে রাখি—মল্লি কিছুতেই হাসপাতালে যেতে চাচ্ছে না! তুই ভালো করে বুঝিয়ে রাজী করাবি, কেমন!

মুকুল নিশ্চিন্ত ভাবে বলে—তোমার ত দেখছি কারখানার সাজ। চা-জলখাবারও খাওয়া হয় নি। দাঁড়াও, জলটল খাও আগে।

দেবজ্যোতি রীতিমত বিরক্ত হয়, বলে—খাওয়ার সময় ঢের মিলবে! ওদিকে মেয়েটা পড়ে পড়ে কাৎরাচ্ছে—

যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবে বল্‌ল মুকুল—আরে বাবা তুমি তড়বড় করলেই ত আর পেটের ছেলেটা পড়বে না! সবে ব্যথা উঠেছে, প্রথম পোয়াতী, এখন ক'বেলা ব্যথা খাবে তার ঠিক কি আছে। যতটুকু ভোগ আছে ভুগিয়ে তবে সে বেরুবে। হয়তো পালটের ব্যথা এটা, কিছুই নয়। বসো!

দেবজ্যোতি থ বনে গিয়েছে! মুকুলের কথার একটি বর্ণও তার মগজে ঢুকছে না। সে বল্‌ল—চোখে না দেখে এখানে বসে রায় দিচ্ছিস, আগে গিয়ে ছাখ।

হেসে উঠল মুকুল—আমি ত অনেক দেখেছি, এখন তোমাদের দেখার পালা। বসো, চা-টা খাও, তারপর চলো গিয়ে দেখি—দরকার বুঝলে গাড়ি ডাকবে। আর ও যদি হাসপাতালে একান্তই না যায়, বাড়িতেই খালাস হবে।

—বাড়িতে হওয়া কি অতই সোজা?

—বাঁকাটা কোথায় বুঝছি না। তুমি আমি সবাই ত ওই মঙ্গলার মায়ের হাতেই বাড়িতেই হয়েছি। অবিশ্যি মঙ্গলার মা এখন বেঁচে নেই। মঙ্গলা যে দাই হিসেবে খারাপ তা নয়। কিন্তু হাসপাতাল, নার্স এইসব হয়ে ইস্তক বেচারীর অন্ন উঠতে বসেছে। এখন ও বেচারী অন্য পথ ধরেছে। ও-ই বা কী করে, বাঁচতে তো হবে। দাইগিরির ডাক বিশেষ পায় না,—দরকারই বা কী, অমন আঁটসাঁট দেহের বাঁধুনী, নষ্টামী ক'রে পসারও বেশ জমিয়েছে।

দেবজ্যোতি যেন অন্য রাজ্যের কথা শুনছে। যে মানিকপুরকে সে চেনে সে মানিকপুরে মঙ্গলা-ভক্তবৃন্দের উপস্থিতির খবর সে এই প্রথম শুনলে।

তাকে এই অবস্থায় বসিয়ে রেখে মুকুল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একা-একা বসে দেবজ্যোতি ভাবছে,—সে কিছুই জানে না। তার তুলনায় মুকুলের বাস্তব অভিজ্ঞতা অনেক বেশী! মঙ্গলার মতো মেয়েদের যে কঠিন বাস্তবের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয় সেই নিষ্ঠুর বাস্তব এই মানিকপুরের বুকে জীবন্ত, জাগ্রত—সে আপন মাশুল আদায় ক'রে চলেছে।

এক সময়ে মুকুলের শাশুড়ী ললিতের মা এসে ঘরে ঢুকলেন—ও মা, আমার

কি হবে, গুরুঠাকুর এই আঁধারে বসে রয়েছে একলা। আক্কেলকে বলিহারি, আলোটাও জ্বেলে দিয়ে যায় নি।

ইলেকট্রিক আলোর ঝলকে দেবজ্যোতির মনোলোক যেন অতলে ডুবে গেল। সে উঠে দাঁড়িয়ে গোবিন্দবাবুর স্ত্রীকে প্রণাম করল—কেমন আছেন কাকীমা?

—আর বাবা, আমাদের আর থাকা! তিনি পায়ে ঠাঁই দিলেই যাই। কতোকাল পরে তোমাকে দেখলাম। বেঁচে-বর্তে থাকো সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করো! আর সুখের কথা কি বল্‌ব বাবা, সবই কপাল—এই ললিত, কতো ক'রে মুখে রক্ত তুলে যা হোক খুদকুঁড়ো খুঁটে খাচ্ছিল। তা মুখ-পোড়াদের চক্ষুশূল।—মিথ্যে জাল-জুচ্চুরীর বদনামে জড়িয়ে বাছাকে আমার এমন বিপদেই ফেল্‌লে যে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এখন আবার নতুন ক'রে অ-আ-ক-খ শুরু করেছে! কী যে বলি! ছেলেটার হাল দেখলে কষ্ট হয়। সেই সাত সকালে বেরিয়েছে, ফিরবে কখন তার ত ঠিক নেই!

মুকুল ঢুকে আলমারী থেকে একজোড়া সৌখীন কাপ ডিশ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আড় চোখে গোবিন্দবাবুর স্ত্রী দেখলেন, বললেন—অ বৌমা, ওগুলো আবার কেন বার করা, এখুনি তোমার দস্যি ছেলে ত চুরমার করবে বাপু। গুরুঠাকুর আমার ঘরের ছেলে, ওকে গেলাসে ক'রে চা দিলেই বা কি ক্ষেতি। নাকি তুমিই বলো না বাবা?

তিনি দেবজ্যোতির দিকে সমর্থনের আশায় তাকালেন। দেবজ্যোতি কিছু বলবার আগেই মুকুল জোরে জোরে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মুখ বাঁকিয়ে গোবিন্দবাবুর স্ত্রী বল্‌লেন—দেখলে ত বাবা! দিনরাত এই রকম অপমান সইতে হয়। ভালো কথা বললেই বিবি ব্যাজার। আরে বাপু, থাকলে তোদেরই ত থাকবে। আমার কী!

দেবজ্যোতি অসহায় ভাবে বলে—এ সবের কোনোই দরকার ছিল না। মল্লিকা বেচারীর এতক্ষণে কী যে হচ্ছে তার ঠিক নেই! আমি এলাম ওকে খবর দিতে—

—মল্লিকার আবার কি হয়েছে, কই কিছু ত শুনি নি! অ বৌমা—

বল্‌তে বল্‌তে মুকুলের শাশুড়ী বেরিয়ে গেলেন। বারান্দায় পা দিয়ে কাকে যেন বললেন—আ মরণ এখেনে দাঁড়িয়ে কেন! যাও না, মামা বসে রয়েছে ঘরে। মিষ্টি খাবার জন্যে আবদার করবে তাতেও লজ্জা! খুড়তুতো-পাড়াতুতো নয়, সত্য আপন মামা—ঢঙ্‌ ঢ্যাখ না। যা, যা,—

তাঁর কণ্ঠস্বর যেন নিক্তিতে ওজন করা, চাপা হ'লেও দেবজ্যোতির কানে পৌঁছবার মত জোর তাতে রয়েছে। অপর পক্ষের সাড়া শব্দ নেই। আবার গোবিন্দবাবুর স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়—হবে কি ক'রে, এলে গেলে মানুষের কুটুম। তা সে সব পাট ত নেই। ঠেকায় পড়েছে, তাই এসেছে। কী কালই যে হ'লো। মায়ের বড় ভাই মামা, তা ত্যাখো—

দেবজ্যোতির ইচ্ছে করে ছুটে বেরিয়ে যেতে। যেন কোন বন্ধ বন্দীশালাতে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। না, তার চেয়েও সাংঘাতিক কিছু—যেখানে এক বিন্দু বাতাস নেই, আলো নেই, কিছু নেই এমনই অকল্পনীয় এই পরিবেশ। কিন্তু পালাবার কোনো পথ নেই। তার পায়ে কে যেন বেড়ী দিয়ে আটকে রেখেছে। যেখানে দু-দণ্ড বসে থাকতে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে সেইখানে মুকুলের ছেলেমেয়ে মানুষ হচ্ছে! ওরা বড় হয়ে কি ধরনের মানুষ হবে!

এক হাতে হালুয়ার প্লেট আর এক হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে মুকুল এসে যেন দেবজ্যোতিকে বাঁচালো। বলল—দাদা, দেখছ ত অবস্থা! একদিনে আর কি দেখবে, নিত্যই লেগে রয়েছে। সব সময় টিকির-টিকির, পাগল হয়ে যাবার দাখিল। নেহাৎ আমার মত শক্ত মেয়ে, বাবার হাতের পিটুনীতে কঠিন জান—তাই সয়ে যাচ্ছে। অন্য মেয়ে হলে কবেই পাগল হয়ে যেত। নাও—

দেবজ্যোতি চিত্রার্পিতের মত বসে আছে।

মুকুল আবদারের সুরে বলে—গরীব বোনের ওপর রাগ করো না দাদা! এটুকু না খেলেই চলবে না। কতোকাল পরে যে তুমি এলে—কিছুই দিতে পারলাম না।

বলতে বলতে মুকুলের চোখ অশ্রু ছলছল হয়ে আসে।

দেবজ্যোতি হাসলো, অনেক কালের পুরনো একটা হাসি যেন হঠাৎ সে

ফিরে পেয়েছে মুকুলের আন্তরিকতার ছোঁয়ায়। সে বল্‌ল—তাহলে কিছুই বদলায় নি, নারে মুকুল ?

বুঝতে পারে না মুকুল, বলে—কি বদলাবে ?

—না কিছুই বদলাবে না হয়তো! এই যে এত কাণ্ড, ষ্ট্রাইক বলো, এওয়ার্ড বলো, কিছুতেই কিছু হয় নি। মানিকপুর ভেতরে সেই মানিকপুরই থাকবে। মিথ্যে সবাই ভেবে মরছে!

মুকুল তবু বুঝতে পারে না—ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে দেবজ্যোতির আয়ত চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কখন যে মুকুলের কোলের ছেলেটি দেবজ্যোতির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে দেবজ্যোতি বা মুকুল দুজনের কেউই টের পায় নি। ছেলেটি হঠাৎ আদো-আদো স্বরে বলে—মামা! মামা! আপনি হালুয়া খাচ্চো না ত্যানো ?

মুকুল চম্‌কে উঠে ভ্রূকুটি ভরা দৃষ্টিতে ছেলেকে বল্‌ল—এসে জুটেছ ঠিক! যাঃ দূর হ হ্যাংলা কোথাকার!

দেবজ্যোতি ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিয়ে মুকুলকে বকলো—ছিঃ মুকু! অমন বলে না। ওদের দোষ কি!

তারপর ছেলেটির মুখে খানিকটা হালুয়া তুলে দিয়ে বল্‌ল—মামা খাও!

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ছেলেটি মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে—ছাখো মা, আমি চাই নি। আমি চাই নি। মামা জোর ত'রে দিচ্ছে! ছাখো—

—খাও বাবা, তুমি লক্ষ্মী ছেলে, মামা দিলে খেতে হয়। যা-যা মুকু তুই তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে।

—তৈরী হবার আছে কী। দোল-দুর্গোচ্ছব ত নয়! পোয়াতী দেখতে কি বেনারসী বার করতে হবে নাকি। নাও, চাটুকু আর জুড়িয়ে বরফ করো না! পরমেশ তোমার হালুয়া খাওয়া হয়েছে, এবার নামো!

ছেলেকে নামিয়ে নিল মুকুল।

—তোর আর সব ছেলেরা কোথায় রে ?

—কি জানি, সময় হলেই আসবে। তাদের পাত্তা পাওয়া দায়! খাবার

সময় হাজির হবে। লেখাপড়ার নামে ঘণ্টা। আমি একা আর কতদিক সামলাবো! যার ছেলে সে-ই যদি না ছাখে ত আমার কী!

—আরতির খবর কী?

—তার কথা আর কি বল্‌ব। সুখে আছে। নাও চলো।

—চল্‌।

ব'লে দেবজ্যোতি উঠে পড়ল।

পথে পা বাড়াতেই পরমেশ ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল। বল্‌ল—আমি যেতে চাইনি মা, ঠাৎমা না, বল্‌ল মারবে! আমি মার খাবো না মা, আমি যাবো!

মুকুল কিছু বলবার আগেই দেবজ্যোতি পরমেশ্বরের হাত ধরল—চলো, চলো মামা! ঘুম পাবে না ত?

একগাল হেসে পরমেশ বল্‌ল—এট্টুও ঘুম পায় না আমার। বাবা যখন আথে, বাবা যখন মাতে দুম্-দুম্ মারে তখনও আমি ঘুমোই না।

মুকুল বলে—থামো, তোমাকে আর বাহাদুরী ক'রে বাপের গুণগান করতে হবে না।

দেবজ্যোতি বুঝতে পারে মুকুল যেন কিছু একটা লুকোতে চাচ্ছে তার কাছ থেকে। এখন আর ওসব নিয়ে কালক্ষেপ করতে ইচ্ছে নেই দেবজ্যোতির। সে মুখ বুজে পথ চলতে লাগলো।

পথে আলো জ্বলেছে, লোকের ভিড় নেই। কেবল এক একটি মোড়ে ছেলে ছোকরার জটলা। আশপাশের বাড়ী থেকে কোথাও বা গানবাজনার সুর ভেসে আসছে।

চল্‌তে চল্‌তে দেবজ্যোতি ভাবছিল মুকুলের জীবনের কথা। বেচারী বড়ই অবহেলিত। শ্বশুরবাড়ির চেহারাতে সুখের শান্তির চিহ্নমাত্র নেই। গোবিন্দ মুখুয্যের বাড়ির সঙ্গে দীনদয়ালের বাড়ির ছবির কোথাও মিল নেই। অথচ দুটি পরিবার এই একই মানিকপুরে রয়েছে।

অবশ্য দীনদয়ালের বাড়ির কথা আলাদা, মানিকপুরের বেশিরভাগ পরিবারের ভেতরের চেহারা ওই মুকুলের শ্বশুর বাড়ির মতো। দেবজ্যোতি রীতিমত দমে গিয়েছে। এতদিন সে কেবল ইউনিয়ন করেছে, মালিকের সঙ্গে

শ্রমিকের ঝগড়াতেই নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছে। নিজের প্রতিবেশীর ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাসহবতের কথা মনেও পড়ে নি!

দীর্ঘনিশ্বাসটুকু বুকের মধ্যেই থমকে দাঁড়ায়।

ওদিকে ইউনিয়নের ক্ষমতায় শক্তিবান শ্রমিকদের উন্মত্ত মনোভাব। তারা এখন দিন কিনে নিয়েছে। কাউকে গ্রাহ্য করে না। তারা জানে, যেমন উপরওয়ালারা কর্তৃত্বের মুগুর দিয়ে শ্রমিককে দাবিয়ে রেখেছিল, এবার তেমনি মজদুরের জমানা এসেছে—তারা চোখ রাঙিয়ে মাথা উঁচিয়ে ইচ্ছামত চলতে শুরু করেছে। সামঞ্জস্য বজায় রাখার কথা কেউ কি ভাবে? এদিকে হাজার হাজার পরিবারের ছেলেমেয়েরা অনিয়ম বিশৃঙ্খলার মধ্যে বেড়ে উঠছে। এদের পথ দেখাবার, মানুষের মতো মানুষ করবার কথাও বোধ হয় কেউ চিন্তা করে না।

সহসা পরমেশের একটা কথায় দেবজ্যোতির চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়।

পরমেশ বল্‌ল—মামা, ও মামা, আপনি তোলে নিতে পারো না! আমি যে ছোত ছেলে।

মুকুল ধমক দেয়—ছোট ছেলে ত এলি কেন? আবার আবদার হচ্ছে!

—আসবো, বেশ তরব! ঠাংমা নইলে মারবে যে—ইঃ!

দেবজ্যোতি পরমেশকে কোলে তুলে নিল। তারপর পরমেশ নিজের মনে বকতে শুরু করল—মামা তুমি দুষ্টু তরবে না, তাহলে ভূতে ধরে,—আচ্ছা মামা ভূতের মা ত্যামোন? দুম্ দুম্ মারে!

কচি মুখে বিচিত্র উচ্চারণ ভঙ্গিমা দেবজ্যোতির সমস্যাপীড়িত মনকে যেন খানিকটা অন্যমনস্ক ক'রে দেয়।

দীনদয়াল পায়চারী করছিলেন অমলের কোয়ার্টারের সামনের পথে। ওদের দেখে তিনি বল্‌লেন—এ্যাম্বুলেন্সের কি হ'ল দেবু?

জবাব দিল মুকুল—দাঁড়ান কাকামণি আমি দেখি আগে, তারপর গাড়ির কথা ভাবা যাবে।

—বেশ-বেশ তাই ত্যাখো মা। এসব তোমাদেরই ব্যাপার, তুমি বুঝবে ভালো। মিণ্টুর কথা ছেড়ে দাও, বয়েসই হয়েছে—অভিজ্ঞতা কিছু নেই ত!

কথাটা দীনদয়াল সাধারণ ভাবেই বল্লেন। দেবজ্যোতির তবু মনে হয়, এর মধ্যে কোথায় একটা বেদনার আর্তি লুকিয়ে রয়েছে।

মুকুল ভেতরে চলে গেল। দীনদয়াল দেবজ্যোতির সঙ্গে পথেই দাঁড়িয়ে কথা কইতে লাগলেন। জ্যাক্‌সনের আফিসে যে হাঙ্গামা হয়েছে তাতে নাকি উপরমহল খুব ক্ষেপে গিয়েছে। এর একটা বিহিত তারা করবেই। নানান জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে!

এমন সময়ে অমল এসে পড়ল। তাকে দেখে দীনদয়াল বল্লেন—কী, বাবাজী এমন অসময়ে যে? ছুটি নিয়েছ, তা ভালোই করেছ!

অমল হাসতে হাসতে জবাব দিল—না, ছুটি নিতে হয় নি! ওর শরীরটা খারাপ, তাই এক ফাঁকে বেরিয়ে এলাম। ব্যবস্থা করে এসেছি টিকিট একজন পাঞ্চ করিয়ে রাখবে।

দেবজ্যোতি মুখে কিছু বল্ল না। সে জানে, হামেশাই আজকাল বহু লোকে এই বন্দোবস্ত ক'রে থাকে। টাইম অফিসের বাবুরাও কিছু বলে না। যে যখন খুশী কারখানা থেকে বেরিয়ে আসে, অন্যের কাছে গোল চাকতিটা দিয়ে বল্লে আসে—ভাই আমার টিকিট খানা পাঞ্চ করিয়ে নিয়ো যাবার সময়। আবার এরকমও সে শুনেছে যে, ডিউটির সময়ে বাইরে বেরিয়ে অনেকে অন্য কাজ ক'রেও উপরি রোজগার চালাচ্ছে। লোক হাজির না হ'লেও তাদের হাজিরা বজায় থাকে—মজুরী তারা পায়।

অমল বল্ল—কেমন আছে?

—যাও গিয়ে ত্থাখো না। কষ্ট পাচ্ছে খুব।

দীনদয়াল বল্লেন।

দেবজ্যোতি বল্ল—মুকু এসেছে, মিণ্টু রয়েছে!

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অমল একটু হাসল—তবে আর ভাবনা কি, দিদি যখন এসে পড়েছেন—!

পরক্ষণে অমল বল্ল—তা আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে কেন? চলুন ভেতরে যাওয়া যাক!

দীনদয়াল বল্‌লেন—তোমরা সবাই ত রয়েছ—এই ফাঁকে আমি একটু ঘুরে আসি। কি বল।

—আচ্ছা।

ততক্ষণে মুকুল তার স্বভাবসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের জোরে ভেতরের আবহাওয়া খানিকটা আয়ত্তে এনেছে। এমন সময়ে দেবজ্যোতি আর অমল ঢুকল।

মল্লিকার যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে, মুকুলকে বল্‌ল অমল—কেমন বুঝছেন দিদি?

—ভালোই দেখছি ভাই! এটা পালটের ব্যথা। অধৈর্য হ'লে চল্‌বে কেন? আসল ব্যথা উঠ্‌লে পোয়াতী এতক্ষণে কেঁদে ককিয়ে পাগল হয়ে যেতো।

মল্লিকার যন্ত্রণার মেঘ ঢাকা মুখে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটু হাসি খেলে যায়। ও ক্লান্ত স্বরে বলে—তুমি বেশ বল্‌ছো দিদি, আমি বলে যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি।

—ও লো থাম! যন্ত্রণার এখনই হয়েছে কী। নেড়েচেড়ে ত দেখলাম সবই।

দেবজ্যোতি অতশত শুনতে চায় না, বলে—তাহলে কি বল্‌ছিস্? হাসপাতালে যাওয়ার দরকার হবে না এখন?

—আমার ত তাই মনে হয়। আর হিসেবও যা শুনলাম তাতে পনেরো দিন হাতে আছে।

মল্লিকা লজ্জায় মুখ লুকিয়ে বলে—আঃ কি হচ্ছে দিদি?

অমলও কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে মুকুলের এই স্পষ্ট আলোচনার ধরনে। মিণ্টু এক ফাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে।

পরমেশ মামার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে—মাছির তি হয়েছে! অসুথ তরেছে?

দেবজ্যোতি হাসতে হাসতে বলে—হ্যাঁ, মাছির একটা খোকা হবে তোমার মতো!

মুকুল যেন কথাটা লুফে নেয়, বলে—হ্যাঁ খোকা হচ্ছে আর কি! ওর যেরকম ঢলোঢলো মুখের ফের দাঁড়িয়েছে, পেটে নির্ঘাত মেয়ে আছে! আমি

বাবা জানি, যখনই ছেলে পেটে এসেছে তখনই শুকিয়ে আম্‌সী হয়ে গিয়েছি। আর এই অনীতা-গীতা ওদের প্রত্যেকেরই মেয়ে হয়েছে—ওরা পোয়াতী কালে দেখতে কেমন সুন্দর হয়েছিল!

মল্লিকা ভর্ৎসনার সুরে বলে—ব্যাখ্যানা রাখ তো দিদি।

পরমেশ বল্‌ল—ছ্যাখো মামা, মাছির ধরের আলোটা ত্যামোন অন্ধকার! এট্টুও ভালো না।

মল্লিকা হেসে বলে—ওরে বড়লোকের ব্যাটা! আমাদের ঘরের আলো অন্ধকার!

অমল বল্‌ল—বাঃ, রোগী এখন ত বেশ ভালোই রয়েছে। তাহলে মিণ্টু আমাদের জন্যে একটু চাও করতে পারে ত!

মুকুল হাসতে হাসতে বল্‌ল—হ্যাঁ-হ্যাঁ! আর একটু পরে নিজেই ও চা দিতে পারবে। কি রে মল্লি পারবি নে?

অমল হাল্কা সুরে জের টানে—দিতে না পারলেও খেতে পারবে, দেখুন না।

পরমেশ গম্ভীরভাবে দেবজ্যোতিকে প্রশ্ন করে—ও মামা, মাছির ছেলে হ'ল না? তখন হবে ছেলে!

এ কথায় সকলে এক সঙ্গে হেসে উঠল।

মিণ্টু ছুটে ঘরে ঢুকে বল্‌ল—কি হ'ল তোমরা সবাই হাসছো যে!

একমাত্র পরমেশই ওদের হাসিতে যোগ দেয় নি। সে রীতিমত চটে গিয়েছে। কেন এরা সবাই তার কথায় এমন ক'রে হাসলো? কি জানি কেন মিণ্টুর দিকে তাকিয়ে সে ওকে নিজের পক্ষের লোক ভাবলো—এবং দেবজ্যোতির কোল থেকে নেমে মিণ্টুর কোলঘেঁষে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—ছ্যাখো ওরা সব্বাই ত্যানো হাসছে! সব দুষ্টু, ধর্‌বে ভূতে, হ্যাঁ!

মুকুল ধমক দিল—যতো সব অলুক্ষুণে কথা। রাম-রাম রাম-রাম!

মিণ্টু পরমেশকে কোলে নিয়ে বল্‌ল—তুমি খুব ভালো ছেলে, তাই না! তোমাকে একটা জিনিস দেবো।

পরমেশ খুশী হয়ে বলে—আচ্ছা! তা'লে তুমি আমার ভাই—আমরা দুটি ভাই এ্যাঁ।

আর একদফা হাসির রোল ওঠে।

মল্লিকা বল্‌ল—উঃ, আমাকে আর হাসিও না বাবা—বড্ড কষ্ট হচ্ছে কিন্তু।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—এই, যাও চা করো তো একটু!

অমল মুচ্‌কি হেসে বলে—'এই' কি কথা, বলুন ওগো—।

মিণ্টু ভ্রূ-বাঁকিয়ে বলে—আমাদের 'এই' দিয়েই চলে যাবে, ওগো-টোগো আপনাদের জন্যেই থাক।

মুকুল বল্‌ল—চল ভাই মিণ্টু তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, কতদিন পরে যে দেখা হ'ল! ভাগ্যে মল্লির ব্যথা উঠেছিল।

মল্লিকা বল্‌ল—দাদা তোমরা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, বসো না।

অমল হাসলো—দাদা বসবেন, কিন্তু আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই। যাই, চাটুকু খেয়ে আবার কারখানাতে ফিরে যাই। যখন তোমার কিছুই হলো না তখন আর ফাঁকিটা দিই কেন।

কথাটা মল্লিকার আদৌ মনঃপুত হ'ল না, ও বল্‌ল—যাবেই যদি ত এলে কেন মিছেমিছি।

—তোমাকে দেখতে!

—আহা, ঢঙ্‌! বলেই ত দিয়েছিলাম যে, আমার জন্যে ভাবতে হবে না। তুমি তোমার রবিনসন সাহেবের ডিউটি বজায় রাখো তাহলেই চল্‌বে।

—ছাখো মোলু মিছে বক্‌ছো! তখন কতো ক'রে বল্‌লাম যে, মাকে চিঠি দিই চলে আসবার জন্যে—তা মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করলে! আর এখন বল্‌ছ কারখানা কামাই ক'রে তোমার শিয়রে বসে থাকি। আহা, তা নয় রইলাম—কিন্তু আমি যে নার্সিং টার্সিং কিছু জানি নে। তা ছাড়া এখন ত হরদম টাকার দরকার। ইয়ে,—

মুকুল ঘরে এল চায়ের কাপ হাত ক'রে। অমলের শেষ কথার সুর ধরে বল্‌ল—আচ্ছা ভাই অমলবাবু, আপনাকে আর বকুনী খেতে হবে না, নার্সিংএর চাকরীও নিতে হবে না। আমি ত মরি নি! আর মল্লিকা যখন পোড়াকপালী বড়বোনকে মুখ ফুটে ডেকেছে তখন ত সব হাঙ্গামা মিটেই গিয়েছে। এখন এই আমি জেঁকে বসলাম, আঁতুড় তুলে দিয়ে তবে নড়ছি!

খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে অমল একগাল হেসে বল্‌ল—দাঁড়ান আপনার হাত থেকে কাপ নেবার আগে এক খাব্‌লা পায়ের ধুলো নিই। এমন মানুষ আপনি, আহা আপনার ছোট বোন যদি এর অর্ধেক গুণও পেত।

সত্যিই অমল গড় হয়ে প্রণাম করল। মুকুলের হাতে চায়ের কাপ, বাধা দিতে পারল না, মুখে বল্‌ল—আহা ওকি করেন, না, না, না! ব্রাহ্মণ—

অমলের দিকে তাকিয়ে মল্লিকা হাসতে হাসতে বলে—দেখো অতি ভক্তি ভালো নয়!

জবাব অমলের ঠোঁটের ডগায় জোগানো ছিল যেন, সে বল্‌ল—কী যে বলো! দিদি হচ্ছেন আসল জহুরী; কাঞ্চন ফেলে কাঁচ কি ছোঁবেন ভেবেছ!

কথাটা যত হাল্কা সুরেই অমল বলে থাকুক না কেন, তার পরিণতি বড় গভীর হয়ে দাঁড়ায়। মল্লিকা যেন ভুলে যাওয়া প্রসববেদনার পুনরাবির্ভাবের যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত ক'রে পাশ ফিরে শুলো। মুকুলের মুখে গভীর বিষণ্ণতা নেমে আসে। একটা দীর্ঘনিশ্বাসকে চাপতে গিয়েও পারল না মুকুল, তার ফলে দীর্ঘতর হয়ে পড়ল নিশ্বাসের রেশটুকু। ও বল্‌ল—কাঞ্চন মনে ক'রে কাঁচই কুড়িয়েছি ভাই। সে যাক, ওসব কথা আর কেন!

মল্লিকার দিকে নজর পড়তেই মুকুল ব্যস্তভাবে বল্‌ল—কি রে মল্লি, আবার কি হ'ল। কষ্ট হচ্ছে নাকি?

সাড়া দিল মল্লিকা—উঁ—! হুঁ—

—চা খাবি নে? কিছু লঘুপাক খাবার খেয়ে নে ভাই। এ সময়ে খালি পেটে থাকলেই বেশি কষ্ট হয়।

মিণ্টু আর একদফা চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বল্‌ল—আমি ভাই কতো করে বলেছি, কিছুতেই কিছু খাবে না।

মুকুল বল্‌ল—না, না, খেতে ত ইচ্ছে করবে না। কিন্তু জোর ক'রে খেতে হবে।

ক্ষীণ সুরে মল্লিকা বলে—আমি পারবো না খেতে, মিথ্যে কেন জোর করছ তোমরা!

মুকুল মিনতির সুরে বলে—তোমার কথা ত নয় বোন, পেটে যেটা রয়েছে

তার কল্যাণের কথা মনে করেই খেতে হবে ভাই। এখন তুমি ত আর একলাটি নও, সব সময় ওই পেটেরটার কথা মনে রেখে চল্‌তে হবে, বুঝলে!

পরমেশ হাসে—মাছি বুঝি দুধ বার্লি খেতে পারছে না। অসুখ তরেছে তি তরবে বলো মাছি, খাও নক্ষি ছেলে!

আবার ঘরের হাওয়াটা হাল্কা হয়ে গেল। মল্লিকা এক ঝট্‌কায় উঠে বসল—আয়, আমার কোলে আয়, টুন্‌টুনি পাখি! কথার জাহাজ!

আশি

পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট পার্টি সরকারী অভিশাপে নির্বাসিত! নির্যাতন চল্‌ল অনেক। সক্রিয় কর্মী যাঁরা বিপ্লব প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে ধ্বংসমূলক কাজে ছেলেছোকরাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন, তাঁদের অনেকেই বন্দী। বাকী যাঁরা সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা মাটির তলায় চলে গেলেন—অর্থাৎ গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

সেদিন দেবজ্যোতিদের কোয়ার্টারেও পুলিস হানা দিয়েছিল—দেবিকার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা রয়েছে। দেবিকা বাড়িতেই ছিল তবু তাকে পুলিস ধরতে পারল না। ওয়ারেণ্টে একটা ভুল ছিল,—ওয়ারেণ্ট ছিল দেবকী মুখার্জির নামে অতএব সীতানাথ এবং দেবজ্যোতির চোখের সাম্‌নে দেবিকাকে ঢাকা কালো গাড়িতে উঠতে হ'ল না। তবে এও ঠিক যে, পুলিস আবার আসবে, ভুলটুকু শুধ্‌রে নিয়ে। ইত্যবসরে দেবিকা গা-ঢাকা দিল।

দেবজ্যোতির খুব হাসি পায়। দেবিকার মতো মেয়ে নাকি স্বদেশী মন্ত্রীদের গদি কাঁপিয়েছে! এ কথা কল্পনা করবে কি ক'রে দেবজ্যোতি। কতটুকু জানে, কি বোঝে দেবিকা? এই সব নিরীহ মানুষকে এত ভয় কি জন্যে? সত্যি কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড কিছু একটা করার ক্ষমতা এদের আছে? নাকি, নিছক আতঙ্কের বশে কংগ্রেসীরা এদের পিছনে পুলিস লেলিয়ে দিচ্ছে!

ক'দিনই বা দেশের হাতে স্বাধীনতা এসেছে! এরই মধ্যে দেশের একদল লোক অপর দলকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে। শুধু অবিশ্বাসই নয়, শত্রুতার চরমে পৌঁছেচে, নইলে সরাসরি জেলখানায় আটক ক'রে দাবানোর চেষ্টা হ'ত না। অথচ দেশের মানুষ ত এরা সবাই। ইংরেজের আমলে এরা সকলেই বিদেশী শাসনের বিপক্ষে সংগ্রাম ক'রে এসেছে। ইংরেজ যেই চলে গিয়েছে—অমনি প্রশ্ন উঠেছে অধিকারের। কংগ্রেসের আধিপত্য কমিউনিস্ট পার্টি মানবে না। এ স্বাধীনতা নাকি মিথ্যে, ভুয়ো!

দেবজ্যোতি বুঝতে পারে না, সত্য কোথায়! নিজেকে কোনো জবাব সে দিতে পারে না। তবু যখন মনে পড়ে যে, দেবিকার মতো সাধারণ মেয়ে, যার চরিত্রে এমন কোনো সমাজবিধ্বংসী মারাত্মক সম্ভাবনা নেই, তাকেও পুলিসের ভয়ে অভিযুক্ত দাগী ফেরার আসামীর মতো দিনরাত লুকিয়ে লুকিয়ে ফিরতে হচ্ছে,— তখন দেবজ্যোতি প্রতিবাদে মাথা নাড়ে। কোথায় যেন মস্ত একটা ভুল হচ্ছে।

কলকাতা থেকে অমলা এসে পৌছলো। দীনদয়ালের বাড়িতে অমলা আশ্রয় নিয়েছে। ছেলেকে সঙ্গে আনে নি, কি জানি কখন কি হয় বলা ত যায় না।

অমলাকে দেখে দেবজ্যোতি প্রথমে বিস্মিত হয়—তার চেয়ে খুশীই হয়েছে বেশি। অনেকদিন পরে যেন এক আত্মীয়ের সাক্ষাৎ পেয়ে দু'টো মনের কথা বল্‌তে সাধ হয় তার। কতকাল যে নিজের মধ্যেই নিজেকে আটক রেখেছিল আজ হঠাৎ মুক্তির সন্ধান পেল। মুক্তি আর কি, মন খুলে কথা বলতে পাওয়া —আর এমন লোকের কাছে বল্‌তে পাওয়া যে তার কথা বুঝবে ব'লে দেবজ্যোতির বিশ্বাস। মনে পড়ল সেই কলকাতায় যাওয়ার কথা। সে দিন অমলা রিক্ত, অবসন্ন, সহায়সম্বলশূন্য হ'য়ে মানিকপুর থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। আজ আবার সেই মানিকপুরেই আশ্রয় নিতে ফিরে এল। কিন্তু যে মানুষটা চলে গিয়েছিল এ যেন তার চেয়ে অনেক দিক দিয়ে আলাদা—তবু একটা জায়গায় অমলা সেই পুরনো অমলাই রয়েছে। ঠাকুরপো ব'লে পুরনো সুরেই দেবজ্যোতিকে ডেকেছে অমলা।

সাড়া দিতে দেবজ্যোতির একটুও দেরি হ'ল না—কি বৌদি!

—ভালো আছো? কতোকাল তোমাকে দেখি নি।

এ কণ্ঠস্বরে অভিযোগ নেই, আছে বেদনা।

দেবজ্যোতি বলে—এখন থাকছেন ত?

—হ্যাঁ ভাই, তোমাদের বিয়ের নেমতন্ন খেতে এসেছি!

বলেই অমলা হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে নিজেকে যেন বাড়িময় ছড়িয়ে দেয়।

ছচল্লিশ

—ওরে গোকুল একটা মোড়া পেতে দে, সাহেবসুবো এসেছেন,—ভালো করে খাতির-যত্ন না করলে চাকরী গন্!

অবিনাশ সাইকেলখানা দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে মাথার টুপী খুলে একটু হাসলো—ঠাট্টা ইয়ার্কি নয় হে, সত্যি চাকরীর গোড়ায় ঘুন ধরেছে তোমার।

দত্তগুপ্তর পরিহাস-উজ্জ্বল মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে আম্‌তা-আম্‌তা করে বল্‌ল—তা, তোমরা ভাই এখন প্যাঁজ-পয়জারের মালিক। রাখতেও তোমরা, মারতেও তোমরা। এক গেলাসের এয়ার বলে ত কারখানাতে কাঁধে হাত দিয়ে চলি নে। দস্তুরমতো তোমার চেয়ারের সাম্‌নে, একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এত করেও যদি মন না পাওয়া যায় তবে নাচার।

অবিনাশ প্যাণ্টের ক্লিপ খুলে মোড়ার ওপর চেপে বসল।

দত্তগুপ্ত ঘর থেকে সিগারেটের প্যাকেট এনে অবিনাশকে দিয়ে নিজে বিড়ি ধরায়।

অবিনাশ প্যাকেটটা ফেরৎ দিয়ে বল্‌ল—ধোয়া সুতোর খাকীই একটা দাও, অনেকদিন বিড়ি খাই নি।

—আর ভাই, তোমাদের এখন পাইপ ধরবার ইজ্জৎ। তা বিড়ি খাবে কোন্ দুঃখে!

—ছাখ্ অদ্ভুতো, তোর এই ঠেসমারা আর ভালো লাগে না। তুই ত কেবল আমার উন্নতিই দেখ্‌লি, তার চাঁটটা ত টের পাস নে! বেশ আছিস—

—হ্যাঁ, ভালোই আছি। এতো বছর ধরে ঘসে ঘসে শালা এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ফোরম্যানও হতে পারলাম না। দু-টাকা চোদ্দ আনাতে কায়েম হয়েছি আজ তিন বছর, তার এক আধলাও বাড়লো না। এদিকে মাথায় টাক পড়ল, চুলে পাক ধরল, বৌটা দেশে পড়ে থেকে মরচে ধরল। একখানা ঘরেব খুপরীও

কপালে জুটল না। বছরে একবার ছুটী নিয়ে তিন হপ্তার মেয়াদে গেরস্থ-সুখ পুইয়ে আসি—বেশ আছি।

অবিনাশ পোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিক্ত হাসি হেসে বলল—নিজের দুঃখু আর পরের দৌলত, সবাই বেশি ছাখে রে! আমার কথা যদি শুন্‌তিস ত তোরও করুণা হ'ত।

—থাক ভাই, তোর সুখে বাদ সাধবার মতো ছোট নজর আমার নয়। তাই ত পাঁচ জনের কাছে বড়াই করে বলি, হ্যাঁ রাইজ্‌ করল বটে অবিনাশ। এলো যখন হ'টে ক্যাংলার মতো ত্যানা পরে, আর এখন ছাখো এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার। আমি ত জানি যে, তুই স্রেফ নিজের পায়ের জোরে চড়্‌-চড়্‌ করে ওপরে উঠেছিস—ব্যাকিং নয়, ফক্কিবাজী নয়—দস্তুর মতো সেল্‌ফ্‌-মেড্‌ ম্যান। হাঁ একেই বলি, পুরুষস্য ভাগ্যং।

অবিনাশ হো-হো করে হাসতে শুরু করল—বেশ বলেছিস মাইরি!

দত্তগুপ্ত হাসলো না, তার কাছে এসব হাসির কথা নয়। কতকাল পরে অবিনাশ চাটুজ্যে বাদামতলার মেসবাড়িতে এসেছে। আর ত কারুর কাছে আসে নি, দত্তগুপ্তর কাছেই এসে বসেছে—কেন, না, পুরনো বন্ধু। পাঁচজনে দেখুক, বুঝুক একবার যে, মানিকপুরের ওপর মহলের সঙ্গে দত্তগুপ্তর দহরম-মহরম কি পরিমাণ! আজ কোথায় গেল সেই ডাঁটিয়াল সুবল ছোক্‌রা! ওরকম হ্যাংলার মতো ফার্স্ট স্টাফেদের দরজায় ধন্না দেওয়া দত্তগুপ্তর স্বভাবে নেই। তার কাছেই কুশল-প্রশ্ন করতে আসে স্টাফের লোকে। আরে বাপু তেল দেবার মতো খাটো রুচি থাকলে কি আর এই শর্ম্মা বাদামতলার মাহুরে পড়ে থাকতো!

অবিনাশ বল্‌ল—এবার উঠ্‌বো ভাই!

—সে কি হে, এককাপ চা না খেয়ে ত যাওয়া হতে পারে না! তা ছাড়া বড়বাবু এখনো ফেরেন নি, তাঁকে একবার ছাখা না দিয়ে যাবে, সে কি হয়?

—না ভাই দেরী করতে পারবো না, ওয়াইফ আবার চটে যাবে। আর ভাই বলো না, তার দাপটে কি নড়াচড়া করার উপায় আছে? নেহাং তোমার কাছে জরুরী দরকার, তাই কারে পড়ে এসেছি।

দত্তগুপ্ত আত্মপ্রসাদে ফুলে উঠ্‌ল—তোমার দরকার আমার কাছে? বেশ, বেশ,—

অবিনাশ বল্‌ল—ঠিক আমার নয়, ব্যাপারটা তোমাকে নিয়েই। মানে একটু বুঝে সমঝে চলা দরকার হে!

—তার মানে!

দত্তগুপ্ত ঘাব্‌ড়ে গেল।

—মানে-টানে জানি নে। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছি, তোমার পেছনে কাঠি দেবার জন্যে লোক লেগেছে। সাহেবের দপ্তরে কন্‌ফিডেন্সিয়াল নোট্‌ গিয়েছে, তুমি নাকি তলে তলে কারখানার মধ্যে, বাইরেও স্বদেশী আন্দোলনের আগুন ছড়াচ্ছ! আজকাল যে রকম হাল হয়েছে, তাতে ভাই ভয় পাবারই কথা। একটা ছুতো-নাতা করে চার্জশীট দিতে আর কি লাগে! চোখের ওপর এরকম ত আকছার হচ্ছে ভাই! তা ভাবলাম তোমাকে একটু হুঁশিয়ার করে দিয়ে আসি।

বলেই অবিনাশ উঠে দাঁড়ালো।

দত্তগুপ্ত তার হাত ধরে বল্‌ল—মাইরি তোর গা ছুঁয়ে বল্‌ছি, আমি ভাই সাতে পাঁচে থাকিনে। ছা-পোষা মানুষ, নিজেরটুকু নিয়েই মশ্‌গুল থাকি। কোনো গোলমালে কি তুই কোনোদিন দেখেচিস আমাকে, বল্‌!

—আহা, সে নয় আমি জানি। কিন্তু একবার রিপোর্ট হ'লে ত রক্ষে নেই। চারদিকে শালা টিক্‌টিকি লুকিয়ে রয়েছে। এই যে আমি তোর কাছে এসেছি, এ খবরই কি চাপা থাকবে ভেবেছিস্‌। তবু না এসে পারলাম না, তোকে যে ভালোবাসি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অবিনাশ টুপীটা মাথায় চড়ালো—আসি ভাই, আজ আবার ওয়াইফের সিনেমার ডেট্‌, ছেলেমেয়ে দুটোকে রাখতে হবে!

—অ তোর বুঝি দুটি হ'ল! এই ত সেদিন বিয়ে করলি রে!

—দেখতে দেখতে তিন বছর হয়ে গেল ভাই। তা যা হবার একটু আর্লি-আর্লিই হয়ে যাক। বুড়ো বয়েসে হ'লে আর মানুষ করার ফুরসৎ পাবো না। আসিস না একদিন—

—যাবো। আজই যেতে পারতাম। তা ছাখা ত হয়েই গেল।

—হ্যাঁ। তা ছাড়া আজ গেলে ত ওয়াইফের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয় না। গেলে হয়তো দেখবি, ষষ্ঠীবুড়ি সেজে বসে আছি। বড় লোকের মেয়ে বিয়ে করার অনেক ঝক্‌মারী রে!

—যা-যা আর ওস্তাদী করতে হবে না। সোনার বরণ ডব্‌কা বৌ পেলি, আর ওদিকে শ্বশুরের ঠেক্‌নোতে কপাল খুলে গেল, সেটা কি জানতে কারুর বাকী আছে? বিয়েতে ত নেমন্তন্নও করিস নি।

—ওই যে বলেছি পরের দৌলত—এ তাই। বড়লোকের মেয়ের মেজাজ সামলাতেই হাল্লাক হয়ে গেলাম। এবেলা এখানে ত ওবেলা বাপের কোয়ার্টারে, এইটুকু কোয়ার্টারে তার মন ওঠে না। ঠাকুর-চাকর রেখেছি, কিন্তু আয়া নেই যে! ছেলেমেয়ের হ্যাপা উনি পোয়াতে নারাজ! বাপের আদুরে মেয়ে ত! কিন্তু এই আয়ে কি আয়া পোষা যায়, তুই বল ভাই! কী ভুল যে করেছি! যাক সে সব আর বলে কি লাভ—এখন আমি ভাই খাঁচার পাখীটি। ইস্ কথায় কথায় সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল, আজ কপালে দুঃখু আছে। চলি ভাই,—একদিন আসিস।

—যাবো বই কি। তোর ছেলেমেয়েকে দেখে আসবো। আমার ত দেশে যেতে এখনো সাতমাস দেরী—তবু তোর দুটোকে দেখলেও একটু স্বস্তি!

—আর যা বল্‌লাম, একটু সাবধানে পা ফেলিস ভাই, দিনকাল বড় খারাপ।

অবিনাশ চলে যাবার পর দত্তগুপ্ত মোড়ার উপর বসে একটা সিগারেট ধরালো। হিসেব মতো এ সিগারেটটা বাজে খরচ নয়—অবিনাশ খেলে ত এটা খরচ হতোই। বসে বসে অদ্ভুতচন্দ্র দত্তগুপ্তর মনে অনেক কথাই তোলপাড় করে।...যুদ্ধ তখন কোথায়! যুদ্ধের কথাও কেউ কল্পনাই করতে পারত না—সেই আমলে ম্যাট্রিক ফেল করে এই মানিকপুরের মাটিতে সে যখন পা দিয়েছিল তখন সাত আনা রোজের ঝাড়ুদারের কাজ করতে হ'ত। পদোন্নতি হ'তে বেশি দেরী হয় নি। প্রথম দু-বছর মাইনে বেড়ে বেড়ে একটাকা পাঁচ

আনায় দাঁড়ালো। মেসের চার্জ তখন মাত্র তেরো টাকা—তাই যেন দিতে কষ্ট হ'ত!…তারপর বিয়ে—রোজগেরে ছেলের বিয়ে হবে বই কি! বাপ-মায়ের চেষ্টাতেই মোটা পণ পেয়েছিল বিয়েতে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পরিবারে বেষ্টিত হয়ে ঘরসংসার করার স্বপ্ন, স্বপ্নই রয়ে গেল। মানিকপুরের আশপাশে ছোটছোট দু-কামরার বাসা ভাড়া করে যে থাকবে, তাও হিসেব করে দেখেছে, এই আয়ে সঙ্কুলান হবার নয়। চল্লিশ টাকা, নিদেন পঁয়ত্রিশ টাকা ত ঘর-ভাড়াই লেগে যাবে। অথচ একটা কোয়ার্টার যদি পেত সে! কত লোকেই পাচ্ছে, তদবির তোয়াজ করতে পারলেই হয়। কিন্তু অদ্ভুতের মুখচোরা প্রকৃতির জন্য এই কাজটা, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও, তাকে দিয়ে হয় না। দীর্ঘশ্বাস ফেলেই বা কি লাভ? বাকী জীবনটা বুঝি এমনি করেই এই বাদামতলার মেসে কাটিয়ে দিতে হবে!

অথচ ওই অবিনাশ চাটুয্যে স্রেফ বুদ্ধির প্যাঁচ খেলে কোথায় চড়ে বসেছে! এই যে অবিনাশ আজ এখানে এসেছিল, এরও মূলে গভীর অভিসন্ধি যে লুকিয়ে নেই এমন কথা অদ্ভুত দত্তগুপ্তর মন মানতে রাজি নয়। হয়তো এমনও হ'তে পারে যে অবিনাশ নিজেই তার নামে রিপোর্ট করে এখানে সাফাই গেয়ে গেল।

সব কিছুই ছাপিয়ে প্রৌঢ় মানুষটির মনে একটি ছবিই উজ্জ্বল হয়ে চিরন্তন সান্ত্বনার মতো আজো ভেসে বেড়াচ্ছে—আঠারো বসন্তের উদার প্রাচুর্যে ভরা যৌবনোজ্জ্বল নমিতার ঢলঢলে চোখের আবিষ্ট চাহনী। স্বামীর মুখের ওপর সেই চাহনী মেলে দিয়ে প্রথম মিলনরাত্রিতে কুণ্ঠিত স্বরে বলেছিল সে—তোমার জন্যে আমি সব কষ্ট সইতে পারবো। জানি ত তুমি আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাবে, আজ না-হোক দু-বছর পরে।…তারপর ত কত দু-বছর পেরিয়ে গেছে! নমিতার কোলে একটির পর একটি ক'রে চারটি ছেলেমেয়ে এসেছে। তাদের সবচেয়ে আদরের প্রথম সন্তানটি অকালে অভিমান ভরে চলে গেছে। মৃত্যুর সময় বাবাকে দেখবার জন্য ছট্‌ফট্ করেছে, কিন্তু অদ্ভুত দত্তগুপ্ত ছুটি পায় নি, দেখাও হয় নি। ছেলেটির সাধ মানিকপুর দেখবে, সে সাধও মেটে নি। নমিতা এখন আর কোয়ার্টারের জন্য চেষ্টা করার অনুরোধ

জানায় না চিঠিতে। সংসারের অভাব-অভিযোগের ভিড়ে মিষ্টি-মধুর কথাগুলো চাপা পড়ে গেল কবে, আজ আর তা মনে পড়ে না।—

এমনি করেই দিন যাচ্ছে, বছর ঘুরছে, ভাগ্য কিন্তু এক জায়গাতেই জগদ্দল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছে। না, তাই বা বলা যায় কি করে? এই যে অবিনাশের অশুভ ইঙ্গিত, এ ত ভাগ্যের গতিরই সূচনা! হাওয়া উল্টো দিকে বইবে না কি?…অদ্ভুত দত্তগুপ্ত আর ভাবতে পারে না। কি হবে ভেবে!

গোকুল এসে চম্‌কে দিল—ছোটবাবু আঁধারে এমন গুম মেরে বসে কি করছেন গো!

অদ্ভুত একবার পোড়া সিগারেটটার দিকে তাকালো, ইস অনেকখানি জ্বলে নষ্ট হয়ে গেছে। মিথ্যে বাজে ভাবনায় পড়ে সিগারেটের মৌজটাই মাটি। অদ্ভুত বল্‌ল—কেবল কাজে ফাঁকি, যা—যা খবরের কাগজটা নিয়ে আয়।

সাতচল্লিশ

বয়লার বার্স্ট করল। গোটা কারখানাটা প্রচণ্ড কাঁপনে চমকে উঠ্‌ল। সাংঘাতিক আওয়াজে পাওয়ার হাউসের লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে এল। আতঙ্কে সকলের মুখ বিবর্ণ বিশুষ্ক—এত বড় বিস্ফোরণে না জানি কি বিরাট সর্বনাশ হয়ে গেল!

তবে খুব আশ্চর্য এই যে, কোনো লোক আহত হয় নি। সেদিন তিন নম্বর পাওয়ার হাউসে খুব হৈ-হাঙ্গামা চল্‌লো সারাটা দিন। সীতানাথ মুখুয্যের আর নিশ্বাস ফেলবার অবসর নেই। বুড়ো বয়সে এমন অমানুষিক মেহনৎ করলেন যে, সবাই অবাক হয়ে গেল। ইদানীং সীতানাথ গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তাকে কেউ গণনার মধ্যেই আনে না। অথচ তিনি আজ যে তৎপরতা দেখালেন, সেটা সাহেবদের পর্য্যন্ত নজরে পড়ল।

কিন্তু তার পরিণাম যে এ রকম উল্টো দিকে ফল প্রসব করবে, তা কে জানতো!

দিন-চারেক বাদে একটা সার্কুলার বেরুলো,—'এরপর থেকে অবিনাশ তিন নম্বর পাওয়ার হাউসের ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হ'ল।' আর সীতানাথ মুখুয্যে—এ্যাসিস্ট্যাণ্টের পদেই রইলেন। তবে এটাই তাঁর পক্ষে চূড়ান্ত। অবিনাশকে তাঁর ওপরওয়ালা বাহাল করা হ'ল!

কারণ কী? সীতানাথ মুখুয্যের কাজে গাফিলতী এসেছে, তার প্রমাণ সেদিনের বয়লার-দুর্ঘটনা। বয়লারের লিকেজ ত ইঞ্জিনিয়ারের দেখার কথা, অথচ সে দায়িত্ব পালন করেন নি সীতানাথ। তাঁর অসাবধানতার জন্যই কোম্পানীর এতবড় একটা ক্ষতি হয়েছে। নেহাৎ পুরনো লোক বলেই কোম্পানী তাঁকে বরখাস্ত করে নি, নচেৎ সেটাই সমীচীন হ'ত।

বজ্রাঘাত! বুড়ো বয়সে সীতানাথের এই আকস্মিক অধঃপতনে সকলের সঙ্গে সীতানাথও কম বিস্মিত হলেন না। বিস্ময়ের চেয়ে আঘাতটাই পেলেন

বেশি। কিন্তু উপায় কী? এর ওপর অদৃষ্টের চরম পরিহাস—অবিনাশ চাটুয্যের অধীনতায় তাঁকে কাজ করতে হবে।

এই অবিনাশকে সীতানাথই নিজে হাতে করে নীচের মহল থেকে ওপরে ওঠার সিঁড়ির মুখে আনেন, শুধু তাই নয়—মল্লিকসাহেবের কাছে দরবার করে অবিনাশের জন্য খাশা কোয়ার্টার পর্যন্ত ব্যবস্থা করেছিলেন সীতানাথ। অবিনাশের জন্য তিনি কী না করেছেন! নইলে অবিনাশের যোগ্যতা হিসেব করলে তার বড় জোর এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ফোরম্যান হবার কথা।

আগে হ'লে এই ব্যাপার নিয়ে সীতানাথ চেঁচিয়ে ডিপার্টমেণ্ট ফাটিয়ে দিতেন। কিন্তু আজ নিজের সীটে বসে রইলেন মাথা হেঁট করে। বয়স যথেষ্ট হয়েছে। এটুকু বুঝেছেন যে, বয়লার না ফাটলেও অন্য কোনো অছিলায় তাঁকে দাবিয়ে দেওয়া হ'ত। বিশেষ করে অবিনাশ যখন বড় অফিসারের জামাই, তখন তাকে উঁচু জায়গায় বসানো তো শ্বশুরের, তথা শ্বশুরের কোম্পানীর অবশ্য কর্তব্য। একটু বুঝি বা শ্লেষের হাসিও তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে ওঠে। একবার দেখা করবেন নাকি মল্লিকসাহেবের সঙ্গে? পরক্ষণেই বুঝতে পারেন, তাতে কোনো লাভ হবে না। দেবজ্যোতি স্বদেশী আসামী, তার ওপর মল্লিকের আর কোনো আশা-ভরসা নেই। তা ছাড়া অনেক দিন ও পথে যাওয়া ছেড়েছেন বলে মল্লিকসাহেব সীতানাথের ওপর বিরূপ হয়ে বসে আছেন। আর, এই ওলট-পালটের ওপর মল্লিকেরও হাত থাকা সম্ভব।

সীতানাথের ইচ্ছে করে চাকরীতে ইস্তফা দিতে। এরকম অপমান আর হজম করতে রুচি নেই। অথচ ঠিক এইভাবেই একদিন অনেককে ডিঙিয়ে ড্রিল-সেকশন থেকে সীতানাথ মুখুয্যে পাওয়ার হাউসের এত বড় পদে পৌঁছেছিলেন। যখন পাওয়ার হাউসের কর্তৃত্ব নিয়ে প্রথম আসেন তখন তাঁর নীচের লোকদের কাছেই তিনি কাজ শিখেছেন। কাজই তাঁকে আস্তে আস্তে এই পদের যোগ্য করে তুলেছে। অথচ আজ যখন অবিনাশ সেই রাস্তা ধরেই এসে তাঁকে হটিয়ে দিল তখন সীতানাথের অসন্তোষ আর ক্ষোভের অবধি নেই। একবারও তাঁর মনে হ'ল না যে, মানিকপুরের কারখানাতে উন্নতি হয় চোরা-

গলির গোপন পথে। দীনদয়াল সান্যালকে ডিঙিয়ে সীতানাথ এই আসন দখল করেছেন—সে ত খুব বেশিদিনের কথা নয়।

খচ্ খচ্ করে ইস্তফার চিঠিখানা লিখে সীতানাথ শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তারপর কি ভেবে সেটা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। ভয় হ'ল, যদি কোম্পানী তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়, তাহলে? একটা অনিশ্চিত ভয়ের আশঙ্কায় সীতানাথের বঙ্করেখাঙ্কিত মুখখানা বিকৃত হয়ে যায়। কারখানার বাইরে সীতানাথ বাঁচতে পারবেন না—সেটা কল্পনা করা অসম্ভব। এখানেই থাকতে হবে তাঁকে।

অবশেষে সীতানাথ স্থির করলেন, ইউনিয়নের দরবারেই যাবেন, যদি কিছু হয় ত সেই দিক থেকে চাপ দিয়েই হবে।

'অল ইণ্ডিয়া মহলে'ও সীতানাথের পুরণো খাতির আর বজায় নেই, চিড় খেয়েছে বিলক্ষণ। অভিজিৎ সিং, বান্দা সিং, ডোমনপ্রসাদ, নটবর মাহাতো, কিষণরাম তেওয়ারী ইত্যাদি ব্যক্তি নিজেদের দলকে 'অল ইণ্ডিয়া মহল' আখ্যা দিয়েছে—নামটা অবশ্য একদা সীতানাথেরই দেওয়া। কিন্তু দীনদয়াল সান্যালের সঙ্গে সীতানাথের সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ততই সীতানাথকে এর বিপক্ষদলীয় ব'লে দূরে ঠেলে দিয়েছে। অবশ্য ইদানীং সীতানাথ নিজেও বড় একটা এদের মজলিসে-মতলবে থাকেন না। মুকুল নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকে তিনি নিজের বাড়িতে বসে বসে তামাক খান। দীনদয়ালের সঙ্গে গল্প করেন—গল্প আর কি, সীতানাথ মুখ বুজে শোনেন। তবু আজ পুরণো অন্তরঙ্গতার জের টেনে সীতানাথ ওই অল ইণ্ডিয়া মহলেই যাবেন স্থির করেছেন।

সেদিন সীতানাথ কারখানা থেকে ফিরেই মল্লিকাকে বল্লেন—ওরে আমার চাদরখানা বার করে দে ত!

মল্লিকা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল—এখন আবার কোথায় যেতে হবে?

অপ্রসন্ন মুখে সীতানাথ বল্লেন—এত কৈফিয়ৎ কিসের, যা বলি শোন।

—একটু জিরিয়ে-থিতিয়ে জলখাবার খেয়ে বেরুলেই পারতে।

—আঃ, বড় বিরক্ত করিস। সময় হবে না।

দেবিকা সীতানাথের কাপড়-চাদর এনে দিল। মল্লিকা তাড়াতাড়ি এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ করে দিল। সেটা নিঃশেষ করে বেরিয়ে পড়লেন—দুর্গা-দুর্গা!

সীতানাথ বাড়ির বাইরে পা দিতেই দেবিকা বল্‌ল—ব্যাপার কী ছোট্‌দি?

—তুমিও যেখানে আমিও সেখানে, কি করে জানবো ভাই?

—বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডাই চল্‌ছিল। অনেকদিন পরে আবার মেজাজ বিগ্‌ড়েছে। নিশ্চয় একটা কিছু আছে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেবিকা চাপা গলায় বল্‌ল—জানিস ছোট্‌দি, ললিত দা এসেছিল মানিকপুরে।

মল্লিকা মুখ বাঁকিয়ে বল্‌ল—যাঃ, চালাকী করতে হবে না।

—সত্যি ভাই, আরতি ত আর আমাকে মিছে কথা বল্‌বে না। পরশু রাতে এসেছিল। ললিতদার ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন দেবে, তাই বাপ-মাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছিল—জানিস! ছেলেটা দেখতে বেশ সুন্দর হয়েছে রে!

মল্লিকা শ্লেষের সুরে বল্‌ল—তুই বুঝি দেখে এলি?

—হ্যাঁ দেখলামই ত, আরতির কাছে ফটো রয়েছে যে। বড় ছেলেরও ছবি আছে—দু-ভাই এক্কেবারে দুরকম দেখতে।

মল্লিকা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। বিকেলের রং যেন বদলে যায়! আস্তে আস্তে ও বলে—আমাদের বোনপোর মুখে-ভাত অথচ আমাদের একবার বল্‌লেও না! হ্যাঁরে, ওরা কোথায় আছে?

—সীতারামপুরের বাজারে ললিতদার আড়ৎ। খুব উন্নতি করেছে যা-ই বলো—এই যে এসেছিল, মা-বাবার জন্য গরদের শাড়ী ধুতি,—আর ভাইবোনেদের গুচ্ছের কাপড়চোপড় দিয়ে গেছে।

—ওরা যাবে?

—যাবে না কেন, ললিতদা দু-হাতে পয়সা-রোজগার করছে। বড়দিও খুব গিন্নীবান্নী হয়েছে। আরতিকে খুব মিষ্টি একখানা চিঠি লিখেছে বড়দি।

—বেশ করেছে। ওদের সুখ ওদেরই থাক, তুমি যেন আবার এসব কথা বাবার কানে তুলো না। ছি-ছি কী কেলেঙ্কারী!

কথাটা শেষ করে মল্লিকা ছোটবোনের মুখের দিকে না তাকিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দেবিকা অতশত বোঝে না, মল্লিকার এত রাগের কী আছে এতে? বড়দি যে সুখে আছে, এ খবরেই দেবিকা খুশী। মায়ের মৃত্যুর পর কাউকে না বলে কয়ে গভীর রাত্রে দিদি যে হঠাৎ কোথায় চলে গেল,—তারপর ভাগ্যে কী দুর্ভোগ ঘটছে, কি অবস্থায় তার দিন কাটছে,—দেবিকা কত রাত জেগে জেগে এইসব ভেবেছে! অথচ খোঁজ পায় নি। আর সেকথা মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারে নি। আজ আরতির পরনে নতুন ডিজাইনের শাড়ী দেখে ক্লাসে তার পাশে গিয়ে বসে বলেছিল—বাঃ, চমৎকার মানিয়েছে ভাই!

আরতির ভাগ্যে এ ধরনের প্রশংসা বড় একটা জোটে না, কাজেই ও খুব খুশী হয়ে বলেছে—সত্যি, না ঠাট্টা করছিস?

—তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি ভাই। এমন ঝরনা-ডিজাইন ত মানিকপুরে দেখিনি।

—হুঁঃ, মানিকপুরে যতো সব বাজে জোলাটে শাড়ী। দাদা কলকাতা থেকে এনেছে, আরও একখানা যা এনেছে না, সেটা এর চেয়েও ভালো।

দেবিকা অবাক হয়ে যায়—দাদা! সে আবার কে ভাই?

—হ্যাঁ রে, দাদা এসেছিল। দাদা কিরকম ফর্সা হয়েছে, আর বেশ মোটা হয়েছে। আমরা ত চিনতেই পারি নি প্রথমে।

তারপরের ইতিহাস এই: স্কুলের পর দেবিকা গিয়েছে আরতিদের বাড়ি, আরতির মা আগের মতো মুখভার করেন নি ওকে দেখে। বরং বলেছেন খুব রোগা হয়ে গেছে দেবিকা, শরীরের দিকে একটু নজর দেওয়া উচিত। আরও অনেক ভালো ভালো কথাই তিনি বলেছেন। এমন কি তাঁদের সঙ্গে দেবিকাকে সীতারামপুর যাবার জন্য অনুরোধও করেছে আরতির মা।

দেবিকা খুশী হয়েছে। বড়দির জন্য পরোক্ষে যে দুশ্চিন্তা ছিল, তার হাত থেকে এমন আশ্চর্যভাবে মুক্তি পাওয়া ত হাতে স্বর্গ পাওয়ারই সামিল। আর খুশী হয়েছে দু-টি কচি-কচি শিশুর ছবি দেখে—সত্যি ওর দিদির ছেলে এরা! কী আনন্দ যে হয়েছে দেবিকার, তা আর কাউকে বলে বোঝাতে পারবে না।

আর সেই আনন্দের আতিশয্যেই ছোটদির কাছে মুকুল আর ললিতের কথা স্বচ্ছন্দে বল্‌তে পেরেছে। অথচ দেবিকার যে সাধারণ বিবেচনা-বুদ্ধি কিছু কম, তা নয়—মল্লিকার মনে মুকুল যে মর্মান্তিক আঘাত হেনেছে সেটা দেবিকার না-বোঝার কথা নয়। তবু ওর যেন [illegible] হয়, মল্লিকাও দিদির সুখে সুখী হবে।

এতবড় একটা সুখবর মল্লিকাকে ক্ষুণ্ণ করল। কিন্তু দেবিকার দৃঢ় বিশ্বাস, আজ দেবজ্যোতি বাড়িতে থাকলে খুশীতে উপ্‌ছে পড়ত! ললিত যে এবাড়িতে দেখা করে নি, তার কারণটুকু উড়িয়ে দেবার মতো নয়—সীতানাথের মেজাজ ত মানিকপুরের এতটুকু শিশুও জানে। দেবিকাকে আরতি বলেছে—সেইজন্যেই দাদা যেতে ভরসা করে নি, নইলে যাবার খুব ইচ্ছে ছিল। এসব কথা শোনবার পর দেবজ্যোতি নিশ্চয় সীতারামপুরে সাইকেল হাঁকিয়েই ছুটত। না, সাইকেল যেতে দিত না, তা হলে দেবিকার যাওয়ার কি হ'ত!

মল্লিকা আবার ঘরে ঢুকল—কী রে, অমন উদাস হয়ে কি ভাবছিস, চাটুকুও কি বয়ে দিয়ে যেতে হবে? ইস্কুলে পড়লে কি সবাই এমনি কুঁড়ে হয়ে যায়? বাবাকে বল্‌ব, মিথ্যে ইস্কুলের পিছনে কতকগুলো টাকা খরচ করার চেয়ে দেবির বিয়ে দিয়ে দাও, সব গোলমাল মিটে যাক।

দেবিকা বল্‌ল—ওঃ তার চেয়ে বলো না, নিজের বিয়ের কথা মুখ ফুটে বল্‌তে পারবে না, তাই ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছ! বেশ ত আমিই বলব তোমার কথা।

—আমার ভাবনায় আর ঘুম হচ্ছে না, তাই বুঝি ওই বেরিয়ে যাওয়া হ্যাংলাটার কথায় উপ্‌ছে পড়ছিস। অসভ্য, স্বার্থপর মানুষ কি আবার মানুষ! ছি-ছি, ওর কথা তুই মুখে আনলি কি করে?

—কেন হ'লটা কী!

—কি হয় নি বল্‌, নিজের বোন বলে ত অন্ধ হয়ে থাকতে পারি নে, চোখের ওপরই ত সব দেখলাম! একজনের সঙ্গে ঢলাঢলি করল, এমন কেলেঙ্কারী যে মুখ দেখানো দায়। তারপর ঘরের সর্বস্ব চুরি করে যাকে নিয়ে পালালো সে লোকটা নেহাৎ অমানুষ নয়, তাই আজ বেঁচে গিয়েছে। এমনও

হয় মানুষের স্বভাব? আমি ত মরে গেলেও ওকে নিজের দিদি বলে স্বীকার করব না। ওকে মানুষ মনে করতেও আমার ঘেন্না হয়।

—আচ্ছা ছোটদি, ও যদি [illegible] যেত তাহলেই কি ভালো হ'ত? তুই খুশী হতিস?

—থাম্, ওর কথা আর মুখে আনিস নে। ভগবানের বিচারে ওর যে কি হাল হওয়া উচিত ছিল আমি ত ভেবে পাই নে। একবার আক্কেলটা ছাখ, মায়ের শ্রাদ্ধের টাকা, সেই নিয়ে পালাতে পারল!

—সেটা অবিশ্যি খুব খারাপ কাজ করেছে।

—খারাপ বল্লে কিছু বলা হয় না। মানুষে অমন পারে না।

আলোচনাতে ছেদ পড়ল, মিণ্টু এসেছে। এর পর একে একে সবাই আসবে। আসবেন দীনদয়াল, সন্ধ্যার আসর জমবে। সারাটা দিন যেন আসরটির আশাতেই এরা কাটায়!

সীতানাথকে দেখতে না পেয়ে মিণ্টু বল্ল—জ্যাঠামশায় আবার কোথায় গেলেন! আজ আমাদের আসরে একজন নতুন মানুষ আসছে কিন্তু!

—কে গো? কে?

দেবিকা কৌতূহলী হয়ে উঠ্ল।

—খুব সুন্দর দেখতে। বলেই মিণ্টু হাসলো।

—যাঃ, তুমি এত ঠাট্টা করতে পারো!

—দেখিস! তোর আর তর সয় না যে! কি করে বুঝলি যে তোকে দেখেই সে ভদ্রলোকের মাথা বিগ্ড়ে যাবে?

মিণ্টু নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠ্ল।

মল্লিকা এবার বক্রোক্তি করল—দেবিদের ইস্কুলে আজকাল প্রেমের পাঠ পড়াচ্ছে তা বুঝি জানো না!

—সত্যি? আমাদের যে বয়েস নেই, নইলে ভর্তি হয়ে যেতাম।

মিণ্টুকে আজ বড় চপল মনে হয় দেবিকার। মল্লিকার ওপরও মনে মনে খুব চটে গেছে ও। কিন্তু মুখে কিছুই বল্ল না। এদের চেয়ে দেবিকার দৃষ্টি যেন অনেক বেশি উদার—অন্যরকম। ওর তরুণ মনে একদিকে যেমন মানিক-

'পুরের ছোট শহরের ছবি, তেমনি তার পাশেই বিরাট পৃথিবীর কত অজানার প্রতি ওর মোহ। ও এই ছোট গণ্ডীতে নিজেকে চিরদিন বেঁধে রাখবার শপথ নিতে পারে না। সেই জন্যেই মুকুলের প্রতি এতখানি দরদ ওর। ওর চোখে মুকুলের শত অপরাধ আজ ক্ষমায় উত্তীর্ণ হয়ে, সার্থকতাভূষিত। ঠিক অমনটি নয়, তবে সত্যিকার বিরাট একটা কিছু করার স্বপ্ন ওকে পেয়ে বসেছে। সেই স্বপ্নে মন্দাকিনীর কথাটাই বেশি প্রভাব বিস্তার করে আছে। হ্যাঁ, মন্দাকিনীর মতো মেয়ে হওয়ার মধ্যেই দেবিকা একটা গৌরবের সন্ধান পায়। দীনদয়ালের আসর আর ওর কাছে আগের মতো ভালো লাগে না। এখানে অনেক ভালো কথা হয়—কিন্তু কাজ কই? যার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের আশ্রয়ে নিজের পূর্ণ প্রকাশ ঘটবে তেমন কাজই দেবিকা চায়।

মল্লিকা ওকে নীরব দেখে ঠেস দিয়ে বল্‌ল—কি, তুই যে একেবারে মৌনী? ও দেবি, ভাষণ-টাসন কিছু ছাড়!

দেবিকা নিরুত্তর। মিণ্টু বল্‌ল—আয় মল্লি তোর চুলটা নতুন ধরণের করে বেঁধে দিই। এ কী রে, ধাংড়ীর মতো জট্ পাকালি কি করে?

মল্লিকা সহানুভূতির স্পর্শে যেন অভিমানে ভেঙে পড়ল—তুমি তাই বল্‌লে, নইলে কে আর আমার জন্যে মাথা ঘামাচ্ছে! কী-ই বা হবে চুলের বাহার দিয়ে? আমাদের আবার মাথা-মুণ্ডু! বেঁচে আছি এই ত যথেষ্ট।

মিণ্টু বল্‌ল—অমন যোগিনী-সাধ ত ভালো নয় মল্লি! তোর আবার কি হ'ল?

—পোড়া কপাল, আমার কেন হতে যাবে, তোমার হোক।

—আমি! সোনা কপাল যদি হ'ত তবে ত কবেই সংসারের সুখে ঢুকে পড়তাম। কিন্তু এমন সেজেগুজে পথে পথে ঘুরে বেড়াই, তা কেউ কি ছাই ফিরে তাকায়—অথচ বয়স ত বয়েই যাচ্ছে ভাই! আমার কিন্তু ভারি ইচ্ছে যে, কেউ আমার প্রেমে পড়ুক।

—তোমার মুখেই এ কথা! ওদিকে ত কোনো ছেলে যদি একটু আড়চোখে দেখেছে অমনি আগুন দাও ঢেলে, নইলে বলো 'না'। এই মুহূর্তে গণ্ডা কয়েক ছোকরাকে এনে দিতে পারি যারা তোমাকে পেলে সব ফেলে ঝুলে পড়বে!

—এত মনরাখা কথাও বলিস! এই জন্যেই ত আসি তোদের বাড়ী। আর দেবী নিজেরটুকু নিয়েই মশগুল। বলি, ও দেবিকে, একটুখানি চাও, দুটো কথা কও—

দেবিকা মনে মনে বিরক্ত হয়, কিন্তু ও বেশ জানে যে, দুর্বলতা প্রকাশ পেলে রক্ষা নেই, মিণ্টু ওকে হাসিয়ে তবে ছাড়বে। তাই সহজ ভাবটুকু বজায় রাখার চেষ্টা করে বলে—আমার ছোট্দির জন্যে একটা বর এনে দাও না। সত্যি ভাই মিণ্টুদি আর ভালো লাগে না—

—কেমন বর! সেই বর এসেছে বীরের ছাঁদে, এ্যাঁ! যে বর শ্যালীর সঙ্গে আলাপ জমাতে ওস্তাদ তেমনি বর—বুঝেছি। বেশ বেশ আজই আনবো। তোরা আমাকে আজকাল খুব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিস। ভাবিস, মিণ্টুটা কেবল মুখেই, কাজের বেলায় কিস্যু নই।

মিণ্টুর কথা শেষ হতে না হতে কলিং বেল বেজে উঠ্‌ল।—এটা সম্প্রতি লাগিয়ে দিয়েছে কোম্পানীর ইলেক্‌ট্রিসিয়ান।

মিণ্টু বল্‌ল—ওই এসেছে রে!

হাসি চাপ্‌তে চাপ্‌তে মিণ্টু উঠে গেল। ওরা দুই বোনও গেল পিছু-পিছু।

মিণ্টু কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করল—আসুন, আসুন অমল বাবু! বসুন।

ঘাড় ফিরিয়ে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—এঁর কথাই একটু আগে বল্‌ছিলাম। ইনি অমল চৌধুরী, আমার বাবার মতে হীরের টুকরো ছেলে। তবে কিনা মানিকপুরের মতো মোষের শিং-এ পড়েছেন ত, ধার থাকবে ক'দিন!

সকলেই হেসে উঠ্‌ল।

মিণ্টু হাসি থামিয়ে বল্‌ল—আর এই আমাদের মানিকপুরের সেরা দুটি রত্ন, মল্লিকা আর দেবিকা। আপনার ভাগ্য নেহাতই মন্দ যে, জ্যেঠামশাই হঠাৎ আজ বেরিয়ে গেছেন। না, আপনি আসবেন এখবর পাওয়ার আগেই বেরিয়েছেন। বসুন, একটু চা খান—বাবাও এসে পড়লেন বলে।

অমল এতক্ষণে কথা বল্‌বার সুযোগ পেয়ে সংযত কণ্ঠে বল্‌ল—

মানিকপুরেও যে একটা সামাজিক জীবন আছে তা এর আগে বুঝতেই পারি নি। সান্যাল মশায়ের সঙ্গে আলাপ না হলে হয়তো সেই তিমিরেই থাকতে হ'ত আমাকে। এটা কিন্তু আপনাদের খুব অন্যায়।

মল্লিকা বল্‌ল—কোন্‌টা অন্যায়?

মিণ্টু কথাটা লুফে নিয়ে জবাব দিল—কোন্‌টা নয়!

—না, আমি বল্‌ছি যে, এভাবে আপনার দাঁড়িয়ে থাকবেন আর আমি বসে থাকব?

—ওঃ, আপনি যে প্রথম চোটেই আতিথ্য অগ্রাহ্য করে একেবারে আপন হয়ে উঠ্‌তে চান। দাঁড়ান আগে দেখি আমরা, জ্ঞাতকুলশীল হ'ন!

দেবিকা বল্‌ল—মিণ্টুদির কথা ধরবেন না, উনি ওইরকম।

অমল হাসল—ওঁকে চিন্‌তে বাকী নেই। প্রথম আলাপেই মুগ্ধ করেছেন।

—একেবারে মুগ্ধ!

মিণ্টু ভ্রূকুঞ্চিত করে কপট গাম্ভীর্য ফোটালো—আপনি কিন্তু মোটেই সুবুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন না।

—ওই বস্তুটি আমার আছে বলে কেউ বদনাম দেয় নি।

অমল চট্‌ করে জবাব দিল।

মল্লিকা বল্‌ল—বসুন আসছি।

দেবিকা বাধা দিল—তুমি থাকো ছোটদি, আমি যাচ্ছি।

মল্লিকা আপত্তি করল না। চা-টা অবশ্য দেবিকা ভালোই করে।

অমল বল্‌ল—আপনাদের আসর বসবে কখন?

—এই ত আপনি এসেছেন, শুরু হ'ল। বাবা এসেই প্রার্থনার হামলা জুড়ে দেবেন। দেখুন না, ক'দিন সহ্য হয় এসব?

—আচ্ছা, দেবজ্যোতি বাবুর খবর কী? তাঁর কথা এত শুনছি যে, দেখতে ইচ্ছে করে।

মিণ্টু বল্‌ল—উহুঁ, এত অল্পে ওঁকে দেখে নেবেন সেটি হচ্ছে না। সেই ভয়েই ত আমাদের সরকার তাঁকে লুকিয়ে রেখেছে। বলে, আমরাই দেখা পাচ্ছি নে!

তারপর মল্লিকার দিকে তাকিয়ে মিণ্টু বল্‌ল—ওহো তোমাকে বল্‌তে মনে নেই, জানো মন্দাকিনী সেই রাতে এঁর সঙ্গেও দেখা করেছিল। এখান থেকে সোজা ওঁর কাছে—কাজেই বুঝে ছাখো, কিরকম মানুষ ইনি! আর সেই অনিল চৌধুরী, যে আমাদের মানিকপুরের মুখ রেখেছে—সে হচ্ছে এঁর ছোট ভাই।

মল্লিকার চোখে শ্রদ্ধাস্নিগ্ধ দৃষ্টি। কিন্তু মুখে শুধু বল্‌ল—ও, তাই বুঝি! তা অনিল বাবুর খবর কী? উনি কোথায় আছেন?

অমল বল্‌ল—ওকে ছেড়ে দিয়েছে। তবে মানিকপুরে ঢোকবার অনুমতি নেই, এখন ও কলকাতায়। আর অণ্টুর সেই প্রেরণাবান্ধবীটি মানে মিস্ সেন অর্থাৎ আপনাদের মন্দাকিনী এখনও আটক রয়েছেন।

বলে অমল এক নজর ওদের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর আস্তে আস্তে শুরু করল—আপনাদের এই মানিকপুর জায়গাটা বিচিত্র—এখানে ওই রকম মেয়ে কি করে তৈরী হয় বুঝে উঠ্‌তে পারি নে। তবে মল্লিক সাহেবের মেয়ে যে একেবারে এ রকম অসুরনাশিনীর ভূমিকা নিতে পারে তা চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হয় না, অবিশ্যি সান্যাল মশাইকে দেখলে খানিকটা অনুমান করা যায়।

—বাবার কথা ছেড়ে দিন। ওঁর সঙ্গে মন্দাকিনীর খুব কমই দেখা হয়েছে। ওর এই পথে দেবুদাই অগ্রদূত। দেবুদাকে ত দেখলেন না,—নেহাৎ আমরা প্রদীপের নীচে ছিলাম, তাই আলোর খবর পাই নি। কিন্তু যারা একটু দূরের মানুষ তারা ঠিক ওঁকে দেখেছে, আলোও পেয়েছে!

মিণ্টু খুব গম্ভীর ভাবে বলল। একটু আগে যে মেয়েটি চপল ভঙ্গীতে কথা কইছিল, তার সঙ্গে এই মিণ্টুর যেন আকাশপাতাল তফাৎ! একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল, ও বল্‌ল—কোনো কাজেই এলাম না। অথচ দিন ত বসে নেই, চলে যাচ্ছে। এই নিষ্কর্ম জীবন আর ভালো লাগে না। আর এই মানিকপুরের মানুষগুলো, কোনো একটি আন্দোলনে এগিয়ে ত আসবেই না, উল্টে বাধা দেবে। অথচ সুফলের ভাগটুকু এদের চাই।

—এদের দোষ দিয়ে .ক হবে বলুন! দেশকে দেখার জন্যে ত বাঁচা চাই।

—এরা যে ভাবে থাকে, তাকে বেঁচে থাকা বল্‌বেন আপনি? এই আমাদের কথাই ধরুন না—

—খাশা আছে। খাচ্ছেদাচ্ছে ডিউটির কড়ি গুণে নিচ্ছে।

—ওটুকু ত জৈব প্রয়োজন। তার ওপর যেটুকু মানুষের দরকার, সেই মনের খোরাক কি পাচ্ছে? তা ছাড়া খাওয়াপরার দিক দিয়েও ষোলআনা পায় না এরা—এর মানে আমরাই। এই যে আমি, আমিই বা কি করতে পারছি, বলুন! যে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে রয়েছে সেটা একটু থামিয়ে রাখি এমন ঠাঁই কই? এসব ফেলে দিয়ে ছুটলে অবশ্য হয়—কিন্তু এর দায় সামলাতে গেলে, অন্য দিকে নজর দেবার উপায় নেই। এমন অবস্থা ত আমারই একার নয়। এক সময়ে এগুলো বুঝতাম না, তখন অনেক অত্যাচার সয়েছে আমার আত্মীয়স্বজন।—রাতদুপুরে পুলিশে হানা দিয়েছে—বাড়ি ঘেরাও করেছে। মা আমার সেই বিপদে বুদ্ধি হারান নি। আস্ত একটা প্রেশের সমস্ত টাইপ গলিয়ে শীসে করে পুঁতে ফেলেছেন। পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে পালাতে গিয়েছিলাম, বাধা দিয়ে মা বলেছেন, তোর অত ভয় কিসের, পালিয়ে কদিন পার পাবি? তার চেয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়া—তার পর যা হয় হবে। সে সব যেন স্বপ্নের কথা! যাক্‌,—এই যে, চা এসে গেছে, একটু গলা ভিজিয়ে নিই, আপনাদের ধৈর্যের ওপর অযথা হাম্‌লা করব না।

মল্লিকা বল্‌ল—না, না, আপনি বলুন, শুনতে খুব ভালো লাগছে।

মিণ্টু হাসল। চায়ের পাত্র অমলের হাতে দিয়ে দেবিকা বল্‌ল—দেখুন, চিনি-দুধ ঠিক হয়েছে কি না।

—আপনার বুঝি প্রশংসা আদায়ের মতলব। আমি আবার এই জন্যে মার কাছে বড্ড বকুনি খাই। ভালো হ'লে মুখ বুজে খাই, খারাপ হ'লে পঞ্চমুখে নিন্দে করি কি না!

—আমার দাদার আবার ঠিক উল্টো অভ্যেস, নিন্দে একদম করেন না; ভালো হ'লে প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বলে' দেবিকা একটু হাসলো।

—আপনার দাদার সঙ্গে ওইখানে আমার তফাৎ।

—কোন্‌খানে।

—মক্ষিকাবৃত্তিতে।

—তা হলে দেবিকার সঙ্গে আপনার খুব মিল বল্‌তে হবে।

মিণ্টুর এই মন্তব্যে সবচেয়ে বেশি হাসলো দেবিকা। তারপর বল্‌ল—মিণ্টুদির আবার দাদার সঙ্গে ভারি সামঞ্জস্য, এই দেখুন না, আজ মানিকপুর ছেঁচে আপনাকে এখানে হাজির করেছেন!

দেবজ্যোতির প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় মিণ্টু যেন তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। আর সকলে হাসলো, শুধু সে-ই যোগ দিতে পারল না।

কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটে গেছে! আলাপ আর জম্‌ছে না।

মল্লিকা বল্‌ল—আজ ওঁরা যেন বড় দেরী করছেন, সব হ'ল কী?

কথাটা শেষ হতে না হতে কলিং বেল বেজে উঠ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে হাঁক শোনা গেল—দেবি!

সীতানাথের এইটাই বৈশিষ্ট্য। কলিং বেলটা বাজিয়েও ভরসা হয় না, যেন যন্ত্রের উপর তাঁর আস্থা নেই! তিনি বেল বাজিয়েও হাঁকডাক করেন।

বৈঠকখানা ঘরেই বসে ছিল সবাই। সীতানাথ ঢুকতেই অমল উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার করল।

সীতানাথ গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন—আপনি?

জবাব দিল মিণ্টু—ইনি অমল চৌধুরী, অল্প দিন হল ইলেক্‌ট্রিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে ঢুকেছেন। বাবা বলেছেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে।

—অ! তা অমল বাবুর দেশ হ'ল কোথায়?

—আজ্ঞে আদি নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলায়।

—মুর্শিদাবাদ! তা, মুর্শিদাবাদের কোথায়?

—জিয়াগঞ্জ।

—তাই বলুন। বেশ, বেশ। মানিকপুর কেমন লাগছে?

—সুন্দর জায়গা।

—সুন্দর ? তা গোড়াতে ওইরকমই মনে হবে, কিছুদিন থাকলেই বুঝবেন ছুঁচোর কেত্তনটা কেমন—।

দেবিকা মাঝ থেকে বল্‌ল—তুমি এখন ভেতরে চলো তো বাবা, সেই কখন বেরিয়েছ, পেটে ত কিছু পড়ে নি !

—আঃ, তোদের জ্বালায় দুটো কথা বলবারও উপায় নেই।

অমল বল্‌ল—আমি ত রয়েছিই, আপনি বরং চা-টা খেয়ে আসুন।

—হ্যা-হ্যা, আপনি বেশ বলেছেন। আমরা মশাই সেকেলে কুলীর জাত, দু-চুমুক চায়ে কুলোয় না, দলপুরু খোরাক লাগে। তা চলো মা,—তোমাদের ছুটি করে দিই।

সীতানাথ নিজের ঘরে গিয়ে, প্রথমেই বল্‌লেন—ছাখো দেবি, তোমাদের একটা কথা বলে দিই। কোথাকার কে-না-কে এসেছে, তার সঙ্গে অমন মাথামাখি আমি পছন্দ করি না।

—মাখামাখি আবার কি দেখলে বাবা! মিণ্টুদির সঙ্গে ওঁর আলাপ আছে। তা ছাড়া কাকাবাবু পাঠিয়েছেন।

—মুখে মুখে তর্ক করা তুইও শুরু করলি ? বলি, একটা ভালো কথা বল্‌লে তাও উড়িয়ে দিবি !

দেবিকা চুপ করে রইল। পিছনে মল্লিকাও এসে দাঁড়িয়েছে। সে বাপের কথায় জোগান দিল—ওর আজকাল বড় মুখ হয়েছে। ইস্কুলের গুণ আর কি !

—তুমি থামো মা। তোমাকেও বলে রাখি, আবার অবিনাশের মতো একটা উড়ো ঝঞ্ঝাট না হয়ে দাঁড়ায় এই তোমাদের, অলক-না-অসীম !

—অমল।

ভুলটা ধরিয়ে দিল দেবিকা।

সীতানাথ ভ্রূকুঞ্চিত করে বল্‌লেন—ওই হ'ল। আজকাল ত চেহারা দেখে মানুষ চেনা যায় না। সবাই দর্জির এক দোকানে জামা বানিয়ে পরে। অথচ ছাখো, কালসাপ শালা অবিনাশ দিল কিনা আমারই ইয়েতে বাঁশ !

দুই মেয়েই বুঝল সীতানাথের মেজাজ বিলক্ষণ খারাপ। আগে, যখন মা বেঁচে ছিলেন তখন এরকম ক্ষেত্রে ওরা সামনে আসাই বন্ধ রাখত। আর ছিল

মুকুল, তার ওপর দিয়েই ঝড়-ঝাপট বয়ে যেত। কিন্তু এখন এই দুই বোনকেই সব তাল সামলাতে হয়। এখন অতিবড় সংকট-সঙ্কেতেও সরে পড়া চলে না।

সীতানাথ আপন মনেই গজরাতে লাগলেন—উঃ, এমন চামারও হয় মানুষ!

আসল ব্যাপারটা প্রকাশ হ'ল দীনদয়ালের সাক্ষাতে। তাঁকে হাতের কাছে পেয়ে সীতানাথ একেবারে ফেটে পড়লেন—যত্তো সব ছাতুখোর আর রসুন-মদখেকো মাতালের ধাড়ী এসে জুটেছে এই নরকে!

দীনদয়াল প্রশান্ত হাসিতে আবহাওয়া হাল্কা করে দিয়ে বলেন—কি হ'ল আবার!

—হ'তে আর বাকী নেই কিছু। অবিনাশ এখন সীতেনাথ মুকুয্যের ওপরওলা।

—হ্যাঁ, সে খবর ত জানি। এখন কি করা যায় বলো দেখি!

—ঘণ্টা। করবার কিছু নেই। আজ তোমাদের ওই অল্-ইণ্ডিয়া মহলেও গিয়েছিলাম। তারা হাত উল্টে ইউনিয়ন দেখিয়ে দিলে। অথচ ইউনিয়নের আওতায় আমরা পড়ি নে, ইউনিয়ন ত তাই বলে!

—আর পড়লেই বা কী! ইউনিয়নটা ত নামেই আছে। কেউ চাঁদা দেয় না, কোনো কাজে যায় না। ঝাঁপও বন্ধ হবার দাখিল। বরেন মজুমদারকে চাকরী দিয়েছে কোম্পানী, ব্যস ল্যাঠা চুকে গেল!

দীনদয়াল এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলেন।

সীতানাথ বল্লেন—কি রে তামাক-টামাক দিবি, না বাপের পোজিশান খারাপ হয়েছে বলে তোরাও অপগেরাস্থি শুরু করলি! তোদের আর কী, তোফা আরামে দিন কাটছে, বুড়ো বাপ মুখে রক্ত উঠে মরুক,—চাই চুলোয় যাক!

বাইরের একজন লোকের সামনে সীতানাথ এইভাবে যা খুশি তাই বলে যাচ্ছেন, দেবিকা-মল্লিকা তাতে খুব ব্যথিত হয়। অথচ ওদের যে কোনো দোষ নেই একথা কে বল্‌বে! আজ দুমাস বাড়িতে চাকর নেই, সংসারের মাজা-ধোয়া থেকে শুরু করে সব কাজই ওদের করতে হয়, তা কি সীতানাথ জানেন না? আরাম ত খুব!

দেবিকা কফেতে ফুঁ দিতে দিতে বল্‌ল—অমলবাবু, আসর কেমন লাগছে ?

মিণ্টু এবার পিতাকে মৃদুকণ্ঠে বলে—প্রার্থনা হবে না, বাবা ?

—হবে বই কি মা। সুখদুঃখ যেমন বাদ যায় না, প্রার্থনাও তেমনি।

অমল বল্‌ল—সীতানাথ বাবুর এ খবরটা কারখানায় খুব এ্যাজিটেশন এনেছে। এ ধরনের অবিচারের প্রতিবাদ হওয়া দরকার।

—দরকার ত তুমি বল্‌লে ভাই, কিন্তু প্রতিবাদটা করে কে? সবারই ত পরমাত্মা পড়ে আছে নিজের চাকুরীটুকুর ওপর। একটা ইউনিয়ন ছিল, তাও সময় বুঝে ফৌত হয়েছে।

সীতানাথ কথাগুলো খুব রুক্ষভাবে বল্‌লেন, কিন্তু তার মধ্যে যে একটা অকৃত্রিম আন্তরিক আবেদন রয়েছে, সেটা সবারই মনকে বিষণ্ণ করে তোলে।

দীনদয়াল অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন। একসময়ে বল্‌লেন—আজ না হোক, দু-দিন বাদে আবার নিজের প্রয়োজনেই ইউনিয়ন মাথা খাড়া করে দাঁড়াবে। অবিচার অত্যাচার ত দিন-দিন বেড়েই চলেছে। তবে চরম একটা অবস্থায় না পৌছলে আমাদের গা গরম হয় না। দেখা যাক চেষ্টা করে।

—দেখবার কিছু নেই। এমনি করেই একদিন ফুরিয়ে যাবো ভাই!

—এ তোমার ভুল। হতাশায় কিছু পাওয়া যায় না। বাধা যদি আসে তখন তার চেয়ে উঁচুতে উঠে তাকে ঘা মারতে হয়। আমাদের ত সেটা ভুলে গেলে চলবে না। তুমি ভুলতে চাইলেও তোমাকে ভুলতে দেবো না। ঘাবড়ানো চলবে না সীতানাথ, মাথা উঁচু করে চলো। এ অপমান বৃথা যাবে না। পাপ আরও বাড়বে, তখন সেই পাপের মধ্যে মানুষের আত্মা হাঁপিয়ে উঠ্‌বে—তখন খুঁজবে পরিত্রাণের পথ। সেই দিন আবার এই অত্যাচারিতের দল দুর্দশার আত্মীয়তায় এক হয়ে মিলবে। আমি সেই দিনটির দিকে তাকিয়ে আছি।

সীতানাথ তামাক টানতে টানতে বিষণ্ণ হাসি হেসে বল্‌লেন—থাক ভাই! তোমার আশা তোমারই থাক। ওসব বড় বড় কথা বুঝি নে! বেশ ভেবে দেখলাম হিন্দুস্থানীদের দলেও চিড় খেয়েছে। অভিজিৎ সিং-এর দলের সঙ্গে কিষণরামের আড়াআড়ি—ওদের মধ্যে কোয়ার্টারের বরাদ্দ নিয়ে কামড়া-কামড়ি

বেশ পাকিয়ে উঠেছে। অনেকদিন ত যাই নি, কাজেই প্রথমে বুঝি নি। সব জায়গায়ই এক কেচ্ছা, যে যার নিজের কোলে ঝোল টানতে ব্যস্ত! যাঃ শালা, দুনিয়াটা হ'ল কী! নাকি মানিকপুরেরই মাটির দোষ!

অমল এবার বল্‌ল—মানিকপুর পৃথিবীর বাইরে নয়। ভাতের হাঁড়ির একটা ভাতের মতো আর কি। এটাই যুগধর্ম।

দীনদয়াল হাসলেন—হবে হয়তো। কিন্তু, না থাক। আজ মাথাটা ঝিম্‌-ঝিম্‌ করছে। বড্ড কী গরম পড়েছে?

অমল বল্‌ল—একশো চোদ্দ ডিগ্রিতে মাথাটা যে ঘাড়ের ওপর টিকে আছে এই ত যথেষ্ট!

আটচল্লিশ

গোবিন্দবাবুকে সীতানাথের অপিসে ঢুকতে দেখে তাঁর মেজাজ গরম হয়ে উঠ্ল। মুকুলের গৃহত্যাগের পর তিনি আর গোবিন্দর সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না। কারখানাতে যদি কখনও সাম্‌নাসামনি পড়ে যান ত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন,—এই ভাবেই সাড়ে তিন বছরের ওপর চলে আসছে। হয়ত আজকের এই আকস্মিক আক্রমণটা গোবিন্দর তরফ থেকে না এলে চিরকালই মুখ ফিরিয়ে চলতেন সীতানাথ!

গোবিন্দ ঢুকে পড়াতে সীতানাথ বিরক্ত হয়েই একটা ফাইল টেনে নিয়ে মনোযোগের ভাণ করলেন।

গোবিন্দবাবু সাদাসিধে লোক, কথাবার্তার বাঁধুনীও তাঁর তেমনি আল্‌গা। একগাল হেসে তিনি সীতানাথের সাম্‌নে গিয়ে বল্‌লেন—তারপর কেমন আছেন দাদা?

সীতানাথ গম্ভীর ভাবে তার দিকে তাকালেন। কোনো উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন না।

গোবিন্দর হাসিটুকু অম্লান। একখানা টুল নিয়ে সীতানাথের পাশে বসে পড়লেন—আরে আপনার দৌত্তুর, আর আপনি এমন পাশ কাটিয়ে গেলে কি হয়? না, সে শুনছি নে। আপনাকে যেতে হবে, মেয়েদেরও নিয়ে যাবেন—তা মেয়েরা আমাদের ইয়ের সঙ্গে এক গাড়িতেই যাবে, তাতে কী!

এতক্ষণে সীতানাথ মুখ খুললেন—আপনি আমাকে কিছু বল্‌ছেন?

—হ্যা-হ্যা! বেয়াই-এর সঙ্গে রসিকতা করছেন, তা বেশ, তা বেশ!

সীতানাথের গলা হঠাৎ সপ্তমে চড়ল—কোনো শালা আমার বেয়াই নয়, তুমি কি ভাবো সীতানাথ মুখুয্যে কিছু বোঝে না—ডিগ্রেড্ করেছে, তাই বুঝি খুশী আর ধরছে না, এঁ্যা! সেইজন্যে গায়ে পড়ে পীরিত ঝালাতে এসেছ? বেয়াই না আমার—।

বলে এমন একটি উপমা ব্যবহার করলেন যা ভদ্রসমাজে শালীনতার আইনে আটকায়। গোবিন্দবাবু অপ্রীতিকর প্রারম্ভের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন তবুও এতখানি অপমান হজম করা তাঁর পক্ষে শক্ত। বিশেষ করে আশেপাশে বেয়ারা এ্যাসিণ্ট্যাণ্টদের উপস্থিতি তাঁকে বড় অস্বস্তিতে ফেলল। কিন্তু সেটা গায়ে না মেখেই বল্লেন—আচ্ছা বেয়াই না হয় না-ই হলাম, ছোট ভাই ত! একসঙ্গে এতদিন কাজ করছি! তা আপনি যাই বলুন দাদা, আমি ছাড়ছি না। আগে সব কথা শুমুন, তারপর যা বলবার বল্‌বেন।

—বলি এটা কারখানা, তোমার সঙ্গে যদি কাজ থাকে ত সেটাতে আমি আপত্তি করতে পারি না। কিন্তু অন্য কথা এখানে হবে না!

—আর যে মোটে সময় নেই দাদা! কাল হ'ল শনিবার। পরশু রবিবার আপনার প্রথম দৌত্তুর ভাত খাবে। মাঝে মাত্তর একটা দিন হাতে আছে। যদি যৌতুক-টৌতুক ছান, তার ব্যবস্থার জন্যেও ত দিন হাতে রাখতে হবে!

—বটে, আমার দৌত্তুরের কথা অন্যের কাছে শুন্‌তে হবে?

—অন্য কেউ ত নয়, আমার যে ও-ই আবার প্রথম নাতি—এ্যাঁ, সেটা বুঝুন!

—তা, কি করতে হবে শুনি? হীরের গোট গড়াতে দিতে হবে না কি? ওরে আমার গোঁসাই ঠাকুর! বলি এতদিন কোথায় গিয়েছিল সব, মরতে পারে নি!

—আহা, অত চটছেন কেন! আপনার মেয়ে আপনার জামাই, সবই ত আপনার। অবস্থাগতিকে একটু অন্যরকম দাঁড়িয়েছে। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

—আর ঠিক হয়ে কাজ নেই। ও মেয়ের নাম আমার মুখে আনতে ঘেন্না হয়। মরে গিয়েছে মনে করে বেশ শান্তিতে ছিলাম। আবার কেন! মরছি নিজের জ্বালায়, তার ওপর খাঁড়ার ঘা মেরো না, দোহাই—তোমার পায়ে পড়ি।

—না দাদা এ হ'ল সুদ। কথায় বলে, গাছের ফেলে তলার কুড়াই, আসল ছেড়ে সুদটুকু খাই। এ হ'ল সেই সুদ। বুড়ো বয়সে আর কি আছে—

নাতি-নাতনীদের নিয়েই যা আনন্দ করা! ললিত বারবার করে বলে গিয়েছে আপনাদের কথা—সব ভার আমার ওপর দিয়ে গিয়েছে। হাজার হোক্, ওরা ছেলেমানুষ ত!

সীতানাথের গাত্রদাহ কিছুমাত্র কমে নি, কিন্তু গোবিন্দ এমন আকুতি করছে যে, এর ওপর চেঁচামেচি করতে রুচিতে আটকাচ্ছে। তবু সীতানাথ বল্‌তে ছাড়েন না—ওসব মিষ্টি কথা থাক। বলি কুকুর-বেড়ালের মতো এখনও ছেলেমেয়ের জন্ম দিচ্ছ, তাতে বুঝি আশা মিট্‌লো না! এখন নাতি চাই, নাতনী চাই! বলি, তুমি কি একটা মানুষ না কি হে? এদিকে মাইনে ত পাও—যাক গে, যার যাতে সুখ, সে তাই নিয়ে থাকবে। আমাকে বাপু ঘাঁটিয়ো না, যাও।

—যাবো? গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়ালেও যাবো না। আপনি সীতারামপুর যাবেন কথা দিন, ব্যাস তাহলেই মিটে গেল, কোন্ শালা আর থাকবে!

সীতানাথ হেসে ফেল্‌লেন। এত রাগেও হাসি পেল—সে শুধু গোবিন্দর কথা বলার ধরনে। তারপর সীতানাথের মুখখানা বিষাদের মেঘে থম্‌-থমে হয়ে উঠ্‌ল—আর নয় ভাই, ঢের হয়েছে। এই কটা দিন যেন শান্তিতে কাটে। জীবনে অনেক ত দেখলাম, সইতেও হয়েছে ঢের। আর ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ো না। মুকুল আমাকে যে দুঃখ দিয়েছে, সে ত কাউকে মুখ ফুটে বলবার নয়। মুখ বুজেই থাকি। খবর কি আর পাই নি, কিন্তু কানে এসেছে,—ওই পর্যন্তই। মনের চৌকাঠের ওপারে আর ঢুকতে দিই নি। কি হবে? ওরা সুখে আছে, সুখে থাক। ছেলেমেয়েগুলোকে মানুষ করতে পারুক, সে আশীর্বাদ দূর থেকেই করব। তার বেশি আর কিছু পারব না! তা ছাড়া, আমি ত ওদের কেউ নই, আমাকে ছেঁটে ফেলে দিয়ে বংশের মুখে কালি ঢেলে চলে যখন গিয়েছে তখনই ত সব চুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে। আমার কপাল—গিন্নী ত মরে বেঁচেছেন। পুণ্যের জোর ছিল তাঁর।

গোবিন্দবাবুর দু-চোখ ছাপিয়ে যেন অশ্রুবন্যা নামবে! প্রৌঢ় কথা বল্‌ছেন ধরা গলায়—দাদা, আপনার দুঃখ বুঝবে কে! কিন্তু আমার কথাটা ভাবুন, সোমত্ত ছেলেটা! বলা নেই কওয়া নেই, পালালো! লোকে কি

বলে নি, জোচ্চোরের বাপ আমি। কী না বলেছে! আর সংসারের কথা ছেড়েই দিলাম—সে আর এক পর্ব! আপনার বৌমা তিনবেলা আমাকে গালাগাল না দিয়ে জলগ্রহণ করত না; অপরাধ—আমার ছেলেকে মানুষ করি নি! কথাটা মিথ্যে নয়—কারখানার ওভারটাইম আর উঞ্ছাবৃত্তি করেই দম ফেটে যায়, সংসারের দিকে তাকাই এমন ফুরসৎ কই! কিন্তু তা বলে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করাটাও ত কর্তব্য! যাক, সে সব ত বুঝলেন। এখন আবার যখন ললিত এসে পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল, তখন নিজেকে সাম্‌লাতে পারলাম না। সব রাগ জল হয়ে গেল দাদা! ললিতের মা ঠিকই বলে, আমি দুর্বল চরিত্রের লোক। তা বলুক, তা মিথ্যে ত বলে না। আমি আবার কাউকে চটাতে পারি নে। মনে হয়, কী হবে, এই ত কটা দিন বাঁচবো—আর ত কিছু দিতে পারি নে কাউকে, একটু ভালবাসা আছে আমার মনে, তা তাই দিই। এতে ত আর পয়সা-কড়ি লাগে না।

—পারলে সেটা খুব বড় জিনিষ ভাই, কিন্তু সবাই ত পারে না!

—সবাই পারে দাদা, সবাই পারে। আমার মতো অকর্মা যা পারছে তা আর কেউ পারেনা হবে কি করে? তা হ্যাঁ যা বল্‌ছিলাম! ছোঁড়াটার হিম্মত আছে, বুঝলেন দাদা! আমার বৌমারও পয় বল্‌তে হ'বে। বিস্তর পয়সাকড়ি করেছে, বল্‌লে বিশ্বাস করবেন না—একখানা বাড়ি কিনেছে সীতারামপুরের মতো গঞ্জ যায়গায়। তা কথাটা মিথ্যে নয়। এখন আবার ভাইবোনেদের দেখাশুনো করে ত মন্দ কী! এখানে পড়ে থাকলে ত এতটা হ'ত না। আমার মতো জিন্দিগিটা লোহা গলিয়েই কাবার হ'ত! আমি বলি কি, ছেলেমেয়েগুলোকে মানুষ করতে পারে করুক না—আমাকে দিয়ে ত হ'ল না।

—টাকা-পয়সার কথা শুনিয়ো না। ওরকম অনেক বেজম্মার ঘরে লক্ষ্মীর দয়া হয়। কিন্তু তাকে মানুষ বলি কি করে! চুরি-জোচ্চুরী করলে কি পয়সা হয় না? তবে পয়সা ছাড়া আর কিছুই হয় না। যাক ভাই, তোমার সুখসম্পদ বাড়বাড়ন্ত হোক, তাতে আমার বুক ফাটবে না। কিন্তু আর কিছু বলো না দোহাই! জোচ্চোর, চরিত্রহীন লম্পটের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, এই হ'ল শেষ কথা!

—তা কথাটা আপনি মিথ্যে বলেন নি দাদা। তবে কি জানেন, ললিত আমার তেমন ছেলেই নয়, জোচ্চোর সে নয়। আপনার মেয়ের সেই আগের ইয়ে ছেলেটিকে ত ফেলে দেয় নি—নিজের ছেলে বলেই ত মেনে নিয়েছে। এই যে আপনার বারোশো টাকার ঋণ সে আজও স্বীকার করে। তার হিসেব একেবারে সুদে আসলে টু দি পাই-ফার্দিং জমিয়ে রেখেছে—আপনি পায়ের ধুলো দিলে সে ক্যাশ দু-টি হাজার টাকা দিয়ে প্রণাম করবে, সে কথাও বলে গিয়েছে। আমি বলি কি, এই ত চাই—টান পড়েছিল নিয়েছিলে, এখন শোধ করে দাও; তাহলেই ধম্ম তোমার কেনা গোলাম। এটা ত জোচ্চোরের কথা নয় দাদা, মিথ্যেও নয়। আপনি একবার গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সীতানাথ যেন চম্‌কে উঠ্‌লেন! তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়! এতগুলো টাকা, তাঁর উপস্থিতির মূল্য? লোকটা বলে কী?—বিশ্বাস করতে যেন সাহস হয় না! তবু একেবারে অবিশ্বাসই বা করেন কোন্ ভরসাতে? সীতানাথ এবার উঠে দাঁড়ালেন—আচ্ছা তা সে, যা হয় হবে। আর ভাববারও ত সময় নেই হে! তুমি বল্‌ছ, যাওয়া উচিত, এঁ্যা!

—সে ত আমি বলে বসে আছি দাদা। তাহলে ওই কথাই থাকল, আরতিদের সঙ্গে ওদের পাঠিয়ে দেওয়া যাক, কাল—ললিতের ত আসবার অবসর হবে না। লোক পাঠাবে সে। আর আমরা দু-বেয়াই দু-ভাই রবিবার সকালে রওনা দেবো। পাকা কথা।

সীতানাথ ঘাড় কাত্ করে সম্মতি জানালেন, নগদ দু-হাজার টাকার কথাটা কিছুতেই তুচ্ছ করতে পারেন না তিনি। তবু একবার বল্‌লেন—দেবে তো, না শেষে জাতই যাবে? কি গোবিন্দ, তুমি কি মনে করো?

—আর দেবে না মানে, ব্যাটা বাপকে আগে করে দেবে। নইলে মা লক্ষ্মী আমার তুলো ধুনে ছাড়বে না! সে ত আপনারই পয়দা! তার মাথা খুব শক্ত মাথা, নইলে ললিতের সাধ্যি কি ছিল যে নিজের বুদ্ধিতে এতখানি উন্নতি করে! বৌমা আমার সাক্ষাৎ দশভুজা। ছেলেটাকে কোথায় তুলেছে ভাবুন তো! আহা না হয়, কুমারী বেলাতে একটু ইদিক-উদিক হয়েছিল, তা সে সব ঢাকা পড়ে যায় দাদা—দোষটা ধরলেই দোষ, আর দোষ বাদ দিয়ে গুণটুকু ধরলে

অমন গুণবতী মেয়ে ত কোটিকে গুটিক দেখা যায়। তা আগে পক্ষের ছোঁড়াটাও বেশ সুন্দর দেখতে হয়েছে।

সীতানাথ আড়চোখে একবার দেখে নিলেন, অবিনাশ চাটুয্যে ধারে কাছে কি না। অবিনাশের কথা মনে পড়তেই সীতানাথ একটা অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করেন যেন! সে-ই যত নষ্টের মূলে। মুকুলকে সেই নষ্ট করেছে, তাতেও শয়তানের তৃপ্তি হয় নি, এখন সীতানাথের পিছনে আদাজল খেয়ে লেগেছে।

গোবিন্দর চোখে সীতানাথের ভাবান্তরটুকু ধরা পড়ল না। তিনি খুশি মনে সীতানাথের পায়ের ধুলো নিলেন।

সীতানাথ বল্লেন—আহা, ওকি করো, ওকি করো—

—দাদা, আমি বড় মুখ করে ছেলের কাছে বলেছিলাম, যা, তোর শ্বশুরের জন্যে ভাবতে হবে না—সদাশিব মানুষ তিনি। আমি যখন আছি তখন—। আপনি আমার মুখ রেখেছেন। তা কথাটা ত মিথ্যে নয়। আসি দাদা, ওদিকে অনেক কাজ!

—আচ্ছা ভাই!

সীতানাথ মনের মধ্যে পুষে-রাখা জ্বালাটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অনেক ক্ষণ ভেবে চিন্তে নিজের মনকে প্রবোধ দিলেন: সময় আসবে। এখন শুধু চুপ করে সয়ে যাওয়া চাই। তারপর একদিন ললিতের মতো অবিনাশকেও খেসারতী দিতে হবে। সীতানাথের মুখে একটা আত্মপ্রসাদের প্রসন্নতা ফুটে উঠ্‌ল। তাঁর বিশ্বাস, প্রাত্যহিক নিয়মে সূর্য-চন্দ্রের উদয় হয় যে ঈশ্বরের নির্দেশে, সে ঈশ্বর কখনও কোনো হিসেবেই ভুল করেন না। অবিনাশের দুষ্ট আচরণের প্রতিফল নিশ্চয় তিনি দেবেন। সীতানাথের চোখের সামনে বহুদিন আগে দেখা ললিতের ভুলে-যাওয়া মুখখানার আভাস ফুটে উঠ্‌ল! অথচ অনেক চেষ্টা করে মুকুলের মুখখানা মনেই আনতে পারলেন না, আদলটুকুও নয়! আরও একটি মুখ তিনি দেখতে পেলেন, সে হ'ল দেবজ্যোতির মায়ের মুখ—ক্লিষ্ট কিন্তু প্রসন্নতায় ভরপুর।

বেয়ারা এসে স্লিপ দিল—ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

সীতানাথ গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন—যা, বল, একটু দেরী হবে।

এইটুকুই সীতানাথের প্রতিবাদের পরিচয়। অবিনাশ ডেকে পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে দেখা করেন না, অকারণেই একটু দেরী করেন। আর অবিনাশ স্লিপ দিয়েই তাঁকে ডাকে। বেয়ারার মুখে খবর পাঠায় না—হয়ত চক্ষুলজ্জার বশেই, এই খাতিরটুকু।

আটচল্লিশ

গোলমাল বাধল মল্লিকাকে নিয়ে। দেবিকার কাতর অনুরোধ, সীতানাথের তর্জন-গর্জন কোনো কিছুতেই মল্লিকা টলল না। সে বলে দিয়েছে—আমি যাব না।

এর বেশি একটি কথাও বলে নি।

অবশেষে সবাই হাল ছেড়ে দিল।

সীতারামপুর এমন কিছু দূরস্থান নয়,—সেখান থেকে মোটরবাসে অনেক শ্রমিক হাজিরা দেয় মানিকপুরের কারখানায়। মিনিট পঞ্চাশেক সময় লাগে। দেবিকা আরতিদের সঙ্গে শনিবার বিকালে দিদির বাড়ি রওনা হ'ল।

যাবার সময় মল্লিকাকে বল্‌ল—মনের মধ্যে বিষ পুষে রাখবি কেন, চল্‌না!

মুখে কোনো জবাব দিল না মল্লিকা—দু-ফোঁটা চোখের জল ছাড়া ওর আর কোনো জবাব জোগাল না।

সন্ধ্যেবেলা জরুরী কাজ সীতানাথের, দৌহিত্রের জন্য তিনি একটা সোনার হার কিনতে বেরিয়ে গেলেন। একা-একা বাড়ির এতগুলো শূন্য ঘরের মধ্যে মল্লিকার দম বন্ধ হয়ে আসে। আজ দীনদয়ালরাও কেউ আসবেন না,—সীতানাথ আগেই বলে দিয়েছেন যে, তাঁরা দু-দিন মানিকপুরে থাকছেন না, বর্ধমানে যাচ্ছেন।

কত কথাই মনে পড়ছে মল্লিকার! আলো জ্বালে নি, অন্ধকারে বসে পুরনো দিনের রঙীন মায়া-মাখানো ছবি দেখছে। একটি কিশোর, লাজুকতায় রাঙা মুখখানা নীচু ক'রে নতুন বাঁধা কবিতা শোনাতো! প্রথমে মাথাটা হেঁট করে মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে—তারপর একটু-একটু করে মুখখানা তুলে মল্লিকার দিকে আকুল দৃষ্টি মেলে দিয়ে, কবিতা থামত! এমনি ভাবেই দু-জনের কৈশোর কেটে যৌবন এসেছিল। অথচ ওরা ত বুঝতে পারে নি। মল্লিকা কেবল এইটুকু বুঝেছিল, ললিত কাছে থাকলে ওর মনটা খুশি হয়,—সেই

সঙ্গটুকুর জন্যে কত লুকোচুরি! আর মনে হয়েছিল, ললিতের মনের কথাটা কেউ বোঝে না, কারুর কাছে লাজুক মনটা ধরা দেয় না, শুধু মল্লিকার কাছে এসে ও ডানা মেলে কল্পনার রাজ্যে ওড়ার স্বপ্ন ত্যাখে। অথচ মল্লিকা এসব বোঝে না। না বুঝলেও ভালো লাগে, এই অজানা অবাস্তবের মায়া-বিলাস!···

কোথায় গেল সে সব কবিতা? কবিতায় ছাওয়া, ঘোরলাগা দিনগুলো কোথায় ডুবে গেল! একখানি খাতার মধ্যে আজও ললিতের কবিতার পরিচয় রয়েছে। আজ হয়তো ললিত আর কাব্য লেখে না। মূল্যবান সোনাদানার জৌলুষে সে হারিয়ে গেছে। নইলে, এই মানিকপুরে এ.সও ললিত একবার মল্লিকাকে দেখে গেল না! সত্যি যদি জানত মল্লিকাকে, তাহলে ললিত নিশ্চয় আসতো। আর কিছুই ত চায় না মল্লিকা—ললিতের সংসার মুকুলের থাক, সেজন্য মল্লিকা ব্যস্ত নয়। ও শুধু শুনতে চেয়েছিল যে, ওকে ভোলে নি ললিত। কবি-মনের অতৃপ্তিটুকুই বুঝি মল্লিকার কাম্য ছিল!

একবার ইচ্ছে হয়েছিল দেবিকার হাতে কবিতার খাতাখানি ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে—। আবার মনে হয়েছে যে সেখানে এর মর্যাদা থাকবে না, কেউ বুঝবে না এই খাতাখানির মূল্য। সেই কবির ঠিকানা এখন কেউ ত খুঁজে পাবে না! কাঁচা হাতের গোটা গোটা হরফের অক্ষরগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকা অবাক-মুগ্ধ দুটি কচি মনের খবর কে পড়তে পারবে! মুকুলের বস্তুস্থূল স্পর্শে ললিতের কবি-মন কবরে চলে গিয়েছে। মল্লিকার কান্না সেই মৃত কবির জন্য।

কলিং বেল বাজল, কিন্তু তার পরেই—'মল্লি' বলে হাঁক.ত শোনা গেল না! তাহলে সীতানাথ নয়, অন্য কেউ। মল্লিকা একে-একে সবগুলি আলো জ্বাললো। তারপর খুলে দিল দরজা।

—নমস্কার!

হাত তুলে অমল অভিবাদন জানালো।

মল্লিকার যেন এক পলক বিলম্ব ঘটল বাস্তবে এসে পৌছতে! কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য নির্লিপ্ততা।

—আসুন, বসুন।

অমল হাসলো—এসেছিলাম একটু বসব বলেই। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে ঘুম থেকে উঠে আসছেন। কী, শরীর খারাপ নাকি?

—না, এমনিই। একা-একা বসে এমনিই ঘুম পায়।

—তা যা বলেছেন। আমারও সেই দশা, তাই বেরিয়ে পড়লাম। ওদিকে মাষ্টার মশাই আমাকে বিধবা করে কেটে পড়েছেন।

—তার মানে?

—সে আর না-ই শুনলেন। গুরুনিন্দা পাপমুখে করা কি উচিত হবে?

—খুব হবে, এক-কাপ চা বরং ঘুষ দিতে রাজি আছি। নিন্দে ত করেই সুখ, আর শুনেও সুখ।

—লোভ দেখাবেন না বেশি। একেবারে কেউ নেই, শুধু আমার জন্যেই চা তৈরী করবেন, সোজা কথা নয়। এমন খাতির বড় ত মেলে না,—রাজী হয়ে যাই যদি!

—বসুন, জলটা চড়িয়ে আসি।

—থাক-থাক আমি এমনিতেই বস্‌ছি।

—আমি কিন্তু ছাড়ছি না, আপনি কেবল দেবির হাতেরই চা খান। আজ একটু খারাপ চা খাইয়ে জব্দ করব।

মল্লিকা লঘু হবার চেষ্টা করে। অমল চৌধুরীর কথাবার্তার মধ্যে একটা কিছু আছে যা পরিচিত মহলের কারুর নেই। বৈশিষ্ট্যটা কোথায় তা মল্লিকা বোঝে না,—তবে ওই 'একটা-কিছু' পর্যন্ত ধরতে পারে।

অমল বল্‌ল, আশ্রম আজ ফাঁকা কেন? বালক-বালিকা ঋষিবর্গ সব কোন্ যজ্ঞে গেলেন? আর আপনিই বা রয়ে গেছেন কেন, তাও বুঝছি না।

—অত বোঝার চেষ্টায় কাজ কি! আমি না থাকলে আপনার গতি কি হত বলুন তো!

—অন্তত চা যে পেতাম না সেটা প্রত্যক্ষ বুঝলাম। একটা সিগারেট ধরাতে পারি?

ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানিয়ে মল্লিকা ভেতরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে যখন ফিরল মল্লিকা তখন ওর মুখখানা প্রসাধনের চিহ্নে কিছু উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ঘুম-ঘুম চেহারা আর নেই।

অমল লক্ষ্য করল, অবশ্য মল্লিকার অলক্ষ্যে।

—বলুন, আপনার গুরুশিষ্য সম্বাদ।

সিগারেটে টান দিয়ে অমল শুরু করল—আর কি বলি, মা যখন তাঁর ছোটছেলের জন্যে উতলা হয়ে এই অধমকে ফেলে কলকাতায় ফিরে গেলেন তখন আমি হঠাৎ অসহায় হয়ে পড়লাম। অথচ এর আগে এমন রোগ ছিল না। মাস্টার মশাইকে জোর করে বাদামতলার মেস থেকে নিয়ে এসে আমার ফাঁকা ঘর ভরাট করলাম। তারপর বেশ চল্‌ছিল, উনি সেতার বাজান, আমি শুনি। এই করে সুরের নেশাটা জমে উঠ্‌ল।

—সেইজন্যে বুঝি এদিকে আজকাল আসেন না?

—কই, এই ত পরশু না কবে এলাম!

—ও হ্যাঁ। আসেন তবে বসেন না, এসেই যাই-যাই করেন।

—মা ত গেছেন বেশ কিছুদিন। চা যখন দেবেনই তখন গল্পটা ফলাও করেই বলি, এঁ্যা! আমি আবার অল্পে কথা সারতে পারি না। মাস্টার মশাই আবদার ধরলেন, তুমি আসরে বাজাও। তা আমি পারব কেন? ওঁকে এগিয়ে দিলাম। এই আগামী কাল ইণ্ডিয়ান ক্লাবে একটা ফাংশন আছে, সেখানে ওঁর বাজাবার কথা! আজ ভোরবেলা ঘুম ভেঙে দেখলাম, উনি নেই। খেয়ালী মানুষ ত, কাল রাত দু-টো পর্যন্ত আমরা পথের ধারে গাছতলায় বসে সুরচর্চ্চা করেছি। ভাবলাম, হয়তো তার রেশ নিয়েই উনি বেরিয়ে পড়েছেন। সেতারও নেই দেখলাম। যাই হোক, সকালে কারখানাতে যাবার তাড়া। চাবী লাগিয়ে বেরিয়ে পডলাম। বিকেল, সন্ধ্যে, এই এখন পর্যন্ত অপেক্ষা করেও তাঁর দেখা মিল্‌ল না। কি করি—সেতারটা যদি থাকতো তাহলেও কথা ছিল!

—এমনও ত হতে পারে যে, উনি হয়ত দরজা খোলা পাননি!

—না, ওঁর কাছে ত আর একটা চাবী রয়েছে। তা ছাড়া চাবী না থাকলেও ওঁর ইচ্ছে থাকলে গাছতলাতেই সারাটা দিন কেটে যেত। আমি

ভাবছি অন্য কথা, লোকটা খাবে কী? পকেটে ত পয়সাও নেই। যেবক মানুষ, আর কোথাও গিয়ে জুটে পড়বেন তাও নয়। মনটা ভারি খারাপ হ আছে। এখন ভাবনা হচ্ছে, বুঝি আর এখানে ফিরবেন না। হঠা এসেছিলেন যেমন, বিদায়ও তেমনিভাবেই নিলেন, কে জানে!

—আপনার সেতার?

—সেতার একটা গেলে আর একটা কেনা যায়। কিন্তু ওরকম মানু ভগবান খুব কমই বানিয়েছেন—সেটাই আমার বড় ক্ষতি। কী যে অপরা হলো আমার, বুঝতেও দিলেন না।

মল্লিকা চেয়ে ছিল অমলের মুখের দিকে। ওর দৃষ্টিতে সংকোচ নেই সমবেদনায় আর্দ্র সে চাহনী। বল্‌ল—উনি ঠিক ফিরবেন, অত ভাববেন না

—না, না, আপনি ত জানেন না কিন্তু আমি মানুষটিকে এই কদিনে চিনেছি। এ পৃথিবীর সঙ্গে ওঁর যোগই নেই।

—আপনি একটু বসুন, চায়ের জল উথ্‌লে গেল হয়তো।

মল্লিকা ব্যস্তভাবে উঠে পড়ল।

কেৎলির ঢাকনাটা মাটিতে রেখে চায়ের পাতা পাত্রে ঢালতে ঢাল মল্লিকার বার বারই মনে পড়ছে অমলের বেদনামাখা মুখখানা। ভারি নর এই মানুষটির মন। কোথাকার কে মাস্টার মশাই, তার জন্যে কী উদ্বেগ আবার ললিতের কথা এসে জুটল মনের পটে। এমনি মন বুঝি ললিতের ছিল। ঠিক এমন না হোক, এর কাছাকাছি। কি জানি এখনও সেই এক রকম রয়েছে, নাকি বদলে অন্যরকম হয়েছে ললিত। সে কী মুকুলকে নি সুখী হতে পেরেছে? কেৎলীর মুখে ঢাকা দিয়ে মল্লিকা দুধটা উনুনে বসালো একটা বেড়াল এসে জানালার গরাদের ওপর সাম্‌নের পা-দুটো আঁক দু-বার ম্যাও-ম্যাও করে ডেকে, বেগতিক দেখে সরে পড়ল। মল্লিকা একবা তাকিয়ে দেখল, তাড়া দেবার কথা মনেই হয় নি। বিকেলেই রান্না সা আছে। মাছ আজ হয় নি। দুধটা ঝুলোনো শিকেতে তুলে রাখলেই হবে

ছাড়ো-ছাড়ো ভাবেই একথা সেকথা ভাবছিল মল্লিকা। আবার খানিক সময় ফাঁকা মনেই বসে অপেক্ষা করছিল। লিকারটুকু তৈরীর সময় দি

হবে ত। ওদিকে অতিথি একা ঘরে, কী মনে করছে! মনে করলেই বা কি! তা ছাড়া, এর মধ্যে যদি সীতানাথ বাড়ি ফেরেন তাহলে আবার একপত্তন কথা শুনিয়ে ছাড়বেন। অথচ মল্লিকা আর কি করতে পারত?—বাড়িতে কেউ নেই—এই বলে অমলের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া—! না, সে ধরণের অভদ্রতা তাকে দিয়ে হবে না!

ছাঁকনীটা কাপের মুখে রেখে, তাতে চিনি দিয়ে লিকারটা চামচেয় তুলে পরখ করে দেখল—না, আরও একটু ভিজলে তবে ঠিক হবে।

চায়ের কাপ নিয়ে বৈঠকখানাতে আসবার সময় মল্লিকার কেমন যেন সঙ্কোচ হ'ল। হঠাৎ কোথা থেকে একরাশি লজ্জা ওর পায়ে পায়ে জড়িয়ে গতি যেন অস্বাভাবিক মন্থর করে তুলল! কেন এমন হ'ল? মল্লিকার হাতখানা কাঁপছে, চায়ের পেয়ালাটা পড়ে যাবে না ত? শক্ত করে ধরল, আরও বেশি কাঁপছে কি ডান হাতখানা? বিচিত্র একটা অনুভূতির শিহরণে মল্লিকা আবিষ্ট হয়ে পড়ে।

চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকে অমলকে দেখেও ওর কাঁপুনী কমল না। কোনোরকমে পেয়ালাটা অমলের হাতে তুলে দিয়ে একখানা চেয়ারে বসে পড়ল।

অমল বল্‌ল—আপনার?

—আমি আর এখন খাবো না।

—সে কি হয়! আমিই বা একা একা—না, না, সে যেন খুব খারাপ দেখায়! নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হবে।

বলে অমল পিরীচে খানিকটা চা ঢেলে নিয়ে পেয়ালাটা মল্লিকার দিকে এগিয়ে বল্‌ল—চা আর জুয়া সঙ্গী-ছাড়া জমে না। নিন্ ধরুন—

মরমে মরে গেল মল্লিকা। কিন্তু অমলের সামনে মুখ তুলে প্রতিবাদ করবার শক্তিটুকুও এখন ওর নেই। অবশেষে মরীয়া হয়ে বল্‌ল—তবে প্লেটেরটুকু আমাকে দিন!

—ও বুঝেছি আপনি গরম চা খাবেন না—রং ময়লা হয়ে যাবে বলে! বেশ। তাই হোক।

প্লেটটা নিয়ে মল্লিকা বল্‌ল—তার মানে ?

—মানে আবার কী ? আমাদের মেজোসাহেবকে দেখেছি, তিনি কক্ষণো গরম চা খান্ না, ঠাণ্ডা করে তবে—কারণ নাকি গরম চা খেলে রং কালো হয়ে যায় ! আরে আগে জানলে কি অমন মারাত্মক অভ্যেস করি ? এমন অভ্যেস আমার যে, গরম চা—আর সরবৎ ঠাণ্ডা না হ'লে মন ওঠে না। চা যদি এতটুকু কম গরম হলো ত, কাপটি ঠোঁটে ঠেকিয়েই নামিয়ে রাখি। তারই ফলে ত রং-টা আমার এমন ময়লা দাঁড়িয়ে গেছে, নইলে যা রং হতো ! যাক নিজের প্রশংসা আর নিজে করব না ! নিন্ ঠাণ্ডা করবেন না।

—আহা এমন ঠাট্টা করেন কেন, না হয় আপনার রং ফর্সাই আছে। তা বলে কি আমরা এই কালো মানুষেরা মানুষই নই ?

—তা হচ্ছে না। আপনি বুঝি ভাবছেন নিজেকে কালো বল্‌লেই অমনি আমি আপনার প্রশংসা করব ? অতো বোকা নই—পাশাপাশি মেলালে আপনাকে বেশি ফর্সা দেখাবে জানি, তবু কবুল করব না। গরম চা খেয়ে যেটুকু কালো হয়েছি সেটুকুর হিসেব কে দেবে ?

—চিনি দুধ ঠিক হয়েছে ত ?

—আপনার হাত বড় মিষ্টি।

কথাটা বলে ফেলেই অমল দেখল লজ্জায় মল্লিকার মুখখানা আবীরের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে। পরক্ষণে অন্যদিকে তাকিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে সে শুধ্‌রে নিতে চেষ্টা করে—তাতে কি হয়েছে। সবাই ত আর আমার মতো কম মিষ্টি খায় না ! আমার মায়েরও ওই কথা, চা ত কেবল দুধ চিনির লোভেই খাওয়া !

—ইস্ আগে জানলে কম চিনিই দিতাম। আমি আবার ভয়ে ভয়ে একটু বেশি চিনি—বল্‌তে বল্‌তে মল্লিকা আর একবার রাঙা হয়ে উঠল।

অমল হাসল—রেশনের দৌলতে জিভের তাক্ তৈরী হয়ে গেছে। এরপর হয় ত বিনা চিনির চা-ই ফ্যাশন হবে। শুনেছি রাশিয়াতে লোকে সেই চা-ই পছন্দ করে। আর আমাদের হিমালয় পাহাড়, চায়ের বাপের বাড়ি

আর কি—সেখানে পার্বতীরা সব ভাতের মতো চা-পাতা সেদ্ধ করে তাতে নূন দিয়ে খুব তরিবৎ করে খায়। আর গিয়ে আপনার গিয়ে তিব্বতে—

এবার মল্লিকা বাধা দিল—হয়েছে। আর তিব্বতে যেতে হবে না। কাল থেকে আপনার চায়ে চিনিই দেবো না। উঃ, এতও বক্‌তে পারেন!

—একটুও বকিনি। আপনি এমন অপবাদ দিলে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। আপনার বাড়িতে বসে, আপনার হাতের চা আদায় করে আবার আপনাকে বকুনী দেবো? আপনার একথায় খুব লজ্জা হচ্ছে।

—আপনি বড় বাঁকা কথা বলেন। আমি ত বলিনি যে আপনি আমাকে বকেছেন!

মল্লিকা এধরণের কথার খেলাতে অভ্যস্ত নয়। তবু খুব ভাল লাগছে ওর।

অমল শূন্য পেয়ালাটা হাতে ধরে বসে ছিল। লক্ষ্য করে মল্লিকা তার হাত থেকে নিয়ে জানলার ওপর রাখতে গিয়ে হাত ফস্কে পড়ল। কাচ ভাঙার শব্দে চম্‌কে উঠ্‌ল মল্লিকা। তারও চেয়ে ঢের বেশি লজ্জা পেল। মরমে মরে গিয়ে মুখখানা আর সোজা করে তুলতে পারছে না অমলের সামনে।

অমল হেসে উঠ্‌ল—অনিল থাকলে খুব খুশী হত। ওর আবার চীনেমাটির জিনিস ভাঙার আওয়াজ শুনতে ভারি ভালো লাগে।

অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে মল্লিকা হাসলো—তাই নাকি লাগে!

—কেন এটা আর এমন কি আশ্চর্য ব্যাপার! সেতারেও সুর আছে, ওই কাঁচ ভাঙাতেও সুর আছে।

মল্লিকা বল্‌ল—আমি ত কাঁচভাঙার সুর শোনালাম, এবার একদিন আপনার সেতার শোনাবেন?

—উঃ, আমার বড্ড কাজ রয়েছে। আচ্ছা আসি এখন।

তার উঠে পড়ার ভঙ্গীতে মল্লিকা হাসি চাপতে পারল না।

—ও কী, হাসির কি হ'ল। কাজের কথায় এত তাচ্ছিল্য!

—থাক আর চালাকী করতে হবে না। বসুন, না হয় সেতার শোনাবেন না।

—ভদ্র ভাষায় আলাপ একেই বলে। আপনি সেতার শুনতে চান না, সে আমি জানি।

—কই, সেকথা আবার কখন বলেছি? বাঃ!

—এই ত এখুনি বল্‌লেন।

মল্লিকা কাচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে বাইরে ফেলে দিল। অমল উঠে দাঁড়ালো।

—আজ আসি। সান্যাল মশায়ের দেখা পাবো বলেই আসা, তা তিনি আজ আর আসবেন না মনে হচ্ছে।

—ও, তা তাঁর ওখানে গেলেই পারতেন, অনেকটা বাজে সময় নষ্ট হল আপনার।

—জীবনে এরকম বাজে সময় নষ্টর সুযোগও ত বেশি আসে না। কাজের সময়ের ঠাসা সোনার ওপর এই বাজে মিনের অলঙ্কারটুকু বেমানান হবে না—মনকে তাই বোঝানো যাবে।

—আবার যদি কাজে ফাঁকি দিতে ইচ্ছে হয় ত আসবেন।

—এবার একদিন মাষ্টার মশায়ের সেতার শোনাবো—যদি তিনি ফেরেন।

—দেখুন, আপনার মাষ্টার মশাইটি কিন্তু সুবিধের লোক নন্। এলে হয়।

—না এলেও একটা সুবিধে হবে। সেতারটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবে। বেচারীর কানে মোচড় দিয়ে, পর্দার মাথায় বাড়ি মেরে যেসব বদ-বেসুর বার করেছি, সেগুলোর হাত থেকে রেহাই পাবে। মাষ্টার মশাই-এর হাত ত নয় সুরের সুরধুনি!

—ও কী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত বকবেন! আর একটু বসুন—সান্যাল মশাই রাতে আর কারখানাতে ডিউটি দেবেন না ত! গেলেই হবে 'খন।

—নাঃ, আজ আর নয়। অনেক বকেছি। কতদিন যে একসঙ্গে এত কথা বলি না মনেই পড়ে না। সেই অনিল আর মা এখানে থাকতে—।

বল্‌তে বল্‌তে অমল যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল! অন্যমনস্কতা না মনের গভীরে ডুবে যাওয়া এটা মল্লিকা ধরতে পারে না। ও নিজেও চোখের সামনে যা দেখছে তার পুরোটা দেখছে না যেন!

অমল চলে যাবার পর কতক্ষণ যে মল্লিকা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল হিসেব নেই। কাপভাঙার শব্দটা এখনও ওর কানে বাজছে। অমলের সামনে এরকম অপটুতা প্রকাশ করে ফেলেছে, ভাবতেও লজ্জা করছে। অথচ এমনিতে মল্লিকা ত মোটেই অসাবধান নয়। ওর যেন আজ কি হয়েছে! সামনের পথ দিয়ে কত লোক যাচ্ছে, অন্ধকারে তাদের ছায়ামূর্তিগুলি অবাস্তব মনে হয় ওর। একখানা লরী গেল,—কামীনেরা গান গাইছে। মেয়েলী গলায় সাঁওতালী একটানা সুরের রেশ বাতাসে ভেসে আসে।

সীতানাথ ফিরলেন অনেক রাত ক'রে।

দুটি হারই তিনি কিনেছেন। আপন মনেই মল্লিকাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন—সে আমি পারবো না, একজনকে দেবো আর একটি জুল্-জুল্ ক'রে তাকিয়ে দেখবে, আর ভাববে দাদু বুঝি তাকে ছেঁটে বাদ দিতে চায়! যার যেমন বিচার,—লোকে মন্দ ব'লে কি আমিও মন্দ হবো! না কিরে মলি, তুই কি বলিস্।

মল্লিকা জবাব দিল—এসব কিছুই করার দরকার ছিল না।

—তা বল্‌লে কি চলে? সমাজে চল্‌তে গেলে অনেক কিছু মানিয়ে-বনিয়ে নিতে হয়। নইলে কি আর আমিই যেতাম, যেতে কি ইচ্ছে করে নাকি? তবু কর্তব্য! তা ছাড়া শুনলাম ত ললিত বেশ কামিয়েছে লড়াই-এর বাজারে।

মনে মনে তিনি হিসেব করে ফেলেছেন, হার দুটির দাম বাদ দিলেও দু-হাজার টাকার অনেক জমা থাকে।

একবার বল্‌লেন—তুইও গেলেই পারতিস্, সবাই যখন যাচ্ছে।

মল্লিকা নিরুত্তর।

ওর মনে এখনও সন্ধ্যার ছবিটা উজ্জ্বল, যেন তাতেই বেশ খুশি! বলি-বলি ক'রেও অমলের আসার খবরটা মল্লিকা শেষ পর্যন্ত সীতানাথকে বলল না।

সীতানাথ আপন মনে খাওয়া-দাওয়া সেরে তামাক টানতে টানতে মন্তব্য করেন—হ্যাঁ রে, মুকুল যদি এখানে আসতে চায়—আর চাইবেও, কতদিন বাড়ি ছাড়া, তখন কি বলা যাবে?

একথায়ও মল্লিকা যোগ দিল না। যেন এ সংসারের সঙ্গে ওর কোনই সম্পর্ক নেই!

উনপঞ্চাশ

আয়োজন সামান্য নয়। সীতানাথ দেখে খুশীই হ'লেন, নতুন বাড়ির সাম্নে খানিকটা মাঠ ত্রিপল দিয়ে ঢাকা হয়েছে। একটা রসুনচৌকিরও ব্যবস্থা রয়েছে। মাঝে মাঝে বাজনা বাজছে। বেশ বড়লোকী আবহাওয়া। গোবিন্দবাবু বাড়িতে পা দিয়েই হাঁকডাক শুরু করেছেন। ললিত বাড়ি নেই, মুকুল আর জাতককে নিয়ে কল্যাণেশ্বরীর পূজো দিতে গিয়েছে, ফিরতে বেশি দেরী হবে না। দেবিকা আরতি কেউই নেই—এই সুযোগে কল্যাণেশ্বরীর মন্দির দেখতে যাবে বই কি!

সীতানাথ চায়ে চুমুক দিয়ে বল্লেন—বাঃ, গোলাপ ফুলের মতন গন্ধ ভায়া!

গোবিন্দ বল্লেন—হবে না, দাদা—মানিকপুরের মতো ওঁছা জায়গা ত নয়। তার ওপর বিজ্‌নেস ম্যান, টু পাইস করেছে। নজরটা ভালোই ছোকরার।

—তা যা বলেছ। আচ্ছা, কল্যাণেশ্বরী এখান থেকে কতটা দূর হবে? এতকাল এই তল্লাটেই কাটালাম, অথচ মায়ের স্থানটা আর দেখা হয়ে ওঠে নি! কপাল, সবই কপাল—ওই রবিন্‌সন সাহেবই আমাদের দেবতা।

—যাবেন দাদা? দূর আর এমন কি, তবে বাস্‌ পাওয়া যায় না যখন-তখন। বাসে এখান থেকে বরাকর, তারপর টাঙ্গা। অবিশ্যি হেঁটে গেলে মিনিট পঁচিশ আরও লাগবে! ওরা সব গিয়েছে গাড়ীতে, ললিতের বন্ধুর গাড়ী।

—আচ্ছা এখন থাক, পরে দেখা যাবে!

—সেই ভালো। এদিকে ত বিরাট যজ্ঞির ব্যাপার ফেঁদে বসেছে—পোঁটা চুন্নীর ব্যাটা চন্নন্ বিলেস! আমার ত দেখেই হয়ে গিয়েছে আক্কেল! আরে পঞ্চাশ জন ত লোকই খাটছে—খাদ্যখাদক ব্যবস্থার পেছনে! এদিকে দিশী, উদিকে বিলিতি—সর্বরকমের নিমন্ত্রিত। এলাই কাণ্ড, বুঝলেন দাদা—আপনার দৌত্তুরের অন্নপ্রাশনে একটা কাণ্ডই হলো।

—তা কেন, বলছ ভালো। তোমার যে নাতি হে, আজ কতবড় আনন্দের দিন তোমার।

সীতানাথ এবং গোবিন্দ দু'জনেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত। সত্যি, এ যেন ভাবাই যায় না! এমন একটা অভাবনীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে, কম কথা নয়।

সুবেশ যুবকেরা কর্মব্যস্ত ভাবে ঘোরাফেরা করছে। তারা সন্দিগ্ধভাবে গোবিন্দ ও সীতানাথের দিকে কটাক্ষ ক'রে চলে যাচ্ছে। তাদের পোষাক-আশাক দেখে সীতানাথ অনুমান করেন, এরাও অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে না হয়ে পারে না। গোবিন্দবাবু একজনকে ওইরকম ভাবে তাকিয়ে চলে যেতে দেখে বল্‌লেন—ওহে, শোনো।

ছোক্‌রা অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে জবাব দিল—আমাকে কিছু বলা হচ্ছে?

—হ্যাঁ, বলি ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা ভাল হচ্ছে ত! দেখো বাবু মান-ইজ্জৎ বজায় থাকে যেন।

যুবকটি তাচ্ছিল্যভরে হাসলো—সে নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

গোবিন্দবাবু নিজের খুশিতেই মশগুল্—হ্যা-হ্যা, তোমরা যখন আছো তখন আর ভাবনা কি। তবু বল্‌তে হয়, তাই বলা, বুঝলে হে ছোক্‌রা!

যুবকটি ভ্রূকুটি করে এগিয়ে এল—ছোকরা আবার কি কথা মশাই!

সীতানাথ হো-হো হাসিতে যেন উপ্‌ছে উঠ্‌লেন—ওহে ভায়া, আদবকায়দা জানো না, বাবু বল্‌তে হয়।

গোবিন্দ বিলক্ষণ চটে গেছেন—বেশ করেছি, ছোক্‌রা বলেছি। তুমি ত ললিতের চেয়ে ছোটই হবে।

—তা ললিত-ললিতই বা করছেন কেন। বিষয়টা কি বলুন ত মশাই!

—দেখুন দাদা, দেখলেন ছোকরার রীতিচরিত্তির! আরে বাপু নিজের ছেলেকেও কি বাবু বলিয়ে ছাড়বে নাকি? বলি এসব ঘটা-পটা কার দৌলতে শুনি! যজ্ঞেশ্বরকে চেনো নি এখনও? এ্যাই আমি আর এ্যাই উনি, বুঝলে? ললিতের পিতে আর ললিতের শ্বশুর—বলি বুঝলে হে ছোকরা!

যুবকটি চুপ্‌সে গিয়ে হাত জোড় ক'রে বল্‌ল—চিনতে পারি নি স্যার, মাপ

করবেন। তা আপনারা কেন রোদ্দুরের মধ্যে কষ্ট করছেন, ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন।

—ওহে এটা কি বিশ্রামের সময়? বলি, দেখাশুনোটা না করলে চলে! এঁ্যা!

—না, না, সে কি হয়। আপনারা কষ্ট করবেন কেন, আমরাই ত আছি।

—দেখলেন ত দাদা, আমি বলেছিলাম কি না, আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। আরে এরা সব সোনার চাঁদ ছেলে। যাও, এখানে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নয় এটা, এখন চতুর্দিকে কাজ!

সীতানাথ অভিভূত হ'য়ে পড়েছেন জামাতার ঐশ্বর্য-প্রতিপত্তি দেখে। তবে গোবিন্দবাবুর মতো আতিশয্য প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব নয়। তাই সময়োচিত গাম্ভীর্য বজায় রাখতে তিনি বিশেষ সতর্ক।

এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। লোকজনের ঘোরাফেরার কামাই নেই। কিন্তু এর মধ্যে একটিও চেনা মুখ নজরে পড়ে না। এতবড় সমারোহের মধ্যে সীতানাথ বড় অসহায় বোধ করেন। এখনও ললিতদের ফেরার নাম নেই। প্রথম সাক্ষাতের পালাটা এখনো বাকী রয়েছে—মনে মনে সে অস্বস্তি কম নয়।

বারোটা নাগাদ ওদের গাড়ী এল। গোবিন্দ বাবু ছুটে বেরিয়ে গেলেন। সীতানাথ আসন ছেড়ে নড়লেন না—ওটা যেন আদেখলেপনা!

গরদের শাড়ী পরা, মাথায় একটু ঘোমটা টানা, মুকুল এসে ঢুকল। সীতানাথ দেখে বুঝতে পারলেন না, হাসবেন কি গম্ভীরই থাকবেন! মুকুলের মুখখানা যেন আগের চেয়ে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে! রং-ও বেশ ফর্সা হয়েছে। কপালে সিঁদুরের টিপটুকু উজ্জল।

প্রণাম করল মুকুল, মুখ তুলে তাকিয়ে বল্‌ল—বাবা, তোমার এ কী চেহারা হয়েছে, তাকানো যায় না যে!

সীতানাথ কোনো কথাই বল্‌তে পারলেন না। বাক্‌শক্তি যেন কেড়ে নিয়েছে কে! একটু হাসলেন সীতানাথ। মুকুল আবেগরুদ্ধস্বরে বল্‌ল—তুমি হতভাগীকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে—এ যে স্বপ্নেও ভাবি নি বাবা!

ঝর-ঝর করে অঝোর ধারে মুকুলের দু-চোখ বেয়ে অশ্রুবেগ নামল।

কোনোরকমে উদ্যত অশ্রুবেগ গোপন করে সীতানাথ বললেন—আনন্দের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই মা! কই আমার দুই শালাকে নিয়ে আয়, তাদের দেখি!

দেবিকার কোলে চড়ে রয়েছে ছোট ছেলেটি, বড়টির হাত ধরে ললিত এল। সীতানাথ দুই দৌহিত্রের গলায় দু-টি হার পরিয়ে দিয়ে গাল টিপে আদর করলেন, বললেন—গরীব দাদামশাই কিছুই করতে পারল না ভাই, রাগ করিস নে!

তারপর ললিতের কাছ থেকে বড় ছেলেটাকে টেনে নিয়ে কোলে তুললেন—তুমি শালা বড় পাজি! এতদিন দাদুর খবর নাও নি কেন?

মুকুল বলল—বাবা, আমি যাই ওদিকে কি কতদূর হ'ল দেখি!

—হ্যাঁ মা, তোমাকে আটকে রাখলে ত চলবে না, যাও-যাও।

মুকুল চলে গেল, দেবিকাও তার পিছু-পিছু। সীতানাথ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, ললিত তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সীতানাথ বললেন—তা বাবাজী, তোমার শরীর বেশ ভালো তো!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এখানে কোনোরকম অসুবিধে হচ্ছে না ত?

গোবিন্দবাবু পিছন থেকে জবাব দিলেন—অসুবিধে আবার কি রে, মেয়ের বাড়ি ত নিজেরই বাড়ি। সুবিধে-অসুবিধের কি আছে, এ্যাঁ!

ললিত বোধকরি একটু লজ্জিত হ'ল। বলল—তা ত বটেই!

ঘি আর মসলার গন্ধে বাতাস সুরভিত। মাঝে মাঝে সানাই-এর সুর ভেসে আসছে। যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই সমারোহের আড়ম্বর। তবু সীতানাথের মনটা এখানে কেন যেন তৃপ্ত নয়! তিনি দ্বিপ্রাহরিক আহারে বসে বিশেষ কিছু খেতে পারলেন না, অনুরোধ অনুযোগ কিছুই তাঁকে স্পর্শ করছে না—আশ্চর্য ঔদাসীন্যে সীতানাথ অন্যমনস্ক। জামাই-মেয়ে বেয়াই-বেয়ান সবাই সীতানাথকে ঘিরে রেখেও ঠিক প্রসন্ন করতে পারছে না। তিনি এসবের বাইরে বেরিয়ে একটু ফাঁকায় নিশ্বাস ফেলতে পারলে যেন বাঁচেন!

আহারান্তে দামী খাটের ওপর নরম গদীতে শুয়ে ধবধবে হাল্কা বালিশে

মাথা ঠেকিয়েও ঘুম এল না সীতানাথের। কিছুক্ষণ পরে উঠে বসলেন, আস্তে পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে এলেন। গোবিন্দবাবুকে ডেকে বল্লেন—ভায়া আমি একটু বেরুচ্ছি।

—এই রোদে আবার কোথায় যাবেন ?

—এত কাছে এসে যদি কল্যাণেশ্বরী মায়ের চরণে প্রণাম না করি ত অপরাধই হবে। তাই ভাবছি একবার ঘুরে আসি।

—তা সে আর একদিন গেলেই হবে। আজ কি করে যাওয়া হয়—এত বড় দায়িত্ব ঘাড়ে! এখন ত মেয়ের বাড়ি আসা-যাওয়ার কামাই থাকবে না আপনার। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ?

—মনটা বড় টানছে ভায়া। ঘুরেই আসি।

গোবিন্দ বল্লেন—নেহাতই যাবেন, তা দেখি গাড়িটা—

—থাক-থাক, এখানে কতো কাজ গাড়ির। আমি একা মানুষ, কিছু অসুবিধে হবে না। গাড়িফাড়ি কখনো চড়া অভ্যেস নেই ত!

গোবিন্দ বাবু উৎসবের নেশায় বুঁদ। কাজেই আর সীতানাথকে বেশি বাধা দিলেন না—শুধু স্মরণ করিয়ে দিলেন সীতানাথকে—কিন্তু দেরী করবেন না যেন ফিরতে, এদিকে খাওয়া-দাওয়ার সময় ঘনিয়ে এল!

গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের একটা চড়াই সামনে। বাসের অপেক্ষায় গাছ তলাতে দাঁড়িয়ে সীতানাথ সেদিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন, ভারি সুন্দর রাস্তা ত! এই মানিকপুরে থেকেও তিনি এমন চমৎকার পথটি কখনও দেখেন নি। ঝাঁ-ঝাঁ রোদে বাতাস উত্তপ্ত—একটা ঝিক্-ঝিকে আলো বায়ুস্তরকে চঞ্চল করে তুলেছে, এ আলোর যেন একটা তরল দেহী রূপ আছে।···মুকুলের ভাগ্য সম্পদে-প্রাচুর্যে ভরপুর। কিন্তু তার মধ্যে কোথায় যেন একটা বিরাট কোনো দৈন্য রয়েছে—যেটা সীতানাথ অনুভব করেছেন!

তাঁর ভালো লাগে নি। দূরত্বের ব্যবধান তাঁকে পীড়া দিয়েছে, অস্থির করে তুলেছে, তাই বেরিয়ে পড়েছেন সীতানাথ। ললিতের ব্যবহারে তিনি খুশী হতে পারেন নি। গোবিন্দবাবু যেরকম আগ্রহ দেখিয়ে টেনে এনেছিলেন,

তার পিছনে সম্ভবতঃ ললিতের কোনো নির্দেশ বা অনুরোধ ছিলই না, নইলে এমনটা হয় কি করে? মাত্র সাধারণ ভদ্রতাই করেছে ললিত, তার বেশি নয়। এমন কি প্রণাম পর্যন্ত করে নি। আরও একটা কথা সীতানাথ ভুলতে পারছেন না—সেই দুহাজার টাকা। গোবিন্দ কি তবে মিথ্যে ধাপ্পা দিয়েছে? সেটাই বেশি পীড়াদায়ক। অনেকবার ভেবেছেন, গোবিন্দকে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করবেন টাকাটার কথা। কিন্তু পারেন নি,—আরও কতকগুলো বাজে কথায় গোবিন্দ হয়ত সীতানাথের বহুকষ্টের বজায়-রাখা ভদ্রতা ঘুচিয়ে দেবে, শেষে এই নিয়ে একটা হাঙ্গামা বেধে যেতে কতক্ষণ?

সীতানাথ নিজের কাছেই লজ্জিত আজ। স্রেফ টাকার লোভে পড়েই বড়লোকের বাড়িতে মান বিসর্জন দিতে এসেছেন! ধিক্কার নিজেকেই দিচ্ছেন তিনি। গোবিন্দর মুখের কথাটা বিশ্বাস করাই ভুল হয়েছে তার। তখন কেন একবারও মনে হয় নি যে, ললিতের পূর্ব-ইতিহাসে যে প্রবঞ্চনার সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে তাতে করে—! আর মুকুলকেও তিনি জানেন। আশ্চর্য, সবই বদলে গিয়েছে—মুকুলকে দেখলে মনেই হয় না যে এই সম্পন্ন ধনী-গৃহিণীই সেই মেয়ে। আর ললিত! সেও কম বদলায়নি—লাজুক সেই মিষ্টি ছেলেটার সঙ্গে এই গম্ভীর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গর্বিত যুবকের কোনো মিল নেই। এখানে এসে গোবিন্দও যেন ভিখারী কাঙালের মতো ঘুর ঘুর করছে! কেউ যদি মনে করে বসে সীতানাথও গোবিন্দরই মত হ্যাংলা—ছি-ছি, তার চেয়ে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না।

জনবিরল পাহাড়ী ঝর্ণার পাশে ছোট মন্দিরটি। দোকানপাট বল্‌তে দুখানা চালা ঘরে, তেলেভাজা আর চিড়ে মুড়ি বাতাসা, বোঁটা ভাঙা কাপে চায়ের আয়োজন, দীনতার চিহ্ন তার চালা থেকে তলা পর্যন্ত। দেবীর মন্দির একতলার অন্ধকার ঘর। যাত্রীর সংখ্যা সামান্যই। ঝর্ণার ওপরে পাহাড়। শান্ত নির্জন এই যায়গাটুকু যেন পৃথিবীর বাইরে! সীতানাথ মন্দিরে প্রণাম সেরে পাথরের ওপর পা ছড়িয়ে বসে ভাবছিলেন।···আজ আর তিনি কারুর অমঙ্গল চিন্তা করবেন না। পরক্ষণেই মনে হল, মুকুল ত কই মল্লিকার কথা একবারও বল্‌ল না। ললিত সীতানাথের সঙ্গে বিশেষ কথাই কয় নি। ওই রকম মুখের

চেহারা যার, সে কেন দু-হাজার টাকা নাহক হাতে করে জলে ফেলে দেবে? মাঝখান থেকে কতকগুলো বাজার ধার হয়ে গেল সীতানাথের—হার দুটো কিনতে! ওদের কাছে এর কোনো মূল্যই নেই। একবারও বল্‌ল না, ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে। অথচ দাম ত অনেক। সীতানাথ দশবার ভেবেছেন। এর চেয় সস্তায় হাল্কা হারও দোকানী দেখিয়েছিল—কিন্তু না, দিতে গেলে ভালো জিনিসই দিতে হয়। দাম একটু বেশী পড়ল তাতে কী! এদিকে আয় কমে গিয়েছে। বয়স বাড়লে লোকের পদোন্নতি হয়, আর সীতানাথের কপালে তার বিপরীতই ঘটছে। সর্বত্রই তিনি কেন এমন ভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন?—কল্যাণেশ্বরী কি এর কিছু একটা বিহিত করতে পারেন না? মুকুলের বড় ছেলেটাকে দেখলে মায়া হয়। ওর যেন সংসারে আপন কেউ নেই! কেউ ওকে ত্যাখে না—নিজেই ও সকলের স্নেহ আকর্ষণের বৃথা চেষ্টা করে!···

একজন যাত্রী ঝর্ণার ধারে বসে চিঁড়ে ভিজিয়ে দুপুরের আহার চুকোচ্ছে। কোথা থেকে একটা কাক এসে জুটেছে, অদূরে বসে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটার খাওয়া দেখছে। লোকটা যখন গ্রাস তুলছে মুখে, তখন কাকটা দৃষ্টি দিয়ে যেন চিঁড়ের দলাটা লেহন করছে! পরক্ষণে কা-কা করে বিরক্তি-ভরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। একমনে খাচ্ছে লোকটা। অবশেষে শূন্য শালপাতাটা ফেলে দিয়ে সে ঝর্ণায় হাত ধুতে নামল, কাকটা লাফিয়ে এসে পাতা ঠোকরাতে লাগল। সীতানাথের দৃষ্টি ওই কাকের দিকে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল মল্লিকা বেচারী একলা বাড়িতে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। সোজা চলে যাবেন মানিকপুরে—গোবিন্দর নাতির অন্নপ্রাশনের ব্যাপারে তিনি আর নেই। মল্লিকা ঠিকই করেছে সীতারামপুরে না এসে।

বেলা পড়ে এসেছে। রাস্তার দু-পাশে জঙ্গল—পলাশ, বেল, অর্জুন—গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে নদীর বিস্তীর্ণ বালির চর। লোকজন বিশেষ চলাচল নেই। একখানা কুঁড়ের সামনে উলঙ্গ শিশু পাকা আমের আঁটি চুষছে—ফলের রসাস্বাদে শিশুটির চোখেমুখে অপরিসীম তৃপ্তি। সীতানাথ তার দিকে তাকাতেই শিশুটি ভেংচি কেটে ছুটে পালালো। কুঁড়েখানার পিছনে আম গাছের ছায়ায় বসে কুমোর বানাচ্ছে মাটির কটোরা। ভিজে কাঁচা মাটির ওপর

পড়ন্ত রোদ চিক্‌চিক করছে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে সীতানাথ মনোযোগ দিয়ে চাক ঘোরানো দেখছেন—বেশ ভালো লাগছে, নিপুণ হাতে ঠাণ্ডা নরম কাদার তালকে সূক্ষ্ম সুডৌল পাত্রে পরিণত করার কাজ দেখতে।

ছেলেবেলায় তাঁদের গাঁয়েও কুমোররা এমনি ভাবেই কাজ করত। কুমোর-বাড়ির উঠোনে ছিল একটা পেয়ারা গাছ—তার ফল ছিল গাঁয়ের সেরা। জমিদার বাবুদের জামাইষষ্ঠীতে সেই পেয়ারা ভেট পাঠাতো পঞ্চা কুমোর। কুমোর বুড়োর মেজাজ খুব খরখরে, কিন্তু একবার পঞ্চা কুমোরের তৈরী সরা কি ভাঁড়ের প্রশংসা করলেই আধখানা পেয়ারার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যেতো। অমনি খানিকটা মাটির তালও দিয়ে দিত বুড়ো। · কতকাল আগেকার এইসব স্মৃতি, অথচ এই দণ্ডে মনে হচ্ছে কালকের ঘটনা! সীতানাথ ভাবনার সহস্র যোজন দূরের হাতছানিতে উৎসুক আগ্রহে তাকিয়ে থাকেন। আর কোনো ছবি মনের সাম্‌নে নেই? আছে, বেনেদের কাল বৌ ছিল, দিনরাত ডাল বাট্‌তো আর গালাগালি করত অকর্মণ্য ছেলেকে। ছেলেটা যাত্রার দলে নিয়তির ভূমিকায় গান গেয়ে বেড়াতো—সৌখীন মেজাজ, বাহারী বাবরী চুল, আর অবরে-সবরে বার্ডশাই ফুঁকতো—মায়ের গঞ্জনায় মুখে সাড়াশব্দটিও করত না। বেনে বৌ কলাই-ডালের পাঁপড় করত খুব সুন্দর! মাটির ওপর রোদে শুকোতো গোল-গোল পাঁপড়। ছবি দেখছেন সীতানাথ—চোখের সামনে। নাকের কাছে হিং-এর গন্ধটুকু ভুর-ভুর করছে।···চম্‌কে উঠলেন, শিশুটি তাঁর পিছনে এসে কাপড় ধরে টানছে। আমের রসে তার হাত চট্‌চটে। সীতানাথ ফিরে তাকিয়ে হাসলেন—ছেলেটা আবার দৌড় দিল হাসতে হাসতে। তিনি কুমোরের কাছে এগিয়ে এসে বল্‌লেন—একটু মাটি দেবে?

অবাক হয়ে চাইলো লোক দুটো। এরা হিন্দুস্থানী। বুড়ো বাবু মাটি নিয়ে কি করবে? বল্‌ল—লে লি জিয়ে!

মাটিটুকু হাতে নিয়ে সীতানাথ আবার পথ চল্‌তে লাগলেন। খানিকদূর চলে এসে দেখলেন—মাথার ওপর দিয়ে রোপ্‌ওয়েতে কয়লার বাকেট বোঝাই হয়ে চলেছে। কাছেই কোলিয়ারী। বস্তী শুরু হয়েছে। নদীর জলরেখা চিক্‌চিকে বালির স্তর পেরিয়ে নীল দেখাচ্ছে। অনেক দিন পরে সীতানাথ সুন্দর

একটি বিকেলের স্বাদ পেয়ে খুশী হয়ে উঠেছেন। আজ সবাইকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন, এমনকি ওই ধাপ্পাবাজ গোবিন্দকে, অবিনাশকেও।...আচ্ছা, মুকুলের বড় ছেলেটিকে যদি সীতানাথ নিজের কাছে রেখে মানুষ করতে চান, ওরা দেবে কি? কতকাল পরে এমন কাছাকাছি একটি শিশুকে পেয়েছিলেন কিছুক্ষণের জন্য—বড় শান্ত ছেলে। আর এই কুঁড়ে ঘরের শিশুটিকেও তাঁর বড় ভালো লেগেছে।

রামনগর কোলিয়ারীর বস্তীতে বৈকালিক জটলা। রাস্তার কলে লোকের ভিড়। সীতানাথ দ্রুত চল্‌তে লাগলেন। এখন আর বাস পাওয়া যাবে কি না কে জানে—হয়ত ট্রেণেই ফিরতে হবে। মল্লিকা বেচারা বড় একা!

পঞ্চাশ

আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে। কালো-কালো মেঘের দল দানবের মতো ঘোরালো আঁধার অবয়বে আকাশ ছেয়ে, গম্ভীর গর্জনে দুনিয়ার মানুষকে শাসাচ্ছে। প্রলয়-আশঙ্কায় গৃহবাসীর মন বিষণ্ণ। গভীর রাতে শুরু হয়েছে শ্রাবণ-বর্ষণ। সকাল হলো, তারই মধ্যে—কারখানার বাঁশীও বাজলো।

ঘরে বসে দেবজ্যোতি বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে দেখছে। আজ আর বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। বৃষ্টির শব্দ সব কিছুই ঢেকে দিতে চাইছে, তবু ডিউটির সাইরেন ঠিক শোনা যায়। অজস্র ধারা মাথায় নিয়ে জেনারেল ডিউটির লোক চলেছে। অনেকের মাথায় ছাতা নেই, আর ছাতা থাকলেই বা কি—উত্তুরে হাওয়ার আস্কারা পেয়ে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো তীর্যকভাবে তীক্ষ্ণ ছুঁচের মতো সবকিছু বাধা অগ্রাহ্য করে পথিককে বিপর্যস্ত করছে। একমাত্র বর্ষাতি গায়ে মাথায় টুপী এঁটে চলেছে যারা তাদেরই যা বাঁচোয়া। সে আর ক'জন!

পথের পাশে বিরাট ছাতার মতো শিরীষ গাছটা দাঁড়িয়ে। তার তলায় একটা রোগা ডিগ্‌ডিগে গরু ভিজছে। কালো চক্‌চকে এ্যাশফাল্টের পথ ঝরাপাতায় ছেয়ে গেছে। একখানা মোটর-সাইকেল ভট্‌ভট্‌ করে শান্ত নির্জীব গরুটাকে চম্‌কে দিয়ে চলে গেল।

দেবজ্যোতির চোখের সাম্‌নে দিয়ে সীতানাথও চলে গেলেন ওই পথ ধরে। অতি পুরাতন গতিভঙ্গী, মাথার ছাতাটা হাওয়ার দাপটে বেসামাল—এইটুকুর ভেতরেই সীতানাথের জামাপ্যাণ্ট ভিজে জল ঝরছে। তারপর আরও আরও লোক চলে গেল।

গোবিন্দবাবু এই বৃষ্টি বাধা, ডিউটির তাড়া কাটিয়ে দেবজ্যোতিকে ঠিক দেখতে পেয়েছেন। পথ থেকে নেমে জানালার ধারে এসে বল্‌লেন—এই যে বাবাজী, তারপর শরীরে আর পদার্থ রাখেনি দেখ্‌চি! যাক ঘরের ছেলে ঘরে

ফিরেছ এই ঢের। কাল আরতি বল্‌ছিল, আচ্ছা এখন আসি ভাই—পরে সব শুন্‌বো!

দেবজ্যোতি হাসলো—আচ্ছা আসুন—।

পিছন ফিরে চল্‌তে চল্‌তে গোবিন্দ বল্‌লেন—সন্ধ্যেবেলা একবার যেযো, তোমার বোন বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছে।

দেবজ্যোতি কিছু বলবার আগেই গোবিন্দ বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে যান।

আবার বৃষ্টি বাইরে—পথে লোক নেই, গাছটা সবুজ পাতার ছাতা দিয়ে অসহায় গরুটাকে বৃথাই জলের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। শাদা আর ভায়োলেট রঙে মেশানো ফুলগুলো ধারাস্নানে ভিজে খুশীর ঢুলুনিতে মশগুল।

পিছন থেকে মল্লিকা বল্‌ল—কার সঙ্গে কথা বল্‌ছিলে দাদা!

—গোবিন্দবাবু।

– কি মতলব লোকটার?

দেবজ্যোতি ঘুরে বসে বোনের দিকে তাকালো। মল্লিকার হাতে দুধের গ্লাস। দেবজ্যোতি বল্‌ল—আবার আজও দুধ!

—ছোটবোনের একটা আবদারও রাখবে না!

—তোকে ত বলেছি, অভ্যেস নেই।

—কিন্তু শরীরটার দিকে একটু নজর না দিলে, তোমার দেশের কাজ আর করতে হবে না।

—তোর চালাকী বুঝতে আর বাকী নেই। এই ব'লে আমাকে দুগ্ধপোষ্য করে রাখতে চাস? না তা হবে না।

—বেশ এ মাসটা খেয়ে নাও। তারপর বন্ধ করে দিলেই হবে। দ্যাখো, গোয়ালাকে যদি মাসের মাঝখানে বরখাস্ত করি ত সে বেচারী কিরকম বিপদে পড়বে!

—হুঁ!

দেবজ্যোতি গম্ভীর মুখে হাত বাড়িয়ে দিল।

মল্লিকা কোন রকমে হাসি চেপে বল্‌ল—তোমরা এত বড় বড় দেশের কাজ করো, আর দুধ খেতে গেলেই ঘাবড়ে যাও, কেন বল তো?

—এ সব আর ভালো লাগে না রে!

—কি সব?

—এই বড় কাজের ভাঁওতা! আসলে আমার কিছুই করবার যোগ্যতা নেই; তাই দেশ, কাজ, আন্দোলন নাম নিয়ে জীবনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলি আমি, আমরা।

মল্লিকা অপ্রতিভ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে দাদার দিকে তাকিয়ে। দেবজ্যোতিকে যেন ও চেনে না! ছেলেবেলা থেকে দীর্ঘকাল দেখা-জানার বাইরের কোন্ এক অচেনা মানুষ! কী যে বল্‌ছে, মল্লিকা বুঝতে পারে না।

দেবজ্যোতি কথা বল্‌ছে মল্লিকাকে সামনে রেখে, সে বুঝি নিজের মনের সঙ্গেই কথা কইছে! বিষণ্ণ স্বরে সে বল্‌ল—নইলে আজ এই কাক-কাঁদানো বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাবা গেলেন কারখানাতে আর আমি ঘরে বসে দুধের গেলাস চুমুক দিচ্ছি! কোন্ অধিকারে আমি এই আরাম পেতে পারি? জেল খেটেছি বলে? কিন্তু আমার এই নিষ্ক্রিয় বছরগুলো ত কোনো সোনার ফসল ফলাতে পারে নি। নিজের কাছে সত্যকে অস্বীকার করার মতো বড অপরাধ আর হতে পারে না।

মল্লিকা নিজের সামান্য বুদ্ধি দিয়ে দাদার কথার খেই ধরতে পারে না। হাত দিয়ে দুধের গ্লাসটা পরখ করে ব্যস্তভাবে বল্‌ল—দুধটা খেয়ে নাও ত, জুড়িয়ে যাচ্ছে।

—তোরা আমাকে এমন পরের মতো আদর করিস্ নে রে! বড় কষ্ট হয় এতে।

—বা রে, তোমার বেশ কথা ত! তোমার মত আমাদের দেশময় ভাই-বোন ছড়ানো নেই, একটিমাত্র দাদা। তোমাকেও যদি একটু যত্ন না করি ত বেঁচে থেকে কি লাভ বলো! আর ক'দিনই বা,—একটা কিছু হুজুগ হলেই ত তোমার আবার পাত্তা পাবো না; হয় জেলখানা, নয় তো কোন্ দেশে তা কে জানে! নিদেন বর্দ্ধমানে চলে গিয়ে ডাক্তারী পড়া—!

—আর ডাক্তারীও পড়ব না, দেশের কাজের নামে বাবার কষ্টও আর বাড়াবো না।

—তবে? কি করবে শুনি!

—কারখানায় একটা কাজের চেষ্টা দেখব। আজই একবার কোম্পানীর আফিসে যাই, ঘুরে আসি।

মল্লিকা চমকে উঠল কথাটা শুনে। আর কেউ যদি একথা বলত, মল্লিকা বিশ্বাসই করত না—দেবজ্যোতির কথায় কাজে তফাৎ থাকে না, মল্লিকা বেশ ভালো করেই জানে। ভয়ার্ত স্বরে ও বলল—দোহাই তোমার, কারখানাতে ঢুকো না, তাহলে তোমার শরীর দু-দিনে পাত হয়ে যাবে। ও তোমার সইবে না দাদা! তা ছাড়া কোন্ দুঃখে তুমি কুলীর কাজে নামবে?

দেবজ্যোতি হাসলো, বিষণ্ণ বেদনার মূর্তিমান প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয় এই হাসি। সে বলল—আর সবাই যা পারে, মানিকপুরের হাজার হাজার মানুষ রোজ যে কাজ করে, বাংলাদেশের লাখ লাখ লোক যা করতে পারছে, তোর দাদা সে কাজ পারবে না কেন?

—না, না, নিজের সর্বনাশ এভাবে ডেকে এনো না। তার চেয়ে আর তো দেড়টা কি দু-টো বছর পড়লেই তুমি ডাক্তার হয়ে যাবে! এ পাগলামী ছাড়ো দাদা।

উত্তেজনার বশে মল্লিকা কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক জোর দিয়েছে। পাশের ঘরে দেবিকা পড়ছিল, সেও উঠে এসে দাঁড়িয়েছে মল্লিকার পাশে—কি হয়েছে গো ছোটদি?

চোখের জল মুছতে মুছতে মল্লিকা বলল—দাদা কারখানাতে ঢুকবে বলে আজই কোম্পানীর আপিসে যাচ্ছে!

বলতে বলতে মল্লিকা আবার কেঁদে ফেলল।

দেবজ্যোতি উঠে এসে বোনের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—পাগলামী করিস নে রে! সত্যি, অনেক ভেবে দেখেছি—এটাই সবচেয়ে ভালো হবে। তোদের কাছে থাকবো,—বাবারও বোঝা হাল্কা হবে। সবাই একসঙ্গে বেশ থাকা যাবে। আর ডাক্তারীর কথা বলছিস, ও আর ভালো লাগে না। মনে হয় আমাদের দেশে ওষুধের চেয়ে পথ্যের দরকার আগে। অবিশ্যি তা বলে ওষুধের দরকার নেই এমন বলছি না। কি জানি, জেলের মধ্যে বসে

থেকে কেবলই মনে হয়েছে—ডাক্তারী আমাকে দিয়ে হবে না। আর এত মানুষ, এত রকমের মানুষের সঙ্গে, এর আগে খুব কাছাকাছি থেকে মেলামেশা করার সুযোগ জেলের বাইরে ত ছিল না। ওখানে এই একটা সুবিধে আছে, মানুষকে ওখানে চেনা যায়, খুব খোলাখুলি ভাবে দেখতে পাবে তুমি প্রত্যেকটি লোকের মন। তিন বছর ধরে দেখলাম। দেখে-দেখে যদি কিছু শেখা যায়, সে শিক্ষা আমার হয়েছে।

দেবিকার তরুণ স্বপ্নবিলাসী মন দেবজ্যোতির কথার খেয়া বেয়ে বন্দী-শিবিরের অজানা রাজ্যে যেতে চেষ্টা করছে। ও বল্‌ল—সেখানে বুঝি সবাই নিজের মনের কথা খুলে বলে! তা ত বল্‌বেই, সবাই সবাইকে আপন ভাবে যে!

দেবজ্যোতি বাধা পেয়ে চুপ করে গিয়েছিল। দেবিকার কথা শুনে মাথা নাড়ল—না রে, আমিও প্রথম প্রথম তাই ভাবতাম। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই আমার ভুল ঘুচে গিয়ে আসল সত্যটা ধরা পড়ল। ভালো-মন্দের দিক ছাড়া আরও একটা দিক যে রয়েছে, সেই দিকের খবর আস্তে আস্তে পেতে লাগলাম। তার নাম বাস্তব।

দেবিকা গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—বাস্তবই ত সব।

—সব? তুই কি করে জানলি?

—এর মধ্যে না জানার আবার আছে কি! সোজাসুজি যা দেখ্‌চি, যা করচি, তা ছাড়া আর কী থাকতে পারে? এই গ্যাখো না, মানুষ মানুষকে মারে না—এমন কাজ কেউ করলে আইনে শাস্তির কথা লেখা রয়েছে। অথচ এত বড় যুদ্ধটা যে হ'ল, ফ্যাসিস্টরা এ্যালায়েড্‌ পাওয়ারকে পরাজিত করার নামে হাজার হাজার মানুষকেই খুন করল!—একটা মানুষকে জখম করা অপরাধ, আবার একটা দেশের সমস্ত মানুষকে হত্যা করার নাম যুদ্ধ! আইনটা বইএর পাতায় লেখা থাকে, কিন্তু মানুষ যা করবার তাই করে—নিজের সুবিধা মতো আইন মানে, অসুবিধা হ'লে তা ভাঙে!

মল্লিকা হাল ছেড়ে দিয়েছে। দেবজ্যোতির কথা চেষ্টা করলে যদি বা কিছু বুঝতে পারা যায়, দেবিকার কথা বোঝা সম্ভবপর নয় মল্লিকার পক্ষে।

জানালার কাছে গিয়ে মল্লিকা বৃষ্টি দেখতে লাগলো। একটা কাক ইলেকট্রিকের তার ধরে ঝুলছে। তার কালো ডানা থেকে টুপটুপ করে জল ঝরছে।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—তোর কথা আর আমার কথা কিন্তু এক নয় দেবি! আমি যা বলছি তার অন্তার্থ এই—আমরা যারা বিয়াল্লিশের আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য জেলে গিয়েছিলাম, তাদের প্রত্যেকের মনের রূপ এক নয়। এমন কি, যে আদর্শের জন্যে জেলে গিয়েছি সেই আদর্শটাই অনেকের কাছে পরিষ্কার নয়। তবু আমরা একটা অখণ্ড শক্তি, এটাই প্রমাণ হলো। বিদ্রোহের প্রচণ্ড চক্রান্ত করেছে এই শক্তি! অথচ কাছে যাও, এক-এক জনের সঙ্গে আলাপ করো, মিশতে চেষ্টা করো, দেখবে প্রত্যেকের পার্থক্য। এই পৃথক সংজ্ঞাটাই আস্তে আস্তে আমার মধ্যে প্রধান হয়ে দাঁড়ালো। আগে আমি দেখতাম দেশকে বিরাট অখণ্ড সমন্বয় রূপে—এখন আমার কাছে এক-একটি মানুষ আলাদা সত্তার আধার হয়ে ধরা পড়ছে। সব সময় আমি নিজের কাছেই অনেক কথার জবাব দিতে পারি না। তবু এটুকু বুঝেছি যে, যদি সত্যিকার কাজ করতেই হয় তবে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। আগেও হয়তো এটা আমার মধ্যে ছিল, তবে এতটা স্পষ্ট ছিল না।

—তার মানে?

—ঠিক পরিষ্কার করে বলা শক্ত। তবে মানিকপুর আমার চেনা যায়গা, এখানকার মানুষকে আমি সহজে চিনতে পারি, বুঝতে পারি। আমি এখানেই ফিরে আসবো। এখানে থাকবো। এরই মধ্যে আমার জীবনের কাজ জমা রয়েছে।

—কথাটা ঠিক বুঝলাম না দাদা।

—কারখানায় কাজ নেবো রে, এটুকু ত বুঝলি?

—কিন্তু তার মধ্যে তোমার সঙ্গে আর ন হাজার লোকের তফাৎ কোথায়? সবাই ত কাজ করে।

—সে তফাৎটা যাতে সত্যিই না থাকে, সেটা করতে পারলেই আমি খুশী। আমার বাবার সঙ্গে আমার তফাৎ—তিনি কুলী, আমি ভদ্রলোক। না, না, একা মল্লিকারই এই ধারণা নয়, কিছু লোক যারা কাজ করে, তারা বাদে আর

সবারই এই ধারণা! কিন্তু এটা বদলাতে হবে। এই সহজ কথাটাই শিখতে পারি নি আগে। তাহলে এতগুলো বছর নষ্ট করতে হত না।

দেবিকা গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—বুঝেছি, তুমি লেবার ফ্রন্টে কাজ করবে, তাই বলো।

দেবজ্যোতি জবাব দিল—কোনো ফ্রন্টেই কাজ করবার যোগ্যতা আমার নেই। জীবনটা আর স্বপ্ন দেখে কাটাতে চাই নে। বাঁচতে হবে, সবার সঙ্গে মিলে-মিশে বাঁচাটাই জীবনের সার কথা। কাজ এড়িয়ে, গা বাঁচিয়ে চলার মধ্যে যেন বিরাট ফাঁকি লুকোনো আছে! আমি কারখানার মজুরের ছেলে, আমাকে এইখানে এই পরিবেশের মধ্যে থেকে বাঁচতে হবে। আমি কারখানাতে চাকরীই নেবো।

—কিন্তু এই হেল্‌থ-এ!

—আমার চেয়ে খারাপ স্বাস্থ্যের লোক হাজার হাজার এই কারখানায় খাটছে। ওটা একটা যুক্তিই নয়।

—কিন্তু তাদের অভ্যেস হয়ে গেছে।

—আমারও হবে। বরং আগেকার বডি বিউটিফুল নিয়ে কাজে যোগ দিলে বেমানান্ হতো। জেলখানার দৌলতে সেই আলগা জৌলুস ঘুচে ভালোই হয়েছে।

মল্লিকা এবার কথা বল্‌ল—তুমি যদি কারখানায় ঢোকো ত আমি ঠিক বিষ খেয়ে মরব।

মল্লিকার চোখ দুটো জ্বল্‌ছে।

দেবিকা গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—তুই চিরকালই অবুঝ রয়ে গেলি ছোট্‌দি! দাদা যাচ্ছে একটা আদর্শবাদের জন্যে। এর ভ্যালু আলাদা।

—তুই থাম্। তোদের লেখাপড়ার বুলি আমার সহ্য হয় না। এই শরীরে ওই লোহা গলানো আগুনের আঁচ ক'দিন সইবে শুনি! যার যা কাজ সে তাই নিয়ে থাকবে, তা নয়। এখন কারখানার ভূত না সাজলে আদর্শবাদ হবে না। কেতাবী কায়দা দিয়ে মানুষকে বোকা বানাবার ফন্দী! খবরদার তুমি ওসব করতে পাবে না দাদা। আচ্ছা আমার একটা কথার জবাব দাও—

—বল।

দেবজ্যোতি বল্‌ল।

—এই কারখানার মধ্যে থেকে আজ পর্যন্ত একটা মানুষ বড় হতে পেরেছে? দেশের লোকের কাছে সম্মান পেয়েছে এমন একজনের নাম করো ত!

—নামের কথা এখন থাক্ মল্লি। কাজের কাজটাই লক্ষ্য। আমরা যদি এগিয়ে যাই, মানুষের মনে সত্যিকার চেতনা জাগাতে পারি, তাহলে দেখবি কত দিক দিয়ে আমাদের সুখ-সুবিধে আসবে। সকলের কথা ভাবতে হবে কি না!

—এই যে বল্‌ছিলে প্রত্যেকে আলাদা।

—আলাদা বই কি, তবে সমান সুরে বাঁধতে পারলে আবার সমগ্রতার একটা বিশেষ রূপ গড়ে ওঠে।

—তাই যদি হয়, তবে যে কাজ করছিলে সেখানে, সেইকাজেও ত তোমার এই শক্তি দিয়ে একটা সমগ্রতা আনতে পারো।

—আনা যায় না এমন কথা ত বলি না। তা যদি না-ই যাবে ত এত বিরাট আন্দোলন হয় কি করে? তবে আমার একটা বদ্ধ বিশ্বাস হয়েছে যে এই মানিকপুরে এমনি একটা প্রয়োজন আছে। সব কিছু আশা স্বপ্নকে আমি এই পথে টেনে এনেছি। এখন আর সহজে ফিরতে পারব না। এ আমার একমাত্র সংকল্প। জেলখানার মধ্যে বসে এইটুকু খুঁজে পেয়েছি।

মল্লিকা চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল। দেবিকাও তাকে অনুসরণ করে চলে গেল, বোধ হয় সান্ত্বনা দেবার জন্য।

দেবজ্যোতি অশান্তভাবে ঘরময় পায়চারী করতে থাকে। দীর্ঘ তিনটি বছরে এই অভ্যাসটা তার স্বভাবে রূপান্তরিত হয়েছে—কারণে-অকারণে পায়চারী করা! জেলখানাতে এ ছাড়া একঘেয়েমি কাটানোর অবলম্বন বিশেষ কিছু ছিল না। অল্প পরিসরের মধ্যে এই ভ্রমণবিলাসটুকুই যেন গতির তৃষ্ণা মেটাতো।

অভ্যস্ত ভঙ্গীতে পায়চারী করতে লাগল দেবজ্যোতি।

জেলখানার কথাই আজ দেবজ্যোতির মন জুড়ে রয়েছে। সেখানকার

বিচিত্র মানুষের দল, যারা মিছিলের মতোই অবিচ্ছিন্ন গুচ্ছরূপে প্রথমে জুটেছিল—আজ তারা যেন বিভিন্ন সত্তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আপন অধিকারের দাবিতে দেবজ্যোতিকে ঘিরে ধরেছে। একই ব্রতের ব্রতী হয়েও এরা মানুষ হিসেবে পৃথক—এক নয়। .....

প্রৌঢ় নেতা শ্যামাপদ ভট্চাযের ধারণা তাঁর হাত দিয়েই ভারতের স্বাধীনতা আসবে। তিনি জেলে আটক থাকাতেই দেশের সমূহ ক্ষতি হচ্ছে।

অরুণ দত্ত নিত্য নূতন বিপ্লবী-কবিতা সৃষ্টি করছে—তার বিশ্বাস, একদিন তার এই অগ্নিস্রাবী কবিতায় দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষ উজ্জীবিত হয়ে অত্যাচারীকে সংহার করবে—বক্তৃতা ও বিক্ষোভের উপর অরুণ দত্তর এতটুকু আস্থা নেই। তার বদ্ধমূল বিশ্বাস, কবিতা আর গান দিয়েই একদিন দুঃখজয়ীর দল দিগ্‌বিজয় করবে। তবে এ কবিতা কলম দিয়ে লেখা হবে না, রক্ত দিয়ে রচিত হবে। একদিন সত্যই অরুণ দত্ত দাড়ি কামাবার ব্লেড যোগাড় করে শিরা কেটে রক্তের কালিতে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে একটি চার লাইনের গান লিখে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিল। তারপর হাসপাতালেই মারা যায় অরুণ।...

সবচেয়ে বিস্ময়কর চরিত্র নিবারণ চৌধুরী। তিনি যাটের কোঠায় পৌঁছেচেন। লোকটির বিশ্বাস, ইংরেজরা এ রাজ্য কোনদিনই ছাড়বে না। স্বাধীনতা কস্মিন্ কালেও নাকি আসবে না। তবুও নিবারণ চৌধুরী যে-কোনও আন্দোলনেই সর্বাগ্রে পুলিশের সামনে নিজেকে এগিয়ে দিয়েছেন। একদিন দেবজ্যোতি জিজ্ঞাসা করেছিল,—আন্দোলনের ওপর যদি শ্রদ্ধাই নেই ত কেন হাঙ্গামায় আসেন দাদা? অত্যন্ত সহজ ভাবেই জবাব দিয়েছিলেন নিবারণ চৌধুরী—নেশা ভাই, নেশা! সেই যে সি. আর দাশের সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করেছিলাম, তারপর থেকে আর অন্য কোনো কিছুতেই তেমন মজা পাই নি। এ্যাজিটেশনের মধ্যে একটা থ্রিল আছে! লোকে বাহবা দেয়। পুলিশও সমীহ করে! আর সাময়িক ভাবে একটা ঘোর লাগে, বুঝি বা মহৎ একটা কিছু করছি! এটা এখন বুঝছো না। কিন্তু দেখো, আমার মতো বয়সে পৌঁছলে তোমারও এই রকমই মজা লাগবে। আর কোন কিছুতেই এতখানি

থ্রিল পাবে না। আর এতে কষ্টই বা কী? খাচ্ছো দাচ্ছো তোফা আরামে আছো। এই দু-চার বছর এক নাগাড়ে এখানে ওখানে আটক রইলে। তারপর ছাড়া পেলে, খোলা হাওয়াতে কিছুদিন খারাপ লাগবে না। কিন্তু বেশিদিন সে মুক্তি সুখের হয় না। সেইজন্যে আবার নতুন আন্দোলন হয়, আবার জেলে যাবার চান্স পাওয়া যায়। সত্যি বলতে কি, জেলের বাইরে থাকলেই ফ্যামিলির জন্যে আর কিছু না হোক চিন্তাও ত করতে হয়। এখানে সেসব নেই।

নিবারণ চৌধুরীকে দেখে দেবজ্যোতির খুব কষ্ট হয়েছিল,—মনে হয়েছিল, বুঝি সৈনিক বলতে এই চরিত্রের মানুষই বোঝায়। যুদ্ধ করাটাই পেশা, এই পেশার পিছনে কোন আদর্শবাদ থাকার প্রয়োজন নেই। তবুও ঠিক সামঞ্জস্য টানতে পারে নি দেবজ্যোতি—সৈনিকের পেশার পিছনে অন্নসংস্থানের প্রশ্ন থাকে, নিবারণ চৌধুরীর ক্ষেত্রে সেটুকুও গৌণ।···লোকটা বলে কি, বৃদ্ধ বয়সে আমিও তার মতো হয়ে যাবো? তার মানে ততদিনেও স্বাধীনতা আসবে না! আর আমিও নিবারণ চৌধুরীর মতো নেশার টানে, তারিফের লোভেই আন্দোলনে অভ্যস্তভাবে নিজেকে জুড়ে রাখব?······দুঃসহ যন্ত্রণায় দেবজ্যোতি ছট্‌ফট্‌ করে। তার মন প্রতিবাদের তীব্র রোষে ফুঁসে উঠ্‌ল—না, না, না! এ হতে পারে না···যারা দেশব্রতী, তাদের প্রত্যেকের কথা ত এ নয়!

তবু যেন নিবারণ চৌধুরীকে তাড়াতে পারে না দেবজ্যোতি। কে যেন মনের মধ্যে থেকে নিবারণের পক্ষ সমর্থনে উদ্যত হয়ে বলে, নিবারণ চৌধুরী সরল মানুষ। মনের কথাটা স্পষ্ট ভাষায় সহজে বল্‌তে পারে। হয়তো তার মতো স্বভাবের অনেক মানুষই আছে, তারা নিজের মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে, আসল কথাটা নিজেকেও বুঝতে দিতে চায় না।···

আরও একটি ছেলের কথা মনে পড়ছে। অনিন্দ্য—সে সবারই স্নেহের পাত্র। সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে পড়তে পড়তে বিয়াল্লিশের উন্মাদনায় মুড়োগাছা রেল ষ্টেশনে আগুন লাগাতে গিয়ে ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। তারপর জেলখানাতে কান্নার জোয়ার বইয়ে দিয়েছে অনিন্দ্য। কৈশোরের কাঁচা লাবণ্য তখনো ওর মুখে মাখানো। অসহায় ছাগশিশুর মতো প্রতিনিয়ত তার বন্দী

মন কেঁদেই চলেছে। অনেকে প্রথমে তাকে ধিক্কার দিয়েছে। কিন্তু তারপর বয়স্কদের সঙ্গে থেকে থেকে অনিন্দ্যর অকালপক্কতা এলো। পুরনো ঝানু রাজবন্দীদের মধ্যে কেউ কেউ স্নেহাধিক্যবশতঃ অনিন্দ্যকে আদর করতেন। তাই নিয়ে নোংরা অশ্লীল ইঙ্গিতও করতে ছাড়ত না দু-একজন।......

বৃষ্টি আরও চেপে এসেছে। আকাশের ঘনঘোর অন্ধকার যেন গুঁড়ি মেরে এখন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে সবটুকু আলো নিঃশেষে শুষে নিয়েছে! দেবজ্যোতির হাসি পেল।...এ কী বিচিত্র গতি তার মনের! যখন জেলখানাতে ছিল, তখন কেবলই বাইরের পৃথিবীর ছবি দেখত। মনে হ'ত সেটাই বুঝি পরম রমণীয় বিলাস! তখন ভাবতো, যদি একবার কারাগারের বাইরে ফিরে যেতে পারে, তাহলেই দেবজ্যোতি খুশি! আর কিছু নয়। জেলখানার অবরোধ থেকে মুক্ত হওয়ার মতো আরাম কিছুতে নেই।...শুধু একবার বাইরের পৃথিবীটা দেখতে পাওয়ার বিনিময়ে দেবজ্যোতি অনেক কিছুই ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল —এমন মনোভাব তার জেল-জীবনে বহুবার পুনরাবৃত্ত ভাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আজ ত সে মুক্ত। অবরোধের বাধা ঘুচেছে। তবু কেন দেবজ্যোতি কারাগারের মধ্যে নিজেকে টেনে নিয়ে এলো? সেই স্মৃতিচারণায় কী রসের সন্ধান পেল তার মন? কারাগারের জীবনটা তাকে আর যাই দিয়ে থাকুক তৃপ্তি ত দেয় নি। হয়তো বৃহৎ কোনো সত্যের সন্ধান দিয়েছে কারারুদ্ধ দিনগুলি। সে সত্যের মূলে বেদনাই পুঞ্জীভূত।

......প্রত্যেকটি মানুষ তার অস্তিত্বের কোটরে যে-কাহিনী গোপন রাখে তা অনায়াসেই ইতিহাস হবার দাবি বহন করছে। ইতিহাস ত অলৌকিকতার লোকোত্তর রূপকথা নয়।......দেবজ্যোতি বুঝেছে, মানুষকে বাদ দিয়ে দেশের কাজ এগোতে পারে না। প্রতিটি মানুষই দেশদেহের রক্তবিন্দু। একথা যত বেশি মনে হয়েছে ততই সে ধরতে পেরেছে নিজের অসম্পূর্ণতা। নিজের মধ্যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জেগে উঠে দেবজ্যোতির 'কর্মী'গর্বকে ধূলিসাৎ করে দিতে কম চেষ্টা করে নি। প্রথম প্রথম এই চেতনাটা খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ত না। সূক্ষ্ম একটা নেতি-যন্ত্রণা পীড়া দিত। তারপর একটু একটু করে আলোর মতো স্বচ্ছ ধারণায় রূপায়িত হয়েছে। সাহসের অভাব হয় নি তা নয়। একেবারে উল্টে-

পাল্টে দিতে হবে নিজেকে? আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে গোড়া থেকে সবকিছু? প্রতিটি মানুষকে নিজের মতো খুঁটিয়ে দেখতে হবে? নইলে কি করে দেশকে চিনবে দেবজ্যোতি? কতবার হতাশায় হাল ছেড়ে দিতে চেষ্টা করেছে—কিন্তু ভূতের মতো এই জ্ঞানের বোঝাটা তাকে জাপ্‌টে ধরেছে। পালাতে দেবে না কিছুতেই। আর যা-ই করুক দেবজ্যোতি নিজের সঙ্গে শঠতা করতে পারে না। জীবনকে সে পরম এবং চরম মূল্য দিয়েই স্বীকার করবে—তাতে কোনো ভয় নেই। সেখানে কোনো ভাবালু জড়তাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। একদা এই নিষ্ঠাই তাকে এ পথে টেনে এনেছে। যা কিছু ত্যাগ বা গ্রহণ, সে ত জীবনের সার্থকতার তৃষ্ণাতেই করেছে। আজও পিছিয়ে গেলে চলবে না। দল থাকুক দলের গণ্ডীতে। দেবজ্যোতি শুধু ত দলের কপালে রাজটীকা দেবার সংকল্প করে নি। তার সংকল্প দেশের কল্যাণের। আর এ দেশ কোনো স্বপ্নের দেশ নয়—মানুষের, সমাজের, সকলের দেশ। এ দেশে নিবারণ চৌধুরী, অনিন্দ্য, শ্যামাপদ ভট্‌চায যেমন রয়েছে তেমনি আছে সীতানাথ মুখুয্যেরা। সবাই রয়েছে।

এবার মানিকপুরে ফিরে এসে এখানকার মানুষগুলোকে নতুন চোখে দেখতে পাচ্ছে দেবজ্যোতি। যুদ্ধের কোনো সুযোগই নিতে পারে নি এই হাজার হাজার মানুষ। যন্ত্র এদের নির্মমভাবে নিংড়ে নিয়েছে। যথার্থ মানসিক ভিত্তির জোর থাকলে এরা স্বপ্রতিষ্ঠ হবার এতবড় সুযোগ এভাবে হারাতো না। হীন চক্রান্তের দৌলতে যারা কারখানার মাথায় চড়ে বসেছে, তাদের ওপর দেবজ্যোতির যতটা বিদ্বেষ তার চেয়ে অনেক বেশি করুণা! এদের কাউকেই যেন পুরোপুরি মানুষ মনে হচ্ছে না ওর। অথচ এদের মধ্যে মানুষ হয়ে ওঠার সব রকম মশলাই ত আছে! তার দৃঢ় প্রত্যয়, এই সম্ভাবনার ক্ষেত্রকে নষ্ট হতে দেওয়া খুব বড় একটা অপরাধ। জীবন যদি উৎসর্গ করতেই হয় ত এরকম ব্রতেই করা প্রয়োজন। নেশা নয়—চেতনার কাছেই দেবজ্যোতির এই আত্মসমর্পণ ব্রত।

মনে পড়ছে মন্দাকিনীর কথা। অনেকদিন পরে আজ নতুন করে মন্দাকিনীকে এত বেশি মনে পড়ছে কেন?······একদিন নিজের অজ্ঞাতে

দেবজ্যোতি মন্দাকিনীকে যে সব কথা লিখেছিল চিঠিতে, এতদিন পরে সেগুলি যেন তার কাছে নতুন অর্থ নিয়ে হাজির হয়েছে—নিজেকে তলিয়ে বুঝে দেখার কথা। আশ্চর্য, দেবজ্যোতি নিজেকে এতদিন বোঝবার চেষ্টা করে নি, শুধু আরোপিত আদর্শবাদের মোহেই চলে এসেছে এতগুলো বছর! আজ নতুন পথে পা বাড়াবার জন্য সংকল্প ওকে পাকাপাকি ভাবে পেয়ে বসেছে। এখন সে কথাগুলো যুগান্তর পারের বাণী-বাক্যত্ব ছেড়ে বাস্তব আকারে, সত্য হয়ে নতুন ভরসায় দাঁড়াল। অতএব মন্দাকিনীকে স্মরণ না করে দেবজ্যোতি পারছে না।

মুক্তি পাওয়ার পর কলকাতায় এবার মন্দাকিনীকে খোঁজে নি দেবজ্যোতি। এখানে এসেও অযাচিতভাবে মন্দাকিনীর মহিমাকীর্তন ওকে শুনতে হয়েছে,—কিন্তু সেগুলোরও যেন কোনো গুরুত্ব ছিল না! আর এই মুহূর্তে ইচ্ছে হচ্ছে মন্দাকিনীকে কাছে পাবার। যেন সাম্‌নাসাম্‌নি বসে অনেক কথা বলবার রয়েছে!

দেবজ্যোতি নিজের পথ ঠিক করে ফেলেছে। এ পথে চল্‌তে শুরু করলে আর ত অবকাশ মিলবে না অন্য দিকে চাইবার। তার আগেই মন্দাকিনীর সঙ্গে দেখা হওয়া একান্ত আবশ্যক।

দেবজ্যোতি ডাকল মল্লিকাকে।

মল্লিকা এসে দাঁড়াতেই বল্‌ল—মন্দাকিনীর খবর কিছু জানিস?

আকাশ থেকে পড়ল মল্লিকা—বা রে, সে তো তোমারই জানার কথা!

—হুঁ, আমারই জানার কথা। ঠিক। কিন্তু আমি জানিনে! খুব ভুল হয়ে গেছে। আচ্ছা, মলি, এখন কি করা যায় বল্ তো? ওর বাড়িতে এক-বার যাবো?

মল্লিকা ব্যস্তভাবে জবাব দিল—তোমার কি মাথা খারাপ? একে এমনিতেই ওঁদের সঙ্গে মন্দার কোনো সম্পর্ক নেই, সেটা ত তোমারই উস্কানীতে। এর ওপর ওখানে গিয়ে খোঁজ করলে ঠিক ভাববেন, বুঝি ওঁদের সঙ্গে ঠাট্টা করতে চাচ্ছ!

—তা বটে। কিন্তু কি করি, তুই বল্।

—আমি! আমি কি করে বলব? ওসব বড় বড় ব্যাপার, তোমাদেরই মাথা বেশি খেলবার কথা।

বিস্মিত দেবজ্যোতি অসহায় দৃষ্টিতে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে বলে—আমার মগজে সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে!

পরক্ষণে মল্লিকাকে বল্‌ল সে—আচ্ছা তুই এখন যা। দেখি, আর একটু ভালো ভাবে চিন্তা করে।

মল্লিকা ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করল—সত্যিই তুমি কারখানাতে ঢুকবে দাদা?

—হ্যাঁ রে, তুই অত ভাবিস নে। তোর দাদার শরীর ননীর পুতুল নয়। আমার এ রক্ত ত শ্রমিকেরই—আমার বাবা যদি ষাটের কোঠায় পা দিয়ে আজও এই বর্ষা মাথায় করে ডিউটি চালাতে পারেন, ত আমি একটা সাতাশ বছরের যুবক পারব না কেন? এতে যদি বাধা দিস ত আমাকে ঘর ছাড়া করা হবে।

—যা ভালো বোঝো করো। কে আর কবে আমার কথা শুনেছে, তুমিই বা শুনবে কেন!

দেবজ্যোতি হাসতে হাসতে বল্‌ল—দাঁড়া, তোকে এমন একটা বর জুটিয়ে দেবো যে, সে তোর কথা ছাড়া এক-পাও নড়বে না।

মল্লিকার ছল-ছল দু-চোখে হাসির আভাষ ফুটে উঠ্‌ল—ওসব আবার কি ইয়ার্কি! আমার জন্যে কতোই যেন ভাবো!

—সত্যি রে অমলকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

—যাও, ঠাট্টা করে আমাকে ভোলাতে হবে না।

—এই ছাখো, ঠাট্টা কেন হবে! সত্যি বল্‌ছি। অবিশ্যি তোর যদি অপছন্দ হয় ত বলে দে, বাতিল করছি।

—কোনোদিন ত গুরুজনকে অমান্য করতে শিখিনি। আমার আবার পছন্দ-অপছন্দ কি আছে?

—বাঃ, এই ত লক্ষ্মী মেয়ের মতো কথা। তা হলে তোর মত আছে?

—বল্‌লাম ত। তবে—

—তবে আবার কি, বল!

—না, আমার মতো মেয়েকে কেনই বা লোকে পছন্দ করবে?

—ওঃ এই কথা! এরকম একটি মেয়ে খুঁজে আনুক দেখি কে পারে?

—না, না, সত্যি বল্ছি, নিজের দাম যে কানাকড়ি, সে আমি জানি। তোমার বোন ছাড়া আমার পরিচয় ত আর কিছু নয়। লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা, রূপের কথা বাদই দাও।

—কিন্তু সব বাদ দিলেও মল্লিকা যে আমার সব চেয়ে প্রিয় বোন, এ ত আমি জানি। আর সব ছেড়ে দিয়ে শুধু এটাই ইয়ে, কি বল্!

—আর ব'ল না, তাহলে গর্বে ফেটে মরব।

—তুই কিন্তু আজকাল বেশ কথা বল্তে পারিস।

—সেটা অবিশ্যি তোমার বন্ধুর দৌলতে।

—আমার বন্ধু? কে সে?

—এই যার কথা বল্ছ।

—ও, অমল, তাই বল্! হুঁঃ—পেটে পেটে এত!

—আবার ইয়ে হচ্ছে।

বল্তে বল্তে লজ্জায় মাথা হেঁট করে মল্লিকা ঘর ছেড়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।

দেবজ্যোতি সস্নেহ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। আশ্চর্য সরল মধুর মনে হয় মল্লিকাকে। ও যেন মায়ের কথাই মনে করিয়ে দেয়। মাও এমনি নরম ছিলেন। এমনি মধুর ছিল তাঁর আচার-আচরণ! দেবজ্যোতি কল্পনায় মায়ের মুখখানা মনে করতে চেষ্টা করে,—আস্তে আস্তে দেখতে পায় সে মাকে! মা যেদিন বলেছিলেন সীতানাথের অসুখের কথা, সেদিনের ছবিটাই উজ্জ্বল হয়ে ভেসে বেড়ায় তার চোখের সাম্নে।

কারখানাতে দেবজ্যোতি যত সহজে ঢুকতে পারবে ভেবেছিল, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ততটা সোজা ব্যাপার নয়। এখন আর নতুন লোক নেওয়া হবে না, বরং ছাঁটাই হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। যুদ্ধ থেমে গেছে। সরকারের মালের চাহিদা আগের মতো নেই, কাজেই এখন বাইরের বাজারের দিকে কোম্পানীকে নজর রেখে চল্‌তে হচ্ছে। বিদেশের বাজার এখনও খোলে নি। তবে দেশের মধ্যে আগের চেয়ে লোহা, ইস্পাতের চাহিদা বেড়েছে—এইটুকু আশাভরসা। অবশ্য এই চাহিদাটা সাময়িক কিম্বা স্থায়ী কি না, এখনও বোঝা যাচ্ছে না। আরও অনেক বড় বড় কথাই এস্‌টাব্‌লিশমেণ্টের ছোটবাবু শোনালেন। মুখ বুজেই সব কথা শুনে গেল দেবজ্যোতি। অবশেষে ছোট একটি নমস্কার সেরে সে উঠে পড়ছিল। ছোটবাবু বল্‌লেন—এর মধ্যেই চল্‌লেন। বসুন না মশাই। বিড়ি আছে ?

—আজ্ঞে খাইনে ত। আচ্ছা, আর একদিন আসা যাবে।

—আপনার নামটা যেন কী ?

—দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়।

—মুখুয্যে, তাহলে কুলীন। তা বেশ, উত্তম কথা। আমরা হচ্ছি বাঁড়ুয্যে। লেখাপড়া কদ্দূর করা হয়েছে ?

—আই-এস-সি পাশ করে ডাক্তারী পড়ছিলাম।

—অ! তা ডাক্তারী ত বেশ ভালো লাইন। ছাড়া হ'ল কেন? পয়সা-কড়ির টানাটানি—বুঝেছি আর বল্‌তে হবে না। আজকাল বি-এস-সি, এম-এস-সি পাশ করে সব এখানে আসে, কি না—খালাসীর কাজ করবে! দিনকাল কী যে হলো! তা মুখুয্যের পো, তোমার জন্যে চেষ্টাচরিত্তির করা যাবে, ভেবো না ভাই—স্বজাতি, আবার পাল্‌টি ঘরের ছেলে, এক রকম আত্মীয়ই বলা চলে—তোমার জন্যে ত করাই কর্তব্য। তা পরশু একবার খোঁজ নিয়ো।

—আচ্ছা।

—তোমার ঠাকুর ত এই ওয়ার্কশপেই আছেন ?

—ঠাকুর ? ও, বাবার কথা বল্‌ছেন—

—এ্যাই দ্যাখো, আজকালকার সব ছেলেরা, ঠাকুর বল্‌লে পিতাঠাকুর বোঝায়, তাও জানে না।

—বাবা আছেন এখানে, ইলেকট্রিক্যালে এ, পি, এইচ, ই,—সীতানাথ মুখুয্যে !

—বিলক্ষণ—বিলক্ষণ, সীতানাথ মুখুয্যে ; অনেকদিনের পুরণো লোক, তাঁকে আর চিনি নে ! তোমার আবার চাকরীর ভাবনা ! বাপকে বলো না, মল্লিক সাহেবের কাছে দরবার করতে ! লেখাপড়া শিখেচ, তা ছাড়া—

—ধরাধরি করে চাকরী জোটানোর ইচ্ছে নেই।

—বেশ, বেশ ! তবে কি জানো, এ হচ্ছে সুপারিশের যুগ। আর তাও বলি, সুপারিশ ছাড়া কে কবে মানিকপুরে উন্নতি করতে পেরেছে। এ হচ্ছে হবুচন্দ্রের রাজ্য—এখানে কর্ত্তারা দিনকে রাত করছেন। তোমাকে নিয়ে ফ্যাসাদেই পড়া গেল—তুমি সুপারিশ চাও না, অথচ চাকরী চাও। আচ্ছা দ্যাখা যাক—

—দেখুন, আমি উন্নতি চাই নে। আপাততঃ কারখানাতে ঢুকতে চাই। তারপর যোগ্যতা থাকে ত উন্নতি হবে, না থাকে হবে না।

ছোটবাবু চোখ উল্টে বল্‌লেন—এত বয়েস হয়েছে এখনো আক্কেল গজায় নি তোমার—এ্যাঁ ! আস্তে আস্তে টের পাবে। একবার চিড়িয়াখানায় ঢোকো না ! যাই হোক, তোমাকে ভাই, আমার মনে বেশ লেগেছে। কথা দিচ্ছি একটা সুরাহা করবো—আর এই শম্মা নামে ছোটবাবু কিন্তু কাজে সব মিঞার ঘাড়ে—হে-হে।

ব্যাপারটা এখানেই থামলো না। সীতানাথ কারখানা থেকে ফিরেই দেবজ্যোতিকে ডেকে বললেন—তোমার কাছে এই আমার শেষ কথা, কালই মানিকপুর ছেড়ে চলে যাবে। ঠিক ছ-মাসের মধ্যে ডাক্তারী পাশ করে মানিকপুর বাজারে ডিসপেন্সারী করবে, বুঝলে !

দেবজ্যোতি কথা বলবার জন্য হাঁ করতেই সীতানাথ বাধা দিলেন—কোনো ওজর অজুহাত শুনবো না। দেশের কাজ ঢের করা হয়েছে। আর নয়। কারখানায় চাকরীর চেষ্টা-ফেস্টা ছাড়ো—ওসব তোমার কম্ম নয়। তাই যদি মতলব ত এক জগ্‌গর টাকা নষ্ট করে এই আট-ন বছর আণ্টেমোর দরকার কি ছিল? এঁ্যা! বলি, যখন মল্লিক সাহেব হাতের কাছে চাঁদ এগিয়ে দিয়েছিল তখন ত নাক কুঁচ্‌কে কারখানার চাকরী করা গরুর সামিল বলে ফ্যাক্‌না মেরেছিলে! এখন আবার এসব কেন?

দেবজ্যোতি জবাব না দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সীতানাথ দরজা আগলে বল্‌লেন—বড় যে কেটে পড়ছ, বলি মুখের কথাটাও খসাতে পারো তো! না হয় দুপাতা ইংরেজী শিখে বিদ্বান হয়েছ!

—আপনিই ত বল্‌লেন যে, কোনো কথাই বলা চলবে না। নইলে—

—নইলে আর কি, বলবে যে, তুমি যা মতলব করেছ সেটাই নির্ভুল। বলি, বাপু হে, আমি তোমার বাপ। একটা কথা বলি দেবু, তোমার বয়েস হয়েছে।

—তা আমিও বুঝি, সেইজন্যেই চাকরীবাকরী করতে চাই।

—চাকরী, তা বেশ ডাক্তারী পাশ করেও ত চাকরী করা যায়।

—আমার আর কেঁচে গণ্ডুষ করার ইচ্ছে নেই। এখন যদি আবার পড়তে যাই ত গোড়া থেকেই আরম্ভ করতে হবে। ক বছর জেল খেটে সব ভুলে গিয়েছি।

—আমারই কপাল! কত ছেলে জেলে বসে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে, আর তুমি উল্টে সব গুলে খেয়েছ! তা কারখানাতে ঢুকতে চাও, সেকথাটা আমাকে বলা উচিত ছিল। ওই হতভাগা ছোট্‌কা বাঁড়ুয্যের কাছে গিয়েছিলে কেন? ওর খাঁই মেটানো তোমার বাপের কম্ম নয়। একটা হেল্‌পারের পোস্টের জন্যে ও দু-শ টাকা খায়, তা জানো?

—দু-শো টাকা, কেন?

—ওর দস্তুরই ওই। আর মল্লিক সাহেবের কাছে তুমি নিজে গেলে হয়তো মোটামুটি ভালো পোজিশনের একটা কাজ পেতে—লোকটা তোমাকে যখন

স্নেহই করে। কিন্তু আমি বলি কি, মন দিয়ে ডাক্তারীটা পড়াই ছিল সবচেয়ে ভালো।

—ওটা আর হবে না।

সীতানাথ ছু-চোখ ছাদের দিকে তুলে হতাশ ভঙ্গীতে বল্‌লেন—আজ পর্যন্ত কোন্ কাজটা তোমাকে দিয়ে হয়েছে শুনি! তাহলে ডাক্তারী তুমি পড়বে না?

—না।

—হুঁ! তবে কারখানার চাকরীই তোমার চাই?

দেবজ্যোতি উত্তর দিল না।

সীতানাথ জবাবের জন্য ছেলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অপর পক্ষ নীরব দেখে তিনি আবার শুরু করলেন—কি কাজ করতে পারো! বলি কারখানায় তোমাকে নেবে কেন? তা ছাড়া তোমার পুলিশ-রিপোর্টেই ত দফা-রফা!

—সে জন্যে আপনার ব্যস্ত হবার দরকার দেখি নে। আমার ব্যবস্থা আমিই করব।

—অঃ! বসে বসে এবাড়ির অন্ন ওড়ানো চল্‌বে না। ব্যবস্থা যদি দেখতেই হয় তবে ষোলআনাই দেখতে হবে। আমার কথা হচ্ছে, আমার বাড়িতে থাকলে আমার মতে চলতে হবে।

—আপনি কি চান আজই চলে যাই!

—তাহলে ত খুব মজাই হয় তোমার, না! ছুটি আইবুড়ো মেয়েকে ফেলে তোমার গর্ভধারিণী মা কেটে পড়েছেন—এখন তুমিও সেই তালে আছো। আর আমি শালা বুড়ো বুদ্ধু, ঘানি টেনেই মরি তাই চাও! সে হবে না। আগে ওদের বিয়ের বন্দোবস্ত করো, তারপর যেখানে খুশি যেতে পারো। আমার জন্যে ভগবান আছেন। হাঁ, তিনি আছেন—সারা জীবন এত ছুঃখ-কষ্ট দিয়েছেন বলে কি আর আমি তাঁকে অপমান করব?

সন্ধ্যার অন্ধকারে সীতানাথের মুখখানা আবছা দেখা যাচ্ছে। দেবজ্যোতি তাঁর কথাগুলি শুনতে শুনতে নরম হয়ে গেল। সে বল্‌ল—আপনি যা বলছেন

আমিও তাই চাইছি। আপনাদের এভাবে ফেলে রাখতে চাই না বলেই ত আরও এখানে কাজ খুঁজছি!

—বসো।

বলে সীতানাথ ছেলের হাতখানা ধরলেন।

দেবজ্যোতি চেয়ারে বসল। সীতানাথ হাঁক দিলেন—ওরে একটু তামাক দে!

দেবজ্যোতি উঠে বল্‌ল—আমি সাজছি বাবা!

—দূর পাগল, তোর কি অভ্যেস আছে?

মল্লিকা কল্‌কে ধরিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকল—এই যে বাবা!

—বস মল্লি, খুকীকেও ডাক!

—দেবি ত এখনো ফেরে নি, ওদের কলেজে কি ফাংশন আছে, দেরী হবে বলে গেছে।

—ও। তা ফাংশন-টাংশন রাত করে না হলেই ত পারে। যাক গে। শোনো, রাগ-ঝাল আর আমার ভালো লাগে না। এই বুড়ো বয়েসে সব তাল সাম্‌লাতেও পারি নে। তাই বল্‌ছিলাম—বকুলপুরে একখানা ভাড়াবাড়ি করেছি—সেটার আজ চার মাস ভাড়া বাকী, লোকাভাবে আদায় হচ্ছে না। কাল সকালে গিয়ে সেটা আদায় করে আনবে। আর ওই বক্সী-বাঁধের পিছনে খানিকটা জমি কেনা রয়েছে। একটু দেখেশুনে করতে পারলে—সেখানেও গোটা তিনেক ছোট ছোট কোয়ার্টার হয়ে যাবে। মানে সেটা তোমাকেই তৈরী করাতে হবে। আমার ত সময় হয় না, নইলে কবেই—যাক তুমি আপাততঃ এগুলো করে ফ্যালো। টাকার জন্যে ভাবনা করতে হবে না—ধার-ধোর করে বাড়িটা তুল্‌তে পারলে,—ভাড়ার টাকা থেকে বছর ঘুরতে-ঘুরতে শোধ হয়ে যাবে।

মল্লিকা আলোটা জ্বেলে দিল।

সীতানাথ কয়েক বার চোখ কুঁচকে উজ্জল আলোর ধাক্কা সাম্‌লে বল্‌লেন—হাজার হলেও আমি তোমার বাবা, তোমরা না ভাবলেও আমি ত আর চোখ বুজে থাকতে পারিনে। এই ছাখো, বকুলপুরের বাড়িতে রয়েছে তিন ঘর

ভাড়াটে—তিরিশ টাকা করে, তিন ত্রিশং নব্বই। তাহলে চার মাসে হচ্ছে তোমার তিনশ ষাট টাকা। এখন ওই দিয়েই বকসী বাঁধের বাড়ির কাজে হাত দিতে পারবে। তারপর গিয়ে, ভিত দেখিয়ে এ্যাড্‌ভান্সও পাওয়া যাবে শ-দুই আড়াই। হ্যাঁ, তা পাওয়া যাবে। আবার ওদিকে ততদিনে ত, আবার ইয়ে বকুলপুরের থেকে মাসে মাসে নব্বই টাকা পেয়ে যাচ্ছ!

মল্লিকা অবাক হয়ে শুনছিল সীতানাথের কথা, এবার বল্‌ল—কই বাড়ি করেছ, জমি কিনেছ—তুমি ত সেসব কথা আমাদের কিছু বলো নি বাবা!

—আরে বেটি, তোরা হচ্ছিস মেয়ে ছেলে। তোদের পেটে কথা তলায় না। হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলাম, দেবু—এখন এই কাজ! বুঝলে, এই কোয়ার্টার তিনটে করতে খরচও বেশি নয়, আমাদের এম্‌ টাইপ কোয়ার্টার যেমন হয়—তবে ছাদগুলোতে খোলার খাপ্‌রা দিলেই হবে, রাণীগঞ্জ টালের অনেক দাম। তাতেই ভাড়া জুটে যাবে তোমার পঁয়তাল্লিশ টাকার মতো! চাকরীও তোমার একটা হয়ে যাবেই—তবে ব্যস্ত হয়ো না। আমি এদিকে তদবির করতে থাকি, তুমি কাজগুলো সেরে ফ্যালো।

দেবজ্যোতি গভীর সমস্যার মধ্যে পড়ল। অতর্কিতে সীতানাথ যে তাকে এমন একটা বিপদের সামনে টেনে আনতে পারেন, সে তা কল্পনাও করতে পারে নি। এর চেয়ে তিনি যদি দেবজ্যোতিকে বাড়ি থেকে চলে যেতে হুকুম করতেন ত সে প্রস্তুত ছিল। আজকের এই সান্ধ্য পরিবেশ এমন অন্তরঙ্গ যে, অযথা একটা মনোমালিন্য সৃষ্টি করতেও তার ইচ্ছা হচ্ছে না।

চিন্তিত ভাবে দেবজ্যোতি বল্‌ল—আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে কতদূর কি হয়!

হাসিমুখে সীতানাথ ঘাড় নাড়লেন—না হবার আর কি আছে! তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে করলেই হয়ে যাবে কাজ। বুঝলে বাবা, একটু মাথাটা ঠাণ্ডা করে চল্‌তে শেখো।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—একটা কথা ছিল।

—বলো, বলো।

সীতানাথ খুশি মনেই তামাক টান্‌তে লাগলেন।

দেবজ্যোতি একবার মল্লিকার দিকে তাকিয়ে হাসলো—মল্লির বিয়ের কথা!

—বেশ ত একটা পাত্তর ত্থাখো!

মল্লিকা উঠে গেল।

—পাত্র মোটামুটি ঠিকই আছে। আপনি রাজী হলে—

—রাজী অরাজীর কথা ত এর মধ্যে কিছু নেই। দু-মুঠো খেতে পাবে এমন ঘর দেখে দেবে, ব্যস! আর আমাদের যা অবস্থা, তাতে দিতে-থুতেও বিশেষ পারা যাবে না—এর পর আর একটাকেও ত পার করতে হবে। তবে ওই হাজার দেড়েকের মধ্যে নগদে অলঙ্কারে কষ্টেছিষ্টে দিতেই হবে।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—তাহলে আমি কথা কইতে পারি?

সীতানাথ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—ছেলেটি তোমাদের স্বদেশী-টদেশী করে না ত?

—আজ্ঞে না। এখানেই কাজ করে, আপনি চেনেন।

—আমি চিনি? কে বল্ তো?

—অমল চৌধুরী।

—বলিস কি! সে ত রীতিমত সৎপাত্র। তা ত্থাখ যদি হয় ত ভালোই হবে—বেশ ছেলেটি। আমার ত মনে হয় ওর দর হাজার আড়াই তিনের কম হবে না। অনেক ত দেখলাম—হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই। আবার মুকুলের কীর্তির কথা শুনে না ভেগে যায়! ও হতচ্ছাড়ীর কেলেঙ্কারীর জন্যেই কত ভাল-ভাল সম্বন্ধ কেঁচে গিয়েছে। মানিকপুরে ত ঘোঁট-কচালের অন্ত নেই বাবা।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—তার সঙ্গে ত আমাদের সম্পর্কও বিশেষ নেই।

—তা বল্‌লে কি হয়। কথায় বলে, এক ঝাড়ের বাঁশ।

—সে সব ভাবনা আমার।

—আমি ত সব ভাবনাই ছেড়ে দিতে চাই বাবা। এখন বুড়ো হয়েছি, একটু পরকালের চিন্তা না করলে পরে সেখানে ঠাঁই হবে না যে।

তাঁর বিশ্বাস, শেষ বয়সে ভগবানকে খুশী করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলে স্বর্গের আনাচে-কানাচে একটু আশ্রয় পাওয়া শক্ত হবে না। হাই তুলে তুড়ি দিয়ে রাম রাম বলে নির্বাপিত গড়-গড়াটা নামিয়ে রাখলেন সীতানাথ। তারপর

ছেলেকে বল্লেন—তবে আর দেরি নয়, আজই একবার তার কাছে যাও। তার কথা নিয়ে কাল বাপকে চিঠি দাও আমার জবানীতে। আমি একবার গোবিন্দর ওখানে যাই, কদিন ধরেই নাকি বড় নাতিটা দাদু-দাদু করছে! ভাবি ত যাবো না, তা এই পাঁচদিন হলো এসেছে—যাইও নি। কিন্তু শিশু না দেবতা, ওরা ত আর অপরাধ করে নি, মিথ্যে ওদের মনে কষ্ট দিয়ে কি লাভ! কি বলো দেবু!

দেবজ্যোতি হাসল—তা ত বটেই।

—আর রাত্তির বেলায় কে-ই বা দেখতে আসছে। যদি কেউ খোঁজ করে ত বলে দিয়ো আমি ওভারটাইম করছি—ফিরতে রাত হবে! মল্লিকাকেও কথাটা বলে রাখা ভালো।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পুনরায় কি ভেবে বল্লেন—না, ওকে এসব আর বলে কাজ নেই—পছন্দ করে না ওখানে যাওয়াটাওয়া! আমি ত এমনিতেও কত জায়গায় বেরুতে পারি। বাড়ি নেই বল্লেই ল্যাঠা চুকে গেল! কি বলো? হ্যাঁ, তুমি তাহলে ওই ছোকরার ওখানে বেরিয়ে পড়ো। শুভস্য শীঘ্রম্! হ্যাঁ সেই ভালো।

বাহান্ন

মানিকপুরের সাজানো গোছানো ছবির মতো শহুরে গণ্ডীটুকু ছাড়ালেই শুরু হয়ে গেল পুরোদস্তুর পাড়া-গাঁ—রাঙাপাড়া। সাঁওতালী পরিচ্ছন্নতার উপর প্রবল বৃষ্টির ঝাপটা এখনো স্থচিহ্নিত রয়েছে। মেটে বাড়ির দেয়ালের বিচিত্র চিত্রগুলি ছন্দবর্জিতভাবে বিকৃত হয়েছে। সকালে উঠেই সাঁওতালেরা নতুন করে কাদাগোলা বুলোচ্ছে দেয়ালের গায়ে।

দেবজ্যোতি চল্‌তে চল্‌তে মাঠের সবুজ বীজধানের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল নিজের কথা। আশ্চর্য, কাল পর্যন্ত সে নিজেও জানতো না যে এই ভাবে আবার জীবনকে নতুন ছাঁদে গড়তে শুরু করবে। কাজটা ভালো হলো কি না, তা এখনও ভাববার সময় আসে নি। এ পথেই যে চলবে সে চিরকাল, তা-ই বা কে জানে! তবে একটা কিছুর মধ্যে লেগে পড়ার যে তৃপ্তি আছে, আপাততঃ সেই খুশীটুকু বেশ লাগ্‌ছে। কতকাল পরে সে সাধারণ মানুষের মতো কাজ করতে পাচ্ছে!

বকুলপুরের কোন্ গাছে যেন খুব মিষ্টি টোপা কুল পাড়তে আসতো মিণ্টু, ললিত, মুকুন্দ ওকে সঙ্গে নিয়ে! সেই গাছটা কি আজও চিনতে পারবে দেবজ্যোতি? ছেলেবেলার টুকরো ছবি এক-একটা, যেন সোনালী রোদে ঝলমল করছে এখনও! অথচ মিণ্টু কত দূরে চলে গেছে—ললিত-মুকুন্দর সঙ্গে ত কোনো যোগই নেই।

সহসা মনে পড়ল নিবারণ চৌধুরীর কথা! স্বদেশী আন্দোলনের নেশাতে জীবনটা এক নিষ্ফল তামাশায় পর্যবসিত হতে দেওয়ার ভয়েই বুঝি দেবজ্যোতি আজ নিজেকে কাজের কষ্টিপাথরে পরখ করবার সংকল্প নিয়ে নেমেছে!

বকুলপুর আর রাঙাপাড়ার মাঝে খানিকটা ফাঁকা মাঠ—এখান থেকে ওই দূর দিগন্তে দেখা যায় ওটা বুঝি পঞ্চকোট পাহাড়! এর মাঝে কত গ্রাম ডুবে আছে গাছের অন্তরালে!

দেবজ্যোতি গাঁয়ে ঢুকে দেখল চেহারা একদম বদলে গেছে। আগে ত মোট দু-খানা কোঠাবাড়ি ছিল—এখন সে জায়গায় গাঁয়ের প্রায় অর্ধেকের উপর বাড়িতে পাকা ছাদ। চালা বাড়িগুলো মুখ লুকোবার জন্য যেন আড়ালে আবডালে কুণ্ঠিত ভাবে সরে রয়েছে!

সীতানাথের বাড়িখানা খুঁজে বার করা এখন সহজ মনে হচ্ছে না। টালির বাড়িও কম গজায় নি।

পথে একজনকে পেয়ে সে প্রশ্ন করল—আচ্ছা, বল্‌তে পারেন সীতানাথ মুখুয্যের ভাড়াবাড়িটা কোন্‌খানে?

লোকটি বার কয়েক দেবজ্যোতিকে আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে দেখে বল্‌ল—কে জানে মশাই! কতো বাড়িই হচ্ছে এবেলা ওবেলা! একটু এগিয়ে যান, ওই যতীন বাবুর বাড়িতে জিগ্যেস করুন যদি বল্‌তে পারে।

—যতীন বাবু? ও, যতীন রায়—হ্যাঁ, তা উনিই বা জানবেন কি করে?

—খুব জানবে মশাই, ইট আর টালির কারবার করে ত! তা বাড়ি যারা করে তাদের হদ্দোহদিস সব জানে। আমরা চাষাভূষো লোক—আমাদের বলুন, কার কোন্ ক্ষেতটা, দেখুন কেমন বল্‌তে পারি কি না!

—আচ্ছা!

বলে দেবজ্যোতি কয়েক-পা এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে সেই লোকটি আবার ডাকলো—ও মশাই শুনুন!

—আমাকে বল্‌ছেন?

—মহাশয়ের নাম? কোথা থেকে আসা হচ্ছে? আমি হরিদাস কুণ্ডু, নিবাস বকুলপুর, পিতা ঈশ্বর ধর্মদাস কুণ্ডু, পেশা—

দেবজ্যোতি বাধা দিয়ে বল্‌ল—বিলক্ষণ, আপনারা এ গাঁয়ের জমিদার তাহলে! খুব জানি, কুণ্ডুদের কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। আমার নাম দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, আসছি মানিকপুর থেকে!

—দাঁড়ান-দাঁড়ান, দেবজ্যোতি মুখুয্যে—নামটা শোনা-শোনা লাগছে! হ্যাঁ মনে পড়েছে—আপনি সেই দেবজ্যোতি মুখুয্যে?

—কোন্ দেবজ্যোতির কথা বল্‌ছেন বলুন তো!

-না তা-ই বা কি করে হয় ?

.াপন মনেই হরিদাস কুণ্ডু তার রেখাবহুল গ্রাম্য মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর করে চোখ কুঁচ্‌কে কি ভাবলো, তারপর বল্‌ল—কিছু মনে করবেন না মশাই, এক দেবজ্যোতি মুখুয্যের কথা শুনি, সে ছোকরা কোম্পানীর এক সাহেবের মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় ভেগেছিল। তা সাহেব বাঙালী হলে কি হয়, পোজিশানের দাপট ত কম নয়, ছোকরার বিন্দাবনী বেলেল্লাপনায় জোঁক লাগিয়ে দিল। একেবারে ফাটক—শুধু কি তা-ই, মেয়েটাকেও জেলে পুরেছে! আরে মশাই, আমরা পাড়াগাঁয়ের মুখ্যু মানুষ—ওসব বড়লোকীর মজা বুঝি নে। যাগ গে যাগ, আমাদের ওসব পরের কথায় কাজ কী? রাধে-রাধে! তা আপনি ব্রাহ্মণ, বেশ বেশ, কাজ শেষ হলে এই পথ দিয়েই ত ফিরবেন। দয়া করে একবার গরীবের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন। দেবেন ত ?

দেবজ্যোতি জিভ্‌ কেটে বল্‌ল—সে কি কথা। ব্রাহ্মণ-টাহ্মণ নই মশাই, পায়ের ধুলো দেবার যোগ্যতা নেই। হ্যাঁ আপনি বল্‌ছিলেন না, দেবজ্যোতি মুখুয্যে—সাহেবের মেয়ে নিয়ে পালিয়েছিল—তা এসব কোথায় শুনলেন ?

বিজ্ঞভাবে ঘাড় নেড়ে হরিদাস একটু হাসলো—ধর্ম মশাই, ধর্ম! ধর্মের কল, ও মশাই কোম্পানীর সাড়ে চার গণ্ডার কলের চেয়ে অনেক বেশি জোর তার। এই দেখচেন বটে মেঠো সাজে হরিদাস কুণ্ডুকে কিন্তু খবর সব পাই! তা আপনি নিশ্চয় সেই দেবজ্যোতি মুখুয্যে নন্‌, কি বলেন এঁ্যা! সে বেটা ত এখন মেয়াদ খাটছে! ঠিক হয়েছে।

একবার ইচ্ছে হল দেবজ্যোতির যে বলে, আমিই সেই দেবজ্যোতি—কিন্তু অনর্থক বিলম্বের আশঙ্কায় এড়িয়ে গেল। অযথা তর্কই বাড়বে, লোকটা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে, দেবজ্যোতি মন্দাকিনীকে নিয়ে পালায় নি! সে নমস্কার করে বিদায় নিল। হরিদাস কুণ্ডু আর একবার অনুরোধ করল—পায়ের ধুলো দেবেন।

পরক্ষণে অতর্কিতে দেবজ্যোতির পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। চম্‌কে উঠে দেবজ্যোতি বল্‌ল—ছি-ছি একী করলেন! না-না-না।

—আজ্ঞে জাত সাপের ড্যাঁপাও ত বিষহরি! আপনি ব্রাহ্মণ; বয়েসে ছোট, তাতে কি!

দেবজ্যোতি নির্বিকার ভাবে মাথা হেঁট করে হরিদাসের পা ছুঁতে গেল। কুণ্ডুমশাই ছিট্‌কে দূরে সরে গিয়ে বল্‌ল—রাধে-রাধে, নরক হয়ে যাবে মশাই।

তারপর আর পিছন ফিরে তাকালও না হরিদাস, হন্‌হন্ করে চলে গেল।

যতীন রায় খুব খুশী হয়েছেন দেবজ্যোতিকে দেখে—আরে আরে এ কী কাণ্ড, আপনি নিজে এলেন বাড়ি বয়ে! কেন, একটা খবর দিলে আমিই যেতাম। যাক তারপর কি খবর বলুন!

দেবজ্যোতি মহা সমস্যায় পড়ল। যতীন রায়ের কথায় বেশ বোঝা যাচ্ছে যে তিনি ধরে নিয়েছেন দেবজ্যোতি আন্দোলন-সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে পরামর্শের জন্য এসেছে। তিনি জেলখানার গল্প শুরু করলেন। তারপর সুভাষচন্দ্রের ব্রহ্ম-অভিযান সম্পর্কে কথা উঠ্‌ল। এমনি করে প্রায় ঘণ্টা খানেক কেটে গেল। ক্রমশ দেবজ্যোতিও ইত্যবসরে আসল কাজের কথাটা ভুলেই গিয়েছিল।

এক সময়ে যতীন বাবু বল্‌লেন—আর কী, এবারে ত একটা ফয়সালা হয়ে যাচ্ছে। তবে আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবো। ভারতবর্ষ ইংরেজের হাত থেকে মুক্তি পেলেও বাংলাদেশের কোনো সুরাহা নেই। লীগের কবলেই আমাদের দফা রফা হবে।

দেবজ্যোতি মাথা নাড়ল—আগে বেনেরা যাক, তারপর ত নিজেদের মধ্যে বোঝাপোড়া! তা সে একরকম করে হয়েই যাবে।

কথায় কথায় যতীনবাবু কখন 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এসেছেন তা কারুর খেয়ালই নেই। হাতের তেলো উল্টে তিনি হতাশভাবে জবাব দিলেন—আমি ভাই কম্যুনল্যাল নই, তবু একটা কথা বিশ্বাস করি, তেঁতুলের নেই মিষ্টি, নেড়ে'র নেই ইষ্টি! বুঝলে না, জিন্নার যা মতলব, তাতে ত কোনো আশা-ভরসাই দেখিনে।

—আপনার এ কথা মানতে পারলাম না রায় মশাই! এই কংগ্রেসে কি ভালো মুসলমান নেই?

—আরে তা কেন থাকবে না? আবার এই জিন্নাও ত ছিল—কিন্তু,

—আমার মনে হয় এর মধ্যে কিন্তুর কিছু নেই।

—আছে ভাই, আছে! সে বার কি হয়েছিল তোমার ওই মানিকপুরের কারখানাতে? তোমরা সে সব খবর জানো?—লীগ মিনিষ্ট্রির সঙ্গে কোম্পানীর রফা হ'ল যে, কোম্পানীর দিকে সরকারী নেকনজর পেতে হ'লে ফিফ্‌টি পার্সেণ্ট ওয়ার্কার রাখতে হবে মুসলমান। বোঝো একবার! তোমার-আমার চোখে ধুলো দেওয়া সোজা। কিন্তু যারা জানবার তারা ঠিকই জানে, ওই তোমাদের রফি-উল্লা নিজে গিয়ে মুসলমান লেবারদের ঘরে ঘরে লণ্ঠন হাতে ঘুরে ঘুরে খবর দিয়ে এল, কাল সকালে সব কারখানায় জয়েন করো। সব নাগাড়ে বেছে বেছে মুসলমানই সে সময়ে ঢুকিয়েছে কোম্পানী।

—এ সব যে সত্যি তা আপনি কি করে জানলেন?

—ওই যে বল্‌লাম, যারা জানবার তারা ঠিকই জানতে পারে।

—দেখুন দাদা, এসব হচ্ছে ছোটখাটো ব্যাপার, একটা দেশের স্বাধীনতা পেতে গেলে আমার মনে হয় এগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবারই দরকার হয় না।

—সব দরকার হয় ভাই! সব। দেখবে যেটা আজ ছোট বলে মনে হচ্ছে, কাল সেটাই ডাগর দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া এটা মোটেই মাইনর ইস্যু নয়, এই নিয়েই ত যত গোলমাল। যাক্ ও নিয়ে তর্ক করে কি হবে, এখন বলো দেখি হঠাৎ এখানে কি উদ্দেশ্যে আসা?

দেবজ্যোতির মনে পড়ল বাড়ির কথা, সে বল্‌ল—আমাদের একখানা বাড়ি আছে, সেটার খোঁজ-খবর নিতে হবে, কিন্তু বাড়িটা ত চিনি না!

—বাঃ, তোমাদের বাড়ি অথচ তুমি চেনো না?

—মানে, বাবার বাড়ি—আমি কিছুই জানি নে এ সবের!

—ও, বুঝেছি, তালতলার সেই টাঁড় জমির ওপর, হ্যাঁ-হ্যাঁ! আমার ত সময় নেই, নইলে সঙ্গে যেতাম। তা খুঁজে পেতে বেশি কষ্টও হবে না। পশ্চিমের পথ ধরে সোজা চলে যাও। গেলেই দেখতে পাবে, নটা তালগাছ

আছে তার কাছেই টালির বাংলো। তোমার বাবার বেশ পছন্দ আছে হে, জায়গাটা ভালো—তবে জলেরই যা অসুবিধে।

—আচ্ছা, এখন তাহলে আসি।

—বেশ, এরকম মাঝে মাঝে এসো। গাঁয়ের মধ্যে ত কথা কইবার মতো মানুষ পাই না। তা তোমার বর্ধমানের পালা চুকেছে ত! এবার প্র্যাক্‌টিশ, —এ্যাঁ?

—আজ্ঞে পড়াশুনো আর হ'ল না, ছেড়ে দিলাম।

—বলো কি? তবে এখন কি পুরোদস্তুর রাজনীতিতে নামলে? বেশ-বেশ! ভায়া দেশের টান বড় জবর টান। একবার এ পাল্লায় পড়লে অন্য কোনো কিছু করা হয়ে ওঠে না। তা যাক, তোমার আর ভাবনা কি, সীতানাথ বাবু হিসেবী লোক—এই কারখানায় চাকরী করেও বেশ গুছিয়ে ফেলেছেন। একটু বুঝে চল্‌তে পারলে তোমার অভাব হবে না! তবে এও ঠিক যে নিছক রাজনীতি দিয়ে সংসার চলে না ভাই, একটা কিছু চাই—বিজ্‌নেস-টিজ্‌নেস না করলে শেষ রক্ষা হওয়া শক্ত।

দেবজ্যোতি হাসলো। যতীন রায় প্রৌঢ় গ্রাম্য লোক, আদর্শবাদী হ'লেও বাস্তবক্ষেত্র সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নন। অথচ আগে ইনি এমন ছিলেন না।

বাংলো-বাড়ি না বলে খানকয়েক টালির ঘর বলাই ভালো। দূর থেকে যত ভালোই দেখাক না কেন, বাড়ির কাছে এলে বোঝা যায় যে নেহাৎ মাথা গোঁজার আস্তানা। দেবজ্যোতিকে আত্মপরিচয় দিতে হ'ল অল্পবয়স্ক একটি বধূর কাছে। একটা মোড়া এগিয়ে দিয়ে বধূটি বল্‌ল—আপনারা ত একবার খোঁজও নেবেন না, আমরা কি অবস্থায় আছি। বাড়িওলা সেই যে বলে গেলেন টিপ্‌কল বানিয়ে দেবেন, তা সে আজও দিচ্ছেন—কালও দিচ্ছেন!

পাশের ঘর থেকে আরও একটি মেয়েলী গলা শোনা গেল—কার সঙ্গে কথা বল্‌ছিস ও শ্যামা দি!

—এই এসো না ভাই ইদিকে, বাড়িওলার ছেলে এসেছেন ভাড়ার

তাগাদায়। ও শান্তি,—তোমার ঘোষ-গিন্নীকেও ডাকো, তার ত কেবল নালিশ যে শ্যামার কথা শুনে অজলে-অস্থলে পড়ে শুকিয়ে মরতে হচ্ছে—ডাকো-ডাকো! শ্যামারই যত দোষ দেয়!

দেবজ্যোতি কোন কথাই বল্‌তে পারছে না। তিন ঘরের তিন গৃহিণী সমবেত ভাবে তাকে ঘিরে ধরে নিজেদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ উজাড় করে দিচ্ছে। তাদের তরফের অভিযোগ একটা নয়—তবে সবারই অভিযোগ এক রকম। জল নেই, বাথরুম তৈরী করে দেওয়ার কথা ছিল তাও দেওয়া হয় নি, আরও অনেক।

কথার ফাঁকে ঘোষ-গৃহিণী হঠাৎ বল্‌লেন—অনেক বেলা হয়েছে, একটু চা খাবেন?

দেবজ্যোতি এ প্রস্তাবে বিব্রত হয়ে পড়ল— না, থাক।

—থাকবে কেন, বসুন। এই করে আনলাম বলে।

তারপর ঘোষ-গৃহিণী চোখের ইঙ্গিতে বাকী দু-জনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন।

ঘরগুলোর সম্মুখে টানা বারান্দা। পাশাপাশি তিনখানি ঘর—মাপে হুবহু কোম্পানীর 'কে' টাইপ কোয়ার্টারের ঘরের মতো খুপ্‌রী। দেবজ্যোতি ভাবছে এখানে ত জায়গা-জমির অভাব ছিল না, তাহলে এইটুকু খাঁচার মতো ঘর কেন করলেন সীতানাথ? বারান্দাটাও ওই মাপের। মনে হয় যেন মানিকপুর থেকে সব কিছু তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে!

তালতলাতে গুটি চার-পাঁচ ছেলেমেয়েতে মারামারি লেগেছে। একটি বছর ছয়েকের মেয়েকে ধরে দুটি ছেলে কিল-চড় মারছে, মেয়েটি গলা ফাটিয়ে চীৎকার জুড়েছে। আর দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট্ট বাচ্ছা গুট্ গুট্ করে দৌড়োচ্ছে আর কাঁদছে—মা-আ—দিদিকে মাচ্ছে! মা—

দেবজ্যোতি ছুটে গিয়ে ছেলে দুটোকে টেনে আনলো দু-হাত দিয়ে। তারপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—কাঁদে না। কি হয়েছে ভাই, খেলতে-খেলতে অমন ঝগড়া হয়েই থাকে।

অপরিচিত একজন মানুষের সামনে কাঁদতে কার সাধ যায়? লজ্জা

পেয়ে মেয়েটি থেমে গেল। মেয়েটির নরম গালে চড়ের দাগ, রাঙা আঙুলের ছাপ হয়ে ফুটে উঠেছে।

ছেলে দুটিকে দেবজ্যোতি তিরস্কার করল—ছিঃ, তোমরা দু-জনে মিলে ওকে মারছো!

একটি ছেলে ফোঁস করে বলে বসল—মারবে না? দালাল বলে খ্যাপাচ্ছে সেই সকাল থেকে। কতবার হুঁসিয়ার করে দিয়েছি—

হাসি পেত অন্য সময়ে, এইটুকু ছেলের মুখে এমন পাকা কথা শুনলে হাসি পাবারই কথা। কিন্তু যেন দেবজ্যোতি হাসতে পারে না! সে গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—দালাল বলেছো খুকী? আর বলো না!

মেয়েটি চোখ মুছতে মুছতে বল্‌ল—খুকী ত বলেনি, আমি বলেছি।

দেবজ্যোতি বল্‌ল, তুমি বলেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকেই ত বারণ করছি খুকী!

—আমি খুকী নই, আমি হচ্ছি মলয়া, খুকী ত সবচেয়ে ছোটো, খোকার চেয়েও ছোট।

যে ছেলেটি একটু বেশী তেজস্বী, সে মুখ ভেংচে বল্‌ল—ইস্, মলয়া! মা তো ডাকে ঘুঁটে বলে! যেমন ব্যাঙের মত ছাতা পড়া রং, ঘুঁটে ত বল্‌বেই।

মলয়ার চোখ দুটো আবার ছলছলিয়ে ওঠে, কাঁদো কাঁদো স্বরে আস্তে ও বল্‌ল—দেখুন না আমাকে রাগাচ্ছে। ওই রকম, আমি ত কিছু করি না, ওরা আমাকে ভেংচি কাটে, ঘুঁটে বলে! ওই রন্টুটা ভারী হারামজাদা।

দেবজ্যোতি মেয়েটিকে আদর করে—তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, ওসব কথা বল্‌তে নেই। ওদের কথায় রাগ করো না, তাহলেই দেখবে ওরা আর রাগাতেই পারবে না।

তারপর ছেলে দুটিকে কাছে ডাকলো দেবজ্যোতি। কাছে এল না তারা, এক দৌড়ে পালিয়ে গেল।

দেখা গেল তিন গৃহিণীই একসঙ্গে এদিকে আসছেন। মলয়া ঘোষ-গিন্নীকে দেখেই ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল—ও কে মা? লোকটা আমার কে হয়?

—বাড়িওলার লোক হয় রে।

কথাটা মলয়ার মনঃপূত হ'ল না, কাজেই শ্যামাকে আবার প্রশ্ন করল—বলো তো কাকীমা, সত্যি কথা—সত্যি বাড়িঅলার লোক?

শ্যামাও ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলল—তা সে বাঁদর দুটো গ্যালো কোথায় এই ভর দুপুরে? কখন চান করবে খাবে, আমি বাবা আর পারি নে!

দেবজ্যোতির দিকে তাকিয়ে শ্যামা বল্‌ল—আপনার অনেক বেলা হবে বাড়ি ফিরতে! আজ আবার রোদেরও তেমনি তেজ—ছাতা আনেন নি সঙ্গে।

ঘোষ-গিন্নী বল্‌লেন—চা কিন্তু ভাই খাওয়াতে পারলাম না, ঘরে চিনি নেই—

লজ্জিত ভাবে দেবজ্যোতি বল্‌ল—তাতে কি আছে, এত বেলাতে চা না খাওয়াই ভালো।

শান্তি কথার মোড় ঘোরালো—আপনি আজ মিথ্যেই এলেন। ভাড়ার টাকা ত আমাদের কাছে নেই। তা ছাড়া কর্তারা কেউ বাড়ি নেই। আর থাকলেই কি দেবেন? ওঁরা সবাই ঠিক করেছেন, জ.লর ব্যবস্থা না করে দিলে টাকা-পয়সা দেবেন না। আর দেখুন না একবার আমাদের ঘরে ঢুকে—এ কদিন বিষ্টি পড়ে' পড়ে' জিনিসপত্তর ভিজে জাব! ছাদ দিয়ে হুড় হুড় করে জল পড়ে। মেরামত না করলে এ ঘরে থাকা যায়?

দেবজ্যোতি গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ ভাবলো, তারপর আস্তে আস্তে বল্‌ল—আমি ত সব শুনে গেলাম, আপনাদের কথা বাবাকে গিয়ে বলি—যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

তিন গিন্নীর মধ্যে শান্তিরই কথাবার্তায় মুখ চলে ভালো। সে বল্‌ল—হবে বলে রাখলে আমরা কচিকাঁচা নিয়ে থাকি কি করে? সেই যে পাঁচ মাস আগে মুখুয্যে মশাই 'সব হচ্ছে' বলে টাকা নিয়ে গেলেন, তারপর এ পথে আর হাঁটেন না, উল্টে টাকার তাগাদা দিয়ে কড়া-কড়া চিঠি লেখেন। বলেন, মামলা হবে—তা হয় হোক!

শ্যামা এতটা চোটপাট পছন্দ করে না, বিশেষ করে দেবজ্যোতির চোখেমুখে যে অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে সেদিকে লক্ষ্য করে শ্যামার মন যেন একটু নরম

হয়ে আসে! ও বল্‌ল—তা নয়, মামলার কথা বাদ দিয়েই বলছি, দেখছেন ত কি কষ্টে আছে! ঝগড়াঝাঁটি করে কোনো লাভ নেই। আমাদেরও যখন ভাড়াটে বাড়িতে থাকা ছাড়া গতি নেই—কবে কোয়াটার পাবে, আদবেই পাবে কি না কোনো কালে তার ঠিক নেই—তখন, যেখানে থাকতে হবে সেখানে ভাড়ার টাকা দিতে হবে বই কি! তবে আমরাও তো মানুষ—

দেবজ্যোতি চকিতে শ্যামার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—আপনাদের মেরামত যা-যা করা দরকার মনে করেন সেটা করিয়ে ফেলুন, খরচ যা লাগে ভাড়ার টাকা থেকে কাটা যাবে। তারপর যদি কিছু পাওনা থাকে সেটা পরে নিয়ে যাবো। কবে আসবো, কোন্ সময় এলে কর্তাদের সঙ্গে দেখা হবে বলে দিন—সেই মতো আসা যাবে।

ঘোষ-গিন্নী বল্‌লেন—এখুনি কি করে বলি? তাছাড়া এসব ব্যাপারে মেয়েদের না থাকাই ভালো। আমি বলি কি সন্ধ্যের পর আসুন, ওঁদের সঙ্গেই সব কথা কইবেন। সেটাই ত আমার মনে হয় সব চেয়ে ভালো।

শ্যামা বল্‌ল—মিছেমিছি ওঁকে ঘোরানোর কি দরকার দিদি! এর মধ্যে ত গোলমাল কিছু নেই। মেরামত অবিশ্যি রবিবার ছাড়া হবে না। আমি বলি কি, দিন পনেরো বাদে আপনি আসুন।

শান্তি আপত্তি তুলল, বল্‌ল—ওঁদের বাড়িঘর সারাই মেরামতের হাঙ্গামাতে আমরাই থাকি কেন বাপু? ওঁরা দাঁড়িয়ে থেকে ব্যবস্থা করাই ত নিয়ম। কর্তাদের সময় কোথায়? মিস্তিরি ডাকা, সিমেণ্ট জোগাড় করা, অনেক ঝামেলা। আমরা ত ভাড়া গুণছি, আবার এর ওপর, অত কে করবে!

শ্যামা বল্‌ল—তা বাস করতে গেলে একটু কষ্ট করতে হয় বই কি! আমি বাপু অত গায়ে হাওয়া লাগিয়ে থাকতে পারি নে। চার মাসে ত অনেক দুর্ভোগ সইতে হয়েছে। ওঁদের ওপর ছেড়ে রেখে দিলে, কবে হবে তার ঠিক নেই। যদি থাকতেই হয়, সারিয়ে সুরিয়ে থাকার যুগ্যি করে নেওয়াই কাজের মত কাজ।

ঘোষ-গিন্নী বল্‌লেন—বেশ, তুমিই সে ভার নাও তাহলে। তোমার কত্তার অবসর থাকে ভালোই ত।

দেবজ্যোতি কিছু বলবার আগেই শ্যামা শেষ রায় দিয়ে দিল—ভার নিতে ভয় নেই। কাজটা হওয়া নিয়েই কথা, আমি ত এই বুঝি।

তারপর দেবজ্যোতির দিকে তাকিয়ে বল্ল—আপনি তাহলে এখন আসুন।

—আচ্ছা।

দেবজ্যোতি অব্যাহতি পেয়ে বাঁচল।

মেঘভাঙা রোদের প্রখরতায় দুপুরটা খাঁ-খাঁ করছে। মাঠের খানার মধ্যে কাদাজলে গা ডুবিয়ে মহিষের দল নাকটুকু জাগিয়ে পরম আরামে বিশ্রামরত। মহুয়া গাছের তলায় রাখাল ছেলেরা পা ছড়িয়ে জটলা জমিয়েছে। একদল শকুন কোনো মৃত জন্তুকে ঘিরে মহোৎসবে ব্যস্ত, অদূরে দাঁড়িয়ে কুকুরেরা ঘেউ-ঘেউ রবে ক্ষুধায়-লোভে অসন্তোষ ঘোষণা করে চলেছে। কাকেরা নীরব দর্শক!

দেবজ্যোতি পথ চল্‌তে চল্‌তে সব কিছুই দেখছে, কিন্তু কিছুই তার মনকে যেন ছুঁতে পারছে না!

বাড়ি ঢোকার আগেই নজরে পড়ল, মল্লিকা জানালার গরাদেতে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে। দাদাকে দেখে একটু হেসে-সরে গেল। দরজা খুলে দিয়ে বলল—ইস্‌, মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে—কী কালো দেখাচ্ছে তোমাকে! না দাদা, এত মেহনৎ তোমার এই শরীরে সইবে না।

—এক গ্লাস জল দে!

—দাঁড়াও, গায়ের ঘামটুকু আগে শুকোক, তারপর জল—নইলে এক্ষুণি সর্দিগর্মী হয়ে বিছানায় পড়বে যে!

—তোদের এই ডাক্তারীর জ্বালায় গেলাম।

মল্লিকা হাসল।

—তারপর কতদূর কী করে এলে?

—বেচারাদের খুব কষ্ট রে! ছাদ দিয়ে হুড়-হুড় করে জল পড়ে। আর তেমনি জলকষ্ট।—এদিকে ত খাবার জল জোটে না, ওদিকে ওপরে বৃষ্টির জলে নাকানী-চুবুনী।

—তারপর ?

—বলে এলাম ব্যবস্থা করে নিতে। না বলেই বা করি কি—ওরাও তো মানুষ !

—বলে এসেছ ত, বেশ করেছ। সত্যি ওই রানীগঞ্জের টালির এই এক জ্বালা, বিষ্টি পড়েছে কি মাথায় হাত—আমাদেরও ত ওই অবস্থা ছিল। আজই নয় আমাদের দিন ফিরেছে। অবিশ্যি বাবাকেও বলিহারি ! উনি ত জানেন যে কোম্পানীর নমুনা নকল করলে পস্তাতে হবে, তবু কেন এমন বাড়ি করা !

—আর সেই মান্ধাতার আমলের বুদ্ধিতে বাঁশের ফ্রেমের ওপর টালি চড়িয়ে দিয়েছেন, কি না খরচ কম হবে ! আজকাল ত সবাই লোহার ফ্রেমই করে—

—যাক, এখন আর ওসব ভেবে কি হবে ! ওহো বল্‌তে মনে নেই—একখানা চিঠি এসেছে তোমার।

—কই দেখি !

—এখনই দিতে হবে ? চান করে খেয়ে নিশ্চিন্দি হয়েই নয় দেখতে—!

—চান করব কি রে ? তার আগে গায়ের ঘামটা শুকোতে দে !

বলে দেবজ্যোতি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠ্‌ল।

—তোমার সব তাতেই ঠাট্টা।

মল্লিকা হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

মন্দাকিনীর চিঠি। মোটেই বাহুল্য নেই। খামের চিঠি, নামেই খাম : মোট দশ-বারো লাইন লেখা—মর্ম এই, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে মানিকপুর যাওয়ার আগে কলকাতায় এলে, অথচ দেখা পেলাম না। খবরটা পরে পেয়েছি। আমি বি, এ, পাশ করেছি অনার্স নিয়ে। এবার কি করা যায়, ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার কোনো সার্থকতা আছে কি ? তুমি নাকি ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিচ্ছ ? কেন ? তোমার সেই বৌদি অমলা ঘোষালের সঙ্গে আলাপ হয়েছে—তিনি এখন একজন জবর[illegible] কমিউনিস্ট নেত্রী। আলাপ ঠিক হয় নি, এক তরফা ঝগড়া। উনি খুব কামড় দেবার চেষ্টা করলেন আমাকে, কিন্তু তোমার কাছে ওঁর সব কথা শোনা ছিল বলে,

মোটেই রাগ করতে পারি নি ওঁর কথায়। সেদিনের তর্ক-বিতর্কে উনি হারিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য ওঁর কথার মধ্যে যুক্তির জোর ছিল না—তবে গলার-জোর ছিল। তুমি কি এর মধ্যে কলকাতায় আসবে?

দেবজ্যোতি কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই স্নানে গেল। মন্দাকিনীর কথা খুব মনে পড়ছে—তবে তার চেয়েও বেশি অমলা বৌদির কথা! দেবজ্যোতি যেন হঠাৎ অমলাকে নতুন চোখ নিয়ে দেখতে শুরু করেছে। সেই অমলা, যাকে একদিন শূন্য নিরাশ জীবন সামনে নিয়ে মানিকপুর থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে। রিক্ত জনতার মিছিলে যার হারিয়ে যাবার কথা—সেই অমলা কি করে ভাগ্যলিপিকে ব্যর্থ করে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল? কি হ'ল ওর সেই শিশুসন্তানের? আশ্চর্য, ছেলেটা বেঁচে আছে! নাকি সেও শেষ আঘাতটুকু হেনে দিয়ে অমলাকে মরীয়া করে দিয়ে গেছে! অনেক প্রশ্নের ভিড়ে দেবজ্যোতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফুটফুটে ছেলেটা এখন কতবড় হয়েছে, দেখতে কেমন হ'ল! কে জানে?—কিন্তু জানতে খুব ইচ্ছে করে দেবজ্যোতির। মন্দাকিনীকেও একবার চোখের দেখা দেখতে পেলে ভালো হয়। এই মুহূর্তে দেবজ্যোতির মন উধাও হয়ে পুরনো দিনের কত ছবি দেখছে—বর্তমানটা যেন ঘোর মিছে!

তিপ্পান্ন

সীতানাথ যখন শুনলেন বকুলপুরের বাড়িভাড়া আদায় হয় নি, তার উপর আবার দেবজ্যোতি হুকুম দিয়ে এসেছে বাড়ি মেরামতের—তখন তিনি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বাড়ি মাথায় তুললেন। খবরটা মল্লিকার কাছেই শুনেছেন, কাজেই বেচারী মল্লিকাকেই ধাক্কা সামলাতে হ'ল। তা হোক, সেজন্য ওর বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই, বরং খুশীই হ'ল সে এই ভেবে যে দেবজ্যোতি উপস্থিত থাকলে নির্ঘাৎ ঝগড়া বেধে যেত। আর সেই কলহের পরিণতি কি হতো অনুমান করা শক্ত নয়।

ঝড়ের বেগ একটু প্রশমিত হতে মল্লিকা বল্‌ল—ও বাড়ি থেকে লোক এসেছিল, একবার যেতে বলেছে।

সীতানাথ বুঝেও না বোঝার ভাণ করেন—ও বাড়ি আবার কোন্ বাড়ি ?

—ললিত বাবুদের বাড়ি।

—ললিতবাবু ? ও। কেন, কি ব্যাপার ?

—অতশত জানিনে। ললিতবাবুকে নাকি পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে—গোবিন্দবাবু এ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়ে হাসপাতালে গিয়েছেন আজ দুপুরে। দাদা খবর পেয়েই হাসপাতালে ছুটেছে। আবার তারপরই তোমাকে ডাকতে এসেছিল।

—তুই যেন দিন-দিন কি হচ্ছিস ! এতক্ষণ সে কথাটা বলিস নি কেন ?

মল্লিকা মাথা হেঁট করে নীরব রইল।

জলন্ত দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে সীতানাথ মন্তব্য করলেন—সোঁদর গাধা ! খাচ্ছে দাচ্ছে আর মোটাচ্ছে। দিন দিন আক্কেলের মাল্‌পো খেয়ে বুঁদ হয়ে যাচ্ছে ! হুঁঃ। ললিতবাবু, গোবিন্দবাবু—কেন, জামাইবাবু, তাঐমশায় বল্‌লে মানের কচুতে মুখ কুট্‌-কুট্‌ করে, না ?

তবুও মল্লিকা কথা বল্‌ল না একটা।

সীতানাথ রেগে গেলেন আরও। বল্লেন—চল্ আমার সঙ্গে, তোকেও যেতে হবে। বড় বোনের এতবড় একটা বিপদ, আর উনি মুখ টিপে টিপে মজা দেখছেন!

এবার মল্লিকা চুপ করে থাকতে পারে না—আমি কেন যাবো? আমার শরীরে অত দয়ামায়া নেই। তোমাদের আছে তোমরা যাও। আর, যারা আমাকে মানুষই বলে গ্রাহ্য করে না, তাদের আমিও অমানুষ ছাড়া বেশি কিছু ভাবি না।

—অ। চ্যাকৃড়ার বিচি খেয়ে খুব গুমোর বেঁধেছে, আয় আজ তোর বিষ ঝেড়ে দিই।

বলে সীতানাথ হাতের কাছে গড়গড়াটা পেয়ে সেটা নিয়েই তেড়ে এলেন মল্লিকার দিকে। মুখে যতই আস্ফালন করুক, মল্লিকা মারধোরকে রীতিমত ভয় করে—ঠিক মারকে ভয় নয়, অশান্তিকেই ওর ভয়!

একটু সরে গিয়ে বল্ল—দাঁড়াও, গড়গড়াটা ভাঙলে আবার পয়সা খরচ আছে। তুমি আমাকে ওখানে নিয়ে গেলে খুব ভালো দেখাবে কি না সেটা আগে ভেবে দেখেচ?

থম্‌কে গিয়ে সীতানাথ বল্লেন—কেন, খারাপ দেখাবে কিসে শুনি?

—এতকাল পরে আমি যদি যাই হঠাৎ দিদির স্বামীকে জেলে পুরেছে বলে, তাহলে ও ঠিক মনে করবে—বিপদে পড়েছে তাই মজা দেখতে গেছি! তাতে হিতে বিপরীত হবে না?

দপ্ করে নিভে গেলেন সীতানাথ—এটা ত মনে হয় নি! তুই বোকা হলেও একটা বুদ্ধির কথা বল্লি বটে।

সীতানাথকে নিরস্ত করতে পেরে মল্লিকা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বল্ল—যাও, আবার হয়ত জামিনটামিনের জন্যে বল্বে। তোমার বড় জামাই তোমারই দায়।

দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে সীতানাথ ছাতা বগলে করে বেরুলেন—আকাশের যা অবস্থা, কখন বৃষ্টি নামে তার ঠিক কি?

বাইরের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বল্লেন—দুর্গা দুর্গা! হ্যাঁ দেখ, ওই ওদের

অমল না কি অমিয়, তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। হয়তো সে আসতে পারে—এলে একটু চা টা দিস, দেবু না আসা পর্য্যন্ত বসতে বলিস—আর যদি তার আগে দেবু এসে পড়ে তবে তো ভালোই হয়। দুর্গা-দুর্গা!

দরজা বন্ধ করে মল্লিকা ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়ল—অবসন্ন ওর দেহ-মন! ললিতের খবর পেয়ে অবোধ ওর মনটা কেমন যেন গুমরে গুমরে কেঁদেছে! অবিচার করল যে মানুষটা, যার জীবনের কোনো আনাচে-কানাচেও মল্লিকার এক ছটাকও ঠাঁই আছে কি না সন্দেহ, সেই মানুষটার জন্যে এত কিসের মমতা? কেন ওকে ধরল পুলিশে? যে লোকটি সীতানাথের খোঁজ করতে এসেছিল, লজ্জার বালাই ঘুচিয়ে তাকেই মল্লিকা জিজ্ঞাসা করেছিল। সঠিক উত্তর পায় নি, এইটুকু সে জানে যে, গোলমালটা মাস কয়েক ধরেই চলছিল। সরকারী আমলা-পেয়াদা আনাগোনা করছিল ঘনঘন—তা আগেও তো আসতো তারা। ইদানীং নাকি অডিটের সাহেব মস্ত একটা ভুল ধরেছে—লাখের কাছাকাছি হিসেবে গরমিল। হাঙ্গামাটা আঁচ করেই ললিত স্ত্রীপুত্রকে মানিকপুরে পাঠিয়ে দেয়—। কাল রাত্রেই বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে ওয়ারেণ্ট নিয়ে খোদ দারোগা সাহেব হাজির।... একা একা অনেক কেঁদেছে মল্লিকা। আরও অনেক দিনের অবরুদ্ধ অশ্রুধারা বন্যার বেগে নেমে আসে এখন। সেই যে ছেলেটির অক্ষম কাব্যের একমাত্র শ্রোতা এবং সমঝদার মেয়েটি ছিল সেই মেয়ে এই আজকের মল্লিকা নয়, তবু তারই মতো যেন হয়ে আসছে ওর মন!

এই দুর্যোগমথিত মনের দুয়ারে হানা দিল অমল চৌধুরী। পরিহাস-স্মিত ওর উপস্থিতির সামনে মল্লিকা আজ অত্যন্ত কুণ্ঠিত। দু-চার কথার পর অমল বুঝতে পারে আলাপে সুরের আমেজ জমছে না।

সে এসেছিল অনেকখানি উৎসাহ নিয়ে। কিন্তু মল্লিকার ম্লান, কষ্টকৃত হাসির মধ্যে বেদনার স্পর্শ পেয়ে দমে গেল।

একসময়ে বললে—আচ্ছা, আজ তাহলে আসি।

মল্লিকার হঠাৎ সম্বিত ফেরে এই কথায়। ভিখারীর মুখের ওপর যেন গৃহস্থ দরজা বন্ধ করে দিতে উদ্যত। প্রায় আর্তনাদের সুরেই বলল মল্লিকা—না,.না, যাবেন না, আপনি যাবেন না!

চমকে উঠ্‌ল অমল,—কি হয়েছে তোমার মল্লিকা! বলো—

—কই কিছু হয় নি ত!

বলে মল্লিকা জোর করে হাসি টেনে আনল।

—আমাকে তুমি লুকিয়ে পার পেতে পারো, কিন্তু নিজের কাছে?

বিষণ্ণ হাসির রেশটুকু মল্লিকার চোখের পাতায় তখনও লেগে আছে। ও বল্‌ল—না লুকোবার আর কি আছে? তবে সব সময় ত মনের অবস্থা এক-রকম থাকে না—

—তাই বলে আমি বেচারা এই অবস্থা-বিপাকে পড়ব—এই বা কিরকম! সেই কতদূর থেকে এলাম—আর অমনি তোমার কি হ'ল,—আমারি কেমন লাগে ভাব তো!

মল্লিকার আবার যেন কান্না পায়। বেচারী অমল—অথচ ওকে ত মল্লিকা এতটুকু ক্ষুণ্ণ করতে চায় না, বরং কিসে অমলকে খুশী করা যায় সেই চেষ্টাই করে! নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে মল্লিকা আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। ইচ্ছে করছে অমলের হাতদুটো জড়িয়ে ধরে মার্জনা চেয়ে নেয়। সেই চিন্তায় ওর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল।

অমল নিজের মনের মধ্যে ডুবে গিয়েছে, তার দু-চোখ যেন কোন অতল রহস্য-রাজ্যের সন্ধানী ডুবুরী! এ অমলকে ত মল্লিকা এর আগে কখনও দেখতে পায় নি।—হয়ত অমল নিজেও আপনাকে আবিষ্কার করছে আজ।

—আমার কাছে লুকিয়ো না মল্লিকা, এই একটি কথা দেবে বলো! আর কিছু চাই নে, শুধু লুকোচুরির অন্ধকারে আমরা কেউ কাউকে ঢেকে রাখব না এই শর্ত। ন্যায়-অন্যায়, সব-কিছুই দিনের আলোর মতো আমাদের দুজনের চোখের সামনে থাকবে। অতীতকে পুরোপুরি ভোলা যায় না, যতটুকু মুছে যায় গেল, বাকীটা যেমন আছে থাকতে দাও—দেখবে অনেক শান্তি, অনেক তৃপ্তি!

মল্লিকা শুনছিল অমলের দিকে তাকিয়ে।

তাকে থামতে দেখে বল্‌ল—কিন্তু এসব কি বলছেন? কেন?

—কেন? শুনতে চাও তো, তবেঁ শোনো—

—আর এক পেয়ালা চা দেবো ?

—থাক, তার চেয়ে জল দাও—

—শুধু জল ?

—আর তার সঙ্গে একটু হাসিও দিতে পারো। চুলোয় যাক সব ভারি-ভারি কথা—আমি ওসব নিয়ে কিছুতেই মাথা ঘামাতে রাজী নই, তবু কে যেন ঘাড় ধরে আমাকে ওই দিকে টেনে নিয়ে যায় !

মল্লিকা বুঝতে পারে না, তবু প্রশ্ন করে—কোন্ দিকে ?

—উজানের দিকে। কিন্তু আমি স্রোতের টানে সময়ের ডিঙ্গি বেয়ে কত দূরে চলে এসেছি, এখন কেন উজান ভাটিতে যাবো ? না, কিছুতেই যাবো না।

অমল গম্ভীরভাবে নিজের সঙ্গে ঝগড়া করছে যেন !

মল্লিকা বুঝতে পারে না—অমলের স্বভাবের অনেকখানিই ও বুঝতে পারে না। তবু ভাল লাগে। এ ভালো লাগাটা যুক্তির দাঁড়িপাল্লার পরোয়া রাখে না। যেমন ওর কাছে অমলের সেতারের আবেদন আছে তেমনি আর কি—কি স্থর বাজাচ্ছে, কোন্ পর্দায় মধ্যমার দীর্ঘ আকর্ষণে সূক্ষ্ম মীড় তুলছে অমল, এসব কিছুই বোঝে না মল্লিকা, তবু তার ভাল লাগাতে কোনো অস্থবিধে ঘটে না। এই ভালো লাগা থেকেই মল্লিকা অতি সহজে ভালবাসাতে পৌঁছেছে।

মল্লিকা খুশী মনে জল নিয়ে ফিরে এলো—অমলের সেই কথাটি কিছুতেই ভুলতে পারছে না 'একটু হাসি দিয়ো'—কি স্থন্দর কথা! কিন্তু এত লজ্জা করছে!—এমনিতেই হয়তো মল্লিকা হাসি মুখে জলের গ্লাসটা অমলের হাতে তুলে দিত—অথচ এখন চেতনা-সজাগ মনের সামনে কথাটা ঘুরছে ফিরছে—'একটু হাসি দিয়ো!' তাই জলের গ্লাসটা অমলের হাতে দিতে গিয়ে মল্লিকা হাসির সঙ্গে অনেকখানি লজ্জা মিশিয়ে ফেল্ল।

অমল এক ঢোক জল খেয়ে বল্ল—ভারি মিষ্টি লাগ্ছে। তুমি ত লক্ষ্য করো নি, গ্লাসের জলে তোমার মুখ দেখা যাচ্ছিল।

—আঃ, আপনি বড় দুষ্টু!

—আপনি আর নেই—আপন। তুমি-তুমি-তুমি। মল্লিকা তোমার ঘাড়ে

এই জগদ্দল মনের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। নিতেই হবে তোমাকে—কোনো আপত্তি শুনবো না।

ছল-ছলে উজ্জল চোখের দৃষ্টি নত করল মল্লিকা। ওর কণ্ঠ নির্বাক। এই নিবিড় নীরবতা দিয়ে মনের গভীর কথাই শোনাতে চায়! সেই মুখের পানে তাকিয়ে অমল আর চুপ করে থাকতে পারে না। কী এক দুনিবার টানে সে এগিয়ে এসে ধরল মল্লিকার ডান হাতখানা।

অপ্রত্যাশিত কিন্তু বুঝি একান্ত বাঞ্ছিত এই স্পর্শে মল্লিকা চকিতে অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করল—ও!

কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল ওর আনত চোখ থেকে, অমলের আস্তিন গুটোনা হাতের ওপর। অমল মৃদু কণ্ঠে বল্‌ল—অভিষেক বারি!

মুখ তুলতে গিয়েও মল্লিকা পারল না, শুধু ডাগর দুটি জলভারস্নিগ্ধ চোখ মেলে অমলকে দেখল। অমলের হাতের মুঠোয় ওর হাতখানি ঘেমে উঠেছে।

অমল ডাকল—মল্লিকা!

এবার মল্লিকার দৃষ্টি এসে দাঁড়ালো অমলের মুখের ওপর, ঠোঁটের কোণে সলজ্জ হাসি।

অমল বল্‌ল—এবার ছাড়ো, যাই!

জবাব নেই মল্লিকার ঠোঁটে। চোখে শুধু বেদনার ছায়া পড়ল।

অমল হাসলো—না, না, ছাড়া পেতে চাই না মল্লিকা। কিন্তু আজ ত যেতেই হবে। আরও অনেকদিনই এসে এসে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু কেন?

মল্লিকা বলতে পারল না, 'না তুমি যেয়ো না।'

অমল বল্‌ল—কি, চুপ করে রইলে যে!

—কি বলব?

—কিছুই বলবার নেই তোমার?

—জানি না।

—না, জানো। বলতে চাইছ না। আমাকেই সব সময়, সব কথা বুঝে নিতে হবে, এই কি চাও?

মল্লিকা এবার আরও একটু বেশী হাসি ফোটালো ওর চোখের তারায়, ঠোঁটের কোণে-কোণে।

অমল বল্‌ল—তুমি ভারি ছেলে মানুষ।

হাতখানা নিয়ে খেলা করতে করতে এক সময়ে অমল নিজের গালের ওপর চেপে ধরল। তারপর আস্তে আস্তে হাত নামিয়ে ছেড়ে দিল। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্‌ল—আমি এ কী করছি মল্লিকা! এমন করলে ত কোথাও আর বাঁধ থাকবে না। তুমি বাধা দেবে না?

মল্লিকা বল্‌ল—বাড়ী যাবে বল্‌ছিলে না।

—যাবো। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ার দরকার বলেই ত বসে আছি।

হেসে ফেল্‌ল মল্লিকা—তা ত দেখতেই পাচ্ছি। আবার, আমাকে ছেলে-মানুষ বলা হচ্ছিল!

—অমন করে তাকিয়ে থাকলে কি চলে যাওয়া যায়?

—চোখ বুজবো?

—না, না, তাহলে যে নিজেকেই দেখতে পাবো না।

—পাগলামী করো না, বাড়ী যাও, গিয়ে সেতার বাজাও।

—ভালো লাগে না আর। নতুন সেতারটাকে যেন আপন করতে পারছি না।

—আচ্ছা, মাষ্টার মশাই-এর কোন খবর নেই?

—না।

—কি রকম মানুষ? পরের হাতের সেতার নিয়ে সরে পড়লেন—বলা নেই কওয়া নেই! এ ভারি অন্যায়।

মাষ্টার মশাইকে এভাবে দোষী করাতে অমলের সায় নেই। সে বল্‌ল—ওঁর কথা ছেড়ে দাও। পরকে সহজে আপন করেন, তেমনি পরকীয়কেও।

—ছি-ছি। এ ভালো নয়।

—ভালো মন্দ বাদ দিয়েও অন্য কথা আছে—সত্যি-মিথ্যে। মাষ্টার মশাই আমার সেতারটিকে আপন করে নিয়েছেন এটাই সত্যি।

—আর তুমি তাই নতুনকে নিয়ে সাধনা করছ !

—আমার সাধনা এখন যন্ত্রের সুরের মধ্যে নেই, জীবনের রাজ্যে এসে পড়েছে।

কুণ্ঠিত মল্লিকা বল্‌ল—আমার জন্যে তুমি অমন জিনিসটা ছেড়ে দিয়ো না।

—ছোটোর মায়া না কাটালে বড়কে পাওয়া যায় না যে।

—তাই বলে শিল্পকে ছোট বলবে ?

—না তা নয়, সুরলোক বড়। কিন্তু জীবন শিল্প বৃহত্তর ! মাষ্টার মশাই সেতারটা যদি কেড়ে নিয়ে চলে না যেতেন তাহলে আজ হয়তো তোমাকে এত কাছে পাওয়ার তাগিদই টের পেতাম না।

—যাও তুমি ভারি দুষ্টু। এমন বড় বড় গালভরা কথা বলো যে শুনে মনে হয় বুঝি বা সত্যি।

—ব্যস, তাহলেই হ'ল। যা সত্যি মনে হয় তা যদি সত্যি নাই হয় ক্ষতি কি ? এই মনে হওয়াটুকু ত মিথ্যে নয়।

কলিং বেলের শব্দে ওরা দু-জনেই চম্‌কে উঠ্‌ল।

মল্লিকা বেরিয়ে গেল, যাবার আগে দরজার ওপর দাঁড়িয়ে একবার অমলের দিকে তাকালো।

দেবিকা ঘরে ঢুকেই মল্লিকাকে জড়িয়ে ধরে কলকণ্ঠে বল্‌ল—আজ একেবারে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি জানিস্‌ ছোট্‌দি—দেবিকা মুখার্জি বল্‌তে কলেজের সব পাগল !

মল্লিকা হাসল না, গম্ভীরভাবে বল্‌ল—দেখিস বাপু, সে আগুনের আঁচ-টাঁচ তোর সঙ্গে আনিস নি ত ?

—তুই আজকাল এমন কথা বলিস ! আমাদের কলেজে ভর্তি হলে তুইই মাৎ করে দিতিস ছোট্‌দি !

—থাক—থাক ! রাত ক'টা বেজেছে সে খেয়াল আছে ?

ঠোঁটের ওপর তর্জনী তুলে দেবিকা বল্‌ল—চুপ ! বাইরে লোক আছে।

—কে ?

—ও, আমাদের কলেজের এক ইয়ং প্রফেসর। কিছুতেই একা

ছাড়লেন না, বল্লেন, আবার দাদার সঙ্গে আলাপ করতে চান। যাক, দাদা নেই ত?

—না। তা ওঁকে পথে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস কেন? ভেতরে ডাক!

—তুই ক্ষেপেছিস। এখন বসলে আর নড়তে চাইবে না। দাঁড়া বিদেয় করে দিই।

দেবিকা বেরিয়ে যাচ্ছিল। মল্লিকা অপ্রসন্নভাবে ভেতরের ঘরে চলে এল।

মিনিট খানেকের মধ্যে দরজা বন্ধ করে দেবিকাও এসে পড়ল। অমলকে দেখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার মল্লিকার দিকে তাকিয়ে দেবিকা বল্‌ল—সরি, ছোট্‌দি! অমলদা আছেন তা ত বলিস নি তুই।

মল্লিকা ধমক দিল—তুই আজকাল ভারী ফাজিল হয়েছিস।

—ওমা, এই কথাতেই তুই লজ্জা পেলি! তাহলে প্রবীর আমাকে যেসব কথা বলে তা শুনলে ত মরেই যাবি। He is irresistably sweet! আজ গ্রীনরুমে ঢুকে পড়ে এমনভাবে সবার সামনে জড়িয়ে ধরল, যে আমিও লজ্জা পেয়েছিলাম।

অমল বল্‌ল—সত্যি!

—শুধু কি প্রবীর নাকি? There are at least a score of them.

বলে দেবিকা খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল।

মল্লিকা বোনের এই প্রগল্‌ভতায় ভ্রূকুঞ্চিত করে বল্‌ল—উর্বশীপনা রাখ দেখি।

—আহা, আমি ত আর তোমারটিতে ভাগ বসাতে যাইনি, মিছে রাগ করো কেন! তা ছাড়া আমার বয়েই গেছে ওদের পাত্তা দিতে! নিজেদের মধ্যেই কামড়া-কামড়ি ক'রে জ্বলেপুড়ে মরবে ওরা। আমি শুধু advantage নিয়ে পার্টির জোর বাড়াবো। বাইরে থেকে ওরা যাই ভাবুক, আমি ঠিক কাজ গুছিয়ে ফেলব, দেখিস তুই। দাদা আর কতটুকু কাজ করতে পেরেছে—শুধু লাইফটাই রুইন করল। দাদার কংগ্রেস দিয়ে কিচ্ছু হবে না। আগামী যুগ হচ্ছে কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে। রিয়েলী…।

এবার অমল সোজা হয়ে বসল—আগামী যুগ কমিউনিজমের যুগ! তুমি ধরে ফেলেছ দেবিকা?

দেবিকা চুলের গুছি খুলতে খুলতে বল্‌ল—এর মধ্যে ধরা-ছাড়ার কিছু নেই অমলদা। অহিংসার দিন আর নেই। তা ছাড়া এতবড় একটা যুদ্ধে কিভাবে জিতলো রাশিয়া, সেটা ত উড়িয়ে দেবার বস্তু নয়। আর আদর্শবাদের দিক দিয়েও দেখতে পাচ্ছেন, সর্বহারার স্বার্থ আমাদের পার্টি যে ভাবে দেখতে সংকল্প নিয়েছে, আর কেউ সেভাবে গ্রহণ করে নি।

—আমাদের ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি কিন্তু অন্য পরিচয় দিয়েছে। ইংরেজের যুদ্ধটা আমাদের দিয়ে করানোর পিছনে তোমাদের এই পার্টি ছাড়া আর কোনো দল ছিল না দেবিকা।

—বাঃ এ তো জনযুদ্ধ!

—তা বটে! আমাদের দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরল—কেন? না, জনযুদ্ধ! আমাদের দেশের মানুষ কাপড়ের অভাবে নেংটি পরে রইল কেন? না জনযুদ্ধ! অথচ এই যে 'জন' তার মুক্তি নেই, কারণ জনযুদ্ধের বিজেতা হলো ইংরেজ। ছ্যাখো তোমাদের জনযুদ্ধ নামক আজব কথাটার মতো নিষ্ঠুর পরিহাস বিংশ শতাব্দীতে আর দুটি নেই। সেদিন যদি কংগ্রেসের মতো, কমিউনিস্ট পার্টি ইংরেজের জুলুমের প্রতিবাদ করতো তাহলে ভারতবর্ষের ভাগ্য অন্য রকম হয়ে দাঁড়াতো। গোটা দেশটাকে ত জেলখানায় ভর্তি করে রাখতে পারতো না ইংরেজ। যেভাবে আগষ্ট আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেভাবে শেষই হতো না। পৃথিবীর ইতিহাসই অন্যরকম তৈরী হয়ে যেত! ইংরেজ যদি জবাবের মতো জবাব পেত তাহলে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা না দিয়ে উপায় ছিল না তার।

—গোড়াতেই ভুল করেছেন। এ ত কেবল ভারতবর্ষের একার ব্যাপার নয়। সারা দুনিয়ার প্রগতির প্রশ্ন। সে দিক দিয়ে হিসেব করলে ত দুনিয়াতে মোট দুটো শক্তি—এক হচ্ছে এ্যাক্সিস আর এক হলো এ্যালায়েড পাওয়ার। আমরা এই এ্যালায়েড পাওয়ারের সঙ্গে হাত মিলোতে বাধ্য। কারণ আমরা ডিক্টেটরীর মূল নষ্ট করতে চাই।

—আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখো, তারপর অপরকে সাহায্য করার

চেষ্টা করো। আমি ত এই বুঝি। আর ডিক্টেটরের ওপর এত রাগই যদি ত তোমার স্টালিন কম কিসে?

মল্লিকা এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। এবার বল্‌ল—তোমাদের এই যুদ্ধ বন্ধ করো দেখি?

দেবিকা রীতিমত চটে গিয়েছে অমলের কথায়, ও বল্‌ল—স্টালিনকে যে ডিক্টেটর বলে সে নিজে টাইরান্ট। I hate Lim.

অমল হো-হো করে হেসে উঠ্‌ল।

দেবিকা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘৃণা ভরে মুখ ফিরিয়ে নিল—আপনি এখনো বসে আছেন। লজ্জা করে না?

অমল হাসির জের টেনে বল্‌ল—লজ্জা? সে ত নারীর ভূষণ।

মল্লিকাও সে হাসিতে যোগ দিল।

দেবিকা এবার ফেটে পড়ল—বেরিয়ে যান—বেরিয়ে যান বল্‌ছি, আমার সামনে থেকে!

অমল উঠে দাঁড়ালো।

মল্লিকা তার হাত চেপে ধরল—না তুমি যেতে পাবে না।

বোনের দিকে তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে মল্লিকা গর্জন করে উঠল—কেন, কেন যাবে?

অমলের ঠোঁটের হাসি তখনো শুকোয় নি, সে বল্‌ল—মল্লিকা, তুমি ওর সঙ্গে ছেলেমানুষী ক'রো না।

—না, না। তুমি জানো না—ও আজকাল সব সময় সবার ওপর চোখ রাঙায়। আজ দাদা আসুক আমিও ছাড়বো না। এ কী অসভ্যতা!

অমল বল্‌ল—আমি এখন আসি। সারাদিন ওর ওপর দিয়ে অনেক ঝড় গিয়েছে। ওর বিশ্রাম দরকার।

দেবিকা তার অনেক আগেই ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

মল্লিকা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে অমলের হাতখানা আরও জোরে চেপে ধরে বল্‌ল—তুমি যাবে না।

—না, না, এত আমার যাওয়া নয় মল্লিকা! আমার মন এখানেই

রইল। আর ক'টা দিনই বা। তারপর ত যাওয়া-আসার কোন প্রশ্নই থাকবে না।

মল্লিকা যেন ভেঙ্গে পড়ল—আর পারছি না। উঃ, মা-মরা ছোট বোন ব'লে আমি ওকে কোন দিন চড়া কথা বলি না। ওর সব ন্যায়-অন্যায়ের বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে নিই। আর আজ আমার মুখের সামনে এত বড় কথাটা বল্‌ল!

অমল ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌ল—ওসব রাজনীতির তর্ক, ওতে একটু মেজাজ খারাপ হয়েই থাকে। আসলে কিছুই হয় নি।

মল্লিকা ঝর-ঝর করে কাঁদতে লাগলো—কিছু হয় নি। কিছুতেই কিছু হয় না! আমি বুঝি কিছুই বুঝিনে? ও তো তোমাকে বলে নি, আমাকেই তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে। তুমি জানো না, আমার মুখে হাসি দেখলে ওদের গা জ্বালা করে।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো মল্লিকা—ওদের আর দোষ দেবো কি। আমারই কপাল!

কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সীতানাথ হাঁক দিয়েছেন—দেবী! দেবী!

মল্লিকা নিজেকে সামলে নিয়ে সীতানাথকে দরজা খুলে দিল।

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সীতানাথ প্রশ্ন করেন—কি রে, তোর কি হয়েছে রে মল্লী?

মল্লিকা ব্যস্ত ভাবে জবাব দিল—কই কিছু না ত! ইয়ে এসেছেন!

—ইয়ে মানে কে রে?

মল্লিকা জবাব দিল না।

সীতানাথ হাসলেন—ও অমিয় না, অমল—বাবাজী এসেছে বুঝি, তাই বল! চা টা দিয়েছিস ত? না শুকনো মুখে বসিয়ে রেখেছিস!

চুয়াল্ল

ছোটবাবু কয়েকদিন দেবজ্যোতিকে ঘুরিয়ে, শেষে একদিন বড় মুখ করে বল্‌লেন—তা এখনকার বাজারে হেল্‌পারীর জন্যেই পাঁচশো উমেদার খোশামুদী করছে, কিন্তু আমি বলি কি মুখুয্যে ছোকরাকে যখন কথা দিয়েছি তখন এ চান্স তাকে আমি দেবোই—কথা দেওয়াও যা জাত দেওয়াও তাই। না কি বলো ভাই! তার ওপর স্বজাতি, পাল্‌টী ঘর! এ্যাঁ—

নিকেলের ঢিলে চশমাটার ফাঁক দিয়ে মিঠে চাহনী ছুঁড়ে, দোক্তাপানের টিপিটা গালের কোলে গুঁজে ছোটবাবু দেবজ্যোতির মুখখানা খতিয়ে দেখলেন।

দেবজ্যোতি খুশী হয়েছে। সে বল্‌ল—তা হলে এখন আমাকে কি করতে হবে?

—তোমাকে এখন 'লেবার টিকিট' নিতে হবে। সোমবার থেকে বেরুচ্চো। শিফ্‌ট্ ডিউটি—প্রথমে ত্নটো থেকে রাত দশটা। তারপর যেমন-যেমন বদল হবে। আরে কাজ ত কিছু নয়, তবে ওই তোমার ওপরওলার ফাইফরমাস খাটতে হবে। তা কাজ শিখতে গেলে, একটু চাঁট সইতে হবে বইকি। বয়েসটা তোমার বেশি হয়ে গ্যালো এই যা একটু অসুবিধে! তা এলেম থাকলে বছর ঘুরতে-না-ঘুরতে তুমি আর্মেচার ওয়াইণ্ডার হতে পারবে। চড়্‌-চড়্‌ করে তারপর উন্নতি হে।

দেবজ্যোতি মুখ বুজে শুনে যাচ্ছিল।

ছোটবাবু বল্‌লেন—আগে ত ছুঁচ হয়ে ঢোকো। তারপর আমি ত রইলামই। কিছু ভেবো না। এমনি করেই এখানে সবাই কেঁচো হয়ে সেঁদোয় আর তারপর ইঞ্জিনিয়ার, শপ্‌ ম্যানেজার হয়ে আমাদেরই মাথা হাতে কাটে ভাই! সবই আপনা-আপনির মধ্যে, একটু তক্কে-তক্কে থাকলে কোন শালা তোমার আখের রোখে!

দেবজ্যোতি হাসল—দেখবেন দাদা, একথা কেউ যেন টের না পায়। আর ইয়ে, আমি কিন্তু আপনাকে ঘুষটুষ দেবো না।

—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ! তুমি হাসালে ভায়া, তোমাকে ছোটো ভাই মনে করি, তোমার কাছে আবার—হুঁঃ। তবে কি জানো, তোমার বিপদে আপদে যেমন আমি আছি, তেমনি বড় ভায়ের দায়-আদায় উদ্ধার ক'রো, তাহলেই হ'ল—টাকাটাই ত সব নয় রে ভাই, মানুষের মনটাই বড়ো—এ্যাঁ!

—তা যা বলেছেন দাদা!

সরল মনেই দেবজ্যোতি সমর্থন কবল। তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে, ছোটবাবু মানুষটি মোটামুটি খারাপ নয়।

দেবজ্যোতি চলে যেতেই, এস্‌টাব্লিশমেণ্টের কেরাণীরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ী করতে লাগলো। একজন ত কৌতূহল চাপতে না পেরে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার দাদা, একেবারে বেড়াল তপস্বীর মতো শিকারটা হাতছাড়া করলেন যে বড়!

ছোটবাবু ডিবে থেকে একটা পান বার ক'রে হাসলেন—আরে ভাই, সব শিকার কী বন্দুক মেরে সাবাড় করতে হয়! জাল ফেলেও ধরা দরকার হয় হে, বোঝো না, পাল্‌টী ঘর। খোঁজবাজ না নিয়েই কি ঘুমোচ্ছি ভেবেছো! বাপের এক ছেলে, গোটাকয়েক বাড়িও আছে। সীতানাথ মুখুয্যের পয়সার অভাব কি—থাকে ওই অমন নাপাঙ্গা সেজে, শালা একের নম্বর চশমখোর। তবে হ্যাঁ ছেলেটা হচ্ছে খাঁটী সোনা। ছোট বোনটাকে গছিয়ে দিতে পারলে, খাশা মানাবে। তা ওকে ঠিক খেলিয়ে তুলবো, নইলে আমার নামে কুকুর পুষো!

যে ভদ্রলোক কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন তিনি নিজের কাজে মন দিলেন, বিরক্ত হয়েই। কারণ ঘুষের টাকাটার বখ্‌রা কিছু ট্যাঁকে আসতো—সেটা বিলকুল মাঠে মারা গেল।

বাইরে কাউণ্টারে নতুন লোক আসতেই ছোটবাবু গম্ভীর হয়ে বসলেন—কি চাই? গেট পাস? এ্যাঁ—গেট পাস কি পয়দা করব মশাই। না, না, কোনো চান্স নেই। আমি ত আর গেট পাসের চাষ করি নি। কোম্পানী এখন নতুন লোক নিচ্ছে না। উল্টে ছাঁটাই-এর কথা ভাবছে। তা ছাঁটাই কেন হবে না বলুন, লড়াই থেমে গিয়েছে—এখন মাল তৈরী ক'রে কি ভাতে-ভাত দিয়ে খাবে? কোন্ কম্মে লাগ্‌বে এতো দামের ইষ্টিল,—এ্যাঁ!

—এ্যাঁ, কি বল্‌লেন ? কোম্পানী কোটি কোটি টাকা লাভ করছে ? হ্যাঁ, তা করবেই ত। কোম্পানী ত আর পঞ্চা তেলী নয়, কারবার করছে লাভের জন্যে—। তা তেলীদেরও বাজার গরম, মশাই, তেল ত আর শাদা বাজারে চোখে দেখার উপায় নেই।

কাউণ্টারের ওপিঠে যে লোকটি কথা বল্‌ছিল সে বেশ চড়া গলাতেই বল্‌ল—তা বলে ত উপোস করে মরতে পারি নে মশাই। আমার কাজ চাই—টাকা চাই।

ছোটবাবু সে কথার কোনো জবাব দিলেন না।

কিন্তু অপর পক্ষ নীরবে উপেক্ষা সইবার মতো সিধে বান্দা নয়। সে বল্‌ল—দ্যাখো ছোট্‌দা ভালোয়-ভালোয় ব্যবস্থা একটা করো নইলে কাল কিন্তু হাঁড়িয়া খেয়ে মেজাজ গরম ক'রে এসে হল্লা জুড়ে দেবো—হ্যাঁ। চেনো না ত জগন্নাথ ঠাকুরকে !

ছোটবাবু আর একটু হ'লে দরওয়ানকে ডাকতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জগন্নাথ ওরফে জগ্‌নার নাম শুনে ঘাবড়ে গেলেন। রাধেশ্যামের সেবাইত—বছরে এক মাসের পালা তাদের চোদ্দ ঘর শরীকের ভাগে ! জগ্‌না ঠাকুর নানা কারণে মানিকপুর অঞ্চলে কুখ্যাতি অর্জন করেছে। তাকে পারতপক্ষে চটাতে চায় না কেউ—কখন পিছন থেকে ছুরি মেরে চলে যাবে তার ঠিক কি।

ছোটবাবু মোলায়েম স্বরে বল্‌লেন—মিথ্যে আমার ওপর রাগ করছেন গোঁসাই। আমরা ত ভাই কোম্পানীর গোলাম। তা একটা কথা বলি শুনুন, যদি কারখানায় ঢুকতে চান তবে আপনাদের বড় গোঁসাইকে গিয়ে ধরুন না, এক্ষুনি ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

জগ্‌না ঠাকুর গর্জে উঠ্‌ল—কি বল্‌লি শালা, ওই মাগীবাজ রেঁড়েলদের পায়ে তেল দেবো ! শালা ফের যদি ওরকম করবি ত জুতিয়ে তোর দাঁতের পাটি উড়িয়ে দেবো—খবরদার। ওই পেনো গোঁসাইকে আমি যদি না জ্যান্তো পুঁতে ফেলি ত আমার জন্মের ঠিক নেই—।

হঠাৎ জগ্‌না ঠাকুরকে ক্ষেপে যেতে দেখে ছোট বাবু প্রথমে ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিলেন, তাঁর পিছনে আরও দু-চারজন জড়ো হতেই তিনি হুঙ্কার

দিলেন—ধর তো শালাকে। এখানে গুণ্ডামী করতে এসেছে বদমাস কোথাকার!

ছোটবাবুর হুমকিতে ফল হলো উল্টো—জগন্নাথ লাফাতে লাগল, অশ্লীল গালিগালাজে জায়গাটা মশগুল ক'রে তুলল। এদিকে কে একজন ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ডে টেলিফোন করে দিয়েছে। তারপর তিনচার জনে বেরিয়ে পড়ে জগন্নাথকে ঘিরে ফেল্‌তেই জগন্নাথ পালাবার পথ খুঁজতে লাগলো—যাঃ মাইরি এসব কি হচ্ছে, ছেড়ে দাও বল্‌ছি। ভালো হবে না কিন্তু। আমাকে খুঁচিয়ো না দাদা।

মিনিট চারেকের মধ্যে বিরাট একখানা দু-টনার ওয়েপন কেরিয়ার এসে এস্‌টাব্লিশমেণ্ট সেক্‌শনের সাম্‌নে ঘচ্‌ ক'রে দাঁড়ালো। ঝপ্‌-ঝপ্‌ ক'রে জন পঁচিশেক সশস্ত্র গুর্খা ওয়াচম্যান নেমে পড়ে জগ্‌না ঠাকুরকে তুলে ফেললো গাড়িতে। জগ্‌নার ত দু-চোখ জলে ভরে গেছে, সে বল্‌ল—ছোটবাবু, তুমি শেষে এই কল্লে! রাধেশ্যামের সেবাইত হয়ে মাথা হেঁট করে কারখানায় খেটে খাবো ভেবে এলাম আর তুমি আমাকে হাজতে পুরলে! আমি গুণ্ডা!

গাড়ীখানা চলে যেতেই যে যার জায়গা ফিরে এলো।

ছোটবাবু কলম হাতে করে স্বগতভাবে বল্‌লেন—নাঃ, ছোঁড়ার শিক্ষে হোক্‌ একটু। বড্ড বেড়ে গিয়েছিল।

আর একজন বললো—ঘোড়ার ডিম হবে। ও ত আব্দুল শেখের চর, পুলিশের ঘরে পৌঁছতে যা দেরী, তারপর ঠিক ছাড়া পেয়ে যাবে। মাইরী এই পুষ্যিপুত্তুর গুণ্ডাদের জ্বালায় প্রাণ নিয়ে বাঁচা দায়।

ছোটবাবু বল্‌লেন—কি করবে বলো ভাই, তবু তো এস্‌টাব্‌লিশ্‌মেন্টের খানিকটা মানইজ্জৎ আছে—সবাই খাতির করে। কিন্তু আর সব ডিপার্টের হাল ভাবো দেখি।

সেক্‌শন ইন্‌চার্জ মিস্টার কোতোয়াল গম্ভীরভাবে ঘরে ঢুকলেন। তারপর ছেটবাবুকে ডেকে বল্‌লেন—বি প্রিপেয়ার্ড ব্যানার্জি!

ছোটবাবু কাঁচুমাচু হয়ে ওপরওয়ালার দিকে তাকিয়ে রইলেন—কি ব্যাপার স্যার!

কোতোয়াল একখানি টাইপ করা কাগজ ছোটবাবুর হাতে দিলেন—অল ওভারটাইম স্টপ্‌ড্‌! ইয়েস। নোটিশ পাঠিয়ে দাও—সব ডিপার্টমেন্টে, এখুনি। আজ থেকে সব ওভারটাইম বন্ধ। নো ফ্রেশ্‌ লেবার টু বি টেক্‌ন্‌ ইন। এ্যাণ্ড—

ছোটবাবু বল্‌লেন—এ্যাণ্ড হোয়াট স্যর? এনি অর্ডার অফ রিট্রেঞ্চমেণ্ট?

—নট এক্‌জ্যাক্টলি সো। ষ্টিল আই এ্যাপ্রিহেণ্ড, ছাট উইল ফলো। ও তো আয়েগা জরুর!

ছোটবাবুর মুখ শুকিয়ে গেছে—ছাঁটাই শুরু হলে স্যার আমাদের মেরে গুম্‌ করে দেবে! আজকাল যা মেজাজ হয়েছে লেবারের—যার নামে স্যাক্‌ অর্ডার হবে, সে-ই মুকিয়ে থাকবে।

কোতোয়াল হাসলেন—ফুঃ, তোমার ভয় কি, কোম্পানীর দরকার নেই তা কোম্পানী এক মাসের বাড়তি মাইনে দিয়ে বরখাস্ত করবে—তাতে তোমার মাথার ওপর লাঠি পড়বে কেন?

—সে আপনি বুঝতে পারবেন না সাহেব। লেবারের মেণ্টালিটি আমাদের জানতে বাকী নেই। ওরা ত কোম্পানীর কর্তাদের চেনে না, আমাদের চেনে। ব্যস একবার দুশ্‌মন ঠাওরালো তো রক্ষে নেই আর।

—ওয়েল! তাহলে তোমাদের এখানে প্রোটেক্‌শনের ব্যবস্থা করা হবে। কতজন সেন্ট্রি চাই বলো।

—কি রকম ছাঁটাই হবে স্যর!

—সে কি আমিই জানি। তবে আপাততঃ ওভারটাইম বন্ধ করা হবে, তাতেও যদি দেখা যায় যে প্রোডাক্‌শন বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে ছাঁটাই শুরু হবে। অবশ্য আমরা বলেছি, হুট্‌ করে রিট্রেঞ্চমেণ্ট অর্ডার যেন দেওয়া না হয়। এখন ডিরেক্টরদের মর্জি। ইউ নো হোয়াট উই আর!

ওভারটাইম বন্ধ হওয়াতে এস্‌টাব্‌লিশমেণ্ট সেক্‌শনেও সকলে অপ্রসন্ন। উপরি আয় ঘুচলো। গোটা কারখানার প্রত্যেকটি শ্রমিকই এই ধাক্কায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠ্‌ল। দীর্ঘদিন একাদিক্রমে ওভারটাইম করে করে তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেকের আয়ের অঙ্ক বেড়েছে। সেই অনুসারে ব্যয়ও বেড়ে

গেছে। এখন এক খোঁচায় আয়টুকু চুপ্‌সে গেলেও, খরচ কমানো সহজ নয়। যুদ্ধের সময় জিনিসপত্রের দাম বেড়েছিল—কিন্তু যুদ্ধের পর আরও বেড়েছে। প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে।

সেদিন আর কেউ মন লাগিয়ে কাজ করল না। যে যার অসুবিধে নিয়ে আলোচনায় মুখর হয়ে উঠল।

বিকেলের দিকে এস্‌টাব্লিশমেণ্ট সেক্‌শনে অর্ডার এলো, বাড়তি লোক বহাল হচ্ছে ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ডে, নতুন আরও আড়াইশো লোক নেওয়া হয়েছে—খাতায় তাদের নাম তোলো। তাদের মাইনে, ডিয়ারনেস ইত্যাদির হিসেবের জন্যে একাউণ্ট্‌সে ফরম পাঠিয়ে দাও। আর তাদের বসবাসের ব্যবস্থার জন্যে জেড্‌-এম অর্থাৎ জমিদারী ম্যানেজারের অফিসে লেখো।

ছোটবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—আবার হুজ্জুতি শুরু হবে যা দেখচি।

পঞ্চান্ন

বাদাম তলার মেসবাড়িতে সেদিন আলোচনাটা একতরফাই চল্‌ছিল। সবাই বিরক্ত। সুবল দস্তিদার সবচেয়ে বেশি হৈ-চৈ করছে—শালারা আমাদের হাতে মারতে পারবে না ব'লে ভাতে মারবার মতলবে আছে। এখন আর কি—যুদ্ধ জিতেছে, তাই মাথা কিনে নিয়েছে!

ক্ষুদিরামদা বিজ্ঞভাবে বিড়ি টানছেন আর হাসছেন।

এ, সি, দাস দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল—সবে ইনসিওরেন্সটা করলাম, এখন গ্যালো টাকা ক'টা যক হয়ে। দুটো প্রিমিয়ামের টাকা নাহক মাঠে মারা গ্যালো। ও কি আর চালাতে পারবো? তার চেয়ে সে টাকায় বৌটার কানের একটা গয়না গড়িয়ে দিলে বাঁধা-বন্দকে কাজে আসতো।

দত্তগুপ্ত খিঁচিয়ে উঠ্‌ল—আমি আর সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু তোমাদের এই অন্যায় আবদার বরদাস্ত করা আমাকে দিয়ে হবে না। তোমাদের ওই এক কথা। আরে বাবা কোম্পানী তঁ আর লোকসান দিয়ে তোমাদের পুষবে না, বলি লাভই যদি ঘুচে যায় ত তোমাদের কি পূজো করবার জন্যে ওভার-টাইমের কড়ি গুনবে?

দত্তগুপ্তর হিসেবটা অন্যরকম। যুদ্ধের সময়ে সে সত্যিই খানকতক শেয়ার কিনে রেখে দিয়েছে। তার বিশ্বাস সে গ্রেট বেঙ্গল স্টীল ম্যানুফ্যাক্‌চারার্সের একজন হকদার অংশীদার, কাজেই তাকে কোম্পানীর স্বার্থের দিকে নজর রাখতে হবে।

সুবল তেড়ে উঠ্‌ল—আপনার আর কী! দালালীর টাকায় এদিকের লোকসান পুষিয়ে নিচ্ছেন।

দত্তগুপ্ত বল্‌ল—মুখ সামলে কথা বলিস সুবল। কাকে কি বল্‌তে হয় তা যদি জানতিস তাহলে তোর ভাবনা ছিল না। বলি, গিয়েছিলি ত সেন সাহেবের পা চাট্‌তে—কেমন লাথিটা ঝেড়েছে! ওঃ, আজ উনি এসেছেন

লেবারের ওপর দরদ দেখাতে। আমি আর সব সইতে পারি কিন্তু এই দুমুখো ছুঁচোদের কথা একদম বরদাস্ত করতে পারি নে।

সুবল আরও ক্ষেপে উঠ্‌ল। তা উঠ্‌তেই পারে: সেন সাহেবের কোয়ার্টারে সে নিত্য সন্ধ্যায় হাজিরা দিয়েছে নাগাড়ে দু-টি বছর। তাকে দিয়ে সেন সাহেবের গিন্নী বাজার হাট করিয়েছেন—আরও আরও কত কি যে করিয়েছেন সেকথা একমাত্র সুবলই জানে। কিন্তু একদিন দেখা গেল সুবল আর সেনের বাংলোয় যায় না, মেসেই বসে থাকে। তারপর নানারকম কানাঘুষো শুরু হ'লো। কিন্তু সেটা বেশিদিন চলে নি—এ ধরণের ঘটনা ত মানিকপুরে নতুন নয়। তা ছাড়া সুবল এখন নিয়মিত তাসের আড্ডায় হাজিরা দেয়, মেসের সকলের মন জুগিয়ে চলে—বড়লোকদের উপর তীব্র বিদ্বেষ বিষ ছড়ায়। কাজেই সুবল এখন মেসের সকলেরই প্রিয়পাত্র। দত্তগুপ্তর কথায় সুবল বিগ্‌ড়ে গিয়েছে সে বল্‌লে—আপনার মতো ছ্যাঁচড়া লোকেরা যদ্দিন লেবারদের মধ্যে থাকবে ততদিন আমাদের আখের নেই। আপনারা মানুষের চামড়া গায়ে জড়িয়ে থাকলে হয় কি, চামড়ার তলায় আছে ভেড়ার মন, গরুর মন, গাধার মন!

সুবল হয়তো আরও কঠিন কথা বল্‌তো, কিন্তু ক্ষুদিরামদা ধম্‌কে উঠ্‌লেন—এই, এই সুবল! কি হচ্ছে? তুই দিন-দিন ক্ষ্যাপা কুকুর হয়ে উঠ্‌ছিস এ্যাঁ! বলি, এইভাবে মানুষকে বলে, হ্যাঁ রে!

দত্তগুপ্ত তেড়ে এসেছে—তোর মুখ ভেঙে দেবো শালা শয়তান!

ব্যাপার বেগতিক দেখে সবাই দত্তগুপ্তকে আগলে রাখলো।

সুবল কিন্তু এতেও দম্‌লো না—আমি কি আর বল্‌ছি দাদা। তামাম মানিকপুরের মজদুর ভাই-এর মনের কথা এটা। বলুন, আজ এই শুকো রোজের ভিক্ষের টাকায় কার ঘরে দু-বেলা হাঁড়ি চড়ছে—কে পেট ভরে খেতে পাচ্ছে! আঁপনি বলুন! আর উনি এলেন কোম্পানীর গুণগান শোনাতে—কোম্পানী কি না সতী। উপোস করিয়ে মারবে! ওদিকে নতুন নতুন মেশিন আসছে—বিলেত থেকে মোটা মাইনের সব ইঞ্জিনিয়ার টেক্‌নিসিয়ান আসছে, শয়ে শয়ে ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ডে নতুন লোক ভর্তি হচ্ছে আমাদের জব্দ করবার জন্যে—সে সবের জন্যে টাকা জোটে কোথা থেকে! মল্লিক সাহেবের গুণ্ডা

পোষার জন্যে মাসে মাসে দশ বারো হাজার টাকা খরচ হয়, সে টাকাও ত জোটে। আর যতো টাকার টানাটানি আমাদের ওভার টাইমের বেলা!

একথার জবাব কেউ দিল না, দেবার প্রয়োজনও ছিল না বোধ করি।

দত্তগুপ্ত কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠ্‌ল—বেশ করবে, কোম্পানীর যা খুশী তাই করবে। দেড় পয়সার মজুরের বুদ্ধি দিয়ে কোটি কোটি টাকার কারবার চলে না, তাহলে ত সব মিঞাই কোম্পানীর ডিরেক্টর হতে পারতো। আমার পাঁঠা আমি যেমন খুশী কাটবো—তুমি এসেছ চাকরী করতে, চাকরী করো। না পোষায় গেট আউট—চলে যাও। তোমায় কে পোঁছে হে।

দত্তগুপ্তের এ কথায় সকলেই মনে মনে ক্ষুণ্ণ হ'ল।

সুবল বল্‌ল—এর পর আর কোনো ভদ্রসন্তান তোমার সঙ্গে কথা বল্‌বে না। কুত্তা দালাল কোথাকার!

তারপর সে বেশ গরম মেজাজেই চটি পরে বেরিয়ে গেল। ক্ষুদিরাম ছাড়া সুবলের এই উগ্রমূর্ত্তির সামনে কেউ মুখ খুলতে সাহস করল না। ক্ষুদিরাম বল্‌লেন—কোথায় চল্‌লি রে!

—ইউনিয়ন আপিসে।

—হঠাৎ ইউনিয়ন আপিসে কেন—এ্যাঁ!

—আর চুপ করে বসে থাকলে চলবে না দাদা। একটা কিছু করা দরকার। ওখানে বসে বসে মজুমদারের দল দালালী করবে, আর আমরা সাফার করে শুকিয়ে মরব, তা হবে না। হয় ওরা কিছু করুক, নাহয় ছেড়ে দিক—আমরা দেখে নিই একবার।

হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল সুবল দস্তিদার।

দত্তগুপ্ত আপন মনেই হাসলো—যাঃ, মর গিয়ে, তোর ডানা গজিয়েছে এবার মানিকপুরের অন্ন উঠ্‌লো।

তারপর সে হিসেবের খাতা নিয়ে বসলো নিজের ঘরে। পঁয়তাল্লিশ টাকা, বারো আনা চার পাই দরে পাঁচ খানা=২২৮৵১৬পাই। আর ছে-চল্লিশ টাকা পাঁচ আনা ন পাই দরে তিন খানা,—১৩৯৲৩পাই, তাহলে মোট খরচ

হচ্ছে ৩৬৭৸১৯পাই। এই হ'ল গিয়ে খরচ। আটখানি শেয়ারের পিছনে এই টাকাটা দত্তগুপ্ত খরচ করেছে। আর বর্তমানে সেই শেয়ারের দাম পড়ে গিয়ে পঁয়ত্রিশ টাকা দাঁড়িয়েছে—আজ আরও নেমেছে, একেবারে আটাশ টাকা তেরো আনা দু-পাই! অর্থাৎ দত্তগুপ্ত তার নিজের অংশ বেচে দিলে পাবে ২৯০৷৷১৬পাই। কিন্তু না, দত্তগুপ্ত শেয়ার বেচবে না। এখন কোম্পানীর এই দুঃসময়ে সবাই যদি নিজের নিজের অংশ বিক্রী ক'রে দেয় স্বার্থপরের মতো, তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। অতএব দত্তগুপ্ত খতিয়ে দেখল, তার ভাগে মোট ক্ষতির পরিমাণ ১৭৭।৩পাই। ক্ষতির অঙ্কটা রোজই বেড়ে যাচ্ছে, তা যাক, কারবার করতে গেলে এরকম ওঠাপড়া হয়েই থাকে। আপন মনে দত্তগুপ্ত এক তৃপ্তির খুশীতে হেসে উঠল। পরক্ষণে করুণায় তার মন ভিজে ওঠে, সুবলের মতো দিনমজুরের জন্যে। ও বেচারীদের আর দোষ কী! ওরা নগদ বিদায়টুকুই বোঝে, কারবারের সুদিন-দুর্দিনের কথা ভাববে কি ক'রে—ওরা দরিদ্র। আর দত্তগুপ্তর কথা আলাদা, তার স্বার্থ অন্য রকম—মালিকদের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা।

দত্তগুপ্ত ঠিক ক'রে ফেল্‌ল, মল্লিক সাহেবের কাছে একখানা ব্যক্তিগত চিঠি লিখবে সে। কিন্তু তার আগে, স্ত্রীর চিঠির জবাবটা দেওয়া কর্ত্তব্য, সে বেচারী অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে লিখেছে দেশে যাবার জন্যে। কিন্তু যাওয়া হয়ে উঠ্‌বে না। কি ক'রে হবে? মাইনে ত কমে গেল! অতএব নমিতাকে খুব বুঝিয়ে, ভারি মিষ্টি একখানি চিঠি লিখতে হবে। চিঠি লিখতে গিয়ে দেখল, কাগজ নাস্তি। আজকাল কাগজেও দুর্ভিক্ষ লেগেছে। টার্ণার মুখুয্যের কেরোসিন কাঠের টেবিলখানাও আঁতিপাঁতি খুঁজলো অদ্ভুত দত্তগুপ্ত। নাঃ, গোটা মেস বাড়িতে কেউ লেখাপড়ার চর্চ্চা করে না। অগত্যা মূল্যবান শেয়ারের হিসেবখাতা থেকে অতি সন্তর্পণে একটি পাতা ছিঁড়ে নিল দত্তগুপ্ত। প্রথমে পাঠ লিখল কল্যাণীয়াসু—তারপর সেটা কেটে দিয়ে, নতুন কায়দায় লিখ্‌ল—'ডার্লিং' হ্যাঁ, এখন থেকে স্ত্রীকে 'ডার্লিং' বলবে!

ক্ষুদিরাম এসে ঢুকলেন—কি অদ্ভুতচন্দ্র একা একা বসে কর্চ্ছটা কি? এ্যাঁ, আবার হিসেব নাকি!

—আজ্ঞে!

ব'লে দত্তগুপ্ত খাতাপত্র গুছিয়ে সরিয়ে রাখল। তার হিসেবপত্র নিয়ে মেসবাড়ির সবাই ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, দত্তগুপ্ত সেটা সইতে পারে না। বল্‌ল—না:, এই একখানা চিঠি লিখছিলাম।

ক্ষুদিরাম পাশে বসে বল্‌লেন—ভায়া একটা কথা বলি শোন! দেখচ ত, হাওয়া বড় খারাপ।

—তা দেখচি।

—বল্‌ছিলাম কি, এখন সময় থাকতে শেয়ার ক'খানা বেচে ফ্যালো, তবু কিছু টাকা ঘরে আসবে। আর যা লোকসান যাবার তা তো গেছেই—যা পাও সেটাই লাভ। এরপর যদি হাঙ্গামা হুজ্জুত বেধে যায়, তাহলে কাগজ ক'খানা তোমার কোনো কাজে আসবে না। গরীব মানুষ আমরা, ওসব খোয়াব দেখা কি পোষায় ভায়া—বেচে দাও, বেচে দাও।

দত্তগুপ্ত গুম হয়ে বসে রইল।

ক্ষুদিরাম দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেন—জানি সৎপরামর্শ কেউ নেয় না। তবু আমার কর্ত্তব্য বলা, তাই বল্‌লাম। এরপর কিন্তু পস্তাতে হবে।

দত্তগুপ্ত সাফ জবাব দিল—এসব আপনি বুঝবেন না দাদা। বড় ভাই ব'লে মান্য করি আপনাকে, তবু বল্‌ছি যে, একদিন এই কাগজই দেখবেন আমার কপাল ফিরিয়ে দিয়েছে। কারবারের দুঃসময়ে কি হাল ছেড়ে দিলে চলে?

—কিন্তু তুমি বুঝছ না যে, ওদিকে তোমার বৌ পরণের কাপড়ের অভাবে চৌকাঠ পেরুতে পারে না। দুধের বাচ্ছাটা ত চিকিৎসার অভাবে মরল। এততেও আক্কেল হলো না—মাথার চুল ত সাদা হয়ে গিয়েছে, বলি অদ্ভুত ভায়া এমনি করে সবাইকে মেরো না।

দত্তগুপ্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছে—আপনার ওই এক কথা। আমি কি রাখার-মারার মালিক; ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। আর সব সইতে পারি কিন্তু কাজের সময় ঝামেলা আমি একদম বরদাস্ত করতে পারি নে দাদা।

ক্ষুদিরাম হতাশ ভাবে হাত উল্টে বেরিয়ে গেলেন—দত্তগুপ্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নমিতাকে মিষ্টি চিঠি লিখতে শুরু করল।

হাসপাতালের ডাক্তারেরা জবাব দিলেন। ঠিক জবাব নয়—তাঁরা বল্‌লেন, গোবিন্দ মুখুয্যেকে কলকাতায় পাঠাতে হবে। একটা চোখ এমন জখম হয়েছে যে অস্ত্রোপচার করা দরকার, আর একটা চোখেও অবশ্য ছানী পড়েছে—সেটা এতদিন কেউই খেয়াল করে নি। ছানিটা না কাটালে সে চোখেও গোবিন্দ দেখতে পাবেন না। কারখানা থেকে ছুটি মঞ্জুর হ'লো। যেহেতু কারখানায় কর্মরত অবস্থায় পাঞ্চিং মেশিন 'Blocked' হয়ে গিয়ে লোহার টুকরো ছিট্‌কে গোবিন্দর চোখে এসে লেগেছিল সেহেতু কোম্পানী চিকিৎসাপত্রের খরচও দিতে প্রস্তুত আছে। সেদিক দিয়ে অসুবিধে তেমন হবে না। গোবিন্দর ডিপার্টমেণ্টের সাহেব হাসপাতালে টেলিফোন ক'রে খবর নিচ্ছেন রোজ। কিন্তু কলকাতায় ত গোবিন্দ এ অবস্থায় একলা যেতে পারেন না—কে তাঁর সঙ্গে যাবে? ওদিকে ললিতকে ত হাজত থেকে জামিন দেয় নি এখনো।

এই অবস্থায় তিনদিন কেটে গেল। গোবিন্দবাবুর সঙ্গে কলকাতায় যাওয়ার মতো লোক জুট্‌ছে না। কে যাবে ডিউটি কামাই ক'রে! তাছাড়া সঙ্গে গেলেই ত হবে না। মেডিক্যাল কলেজে চিঠি নিয়ে দেখা ক'রে রোগীর 'বেড'-এর ব্যবস্থা করতে হবে। পরের হাঙ্গামা, কেউ পোয়াতে রাজী নয়।

সেদিন মুকুল এলো সীতানাথের কোয়ার্টারে, রাত তখন সাড়ে দশটা। ওর সঙ্গে বড় ছেলে নণ্টু।

ওকে এবাড়িতে এত রাত্রে হঠাৎ হাজির হ'তে দেখে প্রথমে সবাই অবাক হয়ে গেল। কেউই বুঝে উঠ্‌তে পারে নি, কি ভাবে, কে কি বল্‌বে—কি করবে!

মুকুলও কম অপ্রতিভ হয় নি। কিন্তু মল্লিকাই থম্‌থমে আবহাওয়া হাল্কা ক'রে দিয়ে বল্‌ল—বসো দিদি!

মুকুল হাসলো। মল্লিকা ওর মুখের দিকে একভাবে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে

রয়েছে। দেবিকা ন'টুকে নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে বক্‌-বক্‌ করতে শুরু করেছে।

মুকুল চৌকীর ওপর বসে পড়ল—দাদা বাড়ী নেই ?

মল্লিকা বল্‌ল—বাথরুমে!

—বাবা ?

—বেরিয়েছেন।

—তারপর, তুই কেমন আছিস ?

—বেশ আছি। খাচ্ছি-দাচ্ছি ঘুমোচ্ছি। তুমি ?

দীর্ঘনিশ্বাস চাপবার চেষ্টা করেও মুকুল সামলাতে পারলো না। বল্‌ল—খুব সুখে আছি। তাই ত এলাম দাদার কাছে, উনি যদি অনুগ্রহ করেন তাহলে বুড়ো শ্বশুরমশাইএর চিকিৎসা হবে—নইলে মানিকপুরের হাসপাতালের এঁরা ত হাল ছেড়ে নিশ্চিন্দি হয়েছেন।

মল্লিকা বুঝতে পারে না, প্রশ্ন করে—দাদা কি করতে পারে ?

—আর কিছু নয়। বুড়োকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ভর্তি করে দিয়ে আসা। অবিশ্যি টাকাকড়ির ব্যবস্থা যা হোক একরকম করে হয়ে যাবে—সেজন্যে ত ভাবনা নেই। কিন্তু এমন কেউ নেই যে বুড়োকে নিয়ে যায়। তাই ভাবলাম, দাদার কাছে যাই। উনি ত আর ছোট বোনকে চোখের দেখাটাও দ্যান না—আমিই মুখ পুড়িয়ে বসে আছি ভাই, দায়ী করব কাকে ? তুইও ত—

মল্লিকা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছল। তারপর ভারী গলায় বল্‌ল—যা হয়ে গেছে তা ত ফিরবে না দিদি। এখন আর ওসব কথা কেন ? বসো, দাদা আসুক—।

—বসব বইকি ভাই, যখন সদর থেকে বিদেয় করিস নি, তখন কি আর না বসে পারি!

বল্‌তে বল্‌তে মুকুল ঝর্‌ ঝর্‌ করে কেঁদে ফেলল।

দিদির এই অপ্রত্যাশিত অশ্রুতে মল্লিকা যেন ভেসে যাবে এমনি আকুতি-ভরা স্বরে মুকুলকে জড়িয়ে ধরল—না, না, তুমি কেঁদো না দিদি। দোহাই তোমার—

বল্‌তে বল্‌তে মল্লিকাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বহুদিনের রুদ্ধ অশ্রুরাশি যেন একটি পথ পেয়ে স্রোতের বেগে বেরিয়ে পড়তে চায়। এ অশ্রুর প্রতিটি কণায় বেদনা-অভিমান গলে গলে ঝরে ঝরে পড়ছে।

মুকুল নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে ছোটবোনকে শক্ত করে ধরল—ওরে তুই অমন করিস নে মল্লি। তোর কাছে আমার এতো অপরাধ—তুই কেন কাঁদবি!

নণ্টু হঠাৎ দেবিকার কোল থেকে ছিট্‌কে মায়ের কাছে ছুটে এল। মল্লিকাকে ঠেলে সরিয়ে সে মায়ের মুখের ওপর মুখ রেখে আদরের সুরে বল্‌ল—ছি-ছি-ছি কাঁদতে নেই। তোমাকে যে বলেছি, আমি একটা সুন্দর পুতুল কিনে দেবো! চুপ-চুপ! মামণি, মাসীমণি সবাই চুপ। তোমরা চুপ করো, আমি সেই সদাগর-পুত্তুরের গপ্প বল্‌ব!

আশ্চর্য! নণ্টুর মধ্যস্থতা সবাই মেনে নিল। মল্লিকা বল্‌ল—বেশ-বেশ সদাগর-পুত্তুরের গপ্প বলো তো ধন!

—ইস্ এখন বুঝি গপ্প হয়? এখন ত গানের সময়—।

মল্লিকা হাসলো—তুমি বুঝি গানও জানো?

কথাটার জবাব দেবার আগেই নণ্টুর নজর পড়ল দরজার দিকে—দেবজ্যোতিকে দেখে সে মায়ের গা-ঘেঁষে আড়ষ্ট হয়ে বসল।

মুকুল ছেলেকে সরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেবজ্যোতিকে প্রণাম করল। তারপর ছেলেকে ডাকল—নণ্টু, মামাকে নমো করো।

নণ্টু নিজের জায়গায় বসে বসেই দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে বল্‌ল—মামা, নমো নমো!

মুকুল নণ্টুর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বল্‌ল—কতবার বলেছি, গুরুজনদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হয়! এসো, এদিকে এসো নন্তু!

নণ্টু কুণ্ঠিত চরণে একটু একটু করে এগিয়ে আসে, আর আড় চোখে মুকুলের দিকে তাকায়—মারবে না, মেরো না মা! এই তো, এই তো, আমি যাচ্ছি!

দেবজ্যোতি হাত বাড়িয়ে ভয়ত্রস্ত নণ্টুকে কোলে তুলে নিল—তুই বুঝি একে মারধ'র করিস মুকু? ছিঃ!

মুকুল খাটো গলায় কতকটা স্বগত ভাবেই বলে—আদর দিলে আর মানুষ হবে না।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—হবে, খুব হবে। তা তুই যে আজ হঠাৎ—কি ব্যাপার?

—একটা বড় বিপদে পড়েছি দাদা!

—কি হলো রে আবার, শুনি বল্।

—শ্বশুরমশাইকে তুমি একবার কলকাতায় রেখে আসতে পারো?

—হঁ্যা, শুনেছি ওঁর ত ডিস্‌লোকেশন অব লেন্স হয়েছে।

দেবিকা প্রশ্ন করল—তার মানে?

দেবজ্যোতি বল্‌ল—চোখের লেন্সটা ঘা খেয়ে নীচে সরে গিয়েছে। অপারেশন করলেও যে দৃষ্টি ফিরে পাবেনই তা ঠিক বলা যায় না। অবিশ্যি অন্য উপায়ে ওই চোখে দেখতে পান, তার ব্যবস্থাও করা যায়। তবে অন্য চোখের দৃষ্টির সঙ্গে এই চোখের পাওয়ারের এত ফারাক হয়ে যাবে যে তাতে ব্যালেন্স রাখা শক্ত। ওঁর ত আবার ছানীও পড়েছে। দুটো চোখেই অপারেশন দরকার—কিন্তু এক সঙ্গে ত তা করাও যাবে না। খুব মুস্কিল! যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে, মোটমাট মাস চার-পাঁচেকের ধাক্কা।

মুকুল মুখ বুজে সব শুনলো, তারপর বল্‌ল—তা এখন তুমি কি করতে বলো? আমার শ্বশুর-বাড়ীতে ত পুরুষ বল্‌তে মাথার ওপর কেউ নেই! চরম বিপদে পড়েই তোমার কাছে এসেছি। জানি না, হয়তো আমারই কর্মফলে ওঁদের এই দুর্ভোগ। এখন ভাবি, এর চেয়ে আমার তখন মরণ হ'ল না কেন দাদা!

দেবজ্যোতির কণ্ঠে সান্ত্বনার স্নিগ্ধ মাধুর্য ফুটে ওঠে—ওসব থাক। কাজের কথা ভাবতে হবে মুকু—মাথাটা ঠাণ্ডা রেখে চলতে চেষ্টা কর।

তারপর মাথার চুলে ঘনঘন আঙুল খেলাতে খেলাতে সে বল্‌ল—নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তা হলে কালই রওনা হওয়া যাবে। তুই কিছু ভাবিস নে। কিন্তু ওখানে ওঁর দেখাশুনাই বা করবে কে?—সেই কথাই ভাবছি! দু-চার দিনের ব্যাপার ত নয়। বুড়ো মানুষ!

—ভাগ্য ছাড়া আর কার ওপর ভরসা করবে বলো! ভগবান দেখবেন।

—হুঁ! আচ্ছা ভেবে দেখি, ভাগ্যের চেয়ে বাস্তব কাউকে পাওয়া যায় কিনা!

একথার পর মুকুল আর কি বল্‌তে পারে?

দেবজ্যোতি নণ্টুর সঙ্গে ভাব করে ফেল্‌ল খুব অল্প সময়ের মধ্যে।

মুকুল আর মল্লিকা গল্পে জমে গেল। দেবিকা নিজের ঘরে চলে গেল—পড়া-শুনো করতে।

একসময়ে দেবজ্যোতি তাড়া দিল—ওরে রাত অনেক হয়েছে। চল মুকু তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মুকুল বল্‌ল—চলো। বাবার সঙ্গে আজ আর তাহলে দেখা হ'ল না।

দেবজ্যোতির দুশ্চিন্তা, সবে সে কারখানায় ঢুকেছে—আজ মাত্র তিন দিন হ'ল। বাড়ীর লোকেরা এখনো সে খবর পায় নি। আর পেলেই বা কি হ'ত! সীতানাথ হয়তো ঝগড়া করতেন, মল্লিকা কান্নাকাটি করত—তারপর সবই খাপ খেয়ে যেত। এখনও সে পর্বটা বাকী রয়ে গেছে।

কাজে ঢুকেই হঠাৎ এইভাবে কামাই করাটা মোটেই শোভন হবে না, সঙ্গতও নয়। ছোটবাবু মুখ ব্যাজার ক'রে ঠিক বলবেন—'ওই জন্যে বাঙালীর ছেলেদের কিছু হ'ল না। লেবারের ডিগ্‌নিটি এরা বোঝে না, গায়ে ফুঁ দিয়েই বড়লোক হতে চায়।' হয়তো দেবজ্যোতির ওপরওয়ালা ওয়াইণ্ডার শিউ-কিষেণ শ্লেষের হাসি হেসে মন্তব্য করবে—আরে ভাই লিখাপড়া ভদ্দর আদমীদের দস্তুরই এই। শালালোগ চৌথা রোজ মে নাগা! আউর, এক ফরমাস করো গে ত গোসা—ঝুটমুট দিগ্‌দারী! কাম শিখনেবালা থোড়াই—! খালি দালালী।

দেবজ্যোতিকে প্রথম দিন ঠিক এই ভাষায় কথা না বল্‌লেও শিউকিষেণ বিশেষ প্রীতির চোখে দেখে নি। তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই সুধীরেশকে বলেছিল—আরে এ সুধীর বাবু, দেখো তো হাম্মারা তর্গ্‌দির! এ সব জামাইবাবু হেলপার

দিয়ে কি কাজ হবে ? খালি-খালি, মশাই-মশাই আপনি-আপনি করতে করতে জান পরেশান হয়ে যাবে—ফয়দা ত ঘণ্টা ! আরে বাবা তুটো খিস্তী করবো তব ভি উল্টা সম্‌ঝেগা ।

দেবজ্যোতি হেসে জবাব দিয়েছিল—এ জী, আপনি আমাকে দিয়ে যা খুশী করিয়ে নেবেন, একদম গোসা হবো না। আমি আপনার হেলপার, আমার মতলব কাজ শেখা, আর হুকুম তামিল করা—ব্যস ল্যাঠা চুকে গেল ।

তবুও শিউকিষেণ যেন সমীহ করেই কথা বলে দেবজ্যোতিকে। আর কেবল বলে—আপকা সুরৎ সে মালুম, আপনি রইস্ আদমী—কাহে আয়ে হেঁ ইয়ে বুরা কাম মে। বাবুজী আপ চলা যাইয়ে। কারখানা বড়া খারাপ জায়গা, বাবুজী দিল্ আপনার বিগড়েই যাবে !

দেবজ্যোতি হেসে জবাব দেয়—আরে দাদা, আপনি ভালো বলেছেন, কাজটা ছেড়ে দিলে পেট চল্‌বে কি করে ? মেহেরবাণী করে শরম ছেড়ে হুকুম চালিয়ে যান।······কিছুটা আড়ষ্টতা কাটলেও শিউকিষেণ পুরোপুরি মজদুরের খাস্তা বুলি মুখ থেকে বার করতে পারে না দেবজ্যোতির সামনে। তাকে সে এখনও নিজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে নি। তবে একটু সুনজরেই দেখতে শুরু করেছে। ভদ্রলোক হলেও দেবজ্যোতি যে ভাল লোক এ আস্থাটুকু শিউকিষেণের হয়েছে ।

ঠিক এই রকম অবস্থায় কারখানার ডিউটি ফেলে রেখে চলে যেতে দেবজ্যোতির মন সরে না। কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই। মুকুল বেচারী একান্ত নিরুপায় হয়েই এবাড়ীতে এসেছিল। যদি অন্য কোন পথ খোলা থাকত তাহলে মুকুল কিছুতেই এখানে আসতো না। মুকুলের কথাগুলো এখনো যেন কানের কাছে ভেসে বেড়াচ্ছে—কী অসহায় ওর অবস্থা !

একবার মনে শঙ্কা হ'ল—চাকরীটা হয়তো থাকবে না। শিউকিষেণ রিপোর্ট করবে। চাকরীতে ঢুকেই মাত্র চারদিনের মাথায় যে হেল্‌পার কামাই করে তার চাকরী থাকে না। না থাক। জীবনে কোনো কিছুই ত আজ পর্যন্ত টিকে থাকল না দেবজ্যোতির। মা গেলেন। লেখাপড়া গেল। আরও কত কী-ই ত চলে গেল ! সীতানাথের ভাড়া-বাড়ীর খবরদারীটুকুও দেবজ্যোতির

দ্বারা হ'ল না। এত সব গিয়েও যেন দেবজ্যোতি নিঃশেষ হয়ে যায় নি। কারখানার চাকরীটুকুকে সে সর্বশেষ অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করল—তা সেটাও থাকবে না। তবু, তারপরও দেবজ্যোতি ফুরিয়ে যাবে না। সে থাকবে, আপন নিয়মে চলার মতোই পুরোপুরিই থাকবে। সে যেন নিজের হাতেই সবকিছু বইবার অসীম ক্ষমতার অধিকার নিয়ে এসেছে এই পৃথিবীতে। নিজেকে সে বিধাতার প্রতিবাদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

সাতান্ন

গোবিন্দ মুখুয্যেকে নিয়ে দেবজ্যোতি সোজা এসে থামলো অমলাদের একতলা বাড়ীর সামনে। কড়া নাড়তেই একটি বছর আষ্টেকের শ্যামল ছেলে এসে দরজা খুলে দাঁড়ালো।

দেবজ্যোতি তাকে দেখেই বুঝলো নিরঞ্জনের সেই শিশুপুত্রটি ছাড়া এ আর কেউ নয়।

ছেলেটি প্রশ্ন করল—কাকে চান ?

দেবজ্যোতি একটু হেসে বল্‌ল—তোমার মা আছেন ?

—মা, হ্যাঁ! আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মালপত্র নামাতে নামাতে দেবজ্যোতি বল্‌ল—অনেক দূর—সেই মানিকপুর।

—ও!

বলে ছেলেটি ছুটে ভেতরে চলে গেল।

দেবজ্যোতি ছেলেটিকে দেখে খুব খুশী হয়েছে। রংটা তেমন ফর্সা হয় নি, কিন্তু ভারী সুন্দর মুখশ্রী, আর চোখ দুটি বুদ্ধি-উজ্জ্বল।

গোবিন্দবাবুর হাত ধরে নামিয়ে দেবজ্যোতি দাঁড়াতেই গোবিন্দ তাঁর অন্ধপ্রায় দৃষ্টি প্রসারিত করে বল্‌লেন—এই কি হাসপাতাল বাবাজী ?

অমলা বেরিয়ে এসেছে, তার মাও এসেছেন পিছনে। ছেলেটি তাড়াতাড়ি গোবিন্দবাবুর স্যুটকেশটা তুলতে চেষ্টা করে, তার পক্ষে রীতিমত ভারি—তবু দু-হাত দিয়ে তুলে কতকটা টান্‌তে টান্‌তেই এগিয়ে যাচ্ছিল। দেবজ্যোতি হেসে বল্‌ল—ওরে বাবা, পালোয়ান যে! থাক থাক ও তুমি পারবে না খোকা! দাও, আমাকে দাও।

—খুব পারবো।

বলে কোঁকড়া চুলে ঢাকা মাথাটা হেলিয়ে দিল খোকা।

অমলা বল্‌ল—কি ভাগ্যি, এতকাল পরে গরিব বৌদিকে তবু মনে পড়ল ঠাকুরপো! এস-এস!

গোবিন্দবাবু কিছুই বুঝতে পারেন না—ও দেবু, আমরা এ কোথায় এলাম? হাসপাতাল ত নয়!

দেবজ্যোতি বল্‌ল—না মেশোমশাই, এ হচ্ছে আমার বৌদির বাপের বাড়ী। নিরঞ্জন ঘোষালকে মনে পড়ে? এটা তাঁদের বাড়ি।

গোবিন্দ যেন স্মৃতির মধ্যে সাঁতার কাটতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে বল্‌লেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে—খুব মনে আছে! সেই সেবার স্ট্রাইকের সময় খুন হ'ল। আহা সোনার চাঁদ ছেলে! তা এটি বুঝি তাদের বাড়ী? বেশ, বেশ! তা এখানে আমরা এলাম কেন বাবাজী? হাসপাতালে চলো, তাড়াতাড়ি চোখটার হ্যাপা চুকোনো দরকার। ওদিকে ওয়ার্কশপ কামাই হয়ে যাচ্ছে যে! বোঝো না তো, আমি না থাকলে আবার সাহেব চোখে অন্ধকার ছাখে—তা দেখবে না! কেউ কিচ্ছু বোঝে না। কথায় কথায় সাহেব এই বুড়ো মুখার্জিকেই ডাকবে। বুঝলে বাবাজী, আমাদের এই মরা হাড়েই ভেল্কি খ্যালে। আর সব ত কেবল কাঁড়িকাঁড়ি টাকা মাইনেই নেয়, কাজ ক'জন বোঝে! তা এবার সাহেব ঠ্যালাটা বুঝবে—ডিপার্টমেণ্টে ত কাজের অন্ত নেই। কি যে হচ্ছে, কে জানে!

বলে গোবিন্দ ম্লান হাসি হাসলেন।

বাড়ীতে হঠাৎ দু-জন অতিথি এভাবে এসে পড়াতে গৃহস্থ বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এর মধ্যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে অমলা এক-আধবার এসে দাঁড়াচ্ছে, দুটো কথা বলছে আবার ব্যস্তভাবেই চলে যাচ্ছে।

দেবজ্যোতিকে খোকন সব খবর দিচ্ছে। তার নাম দেবপ্রিয়। সে ক্লাস থ্রিতে পড়ছে। মায়ের কাছে সকালে বই নিয়ে বসে। রাত্রে নিজেরই পড়তে হয়, মায়ের ফিরতে অনেক রাত হয়—তাঁর কত কাজ! ঠাকুমার ত পূজো-জপ আর রান্নাবান্না করে সময়ই হয় না—তিনি সব সময় ব্যস্ত। তবে হ্যাঁ, খোকনের রথীন কাকা খুব মজার মানুষ। হ্যাঁ, তিনি এ বাড়ীতেই থাকেন। এ বাড়ীতে আরও অনেকে থাকেন—রথীন কাকার মা, ছোট বোন করবী পিসী

আর রথীন কাকার ছোট ভাই ভোম্বল কাকা। খোকন সব খবর দিয়ে দিল—এরপর আলাপও করিয়ে দেবে। আরও কেউ-কেউ হঠাৎ আসেন দু-দিন থাকেন, আবার কোথায় যে চলে যান তা খোকন বল্‌তে পারে না। দেবজ্যোতির অনুমান করতে অসুবিধে হয় না যে, অমলাদের বাড়ীর বাকী ঘর-গুলি ভাড়া দেওয়া হয়েছে। কারণ এর আগে সে যখন এসেছিল, এ ঘরে সে ছিল না। আলাদা ঘরে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখন এ ঘরখানাতেই অমলাদের গোটা সংসার গুছোনো রয়েছে এক নজরেই তা বোঝে দেবজ্যোতি। তার একটু চিন্তা হ'ল, যদি গোবিন্দ মুখুয্যেকে হাসপাতালে ভর্তি করতে না পারা যায় তাহলে সমস্যা! কে কোথায় থাকবে? মনে মনে সে অস্বস্তি বোধ করে। সে স্থির করল সকালেই বেরিয়ে পড়তে হবে।

চা এবং পাঁপরভাজা নিয়ে অমলা এসে বল্‌ল—তোমার সঙ্গে দু-দণ্ড গল্প করি এমন ফুরসুৎ পাচ্ছি নে। রাত্রে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসা যাবে, কি বলো ঠাকুর পো! ইচ্ছে করছে আজ সারাদিন ধরে কেবল মানিকপুরের কথা শুনি, কিন্তু ইস্কুলের দায়িত্ব এমন যে, এড়াবার জো নেই।

দেবজ্যোতি বিস্ময় প্রকাশ করে না, সহজ ভাবেই বলে—আপনি বুঝি স্কুলে কাজ নিয়েছেন?

—না নিয়ে করি কি বলো? যা দিন কাল পড়েছে, তাতে সামলানো যায় না কিছুতেই। বাড়ীখানা একটু একটু ক'রে সবটাই প্রায় ভাড়া বসিয়েছি কিন্তু তাতে আর কি হয়! ইস্কুলে অবিশ্যি সামান্যই পাই—তবু জোড়াতালি দিয়ে চল্‌ছে যাহোক করে।

দেবজ্যোতি প্রশ্ন করল—স্কুলে বুঝি আপনার বিস্তর খাটুনী?

—না, তেমন আর কী! লেখাপড়ার দৌড় ত জানো ভাই! ওই সেলাই, রান্না, হাতের কাজ, এইসব শেখাই। তারপর আবার বুড়ো বয়সে শখ হয়েছে বেয়াড়া—গান শিখতে যাই, আর ইচ্ছে আছে সাম্‌নের বারে ম্যাট্রিকটা দেবো, তাই একটু পড়াশুনো করি এক জায়গায় গিয়ে। এইসব পাঁচ রকম করে-করেই সময় ফুরিয়ে যায়। তা আজ আর কোথাও যাবো না, ইস্কুল থেকে সোজাই বাড়ী ফিরব। তুমি এলে এ কতদিন পরে!

দেবজ্যোতি বল্‌ল—না, না, আমার জন্যে আপনি কাজের ক্ষতি করবেন না বৌদি! আমি এখুনি বেরুচ্ছি একবার হাসপাতালে—দেখি গিয়ে কতদূর কি হয়! তাইে মশাই রইলেন। দুপুরে আমি নাও ফিরতে পারি বুঝলেন!

—সে কি, তোমার খাওয়া-দাওয়া?

—সে ঠিক হয়ে যাবে। ওঁর একটা ব্যবস্থা করা আগে দরকার, বুঝলেন না। মাঝখান থেকে আপনাদের ওপর হাম্‌লা হলো খানিকটা।

অমলা কুণ্ঠিতভাবে প্রতিবাদ করল—তুমি ত আর আপন মনে করো না, তাই এসব বল্‌ছো!

দেবজ্যোতি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো—টের পাবেন মশাই, কিরকম আপন মনে করি, টের পাবেন! আমি ত ওঁকে হাসপাতালে ভর্তি কারে দিয়ে সরে পড়ব। তারপর থেকে আপনিই ওঁর খোঁজ-খবর নেওয়া, দেখাশুনো করা—সব করবেন, বুঝলেন!

অমলাও সপ্রতিভভাবে জবাব দেয়—খুব মজাই হবে। হাসপাতালে যেতে আমার খুব ভাল লাগে, তবে রোগী হয়ে নয়।

গোবিন্দ মুখুয্যেকে অমলা দেখে প্রথমটা চিনতে পারে নি, কিন্তু পরে চিনেছে। মানিকপুরের মানুষ গোবিন্দ, শুধু তাই নয়, ঘোষালের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াই করেছেন তিনি—অদ্ভুত একটা আত্মীয়তার সুর ওঁর মনে বেজে উঠেছে।

দেবজ্যোতি বেরিয়ে যাওয়ার পর অমলা খানিকক্ষণ গোবিন্দর সঙ্গে গল্প করল। কথায় কথায় গোবিন্দ ললিতের গল্প জুড়লেন। বড়ছেলের বিত্তগৌরবে গোবিন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। তারপর এক সময়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—বুঝলে মা, সবই কপাল! নইলে আমার ললিতকেই বা ওরা এরকম জোরজবরদস্তি হাজতে পুরবে কেন! আজ যদি সে বাইরে থাকতো তাহলে কি আমার ভাবনা ছিল! সে আমার তেমন ছেলেই নয়। আজকালকার ছোঁড়াদের মতো ইয়ে নয়—মানে ভক্তিছোদ্দা আছে। আহা!

অমলা সহানুভূতির সুরেই বল্‌ল—আর ক'টা দিনই বা! ইংরেজদের ত

ছাড়তেই হবে এদেশ, কিন্তু এখনো জুলুম করতে ছাড়ছে না। তা আপনার ছেলে বুঝি অনেকদিন বন্দী!

—না, না, এই ত সেদিন বলা নেই কওয়া নেই ধরে নিয়ে গেল। তা ওর মতো মানী লোককে ত যে-সে এসে ধরতে পারে না—পুলিশ সাহেব নিজে এসে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে। বলে কি মা জানো? জোচ্চুরী করেছে ললিত! শুনে আমি ত হেসে বাঁচিনে,—ওর ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ ছিল না যে, জোচ্চুরী করতে যাবে। আরে তার কারবারে কম করে আশী-নব্বইটা লোক খেয়ে পরে বাঁচছে, হাজার-হাজার টাকার লেনদেন হচ্ছে। অভাব ত নেই—তবে কেন জোচ্চুরী করতে যাবে, তুমিই বলো মা! তবে হ্যাঁ, ব্ল্যাকমার্কেট-টার্কেট করে থাকতে পারে। সে ত বড় বিজ্‌নেস যারা করছে তারা সবাই করে।

অমলার ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে আসে, ও বলে—আপনার ছেলে বুঝি বিজনেস ম্যান? কিসের কারবার?

এবার গোবিন্দর ঝাপ্‌সা চোখে খুশীর হাসি খই ফোটে মুখে—তার কি একটা আর কারবার। নানান্ রকম, আমি ও সব জানিনে। অর্ডার সাপ্লাই-এর ফলাও ব্যাপার মা। একেবারে খোদ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক। যুদ্ধের সময় বিজ্‌নেসে নামলো, এই যাকে বলে পোঁটাচুন্নীর ব্যাটা চন্নন বিলেস—তা নিজের হাতেই সব গড়েছে—বাড়ী, গাড়ি কি নয়!

গোবিন্দর ছানিপড়া চোখের সামনে অমলার মুখখানা অপ্রসন্নতায়, ঘৃণায় কালো হয়ে যায় কিন্তু গোবিন্দ দেখতে পান না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অমলা উঠে চলে গেল।

ওর মনে একটা বিষাদের ছায়া পড়েছে। তবে কি আজকের দেবজ্যোতি সেই পুরনো কর্মী দেবজ্যোতি নয়? সেও কি কালের হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিয়ে, কালো-কালো টাকাকে ধনদৌলত মনে করে দু-হাতে সেইসব সঞ্চয় করে যাচ্ছে? কিন্তু দেবজ্যোতির চোখেমুখে ত তেমন কিছু ছাপ ফুটে ওঠে নি! না, না, হয়তো অমলারই মনের ভুল। আবার ভাবে, তবে কেন এই লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে অমলার বাড়ীতে উঠ্‌লো দেবজ্যোতি? একটা রহস্যের দোলায়

অমলা ঘুরপাক খেতে থাকে আপন মনের সৃষ্ট আবর্তে। কখনো মনে পড়ে মন্দাকিনীকে।···কিছুদিন আগে অপ্রত্যাশিতভাবে ওর সঙ্গে মন্দাকিনীর দেখা! তর্কযুদ্ধের একটা ছবি ফুটে ওঠে ওর সামনে। মন্দাকিনী এখনো ছেলেমানুষ, কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীকে তো ছেলেমানুষ বলে ক্ষমা করা চলে না। অমলার কাছে মন্দাকিনী বাক্‌যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছে—না, ঠিক সহজ পথে অমলার জয় হয় নি। পুরাতন আক্রোশের তীব্র জ্বালায় উত্তেজিত হয়ে অমলা অন্যায়ভাবে মন্দাকিনীকে আক্রমণ করেছিল,—ধনকুবেরের দুলালী-তনয়া মন্দাকিনী মল্লিক দু-দিনের শখ মেটাতে এসেছে। যার বাপের হাতে হাজার হাজার মা, বোন, ভাই, ছেলে নির্যাতিত হচ্ছে, অন্যায়ভাবে যে দানব মানুষের মুখোশ পরে শ্রমিককে হত্যা করছে—মন্দাকিনী যে সেই দানবের মেয়ে, অতএব তাকে চিনে রাখুক সবাই!—নিমেষে মন্দাকিনীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। অপমানে ক্ষোভে মন্দাকিনীর কণ্ঠ রোধ হয়ে ছিল। আর অমলার সঙ্গিনীরা বিজয়োল্লাসে কোলাহল করে, টেবিল-বেঞ্চ চাপড়ে সভাঘর-খানা মাতিয়ে তুল্‌ল।···সেদিনের সেই ছবির সঙ্গে আজকের দিনের কোনই যোগসূত্র নেই, তবু কেন মনে পড়ল অমলার? হয়তো কিছু একটা সম্বন্ধ আছে! মন্দাকিনীর সঙ্গে দেবজ্যোতির কি এখনো পুরনো সম্পর্ক রয়েছে? যতক্ষণ দেবজ্যোতি বাড়ীতে ছিল, আশ্চর্য, ততক্ষণ এসব কিছুই মনে পড়ে নি! এখন একে-একে সব কথাই প্রশ্নের আকারে এগিয়ে আসছে! অথচ অমলার বর্তমান জীবনযাত্রার সঙ্গে ত ওদের কোনোই সম্পর্ক নেই! ওরা যেন দূরের ছবি! আধখানা-পড়া উপন্যাসের অসমাপ্ত চরিত্র যেন! তবু ওদের প্রতি এই মুহূর্তের আকর্ষণ, কৌতূহল, উপেক্ষা করতে পারে না অমলা। আজকের মন নিয়ে বর্তমান অমলাও সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। তার সমস্যা, তার দিনযাত্রার ধারা, সম্মুখের আশাস্বপ্ন, সব কিছুই আলাদা। তবু—

অমলার মা মোটেই প্রসন্ন হননি নবাগত অতিথিদের আগমনে। মাস শেষ হ'তে চলেছে—এখন প্রতিটি দিন হিসেবের সূক্ষ্ম নিক্তিতে নির্ভর করে চলে। কিন্তু মেয়ের সামনে ত মন খুলে কথা বলা চলে না—তাহলেই অমলা চটে যাবে। ওর ওই এক কথা—আমাকে ভালবাসে বলেই ত সবাই আসে মা!

কই আর কারুর কাছে ত যায় না! তুমি কি মনে করো যে, কারুর কোথাও ঠাঁই হয় না তাই আসে? তা নয়! মানুষের ভালোবাসা পাওয়া সামান্য ভাগ্য নয়—আমার আর কিছু নেই, শুধু এই সৌভাগ্যটুকুই সম্বল। তাও যদি সইতে না পারো, বলো আমি অন্য ব্যবস্থা দেখি!…তা অমলা পারে। যেরকম তেজী আর জেদী মেয়ে—ও না পারে হেন কাজ নেই। অতএব মা মুখ বুজে নিজের কাজ নিয়ে থাকেন।

মেয়েকে স্নানের ঘরে ঢুকতে দেখে বল্‌লেন—হ্যাঁ রে, একবার শোন!

—কি, বলো।

—চান ত করতে চল্‌লি। ইদিকে ঘরে অতিথি, মাছ-টাছ আনাতে হবে, ত, না কি!

—অতো ইয়ের দরকার নেই। যা হবে তাই দিয়েই দেবে।

—তা বলে একেবারে ডাল-ভাত ধরে দেবো?

গোবিন্দ মুখুয্যের ওপর অমলা বিরক্তই হয়ে থাকবে—হয়তো তাঁর পুত্র-গৌরবের মধ্যে ধনতান্ত্রিক দম্ভের ইঙ্গিত ছিল বলেই। ও বলল—গরীবের ঘরে সোনাভাজা মুক্তোর ঝোল আর জুটবে কোত্থেকে বলো!

মেয়ের এ আচরণে মা বিলক্ষণ বিস্মিত হলেন। বাইরের কেউ এলে অমলা নিজে থেকেই বিশেষ বন্দোবস্তের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আজকের ভাবান্তরের হেতু খুঁজে না পেলেও মা খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে, ধার করবার জন্য রথীনের মায়ের কাছে হাত পাততে হবে না। যাক, না হয় একটু দই আনিয়ে দেবেন।

বেরুবার সময় অমলা গোবিন্দকে বলে গেল—আপনাকে কষ্ট করে একলাই থাকতে হবে দুপুরটা। তবে মা রইলেন। দরকার পড়লে ডাকবেন, লজ্জা করবেন না যেন!

গোবিন্দ বললেন—আচ্ছা মা, আচ্ছা! তুমি বুঝি ইস্কুলে চললে? আহা, বড় কষ্ট মা তোমার। কি করবে বলো, সবই ভাগ্য। আমার জন্যে ভেবো না, বেশ থাকবো। তা ইয়ে, দেবু আবার কখন ফিরবে কে জানে!

আটাশ

মেডিক্যাল কলেজে বন্দোবস্ত চুকিয়ে দেবজ্যোতির বেরুতে বেলা একটা বেজে গেল—গোবিন্দবাবুকে ভর্তি করে খানিকটা নিশ্চিন্ত হল সে। সকাল থেকে দৌড়াদৌড়ি কম হ'ল না। হাওড়া স্টেশনে নেমেছে ভোর সাড়ে পাঁচটায়,—সেখান থেকে এণ্টালি অমলাদের বাড়ী। ভেবেছিল হাসপাতালে এত সহজে বেড্ পাওয়া যাবে না। কিন্তু চোখের ওয়ার্ডে বিশেষ ভিড় নেই, তাই আজ দুপুরের মধ্যেই রোগীকে ভর্তি করার নির্দেশ মিলে গেল—বিকেলে রোগী ভাত হবে না। অতএব যদি আজ এবেলা ভর্তি করা না হয় তাহলে আবার সেই আগামী কাল! দেবজ্যোত অত দেরী করতে ইচ্ছুক নয়—অমলাদের একখানি মাত্র ঘরের ভেতর সমস্ত সংসারযাত্রার ছবিটা ত স্বচক্ষে দেখেছে। কাজেই, রোগী আনতে ছুটলো সাড়ে দশটার সময়। অমলাদের বাড়ী গিয়ে দেখল, গোবিন্দর স্নানই হয় নি তখনও।

অমলার মাকে বল্‌ল—মাসিমা, আপনার ভাত হয়েছে কি?

—হ্যাঁ বাবা, ভাত-ডাল একটা তরকারি হয়েছে—আর—

তাঁকে কথা শেষ করতে দিল না দেবজ্যোতি, বল্‌ল—আর কিছু দরকার নেই, ওঁকে খেতে দিয়ে দিন, এখুনি—ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

গোবিন্দ বল্‌লেন—আহা, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন বাবাজী, খাওয়াটা ত বড়ো কথা নয়। চলো, চলো হাসপাতালেই চলো—সেই কাজেই ত আসা!

অমলার মা মৃদুস্বরে বল্‌লেন—সেটা কি একটা কথা হ'ল? দুপুর বেলা অভুক্ত ব্রাহ্মণ, বাড়ি থেকে চলে যাবেন! তার চেয়ে একবার পাতের সামনে বসুন, এক গ্রাস দু-গ্রাস যা-হোক মুখে ঠেকিয়ে দুর্গা-দুর্গা বলে যাত্রা করবেন! আর, আমার যেমন আয়োজন তাতে দু-মিনিটও লাগবে না খেতে—কষ্টই হবে বরং।

কথাটা নেহাত মিথ্যা বলেন নি অমলার মা। দইটুকু পর্যন্ত আনানোর ফুরসৎ পাননি তিনি। দেবজ্যোতিকেও খেয়ে নিতে বল্‌লেন, কিন্তু সে রাজী হ'ল না। বল্‌ল,—ওবেলা দেখা যাবে—যদি কলকাতায় থাকি!

—ওমা সে কি গো বাবা, কত কাল পরে এলে, আজই যাবে কী! দু-চার দিন থাকবে ত!

অমলার মা দেবজ্যোতিকে সুনজরেই দেখেচেন, তার উপর অচেনা বৃদ্ধ অতিথিটি এত অল্প কালের মধ্যে রেহাই দেওয়াতে তিনি দেবজ্যোতির উপর আরও প্রসন্ন হয়েছেন।

গোবিন্দকে পেয়িং ওয়ার্ডে পৌঁছে দিয়ে, নার্সের কাছে বেড নম্বর জেনে নিয়ে বেশ খুশী মনেই দেবজ্যোতি একটার সময় বাইরে বেরুলো। এতক্ষণে যেন একটু টের পেল সে কলকাতায় রয়েছে! আর মনে পড়ল মন্দাকিনীর কথা। আরও মনে হ'ল যে, আজকের মধ্যে রওনা হ'য়ে কাল সকালে কারখানার ডিউটি বজায় রাখা যায়।

এখনই যদি ইউনিভার্সিটিতে খোঁজ করা যায়, হয়তো মন্দাকিনীর সঙ্গে দেখা হবে। ওকেও বলে যাবে, মাঝে মাঝে গোবিন্দবাবুর খোঁজ খবর নেবার কথা! বেচারী একা-একা পড়ে থাকবেন হাসপাতালে—আর অমলা হয়তো সব দিন আসতেও পারবে না। কাজেই মন্দাকিনী ক্লাসের পর যদি দু-পা এগিয়ে একবার দেখে যায়, বেশ হবে।

মেয়েদের কমনরুমেই মন্দাকিনীকে পাওয়া গেল।

তাকে দেখে মন্দাকিনী হেসে উঠল। শুধু ওর ওষ্ঠরেখাতেই এ হাসির রেশ শেষ হয় না, তার ঢেউ লাগে চোখের তারায় তারায়, শুভ্র গালের মসৃণ অবয়বে —মন্দাকিনীর মুখখানি পরিপূর্ণ আনন্দে উদ্ভাসিত! এ হাসি দেবজ্যোতির অচেনা নয়, তবু অনেক কাল পরে নতুন ক'রে মন্দাকিনীকে দেখল সে, আর দেখল ওর হাসি—দেখেই মনে পড়ল যে, আগেও ও এমনি করেই হাসতো।

এগিয়ে এসে দেবজ্যোতির ডানহাতখানা ধরে বল্‌ল—আসতে পেরেছ! যাক বাঁচা গেল। নইলে, ভাবছিলাম আমিই যাই একবার মানিকপুরে—তা অনেক কথা ভেবে, একটু ইতস্তত করছিলাম।

দেবজ্যোতি অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—কেন, কি এমন জরুরী দরকার, যে বাঘের ঘরে হাত বাড়িয়ে দেবার ইচ্ছে!

—চলো আগে কোথাও একটু বসা যাক। কফিহাউসে যাবে? দাঁড়াও দেখি ভেবে কতো পুঁজি—হ্যাঁ, তা যাওয়া যায়।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—ওসব শহুরে ব্যাপারে পড়তা পোষাবে না, আমাব বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে ভাই।

মন্দাকিনী এবার দেবজ্যোতির মুখের পানে ভালো করে তাকিয়ে বল্‌ল—হুঁ মুখখানা শুকনোই ত, তবে একটু দাঁড়াও আমি টাকা নিয়ে আসি।

—তার দরকার হবে না, বর্তমানে আমি বড়লোক। চলো, চলো। হ্যাঁ, মানিকপুর কেন যাচ্ছিলে?

—তার আগে বলো, কেমন আছো। আর, ডাক্তারী পড়াটা কন্‌টিনিউ করা যায় কি না একবার ভালো করে ভেবে দেখলে পারতে। মাঝে পড়ে কারখানায় ওরকম খেয়ালের বশে ঢোকাটাও ঠিক হয় নি।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—যা হবে না, তার জন্যে খেদ করা বাজে খরচ। আর কারখানায় কাজ করছি এ খবর কে দিল?

—আমি পেয়েছি, এইটুকু জেনে রাখো। যে পেতে চায় তাকে না দিলেও ঠিক সে পায় জ্যোতিদাদা।

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে এসে ওরা সোজা ঢুকলো ওয়াই এম. সি. এ.-তে!

দেবজ্যোতির জন্য মাংস-ভাতের ফরমাস ক'রে মন্দাকিনী নিজের জন্য মাত্র চা আনতে বল্‌ল। বাধা দিয়ে দেবজ্যোতি বল্‌ল—সঙ্গী হয়ে সামান্য কিছু ত খেতে পারো!

হাসতে হাসতে বল্‌ল মন্দাকিনী—রোজ ত আর তুমি এমন করে বলবে না, তবে আজ খাওয়াই যাক। হ্যাঁ মানিকপুর যাচ্ছিলাম তোমাকে কারখানা থেকে তাড়িয়ে এনে এখানে চোখের সামনে রাখবো ব'লে! আজকাল তোমার মগজে ঘুন ধরেছে, সেটা মেরামত করাতে চাই!

—আমার ব্যাপারে তোমার চাওয়ার অন্ত নেই দেখছি! মগজটাকেও ধরে টান মারলে আমার আপন বল্‌তে যে আর কিছুই থাকে না মন্দা!

—বাজে মগজ থাকার চেয়ে না থাকাটা শ্রেয়। শোনো, এই যে এসেছ এখন আর ময়লাপড়া কারখানার কজায় যেতে পাবে না। ইউ আর নট কাট

ফর ছাট! শোনো, আমাকে ধম্‌কে উড়িয়ে দিয়ো না—বল্‌তে দাও। এখন আর আমি ছেলেমানুষটি নই। আর মনে মনে যা-ই থাক, প্রকাশ্যে তোমার কাছে কখনো ত বুদ্ধি কর্জ করতে যাই নি। অতএব আমার নিজস্ব চিন্তার ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিতে তুমি বাধ্য।

—কথাটা যেরকম গলাবাজী করে শোনাচ্ছ, তাতে স্বীকার করিয়েই ছাড়বে। বেশ, তারপর বলো!

—পরে নয়, বর্তমানের কথা। কোনো কথা শুনবো না। আমাদের একটা স্কুল হয়েছে। শুধু স্কুল নয়, তার হস্টেলও হবে—একজন নয়, অনেকজন কর্মীর চেষ্টায় এই স্কুল গড়ে উঠেছে। সেখানে তোমাকেও আমরা চাই।

—আবার চাই!

—এবার একা আমি নই—বলেছি ত 'আমরা' চাই।

—একার চাওয়া বোঝা যায় কিন্তু তার বেশীর চাওয়া—।

—তুমি আজকাল ভারী দুষ্টু হয়ে উঠেছ ত দেখছি।

—না, না, তা নয়, অনেকের চাওয়া ত অনেক রকম হবার কথা। সে যাক, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আর একটি সোনার পাথরবাটী খুঁজছ তোমরা। কিন্তু আমার দ্বারা সে সব হবে না, অনেক দেখে ভেবে বুঝেছি, আমি হচ্ছি অত্যন্ত কমন্ মানুষ। তবে একটু যা কমনসেন্স রয়েছে—সেই কমনসেন্সই আমাকে নিজের কাছে চিনিয়ে দিয়েছে।

—তোমার কমন্‌সেন্স আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বোঝা সহজ নয়। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ মল্লিক সাহেবের তাঁবে চাকরী নেওয়ার মধ্যে কোনো সেন্সই খুঁজে পাই নি জ্যোতি দাদা!

—মল্লিক সাহেবের চাকরী নয় এটা, কারখানার কুলীর কাজ—হেল্‌পার। মল্লিক সাহেবের দ্বারস্থ হ'লে অন্ততঃ বড় না হোক—মেজো-সেজো গোছের চাকরী মিলতো।

—আমি ত বলি বড়ই হোক ছোটোই হোক, ওই মানিকপুরের চাকরী তোমাকে করতে হবে না।

মাংসের ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে দেবজ্যোতি বল্‌ল—একের পর

এক ভুলই করে যাবো এমন অপরিমেয় আয়ু আমার হাতে নেই মন্দা! আমি যা করেছি তার পিছনের যুক্তিটা তুমি দেখতে পাওনি।

—তোমার ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, আগে খেয়ে নাও। তারপর শোনা যাবে—

—তোমার ক্লাস নেই?

—আজ আর কিছু নেই, তুমি আছো যে!

এ কণ্ঠস্বর, এ ভাষা যেন নতুন শুনতে পেল দেবজ্যোতি। পাশের দাঁত দিয়ে একটা হাড় চিবোতে-চিবোতে সামনে চেয়ে সে মন্দাকিনীকে দেখল।

মন্দাকিনী বলে চলেছে—আমার আর ভালো লাগে না একা-একা। বড় ফাঁকা লাগে।—এত কাজ করি, এত মানুষের সঙ্গে মিশি, লেখাপড়া করি কিন্তু এক-এক সময় মনে হয়, সব কিছুই বাজে, মনকে ভুলোবার জন্যেই যেন চারপাশের বাহারী আয়োজন। আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলি, খুঁজে পাইনে আর—কেন এমন হয় বল্‌তে পারো জ্যোতিদাদা?

দেবজ্যোতি ওর মুখের পানে তাকিয়ে বল্‌ল—তোমার চেহারা কিন্তু বেশ হয়েছে। হয়তো অনেক দিন পরে দেখছি তাই ভালো লাগছে।

—চেহারাই কি সবটুকু সত্য দেখিয়ে দিতে পারে?

—না, না, তা বলি নি। এমনি, মনে হলো বল্‌লাম। আসলে তুমি যে প্রশ্নটা করেছ সেটার জবাবও তুমিই দেবে এই ভেবে আমি কিছু বললাম না।

দেবজ্যোতি একটু হেসে জলের গ্লাসে হাত দিল।

মন্দাকিনী উৎকণ্ঠিত ভাবে বল্‌ল—ওমা, ভাত-মাংস সবই পড়ে রইল যে! আরে, খেয়ে নাও। কতটুকুই বা দিয়েছে—তাও খেলে না! আবার কখন কি জোটে তার ঠিক নেই। এমনি করে শরীরটা ঝর্‌-ঝরে ক'রে কি লাভ?

—বোঝো তাহলে, আমার মতো মানুষও খেতে পারল না, তাহলে রান্নাটা কোন্ স্তরের হয়েছে! অবিশ্যি আর একটু চেষ্টা করলে বাকীটুকু খেয়ে ফেল্‌তে পারি—কিন্তু তুমি যে এতক্ষণ ব'কে যাচ্ছ, কিছুই স্পর্শ করো নি। তাই ভাবলাম, এবার আমি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা শুরু করলে তুমি জলযোগ সারতে পারবে!

—যাও, তুমি ভারি ফাজিল হয়েছ। অমন করে বল্‌লে আমি চলে যাবো।

—তা চলে যেতে ভালো লাগলে অবিশ্যি যাবে!

—আমার একটা কথা রাখবে?

—কি কথা, শুনি আগে।

—শোনার পর বিবেচনা করে তবে সম্মতি দেবে? এমনিতে তুমি আমার ইচ্ছের কোন দাম দিতে রাজী নও!

দেবজ্যোতি উচ্চকণ্ঠে হেসে বল্‌ল—যার ব্যাঙ্কে কানাকড়িও পুঁজি নেই তাকে দিয়ে চেকে সই করিয়ে তোমার কিছু লাভ নেই।

—আমার কাছে সইটুকুরই দাম! ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের কথা আপাততঃ ভাবিনে।

—আচ্ছা তোমার মর্জিটা যদি আমাকে দিয়ে আশ্‌মানের চাঁদ পাড়ানোর মতো অসম্ভব না হয় তবে আমি সায় দিচ্ছি।

খুশিমাখা চোখে মন্দাকিনী দেবজ্যোতির দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—এই কাট্‌লেটটা তুমি খাবে।

—বটে! এর জন্যে এতো কথার লেন্‌দেন—উঃ। তোমার জন্যে আর একটা আনাই তার আগে।

—তার দরকার নেই। এই তো আমার রয়েছে।

বলে মন্দাকিনী খুশিখুশি মুখে দেবজ্যোতির ভাত আর মাংসের প্লেট দুটো নিজের সামনে টেনে নিল। দেবজ্যোতি চম্‌কে মন্দাকিনীর হাত চেপে ধরল—না, না, মন্দা এ হয় না। আমার এঁটো—

মন্দাকিনী আরক্ত মুখে বল্‌ল—বা রে, তুমি ত সায় দিয়েছ। দোহাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি এতে বাধা দিয়ো না।

মন্দাকিনী বল্‌তে পারল না 'হাত ছেড়ে দাও'—জীবনে এই প্রথম মুহূর্ত যে স্মরণীয় ক্ষণে দেবজ্যোতি ওর হাত ধরেছে। মন্দাকিনী আবিষ্ট, মুগ্ধ, আত্মহারা—বাধার স্পর্শ এত মধুর তা কে জানতো!

দেবজ্যোতির চোখের সামনে যেন প্রলয়ের আয়োজন! তার শিক্ষিত,

মার্জিত মন কিছুতেই কল্পনা করতে পারে না, মন্দাকিনীর মত আধুনিক-আলোকপ্রাপ্ত মেয়ে কি করে আজকের দিনেও পুরনো কুসংস্কারের অন্ধ-আকর্ষণকে আঁকড়ে ধরতে চায়! কেন, কেন, কেন? মন্দাকিনীর আচরণে দেবজ্যোতি যতখানি বিস্মিত হয়, তার চেয়ে বেশী আহত হয়। তবু মন্দাকিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বাধার হস্ত অপসারিত করে নেয়।

একটা ভারি হাওয়া দেবজ্যোতির আশপাশের সবকিছুই বিষণ্ণ করে তোলে।

মন্দাকিনী কলহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে—আমাদের হোস্টেলের তুলনায় এখানকার অন্ন যেন রাজভোগ—একদানা কাঁকর পর্যন্ত নেই এতে! ও কী তুমি খাচ্ছ না যে!

দেবজ্যোতি গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—কি চাও তুমি মন্দাকিনী, স্পষ্ট করে বল্‌বে?

—আমি ত বলেই বসে আছি, তোমার শোনার সময় হচ্ছে কই! অথবা তুমি জেনেশুনেও বুঝতে চাইছ না।—না, না, সেকথা ঠিক নয়, সেটা আমারই ভাবনার ভুল।

কথাটা শোনবার পরও দেবজ্যোতি কোন সাড়া দিল না। মন্দাকিনী আবার শুরু করল—ছাখো, আমার রাস্তা ঠিক একইভাবে তোমার দিকে চলেছে। তুমি যতো দূরে সরিয়ে দিচ্ছ ততই যেন আমি বেপরোয়া হয়ে উঠছি। কিন্তু কেন এভাবে আমি এগিয়ে যাবো আর তুমি দূরেই সরে চল্‌বে? আর কত কাল চলবে?

দেবজ্যোতি যেন গভীর দৃষ্টি দিয়ে মন্দাকিনীর মনের কথা খুঁজছে; এমনি ভাবে তাকিয়ে, আস্তে আস্তে বল্‌ল—আমাকে যা হওয়াতে চাও আমি যে তা হবার মতো নই, একথাটা কেন বুঝছ না মন্দা! তোমাকে আমি ভালবাসি, এটুকু যেমন সত্যি—আমার জীবন আমার পথে চলুক সেটা চাওয়াও আমার কাছে তেমনি সত্যি। তোমার আদর্শবাদের সঙ্গে আমার জীবনপথ এক নয়—এটুকু বোঝো নি? আমি বাইরে থেকে মানিকপুরের ভেতরে ঢুকতে চাই আর তুমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাও—তফাৎটা কতো স্পষ্ট!

—কিন্তু কেন তা হবে ? যে হাওয়ায় বিষ আছে, সেই হাওয়ায় তুমি কেন শ্বাস নেবে ?

—সেটা ভাববার আগে, কেন নেবো না, বলো ! আমার মনে হয়েছে যে, বাইরের মানুষ হয়ে আমার দ্বারা মানিকপুরের কোন স্থায়ী মঙ্গল করা সম্ভবপর হবে না। কিন্তু—যদি আমি সেখানকারই একজন মানুষ হই তবে কিছু কাজের সুযোগ নিশ্চয় জুটবে।

—আরো স্পষ্ট করে বলো, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আমার নিজের কাছেও ছবিটা খুব বেশী স্পষ্ট নয়। তবে হাঁ, এটা ঠিক যে, বেশ বুঝতে পারছি—ওখানে অনেক বেশী স্বচ্ছন্দ হয়ে চল্‌তে পারি। ওখানকার সমস্যাকে আমি জানি—নিজের পরিবারকে দিয়েও জানি, আর নিজের জীবনের অনেকখানি দিয়ে মানিকপুরকে আমি চিনেছি, জেনেছি। আমার বিশ্বাস যে, ওখানকার কথা আমি যেমন বুঝি তেমন আর কোনো কিছু বুঝি না। জেলখানার দিনগুলোতে অনেক ভাববার অবকাশ পেয়েছি—সেই সময়ে পরিষ্কার মনে এই খবর পেয়েছি যে, কাছের মানুষগুলির সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের সঙ্গে, তাদের নিয়েই সত্যিকার কাজ হতে পারে। আমি ডাক্তার হতে পারব না, আমার সে মন আর নেই। আমি দেশের কাজ করতে পারব না—আদর্শবাদের বিরাটত্ব যেন আমার নাগালের বাইরে মনে হয়েছে ! দিন দিনই ওই মানিকপুরের অসহায় জীর্ণ-যন্ত্রণায় নিজেও জড়িয়ে পড়েছি। আমি বড় নই, আমি মহৎ নই, সাধারণ মানুষ মন্দা !

বল্‌তে বল্‌তে দেবজ্যোতি আত্মগত হয়ে পড়েছিল।

সহসা মন্দাকিনীর একটি কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে সে মানিকপুরে নেই। মন্দাকিনী বল্‌লে—নিজেকে নিয়ে এইভাবে চিরকালই এক্সপেরিমেণ্ট চালাবে ?

হাসলো দেবজ্যোতি—সে আমি কি ক'রে বলব ! যদি দরকার হয় তবে তাই হবে।

—না, তা হতে দেবো না আমি। তোমার এই জীবন নিয়ে খেলা নিয়ত চল্‌বে না।

—একে তুমি খেলা বলো? আমার কাছে যেটা সাধনা সেটা তোমার চোখে খেলা!

আবেগরুদ্ধ স্বরে মন্দাকিনী বল্‌ল—না, তা বলি নি। তোমার নাগাল ধরতে না দেওয়াকেই আমি খেলা বলছি।

—তুমি যে পথে চলেছ সে আমার অগম্য। আমি চাই আমার মানিকপুরের সমাজকে মানুষের আসনে বসাতে—তুমি চাও দেশকে স্বাধীন করতে। এই দুইয়ে ত বিরোধ নেই। তবু পথ এক নয়।

—তবু তোমাকে আমি পেতে চাই।

—অতোখানি ছোট হওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব মন্দা! তুমি ত পারবে না মানিকপুরে গিয়ে আমার পাশে কাজ করতে। সে জায়গার হাওয়া তোমার কাছে বিষ!

—তবে তুমি আমাকে গ্রহণ করবে না?

—আমার কিছু বলবার নেই—গ্রহণ-বর্জন সে ত তোমার হাতে। তবে মানিকপুর ছাড়তে বল্‌লে পারবো না।

করুণ আকুতিভরা দৃষ্টিতে দেবজ্যোতি তাকালো মন্দাকিনীর দিকে। তারপর সে বল্‌ল—আমাকে নিষ্ঠুর ভেবো না মন্দা! তোমার কথাও আমি জানি,—তোমার বাবার জীবনকে, কীর্তিকে তুমি ঘৃণা করো, সেইজন্যে মায়ের মায়া পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলে এই যে একলা চলার কঠিন সাধনায় ব্রতী হয়েছ তাকে আমি প্রণাম করি! সেইজন্যেই একথা বলা চলে না যে, চলো মানিকপুরে একসঙ্গে পাশাপাশি থেকে কাজ করি। তাছাড়া আমি যে পথ বেছে নিয়েছি তাতে আরামের কোনো আশা নেই। সভ্যতা সেখানে বিমুখ মন্দা! তবু সেখান থেকেই আমাকে শুরু করতে হয়েছে। আলো ফুটবে কি না জানি না—তবে আশা করি, সারা জীবনের শেষ তেলটুকু নিঃশেষ হবার আগে আরও অনেকগুলো প্রদীপ জ্বালিয়ে যেতে পারবো।

মন্দাকিনী দীর্ঘনিশ্বাস চাপতে চেষ্টা করল না। ওর দু-চোখে অশ্রুবন্যার আভাষ। তবু কাঁদবে না মন্দাকিনী—না দুর্বল নারী হ'তে ও চায় না। ও চায় না দয়িতের পায়ে পায়ে জড়িয়ে পথের বাধা হয়ে বেঁচে থাকতে।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—ওখানে অনেক কাজ মন্দাকিনী। কিন্তু কাজের মানুষ নেই—অথচ প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। একদিকে চরম উৎপীড়ন আর দিকে তেমনি অসাড়-অসহায় মানুষের একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া —তুমি সজ্ঞানে চোখের ওপর তা ঘট্‌তে দেখবে? অথচ এদের হাতেই নিজেদের বাঁচবার ক্ষমতা রয়েছে; শুধু অজ্ঞতা, মিথ্যে ভয় এদের পিছিয়ে রেখেছে।

—বুঝেছি।

—জানি তুমি বুঝবে। আমার ওপর অভিমান ক'র না মন্দাকিনী!

—অভিমান কোনদিনই তোমার ওপর ছিল না। তবে আশা ছিল একদিন আমার দাবি তুমি পূর্ণ কর্‌বে। জানো না তো কুমারী মেয়ের কী জ্বালা—পদে পদে তার কতো বিড়ম্বনা! পথে পথে তার বিপদের কাঁটা। তাই এক-এক সময় নিজের ওপর বিরক্তি এসে যায়। মনে হয়, যাদের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছি সেই সব পুরুষেরা মেয়েদের কী চোখে ছাখে। পুরুষ-জাতের ওপর ঘৃণা না এসে পারে না। ইচ্ছে করে সব ছেড়ে দিই। তখন একলা ঘরে লুটিয়ে পড়ে কাঁদি। তোমার কথা মনে পড়ে বার বার—তুমিও তো পুরুষ মানুষ। কিন্তু তোমার সঙ্গে এদের কতো তফাৎ! এই তফাৎটুকু যদি না থাকতো তবে হয়ত বিপদে পড়বার কথাই উঠতো না। সেই বিপন্ন অবস্থায় ইচ্ছে করে তোমার কাছে ছুটে গিয়ে বলি, আর পারছি না। নিজেকে আর আগলে রাখা আমার সাধ্য নয়। তোমার গচ্ছিত এই 'আমি'টুকুকে নিজের হাতে তুলে নিয়ে আমাকে রেহাই দাও! সত্যি জ্যোতিদাদা, সেই কবে একদিন তোমার সঙ্গে মোটর চালিয়ে কলকাতায় আসবার পথে তোমার কাছে আমাকে দিয়ে ফেলেছি, তারপর থেকে আমি যেন আর আমার খাশ-সম্পত্তি নেই, তোমার হয়ে গেছি! তা যদি না হতো তবে—।

কথা শেষ হবার আগেই মন্দাকিনী তাকালো দেবজ্যোতির দিকে। দেবজ্যোতিরও দু-চোখ অশ্রুসিক্ত। দেখে মন্দাকিনী আর সামলাতে পারে না। নিজেও কেঁদে ফেল্‌ল।

ওয়েটার বিল নিয়ে আসতেই দেবজ্যোতি সহজভাবে পকেট থেকে টাকা বার করল।

তারপর ওরা বাইরে বেরিয়ে এল।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—ক'টা বেজেছে ?

মন্দাকিনী হাসলো—রিস্টওয়াচটা অনেক কাল হলো বিক্রমপুরে চলে গেছে।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—হ্যাঁ, তোমার কাছে একটা কাজে এসেছিলাম, সেটা ভুলে বসে আছি।

—কি বলো! তোমার কাজ আমাকে দিয়ে হবে ?

সব শুনে মন্দাকিনী বল্‌ল—বেশ ত! তা আজ থেকেই যাওয়া যেতে পারে। গোলদীঘির ঘড়িটা দেখে নেওয়া যাক। আজ তুমি সঙ্গে থেকে গোবিন্দবাবুর বেড চিনিয়ে দাও।

ওরা কলেজ স্কোয়ারের একটা বেঞ্চে বসল—সাড়ে তিনটে বেজেছে। আর আধঘণ্টা পরেই মেডিক্যাল কলেজে ভিজিটিং আওয়ার্স শুরু।

গোলদীঘিটা যেন কলকাতা শহরের ব্যতিক্রম। পিছনে সংস্কৃত কলেজ আর হিন্দুস্কুলের গাছগুলো মাথা উঁচু করে ইমারতী সভ্যতাকে উপেক্ষা বিতরণ করছে। সামনের খোলা ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একদল লোক মাছকে ময়দা খাওয়াচ্ছে। এখানে ওখানে বিশ্রামরত মানুষ অলস-মন্থর সময়কে রোমন্থন করছে। এখানে কাজ নেই, কাজের তাড়া নেই। আশ্চর্য শান্ত, মৌন এক-খণ্ড পৃথক জগৎ এই রেলিং-এর গণ্ডিতে নিশ্চিন্ত মনে বসে রয়েছে।

এক সময়ে মন্দাকিনী বল্‌ল—তুমি ক'দিন থাকবে ?

—আমি ? কেন দরকার আছে কিছু ? আজই চলে যাবার কথা।

—তাই যাও।

—আর কিছু বল্‌বে ?

—না। আর কি বল্‌ব! এর পর কি করব বলো।

—যেমন চল্‌ছে চলুক মন্দা। তুমি যা ভাল বুঝবে করবে। লেখাপড়া শিখেছো, তোমার ব্যক্তিত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি।

—দোহাই তোমার, ওসব বলো না।

—তবে কি শুনতে চাও!

—কিছুই না। শুধু জেনে রাখো যে, আমি এমনি করেই তোমার জন্যে বসে থাকবো! ওই দেবদারু গাছটার যতো পাতা দেখছো ওর একটাও ছিল না, সব নতুন। আবার ওরা ঝরবে, আমি কমনরুমের জানলায় দাঁড়িয়ে দেখব। নতুন সবুজ রং নিয়ে আসবে—দেখবো। কত কালে এই দেখার শেষ হবে তা কে জানে!

দেবজ্যোতি চুপ করে শোনে—দমকা হাওয়ায় পশ্চিমের দেবদারুশীর্ষ দুলে উঠেছে। সেনেটের মাথার ওপর আকাশে বিচিত্র মেঘের সোনালী শোভা।

সে বল্‌ল—আমি আছি মন্দাকিনী। দূরে বসেও হয়তো কাজের ফাঁকে তোমাকে ভাববার জন্যে আমি থাকবো। কিন্তু জানি না আমাদের এই অস্তিত্বের কোনো স্বাক্ষর পৃথিবীর বুকে পড়বে কি না।

—আছো এই ত যথেষ্ট। সার্থকতার কথা আমি ভাবি না। যা শোনার জন্যে এতকাল সংগ্রাম করেছি, আজ সেই কথাটা তোমার মুখ থেকে পাবার পর আর কিছু ভাবনা নেই। আমি ঠিক থাকতে পারবো তোমার ডাক শোনার জন্যে।

উনষাট

কলকাতা থেকে ফিরেই দেবজ্যোতি বুঝলো—একটি দিনের অনুপস্থিতে বাড়ির হাওয়া রীতিমত ওলট-পালট হয়ে গেছে। আব্দুল শেখ নাকি সীতানাথের সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে গিয়েছে—'সাহেব নারাজ হয়েছেন।' অর্থাৎ মল্লিক সাহেব বিরক্ত হয়েছেন সীতানাথের উপর। তার কারণটুকুও আব্দুল জানাতে কসুর করে নি—সীতানাথের ঘরে বিভীষণের বাস!···দেবজ্যোতি কারখানায় ঢুকেছে, সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর করে। এভাবে একটা কুলী হয়ে কারখানায় দেবজ্যোতির মতো মানুষের ঢোকার অর্থ সুস্পষ্ট বই কি! সে একটা হাঙ্গামা পাকিয়ে তুলতে চায়। অবিশ্যি মল্লিক সাহেব কারুর মুখ চেয়ে চলবার মানুষ নন্—তবে সীতানাথের আখের বড় ভালো নয়, মাত্র এইটুকুই আব্দুল জানিয়ে দিয়ে খালাস, অনেক দিনের পুরণো দোস্তীর খাতিরেই নাকি আব্দুল এসেছিল। নইলে তারই বা কি গরজ!

কথাগুলো সেদিন রাতদুপুরে সীতানাথ দেবজ্যোতিকে শুনিয়ে দিলেন।

দেবজ্যোতি পরিশ্রান্ত। আজ শিউকিষেণ তাকে পুরোদমে খাটিয়ে মেরেছে। গতকাল বিনানোটিশে কামাই-এর দুনো উসুল আর কি। তা হোক সেজন্য দেবজ্যোতি বরং মনে মনে খুশী হয়েছে—সে সত্যকার শ্রমিক হতে পারবে, তার পরিচয় আজ সে দিতে ছাড়ে নি।

কিন্তু সীতানাথের এ আক্রমণের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না সে।

একটু উষ্ণভাবেই বল্ল পিতাকে—তা আপনার কি ইচ্ছে?

—আমার ইচ্ছের মুখ চেয়ে ত কখনো চলো নি, আজও চলবে না তা জানি; কিন্তু এভাবে চল্লে তুমিও মরবে, আমিও মরব। মল্লিক সাহেবের সঙ্গে টক্কর দেবার মত হিম্মত্ মানিকপুরে আজ পর্যন্ত কারুর ত হ'ল না।

—আমি ত সামান্য একটা কুলী, [illegible] সঙ্গে বড় সাহেবের বিরোধ কোথায়! তিনি হচ্ছেন সর্বময় কর্তা!

—ছাখ, বুড়ো বাবাকে গায়ত্রী শেখাতে আসিস নে দেবু। ঢের হয়েছে

বাবা, এবার আমাকে রেহাই দে। অন্য কিছু করতে পারিস ত কর—আর ধাষ্টামো ভালো লাগে না।

—অনেক কষ্টে একটা কাজ জুটিয়েছি, এটা আমি ছাড়তে পারব না।

—হুঁ, আগেই জানতাম, এই জবাব দেবে।

—আপনার অসুবিধে হয় বলুন অন্য জায়গা দেখি।

—এটাও পুরণো কাসুন্দি।

—তবে কি বল্‌তে চান, বুঝতে পারছি না।

—আমার আর বলা-কওয়ার কিছু নেই বাবা। মল্লিক সাহেবের কোপ ত আগেই পড়েছে, সেটা নতুন কিছু নয়। তবে আরও কি যে হবে এরপর জানি নে। তুমিও মানুষ হ'লে না, সেই কারখানার গরুই হ'লে—! যাক, সবই আমার কপাল। তাছাড়া আর কাকেই বা দুষবো,—মেয়ে মুখ হাসালো, জামাই হলো জোচ্চোর—আমার বংশের একমাত্র পিণ্ডাধিকারী পুত্র তুমি, তুমি কুলী হ'লে! এরপর ওই মল্লিক দু-ঘা জুতো মারলো কি লাথি মারলো, তাতে কতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে বাবা?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সীতানাথ বিড়ি ধরালেন। একটা টান দিয়ে চোখ বুজে আবার বল্‌তে শুরু করলেন—তুমি নিজেই ভেবে দেখ দেবু, আজ পর্যন্ত কোনো সাধই আমার মিটলো না। আগে ভাবতাম, পয়সা হলেই বুঝি দুঃখ ঘুচবে। ছুটলাম পয়সার পেছনে—আর সব তখন তলিয়ে গেলো। পয়সার মুখ দেখলাম —কিন্তু শান্তি এল না, তৃপ্তি হ'ল না। ছেলে, বৌ, মেয়ে, জামাই নিয়ে ভরা সংসারে হেসেখেলে দিন চল্‌বে, আশা ছিল, কিন্তু—।

দেবজ্যোতি সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে—শুধু ত আপনার একারই এ কথা নয় বাবা। গোটা মানিকপুরের সকলেরই ওই কথা। বিষম একটা অবস্থার মধ্যে কেউ সুখে থাকতে পারে না। সামঞ্জস্য না হলে শান্তি থাকতে পারে না। আপনি আক্ষেপ দিয়ে কিছু করতে পারেন না। তবে হ্যাঁ, যেটা স্বাভাবিক নয় তার স্থায়িত্বও নেই। সমাজ তাকে কিছুতেই টিকতে দেবে না।

সীতানাথ হাত নেড়ে বলেন—তোমার ওসব বড় বড় কথা বুঝিনে বাপু!

—বড় কথা মোটেই নয়। সাধারণ সত্য। আপনি দেখবেন, আবার

একটা গোলমাল আসছে শীগ্‌গির। কমিউনিস্টদের হাত থেকে ইউনিয়নের ভার চলে যাবে শ্রমিকদের কাছে। তখন—

—তখন কি হবে? কিছুই হবে না, যাদের হাতে যাবে তারা হয় নিজের সুবিধে গুছোবে, আর নয়ত শেষ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত হয়ে বিদেয় নেবে। এই ত হয়ে আসছে। ওসবে আমার ভরসা নেই। তার চেয়ে সোজাসুজি মল্লিক সাহেবকে ধরে ভালো চাকরী একটা আদায় করে এখনো যদি তুই বিয়ে থা করিস ত আমি শান্তিতে মরতে পারি।

—না বাবা, সে হয় না। মল্লিক সাহেব কেবলমাত্র তাঁবেদারদের সুখ-সুবিধে ছাখেন, তাও কোম্পানীর স্বার্থের জন্যে। তাঁবেদারীর পায়ে আমি মনুষ্যত্ব বিক্রী করতে রাজী নই। আপনি আমাকে ছেড়ে দিন।

—ছেড়ে দেবো? তারপর! না, না, সে হয় না দেবু। আর আমি কিছু ছাড়তে রাজী নই। যা হয় হোক। ভয়-ভরসা কিছুই রাখবো না। তুমি ওই মল্লিকার বিয়েটা দিয়ে ফ্যালো। ছোটটা যে কি মতলব আঁটছে কে জানে! ওর সঙ্গে কথা কইতে সাহস পাই নে। আর ছাখো, দীনুর মেয়েটি ত বেশ, অবিশ্যি স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ওরা নয়—তা আমি বলি কি, তাতে কি এসে যায়—মিণ্টুকে তোমার সঙ্গে বেমানান হবে না।

দেবজ্যোতি হাসলো—আমার বিয়ে? যে নিজের পায়ে এখনো দাঁড়াতে পারে না তার কি সেধে বোঝা ঘাড়ে নেওয়া মানায়?—না, সম্ভব?

—আমি ত মরে যাই নি রে। তোর বাপ কি ছেলে-বৌকে দু-মুঠো ভাত দিতে পারবে না?

—আপনি পারলেও ছেলের সেটা গ্রহণ করা সমীচীন নয়। বিয়ের কথা থাক বাবা। বাকী কাজগুলো আমি করবো। আচ্ছা, ভালো কথা, আপনার সেই বকুলপুরের বাড়ি মেরামতের কি হলো—বলুন তো!

—আর ব'ল না, শালারা ভাড়া মেরে দিয়ে পালিয়েছে। অবিশ্যি এবার আমি সেয়ানা হয়ে গিয়েছি—চার মাসের ভাড়ার টাকা এ্যাডভান্স নিয়ে তবে ভাড়াটে বসিয়েছি।

—মেরামতের কি করলেন?

—ক্ষেপেছ, যারা থাকবে তারা মেরামত করুক, না পারে চলে যাক। এক জন গেলে দশজন এসে সাধবে, ভাড়াটের আবার অভাব! হুঁঃ।

এইভাবে বিয়ের প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেল। সীতানাথ বিষয়-সম্পত্তির স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেলেন। সেই অবসরে দেবজ্যোতি নিজের ঘরে চলে গেল।

দেবিকার ঘরে তখনো আলো জ্বল্‌ছে। দেবজ্যোতি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখল মল্লিকা ঘুমিয়ে পড়েছে। আর দেবিকা মেঝেতে বসে খবরের কাগজের উপর বড় বড় হরপে কলমের উল্টো পিঠ দিয়ে লাল কালীতে ইস্তাহার লিখছে।

ছোট বোনের পাশে উপু হয়ে বসে দেবজ্যোতি প্রশ্ন করল—কি করছিস?

চম্‌কে উঠ্‌ল দেবিকা, তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বল্‌ল—দেখতেই ত পাচ্ছ! পোস্টার লিখছি।

—কিসের পোস্টার দেবি!

—এ সব আমাদের পার্টির ব্যাপার, তোমার অতো মাথা না ঘামালেও চল্‌বে।

—ও। তা মাথা ঘামাই যদি তাতে কোনো ক্ষতি আছে তোর?

—আছে বই কি। যাও, কাজের সময় বিরক্ত ক'র না।

—বিরক্ত না হলেই ত ল্যাঠা চুকে যায়। অতো চট্‌ছিস কেন তুই?

এবার দেবিকা উঠে দাঁড়ালো, দেবজ্যোতির মুখের সামনে হাত নেড়ে বল্‌ল—কি চাও বলো তো। শান্তিতে একটু কাজ করব—তোমাদের জন্যে তাও হবে না?

বোনের এই অস্বাভাবিক আচরণে দেবজ্যোতি একটুও রাগ করল না হাসতে হাসতে বল্‌ল—এই মেজাজ নিয়ে তুই জনগণের সঙ্গে চল্‌বি কি করে বল্‌তো!

—সে কৈফিয়ৎ অন্ততঃ তোমাকে দেবো না।

—আমাকে দিতে হবে না, যাদের কাছে দেবার দরকার তাদের কাছে দিতে পারিস ত বুঝবো। যাক, যা করছিলি করে যা—আমি চলি।

দেবিকার প্রকৃতিতে ইদানীং উগ্রতা প্রকট হয়ে উঠছে। দেবজ্যোতি সেটা বেশ লক্ষ্য করে। তবে, সেজন্য বিচলিত হয়নি সে। আর পাঁচটা মেয়ের চেয়ে ও যে স্বতন্ত্র, এইটাই তাকে সান্ত্বনা দেয়।

ষাট

পরিশ্রান্ত দেবজ্যোতি কারখানার তিন নম্বর গেট দিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ল। তার আগে আগে কয়েকজন শ্রমিক চলেছে। ওরা মানিকপুরের বাইরে কোনো গাঁয়ে থাকে—হয়ত বকুলপুর, কিম্বা রাঙামাটি। নইলে এ পথে কোনো শ্রমিকের চল্‌বার কথা নয়। কুলী লাইনের বাসিন্দাদের সোজা রাস্তা এক নম্বর গেট—যার সাম্‌নে থেকে বাজার এলাকা শুরু হয়েছে। তিন নম্বর গেট হচ্ছে সাহেবসুবোদের গাড়ীর রাস্তা। গেট থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা পার হ'লেই পার্ক এভেন্যু, পার্ক কর্ণার, পার্ক রেঞ্জ, দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসারদের বাগান বাগিচায় ঘেরা আবাসকুঞ্জ।

স্তব্ধ জনবিরল এই গাছে-ছাওয়া শান্ত পথ দিয়ে দেবজ্যোতির চল্‌তে বড় ভালো লাগে। রোজ যেমন যায়, আজও তেমনি এক ছন্দে হাঁটছে আর মাঝে মাঝে ওপর দিকে তাকাচ্ছে। কদমফুলের গন্ধে পথের বাতাস মনের কোন তন্ত্রীতে যেন খুশীর তান তুলেছে! পথের পাশে পাশে বিজলী আলো, তা দিয়ে গাছের ডাল-ফুল কিছুই ভালো করে দেখা যায় না। তবু দেবজ্যোতি ওপর দিকে না তাকিয়ে পারে না। ওখানে পাতার আড়ালে ফুলগুলো রয়েছে, এ খবর সে যে জানে।

পথটা আচমকা ধাক্কা খেয়ে যেন উদ্ভ্রান্ত হয়ে ওঠে—একখানা মোটরবাইক আসছে, তারই গর্জন। এক পাশ দিয়েই যাচ্ছিল দেবজ্যোতি, তবু নিজের অজ্ঞাতেই আরও ধারে সরে দাঁড়ালো। সে মনে মনে কারখানার ভেতরের ছবিই দেখছে—তিনটে মেশিন শপ, ইলেক্‌ট্রিক্যাল, লোকোমোটিভ সব ডিপার্টমেণ্টেই অসন্তোষের উত্তাপ দিনদিন বেড়ে চলেছে। কথায় কথায় আজকাল ওপরওয়ালাকে কথা শুনিয়ে দেয় মজুরেরা। মজুর মানে কি, যারা কম মাইনে পায়, তারা সকলেই—ফোরম্যান-ইঞ্জিনিয়ারদের ওপরেই তাদের যত আক্রোশ। এই ত আজকেই, জিলানীর মতো ছোক্‌রা যে কাণ্ড করল তা কেউ কল্পনাই করতে পারে নি। ফোরম্যান তাকে কাজের হিসেব চেয়েছিল

মুখের ওপর জবাব দিল, হিসেব আবার কী! কোম্পানী যা মজুরী দেয় তাতে কাজ ত করা চলে না, বেগার খাটার মতো খেটে দিচ্ছি এই ঢের।

ডাক পড়ল ইঞ্জিনিয়ারের ঘরে—ইঞ্জিনিয়ার অবিনাশ চাটুয্যে! জিলানী নাকি সেখানেও ওই জবাবই দিয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার হুম্‌কী দিয়েছেন—চার্জশীট আসবে। তারও জবাব জিলানী দিয়েছে—চারশ বিশীয়াদের চোখ রাঙানীকে লেবার পরোয়া করে না। যদি জানের মায়া থাকে, তবে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যেন বেশি 'ট্যাঁ ফোঁ' না করেন! কথাটা কারখানাময় চাউর হয়ে গেছে। এমনই চাউর হয়েছে যে, শিফ্‌ট ডিউটির লোকেরা পর্যন্ত জেনেছে। জিলানী হচ্ছে জেনারেল ডিউটির লোক, তাদের সঙ্গে বিকেলের শিফ্‌টের লোকেদের কোনোই সম্পর্ক নেই। তবু এসব খবরের নাকি হাওয়াতে উড়ে বেড়াবার ক্ষমতা আছে!

ভাবছিল দেবজ্যোতি—ওভারটাইমের কড়িতে টান পড়েছে। জিনিস-পত্রের দাম দিনদিন আরও বেড়ে চলেছে। কারখানা থেকে ২।৪টি করে টেম্পোরারি লোককে কায়দা করে চার্জশীট দিয়ে দিয়ে শেষে ডিস্‌চার্জ করা হচ্ছে। এসব ফন্দী এখন লেবারমহলের নজরে পড়েছে। তবু কেন শ্রমিক ইউনিয়ন নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা ছেড়ে প্রতিবাদ করছে না? একেবারে প্রতিবাদ যে করছে না, তা নয়—কোম্পানীর দরবারে লেখালিখি করছে, কিন্তু তাতে প্রত্যক্ষ কোনো ফল ত দেখা যাচ্ছে না!

না, এভাবে হাত গুটিয়ে চল্‌লে কাজ এগোবে না। বর্তমান ইউনিয়নের কর্মধারার ওপর দেবজ্যোতির আস্থা নেই। যুদ্ধের সময় সে যদি ছাত্র-আন্দোলনের প্রবাহে জেলে না যেত তাহলে নিশ্চয় মানিকপুরের শ্রমিক-আন্দোলনকে অন্যধারায় টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করত। আজও মনে হচ্ছে যেন সে সময় চলে যায় নি। অবিলম্বে একটা উলটো ধাক্কা না দিলে, কোম্পানীর অমোঘ আঘাতে শ্রমিকরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। আর হয়তো মাস ছয়েকের মধ্যেই একটা পাইকারী ছাঁটাই-এর ঢেউ আসবে। যুদ্ধের চাহিদা মিটে গেছে। বাইরের বাজার খুব মন্দা হয়ে আসছে। এখন যদি কর্তৃপক্ষ ব্যয়-সংকোচ না করে তাহলে তাদের লাভের অঙ্ক শীর্ণ হয়ে পড়বে। সেদিকে নজর ওরা

ঠিকই রেখেছে। তবে সুবর্ণসুযোগের প্রতীক্ষায় আছে।…অতএব ধাক্কাটা শ্রমিকদের তরফ থেকেই আগে আসা দরকার। কিন্তু সেই সংকল্প গ্রহণের আগে অত্যন্ত সতর্ক হ'তে হবে, নতুবা শ্রমিকদের আন্দোলনকেই ছাঁটাই-এর অস্ত্ররূপে ব্যবহার করবে কোম্পানী। দেবজ্যোতির পা পথ চল্‌ছে, আর মন চল্‌ছে কারখানার মধ্যে।

মোটরবাইকটা হঠাৎ থেমে গেল।

যতক্ষণ শব্দ হচ্ছিল ততক্ষণ দেবজ্যোতির চিন্তায় কোনো ব্যাঘাত হয় নি, কিন্তু হঠাৎ মোটরসাইকলটার বিরক্তিকর শব্দটুকু থেমে যেতে সে মুখ তুলে তাকালো। একটি সাহেব পথের পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে বাইকের গায়ে ঠেস দিয়ে।

দেবজ্যোতি কাছাকাছি এসে পড়তেই সাহেবটি তার দিকে এগিয়ে এল। আরও কাছে পৌছে দেবজ্যোতি নিজের ভুল ধরতে পারে, নিখুঁত সাহেবী কায়দায় অবিনাশ চাটুয্যে! অবিনাশই নমস্কার করল—ভালো আছেন?

দেবজ্যোতি বিস্মিত হ'লেও প্রতিনমস্কার করতে ভোলে না। সে বল্‌ল—আরে আপনি! তারপর? এটাই বুঝি আপনার বাংলো?

—না, আমি থাকি ফার্ণ রো-তে! আপনারই খোঁজে বেরিয়েছি।

দেবজ্যোতি আকাশ-পাতাল ভেবে হদিস করতে পারে না, তাকে হঠাৎ অবিনাশের কি প্রয়োজন হ'ল! সে হাসিমুখেই বল্‌ল—দেখুন, দুপুর রাতে কারখানার ডিউটি বাজিয়ে ঠিক রসিকতা বোঝার মতো মেজাজ থাকে না!

অবিনাশ আঁধার মুখে আস্তে আস্তে বল্‌ল—প্রাণের দায় না হলে আমিই কি এই সময়ে আপনাকে ঘাঁটাতে আসি! দেবুবাবু, আপনি বয়েসে আমার ছোটো ভাইয়ের মতো কিন্তু মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে আপনি অনেক বড়।

—তাই নাকি?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেবজ্যোতির কণ্ঠে শ্লেষের সুর ফুটে ওঠে। কিন্তু অবিনাশের মুখের ওপর নজর পড়তে সে নিজের আচরণে লজ্জিত হ'ল, বলল—কিছু মনে করবেন না দাদা, আপনাদের মতো ওপরওয়ালা যদি এরকম তোষামোদের কথা বলেন ত ভয় হয়, বুঝি চাকরীতে ঘুন ধরেছে!

অবিনাশ গম্ভীর, বোধ করি হাসবার মতো অবস্থা তার নেই। সে বল্‌ল —ভাই, আপনি আমাকে বাঁচান।

দেবজ্যোতি সরাসরি প্রশ্ন করে—কি হয়েছে বলুন তো?

—আপনি শোনেন নি কিছু? জিলানীর ব্যাপার—না, না, জেনেশুনে লুকোবেন না ভাই।

—হ্যাঁ শুনেছি। কিন্তু আমি কি করতে পারি, বুঝিয়ে বলুন।

—আপনি সব পারেন। কারখানাতে আমার বন্ধু বল্‌তে যাদের চিনি, তারা ভেতরে ভেতরে আমায় এক কোপে কাটতে পারলে দু-চোপ্ খরচ করবে না।

—অবিনাশবাবু! আমি সাধারণ একজন মজুর, মাত্র দেড় টাকা রোজ পাই। জিলানী আমাকে পাত্তা দেবে কেন? আপনি ভুল করেছেন। তাছাড়া, বলেছে বলেই যে, ও সত্যি একটা কিছু করবে এমন কোনো মানে নেই।

—খুব মানে আছে। আমি সব খবর পেয়েছি মশাই। মাথা গরম ক'রে ত চার্জশীট্ ঠুকে দিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসলাম। এখন আপনি বাঁচালে বাঁচি, নইলে লেড়েটা আমাকে সাব্‌ড়ে দেবে। আপনি ত জানেন না ও হচ্ছে খাক্‌শারের একটা খুদে সর্দার।

অবিনাশের মুখখানা ফ্যাকাশে দেখায় ভয়ে, আতঙ্কে।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—আমার সঙ্গে ওর তেমন আলাপও নেই যে!

অবিনাশ এবার হেসে জবাব দেয়—তেমন আলাপের দরকার নেই! মশাই আপনি এখনো টের পাননি, লেবারমহলে দেবজ্যোতি মুখুয্যে এরই মধ্যে কী প্রেষ্টিজ কিনে নিয়েছে! হাতী ত নিজেকে দেখতে পায় না! সে যাক, এখুনি তোষামোদ সমঝাবেন! আমি বলি কি, জিলানীকে গিয়ে আপনি একবার বারণ করে দিলেই হবে, আর কিছু করতে হবে না।

—বেশ, আপনার যদি সেই বিশ্বাসই হয়ে থাকে ত তাই ক ব। কিন্তু ফলাফল কি হবে, বলা আমার সাধ্যি নয়।

অবিনাশ গদগদ হয়ে বলে—ব্যস-ব্যস! তাহলে উঠে পড়ুন।

—উঠে পড়ব? মানে?

—হ্যাঁ, আমার কেরিয়ারে করে এখুনি নিয়ে যাবো। তারপর আবার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তবে আমার ছুটি।

—কোথায় নিয়ে যাবেন?

—কেন, জিলানীদের বস্তীতে।

—অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? কালই আমি ওকে বলে দেবো।

—দোহাই ভাই, কাল নয়—আমি বলি কি এখুনি চলুন। কোন চিন্তা করবেন না, আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবো, বল্‌ছি ত!

—চলুন।

দেবজ্যোতি মনে মনে বিরক্ত হয়। কিন্তু অবিনাশের দুরবস্থা দেখে আর কোনো আপত্তি করতে ইচ্ছে হ'ল না। মোটর বাইক স্টার্ট দেবার পর অবিনাশ নিজেই বল্‌ল—আমি কালই চার্জশীট উইথড্র করব। ওকে বলে দেবেন।

সাঁইসাঁই করে গাছগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে। পথ যেন ফুরিয়ে যাবার জন্য দৌড়ে আসছে! আলোর পোষ্টগুলো লুকোচুরি খেলার মত একটার পর একটা সরে সরে যাচ্ছে! কোথায় জিলানীদের বস্তী দেবজ্যোতি চেনে না। সে ভাবছে, অবিনাশ এসব খোঁজ-খবর রাখে কি করে? দুপুর রাতে দেবজ্যোতি কোন্ পথে বাড়ি ফেরে, জিলানীর মতো আড়াইটাকা রোজের আর্মেচার ওয়াইণ্ডার কোন্ বস্তীতে থাকে, তার গতিবিধি কি সবই অবিনাশ জানে! অবাক হয়ে যায় দেবজ্যোতি। আরও একটা কথা তাকে উত্তেজিত করেছে—লেবার মহলে দেবজ্যোতি মুখুয্যের প্রতিপত্তি! অথচ দেবজ্যোতি ত তেমন কিছুই করে নি। বক্তৃতা সে দেয় না, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ঘাড় ঘষাঘষি করে না। শুধু নিজের কাজ করে যায়। আর যদি কেউ পরামর্শ চায় তাকে পরামর্শ দেয়! যদি কেউ আলোচনা করতে আসে, তার সঙ্গে শ্রমিকদের অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করে। সেরকম কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি ত—যার জন্য শ্রমিকমহলে সে সুপরিচিত হয়ে পড়তে পারে। অবশ্য শিউকিষেণ, কিম্বা মিশ্রীলাল অথবা ওদের ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা দেবজ্যোতির সঙ্গে আজকাল খুব অন্তরঙ্গ ব্যবহার করে। অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টের আধা-কর্তা শ্রমিকদের সঙ্গেও

দেবজ্যোতির আলাপ-পরিচয় ঘটেছে। ফোরম্যান্, অ্যাসিস্টাণ্ট-ফোরম্যানদের মিলিত একটা চায়ের আড্ডা আছে, দেবজ্যোতিকে ওরা সেখানে প্রায়ই জোর করে ধরে নিয়ে যায়।

একসময়ে মোটর বাইক থাম্‌লো। বিরাট প্রাচীন বটগাছের নীচে ওরা নামলো। গাছের পাশে গাড়িটা রেখে অবিনাশ চাপা গলায় বল্‌ল—আপনাকে দূর থেকে ওদের ঘর চিনিয়ে দিয়ে আমি এখানে অপেক্ষা করব। আপনি কাজ সেরে আসবেন, এঁ্যা! দেখবেন ভাই, ও শালা হারামী যেন টের না পায়!

দেবজ্যোতি বল্‌ল—আপনি বরং ফিরে চলে যান, হেঁটে ফিরতে আমার কষ্ট হবে না।

কি ভেবে অবিনাশ হাসলো—না, না, সেকথা নয়, আপনি থাকতে ওরা আমাকে কিছু বলবে না। আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে বেশ থাকবো।

দেবজ্যোতিকে বস্তীর ঘর চিনিয়ে দিয়ে এসে অশথতলায় দাঁড়িয়ে অবিনাশের কিরকম গা-ছমছম করতে থাকে! এ গাছটাকে আজও সবাই প্রণাম করে—এখানে নাকি এককালে ডাকাতেরা কালীপূজা করত অমাবস্যায়, নরবলি হ'ত! গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড এখান থেকে একখানা মাঠ পেরুলেই! ঠ্যাঙ্গ্যাড়েরা লুঠপাট করে এই গাছতলায় ভাগ-বাঁটোয়ারা করত। অবিনাশের মনে পড়ে, প্রথম সে যখন মানিকপুরে এসেছিল সে আমলেও রাত-বিরেতে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে প্রায়ই রাহাজানী হতো! মুখে মুখে আজও খুনে-অশথতলার বস্তী ব'লে এ অঞ্চলটা পরিচিত—যদিও ভরতপুর গ্রামেরই প্রান্তদেশ এটা। মুসলমানেরা বলে পাগলাবিবির থান। কোন্ মুসলমান জমিদারের সুন্দরী যুবতী স্ত্রী এই গাছে কোন্ দুঃখে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছিল কে জানে! একা একা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অবিনাশের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ওদিকে তার স্ত্রী এতক্ষণে রেগে বারুদ হয়ে উঠেছে। হয়তো প্রথমে দরজাই খুলে দেবে না। এত রাত ক'রে বাড়ি ফেরার স্বাভাবিক কারণটুকু সহজেই অনুমান করে নিয়েছে অবিনাশের স্ত্রী। সে যা-ই অনুমান করুক, আসল সত্যটা ত স্ত্রীর কাছে বলা চলে না। তাতে আরও ছোট হতে হয়—তার চেয়ে মিথ্যা কলঙ্ক শ্রেয়।

কতক্ষণ যে এইভাবে কেটেছে অবিনাশ বুঝতে পারে না।

ছায়ামূর্ত্তি দেখে সে বুঝতে পারে, দেবজ্যোতি ফিরছে।

দেবজ্যোতি একা নয়, সঙ্গে আরও একজন রয়েছে। সর্বনাশ, জিলানী নয় ত? আজ এই অশ্বত্থতলাতেই জিলানী জুৎসই জবাবটা দিয়ে দেবে নাকি! পালালে কেমন হয়! নিমেষের মধ্যে অবিনাশ সবদিক চিন্তা করে নিল—না, পালিয়ে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে দেখাই যাক কি হয়! দেবজ্যোতিকে সে চিন্‌তে ভুল করে নি—ওরকম খাঁটি মানুষ খুব কমই দেখেছে অবিনাশ। অবশ্য, দেবজ্যোতির মত নিষ্ঠাবান মানুষকে সে বোকার দলে ফ্যালে। মিছেমিছি পরের ঝামেলা বইবার জন্যই ওদের জন্ম। নিজের সুখটুকু বিলিয়ে দিয়ে এইভাবে পরের জন্যে মাথা ঘামানোর কি যে সার্থকতা, তা ওরাই জানে! মনে মনে সে হেসে নিল।

যা ভেবেছে অবিনাশ, ঠিক তাই—জিলানীই বটে!

সে এসে অবিনাশকে একটা সেলাম করল, তারপর বল্‌ল—সাহেব আমার কসুর মাফ করবেন। আমার মতো পয়জারকা মাফিক আদমী আপনাকে এত তকলিফ দিল—হায়-হায়, খোদা আমাকে মাফ করবে না। ছি-ছি! হুজুর গোসা করবেন না। আর এই মুখার্জী দাদাকেও ডিউটির পর এতো তকলিফ্‌ দিলাম—কী যে হবে! ইব্‌লিশ আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে!

অবিনাশের দিকে তাকিয়ে দেবজ্যোতি বল্‌ল—আমি কিছুতেই সঙ্গে আনতে চাই নি। কিন্তু কে কার কথা শোনে! ও বলে কি জানেন, এত রাতে আর ঘরে গিয়ে কাজ নেই, থাকুন! যখন তাতে রাজী হলাম না, তখন সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে দেবেই। শেষে নিরুপায় হয়ে বল্‌লাম, আপনি সঙ্গে আছেন। আর যায় কোথায়—কেঁদে ফেল্‌ল। রাগের মাথায় কি যে করেছে, সেজন্যে বেচারীর মনস্তাপের শেষ নেই।

ব্যাপারটা যে এরকম ভাবে মিটে যাবে অবিনাশ ভাবতেই পারেনি।

জিলানী হাত জোড় ক'রে বল্‌ল—আপনারা একদিন গরীবখানায় পয়জারের ধুলো না দিলে আমি মরে যাবো দাদা! আসবেন কথা দিয়ে যান, নইলে আমি এই চাকার তলায় শুয়ে পড়ব।

অবিনাশ হেসে বল্‌ল—আচ্ছা—আচ্ছা তাই হবে। আসবো!

দেবজ্যোতির কোয়ার্টারে পৌঁছতে রাত বারটা বেজে গেল। দেবিকার ঘরে তখনো আলো জ্বলছিল।

দেবিকাই দরজা খুলে দিল। গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করল—ওভারটাইম ছিল বুঝি?

—না, অন্য কাজ ছিল। মল্লি কোথায়?

—ঘুমোচ্ছে।

—তুই কি এখনো তোর পার্টির কাজ করছিলি?

—হ্যাঁ। তোমার খাবার ওঘরে ঢাকা রয়েছে।

—ও। তোর খাওয়া হয়েছে ত?

—হয়েছে।

—তবে, যা।

বলে দেবজ্যোতি নিজের ঘরে ঢুকে ঘামেভেজা কারখানার সাজ খুলতে লাগলো।

পরদিন সকালে উঠে দরজা খুলতেই মল্লিকা ঢুকে পড়ে হৈ-চৈ সুরু করে দিল—যা ভেবেছি ঠিক তাই! রাজকুমারী দয়া করে আমাকে একবার ডেকে দেবেন, তা সে উপকারটুকুও ওকে দিয়ে হবে না!

দেবজ্যোতি ঘুম-চোখ রগ্ড়াতে রগ্ড়াতে বল্ল—কি হ'ল রে সাত-সকালে এত হামলা জুড়লি কেন?

—কেন আবার, তোমরা দুই ভাইবোন মিলে আমাকে পাগল করে ছাড়বে! আচ্ছা, দাদা, এটা কি ভালো হচ্ছে?

—কি আবার হলো?

—রাত্রের খাবার যেমন ঢাকা ছিল তেমনি পড়ে রয়েছে? গোটা রাত দাঁতে দড়ি দিয়ে কাটালে!

—না রে ক্ষিদে ছিল না। এক জায়গায় খুব খাইয়ে দিল কিনা।

—থাক ওসব দিয়ে আর আমাকে ভোলাতে হবে না। দেবী হতচ্ছাড়ীর চুলের মুঠি ধরে ঘা কতক বসালে তবে যদি আমার মনের রাগ মেটে।

দিনদিনই ওর রীত-চরিত্তির অমানুষের মত হয়ে উঠ্‌ছে। তোমরাও কিছু বলো না!

দেবিকার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। ওর এই ধরণের নির্বিকার উপেক্ষা মল্লিকাকে আরও বিদ্বিষ্ট করে তোলে।

দেবজ্যোতি হাসতে হাসতে বল্‌ল—বাবা, আর এই ত ক'টা দিন, তারপর তোকে আর জলতে হবে না। এবার আর দিন পাল্টাবে না, তোর শাশুড়ীও এসে গেলেন ব'লে, শ্রাবণের পাঁচ তারিখ পাকাপাকি হয়েছে রে!

একথায় মল্লিকার মুখ থমে-থমে। দুঃখে কিছু বল্‌ল না মল্লিকা। বাসি বাসনগুলো তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

টেবিল থেকে দাঁতনকাঠি নিতে গিয়ে দেবজ্যোতি দেখল একখানা খাম। কাল রাতে এসব দিকে নজর দেবার মত অবস্থা ছিল না তার, নইলে কালই দেখতে পেত। শিরোনামের হস্তাক্ষর অত্যন্ত পরিচিত—মন্দাকিনীরই চিঠি। খামখানা হাতে তুলতে গিয়ে তার নীচে আরও একখানি খাম দেখা গেল। শাদা খামের ওপর দেবজ্যোতির নাম লেখা। কোন ডাক টিকিট নেই।

প্রথম খামখানা রেখে দিয়ে দেবজ্যোতি দ্বিতীয় খামটিই হাতে নিল। কার চিঠি?

একত্রিশ

কতক্ষণ এইভাবে কেটেছে সীতানাথের হুঁশ নেই। কল্কের ওপর পুড়ে পুড়ে তামাক-টিকে ছাই হয়ে গেছে, তাও তিনি খেয়াল করেন নি। বাইরে থেকে সদর দরজাটা খোলার শব্দ হতে তিনি ধীরে ধীরে উঠে গেলেন—কি হ'ল দেবু ?

দেবজ্যোতি নয়, অবিনাশ বাড়িতে ঢুকেছে, সে বল্ল—কী যে হ'ল কিছুই ত বোঝা যাচ্ছে না ! দেবু ভায়ার মুখে সব শুনেছি—কিন্তু কোথায় খোঁজ করি বলুন তো !

সীতানাথ অবিনাশকে দেখেই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন, মনে মনে তার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে কঠিন কথা শোনাবার সংকল্প করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তার কথাবার্তা শুনে তিনি যেন অকূল পাথারে পড়লেন—সে কি অবিনাশ, তোমার ওখানে যায় নি সে বাঁদ্‌রী ?

—আজ্ঞে, আমাকে এতদিনেও চিনলেন না, এ দুঃখ রাখি কোথায় ! যাক গে, এখন ত অভিমানের সময় নয়। দেবু ভায়াই কি প্রথমে বিশ্বাস করতে চায় ? তাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে সব জায়গা দেখালাম। তাছাড়া আমি ত পাগল হইনি ! যার সঙ্গে বিয়ের ঠিক-ঠাক, তাকে নিয়ে লুকোচুরি করব, কি গরজ বলুন দাদা।—না কি বলুন না আপনি।

—তা নয় বুঝলাম, কিন্তু তাহলে মেয়েটা গেলই বা কোথায় ? শেষে দামোদরে ডুবে মরতে যায় নি ত ?

—দেবুও সেইরকমই বলছিল, আমার সাইকেল নিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছে। কতো করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম—কিন্তু জানেন ত তাকে। বলে কি, বাজে বকে সময় নষ্ট করা যায় না, মেয়েটা হয়তো বেঁচে যেতে পারে দু'মিনিট আগে পৌছলে। যাক, দেখুক !

—দেবু এই ভরা অমাবস্যায় অশৌচ গায়ে শ্মশানঘাটে গেল ? যাক—যাক —সব যাক, মরুক ঝরুক—আমার আর কি ! অবিনাশ—

এই বলে সীতানাথ হাসিমুখে তাকালেন সাম্‌নের দিকে। হাসিটা যেন পাথরের চোখের মতো নিষ্প্রাণ কিন্তু ভয়াবহ! অবিনাশ সাড়া দিল একটু পরে।

—আজ্ঞে!

—তুমি আর এখানে কেন? তুমিও চলে যাও।

—আজ্ঞে, আপনি রাগ করছেন আমার ওপর।

—না হে, তোমার ওপর কেন, দুনিয়ার কারুর ওপরই রাগ নেই আমার। তবে কি জানো, মুকুল অনেক কষ্ট পেয়েছে অবিনাশ। ছেলেবেলায় মেয়েটা শুধু জঞ্জালের মতো অচ্ছেদ্দায় মানুষ হয়েছে। সে সব দিনের কথা ত ভুলতে পারি না—এই মানিকপুরে তরকারী বল্‌তে তখন আলু আর মানুষ বল্‌তে বোম্বেটের দল। আট আনা রোজের মিস্ত্রির ছেলেমেয়েকে দুধ খাওয়ানো দূরের কথা, দুমুঠো ভাত জোটাতে পারলেই ঢের হ'ল। সকাল-সন্ধ্যে ক্ষিদেয় ওরা কান্নাকাটি করলে, বরাদ্দ ছিল ভাতের ফ্যান, অপছন্দ হ'লে ঠ্যাঙ্গানী। তবু মেয়েটার প্রমায়ু অক্ষয়, শেয়ালে টেনে নিয়ে গেছে, জোঁকে জোঁকে ছেঁকে ধরেছে—ম্যালেরিয়ায় মরো মরো হয়েছে। কিন্তু ঠিক বেঁচে উঠেছে। হাসি-খুশী আর ওর মুখ থেকে ঘোচে না। ওর মা, শুধু মা-ই বা বলি কেন, আমি নিজেও—দেবুকে নিয়েই আহ্লাদ করতাম আমরা। মেয়েটা যেন বালাই! সেই বালাই আজ বুঝি বিদেয় হ'ল! আহা বেচারী বড় কষ্টই পেয়ে, অনেক দুঃখে জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে শেষে বুঝি মায়ের কাছেই গেল! তা যাক, এখন ত তার মায়েরও হাতে কাজ নেই, ন্যাওটো মেয়েকে আদর করবার ফুরসুৎ পাবে। আমার এই পোড়া সংসার চুলোয় পড়ুক, তাতে ওদের কার কী বলো!

অবিনাশ কাঠের মতো দাঁড়িয়ে ছিল, প্রৌঢ়ের এই কথাগুলো তাকে যেন অস্থির করে তুল্‌ল, কিন্তু কি যে বলবে সে ভেবে উঠ্‌তে পারে না। সীতানাথের কাছে গিয়ে ধরা গলায় সে বল্‌ল—অত উতলা হবেন না। দেবু ত সাইকেলে রওয়ানা হয়েছে। দামোদরে হেঁটে যাওয়া ত সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার, আর এই আঁধার রাত, একলা মেয়েমানুষের সাহসে কুলোবে না শ্মশানে যেতে—পথেই পেয়ে যাবে ওকে।

—ও মেয়ের সাহস জানতে বাকী নেই। কিন্তু অবিনাশ, কোন্ দুঃখে ও এমন পণ করল? এতবড় একটা কেলেঙ্কারী করল এই বাড়িতে বসে, তবু ত কেউ ওকে গঞ্জনা দেয় নি! এই আমার মতো একগুঁয়ে গোঁয়ার মানুষও ত একটি কথা বলে নি! কপালকে মেনে নিয়ে ভেবেছিলাম, ভালোয় ভালোয় তোমাদের চারহাত একঠাঁই করে দেবো!

—আপনি কিছু ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন শুয়ে পড়ুন।

দেবজ্যোতি ফিরল পরদিন সকালে। তার দিকে চাওয়া যায় না এমনই চেহারা হয়েছে। মুকুলের কোনো খোঁজ সে পায় নি। থানাতে পর্যন্ত খোঁজ করেছে। তবে দামোদরের দিকে যে মুকুল যায় নি সে সম্বন্ধে দেবজ্যোতি সুনিশ্চিত। ইদানীং দামোদরের পথে অনেক জায়গায় পুলিশ পাহারা বসেছে সামরিক কারণে। তারা সবাই বলেছে যে, গত রাত্রে কোনো মেয়েকেই ও পথে যেতে দেখা যায় নি। তাছাড়া দেবজ্যোতি নিজেও তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে।

অবশ্য আরও কতকগুলো সূত্র পাওয়া গেল যা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মুকুল আত্মহত্যার জন্য গৃহত্যাগ করে নি। তার চেয়েও সাংঘাতিক কাজ সে করেছে।

শ্রাদ্ধের এবং সংসারের তাবৎ খরচের বাবদে নগদ প্রায় শ আষ্টেক টাকা বাক্সে তোলা ছিল, সে বাক্সের চাবি মুকুলের কাছেই থাকত,—বাক্সের চাবিটা আলমারীর তাকেই পাওয়া গেল কিন্তু টাকাকড়ি কিছুই বাক্সে নেই। তার বদলে একখানি রহস্যজনক চিঠি বাক্সে রয়েছে। চিঠিখানার প্রেরকের নাম মল্লীনাথ। মল্লীনাথ লিখছে,—আজ রাত্রি এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত রেলস্টেশনে অপেক্ষা করবো। তুমি কোনোরকম কিছু না ভেবে সোজা চলে আসবে। এখান থেকে অনেক দূরে আমি একটা ভালো কাজ পেয়েছি। হাতে যা টাকা-পয়সা আছে, তাতে নির্ভাবনায় ছমাস চলে যাবে। অবশ্য তারও দরকার হবে না। এখান থেকে একবার বেরিয়ে সেখানে পা দিলেই চমৎকার বাড়ি পাওয়া যাবে থাকবার, আর সেখানে মাস গেলে পাঁচ-সাতশ টাকা উপায়

হবেই। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি এক-পাও নড়তে পারবো না। এরকম সুযোগও আর কখনও পাবো না। তাই বলছি—তুমি এসো, এসো, এসো। সঙ্গে কিচ্ছু নেবার দরকার নেই, আমি ত রইলাম।—তোমারই মল্লীনাথ।

কে এই মল্লীনাথ? এই নামের কোনো মানুষ মানিকপুরে আছে বলে কেউ ঠাহর করতে পারে না।

অবশেষে মল্লিকা জানালো যে, ললিতই মল্লীনাথ। এ নাম একমাত্র মল্লিকাই জানে, অন্য কারুর ত জানবার কথা নয়! তবে মুকুলের পক্ষে সবই জানা সম্ভব। একে একে জানা গেল, ললিত অনেকবার মল্লিকার কাছে প্রস্তাব করেছে—চলো আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। দুজনের একক একটি সংসারের স্বপ্ন ললিতের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন। সজল চোখে, অনেকবার থেমে থমকে মল্লিকা বল্‌ল যে, এ চিঠির কথা সে টের পায়নি। সত্যিই মল্লিকা জানে না কিছু। কোনও ভাবে মল্লিকাকে লেখা চিঠিখানা মুকুলের হাতে এসে পড়েছে। হাঁ, সেদিন বিকেলে একটি কালো রোগাটে ছোকরা এসেছিল বটে। মুকুল সব জেনে বুঝেই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল!

ললিতও নিখোঁজ হয়েছে। এ খবরে সবাই নিশ্চিন্ত হ'ল। নিশ্চিত হ'ল এই ভেবে যে, এখন আর অযথা যেখানে-সেখানে ওদের খোঁজ করে লাভ নেই। আপাততঃ শ্রাদ্ধের কাজটা কোনোরকমে চুকিয়ে ফেলা দরকার। তারপর ভেবেচিন্তে দেখা যাবে, কিছু করা যায় যদি! দু-দিক থেকে ললিত এবং মুকুলের মারফতে শ্রাদ্ধের সমস্ত টাকাটাই উধাও। অতএব আড়ম্বরের প্রশ্নই ওঠে না। এইটুকু জায়গা মানিকপুর, কাজেই কারও আর ব্যাপারটা জানতে বাকী নেই।

এ অবস্থায় কেউ এই অভিশপ্ত বাড়িতে সামাজিকতা করতে আসবে কি না সন্দেহ। ওসব নিয়ে দেবজ্যোতির তত মাথাব্যথা নেই, আগেও ছিল না। সে চাইছে, কেবলমাত্র পারলৌকিক ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করতে। সীতানাথেরও এখন তাই মত। অবিনাশ আর এ বাড়িতে আসতে সময় পাচ্ছে না—তার ওভারটাইম শুরু হয়েছে হঠাৎ আজ থেকেই। সীতানাথ স্ত্রীর মৃত্যুর পরও সমানে কারখানায় যাচ্ছিলেন—কিন্তু এখন তিনি এক সপ্তাহের ছুটির

জন্য দরখাস্ত করে দিলেন। স্মরণীয় কালের মধ্যে কেউ তাঁকে ছুটি নিতে দেখেছে বলে মনে পড়ে না।

আগের মতোই সহজ নির্বিকারভাবে মিণ্টু এ-বাড়িতে আসা-যাওয়া দেখাশুনো করছে। উপরন্তু দীনদয়ালও বিকেলবেলা কারখানা-ফেরৎ একবার ঘুরে যান, এবং পরে নাইট-স্কুলের কাজ সেরে রাত্রেও এসে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে যান।

বত্রিশ

সেদিন বিকেলে হঠাৎ মন্দাকিনী এসে হাজির। মা ত অবাক!—ব্যাপার কি রে, এমন অসময়ে, খবরপত্তর কিচ্ছু নেই! হ্যাঁ রে খুকী! আর, এ কী চেহারা রক্ষে-কালীর মতো—এ্যাঁ!

রুক্ষ এলোমেলো চুলের ছড়াছড়িতে মুখখানা প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে মন্দাকিনীর। ও বল্‌ল—বড্ড জল তেষ্টা পেয়েছে মা গো!

—বস্‌-বস্‌।

পাখাটা খুলে দিয়ে মন্দাকিনীর মা বল্‌লেন—শরীর ত সুবিধের ঠেক্‌ছে না।

—শরীর ঠিকই রয়েছে। মনটা—না, তাও এখন ঠিক হয়ে গেছে।

মা বল্‌লেন—বেশ হয়েছে। ভালোই হ'ল, এখন কিছুদিন এখানে শান্ত হয়ে থাক্‌, সব সেরে যাবে।

মন্দাকিনী লাফিয়ে উঠ্‌ল—ইস্‌। আমার যেন সেই সময় আছে! আজকের রাতটুকু থাকবো, তারপর কাল ভোরেই আবার রওনা—ওখানে সব কাজ ফেলে রেখে এসেছি বলে! জ্যোতিদার মায়ের খবরটা পেয়েই কি মনে হ'ল, তাই সোজা গাড়ি নিয়ে চলে এলাম!

মন্দাকিনীর মা অবিশ্বাসের স্বরে বল্‌লেন—গাড়ি নিয়ে এসেছিস মানে?

—হ্যাঁ মা, বেশ আরামেই এলাম। ক'ঘণ্টাই বা লাগলো! সকাল সাড়ে নটায় বেরিয়েছি, মাঝে বর্ধমানে একটু যা চা খেতে থেমেছিলাম।

—ওমা, আমার কি হবে! দস্যি নাকি, দেবীচৌধুরাণী হলি! গাড়ি হাঁকিয়ে এই দেশদেশান্তরে তুই ঘুরে বেড়াবি নাকি?

মন্দাকিনী মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—তুমি এমন করে বকো না মা গো! আমার একটুও কষ্ট হয় নি। হ্যাঁ, একবার যাই চট্‌ করে ওদের ওখান থেকে ঘুরে আসি।

বলে মন্দাকিনী মায়ের মুখের পানে চেয়ে কি যেন বুঝতে চাইল। তারপর বল্‌ল—জ্যোতিদাদা খুব মুষড়ে পড়েছে, না মা?

মা গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন—তুই কি ওই জন্যেই এসেছিস্ খুকী?

—হ্যাঁ!

—এতখানি স্বাধীনতা মেয়েদের পক্ষে ভালো নয় মন্দা। প্রত্যেক ব্যাপারেই যদি হঠকারিতা করিস্ তবে জীবনে শান্তি পাবি না মা!

—এ কথা কেন বল্‌ছ মা? আমি ত অন্যায় কিছু করি নি। জ্যোতিদার এতবড় বিপদের খবর পেয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা আমার দ্বারা হয় না—হ'তে পারে না মা!

—তা বলে—। তোর বাবা খুব রাগ করবেন। আর—

—আর কি, তুমিও রাগ করবে?

—তোর ভবিষ্যৎ ভেবে ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে মা। চার দিকে যেসব কাণ্ড দেখচি তাতে ভরসা একটুও নেই। শেষে তুইও যদি মুখ হাসাস্ মা, এই ভয়।

—এসব তুমি কি বল্‌ছ মা?

—আমার আর কিছু বলার নেই। বড় হচ্ছিস্, তোদের বাধা দিলেও হয়তো মানবি না—তবু আমাকে কর্তব্য করতে হবে, তাই বলা—

—দোহাই মা-মনি, তুমি অমন মুখ ভার করে কথা বলো না। সে আমার সইবে না।

—না রে পাগলী, আমি ত জানি তুই অন্যায় কিছু করবি না। কিন্তু কি জানিস, দেবজ্যোতি অমন নিষ্পাপ রত্ন—তার বোন হয়ে মুকুল যে কাণ্ডটা করল, তারপর আর ভরসার কিছু নেই।

মন্দাকিনী বল্‌ল—মুকুলদির আবার কি হ'ল? হ্যাঁ মা!

—সে পালিয়েছে। ওই ওপাড়ার ললিত না কে, তার সঙ্গে! শুনে অবধি মন আমার—কেবল ভাবছি, একে মায়ের শোক, তার ওপর এই আঘাত, ছেলেটার যে কি হাল হয়েছে, কি জানি!

মন্দাকিনী উঠে পড়ল—আমি একবার যাই মা!

মেয়ের মুখের পানে তাকিয়ে মা বল্লেন—একটু জিরিয়ে, মুখ-হাত ধো, তারপর বেরোবি। এই ধাংড়ীর মতো অবস্থায় যাস্ নে খুকী।

মায়ের মন রাখবার জন্য মন্দাকিনী একটু বস্ল।

—বাবা কোথায় ?

—উনি বেরিয়েছেন। ওঁর ত মোটে অবসর নেই। দেখ, আগেই বলে রাখি, ওঁর সঙ্গে তর্ক ঝগড়া বাধাস্ নে মা।

—না, না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মা, তোমার ওঁ:ক আমি কিছু বলবো না। আমার বাবার সঙ্গে যা বোঝাপড়া করবার তা ত করতে পারি।

সন্ধ্যা হয়-হয়। মিণ্টু এসে চা দি:য় গেল দেবজ্যোতিকে বাইরের বারান্দায়। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দেবজ্যোতি ভাবছিল—এবার ফিরতে হবে বর্ধমা:ন। আর নয়। সীতানাথকে কোনোরকমে বুঝিয়ে:ছ সে, পরীক্ষা হওয়া পর্যন্ত বিয়েটা বন্ধ থাকবে। সীতানাথ বিশেষ আপত্তি করেন নি। মুকুলের ব্যাপারে তিনি যেন নিভে গেছেন !

মন্দাকিনীকে দেখে দেবজ্যোতি যেমন আশ্চর্য হ'ল তার চেয়ে ঢের বেশি খুশী হ'ল—এসো-এসো !

এমনভাবে সে ডাকলো মন্দাকিনীকে, যেন জানাই ছিল মন্দাকিনী আসবে।

তার পাশে বসে পড়ে মন্দাকিনী বল্ল—বাঃ, বেশ একা-একা চা খাওয়া হচ্ছে ! আমার কই ?

দেবজ্যোতি হাঁক দিল—দেবি !

মন্দাকিনী বাধা দিয়ে বলে—থাক্-থাক্ অ:তা হাঙ্গামায় কাজ নেই। তোমার থেকে একটু দিলেই হবে। পারবে না দিতে ?

—আমি ভাই চুমুক দিয়েছি।

—ব্যস, তবে মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে।

বলেই মন্দাকিনী ছেলেমানুষের মতো, কাপ থেকে খানিকটা চা প্লেটে ঢেলে নিয়ে চুমুক দিল।

ওদিকে দেবজ্যোতির ডাক শুনে মিণ্টু বেরিয়ে এসেছে—কিছু বল্‌ছো ?

—এই যে মিণ্টু, শোনো, মন্দাকিনী এসেছে !

মিণ্টু হাসলো—আরে তাই তো ! কতক্ষণ এসেছ ভাই ?

মন্দাকিনী বল্‌ল—এই বিকেলেই পৌছলাম। তারপর, তোমাদের সব খবর ভালো ? তুমি কতক্ষণ এসেছ এখানে ?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে মিণ্টুর আদৌ দেরী হ'ল না—কিছুক্ষণ আগে। এসো, ভেতরে বসবে চলো।

—যাচ্ছি, জ্যোতিদাদার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে নিই !

—আচ্ছা, তোমরা গল্প করো। চা খাবে ত ?

—না, এই ত খেলাম !

দেবজ্যোতি অপ্রতিভ বিব্রত মুখে বসে কি যেন ভাবছে !

মিণ্টু ভেতরে চলে গেল।

মন্দাকিনী বল্‌ল—অমন করে বসে আছো কেন, কথা বলো না ! আমি সেই কলকাতা থেকে মোটর ছুটিয়ে তোমাকে দেখতে এলাম, আর তুমি মুখ বুজে থাকবে ?

—কেন এলে ? কি করে খবর পেলে ?

—জেনেছি মায়ের চিঠিতে। আর, কেন এলাম, তা বলতে পারবো না—!

—তোমাকে চিঠি লিখেছি কয়েকদিন আগে।

—কই, পাইনি ত !

—লিখেছি, কিন্তু ডাকে দিতে পারি নি। যে রাত্রে লিখেছি সে দিন থেকেই সব এলোমেলো হয়ে গেছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দেবজ্যোতি বল্‌ল—এসো না এমন করে মন্দা ! ফিরে যাও। জীবনের বোঝা ভারি করবার আর দরকার নেই—তুমি এর ওপর আর ভার চাপিয়ো না।

মন্দাকিনী ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বল্‌ল—আমি তোমার ওপর ভার চাপাবো কেন ? বরং তোমার যদি কোনো বাড়তি বোঝা থাকে, আমার ঘাড়ে তুলে দাও—নিজেকে বেজায় ফাঁকা হাল্‌কা লাগে আমার !

ম্লান হাসি হেসে দেবজ্যোতি বল্‌ল—ছেলেমানুষীর অবসর নেই আমার।

—সিরিয়াস্‌লি বল্‌ছি জ্যোতিদা! আমি কোনো প্রাপ্তির আশায় তোমার কাছে আসিনি। এসেছি, যদি কোনো কাজে লাগতে পারি এই আশাতে!

দেবজ্যোতি উঠে পড়ে বল্‌ল—দাঁড়াও, তোমাকে যে চিঠিখানা লিখেছি সেটা দিয়ে দিই, অবসরমতো পড়ো!

তার হাত টেনে ধরে মন্দাকিনী বসিয়ে দিল—অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। বসো। তোমার ওপর একটা জরুরী কাজের ভার স্টুডেণ্টস্‌ ফেডারেশন চাপাতে চায়, সেটা সম্পর্কে পরামর্শ করতে এসেছি। পারবে নিতে?

—কি কাজ?

—কলেজে-কলেজে যুদ্ধ-বিরোধী সংগঠনের জন্যে শক্ত লোক দরকার। ওদিকে ত কমিউনিষ্টরা যুদ্ধের সমর্থন ক'রে জিগির তুলেছে!

—কিন্তু, মন্দা এসব ভার ত তোমার মারফতে আসার কথা নয়!

—কেন নয়! আমার কাজ দিয়ে আমি যোগ্যতা প্রমাণ করেছি, তা ছাড়া আমার মতো সবদিক দিয়ে যোগ্য ওয়ার্কার তোমরা খুব বেশি পাবেও না!

দেবজ্যোতি হাসল।

মন্দাকিনী বল্‌ল—কিন্তু তোমার জবাব এখনো পাই নি।

—ঠিক। আমাকে কাজ করতে হবে মন্দাকিনী। কাজ না করব ত বেঁচে আছি কেন? তাই হোক। আমি ভার নেবো। পারি না পারি, এগিয়ে যাবো বই কি!

—জানতাম আমি! তাহলে ভোরবেলা রওনা হচ্ছি আমরা। কালই ভোরে, বুঝলে?

—বেশ।

—পথে একবার বর্ধমানে নেমে তোমার কিছু দরকার থাকলে সেরে নিতে পারবে! এখন তাহলে চলি!

—এখুনি চলে যাবে? আচ্ছা!

মন্দাকিনী উঠে পড়ল। কয়েক পা গিয়েই আবার ফিরল—কই আমার সেই চিঠি!

—থাক, পরে নিয়ো!

—না, এখনই দাও। আর ওদের সঙ্গে একবার দেখাটাও করে যাই। তুমি ততক্ষণে চিঠিখানা বের করো!

দেবজ্যোতি বল্‌ল—চিঠিখানার আর দরকার ছিল না।

—ছিল কি না সে আমি বুঝবো। ওখানা যখন আমাকে লেখা হয়ে গিয়েছে তখন আমাকে দিয়ে দাও।

—আচ্ছা।

দেবিকা আর মল্লিকা বাইরে বেরিয়ে এসেছে মন্দাকিনীর খবব পেয়ে।

মন্দাকিনী ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, একটি কথাও ওর কণ্ঠে জোগাচ্ছে না। এদের মুখের পানে তাকিয়েই মন্দাকিনী যেন শোকের স্পর্শ অনুভব করে!

দেবিকাই প্রথম কথা বল্‌ল—কেমন আছো?

মন্দাকিনী লজ্জিত হ'ল নিজের আড়ষ্টতায়। তবু কিছু বল্‌তে পারল না। সান্ত্বনা দেবার মতো ভাষা ওর জানা নেই। আর যা জানা আছে, তা বল্‌তে সঙ্কোচ হচ্ছে। সামান্য কয়েকটি কথা দিয়ে এতবড় দুর্ভাগ্যের আঘাতকে অপসারিত করা যায় না,—নিছক মৌখিক কথাই বলা হয়, এই অনুভূতিই ওকে যেন আরও জড় করে তোলে!

মল্লিকা একটু হাসল, বল্‌ল—তুমি যেন ভাই দুঃখের কথা বলো না, আর সহ্য হয় না। সবাই এসে কেবল দুঃখের কথা শোনায়। তোমাদের কলেজের খবর বলো, কলকাতার গল্প বলো। নতুন ছবিটবি কি হচ্ছে শুনি! শুন্‌লাম, তুমি নাকি খুব নাম করে ফেলেছ!

মন্দাকিনী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো—ধ্যাৎ, মফস্বলের মেয়েরা ওখানে পাত্তাই পায় না। অবিশ্যি সে হিসেবে আমি শহুরে ছেলেমেয়েদের কাৎ করেছি। কলেজ-ইউনিয়নের সেক্রেটারী, বুঝলে? আমি কলেজ ইউনিয়নের পাণ্ডা।

দেবিকা বল্‌ল—তোমার মা কেমন আছেন?

'মা' কথাটা বলেই দেবিকা একবার মল্লিকার মুখের পানে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

মন্দাকিনীও সেটা লক্ষ্য করেছে। মল্লিকা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, হয়তো সেইজন্যেই ছোট বোনের ভাবান্তরটা এড়িয়ে গেল।

মন্দাকিনী বল্‌ল—উনি আছেন ভালোই। তবে তোমাদের জন্যে ওঁর খুব ভাবনা হয়েছে।

মল্লিকা হেসে জবাব দিল—ভেবে আর কি করবেন বলো! যা হোক করে চলে যাবেই। দাদাকে এখানে আটকে রাখা মানে ক্ষতি করা—নইলে, না, দাদা থেকেই বা কি হ'ত?

ওদিকে দেবজ্যোতি বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই মিণ্টু তাকে প্রশ্ন করল—শোনো, মন্দাকিনী এ বাড়িতে এলো—ওর জন্যে একটু মিষ্টিটিষ্টি আনালে হ'ত!

দেবজ্যোতি বল্‌ল—ও ত এখনি চলে যাচ্ছে।

মিণ্টু বিস্মিত হ'ল—এ আসার কি মানে হয়! একটু বসলে কি ক্ষতি হ'ত?

—আটকে রেখেই বা কি লাভ? প্রায় দেড়শ' মাইল মোটর ড্রাইভ করে ও খুব টায়ার্ড হয়ে আছে। ছেড়ে দেওয়াই ভালো—

—কি বল্‌লে? দেড়শ' মাইল, মানে কলকাতা থেকে কি মোটর হাঁকিয়ে এসেছে? বলো কি! কিন্তু কেন?

সে কথার জবাব না দিয়ে দেবজ্যোতি নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল।

পরদিন ভোরের আলো ভালো করে ফুটে ওঠার আগেই মন্দাকিনীর গাড়িখানা সীতানাথ মুখুয্যের কোয়ার্টারের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো!

দেবজ্যোতি টেরও পায়নি, কিন্তু সীতানাথ বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে মন্দাকিনী গাড়ি থেকে নেমে প্রণাম করতেই সীতানাথ অস্ফুটস্বরে বল্‌লেন—আর কি বলে আশীর্বাদ করব মা, তোমার মঙ্গল হোক! ধর্মে মতি হোক!

মন্দাকিনী প্রশ্ন করল—আপনি এত সকালে ওঠেন?

—চিরকাল। তবে আজকাল ঘুম যেন একেবারে পালিয়েছে! তা হ্যাঁ মা লক্ষ্মী, এখান থেকে এক দমে কলকাতায় যাতায়াত করতে হাত কাঁপে না? তোমাদের ত লোকের অভাব নেই, তবে এ কষ্ট করা কেন?

—কষ্ট আর কই ! বেশ ভালোই লাগে। জ্যোতিদাদার বেরুতে আবার কত দেরি দেখি !

দেবিকা এসে মন্দাকিনীর হাত ধরল—চলো ভেতরে একটু।

—চলো যাই, কিন্তু ভাই আমাকে মা এমন ঠেসে খাইয়ে দিয়েছেন যে আর কিছু খেতে পারবো না।

কথাটা বলেই মন্দাকিনী চম্‌কে উঠ্‌ল। দেবিকা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—তা জানি না, দাদা বসে রয়েছে, একসঙ্গে আমরা সবাই খাবো বলে !

দীর্ঘনিশ্বাস যদি ফেল্‌তে পারতো তবে হয়তো মন্দাকিনীর বুকের বোঝাটা হাল্‌কা হ'ত ! দেবজ্যোতির চিঠিখানা পড়েছে ও। রাত্রে অনেক ভেবেছে। ঘুম থেকে উঠেও সেই চিঠির কথাটা ওর মনে গেঁথে রয়েছে। প্রতিমুহূর্তে চিঠিখানা যেন ওর মনের সঙ্গী !

মল্লিকা ওদের দেখে বল্‌ল—দ্যাখো ভাই মন্দা, আমি ত পারলাম না, তুমি একটু বুঝিয়ে নিয়ে যাও না দেবীকে ! আমি বলি কি, যা না দু-চার দিন মামাবাড়ি থেকে ঘুরে আয়। আমি দিব্যি চালিয়ে নিতে পারবো। তা ও কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না।

দেবিকা অনুযোগের স্বরে বল্‌ল—আচ্ছা ছোটদি, তুই আমাকে এতখানি স্বার্থপর ভাবিস কেন ?

মল্লিকা বল্‌ল—মোটেই তা নয়। এখানে অমন মুখ শুকিয়ে ঘরের কোণে কত কাল কাটাবি ?

—তা বলে তোমাকে একলা ফেলে রেখে—

মল্লিকা হাসি টেনে বল্‌ল—বা রে একলা কি রকম ! কাকামনি আছেন, মিণ্টু, দীপু, সবাই রয়েছে। বাবা রইলেন !

মন্দাকিনী বল্‌ল—চলো না দেবি !

—তা হয় না।

দেবিকা সামান্য এই কথা ক'টি এমন জোর দিয়ে বল্‌ল যে তারপর আর কেউ কিছু বলতে ভরসা পেল না—কি জানি হয়ত কান্নাকাটি শুরু করে দেবে !

দেবজ্যোতি তৈরী হয়ে বেরুবার সময় বল্‌ল—মিণ্টুর সঙ্গে দেখা ত হ'ল না। ওকে বলিস, আমি কলকাতায় গিয়ে অমলা বৌদির খবর নিয়ে চিঠি দেবো।

মল্লিকা কুণ্ঠিতভাবে বল্‌ল—তা নয় বল্‌ব। কিন্তু যাবার পথে যদি তুমি ওঁদের ওখান হয়ে যেতে ত ভালো হ'ত। ওঁরা সব সময় আমাদের এতো করছেন!

—আচ্ছা দেখি!

কারখানার বাঁশীতে প্রভাতের প্রথম সতর্কবাণী ঘোষণা হ'ল। পথে একটি দুটি লোক দেখা যাচ্ছে—ঝাড়ুদার, গোয়ালা!

গাড়িখানা আবার এসে দাঁড়ালো দীনদয়ালের কোয়ার্টারের সাম্‌নে। দরজা তখনও বন্ধ।

দেবজ্যোতি চারিদিকে তাকিয়ে আপন মনেই বল্‌ল—কেউ ওঠে নি এরা?

দীপু সাড়া দিল—দাঁড়াও!

দরজা খুলে দিয়ে দীপু খুশী মনে জিভ্‌ ভেংচেই দেখতে পেল মন্দাকিনীকে, তক্ষুণি লজ্জিত ভাবে দৌড়ে ভেতরে পালিয়ে গেল।

দীনদয়াল সকালে বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন। ভিতরের ঘরে মিণ্টু তখনও শুয়ে ছিল। দেবজ্যোতিকে দেখে চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে বল্‌ল—কি দরকার ছিল আসবার? খামোখা দেরী করছ, ওদিকে আবার পৌছতে বেলা হয়ে যাবে ত!

দেবজ্যোতি হাসল—কাঁচা ঘুম ভেঙে দিলাম নাকি?

—ওঃ একদিন ভোরে উঠেই দেখছি খুব বলে নিচ্ছ! ছাখো, একটু সাবধানে গাড়ি চালাতে বলো ওকে, হাজার হোক ছেলেমানুষ ত!

—কি আর হবে তাতে, বড় জোর প্রাণটা যাবে!

—থাক্, সকাল বেলায় আর বাহাদুরী করতে হবে না। বিদেয় হও এখন।

দেবজ্যোতি চলে যাচ্ছিল। মিণ্টু হাঁক দিল—এই দীপু, প্রণাম করেছিস?

দীপু আসতে না আসতে মিণ্টু নিজেই উঠে এসে প্রণাম করল, বল্‌ল—দেশের কাজ করতে ত বাধা দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এখানকার যা অবস্থা, তাতে ডাক্তারীটা তাড়াতাড়ি পাশ করা দরকার, বুঝছ !

—হুঁ !

বলে দেবজ্যোতি বেরিয়ে গেল।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে পড়েই গাড়ি ছুটতে শুরু করল বিদ্যুৎবেগে। দেবজ্যোতির গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে মন্দাকিনীর উড়ন্ত চুলের দল। হাওয়ার ধাক্কায় নিশ্বাস ফেলতে যেন কষ্ট হচ্ছে !

দেবজ্যোতি বল্‌ল—Don't be so rash !

—এটাই আমার normal form. আমি আস্তে চল্‌তে জানি না। আর ভুলও আমি করি না। যখন ভুল করি না তখন আস্তে চলারও কোনো মানেই হয় না।

সাম্‌নে পথটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—সোজা বাধাহীন পরিচ্ছন্ন কালো ফিতের মতো পড়ে রয়েছে ! দেবজ্যোতি সেদিকে তাকিয়ে বল্‌ল—নিজের ওপর এত ভরসা করা কি ঠিক ? উল্টো দিক থেকে হঠাৎ যদি কিছু এসে পড়ে ত সাম্‌লাবে কি করে ?

—ভরসাটা সব সময়ই নিজের হাতের মুঠোতে রাখা ভালো। তাই নয় ?

—তুমি যেন কিছু শোনাতে চাচ্ছ ?

মন্দাকিনী সামনের দিকে নজর রেখেই বল্‌ল—যা বোঝাতে চেয়েছ সেটা বুঝেছি তা-ই জানালাম। কাউকে ভালোবাসলে দেশের কাজ করা যায় না, এ আমি বিশ্বাস করি না। দেশ ত কথার কথা নয় ! একটা জীবন্ত বিরাট বস্তু হচ্ছে দেশ—তাকে ভালোবাসতে গেলেও সূত্র চাই। তোমার চিঠির মধ্যে অনেক সত্যি আছে, আবার ঢের অবাস্তব কথাও রয়েছে।

দেবজ্যোতি আস্তে আস্তে উত্তর দিল—কি লিখেছিলাম মনে নেই সব—তারপর অনেকগুলো ঢেউ এসেছে, খেই হারিয়ে ফেলেছি। যাই হোক, তোমার বোঝা ত তুমি বুঝেছ, তাহলেই হ'ল !

—ব্যস ! তাহ'লেই হ'ল ?

ঘাড় ঘুরিয়ে মন্দাকিনী পাল্টা প্রশ্ন করল। গাড়ির স্পীড কমিয়ে দিতে দিতে মন্দাকিনী বল্‌ল—কি, জবাব দাও!

—জবাব নেই। তর্ক ভালো লাগছে না। হাওয়াটা ভালো লাগছে।

মন্দাকিনী স্মিত হাসিতে ভ্রূ-কাঁপিয়ে বল্‌ল—অন্য সুরে কথা কইছ কেন?

—না মন্দা, কোনো সুরের পরোয়া না করেই বল্‌ছি। তর্ক-কথা কিছু নয়, কাজের মধ্যে ঢেলে নিজেকে দিতে হবে।

—তা ত হবেই। তবে আমার কথা হচ্ছে, কাজ করবো বলেই যে মুখখানা গোমড়া করে রাখবো,—হাসি নয়, মাধুর্য নয়, সব কিছু বাতিল করে দেবো, তা কেন হবে? কাজ আছে। জীবন আছে। জীবনের সবই আছে। তার মধ্যে কর্তব্য প্রাধান্য পাক্‌ তাতে এসে যায় না—কিন্তু বাকীগুলোও থাকবে। নইলে একটা কৃত্রিম অবস্থা দাঁড়াবে গিয়ে।

—আবার সেই তর্ক!

—না তর্ক নয়। বক্তব্য। তোমার চিঠির ওপর ভর করে একটু চিন্তার চেষ্টা।

—মাকে কি বলে এসেছ?

—বলেছি, মেয়ের আশা ছাড়তে।

—কেন?

—বাবাকে তিনি ছাড়তে পারবেন না, তা আমাকেই ছাড়তে হবে।

—তোমাকে ছাড়তে হবেই?

—হ্যাঁ! অনিরুদ্ধ মল্লিক সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ আছে। কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব না করেই বল্‌ছি, তিনি দেশের শত্রু! কাজেই আমারও—

—এ কথাটা বলার আরও আগে ভাবা উচিত ছিল মন্দা!

—আর ভাবলে এর চেয়েও সাংঘাতিক কথা বল্‌তে হ'ত। তিনি তাড়িয়ে দেওয়ার আগেই আমি বেরিয়ে এসেছি।

দেবজ্যোতি অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বল্‌ল—যাঃ, সত্যি?

—মিথ্যে কোনোদিন শুনেছ আমার মুখে?

—না, তবে এমন কথা যদি মিথ্যে হয় তবে খুশীই হবো। অনিরুদ্ধ মল্লিককে এক কথায় দেশের শত্রু বলে নস্যাৎ করা চলে না।

—নস্যাৎ করব কেন? তৈরী হবো, তাকে বাধা দেবার জন্যে শক্তি সংগ্রহ করবো। দাঁড়াও, কিছুদিন সময় লাগবে।

দেবজ্যোতি বল্ল—সাম্‌নে তাকাও, একটা বাঁক আছে!

—হুঁ!

বলে মন্দাকিনী ষ্টিয়ারিং-এর দিকে নজর দিল।

—আচ্ছা জ্যোতিদাদা, একটা কথা বল্‌তে পাবো নিজেব বুকে হাত দিয়ে?

—কি কথা?

—আমাকে তোমার খারাপ লাগে?

—না!

—ভালো লাগে না?

—লাগে।

—তবে?

—কি, তবে কি?

—তবে কেন অমন ধোঁয়াটে-ধোঁয়াটে কথা বলো?

—ধোঁয়াটে কিছু বলি নি ত! যা আমার মনে হয় তাই বলেছি! স্বপ্নবিলাসের সময় এ নয়—এই আমার বিশ্বাস।

—স্বপ্ন দেখবার জন্যে ত কিছু লাগে না, স্রেফ মনের উড়ো ডানায় চড়ে স্বপ্নের পরী আসে। সে কারুর হুকুমের তোয়াক্কা রাখে না। নইলে আজ, ওই চিঠির পর তুমি-আমি এই ভাবে চল্‌তে পারতাম না। স্বপ্ন তুমিও ছাখো জ্যোতিদাদা, তবে কেন মনকে লুকোতে চাও? রাগ করো না, আমি হয়তো ভুল করছি—তবু আমার যা বিশ্বাস, তা বল্‌তে দাও।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—বাধা দিই নি। যা ইচ্ছে বলো। আমার জীবনটা কতদিন যেন অভিশাপের তলায় চাপা পড়ে ছিল—তুমি তাকে উদ্ধার করে এনেছ, কাজেই আমি খুশী। যা বল্‌বে মুখ বুজে শুনবো!

তেত্রিশ

দিনগুলো কারখানার হেফাজতে—রাত্রের আলো রাজ-সরকারের দখলে। এতগুলো জীবনের প্রাপ্য আলোর উজ্জ্বলতা কোন্ অজানা খাজাঞ্চিখানায় জমা পড়ছে! মোটকথা মানিকপুরের মানুষদের ললাটে আর রোশনাই কিছু নেই। থেকে থেকে সাইরেনের আর্তনাদ সাবধান করছে। শত্রুর আচম্‌কা আক্রমণের সঙ্কেত পেলে কি ভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে সেই কৌশল শেখাচ্ছে এ. আর. পি.। গহ্বরে মুখ লুকোতে হবে। এ এক ভয়াবহ অভিশপ্ত অস্তিত্ব! তবু যখন পথ-চল্‌তি শ্রমিকের নাকে এসে বকুলের সৌরভ উন্মনা করে দেয় ক্ষণিকের জন্য, সে যদি দু-চোখ তুলে গাছটাকে এক নজর দেখে নেয় তখন সে টের পায় সত্যি বেঁচে আছে। দুপুরের টিফিনে খর-রোদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত লাল রং বুঝি অপহৃত জীবনস্বাদকে স্মরণ করিয়ে দেয়! পূর্ণিমার রাত্রে জ্যোৎস্না-মাখানো কলাপাতা যখন এলোমেলো বাতাসে মাতামাতি করে, তখন পিছ্‌লে-পড়া আলোর চমক ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মজুর-পরিবারের মনে আশ্বাসেরই সাড়া জাগায়! শাসন-শোষণের কাঁটাবেড়া ডিঙিয়ে জীবনমায়া এমনি করেই দুর্বহ জীবনকে সহনীয়, কখনও বা সযত্নবেষ্টিত শাসনকে এড়িয়ে রমণীয়ও করে তোলে!

শহরের আকার ধারণ করলেও মানিকপুর এলোমেলো যথেচ্ছাচারের নাগরালী চেহারায় রূপায়িত হতে পারে নি। পথের পাশে পাশে কোথাও শিমু, কোথাও নিমের কচি-কচি পাতার আড়ালে ছোট-ছোট শাদা ফুলের বুটিদার ছেলেমানুষী—আর বাতাসে তার সৌরভ বিসারিত।

বাবুমহল্লাতে কৃষ্ণচূড়া গাছে সাহসী ছেলেদের হাম্‌লা চলেছে—ফুল চাই, পাতার ঝালর দিয়ে গেট বানাবার জন্যে ডালপালাও ভাঙছে তারা। কি হবে? কেন, স্কুলে নববর্ষ-উৎসব হবে। এখন যে হাইস্কুল হয়েছে। আরও আশ্চর্য এই যে, মেয়েদেরও হাইস্কুল একটা সদ্য জন্মলাভ করেছে।

বাইরের দর্শকের চোখে মানিকপুর একটা অপূর্ব ছন্দোবদ্ধ শহর। এমন নিয়ম-নিয়ন্ত্রণে যে এতবড় শহরের এতগুলো লোক স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পাবে সেটা চোখে দেখার আগে বিশ্বাসই হয় না। আর দেখবার পর বোধকরি বিস্ময়টা বিশ্বাসকেও ছাপিয়ে যায়।

স্কুলের নববর্ষ উপলক্ষে হরগোবিন্দ দাস এসেছেন। সভাপতি তিনি, তাঁকে শহর দেখানো হচ্ছে সাড়ম্বরে। প্রৌঢ় হরগোবিন্দ যা দেখছেন, তা-ই তাঁব চোখে সুন্দর, উত্তম, আশ্চর্য!

একজন উৎসাহী কর্মী বল্‌লেন—এসব আর কি দেখবেন স্যার! আসল ত ফ্যাক্টরী।

—কেন, খাশা দেখছি। তবে টালীর ঘরগুলো এই গ্রীষ্মে বড কষ্টদায়ক, যদি চালাঘর বানাতেন আপনারা, তাহলে অনেক আবাম হতো। অবিশ্যি, দেখতে শুন্‌তে এ বেশ ভালো। কিন্তু চালাঘর খুব ঠাণ্ডা।

—না, বল্‌ছিলাম কি, এই রোদে এভাবে পথঘাট দেখে কষ্টই পাচ্ছেন। আজকাল অবিশ্যি, বাইরের লোক কারখানায় ঢুকতে দেয় না। আপনার জন্যে অনেক তদবির করে একখানা পাস এনেছি। চানটান করে চলুন কারখানার ভেতরটা দেখবেন।

হরগোবিন্দ সরল উচ্চহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠ্‌লেন—অন্ধকে হাতী দেখাবেন! কলকব্জার কিস্যু বুঝি নে মশাই। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করার কাজ করে চুল পাকলো—এখন কি ওসব সূক্ষ্ম শিক্ষে মগজে ঢুকবে? তার চেয়ে এই বেশ আছি।

একজন বল্‌লেন—তবু চোখের দেখাটা দেখবেন!

—শুনেছি ধুতিটুতি পরে কারখানার ভেতরে যাওয়া বারণ। অত হাঙ্গামায় কাজ কি মশাই? আপনাদের সভাতে ত কারখানার সব বিধাতাই আসছেন, তাঁদের দেখলেই ফ্যাক্টরী দেখার কাজ হয়ে যাবে। আব এই যে শহরের এতসব কাণ্ডকারখানা, এই বা কম কি হ'ল!

অনেকেই হরগোবিন্দবাবুর কথা শুনে হতাশ হলেন। কারখানাতে ঢোকার জন্যে সবাই হা-পিত্যেশ করে, আর ইনি এ ব্যাপারে একদম বিরূপ!

তবু মুখের ওপর বিশেষ কিছু বলা চলে না, মাননীয় অতিথি ত!

বিকেলের সভাতে কিন্তু হরগোবিন্দ বাবুর অন্যমূর্তি প্রকাশ পেল। তিনি এই কারখানা-শহরের তরুণ ছাত্রছাত্রীদের সম্বোধন করে যে বক্তৃতা দিলেন, সেটা কর্তাব্যক্তিদের মনঃপূত হওয়া দূরের কথা, অনেক স্বদেশী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিকেও রীতিমত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলল।

তিনি যা বললেন তার সারমর্ম এই যে, পরাধীন ভারতের নবীন শক্তিকে দেশের দুরবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। হাতে-হাতিয়ারে দেশের কাজ করাই মানুষের মত কাজ। এই যে স্কুল, স্কুলের শিক্ষা—তা দিয়ে পুঁথির কথা জানলেই শিক্ষা সমাধা হবে না, এখান থেকে শিক্ষার শুরু! বলকারখানাই বলো আর আপিস-কাছারীই বলো, তাদের উদ্দেশ্য—লোকের কাছ থেকে আপন স্বার্থসিদ্ধি! তারা যে মাইনে দেয়, তারা যে মানুষকে বাসের জায়গা দেয়—তার মূল এই স্বার্থ! এবং মেহনতের তুলনায় মূল্য তারা সামান্যই দেয়। যতোটা না দিয়ে পারে তাতো কমই দেয়—। কিন্তু ক'জন তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে? এখন এমন দিন এসেছে যে আর চুপ করে থাকা চলে না। অতএব ছাত্ররা যেন কর্তৃপক্ষের এই উদ্দেশ্যকে চিনতে শেখে। তাহ'লেই আপনাদের কর্তব্যপথ দেখতে পাবে। আজকের এই কারখানা-শহর এখন যুদ্ধের জন্য খোরাক জোগাচ্ছে। এ যুদ্ধ ইংরেজের যুদ্ধ—যে ইংরেজ ভারতবর্ষকে পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখেছে, সেই ইংরেজের জন্যই ভারতবাসীরা যুদ্ধের রসদ জোগানোর কাজে লেগে রয়েছে। আজকের ছাত্র, আগামীকালের মানুষ—তারা যেন এসব কথা স্মরণ রাখে। তাহ'লে আর তাদের শিক্ষা ব্যর্থ হবে না। ইংরেজের কাজ কেবল আত্মরক্ষা করাই নয়, রাজ্য-বাণিজ্যকে দখলে রাখা। পরাধীন জাতি ভারতবর্ষ—তাকে দিয়ে ছলে-বলে এই যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করছে ইংরেজ। আমরা তা মানবো না, শুনবো না, বিদেশীদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে হবে। নববর্ষে তারা স্বদেশের দীক্ষা গ্রহণ করুক এই কামনা তিনি করছেন এবং আর সকলকেও করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন।

আশ্চর্য! হরগোবিন্দর বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ সভা স্তব্ধ

হয়ে রইল। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। সর্বপ্রথমে ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ডের অফিসার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সাহেবরা একে-একে বেরিয়ে গেলেন।

অফিসারটি এগিয়ে এসে হরগোবিন্দকে ইংরেজীতে বল্‌লেন—অনুগ্রহ করে একটু বাইরে আসবেন?

হরগোবিন্দ সহাস্যবদনে বল্‌লেন—ব্যস্ত হবার কিছু নেই, আমি তৈরী আছি। আপনি বরং বাইরে অপেক্ষা করুন। এটা ত পবিত্র শিক্ষানিকেতন।

অফিসার বেরিয়ে যেতেই হরগোবিন্দ উচ্চকণ্ঠে বল্‌লেন—আমার ছাত্রবন্ধু, তোমরা একবার আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলো, 'বন্দে মাতরম্!'

সমস্বরে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি তুলে ছাত্ররা উঠে দাঁড়ালো।

কে একজন বল্‌ল—আপনি বেরুবেন না, ওই লোকটা ধরে নিয়ে যাবে আপনাকে স্যার!

হরগোবিন্দ তাকে কাছে ডাকলেন—শোনো খোকা!

ছেলেটি কুণ্ঠিতভাবে একটু একটু করে এগোতে লাগলো। তিনি বল্‌লেন—তাড়াতাড়ি এসো। হ্যাঁ! এমনিভাবে নির্ভয়ে চল্‌বে।

বলে তিনি সভাপতির মালাটি তার গলায় পরিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—ভয় নয়! তোমাদের কাছে—আমি, আমার মতো আরো হাজার হাজার, লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি মানুষ—সাহস চাই। পালাবার কথা ভুলে, সাহসে ভর করে সাম্‌নে ঝাঁপিয়ে পড়বে, বুঝলে? আমরা একদিন থাকবো না, তোমরা রইলে—তোমরা যদি সত্যি আমাকে ভালোবাসো ত দেশকেই ভালোবেসেছো জানবো। তোমাদের জন্যেই আজ এসেছিলাম, তোমাদের কাছে দেশের কথা জানাবার জন্যেই এসেছিলাম। জানিয়েছি—এখন বলো আবার 'বন্দে মাতরম্!'

হরগোবিন্দ বেরিয়ে গেলেন, তাঁর পিছনে ছাত্রের দল ভেঙে পড়ল।

সেদিনের নববর্ষ-উৎসবের জের অনেকদূর পর্যন্ত গড়ালো। মল্লিকসাহেব হেডমাস্টার মশাইকে ডেকে পাঠালেন—কৈফিয়ৎ চাই, এমন বিপ্লবী লোককে

কেন এখানে আনা হয়? বৃদ্ধ হেডমাস্টার কিছুই জানেন না, স্কুলের দু-একজন শিক্ষকই হরগোবিন্দবাবুকে সভাপতি করে আনার প্রস্তাব এবং ব্যবস্থা করেছিলেন।

—কে, কে করেছিলেন?

মুহূর্তকাল নীরব থেকে বিচক্ষণ হেডমাস্টার জবাব দিলেন—দরিদ্র স্কুলমাস্টার, তাদের ওপর হুজুর—!

মল্লিক বল্‌লেন—আপনার চাকরীটা থাকে এমন ইচ্ছে নেই বুঝি?

—আজ্ঞে!

—পথে আসুন, নইলে সব দোষ আপনার ওপর পড়বে!

হরগোবিন্দর বক্তৃতা বোধকরি কেবলমাত্র তরুণ ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যেই বর্ষিত হয়েছিল, অতএব প্রবীণ হেডমাস্টারের বিবেককে স্পর্শ করে নি—তাই তিনি এক মোচড়েই গণ্ডাখানেক নাম কবুল করে দায়মুক্ত হলেন। এবং নামগুলো বলবার সময় বোধকরি তার ফলাফল জেনেই করলেন—দু-একজন প্রিয় পাত্রকে বাদ দিয়ে এবং পরিপূরক হিসেবে তার জায়গায় জনা-দুই অপ্রিয় ব্যক্তির নাম করতে মাস্টারমশাই-এর ভুল হ'ল না।

সব শুনে মল্লিক বল্‌লেন—এবার আপনি যেতে পারেন।

—আচ্ছা হুজুর!

—হ্যাঁ, দেখুন, দরিদ্র স্কুলমাস্টারদের জন্যে আপনার ভাবনা হয়েছে, তা হতেই পারে। তবে, চাকরী গেলেও তারা উপোস করে মরবে না—ইংরেজের জেলখানায় খেতে পরতে দেয়। তা নেহাৎ মন্দ দেয় না—স্কুলমাস্টারের তুলনায় ভালোই হবে সেটা।

—আজ্ঞে! ওদেরও পুলিশে ধরবে?

মাস্টারমশাই-এর কণ্ঠস্বর ভয়ার্ত অস্থিরতায় কেঁপে ওঠে।

—দেশের কাজের এই ত রাজসমাদর মশাই!

বলে মল্লিকসাহেব চুরুট ঠুকতে লাগলেন—মাথাটা তাঁর একটু ঝুঁকে আছে, কিন্তু তাচ্ছিল্য-মাখানো কৌতুকভরা দুটো চোখ হেডমাস্টারমশাইএর দিকে স্থির হয়ে রয়েছে।

দু হাত তুলে নমস্কার করে হেড্‌মাস্টার মশাই ছাতাটা আঁকড়ে ধরলেন—আজ্ঞে আমি এসবের কিছুই জানতাম না।

—প্লিজ ক্লিয়ার আউট, ওল্ড ফসিল! আপনারই জানবার কথা, না জানাটা আপনার অযোগ্যতাই প্রমাণ করে। বার বার বড়াই করছেন, জানতেন না,—হোয়াই? আপনাকে মাইনে দিয়ে পোষা হচ্ছে কেন, শুনি! ওয়ার্থলেস হ্যাগ্‌!

হেড্‌মাস্টারের হাত থেকে ছাতাটা খসে পড়ল।

মল্লিকসাহেব এগিয়ে এসে তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালেন—জেলে আপনারই যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাতে জেলখানার কলঙ্ক হয়। এমন বাজে লোককে ইংরেজ পুষবে না। তা ছাড়া আমাদের কারখানার স্বার্থে এইরকম বাজে লোকই চাই, বুঝলেন? তাই বেঁচে গেলেন। নইলে টু বি ফ্র্যাঙ্ক, এই চারজন কাজের লোককে এভাবে তাড়াতে, তাদের ফিউচার নষ্ট করতে, কার না কষ্ট হয়? এনি ওয়ে, আপনার কাছে এসব বলার কোনো মানে হয় না। ইউ আর টু গুড টু রিজ্‌ন্‌ এ্যাণ্ড কন্‌সেন্স!

হেডমাস্টার মশাই পারলে ছাতাটা ফেলে রেখেই পালান এমন অবস্থায় ছাতাটি কোনোরকমে কুড়িয়ে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লেন—চিরকাল হুজুরদের দয়ায় বেঁচে আছি। বাকী ক'টা দিন হুজুর ক্ষমা-ঘেন্না করে কাটিয়ে দিন। ভগবান আপনার ভালো করবেন। নমস্কার হুজুর!

—আমি আপনার ছাত্তর নই, আমাকে আর কেন ভগবানের নামে উচ্ছুগ্‌গু করছেন, বরং নিজের জন্যে ভগবানকে ডাকুন মাস্টারমশাই। ওঃ হোয়াট এ প্লাইট! যান, যান, বিদেয় হন, আবার যদি রেগে যাই!

—আজ্ঞে হ্যাঁ! এই যাই—

বল্‌তে বল্‌তে বৃদ্ধের পক্ষে যত দ্রুত চলা স্বাভাবিক, তার চেয়ে বহুগুণ বেগে হেডমাস্টারমশাই রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসৃত হলেন।

তারপর অনিরুদ্ধ মল্লিক আপন মনে একা-একাই নিজের হাসি উপভোগ করতে লাগলেন।

আর বাগানে তখন কর্ণিকার শাখায় হলদে ফুলের গুচ্ছ কালবৈশাখীর

উদ্দাম ঝড়ো বাতাসে দুলছে। ঝড় উঠ্‌ল, আমের শাখা থেকে কাঁচা আমগুলো দমকা বাতাসে দুপ্‌-দাপ পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু কেউ নেই যে গাছতলায় ছুটে গিয়ে আঠাঝরা আম কুড়োবে, উল্লাসে নৃত্য করবে। আছে একটা কুকুর, সেও চেনে বাঁধা রয়েছে। এমন দিনে মন্দাকিনীর কথা মনে পড়ে বইকি মল্লিকসাহেবের! মেয়েটা ঝড়ের অনেক আগে থেকে যেন বাতাসের গতি পরখ করত নাক উঁচু করে! তারপর কী যে মাতনে এতবড় বাংলোখানাকে তোলপাড় করত! আজ হাসতে হাসতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেইসব দিনের কথা। এমন ঝড়মাতানো দিনের সঙ্গে মেয়েটার স্মৃতি বড় বেশী যেন জড়ানো। এইসব মুহূর্তে মন্দাকিনী তার বাবাকে হিড়হিড় করে বাগানময় ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াতো। কী যে হ'ল! না, দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন না অনিরুদ্ধ মল্লিক—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে মাথা উঁচু করে চল্‌তে হবে। একবার, একটু সুযোগ পেলেই পরাজয় তাঁর ঘাড় মট্‌কে দেবে—পরাজয়কে তাঁর যতো ঘৃণা, বুঝি বা ততোই ভয়। অতএব অনিরুদ্ধ মল্লিক অর্ধসমাপ্ত হাসির রেশটুকু টেনে নিয়ে জের ধরে শেষ করলেন।

আব্দুল এলো।

তার দিকে তাকিয়ে অনিরুদ্ধ বল্‌লেন—কি? 'সমাচারদর্পণখানা' খোলো মিঞাজান!

দাড়িতে হাত বুলিয়ে আব্দুল হাসল—হুজুরের কেরামতে মানিকপুর বিলকুল ঠাণ্ডা!

—বহুৎ আচ্ছা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আব্দুল প্রভুর মুখের পানে চেয়ে বল্‌ল—আপনার মেজাজ শরীফ নেই কেন হুজুর?

গর্জে উঠ্‌লেন অনিরুদ্ধ—বিলকুল শরীফ!

চৌত্রিশ

যন্ত্রের পেষণ দিয়ে আশাকে মেরে ফেলা যায় না- যদি সে আশার অন্তরে অধিকারের বীজ বাসা বেঁধে থাকে। মানুষ মরতে পারে, আশাও তার আগে মরে না! অমনি এক অলঙ্ঘ্য আয়ুর আইনে মানিকপুরের শ্রমিকমহল আবার একদিন আপন অধিকার অর্জনের আশাকে অগ্রগামী করতে উদ্যত হ'ল। বিগত ব্যর্থতার গ্লানি নেই, তার জায়গা দখল করেছে নূতন উদ্যম। নতুন লোক এসেছে, আর পুরনো মানুষ নতুন করে সাহস ফিরে পেয়েছে।

কারখানাতে যুদ্ধের কাজ তখন পুরোদমে চলছে। প্রত্যেকটি মানুষ ওভারটাইম খেটে আগের চেয়ে অনেক বেশি পয়সা ঘরে আনছে। তখনই যেন তাদের নিজের উপর আস্থা ফিরে এল। তারা বুঝল, যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গৎ করবার যোগ্যতা একমাত্র শ্রমিকেরই রয়েছে। অথচ তাদের যোগ্য মূল্য ত কেউ দেয় না! আজও তাদের সকলের বসবাসের ঘর নেই। যে মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবানের থাকবার ঘর আছে, তাদের ঘরে হাওয়া নেই, আলো নেই, পিপাসার জল তুলে আনতে হয় পথের কল থেকে। প্রতিদিন ষোলঘণ্টা পরিশ্রম করলে, আজকাল ভাত-ডালের সঙ্গে এক-টুকরো মাছ জোটে। কিন্তু সকলের শরীর এতখানি মেহনৎ সইতে পারে না। ওদিকে বাজারে চাল অগ্নিমূল্য—আয়ের কড়ি ত ওখানেই ফুৎকারে উড়ে যায়! তবু অর্থের আকর্ষণ তাদের ষোলঘণ্টাই খাটিয়ে ছাড়ছে। আর চাকরীর দুঃখ নেই। ছোট-বড়, ছেলে-মেয়ে সবাই কাজ পাচ্ছে। কাজ—আরও কাজ—আরও কাজ! তবু তৃপ্তি নেই।

এবার ইউনিয়ন তৈরী হ'ল প্রকাশ্য ভাবেই। পুরনো দাবীর ওপর নতুন দাবীর ফিরিস্তি জুড়ে দেওয়া হ'ল। ছুটি চাই, ছুটির মাইনে দিতে হবে, চিকিৎসার নামে ভিক্ষের স্তোক দিলে চলবে না; প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড-এর ব্যবস্থা করতে হবে, কারখানার আয়ব্যয়ের হিসেব দেখবার অধিকার শ্রমিক-প্রতিনিধিদের থাকবে, ইউনিয়নের অমতে কোনো কর্মীকে বহাল বা বরখাস্ত

করা চলবে না, সর্বোপরি স্বীকার করে নিতে হবে যে, কারখানার মালিক-অংশীদারের চেয়ে শ্রমিকের অধিকার কোনো অংশে কম নয়। প্রত্যেকটি জিনিসের দাম বেড়েছে, সেই অনুপাতে শ্রমিকের বেতনহার বৃদ্ধি করতে হবে। আরও অনেক দফা।

আশ্চর্য, এবার ইউনিয়ন গড়বার সময় কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ-তরফ থেকে প্রতিরোধের প্রচণ্ড ধাক্কা এল না। সরকারী আইনকে প্রশ্রয় দিল কর্তৃপক্ষ, ইউনিয়নের অফিস বসাবার জন্য একখানি মাঝারি কোয়ার্টার ছেড়ে দিল। অবশ্য শহরের এক প্রান্তে—তা হোক, বেশ ভালো জায়গা মিলেছে ইউনিয়ন অফিসের। বিগত ফেডারেশনের চেয়ে অনেক বেশী ইজ্জৎ বর্তমান ইউনিয়নের।

সাতপুকুর শ্মশানের ওপাশে হাটখোলা গ্রামে একজন নীরব কর্মীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বয়স অল্প হ'লেও ছেলেটির অসাধারণ বুদ্ধি। গোড়াতে সে এসব বড় কাজের মধ্যে আসতে চায় নি। হাটখোলাতে একটি স্কুল খুলেছে, ছোট স্কুল। ওপাশের দু-তিনখানা গ্রামের ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়ছে—আব রাত্রে বড়রাও আসে লেখাপড়া শিখতে। আপনার কাজ নিয়েই উক্ত বরেন মজুমদার ডুবে থাকে। চাষীদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করে। তাদের কাছে খাতিরও পায় যথেষ্ট। বছরখানেক আগে নাকি সে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে শোনা যায়। একদিন কোথাথেকে কি করে যে বরেণ মজুমদার এই হাটখোলা গাঁয়ে এসে পড়ল, সেকথা কারুর মনে পড়ে না। অর্থাৎ খেয়ালই করে নি কেউ! সে অন্য কাহিনী। কেউ তাকে চিন্‌ত না। কিন্তু এখন—মনেও হয় না তা, তাকে না-চেনা কে আছে!

বরেন মজুমদারকে আবিষ্কার করার গৌরব যদি কাউকে দিতে হয় ত তা সুধীরেশ চাকলাদের প্রাপ্য। সুধীরেশও হালআমলের আমদানী। তার চোখেমুখে খই ফোটে। কথায় কথায় জঙ্গী জিগির দিয়ে সে কোক্-ওভেনের চুল্লীমহল্লাকে আরও গরম করে তোলে। সে বলে—আমাদের সামনে পিছনে দুষমণ, এখন এমন নেতিয়ে নেতিয়ে চল্‌লে মরতে হবে দাদা! জোরসে কাজ উঠাও। আর শূয়ারকী বাচ্ছা কোম্পানীর কাছ থেকে রূপিয়া খিঁচে লাও। দেবে না!—কোন্ হিট্‌লার আমাদের রোখে দেখি! দুনো মাইনে জরুর

আদায় হবে। না দিলে হাতিয়ার বন্ধ করবো, দেখি কি হয়! এখন বাবা চালাকীর সময় নয়।

এই সুধীরেশই একদা জনচারেক পাকা-পোক্ত লোক নিয়ে হাটখোলার বরেন মজুমদারের শিবিরে হাজির হ'ল। বেশি কথা বলবার দরকার ছিল না। বরেন মজুমদার সব খবর রাখে। এবং সে শ্রমিকের জন্য নিজেব জীবনকে জামিন দিতেও প্রস্তুত আছে। তবে, তাকে ত কেউ চেনে না—নামজাদা সব লীডারকে আনতে হবে, লীডারদের কথা সবাই শুনবে—বুঝুক-না-বুঝুক, মেনেও নেবে। আর বাকী মেহনতের কাজ অবশ্য বরেনই করবে!

বরেন মজুমদারের সাহস বড় বেশি। সে অনায়াসেই বল্‌ল,—কোম্পানীর খাশ জমিতে মিটিং করতে হবে। একশ চুয়াল্লিশ ধারা? আইনেব গণ্ডী দিয়ে ঘেরা শহর? চারিদিকে পুলিশ-সৈন্য মোতায়েন?—সব জানে বরেন মজুমদার। শুধু একবার জনমতটা তৈরী করে ফেলার ওয়াস্তা। তারপর আর ভাবনা নেই। কোম্পানীর নাকের ডগায় কলা দেখিয়ে সবকিছু কামাল্ করা হবে। রুখতে পারবে না কেউ!

লোকটা বলে কি?

দত্তগুপ্ত বললে—অত মাথাগরম করা ঠিক নয়। কোম্পানীর চেয়ে ইংরেজের সঙ্গেই বাধবে লড়াইটা। এই ত চোখের ওপব দেখলেন, বাঘাবাঘা সব নেতাদের খপাখপ্ খাঁচায় পুরে ফেল্‌ল, কেউ রুখতে পেরেছে?

বরেন মজুমদার হো-হো করে হেসে উঠ্‌ল—আবে মশাই, ওরা সব অহিংসার ছানা। গোলমালটা সেখানেই যে! আরে আমাদের লড়াইটা ত ইংরেজের সঙ্গে নয়, কোম্পানীর সঙ্গে। ফান্‌ডামেণ্টাল ইস্যুতে গলদ নেই আমাদের।

—এ আপনি কি বল্‌ছেন স্যার! ইংরেজ আর কোম্পানী কি আলাদা?

—আলবাৎ আলাদা। কোম্পানীর মোদ্দা কাজ—পয়সা রোজগার করা। আর ইংরেজের এখন সবচেয়ে বড় কাজ—যুদ্ধে জয়লাভ করা, এই দেশকে রক্ষা করা।

—তাতে কি এলো গেলো! কোম্পানী সরকারেরই কাজ করছে ত!

—আরে আমরাও চাই এই যুদ্ধের কাজ করতে। আমাদের সঙ্গে সরকারের

সেই সওয়াল। বুঝুন ব্যাপারখানা তলিয়ে! আমরা মানে শ্রমিকরা এই দেশের পক্ষ থেকে যুদ্ধে সাহায্য করতে চাই—কিন্তু উপবাস করে ত আর কাজ হয় না। আমাদের বাঁচার জন্য অন্ন চাই, মাথা গোঁজার ঠাঁই চাই—কেমন কি না? কোম্পানীর কাজ ততখানি করব যতটুকু মাইনে বা বাঁচবার সুবিধে-সুযোগ পাবো। এখন সরকার যদি লড়াই করতে আমাদের সাহায্য চায় ত আমাদেব খেতে পরতে দিক—অন্ততঃ নজর দিয়ে দেখুন কোম্পানী আমাদের দেখ্‌ভাল্‌ করছে কিনা! ব্যস, সেটুকুই ত আমরা চাচ্ছি!

—তা বটে।

—তাহ্‌লে এখন দেখুন। আমাদের দরজায় জাপানীরা হানা দিয়েছে। তারা ভাইজাগে বোমা ফেলেছে, কলকাতায় ফেলেছে—হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে আসছে। জাপান আমাদের শত্রু, সর্বনাশ করতে উদ্যত। জাপানকে রুখতে হবে। তার জন্যে দস্তুর মতো প্রস্তুত হতে হবে। অতএব এই যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ!

দত্তগুপ্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এইটুকু একরত্তি এক ছোক্‌রা—বলে কী! দত্তগুপ্তর মুখে কথা সরে না। আর সকলেও নির্বাক।

বরেন মজুমদার বল্‌ল—আমাদের দাবিগুলো এখন কোম্পানীর কাছে পেশ করতে হবে। আর এই সঙ্গে একটা কথা আপনাদের বলে রাখি—এত বড় দায়িত্ব আমি একলা ঘাড়ে নিতে পারি না। কাজেই কমিউনিস্ট পার্টির কাছে আমাদের সাহায্য চাইতে হবে। এ ছাড়া শ্রমিক-স্বার্থ বজায় রাখার আব কোনো পথ নেই, থাকতে পারে না!

—শেষে আবার না বানচাল হয়ে যায়!—একজন বলল।

সুধীরেশ জবাব দিল—বানচাল হবার কিছু নেই এতে। এই রাস্তাই জবরদস্ত রাস্তা। আমাদের এই পথই নিতে হবে।

বরেন বল্‌ল—আমার কথা বলেছি। এখন আপনারা স্থির করুন, কি করবেন।

স্থির যা হবার তা ত আগেই হয়ে গেছে। বদ্ধ জলার পচনে শ্রমিকরা হাঁপিয়ে উঠেছে। বাঁচবার জন্য শক্তি সংহত করে আবার সংগ্রাম

অবশ্যই করতে হবে। এবার আর শ্রমিকদের প্রকাশ্যে ইউনিয়নের সভ্য হতে বাধা নেই—কারণ কর্তৃপক্ষ কোনো হুম্‌কী দিচ্ছেন না। একেবারেই যে দিচ্ছেন না তা নয়, স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে প্রত্যেক কর্মচারীই সরকারের জরুরী কাজের দায়িত্ব বহন করছে, যুদ্ধের জন্যে তাদের প্রয়োজন অপরিহার্য। এসেন্সিয়াল সার্ভিসের ছাপমারা রয়েছে কারখানা শহরের প্রত্যেকটি শ্রমিকের ললাটে। চাকরী ছাড়তে ইচ্ছে করলেই তুমি তা পারো না। আর স্ট্রাইক! একবার করতে চাও না, দেখবে ঠ্যালাখানা।··· কিন্তু ওই পর্যন্তই, তার বেশি কিছুই বল্‌ছে না কেউ। এমন কি দোর্দণ্ড-প্রতাপ অনিরুদ্ধ মল্লিকও চুপ করে রয়েছেন। অবশ্য, কোনো দিনই তিনি কথা বলে বাজে সময় নষ্ট করেন না, আড়ালে থেকে বিধাতার মতোই কাজ করে যান। কিন্তু তাঁর কাজেরও বড় নমুনা কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।

শ্রমিকরা একটু-একটু করে বুঝে নিল, কোম্পানী তাদের ঘাঁটাতে চাইছে না। তার মানে, শ্রমিকদের ঐক্যকে স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত—অধিকারকেও! এ কথাও তাদের ভাবতে ভরসা হচ্ছে এখন।

বরেন মজুমদার অসামান্য বিচক্ষণ মানুষ। হ্যাঁ, মানুষের মতো মানুষই সে—এখন আর তাকে ছোক্‌রা বলে তাচ্ছিল্য করা চলে না। তারই আহ্বানে, বড় বড় নেতারা এসে জড়ো হয়েছেন। তাঁরা সরকারী ডাকবাংলোতে উঠেছেন। মানিকপুরে বিপ্লবী পার্টির নেতারা আসবেন সভা করতে।

রামকিষণ সেদিন রাত্রে রামায়ণ গানের আসরে ঘোষণা করল—একদম সব ভারী ভারী লীডরলোক এসেছে। আরে বাপ রে, কী দাপট—সদর্‌সে ম্যাজিস্টর সাব, ডেপ্‌টী সাব, ইধর্‌সে রবিন সাহেব, আউর ভি বহুৎ-বহুৎ রইস আদ্‌মীরা মূলাকাৎ করনে কে লিয়ে গিয়া রহা! শনিচারের মিটিং সে কুছ এস্‌পার ওস্‌পার জরুর হোগা! ইস্‌ সভাকে লিয়ে কারখানা আধা ঘণ্টা পহলে ছুটী ভি মঞ্জুর কিয়া!

তেওয়ারী বল্‌ল—আরে ভাই, প্রোটেক্‌টেড্‌ সিটিই ত চার ঘণ্টাকে লিয়ে খুল্‌ যায়েগা! দেখো তাজ্জব!

আধঘণ্টা আগে কারখানার ছুটি হবে শনিবার। মিটিং-এর জন্য চারঘণ্টা

ধরে মানিকপুরে বাইরের লোকদের ঢুকতে বেরুতে টাউন-পাস লাগবে না, চুয়াল্লিশ ধারা ওই সময়ের জন্য বলবৎ নয়! শ্রমিক মহল আপনাদের কুদরতে গর্বিত। আর সেই সঙ্গে সর্বাগ্রে ধন্যবাদ দিতে হবে বরেন মজুমদারকে। সত্যি, সে না থাকলে এসব কিছুই হ'ত না! শ্রমিকেরা নিজেদের ক্ষমতা কি এর আগে কখনও জানতে পেরেছিল?

সনাতন ময়দানেই সভা হবে। এর আগেও এখানে অনেক সভা হয়েছে। সেই সেবার যে স্বামী সাহেব এসেছিলেন, তিনিও এই বক্সীবাঁধের মাঠেই প্রথম অভিভাষণ দিয়েছিলেন, আজ আর স্বামী সাহেবের নাম কেউ মুখে আনে না—শুধু ঘৃণাভরে বলে বেইমান, বেশরম সরমায়াদার দালাল!

বক্সীবাঁধের এই ময়দানে তাদের পরাজয় ঘটেছে একদা। আজ সেইখানেই যে শ্রমিকদের জয়-ঘোষণা সম্ভবপর হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এবারের সভাতে সত্যিকার শ্রমিক স্বার্থের দাবিদাররা আসছে—তাদের সামনে জননেতারা হাজির হবেন।

সর্বাগ্রে জমায়েৎ হ'ল কোম্পানীর ছাপমারা গুণ্ডারা—এধার-ওধারে তারা ছড়িয়ে পড়ল। তেলপাকানো, রুপোবাঁধানো লাঠি তাদের সঙ্গী। অল্পক্ষণের মধ্যেই জোয়ারের মতো উত্তাল জনতা জিগির দিতে দিতে কারখানার পাশের পথ দিয়ে ময়দানের দিকে আসছে বোঝা গেল—তাদের মিলিত কণ্ঠের আওয়াজে বোঝা গেল তারা আসছে। মাইক্রোফোন টেস্ট করলেন মহাবীর গুপ্ত। হ্যাঁ, গলার আওয়াজ বটে!—মেরে প্যারে বহ্‌নোঁ ও'র ভাঁইয়োঁ! বন্ধুগণ!…

তাঁর সমান দখল বাংলাতে আর হিন্দীতে। বয়স অল্পই। কে যেন বল্‌ল, বাঙালী। কিন্তু এমন চোস্ত হিন্দী বলে, কে বুঝবে যে বাঙালী! চওড়া বুকের ছাতি। ছুটে ছাড়া আস্তে চল্‌তে জানে না।

—এঁ্যা, কী বল্‌লেন? মহাবীর কার ভাই? সে কি মশাই, তিনি যে পুলিশের খোদকর্তা!

—সেই ত মজা। বাঘের ঘরেই ঘোগের বাসা! দাদা হচ্ছে দাপুটে পুলিশ আর ভাই করছে বিপ্লব!

—কি বিচিত্র এই দেশ !

—মহাশয়ের বুঝি থিয়েটার-টিয়েটার আসে ?

—আসে মানে ? আর্ট, স্রেফ আর্ট নিয়েই পড়ে আছি মশাই, আর্টেই ত জন্ম !

—তা এখানে কি করা হয় ? আমিও মশাই রট্ করছি এখানে—এমন নীরস জায়গা !

—আর বল্‌বেন না। দাদার মামাশ্বশুর আবার আমাকে বড্ড স্নেহ করেন। জোর করে নিয়ে এলেন, কি আর করি ! এলাম, এখন টাইম আপিসে আছি। বল্‌লেন কি, কলকাতায় বোমা পড়ছে ! চলো আমার কাছে থাকবে—সেফ্ জায়গা। খুব সেফ্ জায়গা—জাপানীরা ত বাগ পেলেই ঝেড়ে দেবে কয়েকখান খাস্তা গরম বোমা। এদিকে যার জন্যে আসা তাই গেল ফস্কে ! মামাশ্বশুরটি তাঁর ফ্যামিলিকে ঠেলে দিয়েছেন আমাদের দেশের বাড়িতে। হাত পুড়িয়ে খাচ্ছি মশাই। সব হচ্ছে লোহালক্কড় ! ধ্যাৎ—এতে কি আর আর্ট বাঁচে ? নো ফেমিনন্ চার্ম, খামোখা এখানে এলুম।

—যা বলেছেন। তবে একটা খুব বাঁচোয়া যে এটা হচ্ছে রক্ষিত শহর, বোমাটা ফেলবে কি করে ?

ওদিকে বক্তৃতা শুরু হয়ে গেছে। প্রৌঢ় নেতা কৃষ্ণকান্ত মুখুয্যে অনর্গল হিন্দীতে বলে চলেছেন।—রুটির সওয়ালই আজকের এই মজদুরী দুনিয়ার বড় সওয়াল। আর তার চেয়েও বড় হচ্ছে দুষমনকে হঠিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব। হ্যাঁ, যদি আমাদের বাঁচতে হয় তবে জাপানীদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। তাহলে এখন আমাদের সব্ সে পহ্‌লে কি কাজ ? না, জাপানকে রুখতে হবে ! তার জন্য কি করা দরকার ? হাতিয়ার-পত্তর বহুৎ বানানো। ধর্মঘট আমরা করতে পারি—এককথায় দুনিয়ার মজদুর এক হয়ে তাবৎ কলকারখানার কলিজা ঠাণ্ডা করে দিতে আমাদের একটুও দেরী হবে না। ঠিক কথা। কিন্তু তা করলে আমাদের বিরাট সর্বনাশ হয়ে যাবে। রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের দুষমনী—আবার সেই সুবাদেই ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার মিতালী, ইংরেজেরও তাই। এখন ভারতকে, আপনার দেশকে আগে বাঁচাতে হবে। সেই কাজ হাসিল করতে—

চাই কাজ, আরও বহুৎ বহুৎ প্রোডাক্শন—আমাদের করতেই হবে। তবে কি আমরা সেজন্যে কোম্পানীকে পূজো করবো? জরুর নেহি। শয়তান, লালু-শষ্‌ণেবালা কোম্পানীকে আমরা থোড়াই খাতির করি। জবরদস্তী-সে আমাদের হুকুমৎ জারি করবই করব। আগর ও শালালোগ না মানে ত এ্যায়সা দাওয়াই হামলোগ বাতায়েঙ্গে!···

জনতার মধ্যে ঘনঘন করতালি আর উল্লাস ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল।

কৃষ্ণকান্ত মুখুয্যে পাঞ্জাবীর বুক পকেট থেকে একটা সিগারেটের টিন বার করে, তার মধ্যে খানিকটা পানের 'পিচ্‌' ফেলে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে আর একটা পান গালে ঠেসে দিয়ে বক্তৃতা করে চল্‌লেন—আউর এক বাৎ হ্যায়।·· গত বছর, তার আগের বছর—হর সালমে ৯৬৬৪০০০ মেহনতী দিন ভারতবর্ষে নষ্ট হয়েছে—এই ধর্মঘটের হাঙ্গামায়। এই ছিয়ানব্বই লক্ষ চৌষট্টি হাজার মেহনতী রোজ বরবাদ হওয়ার ফলে বহুৎ ক্ষতি হয়েছে। সে ক্ষতি যে কেবল পুঁজিওয়ালাদের হয়েছে তা নয়। সাড়ে ছ লাখ মজদুরেরও ক্ষতি হয়েছে। ভারতের এই ক্ষতি মজদুর মহলের তাগদ ফলাও করেছে, আবার জখম ভি করেছে কঁহি-কঁহি। ইস লিয়ে ইয়ে খেয়াল রাখনা, ক্যাপিট্যালিস্টদের কাছ থেকে যতটা পারা যায় ততটা ছিনিয়ে নিতে হবে। আর স্ট্রাইক করলে কি হবে? আমরা যুদ্ধে হেরে যেতে পারি। তারও আগে ইংরেজ এখন আইন জারি করেছে এসেন্সিয়াল সার্ভিস—কাজ না করলেই মেয়াদ খাটতে হবে। আরে ভাই, সরকারকে আমাদের দফাওয়ারী দাবি জানিয়ে দিচ্ছি—কোম্পানীকে চোখ রাঙিয়ে আমাদের ন্যায্য দাবি পেশ করছি, বে-ওজর সব ডিম্যাণ্ড হাসিল হয়ে যাবে। কিন্তু স্ট্রাইক হঠাৎ করা চলবে না! বিনা স্ট্রাইকেই আমাদের কাজ আরও ভালো হবে। নইলে জাপানী দুষমনকে হঠানো যাবে না। প্রোডাক্শন বাড়াতে চলো, ওঁর ডিম্যাণ্ড হাসিল করতে চলো—!

ধর্মঘট হবে না অথচ ইউনিয়নের কাজ চলবে—বিনা প্রতিবাদে, এত সহজে মালিক পক্ষ যে কর্মচারীদের দাবি মেনে নেবে, একথা বিশ্বাস করতে পারে না অনেকে। তবে হয়তো দিনবদল হয়েছে, কর্তৃপক্ষ হয়তো বুঝতে পেরে থাকবেন

যে, শ্রমিকের ন্যায্য প্রাপ্যটুকু দিতে তাঁরা বাধ্য! কিছুই বলা যায় না—!

অনেকেই বক্তৃতা দিলেন, তবে সকলেরই বক্তব্য মোটামুটি এক। ধর্মঘট করা চলবে না, আরও বেশি কাজ করতে হবে। মজুরীর হিস্যা পুরোদস্তুর বুঝে সমঝে আদায়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন নিচ্ছে—সে ভাবনা ইউনিয়নের!

সভার পর সকলেই বেশ হৈ-চৈ করতে করতে ঘরে ফিরল।

আবার কতকাল পরে শ্রমিকদের মনে একটা সজীব উত্তেজনার স্রোত বইল। আজকের এই সভাতে পুরনো আমলের অনেকেই বলাবলি করেছে সারথী, ঘোষালের কথা। আজ যদি তারা থাকতো তাহলে হয়তো শ্রমিকদের নিজের তরফের প্রতিনিধি হিসেবে দু-চার কথা বল্‌তো। কিন্তু—। না, এতে আর কিন্তু থাকতে পারে না, যারা চলে গেছে তাদের জন্যে দুঃখ করে কি হবে! আজ যারা এগিয়ে আসছে তাদের মুখ চেয়েই চল্‌তে হবে। তবু ভালো যে, এই নতুনেরা হুট্ করে ধর্মঘট জিগির তোলে নি—তাহলেই আবার পুরনো দুঃখের দিন ফিরে আসতো। সেই উপবাস, সেই অশান্তি ও আর অনিশ্চয়তার পীড়নে জীবন বিড়ম্বিত হ'ত।

কারখানার কর্মীদের মধ্যে থেকে কেউ কোনো বক্তৃতা দেয় নি, নেতা হবার মতো কেউ তেমন নেই বুঝি! তা না-ই বা রইলো, মহাবীর গুপ্তরা ত এই শ্রমিক ইউনিয়নেরই আপন লোক! ব্যস, তাহলেই হ'ল!

কতকাল পরে এরা সবাই বাইরের নেতাদের মুখে নিজেদের স্বার্থের কথা শুনলো! পাশাপাশি বসে প্রকাশ্য সভায় দাবিদাওয়ার কথা কইতে পেরে বাঁচলো! ইউনিয়ন করো, সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলে চাপ দাও কোম্পানীকে

বাইরে মোটামুটি একটা খুশীর ভাব দেখালেও, শ্রমিকেরা পুরোপুরি যেন বিশ্বাস করতে পারে না যে, বিনা দ্বন্দ্বে এক কানা কড়িও কোম্পানীর কাছে আদায় হবে। তা যদি হ'ত তবে এতদিন কর্তৃপক্ষ চুপ করে থাকতো না। বাধা একটা আস্‌বই—হয়তো মালিক-পক্ষ বিশেষ সুযোগের প্রতীক্ষা করছে!

তবে একেবারে কোনো কিছুই ছিল না, তারচেয়ে একটা তবু ধ্বজা খাড়া হ'ল। তারপর কতদূর কি গড়ায় দেখাই যাক, সবারই এই মনোভাব।

পঁয়ত্রিশ

ইউরোপীয়ান ক্লাবে কলকাতার নেতাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ। পান-ভোজনের সঙ্গে নাচগানের আয়োজনও ঢালাও। একমাত্র মহাবীর গুপ্ত ছাড়া নাচের দিকে বিশেষ কেউ ঘেঁষলেন না। মহাবীর এই বয়সেই বিলেত থেকে ঘুরে এসেছেন। জনগণের নেতা হ'লেও তিনি আদবকায়দায় উচ্চকোটির এ্যারিস্টোক্র্যাট। প্রচুর হুইস্কিতেও তাঁর পা টলে না।

মিস্টার মুখার্জি এখানে এসেও সিগারেটের টিনে পানের 'পীক্' ফেলে যাচ্ছেন সমানে। অনিরুদ্ধ মল্লিকের সঙ্গে তাঁর বচসা শুরু হয়েছে। মল্লিক বল্‌ছেন— আজ আপনারা বল্‌ছেন বটে যে, আমাদের সঙ্গে আপনাদের বিরোধ নেই। আমিও জানি যে, যা যা ডিম্যাণ্ড আপনাদের তরফ থেকে এসেছে, সেগুলো not too much. কিন্তু কি জানেন, এখানেই এর শেষ হবে না—Bread, more bread, cheaper bread. Give them a square meal and they would scorn the pomp of king. এখন আমরা দিচ্ছি কিন্তু এর পর আপনারা যখন আরও বড় দাবি করবেন তখন কি হবে?

কৃষ্ণকান্ত পানের রস উদরস্থ করে বল্‌লেন—আপনার আশঙ্কা একেবারেই অমূলক। আমরা যুদ্ধের সহায়তাই করতে চাই, আমাদের স্বার্থ সেখানে বাঁধা। These workers are mere instruments. এটা ত ঠিক যে, you are not giving them a square meal.

—আর কি, টাকায় আট সের খাদ্যশস্য দিচ্ছি মাথা পিছু! এটা কি কম হ'ল? একেবার হিসেব করে দেখুন, নগদ টাকা দিলে অঙ্ক কোথায় গিয়ে পৌঁছয়!

—কম নয় কিন্তু তাদের আরও অনেক কিছু পাওনা বাকী থাকছে—সে সম্বন্ধে আমরা press করেছি কি? আপনি বল্‌লেন, নতুন কোয়ার্টার এখন হতে পারে না; সিমেণ্ট, লোহা সবকিছুই দুর্লভ—বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে আমরা আপাততঃ সে দাবির ওপর ত জোর দিচ্ছি না।

—আপনারা press করলেই কি পেতেন ?

মুখার্জি মৃদু হাসলেন—what about increment ? মাইনে না বাড়ালে হবে না।

—বাঃ, টাকায় একআনা করে ত যুদ্ধ বোনাস দিয়ে দিচ্ছি।

—বড্ড কম হয় সেটা।

—আগেই ত বলেছিলাম আপনাকে, আমাদের এর বেশি ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না।

—এনি ওয়ে, আপনাদের আবার কনসিডার করবার জন্য অনুরোধ রইল। Don't you treat us beggars.

—Of course not. Please have some drinks.

—Thanks.

বলে মিস্টার মুখার্জি পানপাত্র হাতে তুল্‌লেন। চুমুক দিতে দিতে বল্‌লেন—মহাবীর in his English habits excels, oh ! Precious guy !

পালিশ-পিছল মেঝেতে রবিনসন-পত্নীর সঙ্গে নাচে মশগুল মহাবীর গুপ্ত এদিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না।

অনিরুদ্ধ মল্লিক চুরুট ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে বল্‌লেন—আপনারা কাল রওনা হচ্ছেন ?

—হ্যাঁ, এখান থেকে একবার আসানসোল যাবো, ওখানে কিছু কাজ রয়েছে। আপনাদের সঙ্গে বরেনই ডিল করবে।

—প্রোডাক্‌শন আমাদের অন্ততঃ ফিফ্‌টি পার্সেণ্ট বাড়া চাই। নইলে এত খরচপত্র সবই বাজে হয়ে যাবে।

—ছাট ইস্ আপ টু ইউ। স্ট্রাইকটা বাঁচাবার দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। এখন আপনারা একটু চাপ দিন, তাহলেই সব ঠিক চলবে।

অনিরুদ্ধ মল্লিক ভ্রূকুঞ্চিত করে অন্য দিকে তাকালেন। এইসব ফন্দী-ফিকিরের উপর তাঁর তত আস্থা নেই। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। এই কাজের মরসুমে একবার স্ট্রাইক শুরু হ'লে সাম্‌লানো যেতো না। সর্বত্রই এখন মেহনতী মানুষের অভাব। কাজেই বাইরের লোক

আনিয়ে কারখানা চালানো অসম্ভব। তা ছাড়া সরকারী নিয়মে শ্রমিকদের মাইনে বাড়ানোর প্রশ্নটা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এতো রকমে জটিলতা এসে জুটেছে যে, কিছুটা স্বার্থত্যাগ অবশ্য না করে উপায় ছিল না। স্বার্থত্যাগ নয় বিরাটতর স্বার্থের খাতিরেই এটা করা। গ্রেট বেঙ্গল স্টীল ম্যানুফ্যাকচারার্সের হাতে এখন মিলিটারী অর্ডার যা এসে জমেছে, তাতে সবারই মাথা ঘুরে গেছে। দিন-দিন বেড়েই চলেছে অর্ডার।

পরদিন সকালে মানিকপুরের পথে পথে একখানা মোটরভ্যানে লাউডস্পীকার লাগিয়ে প্রচার করা হ'ল—মজদুর দুনিয়ার ভালাই-এর জন্য নতুন ইউনিয়ন তৈরী হয়েছে। এই ইউনিয়নের ওপর মেহনতী জনতার যথেষ্ট পুরোদস্তুর আস্থা আছে—এক ডাকে সবাই এই লালঝাণ্ডার নীচে জমায়েৎ হয়েছে। এখন আর ভাবনা নেই। পুঁজিবাদীর জুলুমী জমানা খতম হয়েছে। ইন্ কিলাব জিন্দা-বাদ! ধর্মঘট বাতিল। ওভারটাইমে দু-নো মজুরী মিলবে। টাকায় এক আনা ওয়ার-বোনাস মঞ্জুর হচ্ছে। অতএব ইউনিয়নে এখনও যাঁরা যোগ দেন নি তাঁরা দলে দলে আসুন। এসে আমাদের যুদ্ধ জয়ের অভিযানে হাত মেলান। এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ! জাপানকে রুখতে হবে। ইন্ কিলাব জিন্দাবাদ!

শুধু সেদিন সকালেই নয়, তারপর থেকে প্রায় মাঝে মাঝেই মানিকপুরের কুলী মহল্লার সরুসরু পথে এ গাড়িখানা হাঁকাহাঁকি শুরু করল—আর তার পিছনে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা মহা উৎসাহে ছুট্‌তে লাগ্‌ল খালি গায়ে, খালি পায়ে।

ওদিকে ইস্‌মাইল এবং তার দু-চারজন ভক্ত একদিন সন্ধ্যায় ইউনিয়নের নতুন অফিসে হাজির হয়ে বরেন মজুমদারের সঙ্গে দেখা করল। দু-চার কথার পরই তুমুল তর্ক বেধে যায়।

ইসমাইল বল্‌ল—বাবুজী, আপনারা এসব কী বল্‌ছেন? ইউনিয়নই যদি করলেন ত কোম্পানীর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন কেন? দু-এক পয়সা ভিক্ষে পেয়ে এত লাফালাফি করবার কী আছে?

বরেন মজুমদার একটু তাচ্ছিল্যের সুরেই বল্ল—আমাদের প্রোগ্রাম মাফিক সাক্‌সেস্‌ফুল কাজই হচ্ছে। এটুকু জেনে খুশী থাকুন।

—দেখুন, এর আগে স্বামী সাহেবের আমলে আমরা যে যে সুযোগ-সুবিধে পাবো কথা ছিল, সেগুলোর মধ্যে অর্ধেকই কোম্পানীর কাছ থেকে আদায় হয় নি। একথা আপনাদের জানা আছে—অথচ তার জন্যে কৌশিস কিছু হচ্ছে না। আর ওই যে এক আনা টাকায়, ওতো ভিক্ষেই? কলকাতায়, কি টাটাতে দেখুন, মহাঙ্গী ভাতার জন্যে কম্‌সে কম মাসে বিশ টাকা মঞ্জুর হয়েছে। আমাদের ইউনিয়নের এখন স্ট্রাইক করাই উচিত ছিল।

—স্ট্রাইক? ও'া কংগ্রেস রিএ্যাক্‌শনারীদের বুলি।

—বাবুজী, কংগ্রেস ত ভালো কথাই বলেছে! তা সে সব বড় কথা। আমরা মজুর, আমাদের সওয়াল রুটির সওয়াল। মেহনৎ করবো, পয়সা নেবো। আপনারা পড়ালিখা জানা মানুষ—তাই বেশি বোঝেন। আমাদের যা মনে হয় তাই বলছি, এখন যদি আমরা স্ট্রাইক করতে পারি তবে কোম্পানী জব্দ হয়ে যাবে। কেন না, মাথার ওপর লড়াই, জাপানীরা হরদম হানা দিচ্ছে—এখন লোহা-ইস্পাত ছাড়া ইংরেজের লড়াই অচল। কোম্পানীর সঙ্গে সরকারের বিস্তর মালের কনট্রাক্ট হয়েছে। এই মওকায় হাতিয়ার বন্ধ করলে কোম্পানী আমাদের দাবি না মেনে পথ পাবে না।

কথাগুলো বল্‌তে বল্‌তে ইস্‌মাইলের চোখদুটো জলে ওঠে।

বরেন মজুমদার উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে জবাব দিল—আপনার চিন্তা ভুল পথে চল্‌ছে। হালচাল এখন বদলে গেছে। সোজা হিসেবটা দেখুন—এর আগে কাপড়জামার দোকানে কি রেওয়াজ ছিল? না, আপনি দোকানের দিকে একবার তাকালেই কৃতার্থ হয়ে ডাক্‌তো—আসুন, আসুন! দোকানদার বিশজোড়া কাপড় ফেলিয়ে দশ রকমের পাড় দেখিয়ে আপনার পছন্দ-মাফিক কাপড় গছাবার চেষ্টা করত। কিন্তু আজ?—আজ আপনি দোকানে ঢুকে সাধাসাধি করলেও তারা এতটুকু ফিরে চায় না! সাফ জবাব, নেই মশাই! এও তেমনি, এর আগে আমরা বলতাম স্ট্রাইক করো! এখন পরিস্থিতি বদ্‌লেছে, বলি খুব—বেশি কাজ করো। আমরা কাজ দিয়ে শ্রমিকের হিস্সা হাসিল করব।

ইস্‌মাইল বল্‌ল—আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—না বোঝবার কিছু নেই ত! স্পষ্ট কথা—স্ট্রাইকের জন্য আমাদের অন্য পরিস্থিতি দরকার।

ইস্‌মাইল শ্লেষের হাসি হাসলো—বাবুজী, আপনারা সেই রাতে যখন শাদা ইনষ্টিটিউটে ফূর্তি করতে গেলেন তখনই আমাদের জানা হয়ে গিয়েছে যে, তামাশা বহুৎ জোর! কিন্তু আপনারা কেন এই গরীবদের তগ্‌দির নিয়ে গেণ্ডুয়া খেল্‌ছেন বাবুজী! পহেলা চোটে ভগবান মেরেছেন—গরীবের ঘরে জনম্‌ দিয়ে। দুসরা দফায় কোম্পানী মারল নোকরী দিয়ে—আবার আপনারা এসেছেন আমাদের ভালাই চাইতে—আপনাদের কাছে এ আরজী, আমাদের নিয়ে তামাশা করবেন না। ইউনিয়নের দখল মজুরদের হাতে ছেড়ে দিন, না হয় তাদের স্বার্থটা খেয়াল রাখুন।

বরেন মজুমদার এবার উত্তপ্ত স্বরে গর্জে উঠ্‌ল—আমরা যা ভালো বুঝব সেটাই তোমাদের ভালো। ব্যস, এখন যাও, আমার অন্য কাজ আছে।

—যাবো? কিন্তু মজদুরের দাবিকে উড়িয়ে দিয়ে আপনারা টিকে থাকতে পারবেন না। আজ আমি যাবো, কিন্তু আপনাকেও কাল কি পরশু যেতে হবে, বুঝলেন?

বরেন মজুমদার ঘাড় নীচু করে কি একটা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বাইরে বেরিয়ে ইসমাইল তার ক্ষুদে সাকরেদ জিলানীকে বল্‌ল—ঠিক আছে ভাই। মাঝে ত কিছুই ছিল না, তবু এ একটা খাড়া হ'ল। লেবার ত জানলো যে তাদের একটা ইউনিয়ন হয়েছে! এটুকুই লাভ।

জিলানী ক্লান্ত কণ্ঠে বলে—লেকিন মদৎ দিতে সায় মিল্‌ছে না ওস্তাদ।

—নেহি ভাই, মদৎ জরুর দিতে হবে। একদিন এমনও তো হতে পারে যে, ইউনিয়নের ঘাড়ে চাপ দিয়ে লেবার আপনা কাম হাসিল করিয়ে নেবে। এ কী জানো, মিলন, যিস্‌কো কহতা—কি না, একতা। আরে আপনা আপনা কাম করতা, আউর ঘরমে দিন গুজর্‌তা। ইসমে দশ-বিশ শও-হাজার আদমীকা তো নেহী মিলন হোগা! আগর ইউনিয়ন জিন্দা রহে তো কোই মণ্ডকে মে সারে মজদুরেঁ এক হো যাতে। আজ ইয়া কাল—কোই হরজ নেহি।

জিলানী বল্‌ল—ইয়ে ত সহী বাৎ! মিলন্‌কো জিন্দা রাখনে পড়েগা, ঠিক!

ইউনিয়ন পত্তনের প্রথম দিকে যে জাগরণের সাড়া দেখা গিয়েছিল, তার রেশ বেশিদিন রইল না। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই মানিকপুরের হাওয়া পাল্টে গেল। এই হাওয়া বদলের মূলে, নতুন একটা পয়সা রোজগারের নেশা!

এ, আর, পি,-র চাকরী একটা নতুন আকর্ষণ। কারখানার ডিউটির পর একটু আরামের কাজ—খাটুনী নেই কিছু, বসে বসে রেডিও বাজাও। রেডিওতে হরদম জাপান-বিরোধী প্রচার বক্তৃতা হচ্ছে—সেগুলো সগৌরবে নগরবাসীদের শোনাও, শুনতে বাধ্য করো। প্রত্যেক পথের মোড়ে একটি করে নতুন রেডিও-সেট কোম্পানী বসিয়ে দিয়েছে—শহরের মানুষ একটু আনন্দ করুক। গান, বাজনা শুনুক তারা। আর তার সঙ্গে যুদ্ধের খবরও ত জানতে হবে। প্রত্যেকটি রেডিও-সেট বাজাচ্ছে এ, আর, পি, র লোক—অর্থাৎ কারখানাতে যারা চাকরী করে তারাই। এর জন্য অবশ্য হাত-খরচ দেওয়া হচ্ছে। অতএব বাড়তি সময় বিশেষ আর থাকে না। ইউনিয়নের কাজে কি পয়সা মিলবে! ওসব হচ্ছে শখের ব্যাপার—হাতে কাজ না থাকলে তখন দেখা যাবে। খাকী পোশাক, মাথায় হেলমেট পরে মেজাজই অন্যরকম হয়ে যায় আলাদা—আত্মবিশ্বাসের মোহও যেন জুড়ে বসে অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত শ্রমিকদের মনে!

দীনদয়াল সান্যালের নাইট স্কুলে লোক জোটে না। লেখাপড়া শেখার চেয়ে ঢের বেশী দরকার নগদ পয়সা রোজগার—এ, আর, পি,তে গেলেই পয়সা এসে পকেট ভারী করে, অতএব দু-চারটে অক্ষর চেনার শখ এখন শিকেতে তোলা থাক না, পরে দেখা যাবে। গেল দীনদয়ালের বিনামাইনের চাকরীটা!

ছত্রিশ

যুদ্ধ এসেছে যেন কুবেরের ধনভাণ্ডার উজাড় করে দেবার জন্যে! মানিকপুর শহরের লোক দু'হাতে টাকা রোজগার করছে। হাওয়াতে উড়ছে টাকার ঝাঁক। কথায় কথায় পকেট ভর্তি হয়ে যাচ্ছে।

কোথায় বিয়াল্লিশ সালের অগাস্ট বিপ্লব হ'ল সারা ভারতে, তাতে মানিকপুরের গায়ে এতটুকু আঁচড় কাটতে পারল না। শহরের দিকে দিকে সামরিক সতর্কতা। হরদম রাইফেলধারী সৈন্য টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। একটু সন্দেহজনক চেহারা দেখলেই তাকে চ্যালেঞ্জ করছে—টাউন পাস?

শহরের মধ্যে থাকতে গেলেই, পুলিশের নজরবন্দী হয়ে থাকতে হবে তোমাকে। তোমার নামে পুলিশ থেকে ছাড়পত্র মঞ্জুর করাতে হবে। পাস না থাকলেই, তুমি শত্রুর গুপ্তচর। অতএব তোমাকে হাজতে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায়ই বা কী!

অগাস্ট আন্দোলনের ঢেউ মানিকপুরে লাগে নি। মানিকপুর অন্য রাজ্য, এখানে কুবেরের বাস।

তবে দু-একটি পরিবারে হয়তো কিছু দুঃসংবাদ এসেছে। যেমন সীতানাথ মুখুয্যের ছেলে দেবজ্যোতিকে রাজদ্রোহের অপরাধে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। তার সঙ্গে এ শহরের কি সম্পর্ক? সে ত বর্ধমানের কাছে কোন্ রেল-ষ্টেশনে দাঙ্গা করতে গিয়েছিল—তাই!

মানিকপুরের মানুষেরা সুখে আছে।

কারখানার ভেতর থেকে অনেক মালপত্র উধাও হচ্ছে। কোনোরকমে একবার সংরক্ষিত এলাকার চৌহদ্দী পার করে দিতে পারলেই ব্ল্যাক-মার্কেটের দৌলতে প্রচুর অর্থাগম হয়ে যায়।

ইলেক্‌ট্রিক তার বাজারে কোথাও নেই, কিন্তু কোম্পানীর কারখানাতে তারের ছড়াছড়ি। তামার তার, নাইক্রোম, ইউরেকা—অভাব কিছুরই নেই। সরাতে পারলেই হ'ল। প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টেরই কতকগুলি লোক এই ধরণের

কাজে হাত পাকিয়ে ফেললো। ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ডের মধ্যেও ভাগ-বখরার অংশ বিতরিত হচ্ছে।

এমন সুখের মুখ আর কখনো দেখা যায় নি যেন।

বাইরের লোক যেমন কষ্ট পাচ্ছে—তাদের দুর্দশা যত বাড়ছে, মানিকপুরের সুখ যেন ততই বেড়ে চলেছে! বাংলাদেশের দিকে দিকে অন্নের অভাবে হাহাকার, আর্তনাদ—কিন্তু মানিকপুরে চাল, আটা কিছুরই অভাব নেই। আর কী সস্তা! এক টাকায় চাল, গম, ডালে মিলিয়ে আটসের জিনিস দিচ্ছে কোম্পানী তার কর্মচারীদের। অতএব মানিকপুর স্বর্গরাজ্য। এই জন্যেই বুঝি এটা সংরক্ষিত নগরী!

কাজ করো টাকা পাবে। কাজের অভাব কি? শ্রমিকদের বরাদ্দ চাল, আটা, কয়লা তুমি স্বচ্ছন্দে বেশী দামে বাইরের শহরে কিম্বা গ্রামে বিক্রী করতে পারো। তাতেও অনেক লাভ থাকে। কারখানার চাকরী করতে চাও? তাও পাবে।

অবশ্য আর একটা দিকও আছে এই হঠাৎ-সুখী শহরের। কাঁচা পয়সার দৌলতে এডিথ ব্রাদার্সের মদের দোকান, ক্যেরু কোম্পানীব চোলাই ভাঁটীর আশেপাশে নিত্যই দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে থাকে আজকাল। দেহ-বিলাসিনীদের নিয়ে নির্লজ্জভাবে মাঠেঘাটে ব্যাভিচারও চলে।

শোনা যায় আশেপাশের গাঁয়েও গরীব চাষাভূষোদের ঘরে হামলা শুরু করে দিয়েছে লেবার আর মিলিটারীর লোক। তা সে দোষ ত গাঁয়ের লোকেদেরই—তাদের ঘরে ভাত নেই, মানুষ তো আর উপবাস করে বেঁচে থাকতে পারে না! প্রাণ থাকতে মরতেও কেউ চায় না। কাজেই নীতির বালাই ঘুচিয়ে দিয়ে যদি এই পথে মানুষ আসে ত, কে কি করতে পারে? লেবার মিলিটারী সবাই ত মানুষ! তাদের দেহের ক্ষুধা আর অপর পক্ষের অন্নের ক্ষুধা—এই দুই-এর বিনিময় ঘটছে! তাও কোথায়? মানিকপুর শহরের ভেতরে এসব হবার উপায় নেই—সংরক্ষিত শহর যে। কাজেই যা হবার এই এলাকার বাইরেই তা হয়। এ শহরের ইজ্জৎই আলাদা।

সকালে বাঁশী বাজে। লোকেরা কাজে যায়। এখন মানিকপুরের কাজের লোক হচ্ছে সাড়ে চৌদ্দ হাজার। নতুন একটা প্ল্যাণ্ট বসেছে—তার আলাদা নাম। সে প্ল্যাণ্টের সঙ্গে যেন পুরনো কোম্পানীর কোনই সম্পর্ক নেই। নাম, খাতাপত্র সবই আলাদা। কাজের লোকও পৃথক। তবে অনেকেরই ধারণা যে কিছুদিনের মধ্যেই পুরনো কোম্পানীকে এই নতুন কোম্পানী কিনে নেবে!

শেয়ারের বাজারে গ্রেট বেঙ্গলের দাম দিন দিন চড়ে যাচ্ছে। তিন টাকা থেকে কয়েক মাসের মধ্যে এর শেয়ারের দাম তেতাল্লিশ টাকায় উঠে গিয়েছে। অবশ্য তার সঙ্গে শ্রমিকদের কি সম্পর্ক? না, একেবারেই যে সম্পর্ক নেই একথা বলা যায় না। বাদামতলার মেসে যারা থাকে তাদের মধ্যে কেউ কেউ জল্পনা-কল্পনা করে, কিছু শেয়ার কিনে রাখলে কেমন হয়! দত্তগুপ্ত মনে মনে এই ভেবে মাদুরের ওপর উত্তেজিত ভাবে খাতা-কলম নিয়ে হিসেব কষে। এবারের ইউরেকা তার যদি দশ পাউণ্ড সরাতে পাবা যায়, ইলেকট্রিক ওয়ার্ড থেকে! তাছাড়া এখন এই চোরাই তারের কারবার সেই দূরপাল্লার কুমারডুবী, কুল্‌টি, সাঁতার কারখানা থেকে চোরাই তার আমদানী হচ্ছে। সব মাল পাচার করা হয়ে থাকে বাজারের সেরা কলকাতা শহরে। সব ইউরেকাকে অনায়াসে নাইক্রোম ব'লে কলকাতার সেই বৃদ্ধ দোকানদারকে গছিয়ে দেওয়া যাবে! একশ না-হলেও নাইক্রোম তার আশীটাকা পাউণ্ড দরে বেচা সহজ—দশ আশী, আটশ! আচ্ছা ধরো, আমার কেনাকাটা কলকাতা-যাতায়াত মোট দেড়শ'। হাতে রইল সাড়ে ছ'শো। তেতাল্লিশ টাকা হিসেবে দশখানা শেয়ারের দাম হচ্ছে চারশো তিরিশ! ব্যস্‌, তাহলে আমিও গ্রেট বেঙ্গল ষ্টীল ম্যানুফ্যাকচারার্সের অংশীদার! আস্তে আস্তে দশখানা থেকে একশ' খানা শেয়ারই কিনে ফেলবে দত্তগুপ্ত। চোরা পথে তারের সাপ্লাই বাড়াতে পারলে আর ভাবনা কী!··· একদিন ওই মল্লিকসাহেবকেও দত্তগুপ্ত হুকুম করবার এক্তিয়ার কিনে নিতে পারে। কোম্পানীর অংশীদার হ'লে ত সে মালিকদেরই একজন হয়ে যাবে!

শুধু দত্তগুপ্ত একাই নয়—সে সময়ে এ ধরণের উদ্ভট স্বপ্ন আরও অনেকেই দেখতো।

সাঁইত্রিশ

সীতানাথের কোয়ার্টারেই দীনদয়াল সান্ধ্য মজলিস জাঁকিয়ে তুলেছেন। সন্ধ্যায় প্রার্থনার আসর বসে—দীনদয়াল তিলকের গীতা পড়েন, ব্যাখ্যা করেন। গান্ধীজীর জীবনী আলোচনা করেন। মল্লিকা, দেবিকা, মিণ্টু এবং আরও কয়েকটি ছেলেমেয়ে এই আসরের নিয়মিত সভ্য জমায়েৎ হয়। সীতানাথও থাকেন—তবে তিনি কোনো আলোচনার মধ্যে নেই, বসে বসে তামাকের ধোঁয়া ছাড়েন।

সেদিন সন্ধ্যায় দীনদয়াল এলেন, অত্যন্ত বিষণ্ণ গম্ভীর চেহারা নিয়ে। তাঁর এ মূর্তির সঙ্গে সকলের পরিচয় নেই। কিন্তু এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি বড় রকমের একটি আঘাত পেয়েছেন।

দেবিকা ডাকল—কাকাবাবু!

—কি মা?

—আপনার কি হয়েছে?

—আমার, না, আমার কিছুই হয়নি মা। তবে তোমার আমার সকলেরই সর্বনাশ হয়েছে।

মিণ্টু সামনে এগিয়ে এসে পিতার পিঠের ওপর ডান হাতখানা রেখে বল্‌ল —খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার, না বাবা!

—আমার? আমার চেয়ে ঢের বেশি কষ্ট হচ্ছে আর একজনের, তোরা তার আর কতটুকু বুঝবি? সীতানাথ হয়তো একটু বুঝতেও পারে। পঁচাত্তর বছর বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হওয়ার কষ্ট আর জীবন্মৃত হওয়া একই কথা।

দেবিকা আকুল কণ্ঠে বল্‌ল—কি হয়েছে কাকাবাবু? কি হয়েছে?

—কস্তুরবা আর নেই রে! শিবরাত্রির দিন সতী-সীমন্তিনী দেহ রক্ষা করেছেন।

খবরটা বজ্রপাতের চেয়েও সাংঘাতিক, তাই বুঝি একটি প্রাণীও এতটুকু শব্দ করতে পারল না! স্তব্ধভাবে খানিকক্ষণ কাটাবার পর দীনদয়াল আস্তে আস্তে বল্‌লেন—এই সেদিন মহাদেব দেশাই মারা গেলেন। সেও ত জেল-

খানাতেই—এর ওপর আবার কাল কস্তুরবা—আমাদের জন্যেই বৃদ্ধবয়সে গান্ধীজীকে জেল খাটতে হচ্ছে, তার ওপর এই শেল! এত নিগ্রহের সাধনা ব্যর্থ হতে দিয়ো না।

সীতানাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—সর্বনাশ হতে আর বাকী নেই। বুড়ো এ শোক সাম্‌লে উঠ্‌তে পারবে বলে মনে করো তুমি?

দীনদয়াল হাস্‌লেন—ওঁর শক্তির কূল, কিনারা খুঁজে পাওয়া ভার। নইলে কবেই ত মরে ভূত হয়ে যাবার কথা।

মিন্টু বল্‌ল—এবার বোধ হয় নেতাদের ছেড়ে দেবে সরকার। দেবুদাও তাহলে ছাড়া পাবে।

সীতানাথ তামাক টানতে টানতে এক ফাঁকে বল্‌লেন—এত অল্পে চিঁড়ে ভিজবে না—ইংরেজ সরকার রাজ্য চালায় বন্দুক দিয়ে, ওদের মায়া-দয়া থাকলে কবেই সব ওলট-পালট হয়ে যেত।

দীনদয়াল গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লেন—এবার আমরা প্রার্থনা করব।

দেবিকা চোখ মুছতে মুছতে গাঢ় স্বরে বল্‌ল—আচ্ছা কাকাবাবু, আমাদের এই প্রার্থনা কি তিনি শোনেন? যদি সত্যিই তিনি শুনতে পান তবে আমাদের দেশের সুদিন কেন আসছে না?

—তাঁর কথা তিনি ছাড়া আর কেউ বল্‌তে পারে কি? তোর আমার চেয়ে তাঁর দৃষ্টি আলাদা মা! হয়তো এর মধ্য দিয়েই তিনি কল্যাণ রচনা করে চলেছেন, আমাদের বদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে সেটা দেখতে পাচ্ছি না।

দরজায় কড়া নাড়ছে কে! মিন্টু তাড়াতাড়ি উঠে গেল।

মিন্টুর সঙ্গে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। তার রুক্ষ এলোমেলো চুল কপালে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। একহারা চেহারা। সবাই তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ দেবিকা কলকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—আরে আরে মন্দাকিনী! ইস্‌ কী চেহারা হয়েছে, একেবারে চেনা যায় না! এ্যাঁ।

মন্দাকিনী একটু হেসে বল্‌ল—মন্দাকিনী নয়, মালবিকা! দোহাই তোমার, বেশি হৈ চৈ কর না। জানো ত আমি ফেরারী আসামী। আমার নামে ওয়ারেণ্ট ঝুল্‌ছে।

দীনদয়াল সবিস্ময়ে মন্দাকিনীর দিকে চেয়ে ছিলেন, দৃষ্টি স্থির রেখেই বল্‌লেন—এসো মা, বসো! আমাদের প্রার্থনায় যোগ দেবে তুমি।

মন্দাকিনী দীনদয়ালের গা ঘেঁসে বসল—কাকাবাবু, আগামী পরশু পঁচিশে ফেব্রুয়ারী সারা ভারতে হরতাল, শোভাযাত্রা-সভাও হবে! মানিকপুরে যাতে এই হরতাল পালন করা যায়, তার ব্যবস্থা করতে চাই। সেইজন্যই এলাম আপনাদের কাছে। দেশের নেতাদের মুক্তি চাই। এই আন্দোলনে সহযোগিতা করবেন আপনারা।

দীনদয়াল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বল্‌লেন—কোনো লাভ হবে না, মা জননী! মাঝখান থেকে আরও কতকগুলো ছেলেমেয়েকে জেলে পুরবে। মানিকপুরে সব ঘুমোচ্ছে—এরা সব টাকার আফিং-এ বুঁদ!

—কিন্তু, কাকাবাবু, প্রতিবাদ না হলে আর চলছে না। এই ভাবে বছরের 'পর বছর এতগুলো মূল্যবান জীবন জেলখানায় পচে মরবে—আর আমরা—

—তোমরাই কি সুখে আছো? জেলে থাকার চেয়ে এই আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থাকা যে অনেক বেশী যন্ত্রণা! সব সময় আতঙ্কে মন সিঁটিয়ে আছে। সে যা-ই হোক, আমার ধারণা তোমার শহরে শোভাযাত্রার লোক জুটবে না। বাইরের লোক এখানে ঢুকতে পায় না যে, তাদের এনে জমায়েৎ করবে। এখানকার ব্যাপারই আলাদা। এই যে এতবড় দুর্ভিক্ষ বাংলা-দেশকে উজাড় করে দিল, তা এখানকার মানুষ টেরও পায় নি—কোম্পানীর দৌলতে এরা পেট ভরে ভাত খাচ্ছে। সস্তার চাল, মুঠো মুঠো পয়সা, সোনার রাজ্য—লোহা ত নয় সোনার চেয়ে দামী। এখানে অসন্তোষ কোথায়? দিনের পর দিন কারখানার সঙ্গে মিশে মিশে মানিকপুরের সব মানুষ যন্ত্র হয়ে গেছে। বাইরের কথা কেউ ভাবে না। দেশকে এরা ভুলে গেছে। রাগ কর না মা জননী, কারখানার বাইরে দুনিয়া নেই—এরা কি করে তোমার দেশের সমস্যা জানবে বলো?

মন্দাকিনীর দুটো চোখ জ্বলে উঠ্‌ল—আপনার কথায় মনে হচ্ছে যেন আপনিও এদের এই পথকে সমর্থন করেন! তবে কি আপনাকে চিনতে ভুল করেছি?

দীনদয়ালের উদার হাসিতে পরিবেশটা বদলে গেল যেন! মন্দাকিনীর মাথায় সস্নেহে হাত রেখে তিনি বল্‌লেন—তোমরা হচ্ছো পরিশুদ্ধ অগ্নি, কিন্তু মা শুধু অগ্নিতে ত হবে না, জলও চাই। একদিকে যেমন গ্রীষ্মের অগ্নি চাই, তেমনি তারপর বর্ষার করুণাধারা এই দুটোই চাই, নইলে মাটিতে শস্য ফলে না! আমি ওদের সপক্ষে নই, কিন্তু আবার ওদের বিপক্ষেও যেতে পারি না। জীবনযাত্রার যে ধারা ওদের ওপর আরোপিত হয়েছে—তাতে এই পথে চলাটাই স্বাভাবিক। আজকে হঠাৎ রাতারাতি ওদের পাল্টে ফেলা তোমার-আমার সাধ্যের বাইরে।

মন্দাকিনী ব্যস্তভাবে বল্‌ল—অর্থাৎ আপনি সাহায্য করতে পারবেন না?

দীনদয়াল প্রশান্ত মুখেই বল্‌লেন—আমার সহায়তায় তোমার কাজ যদি বিন্দুমাত্রও সাধন হয় তো তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু যেখানে শুধুই ব্যর্থতার সম্ভাবনা, সেখানে তোমাকেও এগোতে বারণ করব। এইজন্যে বারণ করব যে, যারা তোমার-আমার কথায় এগিয়ে যাবে তাদের আহুতি থেকে দেশের এতটুকু সাহায্য হবে না! ক্ষেত্র বড় অপরিণত। যদি কাজ করতে হয় তার জন্যে দীর্ঘদিন পরিশ্রম করবার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। নেশার ঘোর কাটাতে সময় চাই। আচমকা কিছু হবে না মা! হরতাল ত একটা মনোভাবের প্রকাশ! তা সে মনোভাবের কথা ভাবার আগে ভাবতে হবে যে আসল মনটুকু আছে কি নেই! মন নেই মা, মানিকপুরের সব মন লোহার চাপে মরেছে।

—কাকাবাবু, আপনার মত সমর্থন করতে পারলাম না। যাক্ এসব তর্কে সময় নষ্ট হয়। আচ্ছা, আমি তাহলে এখন চলি। দেখি!

মিন্টু বল্‌ল—এই রাত্রে কোথায় যাবে তুমি?

—রাত্রি ছাড়া সুযোগ আর না। যেতেই হবে—কোথায়, তা জানতে চেয়ো না। তবে আমাকে চেষ্টা করতেই হবে।

মল্লিকা বল্‌ল—তোমার মায়ের খুব অসুখ।

—খবরটা না দিলেই পারতে। যাক, এখন অনুরোধ, মাকে যেন জানিয়ো না আমি এখানে এসেছিলাম।

দীনদয়াল বল্‌লেন—তোমার কল্যাণ হোক মা! কিন্তু বুড়োর কথা শুনলে হয়তো ভালো করতে। মানিকপুরের মাটিতে বিপ্লবের বীজ এখনও পড়ে নি—জমিও তৈরী হতে দেরী আছে। তোমার এই শক্তির অপব্যয় বুড়োর মনকে বড় পীড়িত করছে।

মন্দাকিনী হাসলো। কোন উত্তর সে দিল না—এবং বিনা ভূমিকায় বেরিয়ে গেল।

দেবিকা উঠে গেল ওর পিছু পিছু। বাইরের দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে মন্দাকিনী জিজ্ঞাসা করল—জ্যোতিদার খবর কিছু জানো?

—উনি এখন বহরমপুর জেলে আছেন। দিন-আষ্টেক আগে চিঠি এসেছে, ভালো আছেন লিখেছেন।

পরমুহূর্তে দেবিকা মন্দাকিনীর হাতটা চেপে ধরে বল্‌ল—মন্দাকিনী, তুমি আমায় সঙ্গে নেবে? আমি যাবো তোমার সঙ্গে, নেবে?

মন্দাকিনীর মুখখানা অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না, স্পর্শ দিয়ে অনুভবে দেবিকার মনে হ'ল যেন মন্দাকিনী কাঁপছে! পরক্ষণে ওর হাতে একটু চাপ দিয়ে বল্‌ল মন্দাকিনী—সময় হ'লে আপনিই আসতে পারবে, তখন আর সঙ্গীর দরকার হবে না।

—কি করে বুঝব যে সময় হয়েছে?

—সেটা আমিও বল্‌তে পারব না। তবে একদিন নিজেই বুঝেছিলাম, কেউ বলে দেয় নি ভাই!—আচ্ছা আসি।

মন্দাকিনীর শেষ স্পর্শটুকু যেন দেবিকাকে শিহরিত করে দিয়ে গেল! বাড়ির মধ্যে ফিরে আসতে আসতে ওর মনে হ'ল, একটু আগে মন্দাকিনীর শরীর কাঁপে নি—দেবিকা নিজের উত্তেজনার শিহরণকেই বুঝতে ভুল করেছিল। এখনও ওর সারা শরীরটা থর-থর করে কাঁপছে।

ভেতরের দালানে তখন দীনদয়াল বল্‌ছেন—এই হ'ল দেশের ডাক। নিজের পিতামাতা পরিবার বলো, আত্মীয়-পরিজন, অর্থ-সম্পদ বলো—সব-কিছুর আকর্ষণকে একেবারে অস্বীকার করে নিজেকে উপ্‌ড়ে নিয়ে যাবার প্রচণ্ড শক্তি এনে দেয় এই ডাক। এখানে দ্বিধার প্রশ্রয় নেই। দু-দিক বজায় রাখার

অবকাশ নেই। কিন্তু এ নিয়ে ছেলেখেলা করা চলে না। তোমার মনে সত্যিকার সাড়া এলে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। তেমনি শখ করে কি কেউ আগুনের মধ্যে হাত দেয়? দেয় না। মন্দাকিনীর কথাই ধরো। ওকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমার নিজের চেয়ে ওকে অনেক বড় বলে মাথা হেঁট করি। কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি যে, একটা মহান্ মন শুধু আমাদের অক্ষমতার জন্যেই নষ্ট হবে। এমনি কতো হয়েছে, আরও কত যে হবে!

—নষ্ট হবে কেন কাকাবাবু?

—নষ্ট কথাটার মধ্যে অসম্ভ্রম নেই মা জননী। আমি বল্‌ছি যে, এমন একটি বড় মন নিয়ে সংসারে থাকলে মন্দাকিনী অনেকের অনেক ভালো করতে পারত। সংসারের শ্রী বলো, শিক্ষা বলো—এসব ত সাধন করতে পারতো!

—তবে কি আপনার মতে দেশের কাজটা কাজ নয়?

—অবশ্যই কাজ—বিরাট ব্রত। এ আমি স্বীকার করি একশো বার। কিন্তু মা, সব কাজ ত সবার জন্য নয়। কি জানি ঠিক বুঝতে পারি না—এক এক সময় ভারি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। মনে হয় বুঝি বা এরা সবাই নেশার ঘোরে চল্‌ছে! আবার নিজেকে ধিক্কার দিই—এত ক্ষুদ্রতা ভালো নয়। ছোট ছোট স্বার্থের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, বলে, নিজেকে শাসন করি। ভেবে ভেবে কোনো কিনারা পাইনে—এখন ওসব ছেড়ে দিয়েছি। যে যা ভালো বুঝছে করছে। আমার বোধশক্তিই ত চরম শক্তি নয়! তবু এখনো সংশয় কাটেনি। নিজেকে অসম্মান করাও মানবতাকেই তুচ্ছ করা—আমিও মানুষ কাজেই আমার কাছে নিজের সিদ্ধান্তটা ফেলে দেবার বস্তু নয়। শুধু আমি কেন, তোমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেও এই কথাই খাটে! নিজের কাছেই চরম বিচার। যদি ভুল হয় ত সে ভুলটা ধরতে পারলে আপনিই শুধরে নেবে। আর একজন বড় কেউ একটা কোনো কথা বলেছেন বলেই সেটা চরম, ঠিক হতেই হবে তার কোনো মানে নেই। তোমার আপন মনের কষ্টি-পাথরে সেটা যাচাই না করে গ্রহণ বা বর্জন করা আদৌ কর্তব্য নয়। এই যে মন্দাকিনী এল, ও যা বল্‌ল, সেটা আমার কাছে গ্রহণীয় বলে মনে হ'ল না—তার মানে

এ নয় যে, তোমাদের কারুর কাছেই সেটা আমল পাবার যোগ্য নয়। আমি বল্‌ব, যদি কারুর ইচ্ছে হয়, সে স্বচ্ছন্দে এই হরতালে সাহায্য করতে পারে—কিছুমাত্র সঙ্কোচের প্রয়োজন নেই।

মিণ্টু বল্‌ল—বাবা তুমি একথা বল্‌ছ কেন?

—আমি ঠিকই বল্‌ছি মা। এটা শুধু আধুনিক পৃথিবীতেই নয়, মানুষ চিরকাল মাতব্বরী করতে ভালোবাসে। আমার 'মত'ই তোদের সকলের 'মত' হোক—এটাই এক ধরণের মানুষ চায়। তারা নেতার আসন চায়—যোগ্য হ'লে পায়। আবার অযোগ্য মানুষকেও অনেক সময়ে নেতা হতে দেখা গেছে। যোগ্য হোক বা অযোগ্য হোক, নেতার নেশাই হ'ল অপরকে স্ব-মতে পরিচালনা করা। একের ভুলে দলের সমূহ সর্বনাশও হয়। নেতার মাথায় ভালোমন্দর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বাদবাকী সবাই নেতাকে অনুসরণ করাটা অভ্যাস করে নেয়! ভাবনা-বিবেচনার ধার-কাছ দিয়ে তারা হাঁটে না। সেটা ঠিক নয়। প্রত্যেকে ভাববে, প্রত্যেকের নিজস্ব চিন্তার মধ্যে দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করবে, তবেই ত মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটবে। ফরমায়েসী মন দিয়ে যন্ত্রের কাজ করা যায়—মনের ক্রিয়াকে সীমিত করা হয়। সেটাই নেতৃত্ববাদের মূল কথা। আবার সেটাই মনুষ্যত্বকে যান্ত্রিকতার ছোট গণ্ডীতে টেনে নিয়ে গিয়ে, ক্ষুদ্রদৃষ্টি করে ফ্যালে। আরও ভালো হয় যদি বলি যে, যন্ত্রের মতো মানুষের মনকে অন্যের পরিচালনার মুখাপেক্ষী করে রাখা হয় এ দিয়ে। এখন এটাই আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় বিপদ! তাই বল্‌ছি, আমার নিজের মত যাই হোক না কেন, তা দিয়ে তোমাদের ব্যক্তিগত চিন্তাকে প্রভাবিত করো না। নিজের পথ নিজে স্থির করবে। নেতা বা গুরু বলে যদি কাউকে স্বীকার করেও থাকো তবু বিচার-বিবেচনার দায়িত্ব নিজে হাতে রাখো!

সীতানাথ বল্‌লেন—ওরে বাপরে! সেটা আর শিখিও না দীনু ভাই! তাহলে সংসার টিকবে না। সব তচ্‌নচ হয়ে যাবে। এসব বড় সাংঘাতিক কথা। না, না, না—এ ঠিক নয়। মাথাকে মাথা বলে মানবে না, এ কি একটা কথা হ'ল?

দীনদয়াল বল্‌লেন—ধরে বেঁধে আর ক'দিন আটকে রাখা যায় ভাই? তার চেয়ে মুক্তি দাও, দেখবে টান ঠিক থাকলে কিছুই ওলটপালট হবে না। শক্তিকে বেশিদিন জোর করে দাবিয়ে রাখা যায়?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সীতানাথ বললেন—তা যা বলেছ! তা যায় না। নইলে মুকুলই বা—

সীতানাথ কথাটা শেষ না করে উঠে গেলেন। দেয়ালের গায়ে হুঁকোটা ঠেস দিয়ে রেখে সীতানাথ বোধহয় বাইরে মাঠের দিকে একটু হাওয়া খেতে গেলেন—এই শীতেও ফাঁকা মাঠের হাওয়া এক-এক সময়ে ভালোই লাগে হয়তো!

আটত্রিশ

পথের কঠিন স্পর্শে মন্দাকিনী আবার নিজেকে শক্ত করে নিল। ও বুঝেছে, দীনদয়াল বার্দ্ধক্যের ভারে নিস্তেজ হয়েছেন, তাঁর মনে আর আগুন নেই। সত্যিই যেন তাই হয়,—নইলে মন্দাকিনীর সামনে কোনো পথ খোলা নেই! যে সংকল্প নিয়ে তিন বছর পরে ও মানিকপুরে ফিরে এল, সে সংকল্প একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে, একথা ভাবতে পারে না মন্দাকিনী। একা, নিজের ঘাড়ে এতবড দায়িত্ব নিয়েছে স্বেচ্ছায়। মনে মনে ভরসা ছিল দীনদয়ালের সহায়তা পাওয়া যাবে। তাঁর ক্ষমতা আছে, হাজার দু-হাজার লোককে এক ডাকে জড়ো করার—। তার বেশি ত দরকার নেই! মানিকপুরের বুকে এখন কমিউনিস্টরা ইউনিয়ন বানিয়ে ভোল-পাল্টাবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে—এ খবর মন্দাকিনীর অজানা নয় তাই আরও বেশি আগ্রহ ওর—কস্তুরবার মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে শোকসভা, মিছিল-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীযতার স্বাক্ষর এঁকে দেওয়া চাই।

কিন্তু দীনদয়াল জবাব দিয়েছেন।

এখন কোথায় যাবে, কার কাছে সাহায্য চাইবে? ছেলেবেলা থেকে মানিকপুরের সঙ্গে মন্দাকিনীর পরিচয় খুব বেশি ঘটে নি। আর যেটুকু পরিচয়, তা ওই উঁচু মহলে, সেখানে মানুষ কই! এমন মানুষ একটিও নেই. যে আজ ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে ভরসা দেবে।

খুব আশ্চর্য হয়ে গেল মন্দাকিনী। যে মানিকপুরের মাটিতে ওর উনিশ বছর কেটেছে সেখানে সবাই তার অপরিচিত! এ বিস্ময়ের মধ্যে হতাশা বড় কম নেই। দেশের কাজ করতে নেমেছে এই মেয়ে—দেশকে কতটুকু দেখেছে? কটি মানুষের সঙ্গে তার পরিচয়? অথচ কলকাতায় শহরতলীতে যখন গোপন বৈঠকে আর দশজন কর্মীর সম্মুখে বসে উত্তেজিত আলোচনায় উন্মত্ত হয়ে কথা বলেছিল মন্দাকিনী তখন তারিফ বড় কম পায় নি।

নিষ্প্রদীপের নিষ্প্রভতা ওকে কোন্ দিক দিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছে, সে বিষয়ে খেয়াল নেই মন্দাকিনীর। ভাবছে, কেবল দিশেহারা মনকে ভেবে ভেবে উদ্ব্যস্ত করে তুল্‌ছে মন্দাকিনী।

দেবজ্যোতির কথা বড় বেশি মনে পড়ছে। আজ যদি দেবজ্যোতি মানিকপুরে থাকতো তাহলে মন্দাকিনীকে এমন বিপদে পড়তে হ'ত না। একবার ওর মনে হ'ল দেবিকা আসতে চেয়েছিল—ওকে সঙ্গে নিলেই হ'ত। হয়তো দেবিকা এক-আধজন কাজের লোকের সন্ধান দিতে পারতো! যাবে নাকি—আবার ফিরে যাবে?

মোড়ে একটা জটলা চল্‌ছে। আবছা আলোতে মন্দাকিনী দেখ্‌ল অনেকগুলি লোক জমায়েৎ হয়েছে—একটা রেডিও বাজছে খুব জোরে। নাৎসীদের যৎপরোনাস্তি দুরবস্থার কথা সগৌরবে ঘোষণা করছে রেডিওর বক্তা। মন্দাকিনী সোজা সাম্‌নের দিকে তাকিয়ে পথ চল্‌ছে। এই আপাত-সহজ চলাফেরার অভ্যাসটা ও রপ্ত করে নিয়েছে সহকর্মীদের কাছ থেকে। মুখেচোখে এতটুকু সঙ্কোচ যেন ফুটে না ওঠে, তাহলেই সন্দেহ এড়ানো যায়। এখন শহর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে—পাশের গাঁয়ে ওর তিনজন সঙ্গী আস্তানা নিয়েছে। এখন সেখানেই যেতে হবে এবং ব্যর্থতার কথাটা স্বীকার করতে হবে। এ ছাড়া উপায় ত কিছু নেই। মন্দাকিনীর মনে হচ্ছে এর চেয়ে কলকাতাটা ওর অনেক আপন, সেখানে কতো চেনা মানুষ! মানিকপুর সত্যিই মন্দাকিনীকে নির্বাসিত করেছে!

মোড় পেরিয়ে কিছুদূর চল্‌বার পর একবার পিছন ফিরে তাকাল মন্দাকিনী। নিছক কৌতূহল। কেউ টের পায় নি ত?

একটা ছায়ামূর্তি যেন একটু দূরে দূরে এগিয়ে আস্‌ছে পিছন থেকে! মন্দাকিনী একটু জোরে পা চালালো। পথ প্রায় জনশূন্য। বাবু-মহল্লার এলাকা পেরিয়ে এবার কুলী-মহল্লায় পড়লেই পথেঘাটে আবার লোকজনের মুখ দেখা যাবে।

হঠাৎ ওর পিঠের কাছে একটা নিশ্বাসের উত্তপ্ত হাওয়া ধাক্কা মারল। শীতের ঠাণ্ডা রাত—গরম নিশ্বাসটুকু বেশ টের পেল মন্দাকিনী। তবু পিছন

ফিরে দেখল না। পেটের নীচে একটা আগ্নেয়াস্ত্রের অস্তিত্ব অনুভব করে মন্দাকিনী নিশ্চিন্ত। ডান হাতখানা তৈরী রাখতে হবে!

—দিদিমনি!

চমকে উঠল মন্দাকিনী। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবার আগেই আব্দুল শেখ সাম্‌নে এসে দাঁড়াল।—হাঁ, বুড়ো হ'লেও বেড়ালের নজর ঠিক আছে। দিদিমনিজী!

মন্দাকিনী প্রথমে রিভল্‌বারে হাত দিয়েছিল। কিন্তু পরমুহূর্তে কি ভেবে শান্তস্বরেই বল্‌ল—মিয়াজান, ভুল করছেন, আমি আপনার দিদিমনি নই!

আব্দুল শেখ উচ্চ হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল—কুত্তা আপন মনিবকে চিন্‌তে ভুল করে না দিদি! মা বেটীকে ঠিক চেনে। আপনি কিছু ভাববেন না, আব্দুল শেখ এই হাতে লোফা-লুফি করেই আপনাকে চাঙ্গা রাখত!

বলে আব্দুল ওভারকোটে ঢাকা হাত দু-খানা বার করে শূন্যে আস্ফালন করল।

মন্দাকিনী দৃঢ়স্বরে বল্‌ল—পেয়ারের বুলি শুন্‌তে সময় হবে না মিয়া। আপনি পথ ছেড়ে দিন, আমার কাজ রয়েছে।

—আল্লা মেহেরবান, এই রাতে আপনাকে একা কোন্‌ ভরসায় ছাড়ি? ও হবে না, আজ রাতে তক্‌লিফ করে আমাদের গরীবখানায় আপনার পয়জার রাখতে হবে। তারপর শুবে চার বাজে গোলাম আপনার হুকুমে ঠিক জায়গায় হাজির করে দেবে।

—আব্দুল মিয়া, আপনি জানেন না, কি বিপদ ডাকছেন!

—জানি, সব জানি। বুড়ো হয়েছি দিদি। হুজুর সাহেবের কলিজায় যে চোট লেগেছে, তাও জানি। আপনি গ্রেপ্তারী পরোয়ানার আসামী, সেও জানি। আবার এই কুত্তা আপনার মতো হুরীর পয়জার ছোঁবার যোগ্য নয় তাও জানি। আর কি জানতে হবে বলুন!

—আপনাকে আমি খুন করতে পারি এটা জানেন কি?

—আপনি গোসা হচ্ছেন দিদি। জানের পরোয়া করি না, তার ওপর

আপনার হাতে মরলে পরে অনেক পাপ খারিজ হয়ে যাবে দিদি। এই জীবনে পাপ ত কম জমা হয় নি!

মন্দাকিনী আব্দুলকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পথ চলতে থাকে। আব্দুল আবার সামনে গিয়ে পথ আগ্‌লে দাঁড়ায়। তার মুখে হাসিটুকু লেগেই রয়েছে—জান কবুল, আপনি আমাকে জিন্দা রেখে এভাবে যেতে পারবেন না দিদিমনি। বেশ ত যাবেন, কাল—আপনার মায়ীজীকে একবার চোখের দেখা দেখে যাবেন।

—আঃ, আপনি বড় দিগ্‌দারী করছেন। কাজ আছে বল্‌ছি না!

—বেশ আপনার কাজে আমি মদৎ দেবো, আপনি এখন থামুন। লড়ায়ের বাজারে, চারদিকে ভুখা দুষমন লুকিয়ে আছে—আপনি জানেন না এইসব ফৌজী শয়তানের পাল্লায় পড়লে আপনার ইজ্জৎ খতম হয়ে যাবে দিদিমনি।

—মিয়াজান, ইজ্জৎ ইমানের এত দাম দিতে কবে শিখলেন? চিরকাল ত ওই মল্লিকসাহেবের শয়তানীতে সাগিরদ হয়ে চুল পাকালেন!

—এ হক্‌ কথা। কিন্তু দিদিমনি নিজে ইজ্জৎ দিয়েছি বলে কি ইজ্জৎদার-এর কদর জানি না? আপনি স্বদেশী করেন; গান্ধীজী, জওহরলালজী, সুভাষচন্দ্রজী-ও স্বদেশী করেন। ভারতের জন্য সব উজাড় করেছেন আপনারা। হাজারো সালাম!

—আপনার বুলি ত বেশ। তবে কেন আপনি স্বদেশী করেন না?

—এ জিন্দ্‌গী বরবাদেই গেল দিদিমনি। জানেন ত সবই, ছিলাম ঘোড়ার নফর, স্রেফ বুদ্ধি খাটিয়ে আজ একটা পোজিশন করেছি—কিন্তু মানুষ হওয়া আর হ'ল না। সে সব কথা পরে হবে, এখন আমার আর্জিটা মঞ্জুর করুন।

অনেকদিন পরে আব্দুল শেখের সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে মন্দাকিনীর মনটা কেমন নরম হয়ে গেছে নিজের অজ্ঞাতেই! ছোটবেলার কতো কথার হাতছানি ওকে ইশারায় যেন ডাকছে! আস্তে আস্তে ও বলল—কিন্তু মিয়াজান, আমার সঙ্গে আপনার দোস্তীর সম্পর্ক নয়, আপনি শত্রু—আমি আপনার শত্রু।

—এ হতেই পারে না দিদিমনি। আমি আপনার গোলাম। আমার ত কোনো বাল্‌বাচ্ছা নেই—ভালোই হয়েছে, বাচ্ছা হ'লে ত শয়তানেরই বাচ্ছা হ'ত! আপনি জানেন না, আমার মতো শয়তানেরও দিলে দিদিমনি বেহেস্‌তের হাওয়া এনে দেয়।

—আচ্ছা মিয়াসাহেব, একটা হদিস যদি দেন তবেই আপনার কথা রাখবো।

—জরুর দেবো।

—আচ্ছা এখানে কোনো কংগ্রেসীর পাত্তা দিতে পারেন? সেখানে একবার যেতে চাই।

—কেন দীনদয়াল বাবু!

—না, আর কোনো লোকের কথা বলুন।

আব্দুল অবাক হয়ে মন্দাকিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—সায়দ্ উস্‌সে সাচ্চা আদমী সারে মানিকপুরমে ত নেহি হ্যায়।

—আর কেউ নেই?

—দাঁড়ান ভেবে দেখি! হাঁ, দো-এক নওজোয়ান থা, বল্ কি—

—কে, কে বলুন!

—তারা ত স-ব জেলে।

—জেলের বাইরে কেউ নেই?

—এ্যায়সা মালুম হোতা। এক ছোকরা আছে চৌধুরী—লেকিন।

—বেশ চলুন চৌধুরীর ওখানে একবার যাবো। কিন্তু দেখবেন তার আবার সর্বনাশ করবেন না।

—জবান আর জীবন ত এক দিদিমনি!

—বহুৎ আচ্ছা।—চলুন।

—আমি সেখানে যাবো না, তবে কাছাকাছিই থাকবো। আপনি কথা চুকিয়ে পথে আসবেন, একাই আসবেন ফিরে—এ্যাঁ!

—আচ্ছা তাই হবে।

ফর্সা ছিপ্‌ছিপে একুশ-বাইশ বছরের এক ছেলে এসে দরজা খুলে দিল—কাকে চান? মন্দাকিনী বল্‌ল—অমল চৌধুরী আছেন?

ছেলেটি একটু হাসলো—হ্যাঁ, আছেন। আপনি ভেতরে আসুন।

ছোট ঘর, তার অনেকখানিই জুড়ে রয়েছে বড় একখানা চৌকী। আব বাকী অংশে বাক্স, হাঁড়ি, ড্রাম, কলসী। মন্দাকিনী দাঁড়িয়েই দেখছিল। দেয়ালের গায়ে দুটো সেতার ঝোলানো রয়েছে। আর হারিকেন টাঙানো আছে দেয়ালের পেরেকে।

বিছানা ছাড়া বসবার অন্য ঠাঁই নেই। ছেলেটি বলল—বসুন! দাদা খেতে বসেছেন।

ভিতর থেকে সাড়া এল—কে রে অনিল?

ছেলেটি বিব্রতভাবে মন্দাকিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মন্দাকিনী বল্‌ল—আপনাকে নিশ্চয় আটকে রেখেছি—না, না, আপনি খেতে যান, আমি বরং বসছি।

ছেলেটি বল্‌ল—আমি ত সন্ধ্যের সময় খেয়ে নিয়েছি। শরীর ত ভালো নয়। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

—সেতার আপনি বাজান?

—একটু একটু শিখি। দাদা খুব ভালো বাজাতে পারে। আমার অসুখ বলে ওস্তাদ বেশি রেওয়াজ করতে দ্যান না।

মন্দাকিনী এবার খুঁটিয়ে দেখল ছেলেটিকে,—অস্বাভাবিক রকমের ফর্সা রং বলে যেটা মনে হয়েছিল সেটা রক্তশূন্যতার জন্যই, এখন বুঝল। বল্‌ল—কি অসুখ আপনার?

—প্লুরিসি আর টাইফয়েড হয়েছিল এক সঙ্গে। আমার হেল্‌থ খুব ভালো ছিল, নইলে দেখুন না মরলাম না কেন! যম রিফিউজ করে দিয়েছে।

নিজের কথার মাঝখানেই থমকে গিয়ে ছেলেটি বল্‌ল—আচ্ছা, একটা কথা বলব?

—কি, বলুন!

—আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি, খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে!

চম্‌কে উঠ্‌ল মন্দাকিনী, প্রতিবাদের স্বরে ব্যস্তভাবে বল্‌ল—এক জনের চেহারার সঙ্গে আর এক জনের চেহারার অনেক মিল থাকে, অনেক সময়ে ভুলও হয়!

—না, সেরকম ভুল আমার বড একটা হয় না। আপনি কি স্কটিশে পড়তেন?

মন্দাকিনী এই অতর্কিত আক্রমণে যেন আত্মগোপনের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়, বলে—স্কটিশে?

ছেলেটি এবার বিজয়ীর মতো সরবে বল্‌ল—মন্দাকিনী? তুমি মন্দাকিনী! অথচ ভাখো প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি অনিল, মনে পড়ছে না?

অনিলকে মনে পডবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে—ওদের ক্লাসের একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিল অনিল। শুধু লেখাপড়াই নয়, সব দিক দিয়ে অনিল অসাধারণ। কিন্তু সেই অনিলের এই চেহারা হয়েছে? সত্যি চেনা যায় না।

মন্দাকিনী বিস্ময়ের চরম সীমায় উপনীত—বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে বল্‌ল—তুমি অনিল! তুমি এখানে?

—বাঃ, দাদার কাছে চেঞ্জে এসেছি। পরীক্ষার মুখে এমন অসুখ করল! আচ্ছা, তোমার কি ব্যাপার বলো তো—হঠাৎ কলেজ ছেড়ে দিলে! তারপর কত খোঁজ করেছি, কেউ বলতে পারে নি তোমার খবর। এখানেও এসেছি প্রায় মাসখানেক হ'তে চল্‌ল—বিশেষ কোথাও যাই না, সকালে বিকেলে একটু বেড়াতে বেরুই মার সঙ্গে। তা তোমাদের বাড়ি যে এখানে একেবারে মনেই ছিল না। অসুখে ভুগে ভুগে কেমন যেন হয়ে গেছি! নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত—আর ভালো লাগে না!

অনিল যেন অনেক দিন পরে নিজের কথা বলবার মতো একটি মানুষকে পেয়ে এক নিশ্বাসে সব কিছু বলে ফেলতে চায়! মন্দাকিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে একবারও শ্রোতার দুরবস্থাটা দেখতে পেল না।

অবশেষে মন্দাকিনী অনুনয়ের সুরে বল্‌ল—তোমাকে একটা কথা বলব, রাখবে?

অনিল যেন অপ্রত্যাশিত কোনো সম্পদের সন্ধান পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠ্‌ল—নিশ্চয়! তোমার কথা রাখব বই কি!

—তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়টা এখানে প্রকাশ করবে না।

—বাঃ, তা কি করে হয়! আর কেনই বা তা করব?

—অতো কথা বলবার সময় নেই। এইটুকু জেনে রাখো, মন্দাকিনী আমি নই, আমি মালবিকা সেন।

অনিল খুব খুশী হ'ল না। তবু বল্‌ল—বেশ! কিন্তু—

ওদিকে অমলের সাড়া পাওয়া গেল—কি ব্যাপার অনিল?

মন্দাকিনী দু-হাত তুলে নমস্কার করল—আপনার কাছে একটা গোপনীয় কাজে এসেছিলাম।

অনিল গম্ভীরভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অমল চৌধুরীর বয়স বেশী নয়, বেশ দোহারা চেহারা—চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। সে বল্‌ল—গোপনীয় কাজ? কিন্তু আপনাকে ত চিনলাম না!

—আমার পরিচয়, একজন কর্মী!

—ও। বলুন।

—তার আগে একটা কথা জেনে নিতে চাই। আপনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সম্বন্ধে কিরকম মত পোষণ করেন।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ, যদি এই শহরে হরতাল হয়, নেতাদের মুক্তির দাবী জানিয়ে—আপনার তাতে সমর্থন আছে কি না!

—সমর্থন ত নিষ্ক্রিয়ও হয় অনেক ক্ষেত্রে!

—সক্রিয় ভাবে আপনার এতে যোগ দেওয়াতে আপত্তি কি?

—আপত্তি নয়, অক্ষমতা। তার চেয়ে একটু ভেঙে বলি। আমার ওপর একটি পরিবারের সব কিছু নির্ভর করছে। ধরুন রুগ্ন ছোট ভাই, মা—আপাততঃ দুজন এখানে, আর কলকাতায় আরও তিনটি ভাইবোন, বুড়ো বাবা সবাই আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এ অবস্থায় আমি প্রত্যক্ষভাবে কোনো আন্দোলনে নামতে পারি না।

মন্দাকিনী একটু ভেবে নিয়ে বল্‌ল—আপনার কথা বুঝলাম! কিন্তু আপনি কি কোনোরকম ভাবে সহায়তা করতে পারেন না? মানে,—

অমল সরাসরি মন্দাকিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হাসি হেসে বল্‌ল—আপনার কথা শুনে ইচ্ছে করছে, আবার 'বন্দে মাতরম্' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু পিঠের বোঝাটা এমন জেঁকে বসেছে যে ঠেলে ফেলতে পারছি না। সত্যি আমরা কতো অপদার্থ হয়ে পড়েছি! নইলে এমন দিনও গিয়েছে যখন দেশের বাড়িতে কাপাসের চাষ করে, সেই তুলো দিয়ে চরকায় সুতো করেছি, দালানে আমাদের দু-খানা তাঁত বসিয়েছিলাম—নিজেরা তাঁত চালিয়ে কাপড় বুনেছি। সে সব স্বপ্ন! যাক, আপনাকে অযথা আটকে রাখবো না। আসলে আমি পুরনো সব কিছু মুছে ফেলে দিয়ে এই মানিকপুরের কারখানায় চাকরী করতে এসেছি। যাকে বলে মাথার ঘাম পায়ে ঝরিয়ে পয়সা আনা, তাই আনি। এখানকার কোনো কিছুতে নাক গলাই নে। কাজেই বিশেষ কেউ চেনেও না। তবে হ্যাঁ, সি. আই. ডি. র দপ্তরে এখনও হুঁশিয়ারী ঘোচে নি। কিন্তু আপনাকে এখানে কে পাঠালো?

মন্দাকিনী বল্‌ল—তাকে আপনি চিনবেন না।

—অত্যন্ত দুঃখিত, আপনার কষ্টটাই বাজে হয়ে গেল।

—আচ্ছা তাহলে আসি। নমস্কার।

—এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আমার ওপর রাগ করে এভাবে যাবেন না যেন!

অমল জোর গলায় ডাকল—মা!

—যাই বাবা।

বল্‌তে বল্‌তেই অমলের মা এলেন, তাঁর পিছনে অনিলও।

অমল বল্‌ল—অতিথি। তার ওপর দেশকর্মী। নাম-ধাম জানা চল্‌বে না। তোমার ভাঁড়ারে কিছু নেই?

মা হাসলেন—ও মা, সে কি কথা! ভাত-তরকারী সবই ত রয়েছে রে! এস মা এস, চলো মুখ-হাত ধুয়ে নেবে।

মন্দাকিনী ব্যস্ত ভাবে বল্‌ল—এখন সময় হবে না, মাপ করবেন।

—তোমাদের ত চিনতে বাকী নেই মা। ছু-মুঠো মুখে দেবার মতো সময় খুব আছে। চলো খেয়ে নেবে। ছু-মিনিটে দেশের কাজ পালিয়ে যাবে না। নাও চলো।

অনিল এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার বল্‌ল—মায়ের হাতের রান্না একবার খেলে অবিশ্যি আপনাকে আবার লোভে লোভে আসতেই হবে।

—থাম্ তোকে আর ওকালতী করতে হবে না। বাছার মুখটি ক্ষিদেয় শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। আহা!

মন্দাকিনীর কোনো আপত্তিই টিকবে না তা সে বুঝেছে—অগত্যা অমলের মায়ের সঙ্গে মুখ-হাত ধুতে গেল। ছোট একরত্তি উঠোনে বালতিভতি জল, তার পাশেই উন্থনে একটা হাঁড়ি বসানো। মা বল্‌লেন—দাঁড়াও, তোমাকে গরম জল দিই, এ ত আর কলকাতা নয়!—কয়লা অঢেল, একবার উন্থন ধরালে চব্বিশ ঘণ্টা আঁচ জিইয়ে রাখা যায়।

চৌকো সতরঞ্চির মতো এতটুকু বারান্দায় মন্দাকিনীকে খেতে দিয়ে অমলের মা পাশে বসলেন—তোমার এমন কচি বয়েস, এইভাবে ঘোরাঘুরি করো, কোনো বিপদ-আপদ না হয় মা! মানুষ ত সবাই সমান নয়।

—চচ্চড়িটা খাশা হয়েছে। কি করে রাঁধতে হয় আমাকে একটু শিখিয়ে দেবেন মা!

—নাও, আর অনিলের মতো ছেলেমানুষী শুরু করো না। চচ্চড়ি আবার রান্না!

বল্‌তে বল্‌তে তিনি অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন—আচ্ছা তোমাদের দেশ কোথায়?

—বাংলা, ভারতবর্ষ সবটাই।

—পাগলের মতো আবোল-তাবোল বকো না। আমি ত পুলিশ নই। তোমাকে দেখে কী যে ভাল লাগছে, ইচ্ছে করছে নিজের কাছে রেখে দিই। এমন মিষ্টি মুখ, আর তুমি মা ওই বাউণ্ডুলেদের দলে জুটলে কি করে? তোমার মা-বাবা নেই?

প্রশ্নটা মন্দাকিনীর বুকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল! আজকের ব্যর্থতা যেন পাষাণ-

ভারের মতো ওর বুকে চেপে বসেছিল, তার ওপর এই আঘাত আর সইল না, ওর দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা নামলো।

অমলের মা অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। মন্দাকিনীর পিঠে হাত রেখে বল্‌লেন—না বুঝে কি বলেছি, কিছু মনে কর না মা!

নিজেকে সামলে নিয়ে মন্দাকিনী বল্‌ল—না, আপনি এমন কিছুই বলেন নি। কত দিনের পরে মায়ের আদর পেয়ে মনটা কেমন আবদেরে হয়ে উঠেছে! ও কিছু নয়।

দুর্বলতাকে ঢাকা দেবার জন্য, বোধ করি অমলের মাকে খুশি করবার জন্যও মন্দাকিনী আর দুটি ভাত চাইল।

অমলের মা বল্‌লেন—দুটি মুড়ি খাবে?

অনিল ঘরের ভেতর থেকে হেসে উঠ্‌ল—মা হেরে গেছে। মায়ের লক্ষীর ভাণ্ডারে ঠন্-ঠন্ ঠন্-ঠন্!

মন্দাকিনী হেসে প্রশ্ন করল—কি ব্যাপার?

মা বল্‌লেন—পাগলের কথা কানে তুলো না। হাঁড়িতে ভাত বাড়ন্ত—তা কি হয়েছে? উনুনে চালে-ডালে বসিয়ে দিলে আর কতক্ষণই বা লাগবে! আমারও যেমন কাণ্ড, তোমাদের বাড়ন্ত বয়েস, হাঁস-হাঁস করে খাবে! তা তোমার মুখ শুকনো, ক্ষিদে পেয়েছে বলে—আমার মতো দুটি যা হাঁড়িতে ছিল তাই দিয়েছি। তা—

অমলের মায়ের অপ্রতিভ মুখের দিকে চেয়ে মন্দাকিনীও হেসে ফেল্‌ল, বল্‌ল—বেশ, বেশ, খিচুড়ী হোক।

—বসবে ত আমার সঙ্গে আবার? দ্যাখো বাছা! একা নিজের জন্য রান্না করা পোষাবে না।

—অবিশ্যি। আপনি শীগ্‌গির চড়িয়ে দিন।

—এই দিই।

বলে অমলের মা শোবার ঘরের চৌকীর তলা থেকে চাল-ডাল বার করতে গেলেন। মন্দাকিনী উঠে পড়ল। রাত অনেক হয়ে গেছে, এখুনি চলে যাওয়া দরকার মন্দাকিনীর।

আবার ঘুরে আসবে এইরকম আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিয়ে যখন বাইরে বেরুলো মন্দাকিনী তখন ওর মনটা আগের চেয়ে অনেক বেশি ভারাক্রান্ত মনে হ'ল। যেন একবার নিজের মাকে দেখবার ইচ্ছে ওকে অস্থির করে তুলেছে!

আব্দুল শেখ তখনও অশ্বত্থ-তলায় বসে ছিল।

মন্দাকিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে বল্‌ল,—কাজ হ'ল না বুঝি?

অত্যন্ত বিরূপ ভঙ্গীতেই জবাব দিল মন্দাকিনী—পোড়ামাটিতে কাঁকর ছাড়া ঘাস জন্মায় না মিয়াজান!

—দিদি, তোয়াজ করলে সবই হয়। সময় লাগে।

—আচ্ছা মিয়া সাহেব, তুমি এবার আমাকে একটু বকুলপুরের দিকে এগিয়ে দাও।

—সে কি, তুমি কি সেইজন্যে বুড়োকে এই হিমে বসিয়ে রেখে দিলে ঠায় এক ঘণ্টা?

—তোমার দিদিমনি মরেছে, তাকে আর কোনোদিন ফিরে পাবে না। এখন—

—দিল্ বিগ্‌ড়ালো কেন দিদি?

—দিল্-টিল্ শখের ব্যাপার, ওসব তোমাদের জন্যে। আমার কাজ আছে —এখুনি যেতে হবে। পৌঁছে দিতে নারাজ হও তো একাই যেতে পারবো।

—চলো, তোমার মর্জি! কিন্তু একবার মাকে দেখে গেলে না?

অন্ধকার রাত্রির স্তব্ধ ঝিমন্ত আবেশকে চিরে তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে মন্দাকিনী বল্‌ল—না! সে হয় না মিয়াজান!

যেন নিজের দুর্বলতাকেই কঠিন শাসনে দমিয়ে দিতে গিয়ে মন্দাকিনীর এই আর্তনাদ!

আব্দুল নিঃশব্দে ওর পাশে পাশে চল্‌ল।

উনচল্লিশ

অনিল তার দাদাকে জিজ্ঞেস করল—মেয়েটি তোমার কাছে কি জন্যে এসেছিল ?

অমল কতকটা ঔদাস্যভরে জবাব দিল—সবটুকু শোনার অধিকার আমার নেই। রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ যখন রাখতেই পারব না তখন তার গোপন রহস্য নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করার কোনো মানে হয় না, বুঝলে! তাই ঠিক কি কাজের জন্যে এসেছিলেন, সেটা ষোল আনা জানতে চাই নি।

অনিল আহত কণ্ঠে বল্‌ল—আমাদের জন্যেই তোমার এই অবস্থা, তাই না দাদা! এর জন্যে মনে মনে নিজেকে খুব অপরাধী বলেই বুঝি। কিন্তু আমার অসুখ হয়ে না পড়লে আমি এতদিনে সংসারের বোঝা খানিকটা হাল্কা করতে পারতাম।

অমল মৃদু তিরস্কার করল—দিনরাত এইসব নিয়ে মনে মনে জট্ পাকাচ্ছিস্, তার ফলে তোর শরীরটা সারার দিকে একটুও যাচ্ছে না। ওসব চিন্তা ছাড় দেখি!

অনিল ক্লান্তভাবে বিছানার ওপর গা ঢেলে দিয়ে বল্‌ল—শরীর আমার বেশ সেরেছে। এবার এক কাজ কর, তোমাদের এখানে কেরাণী-টেরাণী করে আমাকে ঢুকিয়ে নাও। জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগে।

অমল এবার চড়া গলায় বল্‌ল—খাশা জায়গা, জেলখানার মতো বেশ ঘেরা! দুনিয়ার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। চাকার সঙ্গে তোমার মনকে জড়িয়ে দাও। জীবনটা দিব্যি আরামে কেটে যাবে। বাঃ, তোর লেখাপড়া শিখে খুব বুদ্ধি হয়েছে ত অন্টু!

অনিলের মা বারান্দা থেকে বল্‌লেন—কি রে রাত দুপুরে দু-ভায়ে হাতা-হাতি করবি না কি ? এদিকে আমি যে কি করি—

অমল হেসে উঠ্‌ল—তোমার এই আদুরে গোপালকে আমার কি কিছু বল্‌বার সাহস আছে ?

—আমার আদর, না, তোর—এ্যাঁ! এই শীতের রাতে এতবড় মিছে কথাটা মায়ের মুখের ওপর বল্‌তে একটুও বাধলো না! এদিকে আমি মরছি নিজের জালায়, এখন এই খিচুড়ির ডাঁই নিয়ে করি কি!

অমল বারান্দায় বেরিয়ে এসে মায়ের কাছে বসল—গ্যাখো দিকিন, কি কাণ্ড! তুমি কেমন আরামে উপোস দিয়ে রাত কাটাবে, তা নয়, এখন ক্ষিধেটাকে মিটোবার জন্যে খেতে হবে—কি কষ্ট বলো তো!

—থাম্‌, আর মায়ের সঙ্গে ঠাট্টা করতে হবে না!

—ঠাট্টা কি গো মা, ওই স্বদেশী মেয়েটা তোমাকে কেমন ঠকিয়ে গেল তাই ভেবে আমি অবাক! খাবে বলে আর খেলো না। ওই জন্যেই বলেছে, স্ত্রীষু রাজ—

কথাটা শেষ হ'তে পারল না। মা বাধা দিলেন—খিচুড়ী দেখলে আমার কান্না পায়। এই সেদিন পর্যন্ত কলকাতার গোটা সংসারটা দু-বেলা লঙ্গর-খানার মতো জলো খিচুড়িতে পেট ভরিয়েছে। সেই খিচুড়ী—!

অমলের পরিহাস-উদ্ভাসিত মুখখানা নিমেষে ম্লান হয়ে গেল। সত্যি, গত বছরের দুর্ভিক্ষটা সে এখানে বসে টের পায় নি, আর তার মা-বাবা-ভাই-বোন এদের সকলের উপর দিয়ে দুর্দশার ঝড় বয়ে গেছে। সবাইকে এখানে চলে আসার কথা লিখেছিল, কিন্তু কেউ আসে নি। আর অমল ধার-দেনা করে কিছু বাড়তি টাকাই পাঠিয়েছিল—চাল-ডাল পাঠাবার উপায় তার ছিল না। এখানে বসে অন্ন-আরাম ভোগের স্মৃতিটা এখন তার নিজের চোখে অনপনেয় অপরাধের কলঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অমল বল্‌ল—তোমার জন্যে কিছু খাবার কিনে আনবো?

মা বল্‌লেন—না রে পাগল, সে জন্য নয়—মেয়েটা মুখের অন্ন ফেলে গেল, তাই বল্‌ছিলাম।

অনিল এবার ঘর থেকে বলে উঠ্‌লো—বড়লোকের মেয়েদের সবই শোভা পায় মা!

—বড় ঘরের মেয়ে তা দেখলেই বেশ বোঝা যায় অণ্টু! আমার বড়ো ইচ্ছে অমুর ওই রকম একটি বউ আনি।

অনিল বলল—ওরকম মেয়ে আসবে কেন মা, ওরা বেজায় বড়লোক।

—তুই কি জ্যোতিষী নাকি রে! আর তা ছাড়া অমু আমার ছোট কিসে শুনি!

অনিল বল্‌ল—তোমার অমু যতো বড়োই হোক না কেন, ওদের নাগাল ধরতে পারবে না এটা জেনে রেখে দাও।

—দ্যাখ অণ্টে, আমাকে এত হেনস্থা কবিস নে! তুই নয় বিলেত যাবি, তোর নয় খুব লম্বা লেজুড় হবে,—তবু তোকে আমার ছোট ভাইই থাকতে হবে।

অমল বিজয় গর্বে ঘোষণাটা করে মায়ের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—কেমন কি না তুমিই বলো মা!

—বিলেত আর গিয়ে কাজ নেই! আর যাবে বল্লেই ত যাওয়া হয় না বাবা! এখন সেরে সুরে উঠুক ত!

—ইস না সারলে শুন্‌ছি আর কি! এই যে এত খরচপত্র হ'ল সেগুলো াক নিছক বাজে করে দিতে পারবে ও? দিক্ না দেখি কেমন পারে!

অনিল নীরবে হারিকেনের আবছা আলোতে টালির শিলিংবর্জিত ছাদের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে! সত্যি, আজকের এই আশ্চর্য রাতের সঙ্গে অন্য কোনো রাতের কিছুই মিল নেই। কোথা থেকে মন্দাকিনী এলো ওর তপঃশীর্ণ উজ্জ্বল স্বর্ণাভ রূপ নিয়ে, এই ছোট খাঁচাটার চেহারা বদল করে দিয়ে নিঃসীম রাত্রির অন্ধকারে আবার মিলিয়ে গেল!

কিন্তু যাবার সময় বুঝি কিছু ফেলে রেখে গিয়েছে মন্দাকিনী! অনিল কিছুতেই ভুলতে পারছে না। একে একে তার চোখের সামনে কলেজের এক-একটি দিনের ছবি জেগে উঠ্‌ছে। আস্তে আস্তে অনিল আগাগোড়া একটি অখণ্ড ইতিহাসের সূত্র খুঁজে পায়। মন্দাকিনী হিমালয়ের উৎস থেকে নেমে এসেছে—এসে মিশেছে সমতলের নদীতে, সমতলকে সমৃদ্ধ করার সঙ্কল্পই ওকে নিরন্তর অস্থির বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। আর অনিল, সে একটি ব্যক্তির আধারে ছোট গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে। তার দৃষ্টি আত্মকেন্দ্রিক। বরাবর নিজেকে বিশিষ্ট করে তোলার চেষ্টায় সে সব-কিছু শক্তি ব্যয় করেছে। আমি

বড় হবো—অতএব পরীক্ষায় শীর্ষ-আসনটি আমার চাই, আমি বিলেত যাবো—কেন? না, আমার অর্থ-যশ দিয়ে মান্য-গণ্য নিজের বৈশিষ্ট্য দেখাবো!

ভাবতে ভাবতে অনিলের চোখের ঘুম ছুটে গেল। একটা অব্যক্ত, দুঃসহ যন্ত্রণায় সে ছট্‌ফট্ করছে! ভুল, ভুল—একুশটি বছর ধরে অনিল সম্পূর্ণ ভুল পথে চলে এসেছে। এ পথ তাকে বদলাতে হবে—তাকে ছোট পথ ছেড়ে বড় সদর শড়ক ধরতে হবে। · কখন দাদা এসে অনিলের পাশে শুয়েছে, তার গায়ে লেপ ঢাকা দিয়ে দিয়েছে, মা শুয়েছেন মেঝেতে বিছানা করে—এসব কিছুই অনিল টের পায় নি। সে এক নাগাড়ে নিজের সঙ্গে মনে মনে কথা কইছে!

একটি বিনিদ্র রাত্রির মধ্যে চিন্তার পরিমণ্ডলে একটা বিরাট বিপ্লব ঘটে গেল অথচ আর কেউ তা টের পেল না।

ইচ্ছে করছে মন্দাকিনীর সন্ধানে এখনই বেরিয়ে পড়তে—নিজের সামান্য শক্তি দিয়ে অনিল যতটুকু পারে মন্দাকিনীকে সাহায্য করবে। না, ঠিক মন্দাকিনীকে সাহায্য করা নয়, তার কাছ থেকেই বরং অনিল সাহায্য চাইবে। এই একক স্বার্থের খোলসটুকু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বিরাট দেশের মানুষের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেবার ব্রত—এতে মন্দাকিনীই হবে অনিলের গুরু! অনিল এই ব্যাধি-জর্জর দুর্বল দেহটা নিয়ে পারবে কি ওই বড় শড়কে ওদের সঙ্গে চল্‌তে? কে জানে! তরুণ মনের সতেজ প্রবণতা অনিলের ভেতরে সাড়া দিল—খুব পারবে, নিশ্চয় পারবে। মন্দাকিনীর সুগৌর মুখখানা ইতস্তত ছড়ানো চূর্ণ চুলের টুক্‌রো মেঘের ফাঁকে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠ্‌ল। অনিল সংকল্প করল, ব্যক্তি-স্বার্থের জাল কেটে সে নিজেকে মুক্তির মহাসমুদ্রে ভাসিয়ে দেবে। এই মুহূর্তে তার একবারও মনে পড়ল না অমলের কথা—অমলও একদা মুক্তির স্রোতে এমনি করেই নিজেকে ঠেলে দিয়েছিল। পাশাপাশি থেকেও একজনের অভিজ্ঞতা অপরকে প্রভাবিত করতে পারে না। বৃহত্তর আকর্ষণ আর সব কিছুই ভুলিয়ে দেয়।

চল্লিশ

বকুলপুর এককালে চাষীপ্রধান পল্লী ছিল—খুব বেশি দিনের কথা নয় সেটা। তবে এ অঞ্চলের মাটি বড় কৃপণ, তাই ফসল একটাই হয়—এবং তার জন্য খুব বেশি মেহনৎ দরকার। কাজেই মানিকপুরের কারখানায় আধুনিক কালের গ্রাম্য ছেলেছোকরারা চাকরী করবার জন্য ঝুঁকে পড়েছিল। তাদের চোখে মানিকপুরের শ্রমিকেরা স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী। একে ত প্যাণ্ট পরে ওরা; ওদের গায়ে জামা, পায়ে জুতো; এ ছাড়া আরও কতরকমের অজানা মজার স্বাদ পায় মজুররা, তা ঠিক জানা না থাকলেও অনুমান ত খানিকটা করা যায়। রোদ-বৃষ্টির মধ্যে গরুমোষের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কি সম্মানের কাজ? তার আন্দাজে ফ্যাক্টারীর চাকরীতে মান-ইজ্জৎ ঢের বেশি। এই ভাবেই প্রতি বছর দু-চারটি নবযুবক কারখানার স্বর্গের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ১৩৫০ সালের আকালে যেন ঝড়ের ঝাপটে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল কারখানার সিংহদ্বারে —বাকী যারা ছিল তাদের সব্বাইকে। কারখানার চাকুরেদের প্রত্যেককে কোম্পানী আটসের করে চাল-ডাল দিচ্ছে টাকায়—আর এদিকে বকুলপুর কেন আশপাশের দশ-বিশখানা গাঁয়ে-গঞ্জে কোথাও লক্ষ্মীর দানা নেই। মাঠ খাঁ খাঁ! অতএব সেই সময়ে চাষের কদর একেবারে ঘুচেছে। একজোটে সব রাধেশ্যাম-পাড়ার গোঁসাইদের দরবারে হাজির হ'ল—এ যাত্রা রক্ষে না পেলে গাঁকে-গাঁ উজোড় হয়ে যাবে।

প্রাণগোবিন্দ—'রাধে রাধে' বলে নতুন স্যুটের দিকে সগৌরবে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন,—ঠাকুরের কাছে তোরা সব দরখাস্ত কর, পাঁচ সিকে করে প্রণামী দিয়ে! রাধারমণকে আরাধনার সময় আমিও বুঝিয়ে বলব, আর রাধারাণীও ত অবুঝ নন্। ব্যবস্থা একটা নিশ্চয়ই করবেন ওঁরা। তারপর দেখি কতদূর কি করতে পারি!

কারখানার ক্ষুধা দিন-দিন বেড়েই চলেছে—যত মানুষ দাও সব গিলবে! এ ত সামান্য একখানা বকুলপুর গাঁয়ের শ'চারেক লোক, কাজেই রাধাগোবিন্দর

কৃপায় বকুলপুরের ছেলে বুড়ো সবাই মজুর হয়ে গেল। তারপর বছর ঘুরেছে। প্রৌঢ় আর বৃদ্ধরা এখন আবার হাল-বলদ নিয়ে মাঠে নামার জন্য উদ্ব্যস্ত। কিন্তু সরকারী আইন বড় শক্ত, এসেন্সিয়াল সার্ভিসের লোকেদের চাকরী ছাড়া অতো সহজ নয়। মাঠের কাজ করবে কে? ভাগচাষে যারা কাজ করতে চায় তাদের হিম্মৎ আর কতটুকু? এ বছরে যে কি হবে, কে জানে!

যাদের কাঁচা বয়স তাদের কাছে কারখানার চাকরীই জীবনের স্বর্গ। কারখানা থেকে ফিরতি পথে রাঙাপাড়ার সাঁওতাল বস্তীতে-তারা পচাইএর নেশায় মেজাজ শরীফ করে ঘরে ফেরে বেশ রাত করে। আর হপ্তার মাইনে পেলে সেই রবিবারে শহরে চলে যায়, টকী দেখতে—বাজারে বেশ্যাদের ঘরে রাতটুকু কাটিয়ে একেবারে সোমবার কারখানার হাজরি বজায় রাখে তারা। এই ত জীবনের পরম সার্থকতা, এর বেশি আর চাই কী!

এই বকুলপুর গাঁয়েই মন্দাকিনীদের গুপ্ত শিবির দু-তিন দিনের জন্য। আশ্রয়দাতা নিজে এখন কারাকক্ষের অন্তরালে। তাঁর ছোটভাই বঙ্কিম রায় নেহাতই ছেলেমানুষ।

মন্দাকিনী যখন শিবিরে পৌঁছলো তখন রাত দশটার 'ভোঁ' বেজে গেছে। আসার পথে নাইট ডিউটির লোকদের দেখেছে রাঙাপাড়ার কাছাকাছি। এখন আর একটিও মানুষ গাঁয়ের রাস্তায় নেই।

ওকে দেখে নন্দিতা সোৎসাহে বল্‌ল—কি? রাজেন্দ্রাণীর অভিযান বেশ সাক্‌শেস্‌ফুল ত!

বীরেন্দ্র একখানা বই পড়ছিল, মুখ না তুলেই বল্‌ল—বকুলপুরের মেয়াদ আজই শেষ, আমরা শিফ্‌ট্‌ করবো তোমার এলাকায় মন্দা।

মন্দাকিনী হাসলো, বড় দুঃখেই এমন হাসি ফোটে! ও বল্‌ল—বকুলপুর মানিকপুরের চেয়ে অনেক ভালো।

নন্দিতা চাপা গলায় বল্‌ল—হ্যাঁ তা আর নয়, এখানকার হোস্ট যা হোস্টাইল—কাল সকালেই না পুলিশে খবর ছায়!

—তার মানে?

—মানে আবার কি, যতীন রায় জেলে যাবার পর এখানকার চেহারা বদলে

গেছে। গত সপ্তাহে কলকাতা থেকে কমিউনিস্ট মেয়েরা মানিকপুরে মিটিং করে গেছে।

—তাতে হয়েছে কি? আমাদের কাজ আমরা করব।

—সেটা মুখে বলা সহজ। কিন্তু ওদিকে আমাদের ইয়ং হোস্ট বঙ্কিমচন্দ্র যে বিষবৃক্ষের ফল খেয়েছেন! লাল দলের একটি রাঙা মেয়েকে দেখে ইনি রাতারাতি কমিউনিস্ট পার্টির ওপর ভক্তিতে গদগদ। এই আজই ত ইউনিয়নের অফিসে গিয়েছিলেন, বেশ ঘায়েল হয়ে ফিরেছেন। এ-ঘর থেকে ও-ঘরের কথা বেশ শোনা যাচ্ছে ভাই!

বল্‌তে বল্‌তে নন্দিতার কণ্ঠস্বর তিক্ততায় ভরে ওঠে।

মন্দাকিনী সব শুনে বল্‌ল—যা বুঝছি, ওদের মতো লিবারল না হলে আর চল্‌ছে না দেখচি।

বীরেন্দ্র এবার বই মুড়ে রাখল—তার চেয়ে ওদের দলে ভিড়ে গেলেই ত হয়।

নন্দিতা গম্ভীর হয়ে গেল—আপনাদের এইসব ঠাট্টা একটুও ভালো লাগছে না।

মন্দাকিনীর হাসির মুখোশটুকু এই একটি কথায় খসে পড়ল, ও বল্‌ল—মানিকপুর থেকে আমাদের খুব বড় ধাক্কা খেতে হবে। ওখানকার লোক্যাল সাপোর্ট কিছুই পাওয়া যাবে না। যাঁদের ওপর ভরসা করেছিলাম তাঁরা ব্যাক আউট করেছেন; তাঁরা বলছেন, কোনো সাপোর্টের আশা নেই।

—তাহলে?

নন্দিতার চিন্তিত মুখে যেন সমবেত জিজ্ঞাসার ছায়া পড়ল।

মন্দাকিনী উত্তেজিত ভাবে জবাব দিল—তবু আমাদের প্রতিবাদ আমরা জানাবোই। আর কেউ না এলেও আমরা যাবো—হতাশ হবার কিছু নেই। যারা আজ কাছিমের মতো নিজের খোলসে মুখ লুকিয়ে আছে, তাদের বুঝতে দিতে হবে যে মুখ লুকোলে নিজেকেই অস্বীকার করা হয়। আত্মরক্ষা করবার জন্য ওরা যে নেতির পথ বেছে নিয়েছে সে ত মানুষকে—মনুষ্যত্বকে হত্যা করারই নামান্তর। আমাদের জীবন দিয়ে তাদের চেতনা আনতে হবে। আমরা

যে পথে যেতে চাই সে পথে মৃত্যু হ'লেও মনুষ্যত্বের গৌরব ঘোষণা করে তবেই আমরা মরব। কোটি কোটি মানুষ চিনে রাখবে এই খুনীদের—তারপর বিশ্বের মানবতার এজলাসে এই খুনীদের বিচার হবে!—এই কথাটা যদি ওদের চৈতন্যে পৌঁছে দিতে পারি, তাহলেই ত হ'ল!

পাশের ঘর থেকে অসহিষ্ণু কণ্ঠে কে যেন বলছে—সে হয় না বৌদি, ওদের সঙ্গে আমি হাত মেলাতে পারবো না। ওরা দেশের শত্রু—হ্যাঁ শত্রুই ত। দাদা? দাদাও তাই। এ আমার বিশ্বাস। তুমি অযথা আমাকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করছ। তুমি কি বোঝো? দুনিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বড় ভাবে দেখতে হবে—ওরা নাৎসীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ওরা হ'ল ফিফ্‌থ কলামনিস্ট! কংগ্রেসকে রুখতেই হবে, নইলে দেশের সর্বনাশ। কি? ওঁরা আশ্রয় নিয়েছেন, ভদ্রতা! রাবিশ, বুর্জোয়া বুলি। দাদার বন্ধু? তা সে বন্ধুত্ব দাদার সঙ্গে—আমি আমার কাজ করবো। এ্যাঁ—

এ পর্যন্ত বেশ জোরে জোরে কথাগুলো ভেসে আসছিল। হঠাৎ কি হ'ল—আর একটি কথাও শোনা গেল না।

মিনিট তিনেক পরে একটি বছর বাইশ-তেইশের যুবক এঘরে ঢুকল—আপনাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না ত? ইয়ে, বৌদি বল্‌ছেন আর রাত করা ঠিক নয়, এবার খাওয়া-দাওয়া করে নিন্‌।

বীরেন্দ্র বল্‌ল—বেশ, বেশ!

মন্দাকিনী বল্‌ল—আপনারা যান, আমি ওসব পাট সেরে এসেছি।

যুবকটি তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনুনয়ের সুরে বল্‌ল—না, না, সে হয় না। কিছু মুখে দিতেই হবে, কোনো আপত্তি শুনছি না। গেরস্থ বাড়িতে সে কি হয়?

—আমি বেশ আছি, বরং আপনার সঙ্গে একটু গল্প করা যাবে, ওঁরা ততক্ষণে খেয়ে আসুন। আপনারই নাম বুঝি বঙ্কিম রায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—একটু আগে আপনার গলা পেলাম মনে হচ্ছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বৌদির সঙ্গে একটু গল্প করছিলাম। মানে আপনাদের ঠিকমতো আদর-যত্ন হচ্ছে কি না—এই সব ইয়ে—

—মাপ করবেন, আপনার সব কথাই এ ঘর থেকে আমরা শুন্‌তে পেয়েছি।

বঙ্কিমের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে একটু কুণ্ঠিত হয়ে বল্‌ল—ও কিছু নয়। কিছু মনে করবেন না, আগে জানতাম না যে আপনারাও আছেন।

—আমরাও মানে?

—মানে, মেয়েরা। কি জানেন, আমাদের পরিবারে—শুধু আমাদেরই বা বলি কেন, হিন্দু সংস্কৃতিতে মেয়েদের সম্মান সর্বাগ্রে। তা সে শত্রুপক্ষই হোক আর বন্ধুপক্ষই হোক।

—আপনি তাহলে হিন্দু?

—এ আপনি কি বল্‌ছেন—আপনি নন্‌?

—না, সে কথা বল্‌ছি না—কম্যুনিজ্‌ম্‌ ত ঈশ্বর অস্বীকার করে, মনকে অস্বীকার করে। মনুষ্যত্বকেও—

—এটা আপনার প্রোপাগাণ্ডা।

বঙ্কিম উত্তেজিত ভাবে বলে উঠ্‌ল।

মন্দাকিনী বল্‌ল—আমার কথা অবিশ্বাস হয়, আপনি জিজ্ঞাসা করবেন কোনো কমিউনিস্ট নেতাকে।

—অবিশ্যি ঈশ্বরের কথা যদি বলেন ত বল্‌ব তার অস্তিত্বের কোনো নজীর নেই। যাক ওসব তর্ক করে কি হবে? তবে মনুষ্যত্বের ওপরেই কম্যুনিজ্‌মের ভিৎ পত্তন সেটা ত জানি। মেহনতী উৎপীড়িত, শোষিত জনগণের সংস্থা—

মন্দাকিনী বাধা দিয়ে বল্‌ল—সব মেনে নিলেও একটি প্রশ্ন বাকী থাকে।

—কি বলুন!

—আপনাদের এই আপোষ। আজকে যখন সেই উৎপীড়িত জনতা একটা সুযোগ পেল আত্মপ্রতিষ্ঠার,—খুব ছোটো একটা নজীরই দেখুন, এই মানিকপুরের ব্যাপারটা ধরুন, যখন খোলা চোখে দেখা যাচ্ছে, এখানে স্ট্রাইক করলে মজুররা অনেকগুলো সুবিধে আদায় করে নিতে পারত, কোম্পানীর রাজী

হওয়া ছাড়া অন্য পথও ছিল না—যুদ্ধের জন্য তাকে সাপ্লাই বজায় রাখতেই হ'ত, ঠিক তখনই আপনারা জিগির তুললেন, স্ট্রাইক করা চল্‌বে না। অথচ আপনাদের পার্টিই মাদ্রাজে মজুরদের টাকা দিয়ে স্ট্রাইক করিয়েছেন কিছুকাল আগে।

বঙ্কিম বিব্রতভাবে আশপাশে তাকাচ্ছিল। এবার মন্দাকিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বল্‌ল—আপনার কথার জবাব আমি কাল্ জেনে এসে দেবো।

মন্দাকিনী একটু হাসলো—জবাব আমিও দিতে পারি। ও পথে মীমাংসা নেই। বিবাদ-বিসম্বাদটাই বেড়ে যাবে। আপনি ছেলেমানুষ। এখন থেকে যদি নিজের বিচার-বিবেচনাকে বাতিল করে ভাবাবেগেই চলেন তবে এরপর দিশে খুঁজে পাবেন না। আপনার দাদা ভুল করেন নি। কিছু না পারেন অন্ততঃ তাঁকে অনুসরণ করতে পারেন ত আপনি।

বঙ্কিম বল্‌ল—দাদার কথা বাদ দিন। উনিই ত এ সংসারের এই হাল করেছেন। আমি চাই আবার আমাদের অবস্থা ফিরুক। আজ আমাদের সংসারে লক্ষ্মী ত বাঁধা থাকতেন। উনি নিজে কিছু করলেন না—খালি কংগ্রেস-কংগ্রেস করে সব ডুবিয়ে দিলেন। সে কথা থাক।

—বাঃ, কমিউনিজ্‌ম্ বুঝি তাই বল্‌ছে!

বঙ্কিম এবার অসহিষ্ণু ভাবে বল্‌ল—পলিটিক্স আমার লক্ষ্য নয়। সত্যি কথা আপনাকে বল্‌ছি। মেয়েদের সঙ্গে পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করা ঝক্‌মারী। তার চেয়ে বরং অন্য কথা বলুন।

—অন্য কথা কি বল্‌ব?

—রাগ করবেন না, আমার কেন যেন এই গেঁয়ো মেয়েদের তেমন ভালো লাগে না। আর যে মেয়েরা পলিটিক্স করে, তারা কেমন স্মার্ট হয়! এই সেদিন কম্‌রেড মনিকা মুখার্জির সঙ্গে আলাপ হ'ল, অবিশ্যি আপনার মতো এমন ইয়ে তিনি নন্।

—ইয়েটা কি?

বঙ্কিম হাসি-উচ্ছল ভঙ্গীতে বল্‌ল—উঃ, আপনার কাছে পার পাবার উপায় নেই। বড্ড তর্ক করেন।

মন্দাকিনী কথাটা এড়িয়ে গেল—আচ্ছা বঙ্কিম বাবু, আপনাদের এ গাঁয়ে স্কুল নেই ?

—প্রাইমারী পাঠশালা রয়েছে।

—তারপর লেখাপড়ার কি ব্যবস্থা ?

—আমরা সব রাধেশ্যামপাড়ার স্কুল থেকে ম্যাট্রিক দিয়েছি। আর কলেজ সেই আসানসোলে।

—আপনার কি মনে হয়, এই যে দেশের নেতারা জেলে আটক রয়েছেন, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা আমাদের উচিত নয় ?

—আপনি কি বলেন, করা উচিত ?

—আমি ত বলি, না করলে আমাদের বেঁচে থাকার কোনো মানেই হয় না। তাঁরা দেশের জন্যে, দশের মুখ চেয়ে এই নির্যাতন সইবেন, আর আমরা সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে স্বার্থ গোছাবো! এই কি লেখাপড়া শেখার পরিণাম ? এমনি করলে দেশ ত কোনো কালেই স্বাধীন হবে না ভাই! আপনার মতো ছেলের ত ঘুমোনো সাজে না আজকের দিনে। কী ? চুপ করে রইলেন যে ?

—ঠিক কথা। আমাদেরই জন্যে তাঁরা আজ বন্দী। তা বটে।

—তাহলে আপনারা আসুন সেই প্রতিবাদ-মিছিল বার করতে সহায়তার কাজে।

—আপনি যখন বল্‌ছেন তখন এটা অবশ্যই করতে হবে।

শ্লেষের হাসি হেসে মন্দাকিনী বল্‌ল—দেশের নেতাদের কি কপাল দেখুন তো, ভাগ্যে আমি ছিলাম!

নির্বোধের উচ্চহাস্যে বঙ্কিম ঘরখানা ভরিয়ে দিল—আমার হাতে খুব কম করে পঞ্চাশ-ষাটজন ছোকরা আছে, তাদের যা বল্‌ব তাই শুন্‌বে—আমি যদি বলি তোমরা কমিউনিস্ট ত তারা ঘোর কমিউনিস্ট, আর আমি যদি বলি তোমরা ক্যাপিট্যালিস্ট ত তারা তা-ই! অবিশ্যি এর জন্যে কিছু-কিছু খরচ করতে হয়। দল রাখতে গেলে এটুকু করতেই হয়।

পুনরায় বঙ্কিম তার স্বভাবসিদ্ধ গ্রাম্য দাম্ভিক হাসিতে ঘরখানা ভর্তি করে ফেল্‌ল।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে মন্দাকিনী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

বঙ্কিম বল্‌ল—দেখুন, আপনাকে মানে তোমাকে কি বলে ডাকবো? তুমি ত বয়েসে আমার চেয়ে ছোটই হবে?

মন্দাকিনী দাঁতে দাঁত চেপে, আস্তে আস্তে বল্‌ল—আপনার জন্যে আলাদা কোনো নাম নেই, সবাই যা বলে তাই বল্‌বেন—মিস্ সেন!

বঙ্কিম বল্‌ল—আমি খুব চট করে আত্মীয়তা করতে ভালোবাসি, বুঝলেন কি না!

বঙ্কিম রাতারাতি রং বদল করার ফলে বকুলপুরের শিবিরে বীরেন্দ্রের দল অনেকখানি কাজের সুবিধে পেয়ে গেল।

পরদিন বিকেলে যথাসময়ে শখানেক লোকের একটি মিছিল যখন তালপুকুরের পাশ দিয়ে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে বাতাস মুখরিত করে গাঁয়ের বুকে জাগরণের সাড়া তুলে চল্‌ল তখন গৃহস্থ বধূরা হাতের কাজ ফেলে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো। বিশেষ করে দু-জন মেয়ে এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকাতে বধূদের বিস্ময়ের অবধি নেই।

কেউ বল্‌ল—দেখতে কিন্তু বেশ।

কেউ বল্‌ল—কালে কালে দেশটা কি হয়ে গেল, হ্যাঁ লো!

প্রবীণারা বল্‌লেন—দেশেঘরে আর শান্তি থাকবে না, ঘরের বৌ-ঝিদের পথে বার করে কী সব্বনাশই যে করছে—এই স্বদেশীরা!

রাঙাপাড়ার আসর এখনও ফাঁকা। কাঁকর-মাটির শাসন এড়িয়ে যেখানে ঘাস জন্মেছে, সেখানে গরু-ছাগলেরা চরছে। একজন বুড়ো গাছতলায় বসে তামাক খাচ্ছে। বারোয়ারী ইঁদারার পারে কলসী নিয়ে মেয়েরা ভিড় জমিয়েছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় বাঁশঝাড়ে ঝড়ের চাপা গর্জনের শব্দ। কোথায় একটি বাছুর ডেকে উঠ্‌ল—হাম্বা!

সহসা পাকা শড়কে মিছিলের সমবেত কণ্ঠরোল ধ্বনিত হ'ল। সবাই

চকিতে কৌতূহলী দৃষ্টিপাতে ধ্বনির অনুসরণে উত্তরের দিকে তাকিয়ে রইল। রাঙাপাড়ার ওপর দিয়ে মিছিল চলেছে।

মানিকপুরে ঢোকার মুখেই কারখানাতে ছুটির 'ভোঁ' বেজে উঠ্‌ল। জনতার সাম্‌নে টাউনের গেট বন্ধ হয়ে গেল। গেটের ওপারে সারি সারি লাল পাগড়ী মোতায়েন। এক বুক উঁচু কাঠের বেড়া দেওয়া দরজাটা দিনের বেলা কখনই বন্ধ থাকে না—রাত এগারোটার সময় বন্ধ হয়। আজ এই ব্যতিক্রমে ছুটি পাওয়া মজুরেরা অবাক!

গেটের এপারে মিছিল থেকে ক্রমাগত ধ্বনিত হচ্ছে 'বন্দে মাতরম্'—'গান্ধীজী কী জয়'—'কস্তুরবা কী জয়'—'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই'—!

ওপারে মানিকপুরের গণ্ডীতে স্তব্ধ মূক দর্শকদের ভিড় জমে উঠেছে। কোনা সাড়াশব্দ নেই মানিকপুরের এলাকায়।

হঠাৎ কোথা থেকে একটি একক কণ্ঠ প্রোটেক্‌টেড্‌ শহর-এলাকা থেকে প্রতিধ্বনি করল—'বন্দে মাতরম্'!

মানিকপুরের চৌহদ্দীতে এতক্ষণ যারা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা আশপাশে চঞ্চল হয়ে তাকাল—কে?

পুলিশের মধ্যে তৎপরতা—কে? কে?

অপর পারে উৎসাহিত মিছিল আবার জিগির দিল—ভারতমাতা কী জয়!

সাড়া এল—ভারতমাতা কী জয়!

এবারও একক কণ্ঠের বিশিষ্ট ধ্বনি।

—এই যে, এই যে—এই ছোকরা!

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাকে ধরে ফেল্‌ল।

ছিপ্‌ছিপে একহারা চেহারার সুদর্শন একটি ছেলে! পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে রাখলো গেটের পাশে। পুলিশের কর্তার হুকুম শোনা গেল—পাকড়ো!

গেট পেরিয়ে পুলিশের দল তাড়া করল মিছিলের দিকে। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। যারা পালাবার তারা পুলিশের দৌড় দেখেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে মাঠের ওপর দিয়ে। বাকী ছিল সাত জন। মন্দাকিনীরা তিনজন, আরও চারটি নির্ভীক ছেলে।

বঙ্কিম রায় ধরা পড়ে নি। পুলিশ-ভ্যানে উঠ্‌ল বন্দীরা।

মন্দাকিনী এসে বসল মানিকপুর এলাকার একক ছেলেটির পাশে, বল্‌ল—অনিল, তুমি এই অসুখ শরীর নিয়ে কেন এলে?

অনিলের মুখে কোনো কথা নেই, তার উজ্জ্বল দুটি চোখ—জ্বল্‌ছে।

মন্দাকিনী আবার বল্‌ল—ওদের হাতে পড়লে তোমার আবার অসুখ করতে পারে অনিল!

—জানি। জেনেশুনেই এসেছি। আর চুপ করে থাকতে পারলাম না যে!

এর বেশি আর একটি কথাও কেউ বল্‌ল না।

ছুটি-পাওয়া শ্রমিকদের ভিড় কাটিয়ে পুলিশ-ভ্যান দ্রুত বেগেই মানিকপুরের বড় শড়ক দিয়ে চল্‌ল।

বীরেন্দ্র পকেট থেকে একখানা বই বার করে এরই মধ্যে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। প্রশান্ত নির্বিকার তার চেহারা!

একচল্লিশ

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি, কস্তুরবা গান্ধীর জন্য শোকপ্রকাশ, কোনটাই তেমন গুছিয়ে জানাতে পারে নি আন্দোলনকারীরা—কিন্তু তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভটুকু এই সামান্য মিছিল বার করার মধ্যেই স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। জালে ঘেরা কালো গাড়িখানা শহরের সদর দিয়ে চলে গেছে, হাটের পাশে বাধা পেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। রাস্তার দুধারে ব্যাপারীদের ভিড়, গরুর গাড়ি আর ঠেলা গাড়ির জমায়েৎ। কালো গাড়ি বাধ্য হয়েই থেমেছিল। তখন বন্ধ গাড়ির অন্তর থেকে সমবেত কণ্ঠে জিগির দিয়েছে ছেলেমেয়েরা। চমকে উঠেছে জনতা। আন্দোলনটা কারুর নজরে পড়ে নি, কিন্তু আলোড়ন একটা হয়েছে, তা প্রতিটি মানুষের মনে। শান্ত সংরক্ষিত নগরের এলাকায় একটা চাপা বিষণ্নতা ছেয়ে গেল।

এ মাসে বাদামতলা মেসের ম্যানেজার হয়েছে দত্তগুপ্ত। কারখানার ডিউটি থেকে সোজাসুজি সে হাটে গিয়েছিল সুখাঁচাদ ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে। চাকর গোকুলটা কোন কর্ম্মের নয়, দত্তগুপ্ত বলে—'আরে বাবা, রান্না ত হাটেই অর্দ্ধেক হবার কথা। এই ধরো উচ্ছে কিনলেই তোমাকে বেগুন কিনতে হবে, তার সঙ্গে মূলো আর কাঁচকলাটি না দিলে চলে?—বলি শুক্তো রাঁধবে ত! আবার ধরো আলু যদি বেশি কিনেচ ত পোস্ত চাই আর কলাই-ডাল—আলু পোস্ত আর কলাইডাল, মানে রাজযোটক।' গোকুলটা অতশত হিসেব করে না, দু-চোখোর মতো যা-নয়-তাই কিনবে। অতএব ম্যানেজার নিজেই হাটে এসেছে।

হাট থেকে ফিরেই দত্তগুপ্ত বেজার মুখে বিড়ি ধরালো—ইস্, পালং শাক নিয়েছ ঠাকুর, বলি দু-আনার বড়ি ত কেনার কথা বললে না। সব মাটি!

সুখাচাঁদ আমতা আমতা করল—আজ্ঞা আমি ত বলেছিলাম আজ্ঞা!

—দ্যাখো, আমি আর সব সইতে পারি, মুখের ওপর ধোপদুরস্ত মিথ্যেটা হজম করতে পারি নে। বলছি—তুমি বলোনি।

—আজ্ঞা, আপুনি যখন বেগুনটা কিনছেন তখন বড়িউলি কতো সাধলে, আজ্ঞা! ওই যে স্বদেশীদের গাড়ি থেকে জয় জয় করছিল আজ্ঞা তখন—

দত্তগুপ্ত দাঁত খিঁচিয়ে ধমকে উঠ্‌ল—ত্থাখো ঠাকুর, আমি আর সব সইতে পারি কিন্তু মুখে মুখে তক্ক করাটা আমি একদম বরদাস্ত করতে পারি নে, তোমাকে কতদিন না বলেছি। বেশ হয়েছে, বড়ি না হলে কি পালং হয় না? বিলেতে ত পালং শাক সেরেফ সেদ্ধ করেই খায় হে!

—তা আজ্ঞা বেসনের বড়া দিলেই শাকুটো সোনার চাঁদ হয়ে যাবে আজ্ঞা!

—আবার ব্যাসন্! লালার দোকানের পোকাপড়া ব্যাসনটি আমাদের গেলাতে পারলে তোমার স্বগ্‌গ লাভ হবে? বলি, আমরা কি গরু না গোবর্ধন—আর সব সহ্য হয়, তোমার ওই ব্যাসনটি বাদে ঠাকুর! তোমার আর কি, দস্তুরী পেলেই হ'ল, বাবুরা মরুক!

নতুন মেম্বার সুবল দস্তিদার, অল্প বয়স, গোঁফের রেখা সবে একটু ঘন হচ্ছে-হচ্ছে ভাব। রোজ বিকেলে এই শীতেও স্নানটি করা চাই। এই নিয়ে রোজ সুখীচাঁদের সঙ্গে সুবলের তক্‌রার বেধে যায়—এই রান্নার সময়ে কিনা সুবলের জন্যে এক বাল্‌তি জল গরম করে দিতে হবে! আব্‌দার মন্দ নয়! উনি গায়ের রং ফর্সা করে মাথার চুলে ব্যাকব্রাশের পালিশ খোল্‌তাই করে যাবেন—রায় সাহেবের বাংলোতে। সুখীচাঁদ গররাজি হ'লে সুবল লোভ দেখায়, 'সামনের পুজোতে তোমাকে কাপড় কিনে দেবো।' দোক্তাপানে ভর্তি গালটা ফুলিয়ে সুখীচাঁদ হাসে—'আজ্ঞা সব বাবুই সব দিয়েছেন!' আজও সুবলের গরম জল পর্ব নিয়ে বেধে গিয়েছিল-গোকুলের সঙ্গে। সুখীচাঁদের মতো গোকুল বহুদর্শী নয়, অল্পেই সে সুবলকে রান্নাঘর থেকে হটিয়ে দিয়েছে। বাজারের উপরীটুকুও বাবুদের জ্বালায় ঘুচলে কার মেজাজ ঠিক থাকে?

দত্তগুপ্তকে দেখে সুবল হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে বল্‌ল—আমার নিমোনিয়া হ'লে দাদা আপনারই বদনাম হবে। আর এই গোকুলের নামে আমি চার্জশীট দিলাম।

দত্তগুপ্ত অবাক হয়ে গেল—বলো কি হে, একেবারে চার্জশীট?

—তা ছাড়া কি উপায় বলুন! এক বাল্‌তি গরম জল দিল না, উল্টে বলে কি না,—

—আমার আর সব সহ্য হয়, কিন্তু এই চার্জশীট-ফিট মোটে বরদাস্ত করতে পারি নে বুঝলে সুবল!

—না পারলে ম্যানেজারী ছেড়ে দিন। আজ ঠাণ্ডা জলে চান করতে হ'ল, চার্জশীট দোবো না?

দত্তগুপ্ত হাঁক দিল—গো-কু-ল!

—আজ্ঞে যাই বাবু।

—আচ্ছা সুবল, এই শীতের সন্ধ্যেয় চানটা করা তো মোটেই উচিত নয়!

—এটা আমার পার্সনাল ব্যাপার। তা ছাড়া উপায় কি বলুন, হাই সার্কেলে মেলা-মেশা করতে গেলে টিপ-টপ থাকতেই হবে একটু। এসব আপনারা ঠিক বুঝবেন না।

গোকুল এসে দাঁড়ালো,—আজ্ঞে কিছু বল্‌ছেন?

—হ্যাঁ, ইয়ে—গাছগুলোয় জল দিয়েছিস্? খবরের কাগজটা কোথায়? নন্দীবাবুর চিঠিপত্তর এসেছে?

—আজ্ঞে—

ধম্‌কে উঠল দত্তগুপ্ত—আঃ, সব কাজেই বাধা দেওয়া তোর স্বভাব। আর সব সইতে পারি গোক্‌লো, কিন্তু এই ইয়ে! আগে আমাকে বসে নিতে দে—

সুবল এই ফাঁকে বল্‌ল—আমার চার্জশীটের কি হ'ল দাদা?

দত্তগুপ্ত এবার আর একটা ধমক দিল—ছুঁচোর গোলাম চামচিকে তার মাইনে চোদ্দ সিকে! ওহে তুমি থামো দেখি! বলি চার্জশীট বানান করতে পারো? বেশ করেছে, খুব করেছে। গরম জলের জন্যে আলাদা বন্দোবস্ত করতে হয়, করে নিয়ো তোমার সেই হাই সার্কেলে। হুঁঃ, পেটে পুঁই চচ্চড়ির ব্রতচারী নাচ, মুখে ড্যাম-সোয়াইন! যাও যাও—

সুবল এবার হাত-পা ছুঁড়ে গলা সপ্তমে চড়িয়ে বল্‌ল—আচ্ছা দেখা যাবে এর কোনো বিহিত হয় কি না। আমিও নিতাই দস্তিদারের নাতি, ছুঁচো বলার জন্ত আপনাকে সাফার করিয়ে ছাড়বো।

কারখানা থেকে অনেকেই ফিরেছে। ধরাচূড়া ছেড়ে লুঙ্গীটি পরে গা এলিয়ে একটু আরাম করছিল, এমন সময়ে মেসে হাওয়া গরম হ'তে দেখে সবাই বাইরে বেরিয়ে এল। ক্ষুদিরাম বাবু সবচেয়ে পুরণো মেম্বার, তিনি এগিয়ে এলেন—বলি ছোকরা এত চেল্লাচ্ছ কেন? ব্যাপার কি?

দত্তগুপ্ত চুপচাপ। সুবলের হাত-পা নাড়া বেড়েই চলেছে—আমাকে ছুঁচো বলা! আপনারা সব সাক্ষী; আমি এর স্টেপ নেবো।

তাচ্ছিল্যভরে দত্তগুপ্ত বিড়ি ধরিয়ে বল্‌ল—যা, যাঃ, ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্‌ করিস নে! বড়লোকের পা-চাটা ক্যাংলা। বলি, তোদের বয়েসী সব ছেলেমেয়েরা দেশের জন্যে জেলে যাচ্ছে, পুলিশের গুলিকে পরোয়া করছে না—আর তুই কি না বাবু সেজে চল্‌লি গোলামের গোলামী করতে। লজ্জা-ঘেন্না কিছু যদি থাকতো—

সুবল তুবড়ীর ফুলকীর মতো তেড়ে-তেড়ে বকে চলেছে—আচ্ছা-আচ্ছা আমিও বল্‌তে পারি ওরকম লম্বাচওড়া কথা। তবু যদি না অবিনাশ ফোরম্যানের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে আব্দুল শেখের ঘরে ঈদের ভেট্‌ পাঠাতেন ত এসব বলা সাজতো! জান্‌তে কিছু বাকী আছে নাকি? তবু তো কামিন ছুঁড়ীর কেচ্ছার কথা তুলি নি।

এবার দত্তগুপ্ত ঘুষি পাকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুবলের ওপর। ক্ষুদিরাম তাকে ধরে সরিয়ে আনলেন—আঃ, এসব কি হচ্ছে!

—ছাড়ুন দাদা, আজ ওকে এখানে জ্যান্ত পুঁতে ফেল্‌ব। আমি আর সব সইতে পারি, কিন্তু ছোটো মুখে বার্‌ফট্টাই একদম বরদাস্ত করতে পারিনে!

গোপাল ওয়াইণ্ডার, চৌধুরী হেলপার, মুখুয্যে টার্ণার সবাই এবার দত্তগুপ্তকে ঘিরে ধরেছে। ক্ষুদিরাম সুবলকে বল্‌ল—সরে পড়ো ছোক্‌রা। দত্তগুপ্ত এমনিতে মাটির মানুষ কিন্তু রাগলে ওর দিগ্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না।

সুবল তখনও হাঁপাচ্ছে, তার ভেতরে যেন একটা হিংস্র উত্তেজনা দাপাদাপি করছে। সে দমবার ছেলে নয়—আমিও ছেড়ে দেবো না। জানের পরোয়া কে করে? মারুক না দেখি!

ক্ষুদিরাম মানুষটি খুব ঠাণ্ডা মেজাজের, তিনি মিষ্টি কথায় সুবলের গায়ে হাত বুলিয়ে বল্‌লেন—অতো চট্‌লে কি চলে? পাশাপাশি থাকো, সবাই

ভদ্দরলোকের ছেলে, দাদাভাই সম্পর্কে—মিথ্যে হাঙ্গামা করে কি হবে বলো ভাই !

—কিন্তু তাই বলে অপমান করবেন উনি ?

—কথা গায়ে মাখলেই অপমান। আরে যা হবার হয়ে গেছে, এখন চেপে যাও। মেজাজ ঠাণ্ডা হ'লে তখন দেখবে ভেবে। এখন যাও ভাই।

—দাদা আপনি গুরুজন, তায় বয়সে বড়, শুধু আপনার কথা রাখবার জন্যেই যাচ্ছি, কিন্তু এও বলে দিচ্ছি—ওঁকে সাফার করতে হবে !

দত্তগুপ্ত বল্‌ল—আপনিই বলুন দাদা, এই যে এত বচ্ছর এই বাদামতলার মেসে আছি—সেই ঝাড়ুদার হয়ে ঢুকেছি কত বছর আগে, তখন থেকে ত দেখছেন। আপনাদের মুখের ওপর কোনো কথাটি বল্‌তে শুনেছেন ? আর দেখুন, দেড় দিনের যুগী, গোকুলকে চার্জ শীট দিচ্ছে, আমাকে চোখ রাঙাচ্ছে। আরে তোর চার্জশীটের ক্যাঁথায় আগুন ! আজ যদি পুরণো চাকরীটি চলে যায়, কাল তুই একটা এরকম বিশ্বাসী লোক জোগাড় করে আনতে পারবি ? তখন এই মেসশুদ্ধ লোকের কি হাল হবে শুনি ! সেই যে স্বামীসাহেব স্ট্রাইকের সময় গোকুলকে বিনি মাইনের ছুটি দিয়ে দেশে পাঠানো হ'ল তারপর ত আবার ফিরে এসে ঠিক কাজ করছে। তখনকার দিন কি এখন আছে ? বেচারী যদি ফিরে না আসতো তাহলে কি হ'ত !

টার্ণার মুখুজ্জে বল্‌ল—চেপে যাও দাদা ! সাম্‌নাসাম্‌নি চাকরদের তারিফ দিলে ওরা জোর পেয়ে বসে। দেখো, উল্টো ফ্যাসাদ হবে, মাইনে বেশি চেয়ে মেজাজ দেখাবে। কথায় বলে ঝি-চাকর, বিয়েকরা বৌ আর গামছা—এ সবই জোরে আছাড় দিয়ে না কাচ্‌লে ঠিক থাকে না। তা চাকরের জাতকে আস্কারা দিতে নেই।

দত্তগুপ্ত গোঁজ হয়ে শুন্‌ছিল, এবার ফট করে হাঁক পাড়লো—গোকুল !

বোধকরি গোকুল কাছেই ছিল, সে সাড়া দিল—আজ্ঞে, গাছে জল দেয়া হয়েছে, খবরের কাগজ বড়বাবুর ঘরে (ক্ষুদিরামকে মেসের সবাই বড়বাবু বলে উল্লেখ করে), নন্দীবাবুর চিঠি আসেনি, চন্দবাবুর চিঠি এসেছে, তাঁর ফিরতে চারদিন দেরী হবে। ছুটি একস্‌টেন করেছেন তিনি—।

—আঃ থাম্ দেখি তুই! তোর ওসব কথা কে শুন্‌তে চেয়েছে?

—আজ্ঞে আপনি জিগ্যেস করলেন তখন, সেই মুখে উড়ো কথা শুরু হলো—তাই বল্‌তে পারি নি।

—আবার মুখে মুখে জবাব! এখন এসব কোনো কথা শুনতে চাই নে। বাবুদের সকলের বিচারে তোমার অন্যায় সাব্যস্ত হয়েছে, সেইজন্যে চার আনা ফাইন বুঝলে।

—ফাইন?

—হ্যাঁ জরিমানা।

ক্ষুদিরাম ঘরে চলে গেছেন। চৌধুরীও তাঁর পিছু পিছু সরে পড়েছে।

গোকুল খুশি মনে বল্‌ল—আজ্ঞে আচ্ছা।

—আচ্ছা কি? মাইনে থেকে কাটা যাবে জেনে রাখো।

—বাবুদের বিচার যখন তখন আর কি বল্‌ব বাবু! তবে দেখ্‌বেন গরীব লোক, তলব থেকে যেন লোকসান না হয়, তাহলে খ্যাঁদার মায়ের বড় খোয়ার হবে। একপাল ছেলেছ্যামড়া—

—তার আর আমি কি করবো। অন্যায় করেছ শাস্তি হ'ল! ব্যস—

—আপনারা দয়া করবেন, আর জানিনে বাবু! এখন এট্টু চা আনি, খুব ত হ'ল।

দত্তগুপ্ত কপট তিরস্কারের সুরে বল্‌ল—ব্যাটা তোওয়াজ করতে শিখেছে ছাখো। যাঃ, তোকে আমি একটাকা বকশিস্ করব, কিন্তু মাইনে থেকে ফাইনটা কাটা যাবে ঠিক। আর গোকুলো,—আমি ত এখন কোম্পানীর অংশীদার রে। ব্যাটা জানিস্, শীগ্‌গির পঁচিশখানা শেয়ার কিন্‌ছি—হ্যাঁ রে!

গোকুলের কপাল ফিরে যাওয়াতে সুখীচাঁদ একটু ফুট কাটলো—বুড়ো হ'লে অমনি মতলববাজ হয়! শালা আমিই যতো খেটে মরি। উনি আছেন বকশিস বাগাতে আচ্ছা।

চায়ে চুমুক দিয়ে দত্তগুপ্ত খুশির সুরে বলল—ও গোকুল, এযে চিনির চা—মানিক!

—আজ্ঞে!

—বলি গুড়ের গন্ধ ত পাচ্ছি নে চাঁদ! চিনি পেলি কোথায়?

—আজ্ঞে গুড়ের গন্ধে চায়ের বাস নষ্ট হয় কি না।

—কিন্তু চিনি পেলি কোথায় হতভাগা?

—জোগাড় করলাম।

—তোর বাপের চিনির কল আছে? হপ্তায় আধপো চিনি, সেও তো ব্ল্যাকে বেচে দিস। বলি রেশন ত আসবে কাল—

গোকুল বেগতিক দেখে বিনা কৈফিয়তেই সরে পড়েছে।

দত্তগুপ্ত একা-একা ঘরে বসে আজকের বিকেলের কথাই ভাবছে। এই মানিকপুরের বুকের ওপর এমন দুঃসাহসিক কাজ কে করল, কারা গেল জেলে! চাকরীর পিছুটান না থাকলে, দেশের বাড়িতে ঘরসংসারের দায়িত্ব না থাকলে, দত্তগুপ্ত নিজেও এদের ডাকে হয়তো সাড়া দিতে পারতো! কিন্তু পিছুটানেই ত সব ঘোলা করে রেখেছে!

চুয়াল্লিশ

সন্ধ্যার সময় অমল রোজই সেতার বাজায়। আসেন মাষ্টারমশাই। রহস্যের দুর্ভেদ্য জালে ঢাকা এই মানুষটিকে অমলের খুব ভালো লাগে। মানিকপুরের কেউ এঁর নাম জানে না—অথচ এঁকে না চেনে এমন লোক এ শহরে খুব কমই আছে।

অন্য দিন অমল কোয়ার্টারে ঢুকবার আগেই দূর থেকে সেতারের সুর শুনতে পায় কানে। এমন মিঠে হাত মাস্টারমশায়ের যে, সুর একবার কানে গেলে মনেও বসে যায়। নিজের অজ্ঞাতেই অমল উৎকর্ণ হয়ে থাকে মাস্টার মশায়ের হাতের মীড়-গমকের কাজ শোনার জন্য। পথের দু-পাশে কচি-কচি পাতার গায়ে শেষ সূর্যের নরম আলোর সঙ্গে মিশে এই সুরটুকু যেন অন্য কোনো অজানা লোকের হাতছানি বলে ভুল হয়! পাশাপাশি চল্‌তি আর সব ডিউটি-ফেরৎ মানুষগুলিকেও অমলের আশ্চর্য সুন্দর মনে হয়। রোজই এই ভাবে দিন চলেছে গত কয়েকমাস ধরে। হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া মানিকের মতো মাস্টার-মশাই অমলের কর্মক্লান্ত নিস্তেজ দেহে নতুন প্রাণের রসদ জুগিয়ে চলেছেন। এর পর আছে অনিল। সে অবশ্য তেমন কিছুই শিখতে পারে নি। কিন্তু তার হাতটাও বড় মিঠে। মাস্টারমশাই বলেন,—হবে, খুব তৈরী হবে। আমি এমন ছাত্র যে কতদিন ধরে খুঁজছি!

আজ কিন্তু অমলের আশার সুর কানে লাগল না। বিস্ময় নয়, ব্যতিক্রমের জন্য একটু ছন্দ-পতনের বেদনায় অমলের ক্লান্তদেহটা আসন্ন।

মা দরজা খুলে ঘাসের ওপর মোড়া পেতে জাম্পার বুনছেন।

অমল বল্‌ল—মাস্টারমশাই-এর কি হলো বলো তো!

—তোমার মাস্টারমশাই, তুমিই জানো বাবা! খেয়ালী মানুষ ত!

—লোকটা যা বেহুঁশ, হয়তো গাড়িটাড়িই চাপা পড়েছে। এমনিতে ত কানে শুন্‌তে পায় না। তার ওপর আবার অন্যমনস্ক।

—আচ্ছা, কানে শোনেন না ত টকা-টক তোর বাজনা বেসুরো বলে ধমক দ্যান, আবার অণ্টুর সুখ্যেত করেন, তা কি করে হয় ?

অমল হাসলো বিজ্ঞভাবে—ওরে বাবা, সুরের ঘরে শিকারী বেড়াল। একটু এদিক-ওদিক হ'লে রক্ষে নেই। সেবার মনে নেই, জলসাতে তবল্চি বেতালা সঙ্গত করল বলে উঠে চলে এলেন! ওইরকম আর কি। অথচ তিনগজ দূর থেকে কাল দুপুরে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করেও সাড়া পেলাম না!

—মানুষটি কিন্তু বড় ভালো।

—গুণী বটে, ভালো-মন্দ জানিনে মা।

—থাক্ অনেক হয়েছে গুরুনিন্দে, এখন মুখহাত ধুয়ে আয়।

—আসি মা। কিন্তু এত দেরী ত হয় না ওঁর।

—সময় হ'লেই আসবেন, তুই জলখাবার খেয়ে নে ত।

—আমার জন্যে ত ভাবনা নেই। ওই লোকটার কপালই খারাপ, নইলে মানিকপুরের মতো জায়গায় আজ পর্যন্ত একটা হিল্লে হ'ল না! অথচ বেতালা-বেসুরা আজেবাজে লোক সব মোটামোটা টাকা রোজগার করছে!

—তোর ভাবনা-করাই সার। তার চেয়ে কারখানাতে যদি একটা কেরাণীর কাজ জুটিয়ে দিতে পারিস ত দ্যাখ।

—এটা তুমি কি বল্‌ছ মা! এইরকম গুণী শিল্পীকে ওখানে মানাবে কেন?

—গুণী হলেই বুঝি বাউণ্ডুলের মতো ভেসেভেসে বেড়াতে হবে। তাতেই বেশ মানায়, না রে!

—না মা, আমার কি মনে হয় জানো, মাস্টারমশাই-এর মনে খুব বড় একটা ব্যর্থতার আঘাত লুকোনো আছে। মনে হয় বল্‌ছি কেন, কথাটা সত্যি—একদিন কথায় কথায় বলেই ফেলেছিলেন। ওঁর আর সব ভাই কেউ জজ, কেউ ম্যাজিস্ট্রেট—নামজাদা। আর উনি জীবনে কিছুই করতে পারলেন না। কেবল গান-বাজনার পিছনে সময় নষ্ট করেছেন। বংশের নামে কলঙ্ক পড়বে বলেই উনি এমন নামধাম ভাঁড়িয়ে চলেন। কত করে বোঝাতে চেষ্টা করেছি, শিল্পীর মর্যাদা ওসব জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে কম ত নয়ই বরং বেশি। তা শুনে উনি খুব হাসলেন, বল্‌লেন, সে ত আমাকে দিয়েই দেখতে

পাচ্ছেন। অবিশ্যি আমার ওস্তাদের পায়ের নখের যুগ্যিও নই!—তাঁরই বা কি আদর?

—সংসারে ক' জনই বা গুণীর মূল্য দিতে জানে বাবা! তা হ্যাঁ রে, মাস্টারমশাই-এর চা করব?

—করো। এখুনি হয়তো বিড়ির বাণ্ডিল হাতে করে হাজির হবেন। ইয়ে, অনিলটা এখনো ফিরল না কেন?

—তোর যতো ভাবনা। শরীরটা একটু সেরেছে, ঘুরে ফিরে বেড়ানোই ত ভালো। হয়তো ওই দীনদয়ালবাবুর বাড়ি গিয়েছে। ওর ত একটিই যাবার জায়গা।

—ঠাণ্ডা লেগে না-যায় আবার। একা-একা বেরিয়েছে, চাদরও নেয়নি দেখছি।

—বল্‌ল, আজ বেশ গরম লাগছে। আমি বলেছিলাম চাদরের কথা।

মাস্টারমশাই এসে পড়লেন।

অমল তাঁকে দেখেই উৎসাহিতভাবে বল্‌ল—কী, আমি ভাবলাম বুঝি গাড়ি চাপাই পড়লেন!

মা মৃদু তিরস্কার করলেন—ছি, অমন কথা মুখে আনতে নেই অমু!

মাস্টারমশাই চুপ করেই রইলেন, কী যেন ভাবছেন!

অমল সেতার নামিয়ে আনলো।

মাস্টারমশাই বল্‌লেন—আজ থাক্।

—সে কী!

আশ্চর্য হবারই কথা, মাস্টারমশাই এভাবে কোনোদিন অনিচ্ছা ত প্রকাশ করেন না, বরং সেতার বাজাতে বাজাতে এমন মশগুল হয়ে পড়েন যে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় দশটার ভোঁ বাজল—এবার উঠুন!

মাস্টারমশাই বিড়ির আশ্রয়ে মুখ লাগিয়ে পকেট থেকে একখানি চিঠি বার করে দিলেন। অমল প্রশ্ন করল—এটা আবার কী?

—পড়ুন।

বলেই মাস্টারমশাই উঠে পড়লেন।

—ও কী, চল্‌লেন কোথায় ?

—একটা কাজ আছে জরুরী। চলি।

চিঠিখানায় দৃষ্টি রেখে অমল যেন কি বল্‌তে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়াল! সেই অবসরে মাস্টারমশাই উধাও হয়ে গেলেন। চিঠি ত নয়, দু-লাইনের খবর। অনিলকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, মাস্টারমশাই স্বচক্ষে দেখেছেন।

—মাস্টারমশাই, মাস্টারমশাই—শুনুন!

বলে অমল ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল।

তার এই আচম্‌কা উৎকণ্ঠিত ডাকে মা ব্যস্তভাবে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন—কি হলরে অমু ?

ততক্ষণে অমল রাস্তায় নেমে গেছে। ঘরখানা খালি-মাদুরের ওপর সেতারটা আর একজোড়া বাঁয়াতবলা পড়ে রয়েছে।

অমল ছুটে গিয়ে মাস্টারমশয়ের নাগাল ধরল—শুনুন, চলে যাবেন না।

—না, না, অমলবাবু, আমি আর এ মুখ দেখাতে পারব না মায়ের সামনে।

—শুনুন মাস্টারমশাই, একা ফেলে যাবেন না আমাকে!

অন্ধকারেও পথ চল্‌তি লোকেরা ওদের দিকে তাকাচ্ছে।

মাস্টারমশাই আবেগকম্পিত স্বরে কথা বল্‌ছেন, যেন পদে পদে হোঁচট খাচ্ছেন বল্‌তে গিয়ে—এ লজ্জা রাখবার জায়গা নেই অমলবাবু! আমি সেখানে দাঁড়িয়ে। আমার চোখের সাম্‌নেই অনিলকে ধরল! আর কি না, আমি কাঠ-পুতুলের মতো দেখলাম। কিছুই করলাম না!

—কীই বা করতে পারতেন ?

—বলেন কি, অনিলকে আঁকড়ে ধরলে কে ঠেকাতো ? আর কিছু না হোক, ওদের সঙ্গে নয় আমিও যেতাম। এইসব তাজা ছেলেমেয়েগুলোকে ধরে নিয়ে গেল, আর সেখানে কম করে আমরা পাঁচ-সাতশ লোক তাই দেখলাম দাঁড়িয়ে! আমরা মানুষ নই অমলবাবু! ছি-ছি-ছি—এ আমি কি করলাম!

অমল কি বলবে, কি করবে ভেবে পায় না। কেমন করে এই বেদনাকাতর মানুষটিকে শান্ত করবে এই চিন্তায় সে অস্থির হয়ে শেষে মাস্টারমশাইকে জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—আপনি চলুন, মুখের চাটুকু ফেলে গেলে মা আরও কষ্ট পাবেন।

কোয়ার্টারে ফিরেই অমল মাকে বল্‌ল—তোমার আর ভাবনা নেই মা, অণ্টুবাবু রাজসেবা খেতে গিয়েছে। রেশনের চাল অনেক বাঁচবে।

মা বল্‌লেন—ঠাট্টা রেখে বল্‌ ত কি হয়েছে ?

—হবে আবার কী, সেই যে মালবিকা সেন এসেছিল, তাকে অণ্টুর ভারি পছন্দ হয়েছে—এমনই পছন্দ যে, একেবারে জেলখানা পর্যন্ত সঙ্গে গিয়েছে।

—সে কী রে ! সত্যি নাকি ? ওর যে শরীর এখনো সারে নি বাবা !

—এবার সেরে যাবে, তুমি কিছু ভেবো না মা ! মাস্টারমশাই দেখেচেন বেশ ঢাকা গাড়িতে করে ওদের নিয়ে গেছে। ঠাণ্ডা লাগবে না একটুও।

—তা ওর আর কি দোষ বল্‌, ছেলেবেলা থেকে চোখের সাম্‌নে বাপকে দেখলো, বড় ভাইকে দেখল। কিন্তু শরীরটা যে বড় দুর্বল। তাছাড়া এসব হাঙ্গামে ত কখনো ঝোঁক দেখি নি এর আগে, বরাবর লেখাপড়া নিয়েই থাকতো।

অমল বল্‌ল—কি জানি হয়তো আমাকে লজ্জা দেবার জন্যেই গেল।

মাস্টারমশাই এতক্ষণ পরে কথা বল্‌লেন—সাহস বলিহারী !

অমল বাধা দিল—সাহস কি দেখলেন ? বাঘ নয়, সিংহ নয়—পুলিশের সামনে গলাবাজি করেছে এই ত।

—কিন্তু এখন খালাসের চেষ্টা করতে হয়।

মাস্টারমশাই বিড়ি ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে বল্‌লেন—মানে, একবার মাতব্বরদের কাছে গিয়ে বলা যাক।

অমল হাসলো—আপনার কি মাথা খারাপ ? কাকে বল্‌বেন ! আর বল্‌লে শুনছে কে ? তার চেয়ে কাফী সিন্ধুটা একবার ঝালানো যাক, আসুন।

মা নিঃশব্দে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

মাষ্টারমশাই চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বল্‌লেন—আপনি অদ্ভুত মানুষ।

—মানুষ ? কে, আমি ? কি করে বুঝলেন ? আমি একজন লেবারার, মেহনৎ করি মজুরী পাই। ব্যস, ফুরিয়ে গেল। যদি মানুষ হতাম, আমিও ওই মিছিলে সামিল হয়ে নিজের দাবী জানাতাম। কিন্তু তা পারি নি, পারবার

উপায় জেনেও তাকে মেনে নেবার সাহস আমার আর নেই—কাজেই মানুষ নই আমি। এই মানিকপুরে ষোলআনা মানুষ কি কেউ আছে? যাক, ওসব ভুলে যাই, আসুন।

মাষ্টারমশাই লণ্ঠনের আলোতে অমলের মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন বোঝবার চেষ্টা করছেন! অমল সেতারখানা হাতে তুলে আলাপ শুরু করল।

সে রাত্রে অমল কিছুতেই মাষ্টারমশাইকে ছাড়ল না। বল্‌ল—আজ অনেক রাত পর্যন্ত আপনার বাজনা শুনবো। যাওয়া হবে না—কিছুতেই না।

পঁয়তাল্লিশ

সেদিন ইউরোপীয়ান ক্লাবে বিশেষ নাচ-গানের আয়োজন ছিল। গ্রেট বেঙ্গল ষ্টিল ম্যানুফ্যাচারার্স কোম্পানীর ডিরেক্টরের সম্মানে, কারখানার মাথা মাথা কর্মচারীরা সস্ত্রীক হাজির। ডিরেক্টব পৈতৃক পরিচয়ে কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তান হ'লেও আচার-আচরণে খাশ সাহেবদের টেক্কা দেন। সস্ত্রীক হাজারীবাগ গিয়েছিলেন খনি দেখতে—ফিরতি পথে একবার এই শহরে রাতটুকু জিরিয়ে নেবেন।

মল্লিকসাহেবের আসতে একটু দেরী হয়েছে। কলকাতায় ট্রাঙ্ককল করে ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে গিয়ে তাঁর এই বিলম্ব।

উৎসব শুরু হয়ে গেছে। অর্কেষ্ট্রার ধ্বনি-কোলাহলে ইন্‌ষ্টিট্যুটের বাতাস উতল। গাড়ী থেকে নেমে মল্লিক ত্বরিৎবেগে হলঘরে ঢুকে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

ডিরেক্টর স্যর রাধানাথকে ঘিরে একটা জটলা চলেছে। এখানকার ম্যানেজার এবং চীফ ইঞ্জিনিয়ার, ওয়ার্কস্‌-সুপার সবাই তাঁর এপাশ ওপাশ বসে। মল্লিক সে দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে তাঁকে পিছন থেকে মেয়েলী গলায় কে ডাকলো—অনিদাদা!

মল্লিক পিছন ফিরে একটু হাসলেন—ও তুমি!

—কেমন আছো?

—ভালো। তোমার শরীর ভালো তো?

—খু-উ-ব। অমন ছট্‌ফট্‌ করছ কেন, শোনোই না—

—দাঁড়াও আগে মালিককে সেলাম দিয়ে আসি।

—ইস্‌, আমাকে ফেলে ওঁকে খাতির করলে কিন্তু ফল ভালো হবে না!

—জানি, তুমিই ত আসল মালিক সরযূ! তবু ফর্মালিটিকে খাতির করতে হয়।

বলে মল্লিকসাহেব অর্থপূর্ণ হাসি হেসে আবার এগিয়ে গেলেন। স্যর রাধানাথ অনিরুদ্ধকে দেখে একটু হাসলেন। অনিরুদ্ধ দেরীর জন্য ত্রুটী স্বীকার করে শুধরে নিতে চেষ্টা করেন। রাধানাথ যে অনিরুদ্ধর অন্তরঙ্গ বন্ধু, সেটা তাঁদের কথাবার্তায় একটুও বোঝবার উপায় নেই। অত্যন্ত মামুলি কুশল-বিনিময় ছাড়া অন্য প্রসঙ্গে কেউই গেলেন না। ওদিক থেকে লেডী সরযূ এসে মল্লিকের হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবার সময় একবার সকলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন—প্লিজ—এক্সকিউজ্ মি!

সবাই সমস্বরে হেসে উঠ্ল। রাধানাথ চুরুট ধরালেন।

এক প্রান্তে একটা নিভৃত জায়গায় গিয়ে মিস্টার মল্লিক আর লেডী সরযূ বসলেন। তাঁদের সামনে পানীয় সম্ভার নিয়ে বেয়ারা হাজির হ'ল। শ্যামপেনে চুমুক দিয়ে সরযূ বল্লেন—ওঃ, কতদিন পরে তোমাকে দেখছি অনিদা, কিন্তু একটুও বদলাও নি ত!

—তুমিই বা এমন কি পাল্টেছো! তেমনি আপেলের মতো চক্চকে তোমার স্কিন!

—থাক আর ঠাট্টা করতে হবে না। সারাটা জীবন ত শুধু কথার ফুল্ঝুরিই ছড়িয়ে দিলে অনিদা!

—আর কীই বা দিতে পারতাম? কিছুই ত চাইলে না—!

—পারতে, তুমিই পারতে—কিন্তু দিলে না। চাওয়াটাকেই এত বড়ো করে দেখলে? দেওয়ার সার্থকতা কিছু বুঝলে না! তুমি এতো কৃপণ, প্রাণে ধরে কাউকেই কিছু দিতে পারলে না! তাতে কী লাভ হ'ল বল্তে পারো?

মল্লিকসাহেব হুইস্কি আর ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে একটু একটু করে গিল্ছেন, তাঁর দৃষ্টি গ্লাসের স্বচ্ছতা ভেদ করে যেন অনেক-অনেক দূরের কোনো রাজ্যে চলে গিয়েছে। আস্তে আস্তে বল্ছেন তিনি—সরযূ, আমার নিজের বলে কিছুই নেই, ছিল না। তুমি ত জানো। আর হৃদয়, সেটা এই কারখানা শহরের লোহাতে, ইস্পাতে, আগুনে কবেই পুড়ে গেছে! মাঝে মাঝে সেসব দিনের কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায়—তখন খুব হাসি পায়।

সরযূ অনিরুদ্ধর দিকে নরম মদালস দৃষ্টির স্পর্শ বিছিয়ে দিয়েছে, তার মনের

সবটুকু ওই আয়ত দুটি চোখের তারায়-তারায় ঘন আবেশে উজাড় হয়ে উপছে পড়ছে—হাসি পায়! কান্না পায় না কেন? আমি ত কাঁদি—তোমার জন্যে, আমার জন্যেও।

—তোমার কান্না তোমাকে মানায়। কিন্তু আমাকে হাসিতে-কান্নাতে কোনো কিছুতেই মানায় না। আমি যে বিধাতার আসনে ভাগ বসিয়েছি। তা জানো না বুঝি!

—অনিদাদা, তুমি আবার সেই পঁচিশ বছর আগেকার স্বরে কথা বলছ, আমার কী যে ভালো লাগছে! বলো—বলো—!

—আজ বলব বলেই এসেছি। সরযূ, তুমি আমাকে অনেক দিলে—আমার ভাগ্যলক্ষ্মীকে তুমিই এনে দিয়েছ। তুমি দিয়েছ এই মানিকপুর কারখানার তখ্‌তে তাউশ, কিন্তু তার বদলে আমার দেবার সামর্থ্য কিছু নেই। কিছু না।

—আবার ওই কথা! যা দিতে চেয়েছি অথচ দিতে পারিনি, তা ছিল আমার সামর্থ্যের বাইরে। সেই জন্যে তুমি ঠাট্টা করছ জানি। করো।

—তোমাকে ঠাট্টা করব এমন সাহস নেই সরযূ। কিন্তু আজ আর এই বোঝা বইতে ভাল লাগছে না। কী যে হয়েছে, কেবল মনে হয়, দুদণ্ড বিশ্রাম পেলে বেশ হ'ত।

—কি হয়েছে তোমার বল্‌বে না আমাকে? বিশ্রাম কেন?

—যদি বল্‌তে পারি ত সে তোমাকেই—। তাছাড়া আমাকে কেউ বোঝে না সরযূ—কেউ নয়। অথচ আমি এদের ভুলবোঝা মানুষটি সেজেই এতকাল কাটিয়ে এলাম। তোমার বিলিয়ে দেওয়া সৌভাগ্য আমাকে নকলগড়ের রাজা করেছে সরযূ, কিন্তু উপায় নেই আর,—আরও কতকাল যে এই অভিনয়ের মধ্যে নিজেকে রেখে দিতে হবে জানিনে।

দীর্ঘ নিশ্বাসের পর সরযূ আরও একটু সামনে ঝুঁকে বসল।

অনিরুদ্ধ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল—না, থাক।

সরযূ তাকে ধরে বসিয়ে বল্‌ল—থাকবে না। বলো, বলো।

—কী বল্‌ব, সবই ফাঁকা কথা। আমার কাজের মধ্যেই ত আমার পরিচয়, মনের ত আলাদা কোনো ফটোগ্রাফ হয় না।

—শোনো অনিদাদা, আমি ছাড়া তোমার মন হাল্কা করবার কোনো ডাস্টবিন নেই, আজকের এই রাতটুকু পর আমিও চলে যাবো। তবে কেন সময় নষ্ট করছ? বলো—

—তুমি ডাস্টবিন? না, না। তুমি হচ্ছ আমার মনের আয়না। তোমাকে দেখলে হঠাৎ যেন ভুলে-যাওয়া আমিটাকে খুঁজে পাই। আমার সাজ-মুখোশ সব খুলে বেরিয়ে পড়ে একটা রক্তমাংসের মানুষ—যার প্যাশন আছে, যার যুক্তির চেয়ে সেন্টিমেণ্টটা বেশী, তেমনি মানুষ। যাকে আরও কোথাও খুঁজে পাই নে, এক তোমার সামনে ছাড়া।

—তাকে ছাখো, ভালো করে ছাখো, আমি ত তাই চাই অনিদাদা! তোমার মধ্যে আমাকে খুঁজি, তুমি পাও নিজেকে আমার মধ্যে—আজও। এটা কি কম কথা!

—কম নয়, বেশিও নয়—সেটুকুই সব। কিন্তু আজ আর পারছি না সরযূ, বড় চোট খেয়েছি। মন্দাকিনী আমাকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে দলে চলে গেল।

—কি হয়েছে মন্দাকিনীর?

অস্থির কণ্ঠে সরযূ জিজ্ঞাসা করলেন।

—তবে শোনো গোড়া থেকে, সে কিছুকাল ধরে স্বদেশী আন্দোলনে ডুবে গিয়েছিল। হঠাৎ এই মানিকপুরে এসে হাঙ্গামা বাধালো। আমি ত একটা ব্যক্তি নই এখানে, আমি একটা প্রতিষ্ঠানের প্রতীক। কাজেই কর্তব্য যা আদেশ দিল তাই ঘটেছে—কালকে তাকে জেলে যেতে হয়েছে। কিন্তু আমি কী করতে পারি—She is representing revolution!

সরযূ মদের গ্লাস আঁকড়ে ধরে থর-থর করে কাঁপছেন। অনিরুদ্ধ বললেন—কী চুপ করে আছো যে, ভুল করেছি?

—তুমি মানুষ নও অনিদাদা! ঠিকই বলেছ, লোহার আগুনে তোমার মনটা পুড়ে গেছে। কিন্তু পুড়ে কেন ছাই হয় নি? ইস্পাত কেন হয়েছে! ইস্পাতের ধারালো অস্ত্র তৈরী করেছে তোমাকে এই কারখানার যন্ত্র! ছি-ছি এ আমি কি করেছি? নিজের মেয়ের বিরুদ্ধে তোমার সেই অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারলে!

অনিরুদ্ধ তাচ্ছিল্যের সুরে বল্‌লেন—তুমি? তুমি আবার করবে কী!

—আমিই ত তোমাকে এই কারখানায় টেনে এনেছিলাম। নইলে আজ এ অবস্থা হ'ত না তোমার। ওঃ, অনিদাদা, এ তুমি করলে কী!

—বাঃ, আমি করলাম কঠিন কর্তব্য আর তুমি দিচ্ছ ধিক্কার! এই আমার পুরস্কার!

—তুমি বুঝছ না, কর্তব্য কেবল আইন আর নিয়ন্ত্রণের পথে চল্‌লে মানুষ যে আর মানুষ থাকবে না! দোহাই, কোথাও একটু দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে প্রমাণ করো যে তুমিও মানুষ। নইলে—

—নইলে কী!

—নইলে বাঁচবার পথ কোথায়?

—কেন, এই ত বাঁচা।

—এর নাম বাঁচা নয় অনিদা। একে বলে যন্ত্রের দাসত্ব।

—যন্ত্র, যন্ত্র, যন্ত্র। এ যন্ত্র ত আমরাই তৈরী করেছি।

—কিন্তু আমার তৈরী যন্ত্র আমাকে দিয়ে দাসত্ব করাবে?

—নইলে আমার গৌরব কোথায়?

—আর যাই থাক্, দাসত্বে গৌরব নেই অনিদা।

—কিন্তু আমার সৃষ্টি যে নিখুঁত তার প্রমাণ তখনই পাবো যখন সেই সৃষ্টি আমাকে পরিচালিত করবে। এর নাম সমাজ, শৃঙ্খলা, যা খুশি তাই বলতে পারো। মানুষ ত চিরদিন এই শৃঙ্খলাকেই নির্ভুল ভাবে বানাবার জন্য প্রাণপাত করেছে।

—করেছে নিজের সুবিধের জন্যে। কিন্তু তোমার কাছে ব্যক্তির মর্যাদা কিছু নেই, বলছো যে, আছে সমাজের। কিন্তু সমাজ ত মানুষ দিয়েই গড়া। তাহলে সমাজেরও মূল্য নেই তোমার কাছে। তোমার তত্ত্বকথা তোমারই থাক্। স্নেহ মমতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে আমি স্বর্গ রচনা করতে চাই নে, মর্ত্য আমার অনেক ভালো।

—তা আর কি করা যাবে! আমি যা চাইনে চিরটা কাল আমাকে দিয়ে তা-ই করিয়ে নিচ্ছো তোমরা। আর দোষ দেবার বেলাতেও আমাকেই দিচ্ছ!

অথচ এই বিরাট যন্ত্রের একটা ইম্‌পর্টেন্ট স্ক্রু ছাড়া আমি কিছুই নই। যারা কাল আন্দোলন করতে এসেছিল, তাদের কাউকে আমার জায়গায় বসিয়ে দিলে দেখতে, এ ছাড়া অন্য কিছুই করত না। একের সঙ্গে এক যোগ করলে দুই ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না—এই তো হিসেব। অন্য কিছু হ'লে ভুলই হবে।

—তোমার সঙ্গে তর্ক করে ত পারব না। আমি যা পারি তা-ই করব—হোম মিনিস্টারকে অনুরোধ করব, তারপর মন্দাকিনী ছাড়া পেলে তোমার মেয়েকে বাড়িতে নজরবন্দী করে রাখার ভার তোমার। এদিকে একটা সৎপাত্রের খোঁজ করি—

অনিরুদ্ধ এবার তীব্র প্রতিবাদ করলেন—না, সে হয় না। আমি যেমন মানুষ নই, তেমনি টাইর‍্যাণ্ট নই—মন্দাকিনীর পথ সে নিজে বেছে নিয়েছে। আমাদের অস্বীকার করাই তার ব্রত। শুধু অস্বীকার নয়, বিপক্ষতা করা ওর লক্ষ্য। লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে, ও যখন এই রাস্তা ধরেছে তখন চলুক নিজের ক্ষমতায়। তারপর নাকানী-চোবানী খেয়ে যদি কোনোদিন নিজে ইচ্ছে করে ফিরে কাছে আসে তখন দেখা যাবে। তার আগে নয়।

—অনিদাদা, একরত্তি মেয়েটাকে তুমি এভাবে ভেসে যেতে দেবে?

—আজকের তুমি মনে করছ ওর বয়স একরত্তি, কিন্তু সেকালে তোমার একুশ বছর বয়সে কি করেছিলে মনে পড়ে? তখন তুমি একজনের গলা জড়িয়ে ধরে বিলেতে কতো মিষ্টি কথা বলেছিলে! আর তার পরই আর একজনের গলায় মালা দিলে। সে সময়ে নিজের বিচারবুদ্ধিকেই ত সবচেয়ে উঁচুতে আসন দিয়েছিলে, কেউ কি তোমায় টলাতে পেরেছিল?

—সে ভুলের মাশুল ত সারাজীবন ধরে দিয়েও শোধ হ'ল না। আজও সেই কান্না তোমার কাছে কাঁদছি! সেইজন্যেই মন্দাকিনীকে বাঁচাতে চাই—

—এভাবে বাঁচানো যায় না সরযূ। আগলে রাখা হয়—তাও বেশি দিন নয়। যে নিজের হাতে ভাগ্যের ভার কেড়ে নিয়েছে তাকে ছেড়ে দাও।

—এটাই তোমার চরম কথা?

—আমার কথা বদলায় না।

—পাষাণের কোনো মন থাকে না। তাই না অনিদাদা!

—হ্যাঁ। তবে ব্যবহার করতে যারা জানে তারা ওই পাষাণকে দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানতে পারে।

লেডি সরযুর পালিশ করা মসৃণ গণ্ডে কয়েকবিন্দু টলটলে মুক্তোর মত অশ্রু একটু একটু করে ঝরে পড়ে গেল। অনিরুদ্ধর ওষ্ঠপ্রান্তে করুণ হাসির আভাস নিমেষে ফুটে উঠে আবার হারিয়ে যায়। তিনি আস্তে আস্তে বল্‌লেন—সরযূ, ওঠো, নাচের লগ্ন বয়ে যাচ্ছে।

—যাক।

—কাল ত আর দেখা হবে না। আবার কত কাল পরে—

—অনেক কাল ধরে মনে মনে আশা জমে ওঠে, স্বপ্নের জাল বুনি—দেখা হ'লে বুঝি অমৃত পাবো—কিন্তু মুখোমুখী এলে কী যে হয়! তার চেয়ে দেখা না হওয়াই ভালো! জ্বালা শুধুই বাড়ে, কেন বল্‌তে পারো?

—রাগ করলে? আমি কিন্তু অনেকটা হাল্‌কা হয়েছি।

একটি কথায় সরযূ চকিতে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, বল্‌ল—মিথ্যে অভিমানের অবসর নেই। আবার ত কাল থেকেই ছকে-বাঁধা ঘানি টানতে হবে! মনের মধ্যে ত তোমার দয়ার দানটুকুই পুঁজি। চলো।

—দিন যে ফুরিয়ে আসছে সেকথা সবাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, অথচ বিশ্বাস করতে পারি নে কেন বলতো সরযূ? সত্যিই কি ফুরোবে এই দিন?

—ওসব হিসেবের কথা থাক্‌। তোমার সঙ্গে একটু বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে। ওরা নাচুক, আমরা একটু খোলা হাওয়ায় বেড়াই চলো।

—সেটা অশোভন হবে। সবাই কি ভাববে!

সরযূ শক্তভাবে অনিরুদ্ধর ডান হাতখানা নিজের নরম মুঠিতে ধরে টানলেন—হোক অশোভন, অন্যায় ত হবে না।

কতকাল পরে অনিরুদ্ধ মল্লিক অনিয়মের স্বাদ পেলেন আজকের এই শীতের রাতে। স্মৃতির রোমন্থনের সিঁড়ি বেয়ে এই প্রৌঢ়া সঙ্গিনী যেন তাঁকে বসন্তের আনন্দলোকে নিয়ে চলেছে!

চুয়াল্লিশ

টিফিনের সময় কারখানাটা যেন ক্ষুধার্ত মানবের মতো ছট্‌ফট্ করে—পাওয়ার-হাউসের হিস্ হিস্ শব্দ আর চুল্লীগুলোর আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপ অসন্তোষে-অতৃপ্তিতে গজরায়। দূর-পার থেকে যেসব মজুর আসে তাদের কেউ কেউ সঙ্গে করে খাবার বেঁধে নিয়ে আসে সাইকেলে—তাতে হোটেলের চেয়ে অনেক কম খরচে উদর পূরণ করা যায়। এই সময়ে ওইটুকু আহার্য নিঃশেষ করেও সময় থাকে হাতে প্রচুর, কেউ কেউ শুয়ে পড়ে, নিমঘুম দিয়ে শরীরটা তাজা করে তোলে।

সুধীরেশ তার টিফিন-ক্যারিয়ারটা খুলেই চীৎকার করল—কোন্ শালা আমার ইয়েতে হাত দিয়েছিল? যতো সব বেইমান জুটেছে—হারামীদের চাব্‌কে পাছার খাল খুলে নেবো।

ওধারে রমজান টিণ্ডাল রুটী-গোস্তে কামড় দিয়েই সুধীরেশের গালাগালি শুনে হাত গুটিয়ে বল্‌ল—কী হ'ল সুধীরবাবু?

রমজানের মুখে তখনও খাবার ভর্তি, কথাগুলো স্পষ্ট বেরুচ্ছে না। তবু সুধীরেশ বুঝল, বল্‌ল—এখন করি কি বলো তো? ভাত-ঝোল-তরকারী কিছু বল্‌তে কিছু রাখেনি! একদানাও না।

রমজান মুখের খাবারটুকু উদরস্থ করে, উঠে এসে দেখল, সুধীরের টিফিন-ক্যারিয়ারটা ফাঁকা। সে বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল—জল এল কোথা থেকে?

—এ্যাঁ এ-হে-হে। পেচ্ছাব, মাইরী। ছি-ছি-ছি!

এত দুঃখেও সুধীরেশ হেসে ফেল্‌ল, রমজানও হাসি চাপতে পারে না।

পরক্ষণে টিফিন-ক্যারিয়ারটা নিয়ে সুধীরেশ কলতলায় ছুটে গেল। রমজান ফিরে এসে অসমাপ্ত খাবারটুকু খেতে লাগল,—একটু দূরে লোকো-শেডে বসে আছে সিল্‌ভা, খালাসীর কাজ করে। তাকে ডেকে রমজান হাসতে হাসতে এই বৃত্তান্ত বল্‌তে লাগল। সিল্‌ভা ছেলেমানুষ, সেও একচোট হেসে নিল। সুধীরেশ ফিরে আসতে ওরা দেখল তার মুখখানা খুব গম্ভীর।

রমজান বল্‌ল—সুধীরবাবু, এখনো সময় আছে, আপনি বরং আচার্যির দোকানে গিয়ে মিষ্টি-টিষ্টি খেয়ে আসুন।

—নাঃ, এর একটা বিহিত করে তবে আমি জলগ্রহণ করব। আসুক একবার শালা। খান্‌কীর বাচ্চার গলায় আঙুল দিয়ে বমি করিয়ে ছাড়ব। শয়তানের জাসু, শালা আবার মুতে রেখেছে, একবার আস্পদ্দাটা ছাখো।

—কে? কে করল বলুন তো—

—কে আবার ওই বাঞ্চোৎ জিলানীর কাজ।

—না, না, ওইটুকু ছেলের এত সাহস হবে না।—সিল্‌ভা প্রতিবাদ করল।

জিলানী সবে বছর খানেক ঢুকেছে,—সুধীরেশের হেল্‌পার হয়ে। ছেলেটি খুবই আমুদে! সকলের সঙ্গেই তার খুব সদ্ভাব। কথা বলবার আগেই হাসিতে ওর তরুণ মুখখানা ভরে ওঠে—যেন সকালের সোনালী রোদ!

সুধীরেশ ঠকাস করে খালি পাত্রটা নামিয়ে রেখে, ময়লা রুমালে, সাবান দিয়ে সগ্য পরিষ্কার করা হাত দুটো মুছতে মুছতে বল্‌ল—তা ছাড়া এ কাজ আর কেউ করতে পারে না। খালি ইয়ার্কি ফাজলামি মেরে বেড়াবে। একটা কাজ বল্‌লে দাঁত বার করে হাসবে।

—খামোশ! তা ওর এ বদ্‌বুদ্ধি কেন হবে?

রমজান কৌটোর তলার ঝোলটুকু জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে প্রশ্ন করল।

—আরে ভাই কানমলা দিয়েছি। ও শালা এতবড় শয়তান—বলে কি, কাল রাতে রাঙাপাড়ার পচুইভাঁটিতে আমাকে দেখেছে। পুঁচকে ছোঁড়ার আস্পদ্দা ছাখো!

সিল্‌ভা কপট গাম্ভীর্যভরে বল্‌ল—বেয়াদপ ত কম নয়! দেখে থাকিস চেপে যা।

সুধীরেশ উষ্মা প্রকাশ করল—থামো তুমি। আমি আর জায়গা পেলাম না—। অথচ বাঁদরটা এই বয়সে ডব্‌গা কামীনগুলোর পিছু পিছু ঘুর্‌ ঘুর্‌ করে বেড়াবে। হপ্তার শেষে কান্নাকাটি, দাদা আট আনা ধার দাও না! আমি বলি, আহা বেচারীর কেউ নেই, শেষে উপোস করে শুকিয়ে মরবে—নে, তাই নে! আজ আর কানমলা খেয়ে পয়সা চাইতে ভরসা হয় নি। খিদে

পেয়েছে, কোন্ ফাঁকে মেরে দিলে আমারই মুখের ভাত। এর ওপর—নাঃ, কুত্তার বাচ্চাকে আমি সহজে ছাড়ছি না।

—কী চার্জশীট ?

—ওসবে কিছু হবে না। মেরে পস্তা উড়িয়ে দেবো। চেনে না ত এই শম্মাকে।

রমজান ব্যস্তভাব বল্‌ল—আগে খেয়ে আসুন। এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনী—

সিল্‌ভা বল্‌ল—না, না, এরকমে বেয়াদপি বরদাস্ত করা ঠিক নয়। আমরাও আছি আপনার দিকে।

সুধীরেশ বিড়ি বার ক'রে রমজানকে একটা দিল, সিল্‌ভা সিগারেট খায়—খালাসী হ'লে হবে কি, ইংরাজের ছোঁয়া আছে ওর গায়ে, দু-দিন পরে একটা ফোরম্যান কি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে খবরদারী করবে হয়তো।

আরও যারা কাছাকাছি ছিল তারাও মজার গল্প পেয়ে এসে জুটল।

সুধীরেশ বল্‌ল—ব্যাটা সময় বুঝে কেটে পড়েছে। আরে পালিয়ে তুই থাকবি কতক্ষণ ? ভোঁ বাজলেই পোঁ-পোঁ করে গোয়ালে আসতে হবে না ! মাঝখান থেকে আজ দুপুরটা খিঁচ্‌ড়ে দিল শালা !

জিলানী ফিরল পরম গম্ভীর মুখে, হাতে তার এক ঠোঙা পুরী-ভাজি ইত্যাদি। তাকে কাছে আসতে দেখেই সুধীরেশ ক্ষেপে উঠ্‌ল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জিলানী একেবারে সুধীরেশের হাতের নাগালে এসে দাঁত বার করে হাসলো—দাদা, মাইরী বল্‌ছি, আর কখনো হবে না। এবারের মতো মাফ করো দাদা !

যা মুখে এল তাই বলে গালিগালাজ করতে লাগলো সুধীরেশ। জিলানী চুপ। মুখের তোড় একটু কমতে সে ঠোঙাটা এগিয়ে দিয়ে বল্‌ল—এটুকু সাবড়ে দাও, তাহলে তাগদ্ হবে—তখন আরাম্‌সে এই বাঁদরকে খুব প্যাঁদাও। আগে খাও দাদা ! ধন মানিক আমার—মুখখানা শুকিয়ে একটুখানি হয়ে গিয়েছে।

—যা, যা, আর সোহাগ [illegible]ড়াতে হবে না উল্লু কাঁহাকা।

—দোহাই দাদা, না খেলে আমি সুইসাইড খাবো—এরা সব সাক্ষী।

ষোলো

বৈঠকখানার চৌকিতে বসে সীতানাথ হুঁকো টান্‌ছিলেন।

অবিনাশ ঘরে ঢুকে বল্‌ল—একা-একা বসে করছেন কী?

—আর করি কি! ভাবছি—দু-দিনে কি ভাবে সব ওলট্‌-পালট হয়ে গ্যালো! সবই মায়ের ইচ্ছে, বুঝলে ভায়া!

—তা যা বলেছেন। ইয়ে, এই অবেলায় আর চা খাওয়া, ঠিক নয়—এ্যাঁ, কি বলেন আপনি?

সীতানাথ মুচ্‌কি হেসে হুঁকোর টানে লম্বা তান ছাড়তে ছাড়তে এক ফাঁকে বল্‌লেন—ভাখো ভেতরে গিয়ে সুবিধে করতে পারো কি না।

আজকাল অবিনাশ এ বাড়ির ঘর-বার একাকার করে ফেলেছে—বরং বাইরের চেয়ে ঘরের সঙ্গেই তার আত্মীয়তাটা বেশি দেখা যাচ্ছে।

সাইকেলের শব্দ পেয়েই হয়তো মুকুল বেরিয়ে এসেছে—আজ কিন্তু আপনি ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবেন না অবিনাশদা, সেই গানখানা—

সীতানাথ বল্‌লেন—তবে আর ভাবনা কি, চা চড়িয়ে দে! হ্যাঁ ভালো কথা, ভায়া তোমাদের ওই মডার্ন গানফান যেন কেমন কেমন লাগে! একখানা ভজন শোনাতে পারো?

—খুব পারি। দাঁড়ান হারমোনিয়মটা আনি আগে—

—আহা সেজন্যে তুমি কষ্ট করবে কেন? ওরে—

তারপর গলাটা চড়িয়ে সীতানাথ হাঁক দিলেন—দেবী, এ ঘরে হারমোনিয়ামটা এনে দে—।

সম্প্রতি বাইশ্র টাকা দিয়ে সীতানাথ হারমোনিয়মটি কিনেছেন। অবশ্য খোঁজ-খবর সবই অবিনাশ এনেছিল। যন্ত্রটির আসল দাম নাকি পঞ্চান্ন টাকা। নেহাত অভাবে পড়ে রামহরি টিণ্ডেল তার প্রিয় বাদ্যযন্ত্রটি বাধ্য হয়ে বিক্রী করে দিয়েছে। আরও কয়েকটা জিনিস সীতানাথকে কিনতে হয়েছে—

নেহাতই পরের উপকার করবার জন্যে। নইলে বেচারীরা উপোস করেই মরত হয়ত! একটা দেয়ালঘড়ি দশ টাকায় কিনেছেন, দুটো বড় কলসী চার টাকায়, একখানা খাট পনেরো টাকায়—। অবশ্য সস্তায়ই পেয়েছেন। তবে, না কিনলেও ত পারতেন! ওই পরোপকারটা তাহলে করা হত না, তাই কেনা!

অবিনাশের সঙ্গে সীতানাথের ঘনিষ্ঠতা খুব অল্পদিনের মধ্যেই জমে উঠেছে।

গান শুরু হ'ল—মা আমায় ঘুরাবি কতো, চোখ বাঁধা বলদের মতো—

সীতানাথ চোখ বুজে হাতজোড় করে শুনতে লাগলেন।

এক সময়ে দু-কাপ চা হাতে করে মুকুল এল—এরই মধ্যে ওর বেশবাসের বদল হয়েছে,—কপালে কালো খয়েরের ছোট একটি টিপও পরেছে মুকুল।

সীতানাথ তারিফ শুরু করলেন—আহা এইসব গান শুন্‌লে মনটা জুড়িয়ে যায়!

পরক্ষণে তিনি চায়ের কাপ মুখে তুলে বল্‌লেন—ওহো, আমাকে যে এখুনি বেরুতে হচ্ছে ভায়া, সেই ইয়ে একবার হারামী অভিজিৎ সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে—খুব জরুরী কথাবার্তা সব রয়েছে।

—তা কাজ যখন রয়েছে তখন আর কথা কী! আপনি বরং সেরে আসুন। দাদা, আমার সেই কথাটা মনে আছে?

অবিনাশ খাটো গলায় বল্‌ল।

—সেজন্যে কিচ্ছু ভেবো না ভায়া, এখন ত আমাদেরই সব দেখেশুনে গোছগাছ করে নিতে হবে। হারামী সিং-টা নিজের কোলে ঝোল টান্‌বার তালে আছে। খলিফা দালাল ওই শালাই ত ইস্‌মাইল-টিস্‌মাইলকে প্যাঁচে জড়ালো—এখন মুস্কিল, বাঙ্গালীর মধ্যে ত ইউনিটি একদম নেই, নইলে সিং ভেঙেচুরে গুঁড়ো হয়ে যেত। ওদের জাতের মধ্যে ওইটি বড় জিনিস ভায়া—এক আট্‌ঠা তো এক আট্‌ঠা! আর আমাদের দিক থেকে ঘোষাল ছেলে হিসেবে খুব চমৎকার মানুষ ছিল, কিন্তু ওর ওই একরোখা মেজাজের জন্যেই ত মোলো! আরে বাবা, এর নাম হ'ল গিয়ে চাল্‌বাজী, তা সেখানে সত্যিমিথ্যে ফারাক রাখলে চল্‌বে কি করে! কাজ হাসিল করাটাই ত আসল

কথা! তা নয় আদর্শ ফলাতে যায়—আরে এ কী সত্যযুগ! সে যাক্, তোমার কথা আমি পেড়ে রেখেচি, কিছু ভেবো না—সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

এক দমে সীতানাথ কথাগুলো বলে ফেলে একটু থমকে বসে রইলেন—অবিনাশও কোনো জবাব দিল না।

চা শেষ করেই সীতানাথ উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—দেখো ভায়া, এসব যেন তিন-কান না হয়!

—আপনি ক্ষেপেচেন দাদা, আমি অত বোকা নই।

—আচ্ছা তাহলে বসো, আমি ঘুরে আসি চট্ করে।

সীতানাথ মুখুয্যে বেরিয়ে যেতে না যেতে মুকুল এসে বৈঠকখানার রাস্তার দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বসেই অভিযোগ করল—কাল যে বড় আসা হ'ল না?

—কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম।

আসল ব্যাপারটা গোপন করে গেল অবিনাশ। হরিহর, দত্তগুপ্ত, মজুমদার আর এ. সি. দাস জোর করে অবিনাশকে তাদের আড্ডায় আট্‌কে রেখেছিল। এ সি. দাস ত স্পষ্টই শাসিয়েছে 'যদি বেশী ওস্তাদী করো তবে মানিকপুরময় কেচ্ছা চাউর করে দেবো।' নইলে সে ঠিকই আস্‌ত।

মুকুল আহত কণ্ঠে বলল—আর কাজ না থাকলেই বা কী—আমরা ত কেউ নই, যে খোঁজখবর নিতে হবে!

—বাঃ, তাই বলেছি বুঝি!

বলে অবিনাশ ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

মুকুল তার হাতখানা ধরে সজোরে ঠেলে দিল—খুব হয়েছে, থাক!

—সত্যি, বিশ্বাস করো ফেডারেশনের কাজে এমন জব্দ করে দিল যে কী বল্‌ব!

—বেশ ত আজও সেই কাজই করলে পারতে—কি জন্যে এলে?

—আঃ, আস্তে, ওরা শুনতে পাবে।

হারমোনিয়মের রীডে এক ঝলক এলেমেলো কোলাহল তুলে চাপা গলায় অবিনাশ বল্‌ল।

মুকুল অবিনাশের গা ঘেঁষে সরে বসেছে,—তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না।

অবিনাশ এবারে হারমোনিয়মের তিনটে চাবী খুলে দিয়ে একটা স্বরের ছন্দ বজায় রেখে কথা বল্‌তে লাগ্‌ল—ছাখো আমার চোখের দিকে, সত্যি তোমাকে কতোখানি খারাপ চোখে দেখি!

বল্‌তে বল্‌তে সে চোখমুখ সবটুকুই মুকুলের দিকে এগিয়ে দিল।

মুকুল কৃত্রিম কোপকটাক্ষ করে বল্‌ল—তুমি ভারি শয়তান। রোজ রোজ এই বলে আদর আদায় করে ফাঁকি দিয়ে পালাও। জানো না কী যে কষ্ট হয় তোমাকে ছেড়ে থাকতে!

অবিনাশ গলা খেলিয়ে গান ধরল—এ গান তোমার শেষ করে দাও

নূতন সুরে বাঁধো বীণাখানি—

ঝপ্‌ করে হারমোনিয়মটা ছেড়ে দিয়ে সে জোর গলায় বল্‌ল—নাও ধরো তো, কেমন শিখলে দেখি!

মুকুল ততক্ষণে অবিনাশের বাহুপাশে আটকা পড়ে চোখ বুজেছে—কাল-বৈশাখীর তপ্ত ধরণী অন্ধ ঝড়ের আভাসে যেন মেঘাচ্ছন্ন স্তব্ধ! মুকুলের বয়স পুরোপুরি বসন্ত না ছাড়ালেও চৈত্রের মতো তপ্ততায় পৌঁছেছে বৈকি!

অবিনাশের বাহুপাশে আবদ্ধ মুকুল তৃষিত চোখের দৃষ্টি দিয়ে আকণ্ঠ পান করছে, তৃপ্তি নেই—শান্তি নেই ওর দু-চোখে! অস্থির এক যন্ত্রণায় কাতর ওর দেহ-মন!

এক সময়ে ওরা দুজনেই চম্‌কে উঠ্‌ল, দেবিকার মুখখানা চকিতে বাড়ির ভেতর দিকের দরজায় উঁকি দিয়ে সরে গেল। অবিনাশ ছিট্‌কে সরে বস্‌ল—কি হবে?

মুকুলের চোখেমুখে তীব্র বিদ্বেষ ফুটে উঠ্‌ল—কি আবার হবে, দেখ্‌ল ত বয়েই গ্যালো! কারুর পরোয়া করি না। আর তা ছাড়া আমি ত আর কারুর সঙ্গে বেরিয়ে যাইনি—তুমি যখন বিয়েই করবে তখন অতো কিসের!

অবিনাশ আবার হারমোনিয়মে স্বরের রেশ টানবার চেষ্টা করে। কোনো কথা তার মুখে জোগায় না—সে বিপন্ন বিব্রত হয়ে পড়েছে।

পরক্ষণে সে ডাক্‌ল দেবিকাকে—কই দেবীদিদি আমাকে পান দিলে না ত!

—এই সেজে নিয়ে যাচ্ছি।

দেবিকা সাড়া দিল।

মিনিট দুয়েক পরে দেবিকা এল, ওর চোখেমুখে অস্বস্তি গোপনের চেষ্টাটুকু স্পষ্টই ফুটে উঠেছে। কোনোরকমে চীনেমাটির পিরিচটা চৌকির ওপর রেখেই মুখ নামিয়ে চলে যাচ্ছিল দেবিকা—অবিনাশ খপ্‌ করে ওর হাতখানা ধরে পাশে টেনে নিয়ে বলল—তুমি খুব ফাঁকিবাজ হচ্ছ আজকাল, গান শিখতে চাও না মোটে—ক্যানো, এ্যাঁ!

দেবিকা সপ্রতিভভাবে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে জবাব দিল—পড়াশুনো করে সময় হয় না! দিদিই ত শিখছে, ওর কাছ থেকে শিখতে পারব। বলেই দেবিকা বেরিয়ে গেল।

অবিনাশ মুকুলের দিকে ফিরে বল্‌লে—নাও ধরো এবার গানটা—

গম্ভীর ভাবে মুকুল বল্‌ল—এরকম বেয়াদপী কিন্তু আমি সইতে পারব না—।

—বেয়াদপীটা কি দেখলে শুনি!

—গাছের খাবে, তলারও কুড়োবে, এ মতলব চলবে না বুঝলে?

—আরে না না, একটু তোয়াজ করে ওকে সাম্‌লাতে চাইলাম আর কি!

—হুঁ!

ছোট ওই একটি 'হুঁ'-র মধ্যে মুকুলের মনের অনেক অব্যক্ত কথা থম্‌কে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে কথাগুলো তেইশ বছরের ঠোঁটের ডগায় দমিত হয়ে পড়ল, তার প্রত্যেকটিই তিক্ত। মুকুল যে অবিনাশের মনকে দিবারাত্রির অবসরে তন্নতন্ন করে দেখে বুঝে বসে আছে, একথা কি অবিনাশ জানে? অবিনাশ যে মুকুলকে সত্যিই ভালবাসে না, কেবলমাত্র দুর্বলতাকে একটু প্রশ্রয় দিয়ে কিছু দৈহিক লাভ আদায় করে, অবিনাশের আশা দেবিকার ললিত-উন্মেষের দিকে আকুল হয়ে ধেয়ে চলেছে—এ সবই যেন মুকুলের জানা হয়ে গেছে! তাই মুকুল অবিনাশের মুখোশটা খুলে দিতে উদ্যত হয়ে ছিল।

কিন্তু পারল না। অবিনাশের মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হ'ল—আহা, বেচারী কতো যত্নে একটা বাসনাকে গোপনে রেখেছে। কী ভীরু ওর মনের হরিণটা! ওকে আঘাত দিতে মুকুলের মন সরে না!

না, মুকুল আরও বেশী বুঝেছে। নিজেকেও দেখতে পেয়েছে ও। যদি দেবিকার কথা তুলে আঘাত দিলে মুকুলের কাছ থেকে অবিনাশ নিজেকে সরিয়ে নেয়, তাহলেই বা কি লাভ! মুকুলের আশা-ভরসা সবই তো ঝরে যাবে—সে দিন ত দূরে নেই, এখনই ফসল সঞ্চার করে নিতে হবে! নিখুঁত হিসেবী ওর মন।

অতএব মনের গহ্বরে যা আছে, তাকে টেনে এনে জীবনের বিড়ম্বনা আর বাড়িয়ে কাজ কি? মুকুল শুধু বুদ্ধিমতীই নয়, ওর হিসেবী নজরের খতিয়ানে আশা, স্বপ্নের সার্থকতাকে অগ্রাহ্য করে নিছক নগদ বাস্তবের মূল্য দিনদিনই বেড়ে চলেছে।

আর অবিনাশ মুকুলের সামনে বসলে জলের তলায় যেন হালের গভীরতার দিশে খুঁজে পায় না। সে মুকুলকে যতখানি ভালবাসে, তার চেয়ে ঢের বেশী ভয় করে। অবশ্য অবিনাশের ভালবাসার রূপটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—সে যখন যাকে ভালবাসে তখনই তাকে ভালোবাসে, ভবিষ্যতের দায়-দায়িত্বের মামলা তার আদালতে ঠাঁই পায় না।

এতদিন এই নিয়মটাই বহাল ছিল। কিন্তু ইদানীং তার মনেও সমস্যার ধোঁয়া জমেছে—মুকুলকে কিছুতেই সে স্বীকার করে নিতে পারছে না, অথচ এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে গেলে মুকুলের প্রাধান্য অগ্রাহ্য করা ত অসম্ভব। এতদিনে খেলা-খেলার পালা মিটিয়ে দিয়ে দেবিকার হাতে নিজেকে সঁপে দিতে অবিনাশ উন্মুখ। অথচ, মুকুল তা হ'তে দেবে না। মুকুলের দাবিকে উড়িয়ে দেবার পথ ত অবিনাশ খোলা রাখে নি! দীর্ঘশ্বাসটা অতি যত্নে চাপল অবিনাশ।

দেবিকা চলে যাবার পর অবিনাশ যন্ত্রচালিতের মতো হারমোনিয়মের রীডের ওপর আঙুল খেলালো অনেকক্ষণ। হয়তো আরও কিছুক্ষণ সে এই ভাবেই মুখ বুজে থাকত কিন্তু মুকুল কোনো মুহূর্তকে ব্যর্থ হতে দিতে নারাজ।

মুকুল অবিনাশের গালের ওপর নিজের আবেগ-শিহরিত বাসনা-তপ্ত ওষ্ঠ সবলে চেপে ধরল।

অবিনাশ আপত্তি করল না, শুধু বল্‌ল—কেউ দেখতে পেলে আমাকে পৌঁদিয়ে দেবে—

মুকুলের বোধহয় সাধারণ শোভনতার সঙ্কোচটুকু ক্ষুধার তীব্র বেদনার তলে তলিয়ে গেছে, নইলে ও কি করে বল্‌তে পারল—ইস্ সকলের সামনে আমি তোমার গলা জড়িযে ধরব, বল্‌ব সব দোষ আমার।

সেই দৃশ্যের ছবিটুকু মনে মনে কল্পনা করে অবিনাশ মুকুলের বাহুপাশে আবদ্ধ থেকেও শিউরে উঠ্‌ল। সত্যি তেমন কিছু হ'লে মুকুলের হাত থেকে সে কোনো কালেই মুক্তি পাবে না!

অবিনাশ নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বল্‌ল—গানটান সব মাথায় উঠ্‌ল যে!

—গান আমার ভাল লাগে না—তুমি গল্প করো!

—একটু অন্ততঃ শেখো, এতক্ষণ ধরে কি করলে, কি কৈফিয়ত দেবে শুনি?

মুকুলের দু-চোখ যেন কামনার দুটি জলপ্রপাত! ও আবার অবিনাশকে দু-বাহুর বেষ্টনে জড়িয়ে ধরে বলে—তুমি, তুমি, তুমি! কৈফিয়ৎ আবার কী—তুমি! দ্যাখো বিয়ের পর কিন্তু তোমার মামার বাড়িতে যাবো না—বাবাকে দিয়ে চেষ্টা করলেই একটা ডবল ইউনিট কোয়াটার আমরা পাবো—

—ইস্, কোয়াটার যেন গড়াগড়ি যাচ্ছে!

—না হোক, নিদেন একখানা ঘরের কোয়াটার ত পাওয়া যাবেই! আর আমাদের বেশিই বা কি দরকার—দু-খানা ঘর নিয়ে কীই বা লাভ? দুটো ত প্রাণী, আর বড় জোর একটি দুটি ছেলেমেয়ে—

অবিনাশ সিগারেট ধরিয়ে বল্‌ল—তুমি এখন বসে বসে এইসব স্বপ্ন দ্যাখো, আমি উঠ্‌লাম।

সত্যিই সে উঠে দাঁড়ালো।

এবার মুকুল দাঁড়িয়ে তার পথ রোধ করল—তারপর চপলা কিশোরীর মত দুটি হাতের পাতা ঘন ঘন বাতাসে ছুঁড়ে ছুঁড়ে নাকী সুরে বলতে লাগ্‌ল—হুঁ-হুঁ-হুঁ, না-নাঁ-না, বস-অ-ও!

অবিনাশ কিন্তু চট্ করে মুকুলের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বাড়ির ভেতর দিকে পা বাড়ালো। মুকুল পিছন থেকে তাকে আঁক্ড়ে ধরল—না, না, না!

ঠিক এই সময়ে বৈঠকখানার জানালায় আর একখানি মুখ ভেসে উঠ্ল। অবিনাশ বা মুকুল কেউ সেই মুখখানির আবির্ভাব টের পায় নি, ওদের দু'জনেরই মুখ বাড়ির ভেতর দিকে।

নবাগত ব্যক্তির মুখে প্রসন্ন হাসি খেলে গেল! ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, মাথা জোড়া প্রকাণ্ড টাক, হাতে একটা লাঠি, দেখলেই বোঝা যায় মানুষটি সাদাসিধে এবং মিঠে মেজাজের।

মানিকপুরের সবাই এই দীননাথ সান্যাল মশাইকে ভালবাসে,—সীতানাথ মুখুয্যের বাল্যবন্ধু। যদিও পদ-মর্যাদায় সান্যাল অনেক উঁচু কেতার মানুষ, তাতে করে সীতানাথের সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্বে কোনো চিড় খায় নি। সান্যাল মশাই মাঝে মাঝে সীতানাথের বাড়ি আসেন। পথ থেকে ঢালু মাটিতে নেমেই হাঁক দিতেন—'সীতানাথ আছো-ও?' কিন্তু আজ বৈঠকখানায় আলো জ্বলতে দেখে আর চেঁচামেচি করেন নি।

নিরঞ্জন ঘোষালের আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি মনমরা হয়ে রয়েছেন, হৈ-চৈ আর ভালও লাগ্ছে না। নিরঞ্জনকে হাতে কলমে শিখিয়ে সান্যাল মশাই মানুষ করে তুলেছিলেন, নিজের ছেলের মতই ভালোবেসেছেন নিরঞ্জনকে।

জানালার সাম্না-সাম্নি এসে এমন দৃশ্য দেখে সান্যাল প্রথম হকচকিয়ে গেলেন, কী এক বেদনাকরুণ সহানুভূতিতে তাঁর মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্ল। মুখ বুজেই রইলেন তিনি।

অবিনাশ ভিতরে চলে গেল, মুকুলও অগত্যা তাকে অনুসরণ করল। তারপর দীনদয়াল সান্যাল জোর গলায় হাঁক দিলেন—সীতানাথ আছ না কি?

মল্লিকা সাড়া দিল—যাই কাকাবাবু! যাই—

একই সঙ্গে দেবিকা আর মল্লিকা বৈঠকখানার দরজা খুলে তাঁকে স-কলরবে অভ্যর্থনা করল—আসুন। আসুন।

—তোর বাবা বাড়ি নেই?

—বাবা একটু বেরিয়েছেন—এখুনি ফিরবেন। ভেতরে আসুন।

—এখন থাক, না হয় পথে আবার খোঁজ নেবো। চলি রে!

—না, না, সে হবে না। আপনি আর আসেনই না আজকাল—বসুন, একটু চা খান—

—বসছি। কিন্তু চা ত চল্‌বে না মা।

দেবিকা একথায় খিল্‌-খিল্‌ করে হেসে উঠ্‌ল—আপনি না বল্‌তেন মাকে যে, বৌঠান মেয়েটাকে দুধ দিয়ো না তার বদলে চা দাও, পুষ্টি হবে! আর আজ সেই আপনারই মুখে—

—আর বলিস নে মা, দিনকাল সবই বদ্‌লে যাচ্ছে। তোর খুড়ীমা হাতে-পায়ে ধরেও চা বন্ধ করতে পারত না। আর আজ—ডাক্তারে মাথার দিব্যি দিয়েছে—চা আর চল্‌বে না! তোদের কাকীমা বেঁচে থাকলে নয় তার ওপর ছেলেমেয়ের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সুখে চা খেয়ে মরতে পারতাম, এখন উল্টে মরবার ভাবনায় ভয় হয় রে! ওই বাঁদরবাচ্ছাগুলোর জ্বালায় আমাকে সব ছাড়তে হ'ল। ভদ্রমহিলা মরেছেন না আমায় মেরেছেন!

বল্‌তে বল্‌তে দীনদয়াল হাসলেন, কিন্তু তাঁর এ হাসিতে দোসর কেউ হ'ল না।

দেবিকা বল্‌ল—চলুন বস্‌বেন। মা আজও আপনার কথা বল্‌ছিলেন—

—কি বল্‌ছিলেন বৌঠান, হ্যাঁ রে—

মল্লিকা বল্‌ল—আপনার নিন্দে করছিলেন—একদম আর আসেন না।

—ত্যাখ আমার কাছে মিথ্যে বলিস নে, আমি কিন্তু সব টের পাই, বৌঠান বল্‌ছিলেন কী জানিস? এমন লক্ষ্মণের মত দেবর আর হয় না।—কিন্তু সে হতভাগা সীতেনাথটা গ্যালো কোথায়?

ভেতরের ঘরে অবিনাশকে দেখে দীনদয়াল অম্লান বদনে বল্‌লেন—এই যে অবিনাশ, ভালো আছো বাবাজী!

—এই, চলে যাচ্ছে কোনোরকমে। আপনি স্যার?

—আমাদের থাকা না থাকার আর মূল্য কী? তা শুন্‌ছি তোমার বেশ পদোন্নতি হয়েছে, সুসংবাদ বই কি—বেশ, বেশ!

—সবই আপনাদের আশীর্বাদ।

—আমাদের আশীর্বাদে উন্নতি হয় না বাবাজী, বরং পদচ্যুতি হতে পারে। ভুলেও আমাদের আশীর্বাদের কথা বলো না। এই ছাখো না নিরঞ্জনটা পারল না আমার আশীর্বাদের ঠ্যালা সাম্‌লাতে—! হুঁ, পালালো। ওসব কিছু নয়।

বলে দীনদয়াল দেবিকার দিকে তাকিয়ে হাসলেন—কিরে পাগ্‌লী, তুই কি বলিস, আমার আশীর্বাদ সইতে না পেরে তোর কাকীমাও ত আগেই কেটে পড়ল—এঁ্যা!

পরক্ষণে মুকুলের দিকে তাঁর নজর পড়ল—তারপর মুকুমা, তোমার মুখ এমন ভার-ভার কেন? কি হয়েছে তোমার, মা লক্ষ্মী!

মুকুল মাথা হেঁট করে কাপড়ের আঁচল আঙুলে জড়াতে জড়াতে বল্‌ল—কই, কি আবার হবে?

—বুঝেছি, দাদার জন্যে মন কেমন করছে, না রে মুকুল?

দীনদয়ালের এই একটি সরল কথায় মুকুল চম্‌কে উঠ্‌ল। কথা না কশাঘাত! সহসা মুকুলের দুচোখ বেয়ে শ্রাবণের ধারা নাম্‌তে চায়। দাদা, দেবজ্যোতি! সত্যি দাদার কথা কেন মনে হয় নি ওর? এমন নিশ্চিহ্ন করে দাদাকে মন থেকে মুছে ফেলেছিল কি করে মুকুল? নিজের এই পরিবর্তনে মুকুলের মন আত্মধিক্কারে ভরে ওঠে। একবার অবিনাশের দিকে তাকিয়ে মুকুল দাদার মুখখানা মনের মধ্যে খুঁজতে থাকে—কোথায় গেল সেই স্নেহবলিষ্ঠ মুখখানা?

দীনদয়াল এই বয়সেও অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশ ছট্‌ফটে মানুষ। তিনি দু-দণ্ড চুপ করে বস্‌তে পারেন না।

—তারপর বৌঠান কোথায় গেলেন?

সাড়া এল রান্নাঘর থেকে—এই যাই ঠাকুরপো, আপনার জন্যে একটু হালুয়া করছি ভাই!

—আচ্ছা, আমি যতো লক্ষ্মণ হতে চাই, আপনি ততোই হনুমান বানাতে চান কেন, বলুন তো? এখন আমি কিচ্ছু খাবো না।

—তা কি হয়?

বল্‌তে বল্‌তেই দেবজ্যোতির মা এ ঘরে ঢুকলেন।

অবিনাশ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল! সে উঠে পড়ল—আমি চলি, একটা কাজ রয়েছে!

দীনদয়াল হেসে উঠ্‌লেন, তাঁর প্রাণখোলা হাসির উল্লাসে ঘরখানা ভরে উঠ্‌ল—বসো বসো, আমিও এখুনি চলে যাবো। আবার কাজ বেড়ে গ্যালো, সবাই ত মানিকপুরে ফিরতে শুরু করেছে, ত্থাখাশুনো খোঁজখবর সেরে নেওয়া দরকার। বেশ ছিল সব দেশে ঘরে!

অবিনাশ একটু থতমত খেয়ে বল্‌ল—না-না আপনি বসুন না, কতদিন পরে এসেছেন—!

অবিনাশ আর মুকুল প্রায় একসঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দীনদয়াল হালুয়ার প্লেটখানা নিমেষে শূন্য করে ফেলে বল্‌লেন—ডাক্তারে অবিশ্যি এসব খেতে মানা করে দিয়েছে। কিন্তু বৌদির অপমান করা আমার কম্মো নয়, না হয় ডায়াবিটিস্‌টা একটু চাগাড় দেবে, তা দিক্‌। চা কিন্তু খাবো না বৌঠান। হ্যাঁ ভালো কথা, সীতেনাথকে একবার পাঠিয়ে দেবেন তো, কথা আছে ওর সঙ্গে—অবিশ্যি অবসর যদি পায়, আজকাল ত খুব কাজের লোক হয়ে পড়েছে!

দেবিকা কলকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—কই আমাদের ত যেতে বল্‌ছেন না কাকাবাবু!

—তুই বুঝি বড়লোকের বেটী হয়েছিস, না নেমন্তন্ন করলে ভাইবোনদের চোখের ত্থাখাও দেখ্‌তে যাবি নে, এ্যাঁ?

মল্লিকা সাগ্রহে কথার পিঠে কথা চাপিয়ে দিল—আর সবাই বড়লোক হতে পারে কাকাবাবু, আমি ত হইনি, সেদিনও গিয়েছিলাম ত!

দেবিকা একটু হেসে বল্‌ল—আহা তুমি ত আরতিদের বাড়ি যাও, পথে পড়ত তাই যেতে। কিন্তু ওরা যেই মামাবাড়ি চলে গেল, অমনি তোমার টান শেষ!

দীনদয়াল মিষ্ট হাসিতে পরিবেশটা লঘু করে দিলেন—হয়েছে-হয়েছে, কাকাবাবুকে তোরা সবাই খুব ভালোবাসিস্‌। আমি আজই গিয়ে মাতৃপুজোর

তোড়জোর করছি—সাম্‌নের রবিবার তোরা তিনজনে গিয়ে মিণ্টু, বাদল, দীপুর সঙ্গে রান্নায় হাত লাগিয়ে দে, আমি মহা আনন্দে খাওয়া-দাওয়া করি। সেই বেশ হবে। তাহলে সেই কথাই রইল, বুঝলি!

দীনদয়াল যেন এক ঝলক হাল্কা হাওয়া ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন। এ বাড়ির ঝিম্‌-ঝিমে ভাবটা কেটে গেল এই কয়েক মিনিটে।

দেবিকা পুরনো তাসের প্যাকেটটা বার করে সোৎসাহে বল্‌ল—উঃ, কতকাল তাস খেলা হয় নি যে!

ওরা সবাই তাস খেল্‌তে বস্‌ল।

মুকুলও বসেছিল, কিন্তু ও যেন ঠিক আগের মতো হৈ-চৈ করছে না! ওর জুটী দেবিকা ভুল করলেও মুকুল চটাচটি করে তাস ছুঁড়ে ফেল্‌ছে না—মুকুলের এই শান্ত মৌন আচরণটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে!

সতেরো

সীতানাথ বাড়ি ফিরলেন খুব হাসিখুশি মুখে। বল্লেন—অবিনাশ হতভাগা এর মধ্যে চলে গ্যালো! জানিস্ মুকুমা, ওর কোয়াটারের ব্যবস্থা করে এলাম। খাশা কোয়াটার! ওই রাধেশ্যামপাড়াতে যে নতুন ব্লক উঠ্ছে সেখানে, একদম নতুন ইউনিট। বিল্কুল নয়া ডিজাইন। বিস্তর লড়াই করতে হয়েছে এজন্যে। ওর চেয়ে সিনিয়র পঞ্চাশ-ষাটটা লোকের নাকের ডগা দিয়ে টপকে কোয়াটার আদায় করা এক এই শম্মাকে দিয়েই হয়!

মুকুল একথায় রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়ল—তাই নাকি? সে বাড়িতে ত ইলেকট্রিক, জল, সবই রয়েছে না বাবা! তবে এখান থেকে বেশ দূর হবে।

সীতানাথ বল্লেন—আগে বিয়েটা হোক, তারপর প্রোমোশনেরও হিল্লে করে দেবো। দ্যাখ না তোকে আমি রাজরাণী করে দেবো রে!

দেবজ্যোতির মা এঘরে ঢুকেই বল্লেন—দীনু ঠাকুরপো এসেছিলেন।

—তা ত আসবেই। এখন যে চাকরীতে টান পড়েছে, না এসে যাবে কোথায়?

—সে কি গো? কই কথাবার্তায় ত তেমন কিছু মনে হ'ল না। বেশ ত হাসিখুশি গালগল্প!

মুকুল মায়ের কথা শেষ না হইতেই বল্‌ল—রবিবার আমাদের সবাইকে নেমন্তন্নও করে গেলেন।

সীতানাথ বিজ্ঞভাবে ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন—ওরে বাবা, সেয়ান ঠক্‌লে বাপকে লুকোয়। দীনদয়াল সাণ্ডেলকে ত আর নতুন দেখ্‌চি নে! জাত বারিন্দর! স্বার্থ ছাড়া সে একপাও নড়ে না। নইলে হঠাৎ আজ খোঁজ নিতে আসার গরজ কেন হ'ল, শুনি! তা নেমন্তন্নই করুক আর যাই বলুক, ওর চাকরী শিবের বাবা এসেও রক্ষে করতে পারবে না, এই বলে দিচ্ছি।

দেবজ্যোতির মা বিষণ্ণ মুখে বল্‌লেন—সে কী গো, বুড়ো বয়সে বেচারী এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে শুকিয়ে মরবে, হ্যাঁ গো? আর যা তা চাকরী ত নয়—মোটা মাইনে! মাস গেলে অতগুলো টাকা আসবে কোথা থেকে?

সীতানাথ নির্লিপ্তভাবে জবাব দিলেন—সেটা আগে ভাবা উচিত ছিল। ওর মতো একটা অফিসার, যার ঘাড়ে ইলেক্‌ট্রিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের গোটা দায়িত্ব, সে যদি লেবারদের পক্ষ নিয়ে কোম্পানীর সঙ্গে আক্‌চা-আক্‌চি করে, লেবারকে ক্ষেপিয়ে বেড়ায়, তবে কেন কোম্পানী ওকে রাখবে? ও ত কোম্পানীর শত্রুতা করেছে ধর্মঘটের সময়!

মুকুল মূঢ়ের মত প্রশ্ন করল—উনি আবার কি করলেন বাবা!

উত্তেজিত সীতানাথ মুকুলের মুখের সাম্‌নে হাত নেড়ে বল্‌লেন—করতে কি বাকী রেখেছেন শুনি! বার বার কোম্পানী লোক পাঠিয়ে জরুরী কাজের জন্যে ডেকেছে, উনি যান নি! কি না, শরীর খারাপ! ওদিকে নিরঞ্জন ঘোষালকে কূটবুদ্ধি জুগিয়ে জুগিয়ে স্ট্রাইকটা ত উনিই এতদিন পর্যন্ত টেনে এনেছেন। আরে বাবা, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায়? এখন বোঝো ঠ্যালা—।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দেবজ্যোতির মা বল্‌লেন—তোমাদের লেবার আর কোম্পানীর ঝগড়ার মাঝে পড়ে অমন একটা ভালো মানুষের এমন দুর্গতি যে কেন হবে, তা বুঝতে পারছি না। কোম্পানীর পুরনো চাক্‌রে, আর মানুষটাও ত ভালো—।

সীতানাথ গজরাতে লাগলেন—সবাই ভালো তোমাদের কাছে, আমিই কেবল বদ্‌লোক, হয়েছে ত? দীনু সাণ্ডেল কেন, অমন অনেক ভালো মানুষের অন্ন উঠ্‌বে মানিকপুর থেকে, বুঝলে? কোম্পানী ত এখানে দানছত্তর খুলে বসে নি, এটা ওদের ব্যবসা! লাভ-লোকসানটা ত দেখতে হবে তাকে, না কী! ভালো-মন্দর হিসেব কষছেন সেই অন্তর্যামী, তাঁর কাছে কোনো গোঁজামিল নেই—হ্যাঁঃ!

—কি জানি, দিনে দিনে মানিকপুরের যে কী দশা হচ্ছে বুঝি নে! আমরা মেয়েমানুষ, ওসবে মাথা গলাতে গেলেই বা পারব কি করে? যাক দীনু ঠাকুরপো একবার তোমাকে যেতে বলেছেন, যেয়ো—কেমন?

—সময় কোথায়? এই সামনের হপ্তাতে কোয়ার্টার বদলি করতে হবে। ওদিকে মল্লিকসাহেবের ওখানে যেদিন না যাবো, সেদিনেই সব ওলট-পালট হয়ে যাবে, সে খবর রাখো? ওখানে এখন শকুনের ঝাঁক হাঁ করে বসে আছে দিন-রাত। চোখের আড়াল হ'লেই সব বান্‌চাল!

মুকুল কুণ্ঠিতভাবে স্মরণ করিয়ে দিল—তোমার টাইফয়েডের সময় কাকাবাবু কি সেবাই করেছেন বাবা! তা একবারটি অবসর করে যদি ওঁর এই বিপদের সময় যেতে ত ভালো হ'ত।

—থাম্‌, তোকে আর নীতিশিক্ষে দিতে হবে না। বুড়ো বাপের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ফের যদি টিকির-টিকির করবি ত এক চড়ে বদন বদলে দেবো!

দেবজ্যোতির মা সহসা স্বামীর সম্মুখে এগিয়ে এলেন—মুকু ঠিক কথাই বলেছে। তোমার যাওয়া উচিত।

এ ভাবে স্বামীর মুখের ওপর কথা বলা মুকুলের মায়ের অভ্যাস নয়। বলে ফেলেই তিনি ভীত হলেন। আর বড় মেয়ের দিকে তাকিয়ে সমর্থনের ভরসা খুঁজতে লাগলেন!

অসহায়ভাবে সীতানাথ বল্‌লেন—যাওয়া যে উচিত, সে কি শুধু তোমরাই বোঝো? আমিও মনে মনে একশ' বার মানি। কিন্তু ওর বাড়ি গেলেই সব শালা দালাল গিয়ে মল্লিকের কাছে চুকলি খাবে। তখন যে সব মাটি!

—কেন, এর মধ্যে লাগানো-ভাঙানোর কি আছে? তোমার বন্ধুর বাড়ি তুমি যাবে, তাতে কার কি বলবার থাকতে পারে?

দেবজ্যোতির মা বল্‌লেন বিস্মিতভাবে।

সীতানাথ পায়চারী করতে করতে বকে চলেছেন—তোমাদের জন্যেই আমার সব ডুববে। এ বাড়িতে দীনদয়ালকে কেন ঢুকতে দিলে? সে একটা দাগী, বদমায়েস। না, না, তা নয়, তবে একটা মাথামোটা গবেট!

—কি যা-তা বল্‌ছ বাবা!

মুকুল চীৎকার করে উঠ্‌ল।

সীতানাথ থমকে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে মেয়েকে দেখ্লেন, তারপর বল্লেন—দূর হয়ে যা আমার সাম্নে থেকে। যা-যা ধিঙ্গী! দীনদয়ালের হয়ে মায়ে-ঝিয়ে ওকালতী করতে আসিস এত বড় আস্পদ্দা!

মল্লিকা আর দেবিকা এসে দাঁড়িয়েছে সীতানাথের চেঁচামেচি শুনে!

সীতানাথ থামলেন না—দীনু সাণ্ডেল হচ্ছে গুণ্ডাদের পাণ্ডা, ওই ঘোষালের বিধবা বৌ আর ছেলেকে আবার এনে নিজের কোয়াটারে ঢুকিয়েছে, সাহসটা একবার গ্যাখো! নিজের পায়ে কুড়ুল মারা আর কাকে বলে!

মুকুল বল্ল—ঘোষালের বৌ ত ওঁর মেয়ের মতো। এতবড় একটা শোক-সঙ্কটের সময়ে উনি না থাকলে বেচারীর কি অবস্থা হ'ত! কোম্পানী ত কোয়াটার কেড়ে নিল, ওই বা দাঁড়ায় কোথায়?

—তা বলে নিজের কোয়াটারে নিয়ে যেতে হবে? ঘোষাল যে কোম্পানীর কত বড় শত্রু, এ কথা কে না জানে? তার মড়া লাশটা পর্যন্ত লোপাট হয়ে গেল, কেন? একবার সেকথাটা দীনুর ত ভাবা উচিত ছিল! যাক গে বাপু, যে যা ভালো বুঝবে করবে, আমাদের তাতে মাথা গলাবার কি দরকার?

তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে তিনি শাসনের ভঙ্গীতে বল্লেন—আমার বাড়ির একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত সাণ্ডেলের বাড়ির ছায়া মাড়াবে না, এই আমার কথা, বুঝলে?

মা, মেয়েরা মুখ বুজে এই নিষ্ঠুর আদেশ শুন্ল, কোনো জবাব কেউ দিতে পারল না।

আঠারো

বিকেল চারটের অনেক আগে থেকেই আজ কারখানার গেটের বাইরে কাবুলীওয়ালাদের ভিড় জমেছে। শুধু আফগানীরাই যে ভিড় করেছে তা নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধির সমাবেশ এখানে হয়েছে। এরা সবাই মহাজন। ছুটির জন্য অপেক্ষা করছে এরা সবাই। খাতকেরা কারখানার মধ্যে মজুত রয়েছে। কারখানা চালু হবার পর আজ এই প্রথম গেটের সামনে ধরবার জন্য এসেছে। কারণটা খুবই স্পষ্ট। পে ডে। নগদ টাকা হাতে থাকতে হপ্তার কিস্তী আদায় করতে না পারলে আর পরে পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে ধর্মঘটের সময় সবাই বিস্তর দেনা করেছে। অনেক মহাজনেরই যা পুঁজি ছিল তা প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গেছে। জলের দামে আসবাবপত্র কেনাতেও তাদের প্রচুর টাকা আটকে পড়েছে। অবশ্য সেটার জন্যে ভাবনা কিছু নেই, কারণ এসব আসবাব-তৈজস একটিও পড়ে থাকবে না। মাস ছয়েকের মধ্যে মোটা দামে বিক্রী হয়ে, লাভের অঙ্ক ফাঁপিয়ে তুলবে। কিন্তু নগদ টাকায় টান পড়েছে।

অন্য সময়ে মহাজনেরা স্থদটুকু আদায় করতে পারলেই খুশি থাকে। আসল টাকাটা কেউ শোধ করতে চাইলে বলে—আহা অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তোমার অস্থবিধে করে আমাকে টাকা দেবার দরকার নেই। কিন্তু এখন অবস্থাটা একটু অন্যরকম দাঁড়িয়েছে। মহাজনেরা আশঙ্কা করছে, শ্রমিকদের ঋণভারটা হয়ত শোধ দেবার সাধ্যের বাইরে চলে গেছে! যারা মাসে দশটাকা ধার করত তারা প্রত্যেকেই পঞ্চাশ-ষাট ত নিয়েছেই, অনেকে আবার শতাবধি পর্যন্ত নিয়ে বসে আছে। এরা কেউ সপ্তাহে পাঁচ টাকার বেশি শোধ করতে পারবে না। এখানে স্থদের হারও চড়া, টাকায় একআনা মাসে—আবার মাস পেরুলে প্রতিমাসে স্থদের টাকার ওপরেও একআনা হারে স্থদ ধরা হয়ে থাকে।

চারটের বাঁশী বাজতেই যে যার নজর শানিয়ে গেটের ভেতর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গেল।

—এ তেওয়ারীজি নমস্তে!

—আর ভাই রামভরোসা, খবর আচ্ছা ত?

—এই যে ঘোষবাবু কেমন আছেন?

—ও মশাই শুনছেন? আরে এদিকে, হে গোবিন্ চৌধুরী মশায়!

—আপনার হচ্ছে পঞ্চাশে তিন রুপেয়া দু আনা, আর তিন রুপেয়ার তিন আনা, বাকী দু আনার সুদ ছেড়ে দিচ্ছি। হাঁ-হাঁ ভাওটি দেবো বই কি—এক মিনিট সবুর দাদা। ওদিকে তিন নম্বর ফানিশের কালো মিঞা পালাচ্ছে, হারামী দেড়শ টাকা গজবের তালে আছে। আপনি দোয়া করে একপাশে দাঁড়ান দাদা—ওই ভাগ নেবালা শালা হারামীকে পাকড়াও করি আগে।

বল্‌তে বল্‌তে আগা সাহেব দৌড়ালো ভিড় ঠেলে।

গোবিন্দ চৌধুরী চুপ করে দাঁড়িয়ে আশপাশের গতিবিধি লক্ষ্য করে। মুদিখানার মালিক লালা হরবন্‌শ নিজেই আজ এখানে হাজির হয়েছে, ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করছে। হরদম টাকা আদায় করছে মহাজনেরা।

আগা সাহেব হাসিমুখে ফিরে এল—কই গোবিন বাবু, দেন আপনার টাকা। আমাদের কারবারে দাদা খালি ঝামেলা। টাকা লিবার সময় সব্বাই ভারি মিঠা বুলি আওড়ায়। আর এই দেখুন ব্যাটা কালো মিয়ার আক্কেল, দিল ত দশ রুপেয়া—না দেবার মতলবই আঠারো আনা ছিল। তার জরুর বেমার, বাচ্ছাটা মরেছে, আরও হরকিসমের বাহানা শুনিয়ে ছাড়ল।

হঠাৎ সে শিকারীর মত নজর চালিয়ে হাঁক মারলো—এই এই ধরমপতি—ধরমপতি জী! ইধর ত আও মেহেরবান—

ধরমপতি বুড়ো মানুষ। আস্তে আস্তে এগিয়ে এল—আগা সাব!

—হ্যাঁ। নমস্কার তো বহুত লম্বা। লেকিন্—আজ কুছু মিলি ত?

—আরে ভাই একদম গাড্ডা মে গীরি হুঁ!

তারপর ধরমপতি দশমিনিট ধরে যা বল্‌ল তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, এ সপ্তাহে সে কিছুই দিতে পারবে না। দেশে গিয়ে অনেক খরচপত্র হয়েছে; আর, এর ওপর মেয়ের বিয়ে লাগছে—সেজন্য শ খানেক টাকা দরকার। আগা সাহেব যদি অনুগ্রহ করে আরও একশ টাকা ধার দেয় ত বড় উপকার করা হবে।

তার জবাবে আগা সাহেব যে সব কথা বল্‌ল তা কোনো ভদ্র অভিধানে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এখানেই যদি ব্যাপারটা থাম্‌তো তবে ছিল ভালো, আগা করল কি, চট্ করে ধরমপতির কাছা ধরে টান মেরে খুলে ফেল্‌ল এবং কাছাতে গেরো বাঁধা টাকা থেকে দশটি টাকা বার করে নিয়ে বাকী চারটাকা সাতআনা পয়সা ধরমপতির হাতে ফেরৎ দিয়ে বল্‌ল—যাঃ বুড্ডয়া, সরাব পিয়ো—

বৃদ্ধ হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল—আগা মুরসেদ, তুমি আমার নাতির সামিল, তুমি এমন কাজ কর না দোহাই! বুড়ো বয়েসে শেষে বাচ্ছা-কাচ্ছা নিয়ে শুকিয়ে মরতে হবে ভাই! আর নয় টাকা ধার না-ই দিলে—দয়া করে এ হপ্তার এই কিস্তীটা ছেড়ে দাও দাদা। চার টাকা সাত আনা দিয়ে দু'রোজের বেশি চল্‌বে না ভাই, ঘরে বেমার আছে। হে মুরসেদ, তুহার গোড় লাগি—! দে দে বেটা, মেরা বাপ্‌!

আগা মুরসেদ তখন অন্য শিকারের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এসব নরম করুণ কথায় কান দিলে তার চলে না।

একপাশে দাঁড়িয়ে বুড়ো ধরমপতি চোখের জল মুছচে ময়লা জামার ছেঁড়া আস্তিন দিয়ে—আর বারবার ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে চোখ দুটো অশ্রুধারাতে।

লালা হরবন্‌শা অদূরে থেকে সবই দেখেছে। সে দু একবার বল্‌লও মুরসেদকে—আরে ভাই, ধরমপতিকে এবারের মত মাফই করে দাও না!

বিজ্ঞ হাসি হেসে মুরসেদ জবাব দিল—আরে বাবা, আমি কি মালিক! আল্লা যদি ইচ্ছে করে ত ওর পয়সার অভাব হবে না। মহাজনী করার মত দিগদারী আর নেই। ছিঃ, এমন কাজ মানুষ করে!

মুরসেদ অনেক ভালো কথাই বলল কিন্তু তার আচরণে করুণার কোনো চিহ্ন নেই, হাতের মুঠোয় টাকা গেলে আর কি ফেরৎ দিতে পারে সে?

আধঘণ্টাও লাগ্‌ল না গেটের সামনের জটলা পাত্‌লা হতে। একে একে সবাই চলে গেল। লালা, কাবুলী, খাতক সব চলে গেছে। শুধু বুড়ো ধরমপতি বসে রইল শূন্য লোহার দরজার সাম্‌নে। এখনও তার দু-চোখ দিয়ে জল ঝরছে।

উনিশ

আড্ডা বসেছে ডোমনপ্রসাদ আহীরের কোয়ার্টারে। অভিজিৎ সিং, কিষণরাম তেওয়ারী, নটবর মাহাতো, বান্দা সিং সবাই গাঁজার কল্‌কেকে চক্কর ঘিরে বসেছে।

অভিজিৎ বল্‌ল—এবার রামগানের দলটা জাঁকিয়ে তুলতে হবে।

ডোমনপ্রসাদ সায় দিল—এ আপনি সাচ্চা বাৎ বলেছেন। কেঁউ কি ওই শালা ঘোষালের পিরেতটা শহরের চৌহাদ্দিতে ঘুরপাক মেরে বেড়াচ্ছে।

নটবর মাহাতো কলকেতে লম্বা টান দিয়ে, ধোঁয়াটা চিবিয়ে চিবিয়ে উপভোগ করতে করতে গম্ভীর ভাবে রায় দিল—জয় রাম জী কি! আবে বাপ, সেই জন্যে ত এত জর-জারি, বেমার লেগে গিয়েছে।

ডোমনপ্রসাদ চট্‌ করে উঠে দাঁড়িয়ে তাকের উপর থেকে একখানা বোম্বাই হরপের তুলসীদাসী রামায়ণ নামিয়ে মাটির ওপর রাখল। তারপর দুইহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বল্‌ল—এই কেতাবখানা আমার গুরুজী দিয়েছেন। আমি হররোজ ফুল দিয়ে পূজা করি।

অভিজিৎ সিং বইখানা তুলে নিয়ে দেখতে লাগলো, বল্‌ল—আরে আরে সব ত ওলট্‌-পালট হয়ে আছে ভাই।

ডোমন হাসল—তা হতে পারে। হাল ত বহুৎ খারাবই ছিল, সিলাই-টিলাই সব খুলে তচ্‌নচ হয়ে গিয়েছিলো। আমি ত মুচির কাছ থেকে দুটো পেরেক মাঙিয়ে নিয়ে হাতুড়ী ঠুকে পাতাউতা এক-আট্‌ঠা করে রেখেছি সিংজী।

অভিজিৎ বল্‌ল—গোসা না করো ত এক বাত বলি, ডোমন! তোমার গুরুজীরও ত রামায়ণ কোনো কাজে লাগতো না?

একথায় সবাই হেসে উঠ্‌ল। ডোমনও সায় দিয়ে বলল—আরে তার কথা বাদ রাখুন সিংজী, লোকটা পয়লা নম্বর বুদ্ধু। লেকিন এ বাৎ

ঠিক, যে, ইমানদার। তবভি কোম্পানীর সঙ্গে ফারখৎ করে খারাপ করল! রঘুবীর সিংকে আর এখন আর কে পোঁছে, বলুন! সে যাক রামায়ণের গানের কথা হোক।

এ আসরে অভিজিৎ সিং ছাড়া আর কেউ বিশেষ লেখাপড়া জানে না।

অভিজিৎ বলল—ঠিক আছে। আমাদের সীতানাথ বাবু কলকাতা যাচ্ছেন শীগগির স্থভাষ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে—ওঁরই হাতে বইটা দিব, বাঁধিয়ে আনবেন কলকাতা থেকে।

ডোমনপ্রসাদ অপ্রসন্ন মুখে বলল—যদি খারাপ করে দেয়? তাছাড়া আর এক কথা: শুনেছি বই বাঁধাইবালারা মুসলমান। রামায়ণ ওদের দিয়ে বাঁধাই করানো ঠিক না।

নটবর বলল—কখনো না!

অভিজিৎ বলল—তবে একটা নোতুন বই কিনিয়ে আনাই আমরা।

কিষণরাম তেওয়ারী এতক্ষণ চুপ করে ছিল, সে বলল—আরে ভাল কথা, রামগানের জন্যে বই কেতাব কি দরকার? আমরা যেমন করে গাই তেমনি গান করলেই ত হয়। তোমাদের আজকাল ফ্যাসান হচ্ছে!

একথায় সবাই সায় দিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক কথা।

বাইরে সীতানাথের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—জয় রাম জী কী!

অভিজিৎ এবং ডোমন দু'জনেই জবাব দিল—রাম রাম বাবুজী!

সীতানাথ ঢুকে পড়ে বললেন—বাঃ সবাই হাজির দেখচি। চাঁদের হাট!

নটবর বলল—সমাচার সব আচ্ছা ত বাবুজী?

সীতানাথ বিড়ি ধরিয়ে সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন—ওদিকে কি কাণ্ড হয়েছে শুনেছো?

—কি আবার হ'ল?

—আরে সে হারামীরা খালাস পেয়ে গেছে।

—কে কে ছাড়া পেল?

—কে নয়! সব ক'টা বদমায়েস, মায় সারথী, ইসমাইল পর্যন্ত। রায় হয়েছে, ওরা যে খুন করেছে ঘোষালকে তার কোনো প্রমাণ নেই। আরে প্রমাণ রেখেই

যদি খুন করবে ত তবে আর ভাবনা কি ছিল! দুষমনদের এ শহরে ঢুকতে দিলে কারখানায় আবার গোলমাল বাধবে, দেখে নিয়ো।

অভিজিৎ সিং বল্‌ল—দেখাই যাক্‌ না কোম্পানী কি করে। আপীল ভি হতে পারে!

—এতে আর দেখাদেখির কি আছে ভাই! শালারা নাহক তেইশটি হাজার টাকা গায়েব করে ফেল্‌ল। এই দ্যাখো না, এখন লেবারদের পেট চল্‌ছে না, হাহাকার পড়ে গিয়েছে। এই ডামাডোলের বাজারে ত ফেডারেশনের ফাণ্ড থেকে টাকা দিয়ে সবাইকে সাহায্য করা উচিত ছিল। কিন্তু টাকা নেই। নেই ত নেই—বল্লেই চুকে গেল! বলি, নেই কেন? সেই যে কোম্পানীর সাথে লড়াই-এর জন্যে মজদুর ভাইরা না-খেয়ে না-পরে চাঁদা দিল—কি জন্যে দিল শুনি? ফাস্ট ক্লাস গাড়ী করে স্বামী সাহেবকে এনে মচ্ছিমলমে খাইয়ে, মাথায় নিয়ে নাচানাচি করলি। তার হাতে সব কিছু ছেড়ে দিলি। তার বদ্‌লিও তেমনি মিল্‌ল—যতটুকু শাঁস ছিল চেটে মেরে দিয়ে সে শালা ত বেপাত্তা হ'ল। এখন হায় হায়!

ডোমনপ্রসাদ রাঙা চোখ দুটো বড় বড় করে বল্‌লে—বেশ ত, ওরা এখন খালাস হয়ে এসে যাক, তখন চেপে ধরব আমরা!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সীতানাথ বল্‌লেন—ওদের চেপে ধরে ঘোড়ার আণ্ডা মিলবে। ও শালারা কম সেয়ানা নাকি? যদি কিছু পেয়ে থাকে ত সেসব সরিয়ে ফেলেছে। ওদের সব পাকা কাজ ভাই—

বান্দা সিং হুঙ্কার দিল—ফরমাস করুন, বেইমানদের জানে মেরে দিই!

অভিজিৎ চোখের ইশারায় সাবধান করে দেয়—যেতে দাও ভাই! ওরাও মজদুর, আমরাও মজদুর। খামেকা ওদের ওপর হামলায় কি ফয়দা উঠ্‌বে?

সীতানাথ বললেন—আমি আর কলকাতায় যাচ্ছি না।

ডোমন প্রশ্ন করল—কেন বাবুজী?

—শরীরটা তেমন জুৎ নেই। আর সুভাষবাবু শুন্‌লাম মল্লিকসাহেবের কাছে খবর পাঠিয়েছেন যে, লেবারদের কেস বড় দুর্বল। তা এমন অবস্থায় কোম্পানী যেন লেবারদের মাফ করে নিয়ে গোলমালটা মিট্‌মাট করে নেন।

আসল কথা হচ্ছে যে, আমাদের মতলবের গোড়ায় গলদ—এখন ওঝা ডেকে কোনো লাভ নেই।

অভিজিৎ বলল—এ খবর কে দিল আপনাকে বাবুজী?

—মল্লিকসাহেব আমাকে দেখিয়েছেন স্থভাষবাবুর চিঠি।

—সাহেব আর কিছু বলেছেন?

—বলেছেন সবাইকে মুচলেকা দিতে হবে। আর ফেডারেশন বাতিল বলে মেনে নিতে হবে।

অভিজিৎ বিজ্ঞভাবে বললে—এ সবই ত জানা কথা। ওসবের জন্যে ভাবনা নেই। সব শালা নাকে খৎ দিয়ে সই করে বসে আছে। তলে তলে আজই সাড়ে তিন হাজার লোক সই করেছে তার খবর রাখেন?

ডোমনপ্রসাদ বলল—বাবুজী, আমাদের আর্জি আছে একটা।

সীতানাথ বললেন—তোমার আর্জি? মানে, তোমার হুকুম বল না বাবা? তোমার হাতে সাড়ে পাঁচশ লেঠেল গুণ্ডা, আর বলছ আর্জি!

ডোমন আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে সীতানাথের পায়ে হাত দিয়ে বলল—আরে রাম কহো! আপনি ব্রাহ্মন, আপনাকে হুকুম করতে পারি আমি?

—কি, বলো।

—আপনার নতুন কোয়াটারে রামগান করতে চাই আমরা।

সীতানাথ হেসে জবাব দিলেন—খুব উত্তম কথা। সামনের পূর্ণিমাতে সত্যনারায়ণের সিন্নী দেবো, তা সেদিনই তোমরা আসর করো।

নটবর মাহাতো মাথা চুলকে মৃদু প্রতিবাদ জানায়—সতনারাণের পূজোতে আপনার ওখানে ত সব বাবুভাইরা আসবেন, সেখানে আমরা নাপাত্তা হয়ে যাবো যে!

সীতানাথ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন—আরে ক্ষেপেচ! বাবুসাহেবদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। আমি হচ্ছি খাশ মজদুর ভাই, তোমরাই আমার বাবু, তোমরাই আমার ভাই।

বান্দা সিং সোল্লাসে হর্ষধ্বনি তুলল—সাবাস—সাবাস বাবুজী!

সীতানাথ বললেন—সিংজী, একটা কথা ছিল।

—বলুন না, এখানে ত আমাদের আপনা-আপনি সবাই আছে।

—মানে, বলছিলাম কি, ওরা ত আজই মানিকপুরে আসছে, এখন দেখা দরকার ফেডারেশনের আফিসে না ঢুকে পড়ে। কি জানি যদি নতুন করে হাঙ্গামা বাধায়! তাই বলছিলাম আপনার রামগানের মজলিশটা ফেডারেশন আপিসে আজ বসালে কেমন হয়?

ডোমন, বান্দা, নটবর, কিষণরাম সকলেই সমস্বরে সায় দিল, অভিজিৎ সিং সর্বশেষে মৃদুকণ্ঠে বল্‌ল—তা বেশ ত চলো ভাই সব, আমরা ওখানেই যাই।

কুলী-মহল্লারই একখানি ঘরে লেবার-ফেডারেশনের আপিস। বন্ধ দরজায় তালা ঝুলছে। ডোমন নটবরের দল যখন এলো তখন আশপাশের কামরার অধিবাসীদের কোনো সাড়া-শব্দ শোনা যাচ্ছে না। যেন একটা প্রেতলোকের পাশে জীবন্ত মানুষের আবির্ভাব হ'ল! আজকাল শ্রমিকেরা কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে! কারখানা ছাড়া আর কোথাও বিশেষ কেউ যাতায়াত করে না। জীবনের স্বাদই বিরস।

ঝাঁঝর, ঢোলক সহযোগে সমবেত রামগানের ধুয়ো উঠ্‌তে কোনো কোনো গৃহস্থ দরজা খুলে একবার বেরিয়ে এল। কিন্তু ওই পর্যন্তই, এ আসরে যোগদান করতে কেউ এগিয়ে এল না। একমাত্র পথের কুকুরগুলো পাল্লা দিয়ে চিৎকার করছিল। রামগানের হল্লায় যারা মত্ত, তাদের কানে সে প্রতিবাদ পৌঁছবার উপায় নেই। কিন্তু কুলী-মহল্লার অধিবাসীরা বিরক্ত হচ্ছিল—নিষ্ক্রিয়-ভাবেই তারা নিজেদের অসন্তোষ হজম করল।

কুড়ি

শুধু মায়ের মুখ চেয়েই দেবজ্যোতি নিয়মিত মানিকপুরে আসা-যাওয়া করে। সীতানাথ তার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না। আর দেখা-সাক্ষাৎ বিশেষ হয়ও না পিতাপুত্রে। কারখানা থেকে এসেই সীতানাথ বেরিয়ে পড়েন, তাঁর আজকাল অনেক কাজ! দেবজ্যোতি অন্য ঘরে থাকে। নতুন কোয়ার্টারে অনেকগুলি ঘর।

এবার এসে দেবজ্যোতি শুনল দীনদয়ালের চাকরী নেই। কথাটা প্রথমে তার বিশ্বাসই হয় নি। কিন্তু মানিকপুরের হালচাল তলিয়ে ভাবলে আর অবিশ্বাস করারই বা কি হেতু থাকতে পারে! এই ত চোখের ওপর সীতানাথ মুখুয্যের দিনবদল সে দেখতে পাচ্ছে। একখানা ঘরের খাঁচাতে একুশ-বাইশ বছর এক নাগাড়ে কাটাবার পর হঠাৎ কোথা দিয়ে কি হ'ল—সীতানাথ ঝপ্-ঝপ্ করে দু-দফা কোয়ার্টার পাল্টাবার স্বযোগ পেলেন! কুলী থেকে বাবু-কোয়ার্টারে পৌছতে কদিনই বা লাগল! সীতানাথ এখন একজন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার! কোথায় ড্রিল-সেক্‌শন আর কোথায় ইলেক্‌ট্রিক্যাল মেশিন শপ্! কোনো হিসেব খুঁজে পাওয়া যায় না যে!··ভাবতে ভাবতে দেবজ্যোতির ঘুম ছু'ট গেল। সে বিছানার ওপর সোজা হয়ে উঠে বসল। ভাগ্যে সে এই কারখানার মধ্যে ঢোকে নি! এই বিপুল জটিল চক্রান্তের মধ্যে এই মানুষগুলো বেঁচে আছে কি করে?

দেবজ্যোতি তার সদ্যফোটা বাস্তব চিন্তার তাড়নায় নিজেকে অস্থির করে তোলে!

যাবে নাকি একবার দীনদয়ালের কাছে? এখনই চলে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পরক্ষণে মনে হয়, দীনদয়াল তাকে ছেলে মানুষ বলে হেসে উড়িয়ে দেবেন। কিম্বা তাঁর সেই সদাহাসি মুখখানা বিষণ্ণ আঁধারে ছেয়ে যাবে—কে জানে? মিন্টু, বাদল, দীপু—ওদের কি অবস্থা!

সীতানাথের বাড়ির একটি পিঁপড়েও নাকি সান্যাল-বাড়ির চৌকাঠ ডিঙালে

সর্বনাশ হয়ে যাবে! অথচ সীতানাথের জন্যে দীনদয়াল এককালে যে তদবির করেছিলেন, যে ভাবে বন্ধুকে আশ্রয় দিয়ে এই কারখানায় ঢুকিয়েছিলেন, সে গল্প ত সীতানাথই বহুবার শুনিয়েছেন!

দেবজ্যোতির ইচ্ছে করে ঘুমন্ত সীতানাথকে জাগিয়ে তুলে খুব কষে দশ কথা শুনিয়ে দেয়! আবার হাসি পায় নিজের পাগ্‌লামী দেখে। সীতানাথ ত জেগেও জাগবেন না! সীতানাথ এখন আকাশের দিকে নজর সই করে বসে আছেন, মাটির ওপর একটুও মায়ামমতা নেই মানুষটার।

তাহলে এখন দেবজ্যোতি কি করবে?

অস্বস্তির মধ্যে শ্রান্ত হয়ে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি! ঘুম ভাঙলো বেশ বেলাতে।

রবিবার সকালেও সীতানাথ বাড়ি নেই।

দেবজ্যোতি সাত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল পথে।

দীনদয়ালের বাড়ির পথ সে ধরলো না। ঠিক তার বিপরীত দিকেই চল্‌ল— হস্‌পিট্যাল রোড থেকে উত্তর দিকে বড় শড়ক দিয়ে ফার্ন পার্ক হয়ে যে বাঁকা পথটা এ-ক্লাস কোয়ার্টার্সে গিয়ে পৌঁছেছে, সেই পথেই চল্‌ল দেবজ্যোতি। সে দেখা করবে অনিরুদ্ধ মল্লিকের সঙ্গে।

অনিরুদ্ধ সম্বন্ধে মানিকপুরের অন্য হাজারো লোকের মত দেবজ্যোতির ভয় নেই। সে মল্লিকসাহেবকে ত দেখে নি, দেখেছে মন্দাকিনীর বাবাকে। মানুষ হিসেবেই অনিরুদ্ধর যা কিছু মূল্য!

মাঝে যখন দেবজ্যোতি মানিকপুরে আসা বন্ধ করেছিল সীতানাথের ওপর রাগ করে, তখনও যে অনিরুদ্ধ তার ওপর বিরূপ হন নি সেকথা মন্দাকিনীর চিঠিতে দেবজ্যোতি জেনেছে। বরং তিনি যে দেবজ্যোতির ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়ে খুশী হয়েছেন, এরকম কথাই মন্দাকিনী লিখেছিল।

আজও তেমনি একটা ভরসার ওপর নির্ভর করেই দেবজ্যোতি চলেছে অনিরুদ্ধর কাছে। হয়তো দীনদয়াল সম্বন্ধে মল্লিকসাহেব ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, তারই ফলে মিণ্টুদের ভাগ্যে এতবড় বিপর্যয় এসে পড়েছে।

দেবজ্যোতির বিশ্বাস, অনিরুদ্ধকে ঠিক মতো বোঝাতে পারলেই দীনদয়ালের চাকরীটা আবার ফিরে আসবে।

অনেকদিন পরে এ পথে দেবজ্যোতি এলো। মন্দাকিনী কলকাতায় আছে। আর কেউ ত দেবজ্যোতির খোঁজ-খবরও করে না।

বাংলোর দরজায় হাত দিতেই জিমি কুকুরটা এলো—তাকে ভোলে নি জিমি, দেখেই বিচিত্র শব্দ করে খুশীর আনন্দ জানালো, লেজটা পত্‌ পত্‌ করে নাড়ছে জিমি!

অনিরুদ্ধ একাই বসে ছিলেন। দেবজ্যোতিকে দেখে হাসলেন—এসো! ভালো আছো তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কেমন আছেন!

—এই ধকল সামলাচ্ছি! These fools, এদের জন্যে দুঃখও হয়, অথচ কোনো উপায় নেই। এরা কিনা শেষে শত্রু ভেবে রুখে দাঁড়ালো? দ্যাখো জ্যোতি, এতে ওদেরই সর্বনাশ হ'ল, কোম্পানীর আর কি বলো! আমি এ সব আদৌ চাই না। কিন্তু এমনই চক্রান্ত যে, না চাইলেও ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে। আর তুমি ত জানো, একবার লড়াই লাগলে তারপর আর স্নেহমমতা থাকে না—শত্রু শত্রুই।

দেবজ্যোতি বিনীত অথচ দৃঢ় ভঙ্গীতে বল্‌ল—আপনার একথায় ষোল আনা সায় দিতে পারলাম না। কারণ ওয়ার্কাররা যে অধিকারটুকুর জন্যে লড়াই করল, সেটুকু মানুষ মাত্রেরই ত প্রাপ্য।

—প্রাপ্য? প্রাপ্য যদি তবে পাচ্ছে না কেন? কারণ তাদের যোগ্যতা নেই। যোগ্যতার ওপরই ত মানুষের অস্তিত্ব।

—আপনি ঠিক উল্টো দিক থেকে দেখছেন। আমার কথা হচ্ছে যে, মানুষকে ঠিক মানুষের মতো বাঁচার অধিকার দিতে হবে। আজ যদি নাও দিতে চান, কাল আপনি দিতে বাধ্য হবেন।

—যাক বাবাজী, তোমার সঙ্গে তর্ক করে কোনো ফল হবে না। ওসব থাক। অনেকদিন পরে এসেছো দুটো ভালমন্দ গালগল্প শোনাও। এখন তুমি কত পাউণ্ড ওয়েট নিয়ে বারবেল করো—দেড়শ?

দেবজ্যোতি বল্‌ল—না, আমি আপাততঃ হাল্কা Free hand চালাচ্ছি। মোটে সময় পাই নে।

—পড়ার খুব চাপ বুঝি? তা ত হবেই, মেডিক্যাল লাইনে বিস্তর খাটতে হয়। কিন্তু শরীর-চর্চাটা বাদ দিয়ো না বাপু। তুমি যে কারখানায় এলে না, তার জন্মে বিশেষ কিছু মনে করি নি—কারণ প্রত্যেকেরই নিজের রুচি থাকা সম্ভব। কিন্তু এক্‌সারসাইজটা ছেড়ো না, তাহলে দুঃখ পাবে পরে—।

– একটা কথা বল্‌ব?

দেবজ্যোতির একথায় অনিরুদ্ধ গুছিয়ে বসলেন—কি কথা? মন্দাকিনী সম্বন্ধে কিছু?

—আজ্ঞে না, দীনদয়াল সান্যালকে আপনি চেনেন ত!

—অফ কোর্স, একটি নিষ্ঠাবান সৎ ব্যক্তি—শ্রদ্ধা করি তাঁকে!

মল্লিকসাহেবের এই অকুণ্ঠ প্রশংসায় দেবজ্যোতির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌ল—আপনি হয়তো জানেন না যে তাঁর চাকরী গেছে!

—অফ কোর্স! হ্যাঁ জানি।

—জানেন?

—না জানার কথা ত নয়। আমি যখন কোম্পানীর একটা রেস্‌পন্‌সিব্‌ল্‌ অফিসার তখন না জানলে চলে কি করে?

দেবজ্যোতি বিস্ময়ে হতবাক, সে মল্লিকসাহেবের মুখের পানে চেয়ে রইল।

মল্লিক বল্‌লেন—ও, তুমি ভাবছো কি বলো তো!

—না, আপনি এইমাত্র বল্‌লেন সান্যাল মশাইকে শ্রদ্ধা করেন, অথচ তাঁর চাকরী গেল—এই বৃদ্ধ বয়সে। আপনি জেনেশুনেও—

অনিরুদ্ধ এবার সশব্দে হেসে উঠ্‌লেন—ইয়ং ম্যান, একটা কথা জেনে রাখো, আমার ব্যক্তিগত মতের সঙ্গে অফিসিয়াল কাজের কোনো সম্পর্ক নেই। এ্যাব্‌সোলিউটলি আলাদা দুটো ব্যাপার। আর এটাই হচ্ছে আমার সাফল্যের মূলমন্ত্র।

দেবজ্যোতি নির্বোধের মত মল্লিকসাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকে।

উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে অনিরুদ্ধ বল্লেন—শোনো দেবজ্যোতি, তুমি ছেলেমানুষ, এসব কথা এখন বুঝতে পারবে না। তবে তোমাকে নিজের ছেলের মতো স্নেহ করি, তাই বল্ছি। সান্যাল মশাইকে মানুষ হিসেবে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। আজ পর্যন্ত অনেক বড় বড় লোভের টোপ ফেলেছি, কিন্তু তিনি সেদিকে ফিরেও তাকান নি। অথচ ওঁর চেয়ে ঢের অযোগ্য লোক স্রেফ আমাদের প্রয়োজনের দৌলতে আখের গুছিয়ে চলছে! তুমিও তাদের চেনো। এ তো গেল পার্সোন্যাল কথা। কিন্তু কোম্পানীর স্বার্থ দেখতে গেলে অবশ্য তাঁর চাকরী কিছুতেই থাকতে পারে না। সান্যাল একজন এ্যারোগ্যান্ট হোস্টাইল লীডার। তাঁর মতো শক্তিশালী লোক যদি কোম্পানীর অন্ন খেয়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে লেবার মহলকে অনবরত উস্কানী দেয়, পরামর্শ দেয়, তাহলে কোম্পানী কেন তাঁকে বরদাস্ত করবে? বলো।

দেবজ্যোতি গম্ভীর হয়ে গেছে, সে আস্তে আস্তে বল্ল—আপনার শ্রদ্ধা তাহলে আপনার চাকরীর কাছে পদানত!

—তা হবে কেন! সান্যাল মশাইকে হয়তো বিপদের সময় দুশো-পাঁচশো টাকা দিয়ে সাহায্য করতে আমি পারি। কিন্তু ইন্স্টিট্যুশনের ইন্টারেস্টেই তিনি আজ বরখাস্ত। এনি ওয়ে, আমি যতো এইসব অপ্রিয় প্রসঙ্গ বাদ দিতে চাচ্ছি, তুমি ততই ওগুলো টেনে আনছো, ব্যাপার কি বলোতো?—স্বদেশী-টদেশী করছ নাকি?

দেবজ্যোতি জবাব দিল—যদি করেই থাকি ত সেটা কিছু অন্যায় করি নি। তা ছাড়া সান্যাল মশাইকে আমি সকলের চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি—আমার জীবনে যতো মানুষ দেখেছি, তার মধ্যে উনি শ্রেষ্ঠ এই আমার ধারণা।

—ও তাই বলো। তা বাপু তোমার শ্রদ্ধাই বলো, admiration-ই বলো, সেটা খুব ভালো জিনিস, কিন্তু ও সব আদর্শবাদ দিয়ে জীবনে এক কড়াও উন্নতি হবে না। বি প্র্যাক্টিক্যাল।

—মনের সঙ্গে কাজের যে রাজ্যে মিল থাকে না, সেই বাস্তবকে আমি গ্রহণ করতে পারব না। এই যে আপনি অফিস আর বাড়ির দুটো আলাদা মন

তৈরী করে রেখে, নিজের কাছে সাফাই গাইছেন, সেটার মধ্যে একটা মস্তবড় ফাঁকি রয়েছে!

—ফাঁকি?

চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন মল্লিকসাহেব।

দেবজ্যোতি এতটুকু বিচলিত হ'ল না, বল্‌ল—হ্যাঁ, আপনি নিজেকে ঠকাচ্ছেন। একটা মানুষের এরকম দ্বৈত সত্তা থাকা মানেই তিনি honest নন্‌।

অনিরুদ্ধ তাচ্ছিল্যভরে হো-হো করে হেসে উঠ্‌লেন। দেবজ্যোতির পিঠ্‌ চাপ্‌ড়ে তিনি বল্‌লেন—তারপর, বলো, আর কি বলবে! ড্যানিয়াল—তোমার বিচার শেষ করে রায় দাও।

বল্‌তে বল্‌তে অনিরুদ্ধর মুখের হাসি হারিয়ে গেল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি দেবজ্যোতির দিকে নজর নিবদ্ধ করলেন।

দেবজ্যোতি অকম্পিত স্বরে বল্‌ল—আমার মতো ছোট মুখের এসব বড় কথা হয়তো আপনি হেসে ওড়াতে পারলেই খুশী হবেন। কিন্তু নিজের সঙ্গে বোঝাপাড়া করতে গেলে বুঝবেন, আমি অযথা আপনাকে অপবাদ দিতে চাইনি। আজ অনেকখানি ভরসা নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম—কিন্তু—

—কিন্তু, কি? বলো!

—কিন্তু আর বলে লাভ নেই। আপনি তার আগেই আমার আশাকে ডুবিয়ে দিয়েছেন।

অনিরুদ্ধ এবার উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে লাগলেন—ছ্যাখো দেবু, আমি তোমাকে সত্যিই স্নেহ করি। অন্ততঃ সেখানে অনেস্টি আছে। বলো তোমার কি বলবার আছে বলো। যদি পারি আমি অবিশ্যি চেষ্টা করব। বলো—

একটা আবেগে দেবজ্যোতির কণ্ঠস্বর বুজে আসে। সে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌ল—না, থাক। আমি বুঝেছি আপনাকে অনুরোধ করা ঠিক নয়।

অনিরুদ্ধ ধম্‌কে উঠ্‌লেন—ছেলেমানুষী রাখো। তোমাকে বলতে হবে। আমি জানতে চাই। আমাকে তুমি যতো হাল্কাভাবে ট্রিট করতে চাও, আমি তার চেয়ে অনেক—অনেক ভারী!

—শুনতে চান, বলতে আমার আপত্তি নেই। সেই কথা বল্‌তেই যখন এসেছি, তখন বল্‌ছি।

—হ্যাঁ, এই ত ভালো ছেলের মতো কথা। বলো—

মল্লিকসাহেব শান্ত হয়ে বসলেন সোফাতে গা ঢেলে দিয়ে।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—দীনদয়ালবাবুর চাকরী যাওয়াতে আমি খুব আপ্‌সেট হয়ে পড়েছি। কাল থেকে সেই চিন্তাই আমাকে অস্থির করে রেখেছে। ছেলে-বেলা থেকে ওঁকে আমি মনের সামনে আদর্শ ধরে রেখে চলেছি—তাই আজ যখন ওই রকম একজন অনেস্ট মানুষকে এভাবে অপমানিত লাঞ্ছিত হতে দেখলাম তখন স্থির থাকতে পারিনি। কেউ অবিশ্যি জানে না একথা। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে আপনার কাছে আসাই ঠিক করে ফেল্লাম। ভরসা ছিল, আপনি ওঁর ব্যাপারটা নিয়ে একটু মুভ করবেন। কি জন্যে এ ভরসা হ'ল তা জানি না। এখন কথা কয়ে দেখলাম যে ভুল করেছি।

—হুঁ!

—আর কিছু নয়, এই আমার কথা।

—ও!

—এবার আমি চলি।

—না।

বলে মল্লিকসাহেব সোফাতে চোখ বুজে বসে রইলেন, যেমন ছিলেন। দেবজ্যোতির গায়ে তির্যক একটি রোদের রেখা এসে পড়েছে। একবার ইচ্ছে হ'ল চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে বসে, কিন্তু অনিরুদ্ধর চোখবোজা মুখের দিকে তাকিয়ে সে চুপ করে বসেই রইল।

কিছুক্ষণ পরে অনিরুদ্ধ বল্‌লেন—তুমি যে এখানে এসেছ, সান্যাল জানে না?

—না!

—তাঁর চাকরী বজায় রাখাতে তোমার কি স্বার্থ?

—আমার বাবার চাকরী বজায় থাকাতে যে স্বার্থ, সেই স্বার্থও মনে করতে পারেন। ইভ্‌ন মোর ইন মর‍্যাল রেস্‌পেক্ট।

অনিরুদ্ধ চম্‌কে চোখ মেল্‌লেন—বলো কি দেবু?

—আমি ঠিকই বল্‌ছি।

—তুমি তোমার বাপের বিপরীত। হ্যাঁ! জানো তোমার বাবা কি বলেন সান্যাল সম্বন্ধে? তুমি ছেলেমানুষ,—

—থাক তাঁর কথা শুন্‌তে চাই না।

—ওয়েল দেন, আমি কয়েকটা কথা বল্‌ছি শোনো।

—কি?

—সান্যাল একদিনও আমার কাছে আসেন নি। তাছাড়া তাঁর আচরণে এমন ভাব কোথাও প্রকাশ পায়নি যে, চাকরী যাওয়াতে তিনি বিপন্ন। আত্মমর্যাদার খাতিরে তিনি এই দুর্দশাকে মেনে নিয়েছেন হয়তো। কিন্তু কোম্পানীরও একটা নিয়ম-নীতি আছে। এখন উনি যদি মুখরক্ষার খাতিরে লোক-দেখানো এ্যাপোলজি চান, তাহলে আবার হি মে বি টেক্‌ন ইন্‌—চাকরী ফিরে পাওয়ার জন্য এটুকু ওঁকে করতে হবে। আমি তোমার কথা রাখতে পারবো—শুধু এইটুকু তাঁকে দিয়ে করাও!

দেবজ্যোতি একটু চিন্তা করে বল্‌ল—আপনার কাছে বল্‌তে সঙ্কোচ করলে চল্‌বে না, উনি যদি এতে রাজী না হন, তবে? তবে কি ওঁর ফ্যামিলি ভেসে যাবে?

অনিরুদ্ধর চোয়ালের হাড় দুটো দাঁতের চাপে শক্ত হয়ে ওঠে—যেতে পারে। সংসার, সমাজ সব-কিছুই ত সমবায়িক চেষ্টার ওপর টিকে থাকে। এক জাতের মানুষ আছে তারা সেটা ভুলে গিয়ে, কেবল অভিমান নিয়ে বড়াই করে। তাদের জন্যে মনে মনে দুঃখ করা ছাড়া আর কিছুই করা যায় না দেবু! কারণ তারা অপরের দিকটা একেবারেই উপেক্ষা করে।

—অভিমান নয়, আদর্শ। কাকাবাবু আদর্শকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা বলে জানেন।

—স্টপ দ্যাট বুকিশ টার্ম—ওসব পুঁথিপড়া বুক্‌নি সর্বত্র ফলানো যায় না। লাইফ ইস হার্ডার। ইস্পাতের মতো শক্ত আর ধারালো এই জীবনের বস্তুতন্ত্র, বুঝলে বৎস! এনাফ অফ ইট। আমি যা পারি তা শুনলে, এখন তোমার হাতে বাকীটুকু। এরপর ভবিষ্যতে আমাকে দুষো না বাপু। তুমি হচ্ছো

খুকীর আদর্শ, তোমার আদর্শ সান্যাল!—আই পিটি দিস্ পুওর মল্লিক। আমার স্থান কোথাও হ'ল না! অথচ বাইরের লোকে আমাকে কী মর্যাদাই ছায়!

বল্‌তে বল্‌তে অনিরুদ্ধ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠ্‌লেন।

দেবজ্যোতি বুঝতে পারে না মল্লিকসাহেব পরিহাস করলেন, না, এটা তাঁর মানসিক আক্ষেপের প্রতিধ্বনি!

অনিরুদ্ধ বল্‌লেন—ইস্ ছাখো, এসেছ কতক্ষণ! অথচ তোমাকে কিছু খেতে বলা হয় নি।

—তার জন্যে ব্যস্ত হবার কি আছে? দরকার হলে নিজে থেকেই খেতে চাইতাম।

—এইজন্যেই তোমাকে ভালো লাগে। এখানকার মানুষগুলো যেন বড় দূর থেকে কথা বলে, জানো দেবু। দিস্ ফরম্যাল লাইফ আই হেট—অথচ এরই মধ্যে বেঁচে থাকতে হয়। মাঝে মাঝে চীৎকার করে বল্‌তে ইচ্ছে করে আমিও মানুষ, তোমাদের মতোই আমি মানুষ। আবার সামলে নিতে হয়—এই ফারাকেরও প্রয়োজন আছে। এরই জোরে এই কারখানার শাসনযন্ত্র চলে।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—মন্দাকিনীর খবর কী?

—ক্যানো তোমায় চিঠি-পত্তর দ্যায় না বুঝি! আই নো, এই মেয়েরা জাত হিসেবে বড়ো ফ্লিপ্যান্ট। হয়তো কলকাতায় গিয়ে পার্টি ফার্টি করছে—সোসাইটির খপ্পরে পড়লেই ব্যস, ছাঁচে ঢালাই করা এ্যারিস্টোক্র্যাট হয়ে পড়ে!

দেবজ্যোতি বাধা দিয়ে বল্‌ল—না, না, সেদিক দিয়ে দোষ আমারই। অনেক দিন হয়ে গ্যালো ওর চিঠির জবাব দিতে পারি নি।

—ও, আই সী! হ্যাঁ, পরীক্ষায় খুকী বেশ ভালো ফল করেছে, অবিশ্যি এটা ত ক্লাস-প্রমোশনের ব্যাপার। গরমের ছুটি হয়েছে, এবার এসে পড়বে দু-চার দিনের মধ্যে।

—আচ্ছা! আসছে বুঝি?

—হ্যাঁ। তখন এসো।

—আচ্ছা, আজ চলি।

—এসো। হোপ ইউ গুড হেল্‌থ!

দেবজ্যোতি অনিরুদ্ধর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে উদ্যত হ'ল, তিনি বাধা দিয়ে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। বিদায়ের সময় দুজনের মুখই হাসিতে উদ্ভাসিত দেখায়।

মনটা অনেকখানি হাল্কা লাগে দেবজ্যোতির। দীনদয়ালের জন্য কিছু একটা করবার সুযোগ যে সে পেয়েছে, এটাই যেন ভাগ্যের বিরাট দান। হয়তো অনিরুদ্ধ যে সর্ত দিয়েছেন সেই সর্তে দীনদয়াল সায় দেবেন না। তখন দেবজ্যোতির এই খুশীটুকু ঘনমেঘে ঢাকা পড়ে যাবে, তা যাক। তবু দীনদয়ালকে সে অনুরোধ করতে পারে, রাজী করবার জন্য চেষ্টা করতে পারে—এটাই কি কম কথা!

বেলা বেড়ে চলেছে। রোদের তেজে ঝাঁ ঝাঁ করছে আশ্‌ফ্যাল্টের পথটা। গরম হাওয়ার শুকনো ঝড়ে চোখ-মুখ জ্বালা করছে। দেবজ্যোতির পায়ে ক্রেপসোলের ক্রেড্‌স্‌ জুতোটা তেতে উঠেছে, মাথার মধ্যে যুক্তি-জালের বুনানী চলেছে একের পর এক।

মাঝপথে দু-এক জন পরিচিত ছেলের সঙ্গে দেখা হ'ল। কারুর সঙ্গেই সে দু-এক কথার বেশি কইল না। সকলকে এড়িয়ে, সব-কিছু কাটিয়ে দেবজ্যোতি এখন দীনদয়ালের সামনে হাজির হ'তে চায়।

কিন্তু দীনদয়াল বাড়ি নেই।

দীনদয়ালের বড় মেয়ে 'মিণ্টু' ওরফে স্বদেশী দেবজ্যোতিকে দেখে প্রথমে অবাক হয়ে গেল—আরে! কী ব্যাপার, এমন অসময়ে দেবুদা তুমি! আমাদের মতো গরীবের বাড়ি হঠাৎ কি মনে করে ভাই?

দেবজ্যোতি এই আক্রমণের জন্যে মোটেই তৈরী ছিল না। কিন্তু মিণ্টুর কথার পিছনে যে খোঁচাটুকু ছিল, তা একেবারেই অকারণ নয়। এককালে দেবজ্যোতি নিত্য দু-বেলা না হলেও অন্ততঃ একবার মিণ্টুদের বাড়ি আসা-যাওয়া করত। বর্ধমানে যাওয়ার পরও সে মানিকপুরে এলে দীনদয়ালের কোয়ার্টারে আসতো। ইদানীং সে নিয়মটা পাল্টে গেছে।

মিণ্টুর কথাটা কানে গেলেও দেবজ্যোতি এখন বাকবিতণ্ডার মধ্যে যেতে চায় না বলেই, গায় মাখ্‌ল না, বল্‌ল—হুঁ, তারপর সব কি খবর ?

—আমাদের খবর কখনো খারাপ হয় না। মুড়ির চাল আমরা, ভাজলে হয় মুড়ি নয় চালভাজা হবো, পোলাও হবার ত আর আশা নেই ! সে বরং তোমরা ! যাক, ওরা সব ভালো তো ?

—ওরা মানে ?

দেবজ্যোতি মূঢ়ের মতো জিজ্ঞাসা করল।

মিণ্টু হেসে ফোড়ন কাট্‌ল—আর ভাই, তোমরা খোঁজখবর নাও না বলে কি আমরা খোঁজ না নিয়ে পারি ! তোমার অনিরুদ্ধ কাকা, মন্দাকিনী।

দেবজ্যোতি মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গিতে বল্‌ল—ছিঃ, মিণ্টু ! তোমার মুখে এরকম কথা মানায় না।

অভিমান তরঙ্গিত হ'ল মিণ্টুর স্বরে—আর তোমার পক্ষে বুঝি ওই রকমটা বেশ মানায় ?

বিস্মিত দেবজ্যোতি প্রশ্ন করল—রকম মানে ? কোন্ রকম ?

—জানি না যাও।

মিণ্টুর রহস্যময় উক্তিতে দেবজ্যোতি যতখানি অবাক হয়েছে, তার চেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছে মনে। এই মেয়েটি সরল বলিষ্ঠ স্বভাবের জন্যই দেবজ্যোতির অন্তরে শ্রদ্ধা মেশানো প্রীতির আসন দখল করে রয়েছে—আজ নয়, অনেক দিন ধরেই। হঠাৎ হেঁয়ালীর বাঁকা গতি দেখে দেবজ্যোতি চোখ বুজে একটু ভাবতে চেষ্টা করে—কি এমন হয়েছে !

মিণ্টু অপ্রত্যাশিতভাবে উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠ্‌ল—দ্যাখো কাণ্ড, কতদিন প'রে তুমি এলে—আর আমি আবোল-তাবোল কোঁদল জুড়ে দিয়েছি ! আমার যেন কী হয়েছে ! সত্যি ভাই রাগ কর না।

দেবজ্যোতির গলা পেয়ে মিণ্টুর ছোট বোন দীপু এসে কোল ঘেঁষে দাঁড়ালো—ইস্ রাগ করবে না ! কেন করব না, খুব রাগ করব। ক্যানো এ্যাদ্দিন আসেন নি ক্যানো ?

দেবজ্যোতি এবার হেসে বাঁচল—আরও-আরও খুব রাগ কর দুপী, একেবারে বেড়ালের মতো ফ্যাঁচ্-ফোঁচ এ্যাঁও!

দীপু লজ্জিত হ'ল—যান আপনি ভারি দুষ্টু, আমি কক্ষণো বেড়াল নই। দুপী নয়, ওসব আপনাদের বানানো কথা।

মিণ্টু সহজ স্বরে বল্‌ল—এতো বেলাতে চা খাবে না নিশ্চয়! একটু সরবৎ দিই?

—তা কে বারণ করেছে—একটু নয় অনেকটুইকু দাও। কাকামনির ব্যাপার কী?

—আর বোলো না ভাই, কোম্পানীর চাকরীতে তবু অবসর ছিল—কিন্তু এই স্বাধীন সংঘের সভাপতি হয়ে অবধি দু-মিনিট বাড়িতে বসার নাম নেই!

বল্‌তে বল্‌তে মিণ্টু মাথাটা মাটির দিকে নামিয়ে হঠাৎ দেবজ্যোতিকে একটি প্রণাম করে ফেল্‌ল—ওমা ছ্যাখো, একদম ভুলেই গিয়েছিলাম।

দেবজ্যোতি তৈরী ছিল না, আচমকা পায়ে নরম হাতের ছোঁয়া লাগতেই সরতে গিয়ে দীপুকে ধাক্কা দিয়ে আরও অপ্রতিভ হয়ে গেল। তার কানদুটো রাঙা হয়ে যায় লজ্জায়। অর্ধস্ফুট স্বরে সে বল্‌ল—না, না, এসব অমি সইতে পারিনে।

দিদির দেখাদেখি দীপুও সাড়ম্বরে পায়ের ধুলো নিতে উদ্যত হ'ল। কিন্তু দেবজ্যোতি তাকে ধম্‌কে উঠ্‌ল—থাম্ থাম্, তুই পায়ে আঁচড়ে কামড়ে দিবি ত!

বছর দুই আগেও দীপু রেগে গেলে কামড়ে দিত। দেবজ্যোতির কথায় সে লজ্জা পেলেও বেশ স্পষ্টভাবে জানালো—আজ্ঞে না মশাই, আমি এখন বড় হয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন না, একবারও আপনার গলা জড়িয়ে ধরি নি!

মিণ্টু এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়েছিল, ফিরে এল লেবুচিনির সরবৎ নিয়ে। বল্‌ল—মুখ তো শুকিয়ে গেছে, খাবে কিছু?

—নাঃ, আজ চলি, ওদিকে মা বসে থাকবেন। সেই সকালে বেরিয়ে এসেছি।

দীপু বল্‌ল—হুঁ, সেই সকালে বেরিয়ে বুঝি এই পথটুকু আসতে এতোখানি বেলা করতে হয়?

মিণ্টু হাসলো—তোর কি একলারই কেনা দেবুদাদা!

—হ্যাঁ তাই! বলো না এতো দেরী করলে ক্যানো!

দীপু কষে একটা চিম্‌টি দিল দেবজ্যোতির হাতে।

মিণ্টু ভ্রূকুটী করল।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—একটু দরকার ছিল। সাহেব-বাংলোতে গিয়েছিলাম।

—জানি মশাই, সাহেব-বাংলোতে মানে, সেই প্যাক্‌-পেঁকে হাঁসের মতো মেয়েটা যে বাড়িতে থাকে সেই বাড়িতে—কী যেন নাম রে দিদি খ্যান্তমনি, না ড্যালাননী মেয়েটার নাম!

দীপুর কথার ধরণই ওইরকম, অন্য সময়ে হ'লে মিণ্টুও হেসে উড়িয়ে দিত কিন্তু আজ কেন যেন দীপুর ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হ'ল, বল্‌ল—দিন-দিন তুমি বড় অসভ্য হচ্ছ দীপালী!

দিদির এই উক্তিতে দীপু মরমে মরে গেল।

দেবজ্যোতিও কম অস্বস্তিতে পড়ে নি! এ বাড়ির প্রতিটি মানুষের হাঁচি কাশিটুকু পর্যন্ত সে চেনে। মিণ্টু অযথা বাইরের মানুষের মতো আচরণ করছে, দেবজ্যোতির কাছে এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছু হ'তে পারে না।

দেবজ্যোতি গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—এখন আমি চলি। শোনো, আবার আসবো বেলা তিনটে নাগাদ। কাকামনিকে বোলো ওঁর সঙ্গে খুব দরকারী কথা আছে।

দেবজ্যোতির মুখের পানে চেয়ে স্বগতভাবে মিণ্টু বল্‌ল—এর মধ্যেই চলে যাচ্ছ?

অভিমান-রুদ্ধস্বরে দীপু বল্‌ল—যাবে না ত কি, তুমি কেবল বকাবকি করছ!

—না রে পাগ্‌লী, বেলা হয়েছে। ওঁরও ত ফেরার কোনো ঠিক নেই। কতক্ষণ আর বসে থাকব!

—বেশ, বেশ যাও। আমরাও তোমাদের মানিকপুর ছেড়ে গাঁয়ে চলে যাচ্ছি; তখন দেখাই পাবে না।

দীপুর ঠোঁট কেঁপে গেল কথাগুলো বল্‌তে বল্‌তে।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—সত্যি তোমাদের চলে যাওয়া ঠিক হয়ে গেছে মিণ্টু?

সংক্ষেপেই জবাব দিল মিণ্টু—হ্যাঁ!

—কবে?

—সপ্তাহখানেকের মধ্যেই। এখানে ত এভাবে থাকা যাবে না!

দেবজ্যোতি বল্‌ল—আচ্ছা মিণ্টু, কাকামনি কি স্থির সংকল্প করেছেন যে, উনি আর কোম্পানীর চাকরী করবেন না?

—তাঁর ইচ্ছে-অনিচ্ছের জন্যে কোম্পানী ত বসে থাকে নি। তুমি কি সেসব কিছুই জানো না?

মিণ্টুর এ প্রশ্নে দেবজ্যোতি খানিকটা যেন ভরসা পেল, বল্‌ল—জানি। তবে, উনি হয়ত একটু চেষ্টা করলে কোম্পানী আবার বহাল করত, সেটা আর করেন নি হয়তো।

—না তা করেন নি। তোমার কি মনে হয় যে, ভিখিরীর মতো সেইটাই ওঁর কর্তব্য ছিল?

—না, তা মনে করি না। তবে কি জানো, তোমাদের দিকে তাকালে—

—থামো দেবুদা, তোমার মুখে একথা মানায় না। মানিকপুরের সবাই যেভাবে যা ভাবে, তুমি অন্ততঃ সেইভাবে চিন্তা কর না। চাকরী করলে মনুষত্ব, মর্যাদা, সব-কিছু ভাসিয়ে দিতে হবে, এ আমি বিশ্বাস করি নে।

—ত্যাখো মিণ্টু, শুধু তোমাদের কথাই ভাবলে ত চলবে না। মানিকপুরের এই যে শ্রমিক-সংগঠনটা দলে-মুচ্‌ড়ে নষ্ট করে দিল ওরা, এটা পারল কি করে? যথার্থ মানুষের অভাবেই ত! কাকামনির মতো মানুষকে ওরা যদি সরিয়ে দিতে পারে তবে ওদের দুর্ভাবনা অনেক কমে যায়। উনি ফেডারেশনের পিছনে থেকে যেভাবে সাহায্য করেছেন, সে সাহায্যটুকু শ্রমিকরা পাবে না। ধরো দু-চারজন কাজের লোককে বাছাই করে তালিম দেবার মতো বিচক্ষণ মানুষ ত আর কেউ থাকছে না। বাকী যারা তারা ত হয় নিজের কাজ গোছাতে ব্যস্ত, কিম্বা পালের গরুর মতো চলতে জানে। এই অবস্থায় কি ওঁর অভিমান করে চলে যাওয়া খুব সদ্‌যুক্তির কাজ হচ্ছে?

দেবজ্যোতির কথাগুলো মিণ্টু খুব মন দিয়ে শুনছিল। তাকে থামতে

দেখে মিণ্টু একটু ভেবে নিয়ে বল্‌লে—কিন্তু দেবুদা, তোমার আদর্শ-কথা আর এখানকার শ্রমিকসমাজ এক পথে চলে না যে! যেভাবে ধর্মঘট শুরু হয়েছিল—তার সঙ্গে কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে কোম্পানীর গোলামীতে ফিরে যাওয়ার কোনো সামঞ্জস্য নেই। তা ছাড়া ঘোষালদা চলে যাওয়াতে বাবার মন ভেঙে গেছে। তুমি ত জানো ওঁকে বাবা কী স্নেহ করতেন! বাবা বলেন, আর হবে না। অমন মানুষ এক যুগে অনেকগুলো জন্মায় না। আর সেই মানুষকে এরা ক্ষমতার লোভে স্বচ্ছন্দে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিল। এ তো একটা মানুষকে খুন করা নয়—মনুষ্যত্বকেই হত্যা করা!

বল্‌তে বল্‌তে মিণ্টুর দু-চোখ উপ্‌ছে অশ্রুরাশি নামলো। ও আর একটি কথাও কইতে পারল না—কিন্তু সেই বেদনাস্রোতে ভেসে যাওয়া মুখখানি তুলে ধরল দেবজ্যোতির চোখের পানে। মিণ্টু মুখ লুকোলো না—এ কান্নায় লজ্জা নেই, সংকোচ নেই।

দৃপ্তকণ্ঠে দেবজ্যোতি বল্‌ল—না মিণ্টু ভেঙে পড়লে চল্‌বে না। তুমি কাকামনিকে বুঝিয়ে বলো উনি যেন হঠাৎ কিছু না করেন!

—আর ত হয় না দেবুদা! ওরা একমাসের মাইনে মিটিয়ে দেবে আগামী বৃহস্পতিবার, তারপর আর একটি দিনও কোয়ার্টারে থাকার অধিকার আমাদের নেই। যাওয়া ছাড়া অন্য পথ নেই।

—আছে—আছে।

—বুঝেছি। কিন্তু এরপর আর কারুর বাড়িতে আমরা থাকতে পারবো না! তাতে হয়তো আশ্রয়দাতারই চাকরীতে টান পড়বে। বৌদি আর খোকনও ত রয়েছে এখানে। ওঁদেরও একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

মিণ্টুর চোখের সামনে সবটুকু ভবিষ্যৎ যেন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে!

দেবজ্যোতি বল্‌ল—আমি যা বলি সবটা শুনে নাও আগে, তারপর তোমার যা বলবার বোলো।

—বেশ, বলো।

—মল্লিকসাহেবের সঙ্গে আমার আজ সকালে কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, যদি কাকামনি একটা চিঠি লেখেন—

—মানে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এই ত বল্‌তে চাইছ ?

—হ্যাঁ, তাই দাঁড়াচ্ছে বটে, তবে ও তরফ থেকে বহাল করার ইচ্ছেটা ষোল আনা রয়েছে এটাও ঠিক।

—কিন্তু দেবুদা, তুমি কি মনে করো যে সেটা সম্ভব? আমিই বাবাকে বারণ করেছি, নইলে এর আগেও এরকম প্রস্তাব এসেছে।

মিণ্টু কথা কইতে কইতে একবার বাইরের দিকে তাকালো—কে? ও আপনি,—আসুন নিখিলবাবু!

বছর চব্বিশের একটি যুবক ঘরে ঢুকল।

মিণ্টু বল্‌ল—আলাপ করিয়ে দিই—নিখিল রায়, আর ইনি আমাদের দেবুদা—

নিখিল নমস্কার করল—আপনার কথা অনেক শুনেছি, অনেকের কাছে শুনেছি; কিন্তু এত অল্প বয়স, সেটা অনুমান করতে পারি নি!

দেবজ্যোতি হাসল, তারপর বল্‌ল—আচ্ছা, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো! খুব পরিচিত চেহারা, হ্যাঁ মন্দাকিনীদের ওখানেই যেন একদিন গিয়েছিলেন!

নিখিল বল্‌ল—মন্দাকিনী কে? ঠিক চিন্‌তে পারছি না ত?

মিণ্টু বল্‌ল—মল্লিকসাহেবের মেয়ে!

নিখিল একটু অপ্রতিভ হয়ে যায়—হ্যাঁ, মানে একদিন কি যেন দরকারে যেতে হয়েছিল!

মিণ্টু হাঁক দিল—বাদল, দীপু—নিখিলদা এসেছেন।

পরক্ষণে দীপু একাই বেরিয়ে এল—আসুন নিখিলদা, আজ একটা নয়, দশটা গল্প চাই, চলুন ওঘরে!

যাবার পথে দীপু একবার মুখ ঘুরিয়ে দেবজ্যোতিকে ভেংচি কেটে গেল।

দেবজ্যোতি হাসি সাম্‌লে মিণ্টুকে বল্‌ল—ভাখো, সব দিক বিবেচনা করে আমার ত মনে হয় মানিকপুর ছেড়ে চলে যাওয়া তোমাদের ঠিক হবে না।

—মানিকপুর ছাড়াও দুনিয়া অনেক বড় দেবুদা! সত্যি বল্‌ছি, একবছর আগেও হয়তো ভাবতে পারতাম না যে মানিকপুর থেকে জীবনে কোনোদিন

চলে যেতে পারব! কিন্তু এই এক বছরে বয়েস যেন অনেক বেড়ে গিয়েছে, ছুনিয়া কতো বদ্‌লে গিয়েছে! এখন মনে হয় গাঁয়ে চলে যাই। সেখানে হয়তো এত স্বার্থের কামড়াকামড়ি নেই। মানুষ সেখানে এত বদলে যায় না।

দেবজ্যোতি বাধা দিল—মিণ্টু, তুমি অভিমান করতে পারো কিন্তু অবিচার করো না। মানুষ বদলে যাচ্ছে বল্‌ছ, সে মানুষগুলোর মধ্যে আমাকেও ধরেছ মনে হচ্ছে।

—আমি বিশেষ করে তোমারই কথা বল্‌ছি নে। তবে তুমিও বদলেছ।

—এটা তোমার ভুল। তা যদি হ'ত তবে আজ—

—আহা বদল হওয়াটা ত অস্বাভাবিক কিছু নয়,—বরং চিরকাল অবিকল এক রকম থাকাটাই অস্বাভাবিক। তবু কেন মন সায় দেয় না।

দেবজ্যোতি একটু হাসল—তোমার এই যুদ্ধ-ঘোষণার খবর পেতে আর একটু দেরী হলেই হয়েছিল আর কী!

—কি আর হ'ত! তা ছাড়া এ তো যুদ্ধ নয়, নিজের মনের সঙ্গে বোঝা-পড়া। তুমি বড়ো হবে, তোমার নামখ্যাতি দূর গাঁয়ে যখন পৌঁছবে তখন শুনবো, আনন্দও হবে, না হয় নাই বা রইলাম আমরা তোমার মনে!

দেবজ্যোতি দেখল মিণ্টুর পাত্‌লা ঠোঁটের কাঁপন, বল্‌ল—হয়েছে-হয়েছে! আমি এবার ফি দফায় তোমাদের এখানে হাজরি বজায় রাখবো ভাই!

মিণ্ট মুখ তুলতে পারে না, মাটির পানে চেয়েই বল্‌ল—না, না, এ আমার ছেলেমানুষী দেবুদা! সত্যি বল্‌ছি, তোমার ওপর আমাদের সবারই অনেক ভরসা। বেঁধে রাখার মতো ছোট মন নিয়ে তোমাকে আগলে রাখা ঠিক নয়, বুঝি।

—হয়েছে-হয়েছে। এখন কাকামনিকে রাজী করিয়ে ফ্যালো দেখি!

—ক্ষমা চাইবেন উনি? এ কথা কি করে বল্‌ব দেবুদা? জীবনে কোনো দিন উনি কারুর কাছে মাথা হেঁট করবেন, এ যে কল্পনাই করতে পারি নে। গরীবের ত ধনদৌলত কিছুই পুঁজি থাকে না, এই মনুষ্যত্বটুকুই তার একমাত্র সম্বল—বাবা তাই শিখিয়েছেন, আমিও এখন বিশ্বাস করি মনেপ্রাণে!

দেবজ্যোতিকে সমস্যার সমুদ্রে কে যেন ঠেলে ফেলে দিয়েছে!

সে বিমর্ষ ভাবে চৌকী ছেড়ে উঠে পায়চারী করতে লাগল।

নিখিল বেরিয়ে এল পাশের ঘর থেকে। মিণ্টুকে সে বল্‌ল—আমি চলি এখন। আপনি সান্যাল মশাইকে একটু বলবেন—বড্ড দরকার।

মিণ্টু স্মিত হাস্যে জবাব দিল—আপনি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যের মধ্যে পেয়ে যাবেন।

—আচ্ছা দেবুদা, নমস্কার! আবার দেখা হবে। আপনার সঙ্গে আলাপের ইচ্ছে অনেক দিনের।

নিখিলের কথার জবাবে ছোট্ট নমস্কার চুকিয়ে দেবজ্যোতি চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল। নিখিল চলে যেতেই দীপু এসে ঢুকল। একবার দেবজ্যোতির মুখের দিকে, একবার দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে দীপু দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

—আচ্ছা মিণ্টু, তাহলে কি হবে?

—যা হয় হবে, এখন অনেক বেলা হয়েছে। জ্যাঠাইমা তোমার জন্যে না খেয়ে বসে থাকবেন, বাড়ি যাও। পারো তো বিকেলের দিকে এসো।

—না, না, আমি সেকথা ভাবছি না। তোমাদের চলেই যেতে হবে? অন্য উপায় নেই! নাঃ, কই আর আছে! তাহলে মানিকপুরের দানব-রাজ্যে মানুষ আর থাকছে না।

দেবজ্যোতির একথায় মিণ্টু জিভ্‌ কেটে বল্‌ল—ছি-ছি সে কি কথা! মানুষ সবাই মানুষ। কিন্তু তাদের মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে কোনরকমে বেঁচে থাকার অভিলাষী।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ বেঁচে থাকা কাকে বলে? বল্‌তে পারো?

—তুমি আমার চেয়ে ভালো জানো।

—এরা সবাই এত বড় ভুলের বোঝা বইবে নির্বিবাদে, বলে দিলেও হুঁশ্‌ হবে না যে ওরা বেঁচে নেই—কোনোরকমে ধুঁক্‌ছে, টিকে আছে! কাকামনি একাই বা থেকে কি করবেন? ওদের চৈতন্য জাগাতে হ'লে আরও মানুষ চাই। বুঝেছি।

মিণ্টু হাসল—আরে বাপু এখুনি তাবলে তাড়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না। আরও ক'টা দিন আয়ু রয়েছে, সেটুকু ভোগ করতে দাও!

—বেশ, বেশ তাই করো, আমি এখন চলি।

মিণ্টু হাসল—দেবুদা, তুমি এখনো ছেলেমানুষই রয়ে গেলে! ভাবছো বুঝি তোমার ওপর রাগ করেই চলে যাচ্ছি। আচ্ছা, তাই কি পারা যায়? নিজের হাত থেকে মানুষ পার পায়? কথা তা নয়, মানিকপুরে আর আপন বল্‌তে ত কেউ নেই বাবার—যারা রয়েছে তাদের ওপরও কোম্পানী বজ্র হেনেছে। সারথী, ইস্‌মাইলের দল জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে বটে, কারখানাতে এখনো তাদের নেওয়া হয় নি। ওরা বাবার অন্ধ ভক্ত, বাবা যদি চলে যান তবে ওরা যে কি করবে তাই ভাবি। চাকরী ওরাও নেবে না, বণ্ডে সই করবে না—মাঝখান থেকে ওদের মা-বোন-বৌ-ছেলে-মেয়ে উপোস করে মরবে।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—কাকামনি কিছু ঠিক করেছেন নাকি?

—না, এখনো পারেন নি ভেবে উঠ্‌তে। ছাখো, এখানে আমার আর ভালো লাগে না। সবাই এরকম পর-পর দূর-দূর চোখে ছাখে, ভাবতে গেলেই মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। অথচ ধর্মঘটের সময় আমরাও ত কম কষ্ট সহ্য করি নি! বাবার যা কিছু সামান্য জমানো টাকাকড়ি ছিল, সবই ওদের কাজে লেগে গেছে! সে সব ভুলে গেল!

—মিণ্টু, সেটা ওদের দোষ নয়, দোষ আমাদের। আমাদেরই মধ্য থেকে কয়েকজন উল্টোরকম বুঝিয়েছি। পরাধীনতার দোষ, অশিক্ষার দোষ ভাই। সে জন্যে তুমি রাগ করলে ত চল্‌বে না, তাহলে কাজ করবে কি করে? অভিমান ছাড়তে হবে। অবিশ্যি মুখে যেটা বল্‌ছি, কাজের বেলায় আমিও হয়তো সেটা পারব না।

এমন সময়েই দীনদয়ালের উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল—কই রে মা জননী! আয়, আয়, আজ আমার মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে দে!

দেবজ্যোতির চোখে মুখে উজ্জ্বল আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠ্‌ল। সে দরজাটা খুলে দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল দীনদয়ালকে।

দীনদয়াল উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন—আয় আয় দেবা পাগ্‌লা! তারপর কোত্থেকে? এ্যাঁ! আর এ বাড়ির চৌকাঠ ডিঙিয়েছিস! জানিস না কত বড় অপরাধ করেছিস্! যাক্ তারপর—এমন শুকনো মুখ ক্যানো রে, এ্যাঁ!

—না, মুখ বেশ তাজাই আছে কাকামনি। আপনি কেমন আছেন?

—খাশা আছি ব্যাটা! কিন্তু মিন্টি আজ আমাকে ধরে মারবে রে! আমি মায়ের অমতে একটা কাজ করে ফেল্লাম বাবা!

মিণ্টু একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে—কি হয়েছে বাবা? আমাকে এত ভয় কবছ কেন?

—আরে বাপরে, তোকে ভয় করব না বলিস কি? তোর যা দাপট! জানিস দেবু, মায়ী আমার পণ করে বসে আছে মানিকপুরে থাকবে না, বণ্ড-ফণ্ড সই করা চল বে না! কিন্তু কি করি বল্‌তো, রামধারীরা কিছুতেই সই করল না, আজকের দিনটি মেয়াদ,—এরপর কোম্পানী আর কাউকে নেবে না। শেষ কথা। অথচ অতগুলো অপোগণ্ড নিয়ে ওরা পথে দাঁড়াবে! বেঁচে থাকতে সে আমি চোখে দেখতে পারব না! তাই—

মিণ্টু আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—সই করেছ?

—হ্যাঁ মা, আমিই প্রথম সই করলাম। তারপর ওরা সব্বাই করল। কিন্তু এছাড়া ওদের বাঁচবার যে পথ ছিল না।

দীনদয়াল মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিলেন—তোদের জন্যে ত ভাবিনে মা। কিন্তু আর সবাই যে একজোট হয়ে বল্‌ল, গুরুজী সই না করলে ওরা কেউ সই করবে না। সারথী, ইস্‌মাইল, মুকুন্দন, হরিপদ সবাই আমার মুখ চেয়ে বসে আছে। ওদের ছেলে, মেয়ে, বৌ, সবাই তো তোদের মতো নয়! ও নিয়ে মন খারাপ করিস নে মা! আবার ওদিকে সুভাষবাবু লিখে পাঠিয়েছেন, আপাততঃ সবাই কাজে লেগে পড়ুক, উনি দায়িত্ব নিচ্ছেন যাতে সুবিচার হয় তার চেষ্টা অবিশ্যি করবেন।

দেবজ্যোতি এতক্ষণ চুপ করে দীনদয়ালের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। এবার বল্‌ল—আমি এখন আসি কাকামনি, ওদিকে আবার ট্রেণের সময়—

—আজই বর্ধমান যাবে নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা জ্যোতি, তুমি আমার একটা উপকার করতে পারো?

—আদেশ করুন।

—নাঃ, থাক্, তোমার অসুবিধা হবে।

—অসুবিধা হবে না আপনি বলুন। নইলে খুব অস্বস্তিতে থাকব।

দীনদয়াল বিব্রত ভাবে বললেন—তা নয়, মানে, আমাকে যদি কারখানার কাজে যোগ দিতেই হয়, তবে কাল থেকেই হবে—এখন কথা হচ্ছে যে, অমলা আর তার ছেলেকে কলকাতায় রেখে আসার কি করা যায়! ভেবেছিলাম যে, আমাদের যখন কোয়ার্টার থেকে চলেই যেতে হবে তখন আর ভাবনা কী—এখান থেকে রসুলপুরে সবাই মিলে রওনা হবো। তারপর ওখানে দু-চার দিন কাটিয়ে অমলাকে কলকাতায় ওর মায়ের কাছে পৌঁছে দেবো আর কাজকর্মের চেষ্টাচরিত্রও শুরু করব! এখন ত সব ওলট-পালট হয়ে গেল। অমলার মা বিধবা, উনি যে কাউকে পাঠিয়ে মেয়েকে নিয়ে যেতে পারবেন, তা মনে হয় না। সেই জন্যেই ত, কারখানা বন্ধের সময়ে নিরঞ্জন কাজকর্মের চাপে পড়ে ওকে রেখে আসতে পারে নি বলে বেচারীর যাওয়াই হয় নি!

—বেশ ত আমি ওঁকে পৌঁছে দিয়ে কালই বর্ধমানে ফিরব। আপনি ঠিকানাপত্তর বুঝিয়ে দেবেন।

—আমারই যাওয়া উচিত। কিন্তু বেচারী খুব মনমরা হয়ে পড়েছে, তবু মায়ের কাছে গেলে হয়তো শান্তি পাবে। আর আমি যে কবে যেতে পারব জানি না। যাক সে ব্যবস্থা করা যাবে যা হয়।

—না কাকামনি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমিই বৌদিকে পৌঁছে দেবো। আজ ওঁর তৈরী হতে অসুবিধে থাকলে না হয় কালই যাবো।

—না, না, কাল নয় আজই যেতে পারবেন বৌদি।

মিণ্টু বলল।

—তাহলে আমি বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

দীনদয়াল আপত্তি করলেন—তুমি এ দায়িত্ব নিয়ো না, দেবু। তোমার বাবা এটা ঠিক পছন্দ করবেন না।

কিন্তু দেবজ্যোতি সে কথা হেসেই উড়িয়ে দিল, বল্‌ল—আপনি ত এখন আর কোম্পানীর শত্রু নন্—বাবার আর আপত্তি হবে কেন?

একুশ

সকাল থেকে ঘোরাঘুরি করে দেবজ্যোতি রীতিমত শ্রান্ত হয়েই বাড়ি ফিরল। মা অনুযোগ করলেন বড় বেলা হয়ে গেছে খোকা! পিত্তি পড়িয়ে অসুখ বাধাবি শেষে! হ্যাঁরে মামীদেরও এমনি জ্বালাতন করিস্ ত?

দেবজ্যোতি হেসে বল্‌ল—না গো মা, তোমার ওপর একটু জুলুম করতে যে বড্ড ভালো লাগে!

আহারের পরই দেবজ্যোতি ঘুমিয়ে পড়েছিল! ঘুম থেকে উঠে বৈঠকখানাতে ঢুকেই সে দেখল, মুকুল আর অবিনাশ বসে রয়েছে। তাকে দেখে মুকুল উঠে দাঁড়াল, আর অবিনাশ বসে থেকেই দু-হাত তুলে নমস্কার করল, বলল—আপনার সঙ্গে আলাপের ইচ্ছে অনেক দিনের। কিন্তু আমার এমনই কপাল যে দেখাই পাই না।

দেবজ্যোতির স্বভাবসিদ্ধ হাসিটুকু ফুটল না, সে গম্ভীর ভাবে জবাব দিল—কেন, আপনার সঙ্গে ত এর আগে পরিচয় হয়েছে, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন?

অবিনাশ প্রতিবাদ করল, বেশ জোর গলায় বল্‌ল—আপনি নিশ্চয় ভুল করছেন। আমার স্বভাবই তেমন নয়, একবার যাকে দেখি তাকে কখনও ভুলি না। এ বাড়িতে আমার এত কালের গতায়াত, আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা এদের কাছে শুনেছি, কতো গল্প শুনেছি, কিন্তু চাক্ষুষ কখনও আপনার দর্শন পাই নি।

দেবজ্যোতির দিকে মুকুল এক ভাবে তাকিয়ে লক্ষ্য করছে। ওর মনে হ'ল যেন দাদা এই লোকটিকে যে কোনও মুহূর্তে একটি ঘুষি মেরে ধরাশায়ী করে দেবে!. দেবজ্যোতির দুই চোয়ালের কঠিন ভঙ্গীতে উত্তেজনা রোধের চেষ্টা প্রতীয়মান—তার হাবভাব বুঝতে মুকুলের আদৌ বিলম্ব হয় না। মৃদু কণ্ঠে মুকুল বল্‌ল—দাদা!

দেবজ্যোতি একবার বোনের দিকে তাকিয়ে একটু হাস্‌ল। তারপর বল্‌ল—দেখুন অবিনাশবাবু, আমিও সহজে কাউকে মনে রাখি না। কিন্তু আপনাকে চিন্‌তে আমার একটুও ভুল হয় নি। নিজের বাড়িতে আর অপমান করব না; তবে জেনে রাখুন, সেদিন আদালতে যে মিথ্যে সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন আপনারা, সেটা খুব ভালো কাজ করেন নি। বর্ধমান কোর্টের গাছতলায় দাঁড়িয়ে মানবতার দোহাই দিয়ে আমি এবং আমার বন্ধুরা আপনাদের কত করে বোঝাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু শোনেন নি সে কথা! অথচ আপনাদের মিথ্যেটা ফাঁস হয়ে গেল। ইস্‌মাইল, সারথী বা কাউকেই খুনী সাব্যস্ত কবতে পারলেন না। কি লাভ হ'ল এতে? এবার বুঝলেন ত আপনাকে আমি ঠিক চিনে রেখেছি!

অবিনাশ নির্লজ্জের মত উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল—চাকরীর খাতিরে সত্যি-মিথ্যে বাছবিচার করতে গেলে চলে না ভাই! এই ত দেখুন না. এমন কায়দায় সাক্ষী দিলাম যে, সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না, অর্থাৎ কিনা ওরাও শাস্তি পেল না আর আমারও একটা লিফ্‌ট হয়ে গেল। ক্যাশ্‌ লাভ মান্থলী টুয়েন্টিটু রুপীজ এইট অ্যানাস—লাভ নয়?

—আপনাদের উন্নতির নিরীখ যাই হোক, আপনারা যে অমানুষ এটুকু পরিচয় সেদিন দিয়েছেন।

অবিনাশের হাসিতে তবুও ছেদ পড়ল না, সে বল্‌ল—সম্পর্কে আপনি বড়, কিন্তু বয়সে ছোটই হবেন। তা অমানুষকে মানুষ করার ভার নিজে না নিয়ে নিজের বোনকে দিয়েছেন এতেই আমি খুশি!

দেবজ্যোতি ভ্রূকুঞ্চিত করে একবার বোনের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—আচ্ছা আপনারা গল্প করুন, আমার আবার ট্রেনের সময়, তাড়া আছে!

দেবজ্যোতি বাড়ির ভিতর চলে গেল, মুকুলও তাকে অনুসরণ করল।

মায়ের ঘরে দেবজ্যোতি এসে দাঁড়াতেই মল্লিকা দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—কি হয়েছে তোমার? সব সময় অমন মনমরা হয়ে রয়েছ কেন দাদা?

দেবজ্যোতি হেসে বল্‌ল—না কিছু নয়, দুনিয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছি না।

মুকুলও এসে পড়েছে। পিছন থেকে উত্তর দিল—তার জন্য দুঃখ করে কি লাভ দাদা, যে যার নিজের রাস্তা খুঁজছে।

—ছাখো মুকু, দুঃখ আমি করতে শিখি নি। যেটা অন্যায় মনে হবে তাকে মেনে নিতে পারব না। ওই যে লোকটা এ বাড়ির বৈঠকখানাতে বসে আছে, ওকে আমি সমাজের শত্রু, মানুষের শত্রু বলে মনে করি। ভবিষ্যতে ওকে এ বাড়ির ছাদের তলায় দেখলে বুঝব, এখানে আমার স্থান নেই। শুধু তোমার মুখরক্ষার জন্যেই সোজাসুজি গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিই নি, যদিও সেটাই উচিত ছিল। ওরা আমাদের ভদ্রতার সুযোগ নিয়েই আমাদের সর্বনাশ করে।

মল্লিকা ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

মুকুল বল্‌ল—কিন্তু এবাড়ি থেকে বার করে দিয়ে তোমার কি লাভ হ'ত শুনি! স্পষ্ট কথা যদি শুনতে চাও ত বল্‌ব, কোনো মানুষেরই সবটুকু খারাপ হয় না, তার মধ্যে কিছু মনুষ্যত্ব বেঁচে থাকে। তা যদি না হ'ত, তবে আজ আমি কোথায় দাঁড়াতাম শুনি! কথাগুলো বেহায়ার মতো শোনাবে, তা হোক—বয়সও আমার ঢের হয়েছে। এই যে এত বড়টা হলাম, কই আমার বাবা বা আমার বড়ভাই তুমি, কি করেছ আমাদের তিন বোনের জন্যে? সামাজিক কর্তব্য কি শুধু দু মুঠো অন্নেই শেষ হয়ে যায়?

মল্লিকা বাধা দিল—তুমি থামো ত দিদি, আজকাল কেবল ওই এক তোমার বুলি হয়েছে!

দেবজ্যোতি মাথার চুলে ঘন ঘন হাত বুলিয়ে, নিজের বিচলিত ভাবটা সামলাবার চেষ্টা করে, বলে—ও, তাহলে সামাজিক দায়িত্ব গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তোমার ওই অমানুষের সঙ্গে মাখামাখির বন্দোবস্তে! এঁ্যা! তা বেশ, সেটাই যদি বড় বলে বুঝে থাকো তবে সারতত্ত্বে পৌঁছে গেছ।

—তুমি অযথা আমার ওপরে রাগ করছ দাদা। তোমার মনের চৌহদ্দী অনেক বড়। কিন্তু আমাদের জীবনে কি আছে, একবার ভেবে দেখেছ? দিনরাত এই মানিকপুরের ক'খানা ঘরেই জীবনটা বাঁধা। লেখাপড়াই কি শেখার তেমন সুযোগ পেলাম! যা হয়েছে তাতে এক দিক দিয়ে ভালোই হবে, তোমাকে মুক্তি দিতে পারব ত! অবিনাশ যেমনই হোক, আমার বাবাকে

মেনে নিয়ে তাঁর কিল-চড়-লাথি খেয়ে যখন মানিয়ে চল্‌তে পেরেছি—তখন অবিনাশকে নিয়ে চলাও আমার শক্ত হবে না দাদা!

—কি মল্লিকা, তোরও জীবনতত্ত্ব ওই রাস্তাতেই এগিয়ে গেছে নাকি? বাঃ, তোরাও বেশ মানুষ হয়ে উঠেছিস! তা একদিক দিয়ে ভালো। বাবা তো কারখানার ষড়যন্ত্রে ঢুকে কাজ গুছোবার তালে আছেন—এখন তাঁর পরিবার চুলোয় গেলই বা!

মুকুল ধীর ভাবে বল্‌ল—সবটুকুর জন্যেই বাবাকে দায়ী করা কি ঠিক? এই যে তুমি মানিকপুরে পা দিয়েই মল্লিকসাহেবের বাংলোতে দৌড়ও, মন্দাকিনীর খবর নিতে—এর জন্যেও কি বাবা দায়ী? আর এই যাওয়ার পিছনে যে টান, সেও কি আমাদের মতো নয়?

দেবজ্যোতি নীরব কটাক্ষে মুকুলের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মল্লিকাকে বল্‌ল—আমি রাত্রের গাড়িতে কলকাতা যাবো, মাকে বল্‌।

মুকুল নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মল্লিকা বল্‌ল—দিদির ওপরে রাগ করে যাচ্ছ দাদা?

—না রে না, কাজ আছে।

—কলকাতায় আবার হঠাৎ কি কাজ পড়ল? এই যে ও-বেলা বল্‌লে দু-তিন দিন থাকবে!

—কাকামনির ওখানে গিয়ে শুন্‌লাম উনি কারখানায় আবার বেরুচ্ছেন কাল থেকে। এদিকে ঘোষালদার স্ত্রী অমলা বৌদি আর তাঁর বাচ্ছাকে কলকাতায় পৌঁছে দেওয়া দরকার, কে যাবে?

—আহা বেচারীর ভাগ্য! ঘোষালদা ত চলে গেলেন, এখন বৌদি এই কচি বাচ্ছাটাকে মানুষ করবে কি ভাবে?

দেবজ্যোতির মা ঢুকলেন ঘরে—কার কথা হচ্ছে হ্যাঁরে? ও অমলা বৌমা! তবু ত কোলে একটা রইল এই সান্ত্বনা! তাকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে, খাওয়াবে নাওয়াবে, মানুষ করবে! হ্যাঁ, শুন্‌লাম নাকি দেবতা আমাদের ওপর গোঁসা করে আজই কলকাতা পালাচ্ছেন—হ্যাঁরে পাগ্‌লা! ছোট বোনের কথায় কি রাগ করতে আছে?

দেবজ্যোতি মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—না মা, রাগ করে চলে যাবো এত ভীতু হইনি। সত্যি, কাজ পড়ল ঘাড়ে। ওই বৌদিকে পৌছে দিতে যাচ্ছি।

—চুপ-চুপ বাবা, ও নাম মুখে আনিস না—বাড়ির মা-মনসা এখুনি শুন্‌লে অনর্থ বাধিয়ে বসবেন! আজকাল আবার মেজাজটা সাহেবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেগে গেলে মূর্ছো যান, কি যেন বলে ব্লাড-প্রেশার না কি, সাহেবী অসুখ, তাই হয়েছে। হবে না, দিনরাত সাহেবদের সঙ্গে ওঠ-বস করেন ত!

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মা বল্‌লেন—তাহলে মুকু যে বল্‌লে ওর ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছিস, সেটা ঠিক নয়? যাক বাপু, আদুরী বোনকে একটু বুঝিয়ে বলে যেয়ো, রান্নাঘরে গিয়ে সে ত ডুক্‌রে কাঁদছে। অবিনাশকে কি সব যা-তা বলে তাড়িয়ে দিল, জানি না! আর বাবা, বুড়ো বয়েসে এত সয় না আমার। কবে যে তোরা সব বিয়ে-থা করবি, কবে ভগবান আমাকে মুক্তি দেবেন, তা তিনিই জানেন! দেবিকা যে সেই দুপুরে বেরিয়ে গেল, এখনও পর্যন্ত ফেরার নাম নেই।

মল্লিকা মাকে থামতে দেখেই বল্‌ল—জানো দীনুকাকা কারখানায় যাবেন কাল থেকে!

—তাই নাকি? তবেই ত্যাখো মা, সৎপথের পথিককে ভগবান ঠিক এগিয়ে নিয়ে যান!

—ওই ভগবানের ভরসায় থাকলে আজ বুঝি আর মায়ের হাতের রান্না খেয়ে যাওয়া ঘটবে না। মল্লি, তুই যাবি নাকি রান্নাঘরে?

—হ্যাঁ, চিরটা কালই ত মল্লি তোকে রেঁধে খাইয়েছে,—বাঁদর ছেলে! তা যা বল্‌ছিলাম, কর্তার সাম্‌নে তোমার কলকাতায় যাওয়ার কথাটা বলে আর কাজ নেই। কি হবে বুড়ো মানুষকে ক্ষেপিয়ে বাবা! তা ছাড়া সত্যিই ব্যারামটার রকম-সকম আমার ভালো ঠেকছে না, তুই নিজে ত ডাক্তার হচ্ছিস, একবার দেখিস ত বাবা!

বলেই দেবজ্যোতির মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বোধকরি ছেলেমেয়ের সাম্‌নে স্বামীর সম্বন্ধে দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়াতে তিনি লজ্জিত হয়েছেন।

দেবজ্যোতি বিমর্ষভাবে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। সে মনে মনে সীতানাথ মুখুয্যের চেহারাটা খুঁজতে লাগল। আজও একবার দেখা হয়েছে বটে কিন্তু কই মুখের দিকে ত তাকিয়ে হ্যাখে নি দেবজ্যোতি! পিতার প্রতি নিজের আচরণে সে এই প্রথম ব্যথিত বোধ করল। আশ্চর্য, মানুষটাকে নিজের আদর্শবাদের জন্য এতই ঘৃণা করে যে সাম্‌না-সামনি দেখা হয়ে গেলেও তাকিয়ে হ্যাখে না দেবজ্যোতি! মায়ের মনের উদ্বেগ তাকে যেন ধাক্কা দিয়ে জাগাতে চাইছে! দেবজ্যোতির মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে সীতানাথকে ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে সে!

কতকাল যে সীতানাথের মুখের দিকে চেয়ে হ্যাখে নি দেবজ্যোতি, তা মনেই পড়ে না! অথচ ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে কুস্তী লড়ত। ছোট একখানা ঘরের মধ্যে ছিল এই বিশ্ব-সংসারটা—নড়বড়ে তক্তপোষখানা তখন কতই না বড় বলে মনে হ'ত! সেই তক্তপোষই ছিল কুস্তীর আখড়া, সেখানেই দেবজ্যোতি কল্পিত চোর-ডাকাতদের ভীষণ লড়াই করে তাড়িয়েছে—কাঁথা বালিশ মেঝেময় ছড়িয়েছে। মায়ের কাছ থেকে মৃদু তিরস্কার শুনে অবাক হয়ে বলেছে—দেখচ্ না ওরা সব ভীষণ ডাকাত—ভীম, রাম, রঘু সবাই হেরে গেছে! আর আমি জিতেছি!

যে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেবজ্যোতি নিজেকে রাজনীতির ঢেউএ ষোলআনা ঢেলে দিতে পারে নি, সেই মা তাকিয়ে রয়েছেন ওই বিচিত্র জটিল চরিত্রের মানুষটির দিকে।

দেবজ্যোতি হঠাৎ আজ আবিষ্কার করল সীতানাথ মুখুয্যের জীবনটাও কম মূল্যবান নয়! বরং দেবজ্যোতির নিজের জীবনের চেয়েও যেন এই চক্রান্তকারী, নীতিহীন মানুষটার দাম এ সংসারে ঢের বেশি। সীতানাথ যদি আজ চোখ বোজেন, তাহলে এই পরিবারের সব কটি প্রাণী অসহায় হয়ে কোথায় তলিয়ে যাবে তা কি দেবজ্যোতি অনুমান করতে পারে? তার আদর্শবাদ ত এদের মুখের অন্ন এনে দিতে পারে না! অবশ্য এই সামাজিক শূন্যতার মূলে বর্তমান অর্থনৈতিক গঠনও কম দায়ী নয়! এই অভাব-সৃষ্টির জন্য দায়ী মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনপতি। সবই ঠিক। দেবজ্যোতি রাজনৈতিক তত্ত্ব-বিশ্লেষণ দিয়ে

শ্রমিক পরিবারের অসহায়তার কারণটা খুঁজে বার করতে পারবে অতি সহজে কিন্তু ওইখানেই তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। সমাধানে, ব্যবস্থার পথ অন্যত্র খুঁজতে হবে। সে পথ এখনও আয়ত্তের বাইরে—এমন কি কল্পনায়ও সুদূর!

চিন্তার ঘোর কাটিয়ে একসময়ে সে বল্‌ল—বাবার শরীর খুব খারাপ হয়েছে না রে?

মল্লিকা বল্‌ল—এমনিতে দেখে বোঝা যায় না, তবে এক-এক সময়ে সব কিছু যেন গুলিয়ে ফ্যালেন! চোখের সামনে আমরা রয়েছি—ডাকলে সাড়া দিতে পারেন না। বুক ধড়ফড় করে, নিশ্বাস ফেল্‌তে কষ্ট হয়।

—হুঁ! তা কই আমাকে বলিস নি ত তোরা কেউ?

—ভুল হয়ে গেছে দাদা!

—তোদেরই বা দোষ দেবো কি, আমি নিজেও ত বাবাকে ভালোবাসতে ভুলে গিয়েছি।

কিছুক্ষণ আগে মুকুল যেসব কথা বলেছে, সেগুলো দেবজ্যোতির মনে পড়তে লাগল। সত্যি নিছক ভালো না হলেও মানুষের মধ্যে কিছু-না-কিছু সুজনতা থাকেই। নইলে সীতানাথ মুখুয্যের মতো মানুষকেও এই মুহূর্তে দেবজ্যোতি স্বীকার করতে পারল কি করে? তবে কি দেবজ্যোতিকে মানুষের সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন করতে হবে?

এই প্রশ্নটুকু সম্মুখে রেখেই দেবজ্যোতিকে সব কাজ করতে হ'ল। যথা সময়ে সন্ধ্যার একটু আগে-আগেই আহারাদি নিষ্পন্ন করল। মুকুলকে আদর করতে গিয়ে আজ দেবজ্যোতি অশ্রুসম্বরণ করতে পারল না। বিদায়ের সময়ে চোখের জলটুকু রইল না বটে, তবে সবাই কেমন বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল! এই বিষণ্ণতার মধ্যে এমন একটা গভীর অন্তরঙ্গতার সুর রয়েছে যার আস্বাদ এ পরিবারের সবাই অনেককাল পরে পেল। যাবার সময়ও দেবজ্যোতির সঙ্গে তার পিতার সাক্ষাৎ হ'ল না—তাঁর কী একটা জরুরী মিটিং আছে।

দেবজ্যোতি সবাইকে বার বার বলে গেল—বাবাকে কিছুদিন ছুটি নেওয়ার কথা তোমরা বুঝিয়ে বলো। আমিও শনিবারে আসতে চেষ্টা করব। ওঁর এখন বিশ্রাম দরকার। বুঝলে?

মা বল্‌লেন—ছুটি নিলে ত রক্ষে থাকবে না বাছা, বাড়ির মধ্যে অনবরত তুমুল কাণ্ড লাগিয়ে দেবেন। জানো তো মানুষটাকে—দু-দণ্ড সুস্থির হয়ে বস্‌তে পারেন না। তা হোক, যদি তাতে অসুখ সারে ত না হয় সেটা সইবে।

তারপর নির্লিপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—হ্যাঁ রে, তেমন ভয়ের কিছু নেই ত খোকা?

দেবজ্যোতি হেসে জবাব দিল—নাও, ওই চিন্তায় চিন্তায় তুমি আবার একটা কিছু বাধিয়ে বসো! ব্যস্ তাহলেই লেখাপড়া শিকেয় তুলে মানিকপুরে এসে আমি বসি!

—হ্যাঃ, আমার আর কাজ নেই, চিন্তা করব বসে বসে। তুইও যেমন! আর যদি তেমন তেমন হয়, তুই এখানে এসে হাত-পা গুটিয়ে বসলেই বুঝি সব ভালো হয়ে যাবে?

মুকুল এতক্ষণে মুখ খুল্‌ল—তবে যে বল্‌ছিলে দাদার ডাক্তারীতে বাবার অসুখ সারবে।

—মন মানে না তাই বলে ফেলি, ওসব কি আর ধরতে আছে!

দেবজ্যোতি মায়ের পায়ের ধুলো নিল। তিনি ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দাঁত দিয়ে ছেলের হাতের কড়ে আঙুল স্পর্শ করে বল্‌লেন—দুর্গা, দুর্গা! সাবধানে থাকিস্ বাবা! আবার ওঁর জন্যে বসে বসে দিনরাত চিন্তা করিস নে—আমরা ত রইলাম, আর এখন মানিকপুরে কে এক বোস সাহেব ডাক্তার এসেছেন, ধন্বন্তরি নাকি! তুই কিছু ভাবিস নে খোকা!

বাইশ

ট্রেনে বেশ ভিড়। দেবজ্যোতি একবার বল্‌ল—বৌদি, আপনাকে মেয়েদের গাড়িতে উঠিয়ে দিই, আরামে যাবেন!

অমলা ম্লান হাসিভরা দুটি চোখ তুলে বল্‌ল—অত আরাম সইবে না ভাই, এক যাত্রায় এক সঙ্গেই বেশ যাবো!

অবশেষে পুরুষদের গাড়িতেই ওরা মালপত্র নিয়ে উঠ্‌ল। অমলা এক কোণে নিজের ট্রাঙ্কের ওপর ছেলেকে কোলে নিয়ে বসেই প্রশ্ন করল—তোমার কি গতি হবে, ঠাকুর পো?

দেবজ্যোতি কুলীর পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বল্‌ল—এইটুকু পথ দেখ্‌তে দেখ্‌তেই কেটে যাবে।

দীনদয়াল এসেছিলেন স্টেশনে, তিনি বাইরে থেকে গাড়ির জানলা দিয়েই মুখ বাড়িয়ে বল্‌লেন—বুড়ো ছেলেকে ভুলে থাকিস্ না অমলা, কোনোরকম অসুবিধে হলে চিঠিতে জানাবি, বুঝলি?

অমলা অশ্রুসিক্ত দৃষ্টিতে তাকাল, বল্‌ল—আপনি কিন্তু ছুটী পেলেই যাবেন, আপনার দাদুকে দেখ্‌তে!

গাড়ি ছেড়ে দিল। স্টেশনের কোলাহল হারিয়ে গেল ইঞ্জিনের গর্জনে। দীনদয়াল আরও কি যে বল্‌লেন শোনা গেল না—শুধু তাঁর বিষণ্ণ, ক্লান্ত মুখখানা জেগে রইল অমলার মনে।

ইতিমধ্যে দেবজ্যোতি বেডিং-এর ওপর গুছিয়ে বসে পড়েছে।

অমলার একটা প্রশ্নে তার মৌনভঙ্গ হ'ল। অমলা বল্‌লে—আচ্ছা, ঠাকুরপো, সবারই ত এই অবস্থা হবে?

দেবজ্যোতি প্রশ্ন কর—কি অবস্থা?

—এই যেমন আমি চলে যাচ্ছি, একদিন সবাইকেই এভাবে চলে যেতে হবে ত? যত লোক মানিকপুরে কাজ করছে, ঘর-সংসার করছে—সবাইকেই ওরা তাড়িয়ে দেবে ত! যতদিন চাকরী ততদিনই সম্পর্ক—এ্যাঁ!

—হ্যাঁ, তাই !

—কিন্তু এমনটা কেন হবে! অবিশ্যি, আমার এ কথার কোনোই মানে হয় না। কোম্পানী ত কাজের সুবিধের জন্যেই ঘরদোর দেয় থাকতে। কাজ ফুরোলে আর কোন্ স্বার্থেই বা রাখবে! সবই বুঝি, কিন্তু তবু ভাবতে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে—যেখানে জীবনের শেকড় তলায় পৌঁছে যায়, সেখান থেকে উপড়ে ফেলা খুব কঠিন। থাকতে থাকতে এমন হয়ে গিয়েছিল যে, মনেও হ'ত না যে এমনি করে ফিরে যেতে হবে! এই যে কাকাবাবুর মতো মানুষ, বুড়ো বয়েসে কোথায় গিয়ে নিজেকে খাপ্ খাওয়াতে পারবেন, বলো তো !

দেবজ্যোতি মুখ বুজে সব কথা শুনছে। অমলার চোখ দিয়েই কোন্ বিচারক যেন মানিকপুরের মতো কারখানা-শহরের নির্মম চরিত্রকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উদ্ঘাটিত করে দিচ্ছে !

অমলা হঠাৎ থমকে গেল, বল্‌ল—আমি যে কি সব আবোল-তাবোল বকছি! রাগ কর না ভাই আমার কথায়—সত্যি মানিকপুর ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হচ্ছে কি না! আমার মন যেন এখানেই হাত-পা ছড়িয়ে বাকী জীবনটা কাটাতে চেয়েছিল! কলকাতায় এক মা ছাড়া আর কে ই বা আছে? আর এখানে আমার কতো আত্মীয়, এখানেই আমার সব। সব ফেলে রেখে চলে যেতে হচ্ছে।

আবেগে অমলার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। আর্তকণ্ঠে অমলা বলে উঠ্‌ল—না, না, আমি যাবো না। ফিরিয়ে নিয়ে চলো, মানিকপুরে না খেয়ে মরি সেও ভালো !

কোলের ছেলেকে অসহায়ভাবে আঁকড়ে ধরে করুণ হাসি হেসে অমলা বল্‌ল—ঠাকুরপো, মানুষ যা চায় তা কিছুতেই পায় না, তাই নয়? এক-এক সময় সেই কথাটা ভুলে যাই, আর তখনই সব এলোমেলো হয়ে পড়ে। ভাবি বুঝি, কেবল আমার বেলাতেই বিধাতা এমন দুঃখকষ্ট ঢেলে দিয়েছেন, কিন্তু তা ত নয়। ছাখো, তোমাদের ঘোষালদার কথাটাই যদি ধরি—তিনি চেয়েছিলেন, কারখানার সব মজুরদেরই ভাগ্য ফিরুক। লড়াই ত কম করেন নি! নাওয়া-খাওয়া ঘুম—সব বিসর্জন দিয়ে, মাসের পর মাস ভূতের মতো খেটে মরেছেন।

আমি অবুঝের মতো রাগারাগি করলে হেসে বল্‌তেন, সবার মতো তুমিও স্বার্থপর হয়ো না অমু! তোমার একার সুখ চেয়ো না, তাতে দুঃখই বাড়বে।—তাঁর চাওয়ার মধ্যে কোথাও এতটুকু খাদ ছিল না—কিন্তু সব উজাড় করে দিয়েও ত কণামাত্র প্রতিদান পেলেন না! একা আমারই ভাগ্য যা বদল হ'ল। আর সবাই ত আগের মতো রইল।

দেবজ্যোতি চিত্রার্পিতের মতো অমলার তন্ময় মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। রেলগাড়ির দোলা লেগে কোলের আরামে ছেলেটা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে! অমলা আপন ধ্যানেই যেন কথা বলে চলেছে—তারপর তোমার কথাই ধরো না কেন, মন্দাকিনীকে তুমি ভালোবাসো, একথা সবাই জানে—সেই জন্যেই ভয় হয় আমার, বুঝি বা ওকে তুমি পাবে না! অথচ তোমার মতো হীরের টুক্‌রো ছেলে কটা কে দেখেছে!

নিজের কথাটা এভাবে ওঠাতে দেবজ্যোতি অস্বস্তি বোধ করে। প্রবল আপত্তিতে তার মন প্রতিবাদ করতে চায়। অমলার মতো আরও অনেকেই ধরে নিয়েছে যে দেবজ্যোতি মন্দাকিনীর প্রতি গভীর প্রেমে আসক্ত। সে নিজে এরকম কিছু ত অনুভব করে না! কই তার আচরণের মধ্যে তেমন কিছু ত প্রকাশ হয় নি! অথচ দেবজ্যোতির বাড়ির সবাই, এমন কি বাইরের লোকেও এই ধারণা পোষণ করে। আসলে এই জাতীয় কোনো ব্যাপারে দেবজ্যোতি আদৌ লিপ্ত হতে চায় না। অমলাকে সে বল্‌ল—আপনার এ কথাটা আমি মান্‌তে পারছি না বৌদি!

অমলা বল্‌ল—তোমাকে আঘাত করতে চাই নি ভাই। তবে, যেটা ভয় হয় তা-ই বলে ফেলেছি। আমি ত খুশীই হবো—মন্দাকিনীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক, তা-ই চাই। কিন্তু যদি না হয়? বাধা আসবে চারদিক থেকে। আগে থেকে যদি এই সন্দেহটা মনে পুষতে পারো তবে হয়তো না-পাওয়ার কষ্টটা তেমন শেল হয়ে বিঁধবে না। আমি কিন্তু কোনোদিন সন্দেহ করি নি যে এই ঘর-দোর, পাড়ার কৃষ্ণচূড়া গাছকে ছেড়ে, তোমাদের সবাইকে ফেলে রেখে চলে যাবো। ভাবতেই পারি নি যে তোমাদের দাদা আমাকে একলা ফেলে রেখে চলে যাবেন! তাই এখন এক-এক সময় দম বন্ধ হয়ে আসে,—

এই ভাবনা যখন পেয়ে বসে! আগে যদি একটুও সংশয় থাকতো মনে, তাহলে—

—আপনার কষ্টের ভাগ যদি নিজের ঘাড়ে তুলে নেবার কোনো উপায় জানা থাকতো বৌদি, তবে নিশ্চয় নিতাম।

গভীর দরদে আবিষ্ট দেবজ্যোতি বল্‌ল।

অমলা হাসিকান্নায় মাখানো ভঙ্গীতে থর-থর গলায় বল্‌ল—তাহলে বুঝি বাঁচ্‌তেই পারতাম না! এখন এই পুরনো ছবি দেখেই ত জীবনটা শেষ করতে হবে! কতোকাল বাঁচব কে জানে?

—কেন, খোকনকে মানুষ করবেন। এ কাজই ত আপনার মহৎ ব্রত!

এতক্ষণ পরে যেন দেবজ্যোতি একটা আলোর রেখা খুঁজে পেয়েছে! এই একফোঁটা শিশুর মধ্যে যেন ভবিষ্যতের কোনো বৃহৎ সম্ভাবনা আত্মগোপন করে রয়েছে—অথচ সেটা এতক্ষণ সে দেখ্‌তেই পায় নি! কচি-কচি নরম দুটি ছোট হাত, ওই লঘু স্বল্প সোনালী চুলের উড়ন্ত ইশারা, দেবজ্যোতির স্বপ্ন-দেখা চোখকে নিবিড় আশ্রয় এনে দিল।

অমলা ঘুমন্ত ছেলের দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে বল্‌ল—তুমিও যেমন বল্‌লে ঠাকুরপো—খোকন বাঁচবে না। আমি জানি ও একদিন মরে যাবে। সেইজন্যে ওকে আমি একটুও ভালোবাসতে পারি না। ভয় হয়, বুঝলে, ভয়ে বুক আমার কেঁপে ওঠে!—যদি চাই ও বাঁচুক, তাহলেই পালাবে! আশাই মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনে—আশা পুষে রাখতে নেই, বুঝলে?

অন্য দিকে তাকিয়ে আছে দেবজ্যোতি। বাইরে অন্ধকারের ছড়াছড়ি। ট্রেন চলেছে সব কিছু উপেক্ষা করে, খর নির্মম গতিতে। রাত্রির অজস্র অন্ধকারের মধ্যে এই গাড়িখানা চলেছে কয়েক শত মানুষকে আলো আর আশ্রয় জুগিয়ে। অমলা কেন এই কথাটা ভাবতে পারছে না! বাইরের অন্ধকার হোক না অজস্র, তবু তো আলো জ্বাল্‌ছে মানুষ—সেই আলোর জ্যোতি যতই অল্প হোক না কেন, শক্তি তার অসামান্য!

একবার সে ভাবল, অমলাকে এই কথাটা বল্‌বে। কিন্তু পারল না, ওর দুঃখ-বেদনার তীব্র অনুভূতিটুকু নষ্ট করবার জন্য মন যতই আকুল হোক না কেন,

অমলার মুখের পানে তাকাবার সাহস নেই দেবজ্যোতির। ওরা দুজনে যেন সম্পূর্ণ আলাদা জগতের মানুষ! দেবজ্যোতি যতই না সমবেদনায় নিজেকে সিক্ত করুক, অমলার মতো কঠিন আঘাত সে পায়নি—এই বোধটাই তাকে পীড়িত করে। যেন অমলার ভাগ্য আর তার নিজের ভাগ্য পৃথক হওয়ার জন্য সে নিজেই অপরাধী!

করস্পর্শে দেবজ্যোতি চম্‌কে উঠ্‌ল।

অমলা তার পিঠে হাত দিয়ে বল্‌ল—কি ভাবছ ভাই?

দেবজ্যোতি পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালো—ভাবছি ভাগ্যের কথা।

—না, তুমি ভাবছো, এমন পাগল মানুষকে কেন পথে নিয়ে বেরিয়েছ! দেখে নিও, আমি একটিও এলোমেলো কথা বল্‌ব না আর!

—বাঃ, কিছু তো তেমন বলেন নি আপনি!

—অমন চুপ করে থেকো না ভাই, তার চেয়ে বরং ধমক দাও, বকো, বুঝব যে আমার ভুল হচ্ছে কোথায়! কিন্তু একেবারে পাথরের মতো সব সইবার সংকল্প তোমার ঠিক নয়।

—না, না, এ আপনি কি বল্‌ছেন বৌদি?

—আমি ঠিকই বল্‌ছি। মনে হচ্ছে, যেন বেশি করুণা করছো তুমি, তাই মুখ বুজে শুনে যাচ্ছ সব। দোহাই, করুণা করো না ভাই, আপন করো।

—তা নয়। তবে খোকন সম্বন্ধে আপনার এই নিরাশাটা ঠিক নয় বৌদি।

—আচ্ছা পাগল ছেলে তুমি, ওইটুকু দুধের বাচ্ছার ওপর তুমি দুনিয়ার সব আশা-ভরসা চাপিয়ে দিতে চাও? সইতে পারবে কেন তা! ও ত একটা নরম ফুলের পাপড়ির মতো!

অমলার দীর্ঘনিশ্বাসে খোকনের চুলগুলোয় ঝির-ঝির কাঁপন লাগল।

—আচ্ছা একটা কথা রাখবে ঠাকুরপো?

—কি কথা?

—তুমি কলকাতায় গেলেই আমাদের বাড়ি আসবে? তোমাদের দেখ্‌তে পাব না একথা ভাবতেও বিশ্রী লাগে। মনে হয় বুঝি বা বাঁচব না!

—আসবো বই কি! কথা দিচ্ছি, আসবো। খোকনকে আপনি মানুষ করবেন আর আমি এসে দেখে যাবো কতবড় হচ্ছে ও।

—খোকনকে আশীর্বাদ করবে, যেন তোমার মতো হতে পারে।

—না, ওর বাবার মতো হোক, সেই আশীর্বাদই ওর সব চেয়ে বড় আশীর্বাদ হবে।

অমলার ওষ্ঠ যেন কেঁপে গেল, কি যেন বল্‌তে চাইল কিন্তু পারল না ও। অমলার চোখমুখে আবার বিষাদের মেঘ ঘন হয়ে নেমে আসে। কথার জাল বোনা বন্ধ হয়ে যায়। গাড়ীর যাত্রীরা ঘুমে অচেতন।

দেবজ্যোতি বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে বসে রইল।

অমলা বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। আবার কথা বলতে লাগলো—জানো ঠাকুর পো, তোমাকে যে কথাটা বল্‌তে চাই সেটা বলি নি এখনো!

দেবজ্যোতি হাল্কা ভাবে সাড়া দিল—কি কথা?

—মিণ্টুকে তোমার কেমন লাগে?

—ছেলেবেলা থেকেই ত ওকে দেখ্‌চি! শুধু মিণ্টু কেন, দীপু, বাদল, ও-বাড়ির সবাই আমার খুব প্রিয়। মানিকপুরে ওই একটি পরিবার আছে যেখানে গেলে মনটা খুশিতে ভরে ওঠে।

অমলা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল—সে কথা একশো বার। এই কদিনে এত আপন করে ফেলেছে, আমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না সত্যি! কিন্তু সে কথা বল্‌ছি না।

—তবে?

—তুমি যেন তোমার ঘোষালদার মতো! মানুষের বাইরের বড় দিকটুকুই দেখতে পাও। মনের মধ্যে যে আর একটা রাজ্য রয়েছে—যেখানে সারা দুনিয়া এক দিকে, আর বিশেষ একটি মানুষ অন্যদিকে থাকে, সেই রাজ্যের খবরটুকু রাখো না!

—আপনি ওরকম হেঁয়ালীর সুরে কথা বল্‌ছেন কেন?

—তবে সোজা বাংলায় বলি, মিণ্টু তোমাকে ভালোবাসে—তোমাকেই! তা জানো?

—আমিও ত তাকে খুব ভালোবাসি বৌদি।

—খুব না ছাই। বিয়ে ত করতে চাও মন্দাকিনীকে।

দেবজ্যোতি হেসে উঠ্‌ল স-কলরবে। ট্রেনের চলন্ত কামরাখানা সে হাসিতে ভরে গেল।

অমলা বল্‌লে—হাসছ যে ?

—হাসব না ! আপনি প্রেমের কথা বল্‌ছেন যে ! সবাই জানে যে আমি মন্দাকিনীর প্রেমে পাগল—আপনিও তাই বিশ্বাস করেন। হয়তো আর কিছুকাল এরকম গুজব চল্‌লে আমাকেও বিশ্বাস করতে হবে।

—তার মানে ?

—মানেই হয় না এসব কথার। এদিকে মাথার ওপর তিনটি আইবুড়ো বোন, নিজের লেখাপড়া, দেশের চরম দুরবস্থা—সব শিকেয় টাঙিয়ে রেখে দিয়ে দেবজ্যোতি মুখুয্যে বড়লোকের কচি মেয়েব সঙ্গে প্রেম করছে, গল্পটা উপন্যাসের খাশা প্লট হতে পারে ! আচ্ছা বৌদি আমাকে দেখে বুঝি সেইরকম বেহুঁশ মনে হয় ?

অমলা যেন অকূল পাথারে পড়ল ! দেবজ্যোতি এসব কি বল্‌ছে, বুঝতে পারে না। অমলা প্রশ্ন করল—এবার তুমি হেঁয়ালী ধরেছ ভাই !

দেবজ্যোতি মৃদু কণ্ঠে বল্‌ল—এর মধ্যে কিচ্ছু হেঁয়ালী নেই। মন্দাকিনী বড়লোকের মেয়ে হ'লেও মনটা ওর ছোট নয়। ওর ছেলেমানুষী আমার ভালো লাগে। ওদের বাড়ি যাই তার বড় কারণ মল্লিকসাহেবকে আমার আরও ভালো লাগে—লোকটাকে নাড়াচাড়া করে দেখার ইচ্ছে ছেলেবেলা থেকে পেয়ে বসেছিল। রূপকথার রহস্যে ঢাকা রাজার মতো মল্লিকসাহেব আমাকে টানে।

অমলা গম্ভীর হয়ে গেল—মল্লিকসাহেব ভালো মানুষ ? এ কথাটা তোমার মুখে মানায় না। ধরতে গেলে মানিকপুরের এত বড় সর্বনাশ ত একা তিনিই করেছেন।

দেবজ্যোতি বাধা দিয়ে বল্‌ল—আপনি যা বলেছেন সেটা হয়তো মিথ্যে নয় কিন্তু আমার কথা তা নয়, মানুষটা বিচিত্র। আপনি ভাবুন দেখি, ন হাজার মানুষের সঙ্গে একলা একটি মানুষ লড়াই করছে !

—একে তুমি লড়াই বলো ? শয়তানের হদ্দ লোকটা, ছলেবলে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যোগসাজোস করে অসহায় মানুষগুলোকে উপোস করিয়ে মারবার মতলব করেছিল। না ঠাকুরপো, তুমি যাই বলো, মল্লিকসাহেবের মধ্যে এতটুকু মনুষ্যত্ব আছে বলে আমি মানি না।

—ঘোষালদা বেঁচে থাকলে দেখছি আপনি খুব শীগ্‌গির দেশের কাজে নাম্‌তে পারতেন।

—তুমি কি ভাবো যে, এখনই পারি না ?

—হয়তো পারেন।

—নিশ্চয় পারি।

কোলের ছেলেটা ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠ্‌ল—মাঁ—আঁ—আঁ !

অমলার মুখ-চোখের ভাব পলকে বদলে গেল। তার চোখের উজ্জ্বল আলো যেন স্বর্গীয় স্পর্শে মমতায় মধুর হয়ে উঠ্‌ল! দেবজ্যোতির দিকে পিছন ফিরে বসে অমলা ছেলেটাকে দুধ খাওয়াতে লাগলো।

তেইশ

কলকাতা শহরকে দেবজ্যোতি কিছুতেই সহজভাবে মনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। এখানকার সবই যেন অন্যরকম! বিশেষ করে এখানকার মানুষগুলি ওর কাছে সব চেয়ে বেশি অচেনা ধরণের মনে হয়! এখানে এলেই মনটা হাঁপিয়ে ওঠে। হাতে যতক্ষণ কাজ থাকে ততক্ষণ সে এক রকম থাকে, কিন্তু বিনা কাজে কলকাতা শহরে থাকার কথা সে যেন কল্পনাই করতে পারে না! চারিদিকে অচেনা মুখ, ভাবটুকু পর্যন্ত অচেনা! দেবজ্যোতি কলকাতাকে আপন ভাবতে পারে না।

আজ সন্ধ্যার গাড়িতেই সে বর্ধমানে ফিরে যাবে, তার আগে একবার ফেডারেশনের অফিসে দেখা-সাক্ষাৎটা সেরে নেবে বলে সকালবেলাতেই অমলাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এণ্টালীর এই অঞ্চলটায় এত এলোমেলো বাড়ির ভিড় যে, দেবজ্যোতির অনভ্যস্ত চোখদুটো বিভ্রান্ত হয়ে একটু আকাশ খুঁজবার জন্য ওপর দিকে তাকায়! পিছন থেকে আচমকা একেবারে পিঠের ওপর মোটরের হর্ন বেজে উঠতে সে লাফিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। নিজেকে সাম্‌লাবার আগেই সে গিয়ে পড়ল পথ-চল্‌তি এক ভদ্রলোকের ঘাড়ের ওপর, তাঁর হাত থেকে বাজারের থলিটা মাটিতে পড়ে গেল। ব্যস্ত হয়ে দেবজ্যোতি লজ্জিত মুখে রাস্তায় ছড়ানো আলু-পটলগুলো কুড়োতে লাগল।

ভদ্রলোক বিরক্তি-মিশ্রিত কণ্ঠে বল্‌লেন—যতো সব প্রেম-পাগল কলেজী চ্যাংড়া। বলি পথে চলবার সময় চোখ দুটো মাথার সামনে রাখলেই গোল চুকে যায়! চোখ রাখবে মগজের মধ্যে, আর মগজটা থাকবে শাড়ীর আঁচলে বাঁধা। হুঁ! সামনের রাস্তায় রাখতে পারো না?

—মাফ করবেন, দেখতে পাই নি।

—তা ত দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু ওদিকে যে এক মিনিট লেট্ হ'লে পেরিং সাহেবের ঘরে হাজরী খাতা চলে যাবে! তখন—তখন তুমি ফাইন দেবে? না কি! মানে কথা—সামলে চল্‌তে হয় হে!

দেবজ্যোতি কুণ্ঠিতভাবে নিজের কাজ করছিল।

এমন সময়ে তার পাশে রিন্-রিনে্ মেয়েলী গলায় কে বলে উঠ্‌ল—তুমি সরো জ্যোতিদা, ও কি আর কুড়িয়ে তোলা যায়? ধুলোকাদা লেগে যা নষ্ট হবার তা ত হয়েছেই, আবার মিছেমিছি কাপড়জামা নোংরা করে কি লাভ?

দেবজ্যোতি মুখ তুলে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল, তার হাত থেকে কুড়িয়ে-তোলা আনাজ-পত্র আবার মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল—মন্দাকিনী তুমি!

—হ্যাঁ আমি।

মন্দাকিনী ভদ্রলোকের জ্বলন্ত দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বল্‌ল—আপনি দয়া করে আর একটিবার বাজার করে নিন। কত লাগবে বলুন, আমি দিচ্ছি পয়সা।

—না, না, সে কি কথা মা-লক্ষ্মী! মানে কথা—তুমি কেন পয়সা দিতে যাবে? আমার এই কটা জিনিস কুড়োতে এক মিনিটও সময় লাগবে না। মানে কথা, তবে কিনা—সে যাক।

ততক্ষণে দেবজ্যোতি আবার নিজের কাজে মন দিয়েছে, আনাজ কুড়োচ্ছে সে।

এবার তিনজনে মিলে ছড়ানো তরকারী তুলে ফেলল। এবং তারপর মন্দাকিনী বল্‌ল—হয়েছে ত কর্তব্য সম্পাদন, উঃ—এখন এসো, গাড়িতে ওঠো।

নোংরা হাত দু'খানা দেখিয়ে দেবজ্যোতি বল্‌ল—ধুতে পারলে হ'ত।

ভদ্রলোক বল্‌লেন—মানে কথা! এই ত তিন পা গেলেই আমার বাসা। সেখানে—

মন্দাকিনী বল্‌ল—ওই ত কল রয়েছে। সাম্‌নেই!

ব্যাজার মুখে ভদ্রলোক ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে হাতের থলিটা নিয়ে চলতে লাগলেন।

গাড়িতে ওঠবার আগে দেবজ্যোতি বল্‌ল—তুমি স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফিস চেনো ?

—কেন, সেখানে খুব জরুরী কাজ আছে নাকি তোমার ? এক্ষুণি যেতে হবে ?

—হ্যাঁ, সেই জন্যেই বেরিয়েছিলাম।

—অবিশ্যি ডিরেক্‌শন দিলে পৌঁছে দেওয়া শক্ত নয়। কিন্তু সেখানে তোমার খুব দেরী হবে না ত ? একটু যদি পরে যাও ?

গাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই দেবজ্যোতি বল্‌ল—তা কি আগে থেকে বলতে পারি ? থাক্‌ আমি বরং ট্রামেই চলে যাই। আচ্ছা তার আগে চট্‌পট্‌ বলো তোমার খবর কী ?

—যাক্‌, তবু কাজের ফাঁকে একথাটা মনে পড়ল !

—মিছে রাগ করছ মন্দাকিনী ! পথের মাঝে গাড়ি-চাপা পড়তে পড়তে বেঁচেছি। তোমাকে যে চিনতে পেরেছি সে-ই কি কম কথা ?

—কিন্তু চাপা দেবার আগে আমি ঠিক চিনতে পেরেছি যে ! পিছন থেকে আমার ঠিক মনে হয়েছে, তোমার মতো মানুষ এখানে কি করে এলো ! কই কলকাতায় আসবে, আগে জানাও নি ত ! এলেই বা কবে ?

—কিছু ঠিক ছিল না, হঠাৎ এসে পড়লাম।

—আর এসেই চট্‌পট্‌ গাড়ি-চাপা পড়তে বেরুলে ! দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? এস-এস, ওঠো, দেখ্‌চ না রাস্তার লোকগুলো কেমন ভাবে তাকাচ্ছে ?

—তোমার ড্রাইভার কোথায় গেল ?

—আপাততঃ আমিই তোমার ড্রাইভার।

দেবজ্যোতি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না যেন, মানিকপুরের সেই ফ্রকপরা মন্দাকিনী ! হেসে মন্দাকিনী বল্‌ল—ভয় নেই মশায়, তোমাকে চাপা দিচ্ছিলাম বলে যাকে-তাকে চাপা দেবো না। Now please direct me !

দেবজ্যোতি পাশে বসে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে ! কিন্তু মন্দাকিনীর হাসি আর কথার জোয়ারে এই অপ্রতিভ ভাবটা সহজেই কেটে যায়। বড় রাস্তায় পড়ে মন্দাকিনী আব্দারের সুরে বল্‌ল—জ্যোতি দা, একটা কথা রাখবে ?

—কি কথা ?

—মিনিট কয়েক সময় উপহার দেবে আমাকে ? তাহলে দু'জনে একটু চা খেতাম।

দেবজ্যোতি কিছু জবাব দেবার আগেই গাড়িখানা সার্কুলার রোড ধরে পার্ক স্ট্রীটের উদ্দেশ্যে চল্‌তে শুরু করল। মন্দাকিনী বল্‌ল—উঃ, কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা ! এই যে হঠাৎ তোমার দেখা পেলাম, সেটা সেলিব্রেট করব না !

দেবজ্যোতি বল্‌ল—তোমার কলেজ নেই ?

—আজ আর কিচ্ছু নেই, শুধু তুমি আছো।

ব.ল ঘাড় কাৎ করে একটু হাসল মন্দাকিনী। পর-মুহূর্তে গম্ভীর ভাবে হাসির রেশ কেটে দিল।

—কিন্তু তোমার কাজ রয়েছে। না, এভাবে তোমার সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

—আমার কাজ ত আমারই শুধু নয়—সবারই কাজ। সে কাজ তোমারও হ'তে পারে।

মন্দাকিনী বল্‌ল—অল্ রাইট, আমি তোমার সোফারের কাজ নিলাম। যখন যেখানে নিয়ে যেতে বল্‌বে, আমি হুকুম তামিল করব। শুধু একটি বার রেস্তোরাঁ থেকে বাড়িতে ফোন করে দেওয়া যাবে, দুপুরে তুমি আমাদের ওখানে খাবে।

—কিন্তু তা যে হবার উপায় নেই ! বৌদি যে বসে থাকবেন ভাত নিয়ে !

এ কথায় মন্দাকিনী যেন নিভে গেল ! অর্ধ-স্বগতভাবে বল্‌ল—তা হ'লে—

দেবজ্যোতি হাসল—এই ত এখনই তোমার সঙ্গে খাবো।

—অবিশ্যি জোর করে আর এর বেশি কতটুকু আদায় করা যায় ?

বাধা দিয়ে দেবজ্যোতি বল্‌ল—কিন্তু আমাদের এই যে যুগ, তাতে জোর-জুলুম ছাড়া কিছুই পাওয়া সম্ভব নয় মন্দা !

—তবে তুমি দুপুরে আমাদের সঙ্গেই খাবে, কেমন ! এটুকু জোর করে আদায়—

—না, তা বলি নি। বিদেশী সরকারের কথাই বলো আর কলকারখানার মালিকদের কাছ থেকে সুবিধা-সুযোগই বলো—সর্বত্রই জোর-জবরদস্তি ছাড়া এক-পা চলবার উপায় নেই।

মন্দাকিনী গম্ভীর হয়ে গেল। দেবজ্যোতির সেদিকে লক্ষ্যই নেই, সে আপন মনেই বল্‌তে লাগ্‌ল, ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের কথা। আরও হয়ত অনেক কথাই সে বল্‌ত, কিন্তু হঠাৎ গাড়িটা থেমে যাওয়ায় সেও চুপ করল।

মন্দাকিনী বল্‌ল—তোমার চেহারাটা যে কোনো পোশাকেই বেশ মানিয়ে যায়। আর ছাখো, এই আমি ত এত চেষ্টা করি তবু চেহারার ঘাটতিটা কিছুতেই চাপা দিতে পারি না।

ঝক্‌ঝকে সাহেবী রেস্তোরাঁয় ঢুকে দেবজ্যোতি যেন মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল! কিন্তু মুখে একটিও অপ্রিয় উক্তি করল না সে, যথাসাধ্য মন্দাকিনীর আনুগত্য প্রকাশে মনোযোগ দিল। শুধু চা-ত নয়, আনুষঙ্গিক আহার্যের বহর দেখে দেবজ্যোতি মৃদুভাবে জানালো—এর পর দুপুরে আর খাবার কোনো উপায়ই থাকবে না।

মন্দাকিনী তিরস্কারের ভঙ্গিতে বল্‌ল—বকো না, কলকাতায় টো-টো করে ঘুরে ছাখোই না, ক্ষিদে পায় কি না!

কাঁটা-ছুরির ঠুকঠাকের ফাঁকে প্রশ্ন করল মন্দাকিনী—এখন ক'দিন আছো তো?

—না, আজই বর্ধমান যেতে হবে।

—যেতে দিচ্ছি আর কী! মেট্রোতে ভালো বই এসেছে, সেটা দেখে তবে যাবে। আর তোমার বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে, ঠিকানাটা দাও—বিকেলে গিয়ে গলবস্ত্র হয়ে নিমন্ত্রণ করে না এলে চল্‌বে না যা বুঝছি।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে দেবজ্যোতি বল্‌ল—সেখানে তোমার না যাওয়াই ভালো মন্দা!

—অত ভালো-মন্দের বেড়া তুল্‌তে হবে না। আমি যাবোই।

—অযথা কোনো মানুষকে আঘাত দিয়ে কি লাভ?

—আঘাত কেন দেবো ?

—তুমি না দিতে চাইলেও তিনি তোমাকে দেখলেই কষ্ট পাবেন।

মন্দাকিনী ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বল্‌ল—আমাকে দেখলে তুমি ছাড়া আর কেউ কষ্ট পায় নাকি ? কেন কষ্ট পাবেন তিনি ?

দেবজ্যোতি জবাব দিল না। তার অপরিবর্তিত গাম্ভীর্যে মন্দাকিনী অস্বস্তি বোধ করে। এক সময়ে অধীর ভাবে বল্‌ল—জ্যোতিদা, আমি কি এমন কিছু করেছি যার জন্যে তোমার আত্মীয়রা—

দেবজ্যোতি ব্যস্ত ভাবে বাধা দিল—না, না, এতে তোমার কোনো হাত নেই। আর সে সব কথা না-ই শুনলে।

অশ্রুমুখী মন্দাকিনী বল্‌লে—আপত্তি থাকে বোলো না। কিন্তু এ আমি সইতে পারব না। এভাবে কেন আমাকে যন্ত্রণা দেবে ? কি এমন করেছি—

—বলেছি ত তোমার কোনো দোষ নেই। তব—

—আমার দোষ নেই অথচ আমার যেতেই যত দোষ !—তা কি করে হয় ?

—ধরো তোমার বাবার জন্যে।

—বাবার জন্যে আমার—এসব কি বল্‌ছ তুমি ?

মন্দাকিনী সৌজন্যের মুখোশ সরিয়ে সহজাত কৌতূহলের দাবি নিয়ে স্পষ্টভাবে বল্‌ল—না, তোমাকে বল্‌তেই হবে, নইলে আমি পাগল হয়ে যাবো ভেবে ভেবে। বলো-বলো—

আগ্রহের আতিশয্যে দেবজ্যোতির হাত চেপে ধরল মন্দাকিনী।

দেবজ্যোতি শান্ত ভাবেই বল্‌তে লাগ্‌ল—মানিকপুরের নিরঞ্জন ঘোষালের স্ত্রী তিনি।

—কে নিরঞ্জন ঘোষাল ?

বিস্মিত হ'ল দেবজ্যোতি—তুমি শোনোনি তাঁর নাম ? কারখানার শ্রমিকদের নেতা ছিলেন তিনি।

—নেতা ছিলেন ভালো কথা। তাতে তাঁর স্ত্রীরই বা কী, আর আমারই বা কী ? সে ত কারখানার ব্যাপার !

দেবজ্যোতির ওষ্ঠে একটু হাসি ফুটে উঠ্‌ল—এ হাসি বিদ্রূপের হাসি নয়,

পরিচ্ছন্ন পরিহাসও এতে নেই, বরং বেদনার আভাষই বেশি ব্যক্ত হ'ল। সে বল্‌ল—তুমি বুঝবে না যে, অনেকেরই জীবনের সঙ্গে কারখানার কতখানি সম্বন্ধ! এই ধরো না, আমার কথাই—আমি ত চাকরি করি না ওখানে, তবু কি মানিকপুরের সঙ্গে বা সেখানকার জীবনধারার সঙ্গে কম যোগাযোগ?

মন্দাকিনী বল্‌ল—বুঝেছি। এখন আসল কথাটা বলো, যার জন্যে যেতে বারণ করছ আমাকে! কই তোমাদের বাড়িতে ত কেউ আমাকে যেতে বারণ করে না। না-কি এবার থেকে তাতেও আপত্তি হবে?

দেবজ্যোতি ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বল্‌ল—কোনো খোঁজ-খবর রাখবে না তুমি—আর তার জের আমি টানবো? তবে শোনো—এবারের ধর্মঘটে নিরঞ্জন ঘোষালকে খুন করা হয়েছে, সে খবর কি তুমি রাখো?

মন্দাকিনী চিত্রার্পিতের মতো দেবজ্যোতির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে অস্ফুটস্বরে বল্‌ল—খুন!

—হ্যাঁ তাই। শোনো নি কিছু?

ফ্যাকাশে মুখে ভীত-চকিত দৃষ্টিতে মন্দাকিনী সরাসরি দেবজ্যোতির দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে যেন অনেক চেষ্টা করে বল্‌তে পারল—খুনটুন ত শুনিনি! তবে মাঝে কয়েক বার বাবাকে ঘনঘন কলকাতায় আসতে দেখেছি,—বল্‌তেন কারখানায় খুব গণ্ডগোল চল্‌ছে। খবরের কাগজেও পড়েছি—সে ত মিটেও গেছে। কিন্তু খুন কেন?

মন্দাকিনীকে বড় অসহায় দেখাচ্ছে।

দেবজ্যোতির সেদিকে লক্ষ্য নেই। সে বেশ সহজভাবেই বলছে—কাগজে আর কতটুকু খবর থাকে! আসল ঘটনার সবটুকু আমিও জানি না। তবে মানিকপুরের প্রায় সকলেরই বিশ্বাস, ঘোষালকে খুন করানোর পিছনে মল্লিক-সাহেবের হাত ছিল।

—বাবা খুন করিয়েছেন? তুমি কি বল্‌ছ জ্যোতিদা? না-না।

এবার মন্দার মুখের ওপর দেবজ্যোতির নজর পড়ল। সে নিজের অজ্ঞাতেই একটু নরম হয়ে পড়ল—অবশ্য প্রমাণ কিছু নেই। তবে ঘোষালকে যে খুন করা হয়েছে এটা ত সত্যি। আর—

—থাক জ্যোতিদা, আর দরকার নেই। প্রমাণটা বড় নয়। এমনি করে জীবনের—না, না—

—শোনো মন্দা!

—আর শুনে কি হবে! আমার মাথা ঘুরছে, এক গ্লাস জল দিতে বলো না।

দেবজ্যোতি সামনের দেয়ালের ফ্রেস্কোর দিকে তাকিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে কি যেন ভাবতে লাগ্‌লো! মন্দাকিনীর মুখের দিকে তাকাতে সঙ্কোচ হচ্ছে তার। এইটুকু একটি নরম সুন্দর মনকে সে কেন এভাবে আঘাত দিল!

মন্দাকিনী আস্তে আস্তে বল্‌ল—তোমার সেই বৌদির কাছে আমাকে নিয়ে চলো না জ্যোতিদা—এই কথাটা রাখো!

—কি লাভ তাতে?—

—জানি না, তবে আমাকে যেতেই হবে তাঁর কাছে। এমনি অচেনা মানুষ, নিতান্ত সাধারণ একজন ছাড়া আমি আর কেউ নই,—সেই ভাবেই যাবো। মল্লিকসাহেবের মেয়েই কি আমার একমাত্র পরিচয়? আমার নিজের কোনো সত্তা নেই?

দেবজ্যোতি বাধা দিয়ে বল্‌ল—কিন্তু মানিকপুরের মানুষেরা তোমাকে অনিরুদ্ধ মল্লিকের মেয়ে বলেই চেনে। সেটা ত মুছে ফেলা যায় না মন্দা!

—তা হোক, তবু আমি যাবো। আমার বিশ্বাস, তাঁর ভুল ভেঙে দিতে পারব। পারব না, জ্যোতিদা? জন্ম যেখানেই হোক, মানুষ নিজেকে আপনার খুশি মতো গড়ে তুল্‌তে পারে, এটা বিশ্বাস করো ত!

—একজনের ভুল ভাঙার জন্যে এতটা করবার কি দরকার? তা ছাড়া তাঁর যা হবার তা ত হয়েই গেছে! একটু আগে যে কথা বল্‌ছিলাম মন্দা, আমার কাজ আমাদের সবারই কাজ হ'তে পারে—মানে, সেটাই হওয়া দরকার, কেন বল্‌ছি বুঝলে ত?

—আমাকে তুমি এই মুহূর্তে ওই খুনীদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে চলো, নইলে মরে যাবো। পারবে না জ্যোতিদা?

মন্দাকিনী এই কটি কথা বলে হাঁপাতে লাগল।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—পৃথিবীতে থাকতে গেলে মানুষগুলোকে বাতিল করে দেওয়া চলে না। তবে তাদের মতকে ও পথকে সহজ সুন্দর সুস্থ করে গড়ে তুল্‌তে হবে। সেটাই আমাদের ব্রত—ভুল ভাঙতে হবে। দূরে সরে না এসে, তোমার বাবার ভুল ভাঙতে পার না ?

সে কথার কোনো জবাব এল না মন্দাকিনীর তরফ থেকে।

উর্দী-শোভিত বয় এল বিল নিয়ে। দেবজ্যোতির কথায় ছেদ পড়ল। ভ্যানিটি-ব্যাগ থেকে নোট বার করে দিয়ে মন্দাকিনী বল্‌ল—আচ্ছা জ্যোতিদা, এরকম আরও কতজন মানুষ খুন হয়েছে ?

—আর হয় নি। ঘোষাল খুব খাঁটি আর অসাধারণ বুদ্ধিমান কর্মী ছিলেন কি না! তাঁর চোখে ফাঁকি দিয়ে শ্রমিকদের সর্বনাশ করতে কেউ পারছিল না, তাই তাঁকে সরানো ওদের দরকার হয়েছিল।

অন্যমনস্কভাবেই রেস্তোরাঁ থেকে বাইরে বেরিয়ে গাড়ির ষ্টিয়ারিং-এ হাত দিয়ে মন্দাকিনী প্রশ্ন করল—তোমার বৌদি খুব ভেঙে পড়েছেন নিশ্চয় ?

—ভাঙলে চল্‌বে কেন, বাচ্ছাটাকে মানুষ করতে হবে ত! সংসারে বৌদির আপন বল্‌তে ত বিধবা মা। শ্বশুরবাড়ির কেউ খোঁজও নেয় নি। ঘোষালের বাবা আবার রায়বাহাদুর কি না—আর বিয়েও হয়েছিল সবারই অমতে। কাজেই বৌদির সে পথ বন্ধ।

গাড়ি স্টার্ট নিল, প্রথম গর্জনে কোনো কথাই কেউ শুন্‌তে পেল না। দেবজ্যোতি যখন মন্দাকিনীর কথা শুন্‌তে পেল, তখন শুন্‌ল, মন্দাকিনী বল্‌ছে—তাহলে আগে তোমার ফেডারেশন আপিস হয়ে তারপর বাড়ি ফেরার পথে বৌদির কাছে নামব, কি বলো ?

—বেশ।

মন্দাকিনীর পাশে বসে গত রাত্রের ছবিটা দেবজ্যোতির চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। অমলার সংশয়াবিষ্ট কথাগুলো যেন দেবজ্যোতির কানে বাজ্‌ছে—মানুষ যা চায় তা কিছুতেই পায় না।···ঘোষালদা পায় নি···তুমিও পাবে না। কেউ না, কেউই পায় না।

ভাবতে ভাবতে দেবজ্যোতি বর্তমানকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ

তীক্ষ্ণ তীব্র আর্তশব্দে চমকে তাকিয়ে দেখল, ওদের গাড়িখানা একটি রিকশাকে সজোরে ধাক্কা মেরেছে—চকিতে মন্দাকিনীর দিকে দৃষ্টি পড়ল, পরক্ষণে দেবজ্যোতি দরজা খুলে নামতে গিয়ে বুঝল মোটরখানা থামে নি, চলছে। হয়তো রিকশাওয়ালা চাপা পড়েছে,—তার মাথাটাই হয়তো চাকার তলায় পড়েছে! কে জানে? উদ্বিগ্ন হয়ে দেবজ্যোতি লাফিয়ে পথে নেমে পড়ল।

একটুর জন্যে মারাত্মক দুর্ঘটনাটুকু ঘটে নি। মোটরের ধাক্কাটা লেগেছে পাশের দিকে, রিকশাওয়ালা বেচারী কিছু দূরে ছিট্‌কে পড়ে মাটিতে বসে ঠক্‌-ঠক্‌ করে কাঁপছে!

দেবজ্যোতি কাছে যেতেই কাতর কণ্ঠে বল্‌ল সে—কসুর হো গিয়া হুজুর! মাপ-হি মাংতা হুঁ। মাফ কি জিয়ে সাব!

বিস্মিত দেবজ্যোতি বেশ ভালোভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল—লোকটার ডান হাতের কনুই ছড়ে গেছে, ময়লা কাপড়ের খানিকটা ভিজেছে হাঁটুর কাছে—পরণের কাপড়টা এতই ময়লা যে, রাস্তার জলে কি শরীরের রক্তে ভিজেছে বোঝা যাচ্ছে না।

দেবজ্যোতি জিজ্ঞাসা করল—কোথায় কোথায় চোট লেগেছে?

—নেহী হুজুর, চোট্‌উট্‌ কুছ নেহি। কসুর হুয়া, বল্‌কী হরন্‌ নেহী শুনা!

মন্দাকিনী গাড়ি থেকে নামে নি। দেবজ্যোতিকে গম্ভীরভাবে ডাক দিল—ছ্যাট্‌স্‌ নাথিং, উঠে এসো জ্যোতিদা! রাস্তার মাঝে এভাবে - এসো এসো।

দেবজ্যোতি ভ্রূকুঞ্চিত করেই গাড়িতে উঠে পড়ল।

মন্দাকিনী বল্‌ল—দেখলে ত কিরকম ভাবে এ্যাক্‌সিডেণ্ট থেকে তোমাকে বাঁচালাম! হতভাগা আর একটু হলেই মরতো—যা জোর ব্রেক কষেছি, এখনও বুকটা ধড়াস্‌-ধড়াস্‌ করছে, এই ছাখো!

দেবজ্যোতি বল্‌ল—ডোণ্ট বি সো র‍্যাশ। একটু হিসেব করে চলো।

—হো-হো! তোমার বুঝি খুব ভয় করে! এ তো একেবারে ডেড্‌ স্লো, ফাঁকা রাস্তায় ত আমি ষাট মাইল স্পীডে চলি। সত্যি তুমি যদি জান্‌তে স্পীডে গাড়ি চালাতে কী আনন্দ! এনি ওয়ে, তোমার ও ভাবে দরজা খুলে লাফিয়ে পড়া ঠিক হয় নি।

—কেন ?

—যবের হাতে পড়লে রক্ষে আছে ?

—কিন্তু লোকটা যদি তেমন জখম হ'ত ? তাহলে ওকে ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দরকার হ'ত।

—তার জন্যে লোকের অভাব হয় না। এ্যাম্বুলান্স ত র'য়েছেই! তা ছাড়া দোষ তো আমার নয়, আমি হর্ণ দিয়েছি—আচম্‌কা গলির ভেতর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল আর একটু হ'লে। দোষ ওরই।

—কি জানি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না মন্দা!

মন্দাকিনী অধীরভাবে বল্‌ল—পাবলিকের আক্রোশ সর্বদা ড্রাইভারের ওপর, তা জানো? দোষ থাক আর না-ই থাক। সেইজন্যে এ্যাকসিডেণ্ট হ'লে আগে সেফ্‌লি বেরিয়ে যাওয়াই ভালো।

বৃথা তর্ক করে কোনো লাভ হবে না ভেবে দেবজ্যোতি চুপ করে রইল। তবে 'সেফ্‌লি বেরিয়ে যাওয়া' কথাটা তাকে বিরক্ত করেছে।

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে সে বল্‌ল—আমাকে এখানে নামিয়ে দাও, দিয়ে তুমি বাড়ি চলে যাও।

—আর তুমি ?

—আমার ফেরার কিছু ঠিক নেই। শুধু শুধু তোমাকে আটকে রাখতে চাই না।

—তাহলে বৌদির সঙ্গে দেখা হওয়াতে তোমার আপত্তি! আবার কখন দেখা হবে ?

—মানিকপুরে গিয়ে। আমাকে আজই বর্ধমান যেতে হবে।

—বৌদির কাছে সত্যিই নিয়ে যাবে না ? বেশ, তাহলে তুমিও বাবার অপরাধে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করলে!

মন্দাকিনীর চোখমুখ অভিমানের উত্তাপে রাঙা হয়ে উঠ্‌ল।

দেবজ্যোতি যেন সেটুকু লক্ষ্য করতে না পেরে বল্‌ল—না, তা কেন হ'তে যাবে? সময় পাচ্ছি কোথায়? সামনে পরীক্ষা, এখন মিছেমিছি কলেজ কামাই করা উচিত হবে না। আচ্ছা ভাই, আজ তবে আসি!

করুণ অশ্রু-ভারানত চোখে মন্দাকিনী গাড়িতে স্টার্ট দিল, মুখে একটিও কথা উচ্চারণ করল না।

গাড়িখানা গর্জন করে উঠ্‌ল। দেবজ্যোতির মনে হ'ল মন্দাকিনীকে দুটো মিষ্টি কথা হয়তো বলা উচিত! কিন্তু কি বল্‌বে, কোন্ কথা বলা দরকার—ভেবে পেল না সে! কাজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা ত সে জানে না, বল্‌তে শেখে নি। অথচ শেষবার চলন্ত গাড়ি থেকে মন্দাকিনী উৎসুক দৃষ্টি মেলে যখন তাকালো, সে কিছু একটা যেন বল্‌তে চাইল—পারল না। একটু হাসলো দেবজ্যোতি! ট্রাফিক পুলিশ পথ খোলার ইঙ্গিত করতেই চক্‌চকে নতুন গাড়িখানা মন্দাকিনীকে নিয়ে ডান দিকে বেঁকে বেরিয়ে গেল।

চব্বিশ

ফেডারেশনের পুরনো আপিসটা এখন তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কেউ তার ধারে-কাছে যায় না। কেবল কুলী-লাইনের পালিত ছাগল আর গরুতে ঘাসের আশায় ঘোরাফেরা করে। আর যায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা —ফাঁকা জায়গায় তাদের খেলাধূলো জমে ওঠে। চল্‌তি কথায় যারা 'লেবার' তারা ডিউটিতে যাতায়াতের পথে চোখ তুলে ওই ঘরখানার দিকে তাকাতেও ভরসা করে না যেন! কারখানার কাজে সবাই খুব মন লাগিয়ে দিয়েছে। এতটুকু ফাঁকি দেবার কথা এখন কেউ ভাবতেও পারে না যেন!

অভিজিৎ সিং-এর পদোন্নতি হ'ল, সীতানাথ মুখুয্যে হলেন এ্যাসিস্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার—দীনদয়াল সান্যালের উপরওয়ালা হলেন তিনি। আরও অনেকেরই কপাল ফিরল। কেউ যেন এসব দেখেও দেখল না—সাহস নেই, প্রয়োজনও নেই বোধ করি।

পাওয়ার হাউসের চুল্লীতে আগুনের জোর বেড়েছে। কারখানার সব দিক দিয়েই দিন ফিরে গেছে। লোহা গল্‌ছে আগের চেয়ে অনেক বেশি। ইস্পাত তৈরীর পরিমাণ হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। আয়রণ ওর, মানে, যে মাটিতে লোহার ভাগ বেশি আছে, সেই পাহাড়ী মাটি আসছে 'গুয়া' অঞ্চল থেকে বর্ধিত পরিমাণে। তার ফলে লোকোমোটিভ ডিপার্টমেণ্টে আরও মালগাড়ির চাহিদা বেড়েছে, ইঞ্জিন চাই আরও। চাই কাজের যোগ্য লোক আরও। অতএব এই সময়ে নতুন লোক নিচ্ছে কোম্পানী। যে যার আত্মীয়-পরিজনকে ঢোকাবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেল।

হরদম লোক নেবে কোম্পানী—বিলেতে যুদ্ধ বেধেছে। খুব বড় লড়াই—এতবড় লড়াই নাকি পৃথিবীতে আর কখনও হয় নি। কোথায় সাতসমুদ্দুর পারে যুদ্ধ বেধেছে তাতে বাংলাদেশের মানিকপুর শহরের শ্রমিকের কিসের মাথাব্যথা? কে তার খোঁজ রাখে? কিন্তু খোঁজ না রাখলেও চলছে না—

কারখানার কাজ যে ভীষণভাবে বাড়ছে। ওভারটাইম চল্‌ল পুরোদমে। অতএব যুদ্ধটা যে বড় তাতে আর সন্দেহ কী! রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ইংরেজ আছে রুশের পক্ষে। আর সেই ইংরেজ ভারতবর্ষের, তথা এই কোম্পানীর হুজুর সরকার। সেদিক দিয়ে হিসেব করলে যুদ্ধটা এমন কিছু দূরের ব্যাপারও নয়। লোক চাই—কত লোক চাই? বিহার, ইউ. পি., পাঞ্জাব, পেশোয়ার দূর-দূরান্তর থেকে লোক আস্‌ছে। আরও নতুন ফার্নেশ বস্‌বে বসুক, ব্যাটারী বাড়ছে বাড়ুক।

কিন্তু এত লোক থাকবে কোথায়? এই মানিকপুর শহরে ত আর জায়গা নেই। তবু এরই মধ্যে নতুন লোক আসছে। তারা ত পথে পড়ে নেই—শহরটা যেন রবারের বেলুন, লোকগুলো হাওয়ার মত ঢুকে পড়ছে এই বেলুনের শূন্যস্থানে! নতুন কোয়ার্টার তৈরী হচ্ছে—ঠিকাদারদের মরশুম পড়েছে। সেখানেও কুলী-কামীন চাই। শহরের ডানা-বিস্তারে পতিত জমি ঘুচে গেল, চাষের জমির ওপরও কোম্পানীর নজর পড়েছে। মোটাদামে জমি কিন্‌ছে কোম্পানী। দামোদরের দিকে কতো জঙ্গল কাটা হয়ে গেল! কোম্পানীর সমৃদ্ধি ত এমন কিছু ক্ষতির লক্ষণ নয়। কোম্পানী কারুর ক্ষতি চায় না—মাটি কিন্‌ছে সোনার দামে, অতএব কোম্পানী সৎ, সুবিবেচক। আর সেই সঙ্গে টালি-খোলার ঘর গজিয়ে উঠ্‌ছে এখানে ওখানে অজস্র।

চারিদিকে একটা প্রবল বন্যার মতো আলোড়ন চলেছে। এর মধ্যে আটানব্বই কি একশ' জনের চাকরী চলে গেল—তাদের জন্য খেদ করবার সময় কই! একসঙ্গে একদিনে ত সকলের চাকরী যায় নি! মাস ছয়েক ধরে বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট থেকে নিঃশব্দে এরা বিদায় নিতে বাধ্য হ'ল। তাদের নিজেরই দোষে বরখাস্ত করেছে কোম্পানী বাধ্য হয়ে। কাজে ফাঁকি দেওয়া, কোম্পানীর জিনিসপত্র চুরি করা—এসব ত গুরুতর অপরাধ, সেজন্য চাকরী গেলে আর কে কি করতে পারে? যদি কেউ বলে যে, যারা ফেডারেশনের পাণ্ডা ছিল কেবলমাত্র তাদেরই চাকরী থেকে বরখাস্ত করার ফিকির খুঁজে খুঁজে কর্তৃপক্ষ শত্রুনিধন করছে—তবে তার জবাব এই যে, বিনা অপরাধে কারুরই বিরুদ্ধে

হস্তক্ষেপ করা হয় নি। বাস্তবিক পক্ষে যারা কাজ করতে চায় না—তারা কেবল গোলমাল পাকিয়ে তুলে অসুবিধার সৃষ্টি করে। অবশ্য প্রকাশ্যে কেউ এমন প্রশ্ন করে নি যে, সারথীর অপরাধটা তেমন গুরুতর নয়। সারথীর মতো আরও কত লোকেই ত ইঞ্জিন সাফ করার 'উল' সরিয়ে শীতের জামা তৈরী করে, সেই জামা গায়ে দিয়ে কারখানার চাকরী বজায় রেখেছে—তবে উলচুরির জন্য সারথীর চাকরীটাই বিশেষ করে খোয়া গেল কেন, এমন প্রশ্ন করা চলে না।

ইঞ্জিন পরিষ্কারের জন্য পশমের দরকার হয়, এবং সে পশমকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে রং-এ ডুবিয়ে তারপর সোয়েটার তৈরী করা খুব পুরনো রেওয়াজ কোম্পানীর লেবার-মহলে। কন্‌কনে হাড়-কাঁপানো শীতে এই পশমী জামা ভারী আরাম দেয়। এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে অনেক অসুবিধে। তা ছাড়া, 'কোম্পানীকা মাল—দরিয়ামে ডাল' মন্ত্রটির উপাসক কে নয়? তবে, এখন একটু বুঝে সমঝে চল্‌বে কিছুদিন—এই বাধ্যতা-প্রসূত নীতিবোধটা সবার মনেই বদ্ধমূল হয়ে গেল।

শ্রমিক মহলের এই অভাবনীয় বশ্যতায় কর্তৃপক্ষ রীতিমত বিস্মিত হয়েছে। আর সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছে বোধকরি শ্রমিকেরা নিজেদের ভীরুতায়। তবে তার জন্য কোনো বেদনাবোধ নেই তাদের। চলে-যাওয়া চাকরীকে আবার ফিরে পেয়ে যেন সকলেই ধন্য! নিজেদের এই অসহায় ভীরুতার ভূতই তাদের দিয়ে বেশি কাজ করিয়ে নিচ্ছে। এখন শুধু কাজের মধ্যে ডুবে থাকাই পরম শান্তি। অপর অস্তিত্বকে যেন ভুলে থাকতে পারলেই ভালো হয়! কিম্বা এই যন্ত্রদেবতার গতিচক্রের সঙ্গে বিলিয়ে বিকিয়ে দিতে চায় এরা নিজস্ব অস্তিত্বকে! অন্ন, আশ্রয়, জীবন—নিছক বেঁচে থাকাটাই যে এত কাম্য, তা এরা নতুন করে অনুভব করছে। এর বেশি আর কিছুই যেন দুনিয়ার কাছে এদের প্রাপ্য নেই!...কে বল্‌বে এরাই একদিন ঘাড় বাঁকিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল, বাঁচার মতো বাঁচতে চেয়েছিল এরাই!

রাতের ট্রেন ধরবে বলে সারথী অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল—প্লাটফরমের এক-প্রান্তে। এখনও গাড়ির অনেক দেরী আছে। শহরের মধ্যে সে আর থাকতে

পারে নি, হাঁপিয়ে উঠেছিল এই নির্বান্ধব জনারণ্যের প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে। তাই সে অনেক আগেই চলে এসেছে স্টেশনে! সঙ্গে জিনিসপত্র বিশেষ কিছু নেই, কম্বলে জড়ানো একটি বিছানা আর একটি টিনের তোরঙ্গ। বাকী সব সে তুলে দিয়ে এসেছে কিষণরাম তেওয়ারীর কোয়ার্টারে। দশ বছর আগে সে প্রথম যখন মানিকপুরের মাটি স্পর্শ করেছিল তখন কিষণরামই একমাত্র ভরসা ছিল। তারপর দিন বদল হয়েছে। কিষণরামের সঙ্গে তার মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হয়েছে বছর তিনেক আগে। মল্লিকসাহেবের পোষা গুণ্ডাদের খাতায় কিষণরামের নামও উঠ্‌ল আর সারথীর সঙ্গে দোস্তীও ঘুচল। দুজনে আলাদা পথের পথিক!

আজ চলে আসবার আগে সারথী সেই পুরনো দিনের স্মৃতিটুকু কিছুতেই মুছে ফেল্‌তে পারে নি, তাই তিলে তিলে সঞ্চিত পার্থিব সম্বলের যতটুকু পেরেছে কিষণরামের হাতে তুলে দিয়ে এসেছে। এত জিনিস তার কি হবে? কোথায় রাখবে সে?

সংসারে তার কেউ নেই। জীবনের ওপর বিন্দুমাত্র মায়া-মমতাও নেই। বোধকরি সেই জন্যই মানিকপুরকে ও মানিকপুরের প্রতিটি লেবারকে এমন আপন ভাবতে পেরেছিল সারথী!

কিষণরাম কারখানার বুট খুলে গামছা ঘাড়ে ফেলে আরাম করছিল। আর সারথী আদর করছিল কিষণের কোলের মেয়ে মনুমায়ীকে।

কিষণরাম বল্‌ল—এখন কোথায় যাবে?

সারথী হেসে জবাব দিল—নসীব আছে আর দুনিয়া আছে! যেদিকে হয় যাবো।

কিষণরামের নিজের দুই কামরার কোয়ার্টারে সারথীর ঠাঁই হতে পারে এমন ইঙ্গিতও কিষণরাম দিয়েছিল কিন্তু সারথী দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে বল্‌ল—আপনার কৃপা অনেক। জীবনে ভুলব না আপনার কথা। এখন বিদায় দিন।

কিষণরাম উদাসীন কণ্ঠে উচ্চারণ করল—জয় রাম জী কী!

তারপর আর সারথী পিছন ফিরে তাকায় নি। রওনা দিয়েছে মানিকপুর

স্টেশনের দিকে—তখনও দিনের আলো কিছু ছিল। ডোমনপ্রসাদের কুস্তীর আখড়ার পাশ দিয়ে সে যখন মোট ঘাড়ে করে, মাথা উঁচু রেখে চলে আসে তখন আশ-পাশের দিকে দৃষ্টি ফেল্‌লে সে হয়ত দেখ্‌ত, বান্দা সিং আর ছোট্টুলাল ঘামঝরা বৈঠক থামিয়ে তাকেই দেখ্‌ছে! ফৈয়াজ মামুদ বিড়ির দোকানের টাট ছেড়ে উঠে এসে তাকে সেলাম করল, কিন্তু সারথী তার জবাবে একটু হাসলো না পর্যন্ত—কারণ সে কিছুই দেখছে না, দেখতে পাচ্ছে না! তার মনের সাম্‌নে মাস-কয়েক আগের একটি প্রভাতী মিছিলের ছবি—সেই ভিড়ের কলরোল সারথীর সর্বসত্তাকে গ্রাস করে রেখেছে।

সেদিন সারথী ছিল জনতার নায়ক। আজ আর কেউ তার পাশে নেই। কেউ তাকে চায় না! পৃথিবীও কি সারথীকে অবজ্ঞা করতে চাইছে?

প্লাটফর্মে পৌঁছে বিছানার ওপর চেপে বসল সারথী। সন্ধ্যাও নামলো।

অন্ধকার প্লাটফরমের আলো জ্বল্‌ল একটি-একটি করে। ট্রেন আসতে আর বেশি দেরী নেই।

এমন সময়ে একটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ালো সারথীর পাশে। মাথায় পাগড়ী বাঁধা, এমনভাবে মুখখানা ঢাকা যে চট্‌ করে কিষণরামকে চেনা যাচ্ছে না। সে এসে সারথীর ডান হাতখানা ধরল—ক্ষমা করো ভাই!

চম্‌কে উঠে দাঁড়িয়ে সারথী বল্‌ল—তেওয়ারীজী, আপ কাহে আয়ে হেঁ? কেউ যদি দেখে ফ্যালে! না, না, কাজটা ভালো করেন নি—চলে যান আপনি।

কিষণরাম আর্দ্রস্বরে বলল—সারথীজী, তোমার মতো সাঁচ্চা মানুষকে আজ মানিকপুর তাড়িয়ে দিল, বড় খারাপ হ'ল—খুব অন্যায় হ'ল।

সারথী বল্‌—ঝুট্‌মুট্‌ দুষমনের নজরে পড়বেন কেন, আপনি চলে যান তেওয়ারীজী! আপনার ক্ষতি হ'লে বড় কষ্ট পাবো—মন্নুমায়ী, বাল্‌কিষণ এদের ভালাইএর কথা ভাবুন। আরে আমি ত নাঙ্গা আদ্‌মী, আমার ডর কি আছে? না ফকীর, না বাদ্‌শা—সব বরাবর।

—কিন্তু না হক চুরীর পয়জার তোমার গায়ে ছুঁড়ে মারল, শালা দালালের দল—ছি-ছি! এমন বেইমানী—

সারথী নির্লিপ্তভাবে বল্‌ল—আরে যানে দিজিয়ে। আমার গায়ে ত লাগেনি, ওই জুতো আবার ওরাই ফিরে পাবে ডবল চোটে।

কিষণরাম হেসে উঠল—তুমি ওদের মানুষ ঠাওরাচ্ছ নাকি? তা যদি হ'ত তবে এমন কাজ করতেই পারত না ভাই। আমি নিজেকে দিয়ে ত বুঝতে পারি—ওদের দুষবো কী! আমিই কি কম হারামীপনা করি! আজ যদি আমি হারামী না হতাম, ত তোমাকে এভাবে চলে যেতে হয়? রাম জী জানেন সব।

—তেওয়ারীজী, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, আবার যখন দরকার হবে যদি বেঁচে থাকি ত ঠিক হাজির হবো। তখন হয়তো আর ফিরে যেতে হবে না।

—কিন্তু সারথীজী, আর ভালো লাগে না। যা হয়েছিল, হয়েছিল—মিটেই যখন গিয়েছে তখন ঝুট্‌মুট্‌ বদ্‌নাম দিয়ে খাঁটি মানুষগুলোকে কুত্তার মত তাড়িয়ে দেওয়ার কি মানে হয়? এ ত বিল্‌কুল্‌ বেইমানী।

—বেইমানী তা কি কেউ বোঝে না তেওয়ারীজী? ওই যে হরিরাম আমাকে বল্‌ল তার হাতে কাজ আছে, তার চোরাই সাফাই উলটুকু সে কারখানার এরিয়া পার করে কোয়ার্টারে পৌছে দিতে বল্‌ল—তারপর সে-ই যে গেটে ওয়াচওয়ার্ডের কানে খবর ভেজে দিল, কোনো সময়ে কি নিজের ধরমের কাছে এ কৈফিয়ৎ করবে না সে? আরে ভাই, আমার নোক্‌রী গেল—ব্যস! গেল ত গেল। আমি বুঝলাম দোস্ত-এর গোস্তাকী আমার হ'ল। ব্যস! লেকিন, জান্‌বর হয়ে বেঁচে থেকে কি ফয়দা আছে তেওয়ারীজি, আপ শোচিয়ে!

কিষণরাম সারথীকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেল্‌ল—সারথীজী, হারাম-সে-হারাম এই কিষণরামকে তুমি সাথে নিয়ে চলো ভাই। আর ঝক্‌মারী বরদাস্ত হয় না। দুষমণ-সে-দুষমণ ওই মল্লিকসাহেবের রংবাজী দিগদারী ভালো লাগে না। ছি-ছি-ছি!

সারথী কিষণরামের পায়ে হাত দিয়ে বল্‌ল—বিশ্বাস করুন তেওয়ারীজী, দোষ ওদের নয়। আমাদের কলিজার জোর নেই, আমাদের মগজে ঘিউ

নেই, তাই ওরা আমাদের কুত্তার মতো দুটো ভাত দিয়ে খাটিয়ে নিচ্ছে। এর চেয়ে কুত্তাও তো ভালো! যাক, আপনি ফিরে যান। আজ যাবার সময় দিলটা খুশিতে ভরে উঠ্‌ল—আপনার মতো যদি সবাই বোঝে তবে আর ভাবনা কী?

দূরে ট্রেনের বাঁশী বাজ্‌ছে। পাশের লাইনে আগতপ্রায় রেলগাড়ির গতির সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। লোহায় কাঁপন লেগেছে।

সারথী বল্‌ল—দেরী করবেন না, তুরন্ত চলে যান।

শেষ বারের মতো কিষণরাম তেওয়ারী সারথীর হাতে হাত রেখে বল্‌ল—এ হাত দিয়ে বেইমানীর লাঠি আর শক্ত করে ধরতে পারব না সারথীজী! জয় রাম জী কী!

সারথী রুদ্ধ আবেগে গাঢ় স্বরে শুধু বল্‌ল—ভগবান সবার ভালো করবেন।

কিষণরাম চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল, যাবার সময় বল্‌ল—আবার ফিরে এস ভাই!

—জরুর, আসতেই হবে। সবাইকেই ফিরতে হবে। জমানাও পাল্টে যাবে। লেকিন দু-রোজ আগে কি দশ রোজ পরে—এই ত মাম্‌লা তেওয়ারীজী!

পঁচিশ

ভারতীয় ক্লাবের বার্ষিক উৎসব এবারে খুব জাঁকালো হবে। কিছুদিন ধরে তার উদ্যোগ-আয়োজন চল্‌ল। অবিনাশ অনেক তালিম দিয়ে মুকুলকে তৈরী করল। সাধারণ নিয়মে প্রোগ্রামের মধ্যে স্থান পাবার কথা নয় মুকুলের। তার চেয়ে অনেক ভালো গায়ক-গায়িকার নাম বাতিল হয়েছে, কলকাতা থেকে বিস্তর পয়সা খরচ করে 'আর্টিস্ট' আনানো হচ্ছে। তবে সীতানাথ মুখুয্যের মেয়ে হিসেবে মুকুলের নতুন খাতির গড়ে উঠেছে, অতএব মুকুল মুখার্জি আধুনিক বাংলা গানের প্রোগ্রাম পেল। আর অবিনাশ তার সঙ্গে তবলা সঙ্গত করবে ঠিক রইল। সেই সুবাদে অবিনাশ দু'বেলাই আসছে এ বাড়িতে। সকালে কারখানা যাবার আগে, আবার সন্ধ্যায়! চা জলখাবারও এখানেই চল্‌ছে তার।

সেদিন সকালে দেবজ্যোতির মা বল্‌লেন—আজ আর উঠ্‌তে পারছি না রে, মাথাটা কেমন ঘুরছে!

মল্লিকা স্নান করে চুল আঁচ্‌ড়াচ্ছিল, বল্‌ল—হবে না, কাল সারারাত ত ঠায় বসে কাটিয়েছ! আচ্ছা মা ওদের ত অবস্থা খারাপ নয়, নার্স কি দাই ডাকতেও ত পারত, তা নয় তোমার ওপর যতো আবদার!

দেবিকা তখনো বিছানা ছেড়ে ওঠে নি, শুয়ে শুয়েই বল্‌ল—বাবা খুব রাগ করছিলেন, এখন আর ওরকম যার তার বাড়ি আঁতুড়-খালাস করতে যাওয়া ভালো দেখায় না তোমার।

মা ক্ষীণ কণ্ঠে বল্‌লেন—থাম দেখি, এককালে ললিতের মা কতো উপকার করেছে! আর আজ দুটো পয়সার মুখ দেখচি বলে কি সেসব কথা ভুলে যাবো! তোদেরই বা এত মাথাব্যথা কেন? কাউকে কিছু করতে হবে না বাপু, আমি উঠ্‌ছি। তোমাদের সংসারের কাজ চালিয়ে দিলেই ত হ'ল!

মল্লিকা ক্ষুণ্ণ হ'ল—তোমাকে কি তা-ই বল্লাম! উল্টে আমার ওপর রাগ করছ মা! এই ত একটু আগে বল্লে, যা, একবার ললিতের মায়ের খোঁজ নিয়ে আয়, তা নয় না-ই গেলাম।

মা বল্লেন—তোকে ত কিছু বলি নি, এই যে নবাবজাদী এখনও আরামে শুয়ে রয়েছেন, আর ওই একজন গিয়ে গান গাইছেন—কেন ওরা কেউ কুটোটি নাড়তে চায় না, কেন শুনি! চিরকালই ওদের বাঁদীগিরি করব?

কথা বল্তে বল্তে দেবিকার মা উঠে বস্লেন। তারপর আবার শুয়ে পড়লেন। তাঁর মুখে আর কোনো কথা নেই। মল্লিকা অবাক হয়ে গেল। দেবিকা উঠে মায়ের মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বল্ল—আমার ওপর রাগ করছ মা? আমি না তোমার কোলের মেয়ে, কচি খুকী!

মা ইশারা করলেন—সরে যা, বড্ড কষ্ট হচ্ছে। বুকের মধ্যে কেমন করছে রে!

মল্লিকা উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে এল—কি হ'ল মা?

মায়ের চেহারায় শুধু ক্লান্তির ছাপই ফুটে ওঠেনি, যন্ত্রণায় কেমন বিকৃত করুণ দেখাচ্ছে ওঁর মুখখানা!

—বড্ড হাঁপ ধরছে রে!

মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে, তবু মল্লিকা রান্নাঘর থেকে হাতপাখাটা নিয়ে এসে বাতাস করতে লাগ্ল।

দেবিকা বল্ল—ছোটদি ডাক্তার রায়কে একটা খবর দিলে হয়।

কথাটা মায়ের কানে যেতেই তিনি বল্লেন—না, না, থাক।

মল্লিকা ছোট বোনকে ইশারায় সম্মতি জানালো। দেবিকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে দিয়ে দেবিকা বেরিয়ে যাচ্ছিল, ওকে দেখে অবিনাশ পরিহাস করল—ওঃ, প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু—দিন যাবে আজি ভালো। তারপর দেবিকে, তুমি হঠাৎ এই উদাসীনী বেশে—কোথায় চলেছ?

মুকুল তখনও হারমোনিয়ামের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে যাচ্ছে—রজনীগন্ধা সম, বেদনা ঝরিছে মম।

দেবিকা তাচ্ছিল্য-গম্ভীর ভঙ্গীতে বল্‌ল—মায়ের অসুখ, ডাক্তারকে খবর দিতে যাচ্ছি।

অবিনাশ ত্বরিতে উঠে দাঁড়ালো—সে কী, কই মুকুল ত সেকথা কিছু বলে নি!

মুকুলও হঠাৎ 'বেদনা'তে সুর থামিয়ে বল্‌ল—কি হয়েছে রে?

দেবিকা ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, বল্‌ল—ইচ্ছে হয় গিয়ে দেখতে পার।

অবিনাশ ব্যস্তভাবে বল্‌ল—দেবি, তোমাকে যেতে হবে না। সাইকেল রয়েছে, আমি যাচ্ছি ডাক্তারের কাছে। কিন্তু তার আগে ভেতরে চলো তো দেখি কি ব্যাপার!

দেবিকা সামনে চল্‌তে চল্‌তেই বল্‌ল—আপনারা দেখুন, আমি ততক্ষণে খবরটা দিয়ে আসি। এই ত দুটো লাইন পথ—

আজকাল দেবিকার কি জানি নিজেদের বাড়িটা ভালো লাগে না। বিশেষ করে অবিনাশ যতক্ষণ দিদিকে গান শেখায় ততক্ষণের জন্য এই বাড়িটা ওর কাছে বড়ই দুঃসহ বোধ হয়। দাদার কথা খুব বেশি করে মনে পড়ে। মল্লিকার তবু এবাড়ি-ওবাড়ি গিয়ে সময় কাটানো অভ্যেস আছে, কিন্তু দেবিকা অত্যন্ত একাকী মন নিয়ে থাকে। নিজেদের ছোট পরিবারের বাইরে তেমন করে মিশতে পারে না। তাই ও নিজেদের বাড়ির ছোটখাট অদলবদল খুঁটিনাটি নিয়ে বড় বেশি মাথা ঘামায়।

পথ চল্‌তে চল্‌তে ওর মনে হয়, মা বুঝি বেশিদিন বাঁচবেন না। দিন দিন তাঁর শরীর ভেঙে পড়ছে। আগের মত খাটতে পারেন না, অথচ মুখে সেটা প্রকাশ করতে চান না। মুকুলের ওপর মনে মনে খুব অপ্রসন্ন তিনি। বিশেষ করে সেই জন্যই, সংসারের সব কাজ তিনি একাই করতে চান, মল্লিকা বা দেবিকা কিছু করতে এলেই সরিয়ে দেন। আর আশ্চর্য এই মুকুলের ঔদাসীন্য। বাড়ির কোনো ঘটনাই ওকে বিচলিত করে না। ও যেন অন্য কোনো রাজ্যে বিচরণ করে! কোন্ রাজ্যে, দেবিকার সে বিষয়ে এতটুকু কৌতূহল নেই। আর সীতানাথ মুখুয্যে ত পুরোদস্তুর বাইরের মানুষ হয়ে গেছেন! যতক্ষণ

বাড়ি থাকেন, বাইরের লোকজন কেউ না কেউ তাঁকে ঘিরেই আছে, আর যখন কেউ না থাকে তখন উনিও বেরিয়ে যান। সংসারে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা তাঁর দেখবার অবসর কই? এক যদি দেবজ্যোতি মানিকপুরে এসে থাকতো, তাহ'লে হয়তো এ বাড়ির হাল অন্যরকম হ'ত! কিন্তু সে-ই বা কি করতে পারে, ডাক্তারী পাশের পড়া নিয়ে সে বেচারী ব্যস্ত।

তবু যদি দাদা খবর পায় মায়ের শরীর খারাপ, তাহ'লে এখানে চলে আসবে। দেবিকা তাই করবে। দাদাকে আজই একখানা পত্র দেবে। দাদা আসুক, এসে মায়ের একটা সুব্যবস্থা করুক—শুধু একদিন একজন ডাক্তারের দেখাতে মায়ের অসুখ সারবে বলে দেবিকার বিশ্বাস হয় না। গোটা পরিবারের দুর্ভাবনাই মাকে নিরন্তর অস্থির রেখেছে। একথা আর কেউ না বুঝলেও দেবিকার দৃঢ় ধারণা হয়েছে। শুধু আজ এই মুহূর্তে নয়—কিছুদিন ধরেই ও বেশ বুঝতে পারছে যে, মা আর সামলাতে পারছেন না।

ওর সামনে দিয়েই অবিনাশ সাইকেল হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। নিশ্চয়ই সে ডাক্তারকে খবর দিতে গেল—তবু দেবিকা যাবেই, অবিনাশকে ও স্বীকার করতে রাজী নয়। ওই লোকটা কোথাকার কে যে, দেবিকাদের সংসারের সব ব্যাপারে নাক গলাতে আসবে!

অবিনাশ আবার এই দিকেই ফিরে আসছে, দেবিকা তাকে দেখেও দেখল না—কিন্তু অবিনাশ ব্রেক কষে নেমে পড়ল ওর পাশেই। তারপর একটু হেসে বল্‌ল—দেবী দেবী মহাদেবী শুনুন, ডাক্তারবাবু 'কলে' বেরিয়েছেন। এখন কি করা যায়? অবিশ্যি ওঁর ফর্সা ছেলেকে বলে এলাম, উনি ফিরলেই একবার পাঠিয়ে দিতে—এর পর তুমি যেতে চাও যাও, ছেলেটি বাড়িতেই রয়েছে, দেখা হবে।

অবিনাশের ইঙ্গিতটা দেবিকা বোঝে, কিন্তু এই বিপদের সাম্‌নে ওসব নিয়ে বাজে তর্ক করতে ইচ্ছে নেই। ও বল্‌ল—একবার রামপদবাবুকে খবর দিতে পারলে হ'ত।

অবিনাশ ঘাড় কাৎ করে বল্‌ল—যথা আজ্ঞা, আমি যাত্রা করছি। কিন্তু

অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। তোমার মায়ের নাড়ী আমি পরীক্ষা করেছি, জ্বরটর নেই—দুর্বল বটে, তা একটু রেস্ট নিলেই সাম্‌লে উঠ্‌বেন।

দেবিকা এবার অবিনাশের মুখের দিকে তাকালো, বল্‌লে—ডাক্তার এসে দেখলে ত ক্ষতি কিছু নেই!

অবিনাশ সাইকেলে উঠে একবার পিছন ফিরে নির্লজ্জ দৃষ্টি দিয়ে ওকে যেন লেহন করল! দেবিকা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

আশ্চর্য বই কি—দেবিকা বাড়িতে পা দিয়েই চম্‌কে উঠ্‌ল, দিদির উচ্চকণ্ঠ বিলাপে গোটা বাড়িখানাই ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে কেন? কি হ'ল? উদ্বেগে দেবিকা প্রায় ছুটে গিয়ে ঢুকল মায়ের ঘরে। মল্লিকা একভাবে পাখার বাতাস করছে মাকে, আর মুকুল মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে। দেবিকাকে দেখে মল্লিকা বল্‌ল—ডাক্তারবাবু আসছেন?

—উনি বেরিয়ে গেছেন। রাম ডাক্তারের কাছে পাঠানো হ'ল!

মুকুল উঠে পড়ে বল্‌ল—মা যে কথা বল্‌ছে না রে দেবী, কি হবে?

মল্লিকা শান্ত কণ্ঠে মৃদু ধমক দিল—অমন করছ কেন দিদি? দাঁতী লেগেছে, নাকের কাছে লঙ্কাপোড়া ধরলেই চলে যাবে। তা ডাক্তারকে খবর দিতে গিয়েছে, তাই ওসব করতে চাই নি।

দেবিকা বল্‌ল—রামপদবাবুর কাছে খবর পাঠানো হয়েছে। এখন চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিলে হয়।

মুকুল তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল নিয়ে এল।

দেবিকা ঝুঁকে পড়ে পরখ করল, মায়ের নিশ্বাস পড়ছে ত! ওর মনে হ'ল ক্ষীণ গোঙানীর মত শব্দ হচ্ছে। মায়ের বুকের ভেতরে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে তাহ'লে!

খানিকক্ষণ জলের ঝাপটা দিতে যন্ত্রণা-কাতর শব্দটা যেন বাড়তে লাগল, তারপর আস্তে আস্তে মায়ের চোয়ালের কঠিন ভাবটা কমে গেল। মল্লিকা মুঠিটা খুলে দেবার চেষ্টা করতে আঙুলগুলোও আলগা হয়ে নেতিয়ে পড়ল ভিজে বালিশের ওপর। মুকুল কাঁপা গলায় ডাকতে লাগল,—মা, মা, ও মা, মা গো!

মা সাড়া দিলেন—কি রে খোকা এলি? সেই কখন সাত সকালে শুকনো মুখে বেরিয়ে গেলি আর বাড়ি ফেরার কথা মনেই নেই! খোকন্! কিচ্ছুটি খাস্ নি যে!

দেবিকা এবার ভেঙে পড়ল—ভুল বকছে মা! কি হবে দিদি? বাবাকে একবার কারখানায় খবর দেবো? দাদাকে টেলিগ্রাম করব?

মল্লিকা বল্ল—আমি কিছু বুঝতে পারছি না ভাই! কাকে দিয়েই বা খবর দিই, বল দেখি?

মুকুল আবার ডাকে—মা গো!

শূন্য বিস্ফারিত চোখে মা ঘরের চারিদিকে তাকাচ্ছেন, তাঁর দৃষ্টির সামনে যেন কিছু নেই! মুকুল মায়ের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে আকুল কণ্ঠে বলে—ওগো মা গো—!

আস্তে আস্তে দৃষ্টিটা স্থির হয়ে গেল একেবারে। উজ্জ্বল কঠিন দুটি চোখে যেন দুনিয়ার উপেক্ষা জমাট বেঁধে উঠ্ল।

আর কোনো কথা বল্লেন না মা।

বাইরে কখন সাইকেল থেমেছে, অবিনাশ কখন ঘরে ঢুকেছে ওরা জানতে পারে নি। চিত্রার্পিত তিনটি বোন ভাগ্যের নিষ্ঠুর আচরণে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

অবিনাশের একটি কথায় ওরা চম্‌কে উঠ্ল—মা কেমন আছেন?

—নেই। মা নেই। তিনজনে একসঙ্গে আর্তস্বরে কঠিন সত্যটাকে যেন ধিক্কার দিল!

ছাব্বিশ

কলেজের পর বাড়ি ফিরতেই ছোট মামীমা এসে দাঁড়ালেন, চা জলখাবার দিয়ে গেল বড় মামার মেয়ে সিণ্টু। সবাই কেমন গম্ভীর! অবশ্য দেবজ্যোতির এসব নজরে পড়ে না,—এখনই তাকে বেরুতে হবে—ছাত্র-ফেডারেশনের আফিসে মিটিং আছে।

খাওয়া সারা হতেই ছোট মামীমা হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রামখানা দিলেন। মামীমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেবজ্যোতি প্রশ্ন করল—এটা আবার কী?

মেয়েরা সবাই এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু কেউ কোনো কথা বল্‌ছে না। দেবজ্যোতি টেলিগ্রামের দিকে নজর দিয়ে সবটা পড়ল, তারপব তার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল। সে হাসির কোনো অর্থ নেই।

সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মামীমারা সবাই কাঁদতে লাগলেন। তাঁদের কথা আর কান্নার আতিশয্যে দেবজ্যোতি যেন শক্ত হয়ে উঠ্‌ল! বল্‌ল—কেঁদে কি হবে বলুন, যা হবার তা ত হয়েই গিয়েছে।

বড় মামীমা বল্‌লেন—তিনি গেলেন সতীলক্ষ্মী সিঁথীর সিঁদূর অক্ষয় রেখে। তাঁর আর কী, ভালোই গেলেন। কিন্তু ওই সংসারের এখন কী গতি হবে তাই ভাবি বাবা। তোদের ভাবনাতেই বুক হিম হয়ে আসে। শেষ দেখাটাও হ'ল না। কী যে অসুখ হ'ল কিছুই খবর নেই। আর কপালও এমনি যে, কাল সকালে মারা গিয়েছেন, তার খবর এলো আজ—পায়ে হেঁটে গেলেও যে মানিকপুর এক দিনের পথ, সেইখান থেকে এইটুকু 'তার' আসতে চব্বিশ ঘণ্টা লাগছে! অবাক কাণ্ড!

দেবজ্যোতি আবার হেসে জবাব দিল—একটু নোটিশ পর্যন্ত দিলেন না মা, একেবারে রওনা হয়ে গেলেন। যাক, এখন একবার মানিকপুরে যেতে হয়।

ছোট মামীমা বল্‌লেন—আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো। মেয়ে তিনটে হয়তো কেঁদেকেটে অনর্থ করছে। ঠাকুরজামাই ত বুড়ো মানুষ, তাঁর যে কি হাল হচ্ছে!

দেবজ্যোতি একবার টেলিগ্রাফের কাগজখানার দিকে তাকিয়ে কী ভাবলো তারপর বল্‌ল—যেতে চান চলুন, তবে তার দরকারই বা কি? দুদিন পরে ত সেই একা-একাই থাকতে হবে ওদের!

বড় মামীমা বল্‌লেন—তবু মাথার ওপর একজন থাকা ভালো। প্রথম ধাক্কাটাই সাম্‌লানো শক্ত।

—বেশ। এই রাত নটার গাড়িতেই যাবো। একটু ঘুরে আসছি আমি।

বাড়ির বাইরে এসে দেবজ্যোতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ল।

পৃথিবীর রং এতটুকু বদলায় নি। টেলিগ্রাফের নিয়তি-পত্রটা তখনও তার হাতের মুঠোতে রয়ে গেছে। চারিদিকে ভালো করে চেয়ে দেখলো। খুব আশ্চর্য হয়ে গেল সে। তার জীবনের এতবড় দুঃসংবাদে রোদের, আকাশের, কোনো কিছুরই এতটুকু পরিবর্তন হ'ল না! যেমন এর আগে কখনও কল্পনা করে নি সে, মা একদিন চলে যাবেন—তেমনি ভাবতে পারে নি যে, মায়ের মৃত্যুর পরও পৃথিবীর গতি-প্রকৃতিতে কিছুমাত্র বিকার ঘটবে না!

তার ভাবনার কোনো দাম নেই। মা নেই, পৃথিবী তবু ঠিকই চল্‌ছে!

অনেকদিন পরে দেবজ্যোতির মনে হ'ল যে তার মা তাকে বড় ভালো-বাসেন। এই ভালোবাসাটা অতীতের ঘটনা নয়। এই মুহূর্তে তিনি নতুন করে বেঁচে উঠ্‌লেন যেন! এমন করে ত মায়ের কথা তার মনে পড়ে নি এর আগে। অনেক টুকরো ঘটনার ছবি জীবন্ত হয়ে দেবজ্যোতির মনে এক মধুর আনন্দলোক সৃষ্টি করছে। কতো কথা, কতো বেদনার ছবি, ঝড়ে উড়ে-আসা এলোমেলো পাতার মতো ছুটে আসছে!

বাজারের মোড়ে ভিড় আর কোলাহলের মধ্য দিয়ে পথ চল্‌তে চল্‌তে দেবজ্যোতি দেখতে পায়, মায়ের স্নেহভরা দু-চোখের চাহনীতে কী গভীর মমতা—'খোকা তুই বড় হয়ে মানুষের মতো মানুষ হবি, কেমন!' কিন্তু মানুষের মতো মানুষ হওয়া বুঝি অতই সহজ? দেবজ্যোতি ত কত চেষ্টা করল, কই মায়ের আশা পূর্ণ হ'ল না—তার আগেই এমন অতর্কিতে মা চলে গেলেন। নিমেষের মধ্যে আনন্দের পরিবেশটা কোথায় তলিয়ে গেল! দুঃসহ হাহাকারে বুকের চওড়া ছাতিটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠ্‌ল! মাথার মধ্যে

কিসের দাপাদাপি? দেবজ্যোতির মনের মধ্যে একটা অসহায় শিশু যেন অর্থহীন কান্নায় উত্তাল হয়ে উঠেছে। নিজের এই অস্থিরতা দেবজ্যোতিকে নিজের প্রতি বিরূপ করে তোলে। একটু আগে যেমন মামীমা আর মামাতো বোনেদের সে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিল তেমনি ভাবে নিজেকেও বোঝাতে চেষ্টা করে—ব্যর্থ সে চেষ্টা! বার বার কে যেন বলে তাকে—আপন বল্‌তে আর কেউ রইল না!

ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নিজেকে সে হাজির করলো ফেডারেশনের আফিসে।

তাকে দেখে সবাই সমস্বরে জয়ধ্বনি করে উঠ্‌ল—এবারে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় জেল-ফেডারেশনের সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছে, তাই এত উল্লাস!

দেবজ্যোতিও অতিমাত্রায় আনন্দ প্রকাশ করল। তারপর বল্‌ল—আমাদের হাতে অনেক কাজ রয়েছে। সে কাজ আমার একার নয়, সবারই কাজ, একথা ভুলে গেলে চল্‌বে না ভাই। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিক আমরা, এটা যেন স্মরণ থাকে সব সময়। সেক্রেটারী অর নো সেক্রেটারী, কাজ আমাদের সবারই সমান।

ধীরে ধীরে ঘরের আবহাওয়া গম্ভীর হয়ে এল। জেলা-কংগ্রেসের সভাপতি এসেছেন, তাঁর সঙ্গে আগামী পিকেটিং এবং মিটিং সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হয়ে গেল।

দেবজ্যোতি যখন ফেডারেশন-আফিস থেকে বেরুলো তখন রাত সাড়ে নটা বেজে গেছে। তার সঙ্গীরা তাকে ঘিরে নানা কথা বলছে কিন্তু একটিও দেবজ্যোতির মনে পৌঁছচ্ছে না। বিকেলের শূন্য রিক্ত বিষাদ-বেদনাটা আবার তাকে গ্রাস করেছে। কি যেন নেই, কিছুই যেন নেই—দেবজ্যোতি যেন অবলম্বনহীন মহাশূন্য আঁকড়ে ধরবার মতো কোনো আশ্রয়ই খুঁজে পাচ্ছে না!

একে একে সবাই চলে গেল।

দেবজ্যোতি নিঃসঙ্গ পথে নিজেকে একা পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌ল।

অথচ অনেকক্ষণ আগে থেকেই মিছিল-কলরব ছেড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে

করছিল, তবু পারে নি সে—নিজের ইচ্ছাকে কাজে নিয়োগ করবার শক্তিটুকু যেন নেই, সব অবশ !

বাড়িতে পা দিতেই বড় মামা বল্‌লেন—এমন হলে ত চল্‌বে না বাবা।

দেবজ্যোতি তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

তিনি বল্‌লেন—নটার গাড়িটা ফেল করা ঠিক হয় নি। এখন এই দুপুর রাতে ছোটবৌমাকে নিয়ে যাবি কি করে? কোলের ছেলেটা ত ঘুমিয়ে পড়েছে। আর অণ্টু-মণ্টুও ঘুমোলো বলে।

বড় মামীমা এসে দাঁড়ালেন—আমারই ভুল হয়েছে, এই অবস্থায় তখন একা-একা পথে বেরুতে দেওয়াই উচিত হয়নি।

বড় মামা বল্‌লেন—রাত্রে আর গিয়ে কাজ নেই। এখনকার মতো দুধ ফলটল খেয়ে শুয়ে পড়ো, কাল সকালের গাড়িতে রওনা হয়ো। আমিও রবিবার পৌছবো।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—সাড়ে দশটার ট্রেনটা হয়তো এখনও পেতে পারি। একাই নয় চলে যাই! বরং আপনি ওঁদের নিয়ে যাবেন রবিবার।

বড় মামীমা বল্‌লেন—যা ভালো বোঝো করো বাবা! শেষ দেখাটুকুও আর হ'ল না। তবু তোমাকে দেখে আইবুড়ো বোন তিনটে একটু বুকে বল পাবে। তবে এই রাত-বিরেতে একা একা ছেড়ে দিতে ভরসা হচ্ছে না।

দেবজোতি একটু হাসলো, ম্লান করুণ সে হাসি,—কিছু হবে না একলা গেলে। চলেই যাই।

বড় মামা কম কথার মানুষ, তিনি বল্‌লেন—তবে আর দেরী কর না। গিয়েই একটা খবর দিয়ো। চিকিৎসা-পত্রও কিছু হয় নি বোধ হচ্ছে। সে যাক। এখন শেষ কর্তব্যটুকু ত করতে হবে।

দেবজ্যোতি বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মামীমা বারবার বল্‌লেন—পথে খুব সাবধানে চল্‌বে বাবা। মহাগুরু নিপাতের মতো বড় দুর্গ্রহ আর কিছু নেই। খুব সাবধান, একা যাচ্ছ।

আর ছোট মামীমা অশ্রুনত মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দেবজ্যোতির মনে হচ্ছে, মা নেই। কিন্তু তারপরেই বড় বেশি করে ধরা পড়ছে মা ছিলেন। বৃদ্ধ সীতানাথ মুখুয্যের মুখের চেহারাটা এখন কেমন হয়েছে? তার বাবাকে দেবজ্যোতি এখন সাধারণ দুর্ভাগ্য ভদ্রলোক হিসেবেই দেখতে পাচ্ছে যেন! তিনি কি খুব মুষড়ে পড়েছেন? খুব কি অসহায় হয়ে পড়েছেন? অনেক চেষ্টা করেও দেবজ্যোতি কল্পনা করতে পারে না সীতানাথ মুখুয্যের নতুন কোয়ার্টারের এই মুহূর্তে কি অবস্থা! একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা তার মনে চমক দিয়ে যায়—এই নতুন কোয়ার্টারে যেন মাকে ঠিক মানাতো না! পুরনো সেই একখানা ঘরের জিনিসপত্র ঠাসা অথচ গোছানো সংসারে যে মাকে সে দেখেছে, এই ক্ষণে সেই মায়ের মূর্তিটাই প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে।...

মা সেদিন বল্‌ছিলেন—হ্যাঁরে, তেমন ভয়ের কিছু নেই ত?

সীতানাথের জন্য উদ্বেগে তাঁর মন আকুলতায় আনচান করেছে। কে জানতো যে মা নিজেই চলে যাবেন!

মেলট্রেন মানিকপুরে ধরে না। জংশনের প্লাটফর্মে পা দিয়ে দেবজ্যোতি খুশি হয়ে উঠ্‌ল। নিশুতি রাতে একা-একা বেশ লাগবে পথ চলতে। মানিকপুরের ছবিটা দূর থেকে মনে মনে দেখার নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। ঠিক এই সময়ে নিরানন্দ শোকের পরিবেশে যাবার মতো মনোভাব তার নেই। এমন নির্লিপ্ত পর-পর ঔদাসীন্য দেবজ্যোতির আগে কখনও হয় নি। · এই পথে একা-একা রাত-বিরেতে এখনও খুন-জখম হয়—চার মাইলের মধ্যে যতটুকু শহরের এলাকা ততটুকু অবশ্য নিরাপদ। কিন্তু শহর ছাড়িয়ে আড়াই মাইল নির্জন গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, তার দুপাশে ধূ-ধূ মাঠ। একটা মদের ভাঁটি ছাড়া বসতি বলতে বিশেষ কিছু নেই। ভাঁটিখানার আশে পাশেই প্রায় খুন-জখম হয়। এখন সে সব কথা আদৌ দেবজ্যোতির মনে কোনো শঙ্কা জাগায় না। জনহীন পথে হাঁটতে হাঁটতে দেবজ্যোতি তারাভরা আকাশের দিকে মাঝে মাঝে তাকায় আর ভাবে—আজকের এই রাতের কথা যতদিন বাঁচবো ততদিন মনে থাকবে।

আনন্দ নয়, বেদনা নয়, হাসি-কান্নার নাগাল পেরিয়ে কী এক অবর্ণনীয়

অনুভূতিতে দেবজ্যোতির অন্তরলোক ভরে উঠেছে, সে আর কোনো দিন এমন কিছু খুঁজে পায় নি! আনন্দ-বেদনার অতীত এ এক অপূর্ব রহস্য-লোকের সন্ধান কেউ কোনোদিন তাকে দিতে পারতো না। মায়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই এক আশ্চর্য অভিজ্ঞান সে পেল—এর কোনো রূপ নেই, এর কোনো পার্থিব সংজ্ঞাও বুঝি হয় না! অতীন্দ্রিয় বৃহতের স্পর্শ বলে যদি কিছু থাকে তবে এই অনুভূতি তারই সমগোত্রীয়।

দেবজ্যোতি এই অপূর্ব লোকের সন্ধান পেয়েও কিছুমাত্র বিস্মিত বা বিচলিত হ'ল না—একটা নির্লিপ্ততা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। সে বেশ বুঝতে পারে—এর পর অনায়াসেই দেশের কাজে নিজেকে ঢেলে দিতে পারবে। এই মুক্তিই কি সে মনে মনে চেয়েছিল যা তার মায়ের মৃত্যুর মধ্যে ধরা দিল!

সাতাশ

হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌ল দেবজ্যোতি। খট্‌খট্ বুটের শব্দ তার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। সাম্‌নের দিকে তাকিয়ে দেখল, শাদাকালো একটা বেড়া তার রাস্তাটা আগলে বন্ধ করে রেখেছে।

বুটের আওয়াজ থামিয়ে লোকটি প্রশ্ন করল—কৌন হো?

দেবজ্যোতি দাঁড়িয়ে পড়ল। একটি টর্চের আলো তার মুখের ওপর স্থির হয়ে রয়েছে, সে ভালো করে তাকাতেও পারছে না।

এবার বাংলাতে কে যেন বল্‌ল—আপনি কোথায় যাবেন?

দেবজ্যোতি বিরক্তভাবে জবাব দিল—মুখের ওপর থেকে আলোটা সরান আগে।

আলোটা এবার তার বুকের ওপর পড়ল।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—ব্যাপার কী? এর মানে কি মশাই?

দু-তিনজন হাফশার্ট আর প্যাণ্ট পরা লোক দেবজ্যোতিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একজন বল্‌ল—এত রাত্রে টাউনে যাবার উদ্দেশ্য কি? পাস দেখি আপনার।

—পাস?

—হ্যাঁ, টাউন-পাস ছাড়া ত মানিকপুরের ভেতরে যেতে পারবেন না।

অবাক হয়ে যায় দেবজ্যোতি, সে একটু বিভ্রান্ত হয়ে বলে—সে কি মশাই, নিজের কোয়ার্টারে যেতেও পাস লাগবে নাকি?

—আপনার কথা শুনেই বুঝতে পারছি নতুন লোক। অথচ বল্‌ছেন নিজের কোয়ার্টারে, মানেটা কি মশাই?

অন্য সময়ে একথা শুনলে দেবজ্যোতি রীতিমত চটে যেতো, কিন্তু এখন তার কণ্ঠে স্বাভাবিক বিনীত ভাবই প্রকাশ পেল, সে বলল—আপনারা নতুন লোক প্রমাণ করতে চাচ্ছেন। বেশ ত বিশ্বাস না হয় আসুন আমার সঙ্গে, দেখে যাবেন সত্যি-মিথ্যে।

—গেটে আমাদের গার্ড ডিউটি মশাই, অতশত জানবার দরকার নেই। মানিকপুর এখন প্রোটেক্‌টেড টাউন—পাস থাকলে ঢুকতে পাবেন, না থাকলে পাবেন না।

—তা হলে সারারাত এই মাঠে বসে কাটাই, এই আপনাদের ইচ্ছে!

—রাত বলে নয়, দিনের বেলাও এই আইন। ঢুকতে গেলে পাস চাই, মানিকপুর এখন প্রোটেকটেড টাউন। যুদ্ধের আইন খুব কড়া। আপনি উইদাওট পাস ঢুকলেই এ্যারেস্ট করা হবে।

—এ আইনটি কবে হলো?

—চারদিন হয়েছে।

—তাই বলুন। কিন্তু আমাকে যে ঢুকতেই হবে। আগে খবর পেলে পাসের ব্যবস্থা করেই আসা যেত। কিন্তু হঠাৎ বিকেলে টেলিগ্রাম পেয়েই রওনা হয়েছি।

—টেলিগ্রাম পেলেন আর এতবড় একটা আইনের খবরটা পেলেন না? বাঃ!

— পেলে কি আর দুপুর রাতে আপনাদের সঙ্গে রসিকতা করতে আসি?

—ওসব আমরা বুঝি না—আমরা ডিউটি করছি মশাই।

—আপনাদের ডিউটিতে মায়ের মৃত্যু-সংবাদও নিশ্চয় বিবেচনার নিয়ম নেই। যাক কি আর করা—আমি ঢুকতে চেষ্টা করি, তারপর আপনারা এ্যারেস্ট করুন। তারপর ত আপনাদের কর্তাদের মারফতে মল্লিকসাহেবের কাছে একটা খবর পাঠাতে পারবো।

অপর পক্ষের কণ্ঠস্বরে কিছুটা বিনয়ের আভাস ফুটে ওঠে—মল্লিকসাহেবের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক, জান্‌তে পারি কি?

দেবজ্যোতি বলল—সে আর এখন শুনে কি হবে? আপনারা ডিউটি করছেন, এ্যারেস্ট করুন, বেশি ত কিছু কথা থাকতে পারে না।

—দেখুন, আপনারা এইভাবে ল ব্রেক করলে আমরা নাচার। মশাই, আইন করলে সেটা মান্‌তে হয়।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—বুঝেছি। বল্‌ছি ত এ্যারেস্ট করুন।

—অযথা রাগ করছেন আপনি। যান—

বলে লোকটি ইশারা করতেই বেড়াটা সরে গেল। বুটের শব্দে স্তব্ধ রাত্রি যেন আর্তনাদ করে উঠ্‌ল!

দেবজ্যোতি বল্‌ল—আমার নাম দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, নোট করে রাখুন, আমার বাবা সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, কোয়ার্টার নম্বর এফ, বি, ১২। ধন্যবাদ, নমস্কার।

—নমস্কার। কিন্তু স্যার, কালই একটা টাউন-পাস করিয়ে নেবেন। কারণ তিন দিনের মধ্যেই খুব কড়াকড়ি শুরু হবে। তখন মল্লিকসাহেবের নিজেরও ঢুক্‌তে বেরুতে পাস লাগবে বুঝলেন!

—আচ্ছা তাই হবে।

সারা মানিকপুর যেন অন্ধকারের অতলে ডুবে গিয়েছে! পথের আলো-গুলো ঢেকে দেওয়া হয়েছে কালো ঠুঙ্গী পরিয়ে। পথে একটিও মানুষ নেই। কারখানার নিশ্বাস পড়ছে। শোঁ-শোঁ শব্দ। আর রাবণের চিতার মতো আগুনের শিখাটা জল্‌ছে না কারখানার মাথা ছাপিয়ে।

দেবজ্যোতি কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিক তাকিয়ে দেখল। তারপর বারান্দায় উঠে তার মনে হ'ল যেন বৈঠকখানাতে কারা কথা কইছে! কিন্তু পরক্ষণে আর কোনো শব্দ শুন্‌তে পেল না সে। হয়তো তার মনেরই ভুল—আস্তে আস্তে কড়া নাড়ল।

তারপর আরও জোরে কড়া নাড়্‌তে লাগ্‌ল—এবার ঘুম-জড়ানো পুরুষকণ্ঠে জবাব এল—হুঁ! কে? কে?

—আমি।

—কে?

—আমি দেবু।

—ও আপনি, দেবজ্যোতি বাবু? দাঁড়ান।

দরজা খুলে অবিনাশ চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে বল্‌ল—এত রাতে এখন কোন্ ট্রেনে এলেন?

অবিনাশকে দেখে দেবজ্যোতি মনে মনে অপ্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল। তবু জবাব দিল—বরাকর জংশনে নেমে হাঁটতে হাঁটতে আসছি।

—তা নয় বুঝলাম, টাউন-গেটে ছাড়া পেলেন কি করে? আমি ত কাল রাতে সাইকেল নিয়ে একবার মানিকপুরে, একবার জংশনে ছুটোছুটি করেছি আপনার জন্যে পকেট পাস নিয়ে। তা এলেন না। ভাবলাম, বুঝি দেশের কাজ যারা করে তাদের মায়ের মৃত্যু-টিত্যুর জন্যে মাথাঘামানোর অবসর নেই।—আজ আর যাই নি।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—আজ বিকেলে ত টেলিগ্রাম পেলাম!

—কি কাণ্ড বলুন দেখি! আর্জেন্ট এক্সপ্রেস টেলি করেছি কাল বেলা দশটায়, আর সেটা—এ্যাঁ! যাক্‌, খাওয়াদাওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—তাহলে এখন শুয়ে পড়ুন। এদিকে আমি পড়েছি মহা ফ্যাসাদে মশাই। এরা সবাই এমন কান্নাকাটি করছে। ওদিকে আপনার বাবার ত ব্রেক ডাউন ডিউটি পড়েছে। কাল সবে শ্মশান থেকে ফিরে একটু জিরোচ্ছেন, এমন সময়ে ছ-ছটা সিটি পড়ল—অমনি হুড়তে পুড়তে ছুটতে হ'ল। উনি যাবার সময় বলে গেলেন, দেখো ভাই, আমি চল্‌লাম। তারপর আজ দুপুরে বুঝি একবার এসেছিলেন—পাওয়ার প্ল্যাণ্টে সাংঘাতিক একসিডেণ্ট হয়েছে, একটুর জন্যে অনেকগুলো লোক প্রাণে বেঁচেছে। চার জন জখম হয়েছে। এখন সব সাহেব-মিস্ত্রীর ফুরসুৎ ফেলবার অবসর নেই। খুব কামাচ্ছে সব, বুঝলেন? আর আমি বোকা বনে শ্বশুরের মানে আপনাদের সংসার আগ্‌লাচ্ছি। ও কি, অমন কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দেবজ্যোতি চেয়ারে বসে পড়ল—হুঁ!

অবিনাশ বিড়ি ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে বল্‌ল—শক্ত হতে হবে দেববাবু! আমারও ছেলেবেলাতেই মা মারা গিয়েছেন। সাম্‌লানো কঠিন—কিন্তু কি করবেন বলুন! অনেক রাত হয়েছে ভাই। ওরা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। আপনি এখানেই লেটে যান।

—আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি দেখছি।

বলে দেবজ্যোতি বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

অবিনাশ বিছানার উপর বসে বিড়ি টানতে লাগল।

বারান্দার আলো জ্বেলে দেবজ্যোতি দাঁড়িয়ে মাথার চুলগুলো মুঠোর মধ্যে ধরে কি যেন ভাবছে! এমন সময়ে সীতানাথের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল মুকুল।

—দাদা তুমি এসেছ? আমাদের কি হবে দাদা?

—কে? ও, মুকুল, তুই ঘুমোস নি?

—ঘুম আর আসবে না। মা যে আমার ওপর রাগ করে চলে গেল দাদা! বড় কষ্ট হচ্ছে, কেন মায়ের বারণ শুনিনি! তোমরা কেউ আমাকে ক্ষমা করো না। আমি পাপী। আমার জন্যে তোমাদের সকলের সর্বনাশ হয়েছে দাদা।

দেবজ্যোতি বোনের কাছে এগিয়ে গিয়ে, নিজের কোলে টেনে নিয়ে আর্দ্র স্বরে বল্‌ল—অমন করে না রে! মায়ের আত্মাকে শান্তি পেতে দে, কাঁদলে তাঁর কষ্ট হবে। আর তুই যদি এরকম পাগলের মত কাঁদিস তবে তোর চেয়ে ছোট যারা, তাদের দেখবে কে?

—না, না, তুমি জানো না দাদা। আমি পাপী, আমাকে ছুঁলেও পাপ হয়। তুমি ছুঁয়ো না আমাকে। তোমাদের সকলের সর্বনাশ হ'ল যে দাদা!

কান্নায় কান্নায় মুকুল ভেঙে পড়ল।

অবিনাশ বেরিয়ে এসেছে, পোড়া বিড়িটা হাতে ধরেই সে বল্‌ল—আবার তুমি ওই সব শুরু করেছ! উনি এলেন এই সাত মাইল পথ হেঁটে। রাত জেগে চোখ দুটো ভয়ানক লাল হয়ে উঠেছে। একটু জিরোতে দেবে না মানুষটাকে?

মুকুল ঝাঁঝিয়ে উঠ্‌ল—তুমি কেন এখানে? যাও,—বলছি।

অবিনাশ বলল—যাচ্ছি। কিন্তু ওঁর শোবার ব্যবস্থাটা করো।

—কি করতে হবে-না-হবে আমি বুঝবো। তোমার পরামর্শ চাই না।

দেবজ্যোতি ধীরে বলল—মুকুল, মুকুল! কি হয়েছে তোর? এমন কেন করছিস? মার কি হয়েছিল বল তো!

—মার কিছু হয় নি, রাগ করে চলে গেলেন দাদা! একটি কথাও বলে যান নি। শুধু তোমাকে খুঁজেছিলেন।

একটু থেমে আবার কান্নার স্বরে বলল মুকুল—আমারই ত যতো দোষ। কিন্তু কেউ সেটা বুঝিয়ে দিল না দাদা! তুমি থাকলে এমনটা হ'ত না। জানো দাদা, আমি অনেক নীচে নেমে গেছি। এত নীচে নেমেছি—ছি-ছি!···

কথা বলতে বলতে মুকুল আবেগে উত্তেজনায় থর-থর করে কাঁপছে। এখুনি যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়বে ও। দেবজ্যোতি মুকুলকে ধরল, তারপর বলল—অবিনাশবাবু আপনি ঘরে যান। আমি ওকে সাম্‌লাচ্ছি।

নিঃশব্দে অবিনাশ বৈঠকখানায় চলে গেল। মুকুল দেবজ্যোতির বুকে মুখ গুঁজে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল। দেবজ্যোতি তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—একটু শান্ত হ'তে চেষ্টা কর, ঘরে চল মুকু!

দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখল মুকুল! দেবজ্যোতির পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকল। মেঝেতে কম্বল পেতে ওরা শুয়েছে। মল্লিকা আর দেবিকা ঘুমে অচেতন। মুকুল আলো জ্বালতেই দেবজ্যোতি নিভিয়ে দিতে ইশারা করল। মেঝেতে বসে পড়ে বলল—নে, শুয়ে পড়। একটু ঘুমো দেখি।

—আমাকে ঘুমোতে বলো না দাদা। বুকের ভেতরে আমার কী যে জ্বালা—যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি! কেউ ত বোঝে না। কেউ জানে না আমার দুঃখ্। আচ্ছা দাদা—

—কি বল।

—বলব। তোমাকে বলতে পারলে হয় তো কষ্ট একটু কমবে। কিন্তু সেকথা যে বলা যায় না। বিষ—আমার সারা শরীরে বিষ ছড়ানো! না, না, সে আমি বলতে পারব না। তুমি কত উঁচু, তুমি দেবতা—তোমাকে কেন কষ্ট দেবো? আমি তোমার বোন, এ পরিচয় আর ত দেওয়া যাবে না—তা হ'লে তোমায় ছোট করা হবে। না, না, সে তুমি সইতে পারবে না।

—মা চলে গেলেন, তার চেয়ে বড় আঘাত তুই আর কি দিবি? এখন ঘুমো।

একটু চুপ করে থেকে মুকুল শ্রান্ত কণ্ঠে বলল—তুমি এখানেই শুয়ে পড়ো, একটু ঘুমোও বরং।

—কিন্তু তোর কথা? কি যেন বলবি!

—আমার কথা আর শুনে কাজ নেই, শুনলে আর ঘুমোতে পারবে না। পরে ত জানতেই পারবে সব।

—তোদের যে কী হয়েছে জানিনে। কিন্তু মার কি অসুখ করেছিল বলবি ত?

—সব শুনো কাল সকালে। এখন একটু ঘুমোও ত। শেষে তোমার আবার রাত জেগে অসুখ না করে।

মুকুল জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। দেবজ্যোতি শুয়ে পড়ে সেই দিকেই তাকিয়ে রইল। কেউই কোনো কথা না কয়ে নীরব সান্নিধ্যের একটা অবাচ্য অন্তরঙ্গতা অনুভব করে যেন! অনেক—অনেক কাল পরে যেন ভাইবোনের দেখা হয়ে গেল! দু'জনেরই হয়তো কত পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে—যে সব দিনে ওদের মা ছিলেন ওদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে, ওরা মায়ের মুখের পানে তাকিয়েই যে কালে নিবিড় ভাবে বেড়ে উঠেছে সেই সব দিনের কতো ছবিই নীরব মনকে জাগিয়ে রাখে! এই নিশুতি রাতে কারখানাটা এখনও চলছে—আগেও চলছে—আরও কতকাল এমনি চলবে! শব্দ ভেসে আসছে, ওরা শুনতে পাচ্ছে!

কারখানার ধ্বক্-ধ্বক্ শব্দটা আবার কতকাল পরে যেন ওরা নতুন করে শুন্‌তে পাচ্ছে! একটানা বৈচিত্র্যবর্জিত এই যন্ত্রের নিশ্বাস যেন জীবন্ত মানুষের মতোই প্রাণময়—মুখর। দেবজ্যোতির মনে পড়ে এককালে ছেলেবেলায় মুকুল বল্‌ত—'আক্কসটা আসছে।' সেই রাক্ষস যেন আবার আসছে! ছোটবোনের মাথায় থোপা-থোপা চুল, ঘন ঘন মাথা নেড়ে দাদাকে ভয় দেখাতো, চোখ দুটো বড় বড় করে বল্‌ত—'দাদা, দুত্তুমি করে না—ও আক্কসটা আসছে—হুঁম্। বাবা!'

আপন মনে দেবজ্যোতি হেসে উঠ্‌ল।

মুকুলও জেগে আছে। সেও শুন্‌ছে ইঞ্জিনের আওয়াজ। কিন্তু ওর মনে

অন্য কথা। মায়ের কথা নয়, নিজের কথাই ও ভাবছে। ওই কারখানার জলন্ত চুল্লীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে বেশ হ'ত—ওই আগুনে জলে পুড়ে সব ছাই হয়ে যেত তাহলে। কিন্তু, তার বদলে মুকুল বুঝি নিজের বুকের মধ্যেই জলন্ত চুল্লী পুষে রেখেছে!

মুকুল হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকারে বলল—বাবাকে বল্‌তে পারবো না, তুমি জেনে রাখো—আমার বিয়ে না হ'লে খুব কেলেঙ্কারী হবে, মাস দুয়ের মধ্যেই বিয়ের ব্যবস্থা করো!

দেবজ্যোতি নির্লিপ্তভাবেই প্রশ্ন করে—কেন?

—সেটুকু জানতে চেয়ো না। ওই অবিনাশ—হ্যাঁ, ওর সঙ্গেই বিয়ে হবে। বুঝলে?

—আচ্ছা। তাই হবে।

কয়েক মিনিট দু'জনেই চুপচাপ।

মুকুল আবার বল্‌ল—লোকটা খুব খারাপ।

দেবজ্যোতি কোনো সাড়া দিল না।

মুকুল নিজের মনেই বলে যায়—তা হ'লেই বা উপায় কী! মেনে নিতে হবে। বুঝলে? আমিও ওর সঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে গিয়েছি।

এবার দেবজ্যোতি বল্‌ল—মায়ের কাজটা আগে মিটুক।

নীরবে মুকুল অন্ধকার রাত্রির বুকে অসহায় অশ্রুধারা বিলিয়ে দিচ্ছে—দেবজ্যোতি তা দেখতে পেল না। সে আপন মনে ধীরে ধীরে বলেই চল্‌ল—এ বাড়িতে আর কিছুই রইল না। মা গেলেন। তুইও যাচ্ছিস। বাবাকে দেখবে কে? মল্লি আর দেবীর একটা ব্যবস্থা হ'লেই মিটে যায়—হয়ত তাও হবে। কিন্তু সীতানাথ মুখুয্যে—আহা বেচারী!

ইঞ্জিনের শব্দটা যেন হঠাৎ বেড়ে গেল! ওরই সঙ্গে বুঝি মিশে রয়েছে বৃদ্ধ সীতানাথ মুখুয্যের শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতিধ্বনি! দেবজ্যোতি শুন্‌তে চেষ্টা করে সেই শব্দটা। জীবনে আজ এই প্রথম মুহূর্ত যে ক্ষণে দেবজ্যোতি নিজেকে অত্যন্ত অসহায় অনুভব করে। সে ধরতে পারছে যে, সত্যিকার কোনো কাজেই সে লাগতে পারল না, কিছুই করবার শক্তি নেই তার। এ সংসারে সে মাত্র একজন অকর্মণ্য দর্শক।

আটাশ

সকালের আবহাওয়া একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। গত রাত্রিটাকে এখন অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে। একটু বেলাতেই তার ঘুম ভেঙেছে। জেগে উঠে সে দেখল, ঘরে কেউ নেই। কিন্তু বাইরে অনেকরকম কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

ভালো করে তাকিয়ে সে দেখল, নতুন কেনা একটা বড় ঘড়িতে—দশটা বেজে বাইশ মিনিট।

চমকে সোজা হয়ে বসল সে। জীবনে কখনো এত বেলা পর্যন্ত সে শুয়ে থাকে নি। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। প্রথমেই দেখা হয়ে গেল মিণ্টুর সঙ্গে। দেবজ্যোতি বিস্মিত হয়ে মিণ্টুর বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সহজভাবেই বল্‌ল—কেমন আছো ?

—ভালো। চা খাবে না ? মুখ ধুয়ে এসো !

পিছন থেকে মুকুল বল্‌ল—অশৌচ হয়েছে, চা খেতে নেই যে !

মিণ্টু বল্‌ল—অভ্যেস যাদের, তাদের বেলায় ওসব আইন নেই ভাই।

দেবজ্যোতি হাসলো—কখন এলে মিণ্টু ? কাকামণি কেমন আছেন ?

মিণ্টু বল্‌ল—এই একটু আগে এসেছি। বাবা ভালো আছেন।

একবার অমলা বৌদির কথা মনে হ'ল দেবজ্যোতির, তাঁর খবর আর নেওয়া হয় নি। কেমন আছে ? নিশ্চয় দীনদয়ালের কাছে চিঠিপত্র লিখেছে অমলা। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ হ'ল না।

মল্লিকা রান্নাঘরে হবিষ্যির জন্য মটরডাল বাট্‌ছিল, সেখান থেকেই বল্‌ল—মিণ্টুদির কথা ছেড়ে দাও, রাত্তিরটুকু কেবল বাড়িতে শুতে যায়, নইলে ত সব সময় এখানেই রয়েছে ! আমাদের সঙ্গে সমানে হবিষ্যি করছে !

মিণ্টু অনুযোগের সুরে বল্‌ল—তুই থাম ত ! আলোচাল কাঁচাকলা আমার বড় প্রিয়—তাই ! মল্লি, তুই চায়ের জল চড়িয়ে দে !

—ক' কাপ?

—এক কাপ। আর যদি খেতে ইচ্ছে থাকে ত তোরাও খেতে পারিস। এই, আমার মায়ের বেলা ত বাবা আমাদের বলে দিয়েছিলেন, যার যা অভ্যেস সে তাই করবে—অশৌচের জন্যে মিছে কষ্ট পাওয়ার দরকার নেই।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—হ্যাঁরে মুকু, বাবা ফিরেছেন?

—সকাল বেলা এসেই আবার কোথায় যেন বেরিয়েছেন!

—ও। দেবীকে দেখচি নে?

—কিছু বলছ আমাকে?

বলে দেবিকা এসে দাঁড়ালো সাম্‌নে। ওর ফর্সা মুখখানা রুক্ষ চুলের এলোমেলো ছড়াছড়িতে বিচিত্র দেখাচ্ছে। দেবজ্যোতি সস্নেহে ওর মুখ থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বল্‌ল—পাগ্‌লী! একা-একা কি করছিস?

—মিণ্টুদি একখানা বই এনে দিয়েছে, সেটা পড়ছিলাম।

—তা ভালো। কি বই রে?

মিণ্টু তাড়াতাড়ি জবাব দিল—শরৎচন্দ্রের একখানা বই।

বাইরের দরজায় তখন একজন বৈরাগী এসে একতারা বাজিয়ে গাইতে শুরু করেছে— যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী!

মুকুল ব্যস্তভাবে দেবিকাকে বল্‌ল—যা ওকে বলে দে, আজ ভিক্ষে হবে না।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—বাঃ, বেশ গলা ত! গাইছে তা গাইতে দে না রে!

এবার মুকুল ভ্রূকুঞ্চিত করে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বল্‌ল—যা ভালো বোঝো তোমরা করো না, আমার কী! বাড়িতে অসুখ-বিসুখ বা অশৌচ, এসব থাকলে ভিক্ষে দিতে মানা। তা তোমরা সব লেখাপড়া বেশি শিখেছো—কিছুই মানো না। কিন্তু গেরস্তর মঙ্গলামঙ্গল বলে ত একটা কথা আছে!

দেবজ্যোতি হাসলো—তা বটে, এখন তোর ওপরই ত গেরস্তর শুভাশুভের দায়িত্ব! যাক গে, গাইতে বারণ করে দিয়ে আয় দেবি, আর ছাখ—আমার পকেট থেকে চারটে পয়সা নিয়ে ওকে দিবি—বল্‌বি, এটা ভিক্ষে নয়, গান শুনে খুশী হয়ে উপহার দিলাম, বুঝলি?

দেবিকা চলে গেলে, দেবজ্যোতি মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—তাহলে এবার আমাকে থান আর কম্বলের আসন টাসন যা দেবার সেসব দে!

মল্লিকার চোখে উদ্গত অশ্রু যেন ঝরে পড়ার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল! দাদার কথায় ও ঝর্‌-ঝর্‌ করে কেঁদে ফেল্‌ল, বল্‌ল—আমি হাতে করে দিতে পারব না। তুমি—

কথাটা শেষ হবার আগেই মিণ্টু অশৌচের কাছা-চাদর-আসন সব এনে দিল দেবজ্যোতির হাতে। সেগুলো নিয়ে দেবজ্যোতি মিনিট খানেক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর স্নানের ঘরে চলে গেল।

দুপুরে হবিষ্যান্নের পালা চুকলে পর সীতানাথ বল্‌লেন—দেবু, তোমার সঙ্গে কিছু বৈষয়িক কথা আছে, আমার সঙ্গে একটু বসতে হবে।

দেবজ্যোতি ঠিক বুঝতে পারে না, কারণ এইভাবে ভূমিকা করে সীতানাথ কোনোদিন কোনো কথাই বলেন নি। চিরকাল তাঁর গতি ঝড়ের মতো, কথা চাবুকের মতো—আজ হঠাৎ এই প্রশান্ত ভঙ্গী দেখে দেবজ্যোতি বিস্মিত হ'ল, তার চেয়েও বেশি অভিভূত হয়ে পড়ল সে। বল্‌ল—বেশ, আমি বাড়িতেই আছি, ডাকবেন।

নতুন চাকরের হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে সীতানাথ বল্‌লেন—সন্ধ্যের পর, অবিনাশও থাকবে—তিনজনেই বসব। এখন একটু বিশ্রাম বড় দরকার, ক'দিন যা গেল!

মায়ের ঘরে মেয়েরা সবাই খেতে বসেছে। দেবজ্যোতি ঢুকে, টেবিল থেকে পড়বার মতো একখানা বই হাতড়াতে হাতড়াতে দেখল সবগুলিই পুরনো। এককালে বার বার এইসব বই সে পড়েছে। আজ কোনো বইই তার মনকে আকর্ষণ করতে পারল না। বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে একখানা 'অভিধান' নজরে পড়ল। অভিধানখানা অচেনা। কোথা থেকে এল? হাতে তুলে নিয়ে খুলে দেখল অভিধানের মলাটের অন্তরালে আসল বইখানা হচ্ছে—'পথের দাবী।' 'পথের দাবী'? এ ত বাজেয়াপ্ত বই! কোথা থেকে, কে আনলো এ বাড়িতে? দেবজ্যোতি লোলুপ দৃষ্টিতে বইখানার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। নাম

শুনেছে সে সব্যসাচীর, কিন্তু বইখানা জোগাড় করতে পারেনি বলে পড়াও হয় নি।

মিণ্টুর দিকে তাকিয়ে সে বল্‌ল—এই বুঝি তোমার শরৎচন্দ্রের বই ?

মিণ্টু জলের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে ঘাড় কাৎ করে জানালো—হুঁ !

বইখানা নিয়ে দেবজ্যোতি বৈঠকখানায় চলে যাচ্ছিল, মিণ্টু বল্‌ল—এখানে বসেই পড়ো না! বাইরের যদি কেউ দেখে ফ্যালে ত বিপদ হ'তে পারে!

দেবজ্যোতি হাসলো—বাইরের বল্‌তে ত বাবা, আর কেউ ত নেই। তা তাঁর কাছে শরৎচন্দ্র আর গোপালচন্দ্রতে কোনো ফারাক নেই। আমাকে সাবধান না করলেও চল্‌তো—দেবীকে বরং সাম্‌লে দিয়ো।

—আচ্ছা, এই সব্যসাচী আর ভারতী দুটি চরিত্রের মধ্যে কতখানি বাস্তব সত্য আছে বল্‌তে পারো দেবুদা ?

মিণ্টুর প্রশ্নটা মন দিয়ে শুনে দেবজ্যোতি বল্‌ল—বইখানা একবারও যে পড়িনি! আগে পড়ি তারপর তোমার কথার জবাব দেবার চেষ্টা করব।

একটু বিস্মিত হ'ল মিণ্টু, বল্‌ল—সে কী ? আমি ত বার চারেক পড়ে ফেলেছি !

—তুমি পেলে কি করে এ বই ?

—মিথ্যে কথা ত তোমাকে বলা চল্‌বে না। অথচ এভাবে জানাজানি হয়ে যাওয়া—

একটু চুপ করে থেকে মিণ্টু বল্‌ল—বাবা !

পাশের ঘর থেকে সীতানাথের তামাক টানার শব্দটা দেবজ্যোতির কানে হঠাৎ খট্‌ করে লাগ্‌লো। সে ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেল।

বিকেলের বেলা গড়াতে-না-গড়াতে অবিনাশের সাইকেল এসে এ বাড়ির নিঝুম আবহাওয়াটা পাল্টে দিল। সীতানাথ হাঁক দিলেন,—ওরে পেনো! পেনো-ও। বাবা প্রাণতোষ, এক কল্‌কে সাজ দেখি ভালো করে! আর ছাখ, দাদাবাবু ঘুম থেকে উঠ্‌ল কি না, তাকে একবার এ ঘরে আস্‌তে বল্‌। কি রে, হাঁ করে দেখছিস কি ? ব্যাটা কালার ডিম !

পেনো হাত নেড়ে বল্‌ল—কি বল্‌ছ আপুনি ?

—বল্‌ব কি, তোমাকে পাটে বসিয়ে পূজো করব বল্‌ছি হতভাগা ! শালা অধিকারীকে বল্‌লাম শান্টিং কুলীকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ো না—তা তখন বল্‌লে যে, ভারী মজবুত আর বুদ্ধিমান, ঠোঁটনাড়া দেখলে মনের কথা প্রাণতোষ আমাদের দিব্যি ধরে ফ্যালে—পেটে বিদ্যের আঁচড় থাকলে বোবা-কালাদের মাস্টারী করতে পারতো ! ধেত্তোর নিকুচি করেছে সস্তার চাকরের !

আর কিছু না বুঝলেও প্রাণতোষ মনিবের মেজাজের আঁচটুকু আন্দাজ করতে পেরেছে। সে বেশ চেঁচিয়েই বল্‌ল—কি বল্‌ছ, একটুন জোরে বলুন না হুজুর !

—কী, আবার চোখ রাঙাচ্ছিস ! বেরো শালা—বেরো, নইলে—বল্‌তে বল্‌তে সীতানাথ ঘুষি পাকিয়ে তেড়ে এলেন।

এর চেয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিতের দরকার ছিল না। প্রাণতোষ ওরফে পেনো, কানে কালা হ'লেও তার কব্জির জোরে সে অভাবটুকু পুষিয়ে নিয়েছে। তাছাড়া একাদিক্রমে লোকোমোটিভ্ ডিপার্টমেণ্টে হাতে হাতিয়ারে কাজ করা তার অনেকদিনের অভ্যাস—চট্ করে আত্মরক্ষার জন্যে তৈরী হ'তে তার মোটেই দেরী লাগে না, ঘুষি বাগিয়ে সে রুখে দাঁড়ালো।

বৃদ্ধ সীতানাথের উদ্যত মুষ্টিকে সে অনায়াসেই ওয়াগনের শিকলের মতো বাগিয়ে ধরল—আহা আপুনি অত চট্‌ছো কেন ? আমি ত আগেই বলে দিয়েছি, সব কথা শুন্‌তে পাই নে। তার জন্যেই এত কম মাইনেতে এই দিনরাতের মেহনতীতে রাজী হইছি। এখন অত গরম হ'লে চল্‌বে কেন ?

অবিনাশ এবার তেড়ে এল—ব্যাটা তুই বাবুর গায়ে হাত তুল্‌লি !

প্রাণতোষ দ্বিতীয় ব্যক্তির মহড়া সাম্‌লাবার জন্যেও তৈরী হয়ে নিল—ছাখেন বাবু, আপনি এর মধ্যে নাক গলাতে এসো না। দুটোকে দুধারে ঠেলে ফেলবার তাগৎ আমার আছে, অমনি কুম্পানী তন্‌খা দিত নি।

এই শুভক্ষেত্রে দেবজ্যোতি হঠাৎ এসে পড়ল—কি হ'ল, এত গোলমাল কিসের ?

সীতানাথ সপ্তমে গলা চড়িয়ে বল্‌লেন—ব্যাটার আস্পদ্ধা দেখ, কি না আমাকে মারতে আসে?

অবিনাশও সঙ্গে সঙ্গে জোগান দিল—আকাট গুণ্ডা, বলে কি আমাকেও কাৎ করে ফেল্‌বে?

দেবজ্যোতি চারিদিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল—ওর আর দোষ কি, আপনারাই ত ওকে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন! লোকটি কানে শুন্‌তে পায় না।

অবিনাশ গর্জে উঠ্‌ল—বটে-বটে, কানে শুনতে পায় না বলে যা খুশী তাই করবে? গায়ে হাত তুলবে? আপনি ত আচ্ছা লোক মশাই!

সীতানাথ অপ্রসন্ন স্বরে বল্‌লেন—বুড়ো বাপকে ধরে ঠ্যাঙাবে সেটাই তুমি চাও, না? জানি জানি!

সীতানাথ রাগে ফেটে পড়লেন।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—আপনারা আমার কথাই শুনলেন না, আগেই রায় দিচ্ছেন।

—বেশ ত বলো না, তোমার বিবেচনাটা দেখি!

—আমি আর কিছুই বলি না, এত হাঙ্গামা না করে, ওর পাওনা যা হয় মিটিয়ে দিয়ে বরখাস্ত করুন। অনবরত একটা কালা লোকের সঙ্গে হৈ-চৈ না করে এটাই ত ভালো। আর এ ধরনের লোক নিয়ে চল্‌তে গেলে মেজাজটা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। সে যখন আপনারা পারবেন না, তখন আর ওকে রাখা কেন?

অবিনাশ কপালের ঘাম মুছে বল্‌ল—মেজাজটা বুঝি ওর একচেটে সম্পত্তি?

—আবার তার ওপর ওর পাওনাগণ্ডার হিসেব ওঠে কি করে! চোখ রাঙাবে, মারধর করবে, তারপর ওকে জুতিয়ে তাড়ানোই ত উচিত বিধান।

সীতানাথ নিজেই তামাক সাজবার জন্যে হুঁকোর মাথা থেকে কল্‌কেটা তুলে নিয়ে বেরুচ্ছিলেন।

প্রাণতোষ খপ করে তাঁর হাত থেকে কল্‌কেটা কেড়ে নিয়ে একগাল হেসে বল্‌ল—এই কথা, তা আগেই বল্‌লে পারতেন বাবু!

সীতানাথ তেড়ে তার কাছ থেকে কল্‌কে নিতে গেলেন—থাক্‌-থাক্‌, তোমার আর খাতিরে কাজ নেই।

প্রাণতোষ বিনয়ে হুয়ে পড়ে সীতানাথের পা ছুঁযে বল্‌ল—হুজুর আমি ছোটলোকের ডিম, রাগের মাথায় আপনাকে খাতির করে কি বলিছি, না বলিছি, সেটা কি আর ধরতে গেলে চলে? আপনার সন্তানের মতো বই ত নই, একটু ছেদ্দাটেদ্দা করে নেবেন।

অবিনাশ বল্‌ল—ব্যাটা মহা শয়তান, আপনি ভালোমানুষ, তাই খুব জো পেয়েছে।

দেবজ্যোতি গম্ভীর ভাবে চৌকীর ওপর কম্বলের আসনটা পেতে বসল।

সীতানাথ বল্‌লেন—হ্যাঁ দেবু, তোমাকে যে জন্যে ডেকেছি। এবার কাজটা মিটিয়ে ফ্যালো। তার জন্যে একটু ফর্দটর্দ করা দরকার—অবিনাশ রয়েছে, তুমি আছো—তোমরাই সব বুঝে-সমঝে করবে। আমি বুড়ো মানুষ, না থাকার মতোই।

অবিনাশ বল্‌ল—তা বল্‌লে কি চলে! আপনি অভিজ্ঞ লোক। মাথার ওপর থেকে দেখাশুনো করবেন। আমরা হুকুম তামিল করব। ব্যাপারটা তো সোজা হচ্ছে না—একটা শোকসভাও করতে হয়।

—সে যা হয় তোমরাই করো বাপু। একটা হিসেব করে খরচপত্র করো। বুঝতেই ত পারছ, সামনে আবার মুকুলের বিয়ে আসছে।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—শোকসভা কেন?

অবিনাশ উত্তেজিত ভাবে উত্তর দিল—ওটা দরকার। দেখুন, ওঁর মতো একজন মহিলা, মানে মানিকপুরে ত মুখুয্যে মশাই একজন বিশিষ্ট নেতা। সবারই ইচ্ছে, তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে একটা সভা করা হয়।

সীতানাথ তামাকের ধোঁয়া গিলে বল্‌লেন—সবাই ধরেছে খুব।

দেবজ্যোতি ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে ছিল, তার দিকে তাকিয়ে সীতানাথ একটু আম্‌তা-আম্‌তা করে বল্‌লেন—আমাদের বিশেষ কিছুই করতে হবে না। অতিথিদের বসবার জায়গা, তা ওই সাম্‌নের মাঠেই হয়ে যাবে।

দেবজ্যোতি বল্‌ল—যা ভালো বোঝেন করুন। মায়ের কথা কতটুকুই বা কে জানে! একটা শো করতে ইচ্ছে হয়েছে—এই ত?

অবিনাশ সর্বজ্ঞের হাসি হেসে বল্‌ল—এ সব না হ'লে এই মানিকপুরের মতো রোথো জায়গায় প্রেস্টিজ-পোজিশন জমানো যায় না ভায়া! অনেক ত দেখলাম। দেবুবাবু, আপনি ঘাব্‌ড়াবেন না—আমার দলবল সব এনে হাজির করবো। আপনি শুধু একখানা ওজস্বিনী স্পীচ দেবেন।

দেবজ্যোতি দু-হাত জোড় করে বল্‌ল—মাপ করবেন। নিজের মায়ের জন্যে মেঠো বক্তৃতা দিয়ে তাঁকে আর হেনস্থা করতে বল্‌বেন না।

অবিনাশ মনে মনে বিরক্ত হ'লেও মুখে কিছু বল্‌তে সাহস করল না। এই অল্পবয়স্ক বেয়াড়া মেজাজের ছোকরাটিকে সে বিলক্ষণ ভয় করে। শুধু বল্‌ল—আচ্ছা, তা হ'লে গুছিয়ে একটা লিখে দেবেন, আমিই স্পীচটা দেবো।

—আচ্ছা ভেবে দেখি।

ব'লে দেবজ্যোতি উঠে পড়ছিল সেখান থেকে।

সীতানাথ বাধা দিলেন—হ্যাঁ, আর একটা কথা। ব'সো একটু—

—আমাকে বল্‌ছেন?

দেবজ্যোতি পিতার দিকে তাকা'লো।

—হ্যাঁ, তোমাকেই।

—বলুন।

—এবার একটু সংসারের দিকে না তাকালে যে চলে না বাবা! তোমার ইয়ে মানে গর্ভধারিণী ত অকালে এতগুলি নাবালিকাকে ছেড়ে চলে গেলেন, একটু আক্কেল-বিবেচনা থাকলে কি কেউ পারে এ ভাবে যেতে? যাক, সে ত যা হবার হয়ে গেল। এখন, একটা উপায় ত চিন্তা করতেই হচ্ছে বাবা! বুঝছো তো!

দেবজ্যোতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সীতানাথের দিকে তাকিয়ে থাকে। সীতানাথ তামাক টেনে বল্‌লেন—মুকুল ত আর কদিন বাদেই নিজের ঘর করতে চল্‌ল। এদিকে আমার কারখানার চাকরী। মল্লি আর দেবীকে ছাখে কে?

যাকে উদ্দেশ করে কথাগুলো বলা হচ্ছে, সে নিরুত্তর। তার চোখে মুখে

একটা আশঙ্কার ছায়াপাত স্পষ্ট। সীতানাথ বল্‌লেন—তোমার যা মেজাজ, তাতে কোনো কথা বল্‌তে ভরসা হয় না। কিন্তু বলি শুধু এই মা-মরা মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে! আমি বাপ হয়ে ত হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি নে! তাই বল্‌ছিলাম যে, কথাগুলো আমার একটু মন দিয়ে শোনো। তারপর ভেবেচিন্তে ছাখো—আগেই ঝেড়ে ফেলে দিয়ো না।

—বলুন।

—সামনের অঘ্রাণে মুকুর বিয়ে দিতে হবে। তার মধ্যে তোমার পরীক্ষা যখন শেষ হচ্ছে না, তখন আর অপেক্ষা করা সমীচীন নয়—ওই মাসেই দিনস্থির করে ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আনতে পারলে ভালো হয়। ও তুমি ডাক্তারী পাশ করে দশবছর ঘস্‌টে পসার জমিয়ে যা আনবে, তার চেয়ে ভালো আয়ের ব্যবস্থাই করবো। হাজার হ'লেও আমি বাপ তো, ছেলের মঙ্গল-চিন্তাটা সব আগেই করি। ভগবানের আশীর্বাদে কোম্পানীর কাছে এখন একটা পোজিশন হয়েছে, কর্তাব্যক্তিরা সমীহ করেন—তোমার গিয়ে মাস গেলে শ-আড়াই টাকা ঘরে আন্‌তে পারবে এমন ব্যবস্থা মানিকপুরেই হয়ে যাবে। তারপর তোমার হাতযশ—ভাগ্য, যা-ই বলো। মোটকথা—বর্ধমানে গিয়ে মামাবাড়িতে পড়ে থাকার আর দরকার নেই। বোনের বিয়ে দেবে যে, তারও নেমকম্ম করবার লোক ত চাই—সেইজন্যে মুকুলের বিয়ের আগেই তোমার বিয়ে হওয়া প্রয়োজন। আর বয়সই বা তোমার কম কি! তোমাদের বয়েসে আমার গিয়ে বড়ছেলের তিন বছর বয়েস হয়েছিল—তা সে ত বাঁচলো না! সে বেঁচে থাকলে আজ কি আমাকে এতো ভাবনাতে পড়তে হয়!

অবিনাশ খুশী মনে, হাসিমুখে বল্‌ল—আমাদের দেবু ভায়াও বেশ বিবেচক ছেলে, আপনার কথায় কি আর না বল্‌তে পারে? এ অবস্থায় সবদিক ভেবে দেখলে, আপনার যুক্তি খুব ন্যায্য বই কি!

নির্বাক দেবজ্যোতি মাথা হেঁট করে বসে রইল।

সীতানাথ বল্‌লেন—কী, চুপ করে রইলে যে?

অবিনাশ সোৎসাহে বল্‌ল—আহা, হাজার হ'লেও ছেলেমানুষ ত! নিজের বিয়ের কথায় তিনি লজ্জা পেয়েছেন। আপনি ভাববেন না, দেবুবাবুর জন্যে

খুব স্মার্ট ও বিউটিফুল একটি মেয়ে বেছে আনবো। আমি সানন্দে এ কাজ করবো।

এবার দেবজ্যোতি সোজা হয়ে বস্‌ল, বল্‌ল—আপনাদের সঙ্গে আমার চিন্তা পাল্লা দিয়ে চল্‌তে পারছে না। এখন মনের এমন অবস্থা নেই যে, বিয়ের আনন্দে খুব মেতে উঠি। মা নেই।

এই পর্যন্ত বলে দেবজ্যোতি মৌন হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বল্‌তে শুরু করল—আপনাদের মনের জোর খুব বেশি—তাই তাঁর অভাবটুকু সহজ ভাবে মেনে নিয়ে, এরপর কি-কি করা দরকার তা ভাবতে পারছেন। আমি হ'লে পারতাম না। তা ছাড়া বাবা, আপনি যা বলেছেন তা সবই শুনলাম—হয়তো ভেবেও দেখবো—কিন্তু তাতে যে খুব লাভ হবে, মানে, আমার এখনকার যা মত, ভাবার পরও সেই মত এতটুকু বদলাবে বলে মনে হয় না।

অসহিষ্ণুভাবে সীতানাথ প্রশ্ন করলেন—তাহলে কি তোমার মতটা, শুনি!

—এখন আর না-ই শুন্‌লেন। ভেবেচিন্তে উত্তর দিতে সুযোগ যখন পাওয়া গেল, তখন ভালো করে ভেবেই বলব।

—তার মানে তোমার মত নেই বিয়েতে?

অবিনাশ মধ্যস্থতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বল্‌ল—আহা, বেশ ত যখন ভেবে বল্‌তে চাইছেন দেবু ভায়া, তখন তাই হবে। আপনি বরং অবকাশ দিন।

সীতানাথ গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন—হুঁ।

দেবজ্যোতি উঠে চলে গেল।

সীতানাথ বেশ জোরে জোরে বল্‌লেন—সবই আমার কপাল। নইলে বুড়ো বয়েসে এই অবস্থা হয়!

অবিনাশ একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছে এসে কতকটা ফিস্‌-ফিস্‌ করেই বল্‌ল—কি আর এমন বয়েস হয়েছে আপনার! আজকালকার জোয়ান ছেলেদের যে ছিরি, তার তুলনায় আপনার স্বাস্থ্য ত লোহার আয়রণ চেস্ট!

সীতানাথ নীরবে নিভে-যাওয়া কল্‌কের ওপরই শুকটান দিতে লাগলেন।

উনত্রিশ

নিমন্ত্রণের ভারটা দেবজ্যোতি নিজে থেকেই নিয়েছে। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় সে ফর্দ হাতে করে একাই বেরুচ্ছিল। মুকুল বল্‌ল—বেরুচ্ছ যখন, একবার ললিতের খোঁজটা নিয়ে যেয়ো, সব জিনিস ঠিক-ঠিক জোগাড় করে দিতে পারবে বলে ত খুব বাহাদুরী দেখিয়ে ভার নিল। ছেলেমানুষের কাণ্ড ত, মানিকপুরে কিছুই পাওয়া যায় না—শহরে যাবে, না, কলকাতা থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জার দিয়ে মাল আনাবে, কিছুই ত বুঝতে পারছি না। সেই যে বায়না নিয়ে গেল, তারপর আজ চারদিনের মধ্যে একবার আর দেখাই করল না!

দেবজ্যোতি কতকটা ভর্ৎসনার স্বরে বলল—খামোখা ওর ঘাড়ে এই বোঝা চাপানো ঠিক হয় নি।

—আমরা আবার চাপালাম কোথায়! নিজে যেচে নিল। বল্‌লে কি, অডার-সাপ্লাই না কি বিজনেস করছে—কতো কথা,—বাজারের চেয়ে এক আধলা দাম বেশি নেবে না, অথচ ওর নাকি তবুও লাভ থাকবে! লেখাপড়া ত করল না। বলে কি, শুধু-শুধু বাপের পয়সা নষ্ট করে কি হবে—শেষে সেই কারখানার দরজায় ধন্না দিতে হবে, তার চেয়ে স্বাধীন ব্যবসা করবো।

দেবজ্যোতি একটু হাসলো—পাগলটা চিরকালই পাগল রয়ে গেল! আচ্ছা এখনও পদ্যটদ্য লেখে?

পাশ থেকে টুকুস করে মল্লিকা জবাব দিল—খুব লেখে, আগের চেয়ে ভালোই লেখে!

মুকুল টিপ্পনী কাট্‌লো—থাক তোকে আর মোড়লী করতে হবে না। তবে যা, ওর কিন্তু কথায়বার্তায় পাকা কারবারীর মতো বাঁধুনী আছে। বলা যায় না, কালে ভালো দোকানদার হয়েও যেতে পারে। তা মানিকপুরে ভালোমত একখানা দোকান দিতে পারলে দু-পয়সা হয় বই কী! এই ত দ্যাখো না

ফৈয়াজ মামুদ যখন টিনের ঘেরাতে বিড়ি আর লেবেনচুষের দোকান দিয়েছিল সে ত আমাদের দ্যাখতাই—আর আজ মামুদের দোকানে পাঁচটা লোক খাটছে, গাঁয়ে দুখানা বাড়ি করেছে। জমজমাট দোকান!

দেবজ্যোতি বল্‌ল—খুব অবাক লাগে, কবিতা আর কারবার—একই মগজে কি করে খ্যালে!

পথে নেমে সেই কথাই ভাবছিল দেবজ্যোতি—আশ্চর্য বই কি! ললিতকে ছেলেবেলা থেকে ত দেখছে! তখন থেকেই ললিত একা-একা আপন মনে বকতো। কারুর কাছে ঘেঁষতে ললিতের বড় লজ্জা। এমনিতে ঘরোয়া আড্ডায় লম্বা-লম্বা কবিতা মুখস্থ বল্‌তো, কিন্তু কোনো আসরে ললিতের মুখ দিয়ে রাটি বার করা যায় নি। অশিক্ষিত পটুত্বের বশে ললিত ছড়া, কবিতা মোটামুটি খারাপ লেখে না। কিন্তু মল্লিকা ছাড়া আর কারুর কাছে তার কবিতার খাতা কেউ কখনো দ্যাখে নি। সেই মুখচোরা ললিত ব্যবসায়ী হবে!

ললিতদের কোয়ার্টারে নেমন্তন্ন করতে যেতেই হ'ত—এই সঙ্গে সে কাজটা সেরে নেবে দেবজ্যোতি—তাই প্রথমে ললিতের বাবা গোবিন্দবাবুর খোঁজ করল।

তিনি বেরিয়ে এসে বল্‌লেন—এস-এস বাবাজী! বাইরে থেকে ডাকাডাকি শুনে ভাবলাম বুঝি বা বাইরের লোক কেউ! তা তুমি! চলো তোমার খুড়িমা এই আজকেই তোমাদের কথা বল্‌ছিলেন—ওঁয়ার আবার শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না। নইলে নিজেই যেতেন—যাওয়া ত উচিত এমন অসময়ে!

দেবজ্যোতি স্বাভাবিক উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—কাকীমার কি অসুখ করেছে? আজ দুপুরে আরতি গিয়েছিল, কিছু বল্‌ল না ত সে কথা!

গোবিন্দবাবু একটু কুণ্ঠিতভাবে বল্‌লেন—বলবার মতো কিছু নয়, ললিতে একটি ভাই হয়েছে এই আঠারো দিন। কাঁচা ইয়ে ত! তার জন্যে কি নয়। আমি ত সমাজের বাইরের জীব। এখন আবার যেতে হবে ছা ঠ্যাঙাতে—মোটে সময় পাই না। এসো-এসো বসবে চলো।

দরজার ওপিঠ থেকে সাড়া এল—কে গো, আমাদের গুরুঠাকুর না!

গোবিন্দবাবুর গুরুদেবের নাম 'দেবেন্দ্র' অতএব তাঁর স্ত্রী দেবজ্যোতিকে গুরুঠাকুর বলেই সম্বোধন করে থাকেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ কাকীমা!

—এসো বাবা। আর বাবা সবই কপাল! তোমার মা সতীসাবিত্রী, সিঁথির সিঁদুর নিয়ে কেমন ড্যাং-ডেঙিয়ে চলে গেলেন। তোমাদের দুর্ভাগ্য, আর কিই বা করবে বলো! সবই মায়া। এই মায়ার খেলায় পড়ে বুঝি ভগবানের কথা আমরা ভুলেই যাই—নইলে, আর পারিনে, নেই-নেই খ্যাচ-খ্যাচ কান্নাকাটি নিয়ে পড়ে থাকতে কি ভালো লাগে? তবু ত আছি বাবা। কবে যে পাপক্ষয় হবে!

দেবজ্যোতি নির্বাক দাঁড়িয়ে শোনে। গোবিন্দবাবু তাকে স্ত্রীর জিম্মায় দিয়ে সরে পড়েছেন।

আরতি এসে বল্‌ল—দেবু দা, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, বসো না।

—বসবার সময় কই ভাই, এখন নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছি।

গোবিন্দবাবুর স্ত্রী বল্‌লেন—আহা এই কি নেমন্তন্নর কাজ বাবা! তবু মাতৃদায়, তাই তোমাকে বেরুতে হয়েছে। কাজটা দিনমানেই সারলে পারতে—ভরা অশুচ গায়ে নিয়ে এই আমাবস্তের সন্ধ্যেবেলা বেরুনো ঠিক হয়নি। সময়টা ত তোমাদের পক্ষে ভালো নয়—অপদেবতাদের কুদৃষ্টি পড়তে কতক্ষণ?

দেবজ্যোতি সঙ্কোচ কাটিয়ে প্রথামত মাতৃদায় জানিয়ে আমন্ত্রণ করলো, তারপর আরতিকে বল্‌ল—তোমরা সব যাবে, খাটাখাটুনীর কাজ ত তোমাদেরই করতে হবে।

—তা যাবে বই কি! আপনাআপনির মধ্যে এ কি আর বলার জন্যে বসে থাকলে চলে! এই যে ললিত আজ ক'দিন পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে, বল্‌লেই বলে—দায়িত্ব নিয়েছি! ছান্দের তাবৎ কেনাকাটার কাজ ঘাড় পেতে নিয়েছে ত!

—আচ্ছা, এখন আসি তাহলে কাকীমা। ললিতকে একবার যেতে বলবেন।

—এসো বাবা। মানুষের মত মানুষ হও। তা ছাখো একটা কথা ছিল—

আরতি বাধা দিল—দেবুদার এখন কাজ রয়েছে, তোমার কথা নয় পরে বলো মা !

—না, না, বলুন কাকীমা !

—এখন ত তোমার মা বর্তমান নেই, তোমাদেরই বলা দরকার। এই বলছিলাম কি ওই অবিনাশ আর তোমার বড় বোনের কেলেঙ্কারী নিয়ে ত মানিকপুরে টিটিক্কার পড়ে গিয়েছে—আর ত কান পাততে পারিনে বাবা! তুমি ত এখানে থাকো না—হয়তো সব কথা জানোও না। কিন্তু আমাদের যে আর মান-সম্মান থাকে না—

দেবজ্যোতি গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—হুঁ! ওদের এই অঘ্রাণে বিয়ে স্থির হয়েছে।

—ওমা, সে কি কথা গো, কালাসূচ যে এক বছর থাকে!—মহাগুরু নিপাত যে সে ব্যাপার নয়।

—কিন্তু এইরকমই ত স্থির করেছেন বাবা।

—তা তিনি যা ভালো বুঝেছেন করছেন। কথায় বলে ঘি আর আগুন এত কাছাকাছি রাখতে নেই। তোমার মায়েরও বলিহারি যাই! তিনি চোখের ওপর সব দেখেশুনেও কেমন নিশ্চিন্দি ছিলেন, তাও বলি! অঘ্রাণের পর বুঝি বিয়ের অবস্থা থাকবে না—বাচ্ছাকাচ্ছা বিয়ের আগে হয়ে পড়লে, মরণ আর কি! তা কালাসূচ মাথায় থাক। মানটা রক্ষে হোক আগে।—আর মানের গোড়ায় ছাই! কী দিনকালই পড়ল!

আরতি কখন চলে গিয়েছে—বোধকরি মায়ের কথার ধারা দেখে লজ্জায় সরে গিয়েছে। দেবজ্যোতিও গম্ভীর মুখে দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করে বেরিয়ে এল গোবিন্দবাবুর কোয়ার্টার থেকে।

পথ চল্‌তে চল্‌তে দেবজ্যোতির হাত-পা কেমন শিথিল হয়ে আসে! নিজের মনে সে অনেকখানি ভেবে ফেলেছে। এই আবহাওয়ার মধ্যে যেন আর থাকতে পারছে না সে! অথচ একটু আগেই যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তখন আসন্ন সন্ধ্যার আরক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে, ঝির্‌-ঝিরে বাতাসে মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। কাছাকাছি থেকে যেন বোনগুলিকে

সে নতুন করে ভালোবাসতে শুরু করেছিল—অন্তরঙ্গতার স্বাদে, ভুলে-যাওয়া ছেলেবেলার দিনগুলি তাজা হয়ে উঠ্ছিল। ঠিক এমনি সময়ে কঠিন বাস্তবের ঘা মেরে কে যেন সব চুরমার করে দিতে উদ্যত হয়েছে! সত্যি কথা, লোকের মুখে হাতচাপা দিয়ে এই কলঙ্ককে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তা ছাড়া, এ ধরণের জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখা যে আরও কঠিন। এখন কী করবে দেবজ্যোতি? এই নিমন্ত্রণ, শ্রাদ্ধের উদ্যোগ—সবকিছুই অর্থহীন নিষ্ঠুর পরিহাসের আয়োজন নয় কি? নিজের মনের কাছে বার বার প্রশ্ন করে কোনো সদুত্তর খুঁজে পায় না দেবজ্যোতি।

তবু সে ফর্দ মিলিয়ে বাড়ি-বাড়ি নিমন্ত্রণের কাজ সমাপন করে চলে।

সর্বশেষে এল সে অনিরুদ্ধ মল্লিকের বাংলোতে। সাহেব বাড়ি নেই।

দেবজ্যোতি এসেছে শুনে তাঁর গৃহিণী বেরিয়ে এলেন। এই মানুষটির সঙ্গে দেবজ্যোতির সাক্ষাৎ-পরিচয় এই প্রথম, তবু দু-এক কথার পরই কেমন যেন ভালো লাগে তার! আশ্চর্য তফাৎ এঁর সঙ্গে—মন্দাকিনীর, মল্লিক-সাহেবেরও। শান্ত মধুর শ্রীতে মাতৃত্ব মাখানো। তিনি দেবজ্যোতিকে সান্ত্বনার কথা বল্লেন না। মৌখিক সহানুভূতির আভাযও তাঁর কথাতে নেই। তবু কী একটা যেন আছে, যা আর কারুর মধ্যে পায় নি দেবজ্যোতি!

বল্লেন—তোমার শরীর ভালো আছে ত বাবা! বোনেরা সব ভালো আছে?

নিতান্ত সাধারণ কথা, কিন্তু এই জিজ্ঞাসার মধ্যেই যেন অনেক কিছু বল্তে চাইছেন তিনি! তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—কাজের পর কয়েকদিন আছো তো? নাকি ওদিকে আবার পড়ার ক্ষতি হবে! ডাক্তারী পড়াতে শুনেছি খুব খাটতে হয়।

—তা একটু হয়।

—ছাখো দেখি এই সময়ে এতবড় একটা আঘাত এসে পড়ল! কি আর করবে বাবা, সংসারে আপদ-বিপদ ত হিসেব করে আসে না। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, এইটুকু যা ভরসা। অল্পবুদ্ধিদের নিয়েই হয় মুস্কিল—এই ছাখো না, আমাদের বাড়ীতে বাপে-মেয়েতে লেগে গিয়েছে।

দেবজ্যোতি প্রশ্ন করল—কি রকম ?

—রকমসকম আর কি ! মেয়েকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটি ত খেয়ে রেখেছেন ! এখন আর রাশ সাম্‌লাতে পারছেন না। কলেজের রাজনীতি নিয়ে মেয়ে এখন মেতে উঠেছে। সভাতে লেকচার দিচ্ছে, প্রোসেশন করে ঠা-ঠা রোদ্দুরে হৈ-হৈ করছে। এদিকে উনি ত ক্ষেপে উঠেছেন। মাঝে একবার কলকাতা গিয়ে বুঝি কি কড়া কথা বলেছিলেন, তা খুকী নাকি মুখের ওপর বলেছে যে, বড়লোকের মেয়ে বলে পরিচয় দিতে তার নাকি ঘেন্না করে। বেশি কিছু বল্‌লে মেয়ে নাকি সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবে ! শোনো কথাটা একবার !

দেবজ্যোতি চুপ করে শুনছিল। মিসেস মল্লিক বল্‌লেন—আচ্ছা বাবা, তুমিই বলো, বাপ-মায়ের মনে কষ্ট দিলেই কি দেশের কাজ করা হয় ?

একটু ভেবে নিয়ে দেবজ্যোতি বল্‌ল—আপনার কথাটা হয়তো খুব ঠিক। কিন্তু অপর পক্ষেও বলবার আছে। নিজের স্বার্থ যোলো আনা বজায় রেখে দশের কাজ, দেশের কাজ করা সব ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। মন্দাকিনী ঝোঁকের মাথায় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। শুধু পিতা-মাতাকে অগ্রাহ্য করাটাই দেশের কাজ নয়, এটা আমিও স্বীকার করি।

—আমিও তাই বলি বাবা। কাজ ত কত রকমের রয়েছে, বেশ ত ভালো কাজ করতে ইচ্ছে হয়, ভালো কথা—কেউ তাতে বাধা দেবে না, তুমি করো না কেন। ওই ইটিলির বাড়িতে যখন গরীব ছেলেমেয়েদের ইস্কুল করল খুকী, আমরা ত আপত্তি করি নি। তারপর যখন দু-জন গরীব মেয়ে ক্লাস-ফ্রেণ্ডের হোস্টেলে খরচ দেবার সামর্থ্য নেই বলে বাড়িতে এনে রাখলো তখনো আমি বাধা দিই নি—ওঁকে না জানিয়েই তাদের ঠাঁই দিয়েছি। এখন আবার তাদের সঙ্গে জোট বেঁধে স্বদেশী করা, মানে, ভ্যাগাবণ্ডের মতো দিনরাত ঘুরে ঘুরে বেড়ানো শুরু হয়েছে ! মানে একটা নেশার ঝোঁক পেয়ে বসেছে খুকীকে ! এখন করি কি বলো তো বাবা ? মানিকপুরে সে আসতে নারাজ—। তাই বলছিলাম, তোমার কথা তো শোনে—একটু যদি বুঝিয়ে বলো,—আর কিছু নয়,—যা করবে তা যেন একটু ভেবে মাথা ঠাণ্ডা রেখে করে। এদিকেও ত

আবার দেখতে হবে। মানিকপুরে যদি জানাজানি হয়ে যায় তবে ওঁরই বা মুখ থাকে কোথায়?

দেবজ্যোতি কি বল্‌বে ভেবে ঠিক করতে পারে না। মিসেস মল্লিকের কথাগুলি একেবারে নস্যাৎ করে উড়িয়ে দিতে তার বাধ্‌ছে, সত্যি তাঁর দিক থেকে দেখতে গেলে সমস্যাটা গুরুতর। অথচ আদর্শের কথা চিন্তা করলে মন্দাকিনীর কাজে বাধা দেওয়া দেবজ্যোতির পক্ষে সম্ভবপর নয়। কিন্তু কিছু একটা বল্‌তেই হবে, মন্দাকিনীর মা তার মুখের পানে সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। অবশেষে সে বল্‌ল—হ্যাঁ, সাময়িক একটা ঝোঁকে পড়ে কাজ করতে গেলে বেশি দিন সাম্‌লে চলা যায় না। তবে মুস্কিল কি জানেন, দেশের এই যে দুরবস্থা,—পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি পাবার সাধনা, সবাইকেই তা করতে হবে! বিশেষ করে যারা লেখাপড়া শিখ্‌ছে তাদের মনে এই স্বাধীনতার তৃষ্ণা অবশ্যই আসতে বাধ্য। এ ত শুধু আপনার একার সমস্যা নয়, সকলের।

—ছাখো বাবা, একটা কথা বলি। তোমাদের মতো বেশি লেখাপড়া শিখিনি। তবু এই বয়সে অনেক ত দেখলাম। আমাদের ছেলেবেলা থেকেই দেখছি। স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে পথে পথে চীৎকার করে বেড়ালেই কিছু ইংরেজ ভয় পেয়ে পালাবে না। ঠিক পথটুকু চিন্‌তে হবে। সেই পথে এগুতে হবে। তার জন্যে যে সাধনার দরকার, তা ত এদের নেই। এরা ছেলেমানুষ, নেশায় পাগল—এদের আর দোষ দেবো কী, যাঁরা এদের তাতাচ্ছেন মাতাচ্ছেন, তাঁদের ওপরই আমার রাগ। তাঁরাই যে সবসময় ভেবেচিন্তে চলছেন না। এই আমার বাপের বাড়ির কথাই যদি ধরো ত দেখবে, সে ভুল আমার দাদারা করেছেন। দাদা যদি দেশবন্ধুর ডাক শুনে কলেজ ছেড়ে না যেতেন, তাহলে আজ আমার ভাইপো ভাইঝিদের এভাবে দুর্ভোগে পড়তে হ'ত না। তাঁর আর কি, জেলই খাটলেন, যক্ষ্মায় ভুগে ভুগে ত জীবনটাকে ক্ষইয়ে শেষ করলেন। কিন্তু তারপর? নিজের মুখে স্বামীর প্রশংসা ভালো শোনায় না, তবু সত্যি কথা বলতেই হয়—ইনিই ত আমার বাপের বাড়ির যাবতীয় দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিলেন। অথচ দাদা বেঁচে থাকতে এঁর সে বাড়িতে ঢুকতে বারণ

ছিল। কি করবে বলো, তোমাদের এখন রক্তের তেজ আছে, তুনিয়াকে একরকম চোখে দেখচ। কিন্তু আমার এই যে দেখা—এও ত মিথ্যে নয়। যাক গে, বাবা, নিজের কথায় তোমাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখে দিলাম কিছু মনে কোরো না।

—না, না, মনে করব কেন। আপনার কাছে তবু কিছু ভালো কথা শুন্‌তে পেলাম। ভেবে দেখবো। আর যদি মনে করেন যে, মন্দাকিনী আমার কথা শুনবে তাহলে দেখা হলে বলব। তবে দেখা যে কবে হবে, তার ঠিক নেই।

—অবিশ্যি তাকে তুমি চিঠি লিখতে পারো।

—বেশ। তবে একটা কথা বলে নিই, আপনার কথাগুলো ভেবে চিন্তে দেখে তারপর আমার যেটা সদ্বিবেচনা মনে হবে তা-ই লিখবো। তাতে যদি আপনার আপত্তি থাকে তবে কি হবে?

—ত্যাখো বাবা, একটি কথা বলি। তোমার সঙ্গে আজই আমার প্রথম পরিচয় মনে ক'র না। আজ পর্যন্ত খুকীর কাছে, তার বাবার কাছে—তা ছাড়া আরও অনেকের কাছেই—তোমার কথা শুনেছি। মনে হয় তোমাকে খুব ছেলেবেলা থেকে চিনি! তোমার বিবেচনায় বিরাট কিছু ভুল হবে এটা বিশ্বাস করি না। তাছাড়া তুমি হয়তো জানো না, কিন্তু আমি ঠিক জানি—খুকীর এই যে স্বদেশী কাজের ঝোঁক, এটা তোমার কাছ থেকেই ও পেয়েছে। সেই সেবারে কলকাতায় গিয়ে তুমি ওকে কি সব বলে রাগ করে চলে এলে, তারপরই বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে। কাজেই তুমি লিখলে ভালোই হবে।

—কই আমি ত কিছু বলি নি!

দেবজ্যোতি বিস্মিত এবং কতটা অপ্রতিভ ভাবে বল্‌ল।

মন্দাকিনীর মা মৃত্থ হেসে বল্‌লেন—বলো নি! তবে হয়তো সেই না বলাটাই ওর বুকে বড় বেজেছে। আমাকে বারবার বলল সেদিন, জ্যোতিদাদা আমাকে মানুষ বলেই মনে করে না, জানো মা! রাস্তার মাঝখানে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে চলে গেল। তারপর থেকেই—ঠিক পরদিন থেকেই এই পার্টি আর মিটিং শুরু করল। ওকে মানুষ হ'তে হবে। আচ্ছা, এটা পাগলামী নয়—!

মন্দাকিনীর মায়ের কথাগুলো শুন্‌তে শুন্‌তে দেবজ্যোতির চোখের সাম্‌নে সেদিনের ছবিটা ভেসে উঠ্‌ল। আশ্চর্য হয়ে গেল সে। সত্যি মন্দাকিনীকে সে রকম তীব্র কোনো আঘাত দেবার জন্য সে কিছু করে নি। তবু নিজের যে আচরণের জন্য তার আজ লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল সেটা যেন অকারণেই মনের মধ্যে খুশীর হাওয়া বইয়ে দিল। সত্যি মন্দাকিনী অভিমানের আগুনে পুড়ে খাঁটী সোনা হ'তে পাববে কি? এ প্রশ্নের জবাবে আর সংশয় নেই দেবজ্যোতির মনে। কে যেন জোরে জোরে বলে উঠ্‌ল—পারবে, পারবে।

মন্দাকিনীর মা বল্‌লেন—তুমি যা ভালো বুঝবে তা-ই লিখবে। আমার কথায় পুরোপুরি সায় দিতে বলি না। জুলুম করে আর কতটুকু পাওয়া যায় বাবা! তোমরা বড় হচ্ছ, আরও বড় হবে এই ত আশা।

কথা বল্‌তে বল্‌তে যেন তাঁর কণ্ঠস্বর আবেগে, গভীর স্নেহে গাঢ় হয়ে যায়! আস্তে আস্তে তিনি বলেন—মা বাপ কি আর তোমাদের কল্যাণ কামনা করেন না? শুধু এইটুকু মনে রেখো বাবা, আমরা যা বলি তোমাদের মঙ্গল চেয়েই বলি। তোমাদের কষ্ট দিতে গেলে সে কষ্ট নিজের বুকে আগে বাজে বাবা!

দেবজ্যোতি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল, তিনি দু-পা সরে গিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বল্‌লেন—আহা তুমি ব্রাহ্মণ, তবু আশীর্বাদ করছি বাবা মানুষ হও, আমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে!

ত্রিশ

বাড়ি ফিরে দেবজ্যোতি ঘরের আলো নিভিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। বাইরে অন্ধকার! পথের বাতিগুলোর মুখে ঘোমটা টেনে দেওয়া হয়েছে, তার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলোর ছিটেফোঁটা বেরুবার জন্য চেষ্টা করছে তা দিয়ে যেন রাত্রির রহস্য আরও বেড়ে গেছে! দেবজ্যোতি সেদিকে তাকিয়ে ভাবছে। আজকের সন্ধ্যেটা তাকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেষ্টন করেছে। মন্দাকিনী আর তার মা এক দিকে, অন্যদিকে মুকুল, সীতানাথ আর অন্যসব মানুষেরা যেন ভিড় করে রয়েছে! অথচ দেবজ্যোতি খুঁজছে নিজের মায়ের মুখচ্ছবিটা। আশ্চর্য সেই মুখখানা ছাড়া আর সব কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে—এমন কি মায়ের দুটো চারটে কথাও মনে পড়েছে। তাঁর কণ্ঠস্বরও অবিকল কানে এসে বাজছে! চোখ বুজল দেবজ্যোতি কই, না, এ ত মন্দাকিনীর মায়ের কপালে সিঁদুর পরা, প্রসন্ন হাসি হাসি মুখ!

হ্যাঁ, মন্দাকিনীকে চিঠি লিখবে সে। লিখবে, তোমার কার্যকলাপের খবর পেয়ে খুশী হয়েছি। আজকের দিনে দেশের এমন মেয়েই দরকার।

কিন্তু দেবজ্যোতির মনে পড়ল হঠাৎ, বাপ-মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে কোনো কিছু করলে আর যা-ই হোক কল্যাণ হয় না। সত্যি কি তাই? দেবজ্যোতি কি নিজের পিতার মতের বিরুদ্ধে চলে নি, চল্‌বে না? না, না, মন্দাকিনীর মা ঠিক কথা বলেন নি। তবে, তাঁর মতো বিবেচনা কি দেবজ্যোতির বাবার আছে? সীতানাথ শিক্ষারই বিরোধী। অবশ্য সীতানাথের মতো মানুষের পক্ষে এছাড়া অন্য কিছু হওয়া বোধকরি সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাই বা মেনে নেওয়া যায় কি করে? দীনদয়াল কাকাও ত এই কারখানায়ই চাকরী করে জীবন কাটালেন। কই তিনি কোনোদিন দেশের কাজকে, শিক্ষাকে বিরূপ দৃষ্টিতে দ্যাখেন নি! দেবজ্যোতি নিজের ভাবনার জালে জট পাকিয়ে ফেলেছে। তার কাছে সবগুলি মানুষের ছবি যেন এক সঙ্গে মিশে গিয়েছে!

আলো জেলে মন্দাকিনীকে চিঠি লিখতে বসল সে:—

আমার মা মুক্তি দিয়ে চলে গেছেন। কিন্তু তোমার মায়ের স্নেহ যেন আমাকে দুর্বল করে ফেল্‌ছে! সন্ধ্যেবেলা ওঁর সঙ্গে তোমার সম্পর্কে অনেক কথা হ'ল। মন্দাকিনী, তুমি তোমার নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে খতিয়ে দেখে যা ভাল বুঝবে তাই করবে, এই কথাই হয়তো আমার বলা উচিত ছিল। কিন্তু সে কথা বলবার আর শক্তি নেই। মনে হচ্ছে যেন—তোমার মায়ের মতো মানুষকে আঘাত দিয়ে কোনো বৃহৎ কিছু লভ্য হবে না। আজ নিজের অভাব দিয়ে মায়ের মূল্য কিছুটা টের পাচ্ছি। অবশ্য রাজনৈতিক গর্ব একথায় হয় তো খর্ব হবে। তা হোক। নিজের মনের সঙ্গে লুকোচুরি করা আরও অন্যায়। তাই যেটুকু খাঁটি মনে হচ্ছে তাই লিখ্‌ছি। হয়তো এর পর দিনের আলোয় বাইরের দুনিয়ার হাওয়া লাগলে এই আমিই অন্য কথা বল্‌বো—তখন আর নিরালা মনকে স্বীকার করতে ইচ্ছে নাও হতে পারে। এখনকার কথা এখনই বলি।

তোমার মায়ের সব কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে যে, তুমি ঠিক দেশের জন্য দেশের কাজ করবার ব্রত নাও নি। শুধু আমি, আমার আচার আচরণই যদি তোমাকে এই পথে টেনে থাকে, তবে পরামর্শ দেবো, মন্দা, এ পথ ছাড়ো। প্রত্যেকের জীবনে বিশেষ একটি মানুষকে আদর্শ হিসেবে সাম্‌নে খাড়া রাখা ছাড়া উপায় থাকে না। পথপ্রদর্শক চাই বই কি! কিন্তু তার আগে যা করছ তা যদি অনুসরণ না হয়ে শুধু মাত্র অনুকরণই হয়, তবে সমস্ত কষ্টটাই বাজে খরচ।

সকলের জন্য সব কাজ নয়। তোমার জন্য কোন্ কাজ যোগ্য হবে তা দেখিয়ে দেবার শক্তি আমার নেই। তবে এটুকু বল্‌তে পারি যে, যেমন ভাবে চল্‌ছ তেমনটি আর বেশিদিন চল্‌তে পারবে না। তোমার বাবাকে যতটুকু জানি তাতে মনে হয় যে, মানিকপুরের আধিপত্যকে তিনি পৃথিবীর সব কিছুর ওপরে স্থান দেন। তোমার জন্য এখানকার প্রতিপত্তি যেদিন এতটুকু চিড় খাবে, সে দিনেই তিনি হয়ত তোমার হাত-পা বেঁধে ঘরে আটক করবেন। নতুবা তুমি নিজের পথে ভেসে যাবে। সেই দিনের দিকে তাকিয়ে এটা অনুমান করা কঠিন নয় তখন তোমার মায়ের কি অবস্থা হবে!

জানি না তোমার মনের জোর কতখানি। এই সব কথা তলিয়ে ভেবে

দেখেছ কি না, তাও জানি না। তবে এটা ঠিক যে, সেদিন যদি আমার কাছে কোনো সহযোগিতা চাও আমি সাধ্যমতো করব। আমার সাধ্যের দৌড়টুকুও সামান্য। এখন আমি মামার বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করি, একটা টুইশন করে হাত-খরচটা চলে যায়—মামাদের ওখানে থাকা-খাওয়ার খরচ লাগে না, তাই রক্ষা। এই আর্থিক অবস্থায় কতটুকু সাহায্য করা সম্ভব, তা আন্দাজ করতেই পারো। তোমার কলকাতায় আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে কিছু আশা রেখো না। পার্টির আশ্রয়ে গেলে কোনোরকমে জীবনটা রক্ষা হতে পারে, তার বেশি কিছু পাবে না। আমার নিজের কথা আর একটু বলি—তোমাকেই বলি, আর ত কেউ নেই যাকে নিজের সমস্যা জানিয়ে দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারি। বাবা চাচ্ছেন সব-কিছু ছেড়ে ছুড়ে মানিকপুরে বসি, আমার বিয়ে হোক—চাকরী হোক, সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার চলুক। আমার বড বোন—থাক, তার কথা আর না-ই বল্‌লাম! সে বিয়ে করছে। অতএব একটা ভাবনা ঘুচলো। আমি যে কোনো দিন এসব নিয়ে মাথা ঘামাবো, তা কে জান্‌তো? ভয় নেই, কারণ এসব ভাবনার যোগ্যতা আমার নেই। তাই এক-এক সময় মনে হয় যে, সংসারের গুরুদায়িত্ব এড়ানোর সহজ বিকল্প হিসেবে দেশের কাজকে আঁকড়ে ধরেছি—ধিক্কার দিই নিজেকে। তবে তাতে এই নির্লজ্জ মানুষটা একটুও টলে না।

অতএব এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকলো বলে। বাবা আর ঢুকতে দেবেন না। কিন্তু ভাবনায় পড়েছি দেবিকাকে নিয়ে। মল্লিকার জন্য ভাবি না। ললিতকে ত চেনো। সেই যে মুখচোরা কবি—মল্লিকার বন্ধু। অনুমান করছি ললিতেরই সঙ্গে মল্লির বিয়ে হয়ে যাবে। জানো মন্দা, এখানকার মানুষেরা বেশ আছে—এরা সহজে প্রেমে পড়ে আর বিয়ে-থাও করে। কারখানায় চাকরী করে জীবিকার জন্য যা করা দরকার, তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দিনগুলো ওদের কোন্ সুরে যে বাঁধা, তা ওরাই জানে! ললিত, মল্লিকা এই মানিকপুরেই মানুষ—কাজেই, ভাবনা নেই। ললিত নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। টিপিক্যাল গেরস্থ হবে। তাতে যদি সুখী হয়, ত আমার কি-ই বা বলবার থাকতে পারে?

হ্যাঁ, দেবিকার কথা বল্‌তে গিয়ে কোথায় চলে এসেছি—ছাখো। আজ আমার মনের ঢাকনাটা খুলে ফেলেছি বলেই হয়তো চিন্তাগুলো এইরকম এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে! যা বল্‌ছিলাম, দেবিকা একটু অন্য রকমের মানুষ। ওর জন্যে ভাবি; কারণ, এই আওতায় থাকলে ও মেয়েটা নষ্ট হয়ে যাবে। অথচ কীই বা উপায়? তবে মিণ্টু (মানে দীনদয়াল কাকার বড মেয়ে স্বদেশী) আছে, যদি সে ওকে ছাখে। একটা-দেড়টা বছর কাটাতে পারলে তখন আমিই দেবিকাকে দেখতে পারবো। তার আগে যদি সরকারী জালে আটকা পড়ি ত সবচেয়ে ভালো হয়—কৈফিয়ৎ দেবার মওকা পাবো। দায়িত্বের দায় থেকে বেমালুম মকুব! কিন্তু নিজের কাছে কি জবাবদীহি করব বলো তো!

এসব কথা কেন বল্‌ছি! কোথায় তোমার সম্বন্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব তা নয়, নিজের কথাই সাতকাহন হয়ে গেল। এটা ঠিক চিঠি নয়—তুমি এখানে নেই, তবু তোমাকে আমার কথা বলা—নেহাৎই কথা। আর উপলক্ষ্য তুমি হলেও নিজেকে লক্ষ্য করেই বলা।

তোমার মাকে দেখে আজ কেবলই মনে হয়েছে যে, দেশকে চিন্‌তে হ'লে, বুঝতে গেলে—মাকে দেখতে হয়, জানতে হয়, তাঁর দিকেও তাকাতে হয়।

আমার মা বেঁচে থাকতে বোধহয় সেকথাটা এমন করে বুঝতে পারি নি। তাঁর অভাবটা অনেকখানি বুকে বেজেছিল। সেই অনুভূতির কম্পমান মাটিতে দাঁড়িয়ে দিশেহারা হয়ে পডেছি, ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন তোমার মাকে দেখলাম! তাঁকে দেখেই যেন এতকাল পরে নিজের মাকে চিনলাম! হয়তো মা কথাটার ষোলআনা অর্থ আজই প্রথম আমি জানলাম। তাই তাঁকে স্বীকার করতে কোনো লজ্জা বা কুণ্ঠা নেই। মায়ের কথাটা মঙ্গলের কথা।

তোমার বাবার সঙ্গে তোমার এই বিরোধটা যেমন নাটকীয় তেমনি অনিবার্য ছিল হয়তো। আজ না হোক, দুদিন পরে এই বিরোধ ঘরে ঘরে দেখা দেবে—সে সমস্যার ছায়া যেন দেখতে পাচ্ছি! কিন্তু তা থেকে উত্তীর্ণ হবার উপায় কী? ওঁরা যে ভাবে ভেবেছেন, দেখেছেন, সেটা বদলানোর সময় এসেছে। আমাদের কালের দেখা, ভাবা, চলা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবে

আজও আগামী পথটা নির্ণীত হয় নি। এ নিয়ে কেতাবী আলোচনা করলে পুঁথিই বাড়বে, সমাধান আসবে না। সমস্যার মধ্যে পড়লে তখন বাস্তবের পাল্লায় তাল সামলাবার জন্য পথ তৈরী হ'তে বাধ্য। সেই পথটাই প্রয়োজনের তাগিদে তৈরী হয়! আমার ঘরেও ত এই বিরোধ মাথা খাড়া করেছে—দেখি কি পরিণতি হয়! বাবার মতের সঙ্গে কোথাও সামঞ্জস্য হবার বিন্দুমাত্র আশা নেই। অথচ এই আমিই তোমাকে নির্দেশ দেবার স্পর্ধা নিয়ে এগোতে চাই!—মানুষের কী আশ্চর্য স্বভাব!

পথ জানি না। তবে অবস্থার একটা আলোচনা করা গেল। হয়তো এ থেকে তোমার কোনো উপকার হবে না। তবু দেখো ভেবে।

আর একটা কথা। রাগ করো না। অনেকদিনের অনেক ছোটবড় ব্যাপার থেকে মনে হচ্ছে যে, তুমি আমাকে ভালোবাসো। সাধারণ প্রীতির কথা বল্‌ছি না। বিশেষ পক্ষপাত—যা একটি পুরুষকে ঘিরে একটি বিশেষ মেয়ের মনে তিলে তিলে জমে উঠে দুনিয়ার আর সকলের চেয়ে পৃথক রূপে দাঁড়ায়—সেই ভালোবাসার কথাই বল্‌ছি! সত্যি কি তাই? যদি না হয় ত ভালো। আর যদি সত্যি তা-ই হয় তবে বল্‌ব, ভুল করেছো। আমার মনে আর যাই থাক সেই প্রেম নেই। তোমাকে ঠকিয়ে আমার লাভ নেই, বরং তোমার ক্ষতি হবে—সেটুকুই আমার ক্ষতি। অনেক তর্ক করে নিজেকে জেনেছি—প্রেমিকের ভূমিকায় এমন কি অক্ষম অভিনেতাও হবার যোগ্যতা নেই আমার। নিতান্ত গদ্য প্রবন্ধের মতো সেন্টিমেণ্ট-বর্জিত এই মনটা কেবলই সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত।

মানুষকে চেনা শক্ত। আমি নিজেও হয়তো নিজেকে ষোলআনা জানি না। ভবিষ্যতে কোনোদিন যে আমার মনে প্রেমের তৃষ্ণা জাগবে না, এমন কথা আজ বলা দুঃসাধ্য। তবে এটুকু ঠিক যে, এখনও তেমন কোনো লক্ষণ দেখছি না। এবং যতদূর মনে হয়, আশপাশের মানুষদের দেখে যে, অমন দেহের দহনজালা আমার হ'তে পারে না। আমার আদর্শ অন্য শিকড় থেকে গজিয়েছে। প্রেম মনে পোষা থাকলে তবেই তাকে গ্রহণ বা নির্বাসনের কথা ওঠে—তা যখন নেই, তখন ও প্রশ্ন আমার নেই।

সব শেষে বলে রাখি, আমার এ চিঠির মধ্যে অনেক অবান্তর কথা এসে পড়েছে। ইচ্ছেমত বাতিল করতে পারো। মনটা বড় ভারী হয়ে উঠেছিল, একটু হাল্কা করে দিলাম, তোমাকে বলে।

আমার স্নেহাশীর্বাদ সর্বদাই রয়েছে। আর, যদি কখনো তোমাকে আঘাত দিয়ে থাকি, সে জন্য ক্ষমা চাইছি।

ইতি

তোমার জ্যোতিদাদা

চিঠিখানা শেষ করে দেবজ্যোতির মনে হ'ল, মাথাটা ঘুরছে। তার সারা দেহটা ঘামে ভিজে উঠেছে। এখন রাত ক'টা বেজেছে, কে জানে? তবু ইচ্ছে করছে গায়ে অনেক জল ঢেলে বেশ স্নান করতে পারলে হয়তো একটু ঘুম আসতে পারে। বাড়ির আর সবাই ঘুমে অচেতন।

স্নান সেরে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে দেবজ্যোতির নাকে একটা সুগন্ধ যেন ধাক্কা মারল। তার সারা দেহ সেই সুগন্ধে মৌ-মৌ করছে। ব্যাপার কী! ছেলেবেলায় মায়ের কাছে দেবজ্যোতি শুনেছিল যে, ভয়ঙ্কর বিষধর সাপের গায়ে চন্দনের গন্ধ থাকে। তারপর মানিকপুরের মাঠেঘাটে বিষাক্ত গোখরো-কেউটেও কম ছাখেনি দেবজ্যোতি কিন্তু চন্দন-গন্ধ ত পায়নি! হয়তো দূর থেকে—কী আজেবাজে ভাবছে দেবজ্যোতি! তোয়ালেটা গন্ধে ভুর্-ভুর করছে। অথচ এ বাড়িতে অশৌচের কালে তেল বা সাবান ত কেউ মাখে না! অবাক হয়ে ভাবলো দেবজ্যোতি—খুব চেনা গন্ধ এটা। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মল্লিকসাহেবের বাড়িতে প্রথম প্রথম যখন সে যেতো তখন এমনি একটা গন্ধ তার নাকে লাগ্‌তো। বিলেতী দামী তেলের গন্ধ—অনেক পয়সা খরচ হয় এই গন্ধটুকু কিন্‌তে। বিলেতী তেল!

তাচ্ছিল্যের তিক্ত হাসি ফুটে ওঠে দেবজ্যোতির ওষ্ঠপ্রান্তে। এ নিশ্চয় মুকুলের কাজ।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেবজ্যোতি ভাবলো—কেবলই ভাবলো সে। কাল সকালে উঠেই এই তেলের ব্যাপার নিয়ে গোলমাল বেধে যাবে। বাধবেই,

কেউ ঠেকাতে পারবে না। দেবজ্যোতি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবে না। যে বিদেশী-বর্জন নিয়ে তারা এতো আন্দোলন করছে, কত নেতা জেল খাটছেন এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, সেই বিদেশী জিনিস দেবজ্যোতির নিজের বাড়িতে এইভাবে রাজত্ব চালাবে! কী, না, শখ—! অশৌচের বাহিক আচার-অনুষ্ঠানের বড়াই করে মুকুল, আর গোপনে এইসব? না, আর ভাবতে পারে না দেবজ্যোতি। এখনই, হ্যাঁ, এই দণ্ডেই সে বোনকে ডেকে তুলবে। নইলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোতে পারবে না সে।

পাশের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দেবজ্যোতি একটু চিন্তা করল। কিন্তু না, সংকল্প তার দৃঢ়। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না, কি জন্যে করবে?

দরজার কড়া নাড়লো জোরে জোরে। এ কী, দরজাটা ত খোলাই রয়েছে। ঘরে ঢুকে দেবজ্যোতি আলো জাললো। মেঝেতে কম্বলের ওপর মল্লিকা আর দেবিকা পাশাপাশি ঘুমোচ্ছে। মুকুল নেই! দেবজ্যোতি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার আলো জাললো—। বাথরুম খোলা, কেউ নেই। দেবজ্যোতি আবার বোনেদের ঘরে ফিরে এল। মুকুলের বালিশটা তুলে নিয়ে পরখ করে দেখল—তেলের সুগন্ধে ভুর্-ভুর্ করছে। এ কাজ ওরই বটে। কিন্তু মেয়েটা কোথায় গেল?

দেবজ্যোতি সারা বাড়ি তন্ন-তন্ন করে খুঁজলো, কোথাও মুকুল নেই। সদর দরজাটায় খিল ছিটকিনি দেওয়া নেই। এবার আর বুঝতে বাকী রইল না।

উত্তেজনায় দেবজ্যোতির হাত-পা কাঁপছে। কী সাংঘাতিক দুঃসাহস! তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলতে গেল—কিন্তু দরজা খুলল না, বাইরের দিক থেকে বন্ধ। হঠাৎ দেবজ্যোতির মনে হ'ল, কোন্ এক অদৃশ্য বিরাট শক্তি তার সাম্‌নের পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে! সমস্ত চেতনা তার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, প্রচণ্ড প্রতিবাদের সাংঘাতিক তীব্র উন্মাদনায় দেবজ্যোতি সাম্‌নের দরজায় সংহত শক্তি দিয়ে পদাঘাত করল। দরজাটা কঠিন জবাব দিল—না, কোম্পানীর ঠিকাদার অমনি নিমক খায় নি, রীতিমত মজবুত ভাবেই বানিয়েছে পদস্থ কর্ম্মচারীর বাড়ির সদর দরজা। দেবজ্যোতি আর একবার

ডান পাখানা তুল্‌ল, লাথিও মারল,—একই উত্তর। এমন সময়ে পিছন থেকে কে তাকে এসে ধরল—কী হয়েছে?

সীতানাথের কণ্ঠস্বর।

দেবজ্যোতি অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে পিতার দিকে তাকালো, রোষের তাড়নায় ঘন-ঘন উঠ্‌ছে নাম্‌ছে দেবজ্যোতির চওড়া বুকখানা। চাপা গর্জনে সে বল্‌ল—বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছে!

সীতানাথ তাকে চেপে ধরলেন—দেবু, দেবু, কি হয়েছে? কে বন্ধ করল দরজা?

পিতার কণ্ঠে কি ছিল দেবজ্যোতি বুঝতে পাবে না, তবে সে একটু শান্ত হয়ে সেই বৃদ্ধের পঞ্জরের আশ্রয়ে নিজেকে সমর্পণ করল।

সীতানাথ বল্‌লেন—কী চুপ করে আছিস কেন? কি হয়েছে বল!

দেবজ্যোতি তখনও আত্মস্থ হ'তে পারে নি। হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌ল—মুকুল। মুকুল নেই। বাইরে বেরিয়ে গেছে।

—সে কী! তুই ঠিক জানিস?

মুখে কোনো কথা সরে না, দেবজ্যোতি মাথাটা বার-কয়েক জোরে বাঁ দিকে ঝাঁকি দিল।

সীতানাথ বল্‌লেন—দাঁড়া, অত মাতামাতি করিস নে। আমি দেখচি।

দেবজ্যোতি বাধা দিল—আপনাকে দেখতে হবে না, আমি যাচ্ছি।

—তুই? তুই কোথায় যাবি?

—আপনি যেখানে যাবেন ভাবছেন, সেখানেই যাবো। অসহ্য!

—ওরে, অসহ্য ত আমারও মনে হচ্ছে! কিন্তু এভাবে মাথা গরম করলে বিচ্ছিরি কাণ্ড হবে। মানিকপুরে আর মুখ দেখানো যাবে না।

—মুখ? ও পোড়ার মুখ যাতে ওরা না দেখাতে পারে তার ব্যবস্থা করব! হ্যাঁ, তাই করব।

বলে দেবজ্যোতি বাড়ির ভিতরে চলে গেল। সীতানাথও ছেলের পিছু-পিছু চল্‌লেন—শোন, শোন, ওরে পাগল শোন।

দেবজ্যোতি ঝড়ের মতো অবাধ্য। সে তর্‌-তর্‌ করে দেয়াল বেয়ে

প্রাচীরের ওপর উঠে পড়ল, তারপর আর সীতানাথ তাকে দেখতে পেলেন না।

বন্ধবাড়ির মধ্যে একা-একা আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগ্‌লেন সীতানাথ—আর পারি না। যে যা খুশী করুক। ওরা কেউ আমার কথা শুন্‌বে না। আমাকে মানুষ বলেই মনে করে না!

এই অসহায় মুহূর্তে একবার তাঁর স্ত্রীর কথা মনে পড়ল, তাই বুঝি ব্যর্থ দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে বুকখানা শূন্য হয়ে গেল! কী ব্যর্থ, কত অসহায়, নিষ্ঠুর এই বেঁচে থাকার যন্ত্রণা!

তামাক, হাঁ, সীতানাথ এক ছিলিম তামাকই খাবেন। তা ছাড়া এই বন্দী অস্থির অবস্থায় কী-ই বা করবেন তিনি?

এক

শাদা কাগজের মতো ফাঁকা পথটা চুপচাপ পড়ে আছে। শীতের বিকেল—নতুন পাতার আশায় রিক্ত শাখা মেলে গাছগুলো কঙ্কালের মতো, কাঙালের মতোই দাঁড়িয়ে কী যেন চাইছে! কি আর চাইবে, সবুজ পাতার কামনায় অপর্ণার মতো কাতর ওদের প্রাণ। রং দাও, রস দাও, রূপ দাও, ছেয়ে দাও এই জীবনকে দাও নতুন প্রাণের সঞ্চারে।

বিকেল। শহুরে বিকেল নয়। কারখানার কলিজায় যারা জীবনীশক্তি জোগায়, যাদের হাতের পেশী লোহার চেয়েও কঠিন হয়ে উঠেছে বয়লারের গন্‌গনে চুল্লীর পেটে বেলচেয় করে কয়লা ঢালতে ঢালতে—তাদেরই ছুটির বিকেল আস্‌ছে। কারখানার কেল্লায় কতো জোয়ান আটক রয়েছে তা কি কেউ টের পায় বাইরে থেকে? পায় না। কিন্তু এই পথ—এর কাছে নথী-পত্রের বালাই নেই যেমন, তেমনি হিসেবের গরমিলও নেই। গাছের তির্যক দীর্ঘ ছায়ায় অবসাদ বিছানো। সারাদিনের নিরবচ্ছিন্ন কাজের ক্লান্তি যেন এই পথের বুকে রেখাঙ্কিত! এখনও পদচিহ্নবিরল শান্ত নিঝুম এই পথটা বাবু-বাংলোগুলোর দিকে তাকিয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়েছে, না ঠিক দাঁড়ায় নি—ঘুরে গিয়েছে। বাঁকের মুখে বুড়ো অশথ গাছের তলাতে একটি অস্থায়ী পান-বিড়ির দোকান। দোকান ত নয়, ছোট্ট একরত্তি দোকানের মত খেলাঘর। তার চারপাশে ছককাটা ছায়া আর পড়ন্ত রোদের মেলা। দোকানী তাকিয়ে আছে সেই আলো-ছায়ার দিকে। আর একটু ঢলে পড়বে ছায়াটুকু—ব্যস্, অমনি এই পথটা লোকে-লোকে ছেয়ে যাবে। কারখানার ছুটির 'ভোঁ' বাজবে। চারটের 'ভোঁ'। দোকানী রসিকলাল বুড়ো হয়নি এখনো, তার শরীরের বাঁধুনিতে প্রাণরসের যথেষ্ট প্রাচুর্য রয়েছে। ছায়ার দিকে তাকিয়ে তার বুকে মোচড় দিয়ে একটানা নিশ্বাস উঠে এসে আস্তে আস্তে নিস্তরঙ্গ বাতাসে মিশে গেল।

দীর্ঘ নিশ্বাস কিন্তু উগ্র নয়, তীব্র নয়—শুধু বেদনার অব্যক্ত অসহায় স্বাক্ষর। জীবনে আর কোন দিনই রসিকলাল চারটের বাঁশী শুনতে পাবে না। শুধু বাঁশীই নয়, কোনো কিছুই সে শুনতে পায় না। এই চার বছরের মধ্যে একটি শব্দও সে শোনে নি—অথচ সমস্ত মনটা রসিকলালের যেন কিছু শোনবার প্রত্যাশায় দোকান খুলে বসে রয়েছে!

তাই রসিকলাল আলো-ছায়ার ছকের দিকে তাকিয়ে স্মৃতি মন্থন করে পুরণো ছবি দেখছে।····· ভোঁ বাজলো—চওড়া চোঙের মধ্য দিয়ে বিরাট গম্ভীর একটা দৈত্যের হঠাৎ আগমনীর সঙ্কেতে শব্দের ঝড় উঠ্‌ল। শব্দটা কি কারখানার যন্ত্র থেকে বেরোয়, না, আকাশের আড়াল থেকে বিশ্বকর্মার আদেশে নেমে এসে হুকুম জারি করে? অমনি সব হাতিয়ার থেমে যায়। নিমেষে যেন হাজার হাজার কলিজা উড়ে আসে আশ্‌মান থেকে—যে যার নিজেরটা ধরে নেয় মুঠোর মধ্যে। অমনি—মানুষ। হাজার হাজার যান্ত্রিক দেহগুলি মানুষ হয়ে যায়। বিশ্বকর্মা ছুটি দিয়েছেন, আর কলকব্জার তাঁবেদারী থেকে রেহাই পেয়ে শ্রমিকেরা মানুষ হ'ল! আর এতক্ষণ সেই সকাল থেকে এই বিকেল পর্যন্ত এরা সব বয়লার, ফার্ণেশ, হাপর, ইন্‌গট, হট্‌মিল-এর খবরদারীতে যন্ত্রের দাস হয়ে ছুটোছুটি করছিল!

একটু এদিক-ওদিক হলেই বিল্‌কুল বরবাদ। এই যেমন রসিকলাল হয়েছে। পিস্টনের প্রচণ্ড ধাক্কায় সেদিন জানটুকুই ফৌত হয়ে যেতো, নেহাত নসীবের জোরে একচুলের জন্য বেঁচে গিয়েছে। প্রাণ বাঁচলেও চাকুরীটুকু আর বাঁচে নি—যেমন বাঁচে নি ওর কানের পর্দা। এও ওই নসিবেরই খেলা। নইলে আজও সে কারখানার মধ্যেই থাকতে পারত, আর চারটের সময় ছুটি পেয়ে বাড়ি ফিরতে পারত।

রসিকলাল দোকান সাজিয়ে বসে থাকে। পানবিড়ির ছোট্ট দোকান, তাতে সস্তার লজেন্স আর লেড়ো বিস্কুটও আছে। কারখানার ছুটির পর খদ্দের আসে, তাদের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন খবর জানার চেষ্টা করে রসিকলাল। প্রথম প্রথম রসিকলাল খদ্দেরদের মুখের কথা বুঝতে পারতো না, হাঁ করে তাকিয়েই থাকত—প্রশ্ন করতো, কী

চাই পান? না বিড়ি? আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে গেছে—এখন ঠোঁট নাড়া থেকে ও অনেক কথাই ধরতে পারে।

অন্য দিনের মতো ভাবছিল সে, আজ বিকেলে কাউকে জিগ্যেস করবে—নতুন যে পাওয়ার-হাউস হচ্ছে তাতে নাকি নতুন রকমের ফার্নেশ বসবে? ফার্নেশের তোড়জোড় কি রকম কায়দার হচ্ছে! একবার ইচ্ছে হয় নিজে গিয়ে, চোখ দিয়ে দেখে আসবার, কিন্তু ইচ্ছেটা মনে পুষে রাখা ছাড়া উপায় নেই।

ওই যে ঝাড়ুদারনী চলেছে। ওর কি ছুটি হয়ে গেল? না, কাজে ফাঁকি দিয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছে? রসিকলাল হাঁক দিল—'হে পরদেশী!'

মেয়েটি ফিক্ করে হাসলো, ডানহাত খানা পেতে কি বলল? ও, বিড়ি চাইছে নিশ্চয়। কিন্তু দুপুরের পর এখনও বউনিই হয় নি—এক পয়সাও না! এর ওপর আবার খয়রাত!

নাঃ, দোকানের আশে পাশে অনেক ঝরাপাতার জঞ্জাল জমেছে। একটা বিড়ি হাতে দিয়ে মেয়েটাকে বল্লেই ঝাড়ু লাগিয়ে তক্তকে করে ফেলবে ও।

রসিকলাল ডাকবার আগেই ঝাড়ু হাতে সাঁওতাল মেয়েটি এসে হেসে দাঁড়ালো। ওর দিকে একটা বিড়ি ছুঁড়ে দিয়ে রসিক নিজেও একটা ধরায়।

তারপর প্রশ্ন করে—এত জল্দি চলেছিস যে, এখনো তো ভোঁ হয় নি!

মেয়েটা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্ল। হাসির ঢেউ-লাগা দেহ-তরঙ্গের ছন্দটুকু ধ্বনির পিপাসা জাগায়। রসিকলাল চোখ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করে। ওই সাঁওতালী মেয়ের কালো চক্চকে অঙ্গের অনাবৃত অঞ্চলে যেন হাসির মহুয়া-গন্ধ রসিকলালের মনকে রিমঝিমিয়ে জড়ো করে ফেলেছে! কী হিল্হিলে হাসি! শাদা দাঁতের পাঁতি, চোখের চক্চকে চাহনি, সবই রসিক দেখতে পাচ্ছে, শুধু শব্দটুকুই শুনতে পাচ্ছে না—তাতে আর কতটুকু ক্ষতি!

বিড়ি টানতে টানতে মেয়েটা পিছন ফিরে চলে যাচ্ছে। এক ঝলক হাওয়াতে শুক্নো পাতাগুলো উড়ল—এতক্ষণ তারা এলোমেলো হয়ে ছিল পড়ে, দম্কা হাওয়া এসে যেন আরও এলোমেলো করে দিয়ে গেল! কী হাওয়া, কন্ কন্ করছে বরফের কুঁচির মতো। তবু বেশ ভালই লাগে রসিকলালের।

চলে-যাওয়া সাঁওতাল মেয়েটির দিকে মোহনিবিষ্ট পলক মেলে তাকিয়ে থাকে রসিকলাল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল—কাজটুকু আদায় করে নেওয়া হয় নি ত!

সে আবার হাঁক দিল—এ পরদেশীয়া!

মেয়েটি ফিরে তাকালো। ওর মুখশ্রী নেই, যা কিছু শ্রী তা দেহের গড়ন-পিটনেই ঢেলে দিয়ে বিধাতা ফতুর হয়েছেন। মেয়েটি এবার ভ্রূ বাঁকিয়ে কী যেন বল্‌ল, রসিক ঠিক বুঝতে পারল না। কথাটা বুঝতে না পারলেও ভাব-টুকু ধরতে পারে রসিক—আর ফিরতে চায় না ও।

যাক গে। সে নিজেই এ কাজটুকু করে নিতে পারবে। মিছেমিছি মানুষের সঙ্গে মনোমালিন্য করতে তার ভালো লাগে না। একটা বিড়ির বিনিময়ে ঝাঁট পাড়িয়ে নিতে পারলে খুবই ভালো হ'ত কিন্তু ওই বিরক্তিটুকুই পীড়াদায়ক। থাক!

মেয়েটা ছুট্‌ছে ঝাড়ু হাতে করে।—অমন করে ছুট্‌ল কেন?

রসিকলাল গলা বাড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল—এক পাল কালো মহিষ মাঠ থেকে পথে উঠে এসেছে। একটু হাস্‌ল সে—ঝাড়ুদারীর কাজে ফাঁকি দেওয়া আর চল্‌বে না। রাস্তা সাফ করো—হ্যাঁ, এখুনি ত ছুটি-পাওয়া বাবুরা এই পথ দিয়েই বাংলোতে যাবেন! মানিকপুরের কারখানা-শহরের আদবদুরস্ত চেহারায় এতটুকু খুঁত থাক্‌লে আর রক্ষা নেই—সাহেব, বাবু, সবারই নজর মেজাজের মতো কড়া। হবে না কেন, হরদম মেশিনের সঙ্গে মিতালি করেন তাঁরা, কাজেই মেশিন যেমন ভুল বরদাস্ত করতে নারাজ, তাঁরাও তেমনি নিখুঁত ছাড়া আর কিছু সহ্য করেন না।

রসিকলাল যে-কাজ করত তাতে সবচেয়ে বেশি দরকার নজরের আর হাতের, কারখানার কাজে কানটা ছিল একদম ফাল্‌তু। চোখ দিয়ে মিটার পড়ো, স্রেফ কাঁটার দিকে তাকিয়ে থাকো। কাঁটা যেই একশ'র ঘর ছাড়িয়ে নাম্‌ল নিচের দিকে, অমনি হিট্‌ লাগাও। বরং ঘটাং ঘটাং হিস্‌ হাস্‌ শব্দে কানটা অযথা উত্যক্ত হ'ত। অ্যাকসিডেন্টের পর হাসপাতালে জ্ঞান হয়ে রসিকলাল যখন কোন শব্দই শুনতে পাচ্ছিল না তখন বেশ

ভালো লেগেছিল। কী শান্তি! তুনিয়াটার মেজাজ ভারি মিঠে হয়ে গিয়েছিল যেন!

তারপর যখন চাকরীটা ছুটে গেল তখন তার ভারী তাজ্জব মনে হয়েছিল। কেন তার চাক্‌রী কেড়ে নিল ওরা? সোজা জবাব—জখম মানুষ দিয়ে ফ্যাক্টরীর কাজ চলে না। কিন্তু রসিকের কাজে ত কানের দরকার হয় না! তার জবাবে ফোরম্যান চাটুয্যে বলেছিলেন,—না হতে পারে, কিন্তু তার কানটা যে অকেজো একথা ত মিথ্যে নয়।

কেন অকেজো হ'ল? কারখানার কাজ করতে করতেই ত হ'য়েছে! কিন্তু তার জন্য দায়ী রসিকলালের অন্যমনস্কতা। তবু ত দয়াপরবশ কোম্পানী তাকে নগদ কিছু টাকা দিয়েছে। কোম্পানী দয়ালু, সাহেব দয়ালু। সেই টাকার দৌলতে এই দোকানখানা দিতে পেরেছে রসিকলাল দাস। আপন মনেই হাসে রসিকলাল।

মেয়েটা মহিষ-যূথের দিকে ঝাঁটা উঁচিয়ে ধেয়ে চলেছে। এখনই মহিষের গোবরগুলো মুক্ত করতে হবে—রাস্তায় ময়লা থাকলে চল্‌বে না।

রসিকলাল দোকানে জাঁকিয়ে বস্‌ল। এবারে বউনি হ'ল বলে, খদ্দের এলো আর কি! কারখানার খবর—গালগল্পের ছিটেফোঁটা তার চোখের ক্যামেরাকে ফাঁকি দিতে পারে না। আর চোখ থেকে মন ত আলাদা নয়। পথের পাশে বটগাছের নিচে নিরালায় টিম্‌টিমে একটা পানবিড়ির দোকান খুলে বসে থাকলে কি হয়, রসিকলাল কারখানারই লোক ত! মানিকপুরের ধোঁয়া আর কালি, দিন আর রাতের জীবন-যাত্রার নিয়মছন্দের সঙ্গে সে নিঃশব্দভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে নিজেকে।

এই নির্জন কালো এ্যাশ্‌ফাল্টের রাস্তাটা সর্পিল গতিতে কারখানার তু নম্বর গেটের সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে। লোহার মোটা গরাদে দিয়ে ঘেরা বিরাট ত্রিশ ফিট উঁচু দরজা।

চারটের 'ভোঁ' বাজলেই এই দরজা দিয়ে বন্যার বেগে অসংখ্য কালো কালো মাথা বাইরে বেরিয়ে আসবে। ক্লান্ত মলিন মুখ কতশত, কালো হাফপ্যান্ট অথবা খাকী, হাফশার্ট কিম্বা স্পোর্টস্‌ গেঞ্জীরা ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে আসে

খোলা আকাশের নিচে। এখানকার আকাশে মেঘ দেখবার আগেই তোমার দৃষ্টি গিয়ে পড়বে কারখানার মাথার ওপর লেলিহান শিখার দিকে। চিম্‌নী-গুলোর মুখ দিয়ে অনবরত উদ্‌গীর্ণমান ধূমপুঞ্জ, হাইড্রোজেন গ্যাস, ডুপ্লেক্সের রঙীন ধোঁয়া আকাশের একটা দিক অধিকার করে রয়েছে। সেই দিকেই তোমাকে আগে তাকাতে হবে। মানিকপুরের আকাশে অন্য মেঘ অপ্রধান—কারখানাই মুখ্য। আকাশ সেখানে ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় ছাওয়া।

মানিকপুর শহর অথবা গ্রাম নয়—একটি কারখানার নিজস্ব বসতি। অতএব এর পথঘাট, বাড়িঘর, গাছপালা, মানুষের জীবন, জীবনযাত্রার দিনান্ত-দৈনিক ছন্দ, সব কিছুরই মূলে কারখানার কোন অলিখিত নিয়ম-নির্দেশ জারি করা রয়েছে। বাইরে থেকে হঠাৎ গিয়ে পড়লে আগন্তুকের মনে হবে—মানিকপুর আধুনিক কালের সুপরিকল্পিত একটি পরিচ্ছন্ন জনপদ। মানিকপুরের নিকটতম পাহাড় পনেরো-বিশ মাইল দূরে—তবু এখানকার মাটিতে পাহাড়িয়া উচ্চাবচ গদ্যকবিতার ছন্দ স্পষ্টই নজরে পড়ে। প্রতি ফার্লং-এর মধ্যে অন্তত: দুটো চড়াই উৎরাই-এর ঢেউ ওঠানামা করবেই—এঅঞ্চলের ভূমি-চরিত্রই এই রকম। কাজেই মানিকপুরের পথকে বাংলাদেশের সমতল পথ মনে করলে ভুল হবে—এদিক দিয়ে একে ছোট্ট পাহাড়ী শহর বলা চলে। নাতিদীর্ঘ অনেকগুলি প্রশস্ত পথ ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে দিক্‌বিদিকে। এক একটি অঞ্চলের সব বাড়িই দেখতে একরকম। বাড়িগুলির কপালে অধিবাসীর পদমর্যাদা চিহ্নিত।—'A' থেকে সুরু করে পর পর ক্রমনিম্ন স্তরের কর্মচারীদের কোয়ার্টারের সংকেত ইংরাজী বর্ণমালার ক্রম দিয়ে সূচিত। কিন্তু শ্রমিকদের ঢালাও নম্বর 'K' অর্থাৎ কুলী!

ঝাড়ুদার মেয়েটি স্বচ্ছন্দে ঢালু পথ দিয়ে মহিষগুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে মাঠের মধ্যে পৌঁছে দিয়ে আপনমনেই গালাগালি দিতে লাগল। তার এ তিরস্কারের প্রতিপক্ষ কেউ নেই—এমনিই হাওয়ার সঙ্গে ঝগড়া। এতক্ষণ ব্যস্ততাবশত: আশপাশের দিকে তার নজর ছিল না। ইতিমধ্যে কখন চারটের ছুটির বাঁশী বেজে গিয়েছে সে টের পায় নি। ভারী-ভারী অসংখ্য বুটের ধাক্কায় পথের কঠিন বুক কেঁপে উঠছে। হাজার হাজার মানুষ পিছন থেকে এগিয়ে

আস্‌ছে। তাদের পায়ের গতিধ্বনি! পিছনে তাকিয়ে দেখল সে, দলে দলে লোক আসছে। ঠিক দল নয়। তবে? মানুষেরা অখণ্ড জমাট এক বিরাট পিণ্ডের মত অবিচ্ছিন্ন ভাবেই এগিয়ে আস্‌ছে। সমুদ্রের ঢেউ যেমন আকাশের মাথা ছুঁয়ে অগ্রসর হয়, ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে দূর থেকে ওই অগ্রসরমান শ্রমিকদের দেখে। ছুটি হয়ে গেল! 'ভোঁ' বেজে গিয়েছে? আজ আর কাজ করতে হবে না—বিকেল, সন্ধ্যে, রাত্রি, কাল সকাল পর্যন্ত মুক্তি! মেয়েটি আপন মনেই মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে কয়েকবার লাফিয়ে নৃত্য করে হাতের ঝাঁটাগাছ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এখনও সামনের দিকে জনসমুদ্রের ঢেউ এসে পৌছায় নি—শান্ত, ঝিমন্ত একটা দিবাস্বপ্নের মত পড়ে রয়েছে সম্মুখের বসতি। আর হয়তো পাঁচ মিনিটও লাগবে না, ওই পশ্চাতের তরঙ্গ এসে প্রাণপ্লাবনে উছলে দেবে—স্বপ্ন টুটে জেগে উঠ্‌বে কতশত নিস্তেজ মানুষ, ঘরে ঘরে মুখর সজীবতা ফুটে উঠ্‌বে—যেমন রাত্রে হঠাৎ ফুলেরা ফোটে বিশেষ কোনো মুহূর্তে।

কি আছে এই ছুটির মুহূর্তে? সব আছে। শ্রমিক জীবনে ছুটির আনন্দ, প্রাণ ফিরে পাওয়ার আনন্দের মতোই অবাচ্যমধুর।

সত্য কথা বল্‌তে কি, মানিকপুরের মানুষের দিন শুরু হয় বেলা চারটের পর। এর আগে পথে ঘাটে লোক কই! হাটে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা চারটের আগে খুবই নগণ্য—যেটুকু জীবনচিহ্ন দেখা যায়, তা যেন ঘুমন্ত মানুষের শ্বাসক্রিয়ার মতই শান্ত, স্থির, নিস্তেজ।

আর চারটে বাজলে মানিকপুর শহর হয়ে ওঠে। পথঘাট টগ্‌বগ্‌ করে ফোটে, বাজারে হাটে লোকের ঠেলাঠেলি। বৈকাল পেরিয়ে সন্ধ্যায় হাজারো রকমের তামাশার প্রতিশ্রুতি—হিন্দী ছবির দেবিকারাণী, হাণ্টারবালীকে মনে হয় নন্দনলোকের হাতছানি, কোথাও গানের মজ্‌লিস, গোপনে গাঁজার আড্ডায় কলকে চড়িয়ে দ্রুতলয়ে তবলা-সঙ্গত, আধুনিক গানের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়ে কোনো গৃহস্থের বাড়িতে কিশোরী-তরুণীমহলের সামনে বসে কণ্ঠে ঈষৎ তরল মোহ ঢেলে দিয়ে যৌবনোত্তর তারুণ্য প্রচারক কোনো পুরুষের গান গাওয়া, ওদিকে ছোট বাবুদের ক্লাব-লাইব্রেরীতে তাস-পাশার

জমায়েত চলে রাত এগারোটা পর্যন্ত, সাহেব-সুবোর ইন্‌স্টিট্যুটে নাচ, গান, পান। আরও অনেক আনন্দের আয়োজন ইতস্ততঃ ছড়ানো, তার হিসাব কে দেবে!

কিন্তু এছাড়াও জীবনের বিকাশ আছে—যে বিকাশের জন্য কোনো আয়োজন হয় না সাড়ম্বর, সে জীবনপ্রবাহটা স্বয়ংসিদ্ধ। সেই জীবনের মধ্যে মানুষের আপন পরিচয়। সে কথা মানুষ কাউকে বলে না, সেটা তার একান্তই গোপন।

উঁচু সদর রাস্তার পাশে ঢালু মাঠ নেমেছে। এই মার্কেট রোডের নিচেই মাঠের ওপর খানিকটা জায়গা টিনের ছাউনী ঢাকা—কুস্তীর আখ্ড়া। হাটের পথে চল্‌তে চল্‌তে কেউ কেউ একটুখানি থম্‌কে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে পালোয়ানদের পাঁয়তারা। বেশ ভিড় জমে উঠেছে।

আজকের লড়াই নাকি কড়া রকমের হবে। গোরখপুরী ওস্তাদ নটবর মাহাতো আর পালানপুরী পালোয়ান বান্দা সর্দার দুজনেরই খুব নামডাক। নটবর মাহাতো হরদম তেল মালিশ করছে পায়ে, হাতে, গায়ে—থেকে থেকে দাব্‌নায় চাপড় মেরে জমাট-আওয়াজ তুল্‌ছে। তার পরণে আপাততঃ লাল-শালুর ল্যাঙট্, মাথার চুলগুলো এত ছোট করে কাটা যে চিম্‌টি কাট্‌লেও তা ধরা যায় না। নটবর মাহাতো তেল মেখে পটাপট বৈঠক দিতে লাগল, ওঠ্‌বস্ করবার সন্ধিক্ষণে তার নাক দিয়ে 'কেঁ ক্-কুঁ' 'ক্-কুঁ' শব্দ হচ্ছে—ঠিক যেমন সাইকেলের চাকায় পাম্প করার সময় শব্দ হয় তেমনি।

ওদিকে বান্দা সর্দার হাসি-হাসি মুখে আখ্ড়ার চারপাশে গায়ে-ফুঁ-দিয়ে বেড়াচ্ছে। তার গুম্ফে আত্মপ্রত্যয়ের হাসি। যেন অনায়াসেই সে প্রতিপক্ষকে পট্‌কে দেবে! তার চাল-চলনে তাচ্ছিল্যের কৌতুক, একমুঠো ঝুরোমাটি তুলে নিয়ে সে নটবর মাহাতোর সামনে দাঁড়িয়ে ফু দিয়ে উড়িয়ে ছড়িয়ে ফেল্‌ল। জবাবে নটবর বৈঠক থামিয়ে কপালের ঘামটুকু মুছে, পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে খানিকটা মাটি ছিট্‌কে বান্দার মাথার ওপর ফেল্‌ল।

কুস্তীর আখ্ড়ার চারিদিকে কৌতূহলী পথিক দর্শক ছাড়া আছে দুই পালোয়ানের নিজস্ব সমর্থক সাক্রেদ্‌রা। অনেকক্ষণ ধরেই এই ফষ্টিনষ্টি চল্‌ছে, লড়াই যে কখন শুরু হবে কে জানে! কেউ কেউ মজার গল্পে মশগুল, আর কেউ বা খানিক দাঁড়িয়ে আবার চলে যাচ্ছে। কখন কুস্তী শুরু হবে তার ঠিক নেই—মিছেমিছি সময় নষ্ট!

অবশেষে নটবর মাহাতো জাঙ্গিয়াটা পরল। এবার সে প্রস্তুত।

আর বান্দা পালোয়ান ঝুঁটিতে হাত বুলিয়ে, কয়েকটা ডন টেনে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। লম্বা দশাসই চেহারা, গায়ের রং টক্‌টকে, মেদবর্জিত পেশীপুষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অমিতশক্তি ভাদ্রের ভরা নদীর মত সুস্পষ্ট—বান্দা পালোয়ান দুই মুঠো ভরে মাটি তুলে নিয়ে নটবর মাহাতোর গায়ে ছড়িয়ে দিল। নটবরের তেলপিছল দেহটা একটু খস্‌-খসে করতে চায় বান্দা।

শুরু হ'ল লড়াই। পাঁয়তারা চল্‌ল খানিকক্ষণ।

নটবর মাহাতো প্যাঁচ মারবার চেষ্টা করছিল। বান্দা চট্‌ করে সেটা কাটিয়ে নিয়ে পিছন ফিরে আরও খানিকটা মাটি তুলে নিয়ে পরম কৌতুকভরে কোমর আর নিম্নাঙ্গ দুলিয়ে দুলিয়ে নাচল। তার তাচ্ছিল্যে দর্শকদের মধ্যে অট্টহাসির ঢেউ খেলে গেল।

নটবরের চোখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে। এ ধরণের তামাশা সে বরদাস্ত করবে না। নিমেষের মধ্যে নটবর ঝাঁপিয়ে পড়ল বান্দার ওপর। ইতিমধ্যে বান্দাও ঘুরে দাঁড়িয়েছে, প্রতিপক্ষকে উত্তেজিত করার কলকৌশল সে খুব ভালো করেই জানে এবং তার প্রতিফলও বান্দার অজানা নেই।

নটবর মাহাতো নিজের গোয়ালে দশবারোটা মহিষ পুষেছে, ছেলেবেলা থেকেই গো-মহিষকে শায়েস্তা করা তার অভ্যাস। কুস্তীর সময়ও সে জবরদস্ত বিপক্ষকে অবাধ্য মহিষ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না।

বান্দাকে নটবর মওকা-মাফিক জাপ্‌টে ধরল। তার গায়ের শক্তি কিছু কম নেই। দু'জনে ঝটাপটি করে পড়ল আখ্ড়ার নরম মাটির বিছানায়!

দু-পক্ষের সমর্থকরা ঘিরে ছিল—এখন আরও কাছে এগিয়ে গেল।

দর্শকদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে অভিজিৎ সিং। তাকে যারা চেনে তারা একটু সরে-নড়ে পথ ছেড়ে দিল। কিন্তু অভিজিৎ সামনে এগিয়ে গেল না। তার সঙ্গী রুদ্রপ্রসাদ প্রশ্ন করল—আজ বুঝি বড় রকমের লড়াই ?

অভিজিৎ জবাব দিল—না, মামুলি মহড়া। এ ত হামেশা হয়।

—হামেশা ?

—হাঁ !

—কিন্তু দেখে ত মনে হচ্ছে দুজনেই বেশ জবরদস্ত পালোয়ান !

—আরে হাঁ ! এরকম পালোয়ান মানিকপুরে এন্তার দেখতে পাবে।

রুদ্রপ্রসাদ তারিফ দিল—যাই বলুন খাশা লড়্‌নেবালা—হা সাবাস্ ভাই—

ওদিকে বান্দা সর্দার পাল্টা প্যাচ মেরে নটবরকে বেকায়দায় ফেলেছে। তাই দেখে রুদ্রপ্রসাদ মহা উল্লাসে বাহবা দিল।

অভিজিৎ চোখের ইশারায় রুদ্রপ্রসাদকে সাম্‌লাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেদিকে নজরই নেই রুদ্রপ্রসাদের, সে লড়াই-এর প্যাচে নিজেকে আটক করে ফেলছে।

মাটি কাম্‌ড়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে নটবর, আর বান্দা তার পিঠের ওপর হাঁটু মুড়ে সওয়ার হয়ে বসেছে, চিত করবার চেষ্টায় সে তৎপর।

অভিজিৎ বলল—চলো হে !

—হারজিতটা দেখে যাবেন না ?

একথায় হাস্‌ল অভিজিৎ,—আরে এত চট্‌পট্ কি ফ্যায়সলা হবে ? ওরা এখন দমভোর যুঝবে !

—এই ত হয়ে এল ! ঝুঁটিবালা কামাল করে ফেল্‌ল বলে !

রুদ্রপ্রসাদ পালোয়ানদের কুস্তীর দিকে নজর রেখেই উত্তর দিল।

অভিজিৎ তার হাত ধরে টান মারল, বলল—ও এখন কমসে-কম ঘণ্টা-খানেকের মাম্‌লা। তা করতে আমরা হাসপাতাল থেকে ঘুরে আস্‌ব।

রুদ্রপ্রসাদ একান্ত অনিচ্ছাভরে মুখ ফিরিয়ে অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বল্‌ল—চলুন। লেকিন—

—আরে, শোনো তো বলি ! ওরা একটু মেহনত করছে, সত্যিই ত

হারজিতের লড়াই এটা নয়। বিকেলবেলা মেহনত না করলে যে তবিয়ত বিগড়ে যাবে। একবার বেতবিয়ত হলেই গুণ্ডার আখের খতম্। তখন কোম্পানী তাকে ছেঁড়া সুকতল্লার মত ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আরে এরা হচ্ছে কোম্পানীর পোষা গুণ্ডা, বুঝলে!

রুদ্রপ্রসাদ এ কথার তাৎপর্য বুঝল না, কিন্তু সে আর কিছু বললও না।

মানিকপুরের একপ্রান্তে কারখানা, অপরপ্রান্তে হাসপাতাল। শহরের সবচেয়ে উঁচু ডাঙ্গায় অবস্থিত হাসপাতালের সারি সারি ঘরগুলি যেন মানুষের আরোগ্যকামনার প্রতীক! খুব অল্পদিন হ'ল হাসপাতালের এই নতুন বাড়ি তৈরী হয়েছে। গোটাকয়েক ইউক্যালিপ্টাস গাছ আর তৃণাস্তৃত খোলা ময়দানে কয়েকটি গন্ধহীন রঙীন ফুলের 'বেড' কোনোরকমে নিরাভরণ মাটিকে বন্ধ্যাদশা থেকে রক্ষার প্রয়াস করছে। কেউ কেউ এই জাতীয় স্বল্পসজ্জাকেই যথার্থ রুচির পরিচায়ক বলে তারিফ করতে পারেন।

পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত বাইরের লোকেরা রোগীদের দেখাশুনো করতে আসে।

সাড়ে পাঁচটার সময় অভিজিৎ সিংকে হাসপাতালে ঢুকতে দেখা গেল। তার সঙ্গে একজন সাহেবী পোশাক পরা লম্বা ছোক্‌রা, ঠোঁটে চুরুট। অভিজিৎ নিজে ধুতিকে দু'পাট করে প্যাঁচ দিয়ে লুঙ্গীর মত পরেছে। ধব্‌ধবে ফর্সা ধুতি। সে বিড়ি ধরিয়ে চল্‌ছিল। হাসপাতালের হল্‌ঘরে ঢোকবার সময় বিড়িটা মাঠের দিকে ফেলে দিল—সযত্নে নিভিয়ে। তার সঙ্গীটিও ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে নিভোতে উদ্যত হ'ল, অভিজিৎ বাধা দিল, না, না, তোমার জন্যে এসব নিয়ম নয়।

অভিজিৎ সিং শ্রমিক ফেডারেশনের একজিকিউটিভ্ কমিটির সদস্য, তাকে খুব হিসেব করে চল্‌তে হয়। নইলে সে অনায়াসে স্যুট হাঁকিয়ে হট্‌মট্ করে ঘুরে বেড়াতে পারে না কি? পাট্‌না থেকে তার শ্যালক রুদ্রপ্রসাদ আজই এসেছে। কারখানা থেকে ফিরে অভিজিৎ সিং বিকেলে কুটুম্বকে শহর দেখাতে বেরিয়েছে।

রুদ্রপ্রসাদকে হাসপাতালে নিয়ে আসার মূলে অভিজিতের সূক্ষ্ম হিসাববুদ্ধি রয়েছে—কুটুম্বকে দেখিয়ে দেওয়া যাবে তার প্রতিপত্তির নমুনা। আবার এখানকার লোকেরাও বুঝবে অভিজিতের সামাজিক মর্যাদা কতখানি উঁচু। রুদ্রপ্রসাদও ভগ্নিপতির মত ধুতি পরে বেরুতে চেয়েছিল কিন্তু তা:ক অভিজিৎ ধমকে বলেছিল—তুমি ত আমাদের মত কুলীকাবারী নও ভাই—সরকারী দপ্তরের অফ্সার বাবু।

অভিজিৎ বিড়ি ফেলে বল্লে—আমার কি মরবার ফুরসুৎ আছে! রুদ্দর্ তুমি এলে, কোথায় তোমাকে নিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াবো—তা নয় এখন চলো হাসপাতাল। না এসেও উপায় নেই। কত যোয়ান যে হাঁ করে পড়ে থাকে আমাদের মুখ চেয়ে। অসুখের সময়ে না দেখ্লে পরে বল্বে, 'বেইমান'—এস, এ ঘরেই আগে যাই! এটা হচ্ছে জ্বর, মানে টাইফয়েড, নিউমোনিয়া এ-সবের ওয়ার্ড।

লম্বা হল্ঘরের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিল অভিজিৎ সিং। রোগীদের বিছানার পাশে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকেরা এসেছে দেখ্তে। বাইরে থেকে হাসপাতালটা যেরকম ঝক্-ঝকে দেখায় ভেতরটা তত পরিচ্ছন্ন নয়। দেয়ালের গায়ে তেলের ছোপ, ছারপোকার রক্তবিন্দু জমাট বেঁধে রয়েছে, মেঝেতে ফলের ছিব্ড়ে, কোথাও কোথাও কাশ থুথুও পড়ে রয়েছে, বাতাসে আয়ডোফরমের গন্ধের সঙ্গে একটা চিম্সে বিশ্রী গন্ধ।

অভিজিৎকে দেখে একজন বৃদ্ধ শীর্ণ হাত তুলে নমস্কার করল। অভিজিৎ প্রতিনমস্কার করে ইশারায় জানালে—'ঘুরে আসছি।' তারপর সে উৎসুক দৃষ্টিতে হলঘরখানা পায়চারী করে দেখে নিল—চেনাশুনো বিশেষ কেউ নেই। আপন মনেই বল্লে—ও, তাহলে তের নম্বরের তেওয়ারীটা পালিয়েছে?

রুদ্রপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বল্লে—আহাম্মকদের দস্তুরই এই। একটু উঠে বস্তে-না-বস্তে কোয়ার্টারে পালাবে। আরে বাবা একটু শরীরটা সামলিয়ে নে। তারপর ত হায়রানী পেশামানী আছেই। কোম্পানীর জাঁতাকল ত রয়েছেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার শুরু করল সে—দোষই বা দেবো কী! না খাট্‌লে মজুরী পাবে না—পয়সা না পেলে পেট চল্‌বে কি করে? তামাম সংসার হাঁ করেই আছে!

তারা ফিরে এসে দাঁড়াল সেই বৃদ্ধের শয্যাপার্শ্বে। বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—টুল্‌টা, দেখুন দেখি কোন্ বেইমান নিয়ে গেল। আরে এঃ—

অভিজিৎ বাধা দিয়ে বল্‌লে—থাক, থাক হয়েছে! কেমন আছো ভাই রঘুবীর, আজ জ্বর কত? রঘুবীরের ওষ্ঠে একটুখানি ম্লান হাসি জ্বলেই স্তিমিত হ'ল—আর আছি বাবু! আজ তিন দিন হয়ে গেল জ্বর আসে নি। ডাক্তারবাবুকে তোষামোদ করি, তব্‌ভি ও শালা রোটি দিচ্ছে না। বেমার যদি গেল ত এবারে উপোস করেই মরতে হবে। এখানে সব আদ্‌মী ডাকু আছে সিংজী! স্রেফ শুকিয়ে মরছি।

অভিজিৎ গম্ভীর হয়ে গেল—দুনিয়ারই ওই হাল—ওর আর এখান সেখান নেই। তা ছ্যাখো রঘুবীরজী, ডাক্তার যখন যা বলে সেটাই মেনে চলা ভালো। বাইরে থেকে কাউকে দিয়ে যেন কিছু আনিয়ে খেয়ো না।

রঘুবীর প্রমাণমাপে জিভ্ কেটে নিজের কানে হাত দিয়ে বল্‌লে—হনুমান্‌জীর দোহাই সিংজী, মরে যাবো তো বেইমানী করব না। বাপ্‌রে বাপ্—জান্‌টা ত নিক্‌লে গিয়েইছিল। স্রেফ আপনাদের আশীর্বাদ আর ডাগদার বাবুর সুইতে আবার একটু একটু ফিরে আস্‌ছে মালুম হয়।

অভিজিতের মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল!

রুদ্রপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে সে বল্‌লে—এখন দেখ্‌ছ বটে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছে। মাত্র সতেরো দিনের জ্বরে—কী চেহারা কি হয়ে গিয়েছে, সে তুমি ধারণা করতে পারবে না।

অভিজিতের এই ক'টি কথা যেন রঘুবীরের মনে সঞ্জীবনী মন্ত্রের মত কাজ করল। রঘুবীরের চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠ্‌ল—সিংজী! আর শুয়ে থাকতে পারছি না। আঃ কী ভুখ্! মালুম কী বিশটা রুটী দিলে খেয়ে হজম করে ফেলি—আবার গায়ের তাকতও ফিরে আসে। আপনি ডাগদারকে

একটু বলে দিয়ে যান। দুধের নামে শাদা জল আর বার্লিক খেয়ে ক্ষিদে আরও ক্ষেপে ওঠে!

অভিজিৎ বল্‌লে—সবুর ভাই, দুদিন গেলেই ভাত দেবে। তারপর রুটি খেয়ো যতো ইচ্ছে বাড়ি গিয়ে!

হতাশভাবে রঘুবীর বল্‌লে—আমি কি আর বাড়ি ফিরতে পারবো সিংজী! দেখুন একেবারে হাড্ডি—স্রেফ হাড্ডি—। আঃ জল!

কথা বল্‌তে বল্‌তে দুর্বল রঘুবীর শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। অভিজিৎ তার গলায় জল ঢেলে দিল।

একটু সুস্থ হয়ে রঘুবীর প্রশ্ন করে—মাঈজী ভালো আছে?

—"হ্যাঁ!" বলে অভিজিৎ বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হ'ল 'আজ চলি!'

—যাবেন বই কি! কেউ ত আসে না দেখ্‌তে! আপনি তবু এসেছেন। আচ্ছা সিংজী, আপনার মনে পড়ে সেদিনের কথা?

তৃষিত উৎসুক দৃষ্টিতে রঘুবীর আহীর তাকিয়ে থাকে অভিজিৎ সিং-এর মুখের দিকে।

অভিজিৎ একটু চিন্তা করল, রঘুবীরের মুখের পানে চাইতেই বুঝতে পারল কোন্ কথাটা বোঝাতে চাইছে বৃদ্ধ।

সে উৎসাহ দেখিয়ে বললে—আরে সে কথা মানিকপুর বস্তিবাঁধের লোকেরা এ জিন্দগীতে ভুলতে পারবে নাকি? হাঁ পালোয়ান বটে রঘুবীর পালোয়ান—এক ডাকে তামাম্ গোয়ালাপট্টী হৈ হৈ করে ছুটে আসে! জানো না ত রুদ্রজী! ইয়া বুকের কলিজা—বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালে মনে হবে চামড়া দিয়ে ঢাকা ইয়া বড় বয়লার!

কথা বল্‌তে বল্‌তে অভিজিৎ তাকাল একবার রঘুবীরের শীর্ণ মুখের দিকে। দাড়ি-গোঁফে প্রায় সবখানি ঢাকা পড়ে গিয়েছে, তবু তার মধ্যে থেকেই চক্‌চকে দুটি চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এই ক'টি কথাতে।

অভিজিৎ উৎসাহিতভাবে বলে চলে—রঘুবীরের লাঠি ঘুরলে সাতখানা তরোয়াল তার মহড়া সাম্‌লাতে পারবে না। সাবাস্ লাঠি ধরে ছিলে ভাই

সেবার—সেই যে পাঞ্জাবীরা মার খেলে গোয়ালাদের কাছে! ব্যস্ ঠাণ্ডা, সেই থেকে আর মাথা তুল্‌তে সাহসই পেলো না!

রুদ্রপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করে—কি রকম ব্যাপার?

—আরে ব্যাপার ত হরদমই লেগে থাকৃত, তবে হঁ্যা আজকাল কোম্পানীর সঙ্গে লড়াই করতে হয় বলে লেবার সব এক সামিল হয়ে আসছে। নইলে আগে আগে মারপিট, দাঙ্গা, খুন, লেগেই থাকত। এখনকার মানিকপুরের সঙ্গে তখনকার মানিকপুর আশমান্-জমীন ফারাক!

রঘুবীর আহির বিরস বদনে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল। কারণটা আর কিছুই নয়—রঘুবীর যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চেয়েছিল সেটা মাঝপথে হারিয়ে যাওয়াতে সে অপ্রসন্ন। আন্দাজে ধরতে পেরে অভিজিৎ সিং প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিল—সেই অরাজক কালে রঘুবীরের মত দু'এক জন ইমান-ইজ্জতদার মানুষই মানিকপুরের মুখ রাখতে পারত। আজ সতেরো দিনের জ্বরে সেই অশথ্ পেঁড়কে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে—চিন্‌তে পারা যায় না এমন হাল হয়েছে রঘুবীরের! আচ্ছা রঘুবীর, প্রথম খবর পেলে যেন কার কাছে?

রঘুবীর ব্যগ্রভাবে বললে—আমি তখন বড় সাহেবের বাংলো থেকে ফির্‌ছি—দেখি না, জনা দুচ্চার কামীন মুখ শুকিয়ে ছুটছে। হাম্ নে বোলা, ক্যা হুয়া? আমাকে ত দেখে বেটিরা রুখে গিয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল। ম্যয় পুছা, আরে বোল্ বেটিয়া! ত ওরা তখন বল্‌লে—এক ইয়া বড় পাঞ্জাবী মরদ, ইয়া কির্‌পাণ নিয়ে, ওই ধোবিখানার সাম্‌নে বন্ বন্ করে ঘোরাচ্ছে, আর যাকে দেখ্‌ছে তাকেই তাড়া করে যাচ্ছে!·· তো হাম শোচা, হামারা লাঠি!

অভিজিৎ বল্‌লে—হঁ্যা, মহল্লায় মরদ নেই। আমরা ত সব ডিউটিতে কারখানার মধ্যে।

রুদ্র অবাক হয়ে গেল—একেবারে দিনে-দুপুরে? বড় তাজ্জব—

—আরে দিনে-দুপুরেই ত সুবিধে—তখন মরদেরা ত সব কারখানায় থাকে, সেই সময়েই দুশমনদের যত নষ্টামী! আজকাল তবু লোক অনেক বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু চার-পাঁচ বছর আগে এখানে মেয়েছেলে নিয়ে বাস করা বেশ বিপদের ব্যাপার ছিল!

রঘুবীর বাধা দিয়ে বল্‌লে—শুনুন ত, বাবুসাব তারপর কি হয়েছিল! ধোবিখানার কাছে লাঠি নিয়ে, পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে আমি হাজির। দেখি বান্দা সিং—ইয়া লম্বা পালোয়ান, শালা নাঙ্গা কৃপাণ 'বন্‌-বন্‌' ঘোরাচ্ছে। শালা হচ্ছে লেস্‌লী সাহেবের মেমের পেয়ারের আরদালী। শালাকে দেখেই আমি 'চন্ন্‌' করে হাল্লা তুলে দিই হা-রা-রা-রা! ব্যাস হামার হাতে পাকা লাঠি, হাওয়া ফেড়ে ঘুরতে লাগ্‌ল! ওদিকে কুলি-কোয়াটারের কেয়ারী-কবাট বিল্‌কুল বন্ধ, একটি লোক নেই পথে—আমি একা, আর ওই শালা বান্দা সিং কৃপাণ নিয়ে তরপাচ্ছে। পহেলা ঠোক্করে কৃপাণ ছিট্‌কে পড়ল, দোসরা ঠোক্করে বান্দা লট্‌কে পড়ল—শালা মাতোয়ালা!

রঘুবীরের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে অভিজিৎ বল্‌লে—তারপর শুরু হয়ে গেল খেল্‌। পাঞ্জাবী আর গোয়ালাদের দাঙ্গা। একে-একে সাত আট দশজন পাঞ্জাবী কৃপাণ নিয়ে তাড়া করল রঘুবীরজীকে। আর রঘুবীরের লাঠি ঘুরছে এ্যায়সান জোর যে বালি ছুঁড়ে মারলে বালি ওর গায়ে লাগ্‌বে না, লাঠিতে লেগে ঠিক্‌রে ফিরে আসবে।

রঘুবীর উত্তেজনায় উঠে বসল—কিন্তু বাবুজী, দশটা পাঞ্জাবীতে চারদিক থেকে আমার হাতে মারবার ফাঁক খুঁজ্‌ছে! আমি জয় হনুমান জপ্‌ছি আর বক্সী-বাঁধের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, কোনোরকমে আমাদের হদ্দোর মধ্যে ওদের টেনে নিয়ে যেতে পারলে রসুণের ধক্‌ মেরে দিই আর কি! গুরুজীর কিরপায় কম্‌সে-কম ত লাঠির চোটে চারটে ঘায়েল হয়ে পড়ল। আমি দেখিনি ওদিক থেকে সাক্‌রেদ ডোম্‌না এসে গেছে! যেই ডোমন এসেছে দেখ্‌লাম্‌, অম্‌নি মনটা হাল্কা হয়ে গেল। ডোমন সাকরেদ আমার, লড়নেবালা বটে! ব্যাস্‌ যেই একটু মনটা আল্‌গা হওয়া, অম্‌নি আমার গর্দানের পাশে কৃপাণের চোট লেগে এক চিল্‌তা ছিল্‌কা উড়ে গেল! তা ডোম্‌না আরও তিনটেকে শুইয়ে দিয়েছিল।

বল্‌তে বল্‌তে রঘুবীর শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। যেন অতীতের সংগ্রামটা এই মুহূর্তেই ঘটে গেল, তারই ক্লান্তি!

অভিজিৎ সিং বল্‌লে—তারপর বক্সী-বাঁধের কাছাকাছি যেতে পাঞ্জাবীদের পিঠে চারদিক থেকে গোয়ালাদের তেল-মাখানো পাকা লাঠি এসে পড়ল। ব্যাস, দে চম্পট্! জান্ সামাল—জান্ সামাল!

রুদ্রপ্রসাদ যেন বিশ্বাস করতে পারে না এদের কথা।

অভিজিৎ সিং সান্ত্বনা দিল রঘুবীরকে—আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। হাড় জিন্দা থাকলে মাস আপনি এসে লেগে যাবে, কিছু ভেবো না রঘুবীর।

পিছন থেকে কম্বু কণ্ঠে কে বল্‌লে—রাম রাম গুরুজী! আরে কেয়া বাৎ সিংজী! রাম রাম, খবর সব ভালো তো আপনার?

অভিজিৎ হাত তুলে নমস্কার করে বল্‌লে—এই যে ডোমনপ্রসাদ যে, কি খবর তোমার?

ডোমনপ্রসাদ খুব লম্বা নয়, তবে তার স্বাস্থ্যকে সত্যিই সম্পদ বলা চলে। রুদ্রপ্রসাদ তাকে আপাদমস্তক দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

অভিজিৎ বল্‌লে—রুদ্র, একটু আগে এই ডোমনের কথাই হচ্ছিল। রঘুবীরের পয়লানম্বর সাক্‌রেদ!

ডোমন প্রাণখোলা হাসি দিয়ে রুদ্রপ্রসাদকে অভিবাদন করলে,—সে বল্‌লে—আমি কিচ্ছু কথা বল্‌তে জানি না বাবু সাহেব! মাপ হি মাংতা।

রুদ্রপ্রসাদ স্মিতহাস্যে জবাব দিল—কথা ত আমাদের মত রোগা পট্‌কার হাতিয়ার, আপনার কথা বল্‌বার কি দরকার?

ডোমনপ্রসাদ আর একদফা হেসে বল্‌লে—আপনি এলেমদার আদমী!

অভিজিৎ-এর দিকে তাকিয়ে বল্‌লে সে—বাবুসাহেবকে নিয়ে আসবেন কোয়াটারে। বাবুসাহেবের দেমাক বড় মিঠে লাগ্‌ছে সিংজী।

রঘুবীর ডাকলে—কেয়া রে ডোম্‌না! তেরা আনেকা টাইম মিলা!

—আর গুরুজী, বাচ্ছাটা বেমার পড়ে গেল!

অভিজিৎ বল্‌লে—তোমার ছেলের অসুখ? কি হয়েছে?—

—আমার বাড়ি না, আমাদের পাশের কোয়াটারের লখীন্দর বাবুর খোকার—

—লখীন্দর দত্ত, সেই দালালটা?

অপ্রসন্নতায় অভিজিতের মুখ কালো হয়ে গেল। তারপর সে বিদায় নিলে।

—আচ্ছা রঘুবীর এখন যাই, জখ্মী ঘরটা একবার দেখে যেতে হবে।

ডোমন প্রশ্ন করলে—কোই নয়া আদ্মী জখম হুয়া, ক্যা ?

—নাঃ, এই মামুলী ভিজিট্ দিতে যাচ্ছি। যদি কেউ থাকে, বলা ত যায় না—এতবড় কারখানা, সাড়ে ন'হাজার লোক কাজ করছে, পাঁচটা ব্যাটারীর বয়লার জ্বলছে—কোথায় কে জখম হ'ল, হাসপাতালে না এলে—!

—হ্যাঁ, তা যা বলেছেন মেম্বার সাহেব।—ডোমনপ্রসাদ সায় দিল।

রুদ্রপ্রসাদ আর অভিজিৎ সিং চলে যেতে ডোমনপ্রসাদ রঘুবীরের বিছানার উপর চেপে বস্‌ল। আপন মনেই সে বল্‌লে—এটা কিন্তু মেম্বারসাহেবের অন্যায়—

রঘুবীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, ডোমন প্রসাদ বল্‌লে—লখীন্দরবাবু কবে কি চুক্‌লী খেয়েছিল, তাই নিয়ে আজও ঝামেলা কাজিয়া করা কি উচিত ?

—আরে গোলী মার ! ওসব মেম্বারবাজীর ঠাট্ ! লখীন্দরবাবু করেছিলটা কী, বল্ তো, আমার কুচ্ছ্ মনে নাই।

—বাদ দাও ওসব কথা গুরুজী ! তুমি কেমন আছ বল তো ?

—আর ভাই মরে গেলাম। বহুৎ ভুখ, দুনিয়ার সব কিছু গিলে খাই ইচ্ছে হচ্ছে। বড় খিদে—

ডোমনপ্রসাদ এদিক ওদিক তাকিয়ে পকেট থেকে একটা শিশি বার করল, তাতে ছিল ঝাল-মশলাদার আচার। রঘুবীর অধীর বালকের মত ডোমনের হাত থেকে শিশিটা কেড়ে নিল। খেতে খেতে বল্‌ল—রোটী নিকাল্ জল্‌দি।

হাসপাতালের সবচেয়ে মূল্যবান বিভাগ 'সার্জিক্যাল ওয়ার্ড।' বিরাট হল্ ঘর—এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে দিল। অনেক সময় দূরের মানুষকে খুব ভালভাবে লক্ষ্য করে না দেখলে ঠিক চেনা যায় না।

একপাশে পর্দা দিয়ে ঢাকা দরজা—ওই পর্দার আড়ালে যে ঘরখানি রয়েছে সেটাই অপারেশন থিয়েটার। ওখানে অনেকেরই মূল্যবান হাত-পা হারিয়ে যায়। এ-ওয়ার্ডের কাজ সব সময়ের জন্যই খুব বেশি! এক একদিন ছটা সাতটা পর্যন্ত জখম লোক ভর্তি হয়।

জ্বরের ওয়ার্ডের সঙ্গে জখমী ওয়ার্ডের কোনোই মিল নেই। লোহার খাট-গুলোর সঙ্গে কারও পা উঁচু করে বেঁধে রাখা আছে। কারুকে অক্সিজেন গ্যাস দেওয়া হচ্ছে। যন্ত্রণায় কোনো রোগী চীৎকার করছে। এই হলে ঢুকেই রুদ্রপ্রসাদের মাথাটা কিরকম ঘুরতে শুরু করেছে—যেদিকে সে তাকাচ্ছে সেদিকেই একটা না একটা কিছু ভয়াবহ দৃশ্য চোখে পড়ছে! এখানে দর্শকের ভিড়ও কম। যারা আছে তারা প্রত্যেকেই কেমন হতবাক হয়ে রয়েছে! রুদ্রপ্রসাদের মনে হচ্ছে যেন, মৃত্যুর এত কাছাকাছি আসতে যে কোনো মানুষই ভয় না পেয়ে পারে না—তাই এ স্তব্ধতা।

অভিজিৎ সিং ধীরপদে প্রত্যেকটি রোগীর বিছানার কাছে গিয়ে খবর নিচ্ছে কে কেমন আছে। কথা বলবার মত অবস্থা যাদের নেই, তাদের কাছে গিয়ে একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌ছে, চলে আসবার সময় রোগীর পাশের লোককে বলে আস্‌ছে—জ্ঞান হ'লে বল্‌বেন ফেডারেশন কমিটির মেম্বার অভিজিৎ সিং দেখ্‌তে এসেছিল।

হাসপাতালের আচার-আচরণ সম্বন্ধে অনেকেরই অনেক অভিযোগ। এখানকার সব ব্যাটা নাকি একজোটে চুরি করে!

নিরাময়ের কাছাকাছি যারা পৌঁছেছে তাদের মুখে পথ্যের অনাচার-দুর্দশার কাহিনী।

একজনের অভিযোগের জবাবে অভিজিৎ বল্‌ল—হাঁ ভাই, সবই ত বুঝতে পারছি, ফাইটও করছি, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়! একে ত কোম্পানীর কাছ থেকে আদায় করা যায় না,—একনম্বর চামার কোম্পানী। তা যদি বা কোম্পানী একপয়সা দিল, ত এই হাসপাতালের লোকগুলোর খপ্পরে তার দু'পাই হাওয়া হয়ে গেল। যে বেইমানগুলো রোগীর মুখের দুধ চুরি করে খায়, তারা কি মানুষ? যারা মরণাপন্ন মানুষের ওষুধে

ভেজাল মিশিয়ে দিচ্ছে, তাদের কি সাজা হওয়া উচিত আমি ত ভেবে পাই না। কিন্তু—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অভিজিৎ সিং থম্‌কে যায়—গলা তার কাঁপতে থাকে আবেগের আতিশয্যে—কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে চল্‌বে না, লড়াই করে জিতে নিতে হবে!

যে লোকটির শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে অভিজিৎ কথা বল্‌ছিল তার পাশের বেডের রোগীটির বুড়ো আঙুল হাতুড়ির ঘায়ে ছিট্‌কে হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। সে বল্‌লে—মেম্বার সাব, আমার কি হবে?

হাতখানা বাড়িয়ে দিল সে সাম্‌নের দিকে।

অভিজিৎ প্রশ্ন করলে—একটা খেসারতীর দাবী দিয়ে দরখাস্ত করো, আমি আছি পেছনে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল—তার জন্যে তোমার চারশ টাকা ত কম্‌পেনসেশন পাওয়ার কথা। কি করে গেল?

—আর খেসারতী! যে আঙুলটা গেল সেটা ত আর টাকা দিয়ে কিন্‌তে পাব না! টাকা নিয়ে আমার কি হবে?

—তা বলে ক্লেম ছেড়ো না। শালা কষাই কোম্পানীর কাছ থেকে খিঁচে নিতে হবে।

কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে লোকটা বললে—আপনার কাছে সত্যি কথাটাই বলি! ফোরম্যান সাহেবের বাড়ির জন্যে একখানা বড় চাটু তৈরী করে দিয়েছিলাম, তারপর তাঁকে বলে নিজেরও একটা বানাচ্ছিলাম।

—তারপর?

—ছুটি হয়ে যাওয়ার পর আপনার মতলবে কাজ করছি—এমন সময় হঠাৎ মচ-মচ জুতোর আওয়াজ কানে যেতেই, কেমন চম্‌কে উঠে বাইরের দিকে নজর দিয়েছি। আর খেয়াল ছিল না, হাতুড়ির ঘা মেরে দিয়েছি নিজের—

রুদ্রপ্রসাদ নিজের অজ্ঞাতেই—"ইস্" করে উঠল।

অভিজিৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে বল্‌লে—হুঁ! ছুটির পর?

—জী হাঁ! ম্লান স্বরে জবাব দিল লোকটি।

—বামাল সাম্‌লাতে পারো নি?

—হাঁ, বামাল ত হরিহরের হাত দিয়ে বয়লারে চালান করিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ্যাকসিডেন্টের টাইম রেকর্ড হয়ে আছে চারটে উনিশ!

—মুস্কিল! এক-আধ মিনিট নয় যে, সম্‌ঝিয়ে দেবে হাতের কাজ তখনও শেষ হয় নি বলে আনফিনিশ রেখে দিয়ে আস্‌তে পারছিলে না। উনিশ মিনিট!

অভিজিৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হতাশভাবে ঘাড় নাড়লে—পিটিশন বাতিল হয়ে যাবে, কোম্পানী খেসারৎ দেবে বলে মনে হয় না।

—আমার নসীব।

পরক্ষণে অভিজিতের চোখে যেন আশার আলো ঝিলিক মেরে উঠ্‌ল —আচ্ছা, তোমার ফোরম্যানকে দিয়ে কায়দা করে ওভারটাইমের মেমো করাওনি কেন এ্যাকসিডেন্টের পর?

—আর বল্‌বেন না সে হারামীর কথা। সাত দিন হাসপাতালে পড়ে রয়েছি তা একবার চোখের দেখাটাই দেখ্‌তে আসে নি।

রুদ্রপ্রসাদ আপন মনে বল্‌লে—একটা চাটুর জন্যে একটা আঙুল!

অভিজিৎ তড়িৎস্পৃষ্টের মত জবাব দিল—লেবারের একটা আঙুলের কি দাম সে তোমরা বুঝতে পারবে না রুদ্র ভাই!

রুদ্র মৃদু কণ্ঠে বল্‌লে—মানুষের আঙুলের থেকে কি তা আলাদা?

অভিজিৎ ধমকে উঠ্‌ল—জরুর! তারপর সে মুখ নীচু করে লোকটিকে সান্ত্বনাচ্ছলে বল্‌লে—আচ্ছা দেখি কি করা যায়!

সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে আর একমুহূর্ত্ত থাকলে রুদ্রপ্রসাদের দম বন্ধ হয়ে যাবে।

একটি বেড্‌এর চারিপাশ কাপড় দিয়ে ঘেরা রয়েছে। সেদিকে দেখিয়ে অভিজিৎ বল্‌লে—ও লোকটার ইলেক্‌ট্রিক চার্জ লেগেছে আজ তিনটের সময়—বাঁচবে না।

একটু আগে যে রুদ্রকে ধমক দিয়েছে সেকথা আদৌ মনে নেই অভিজিতের। কিন্তু রুদ্রপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে অভিজিতের হুঁশ হ'ল, সে বললে—তোমার কষ্ট হচ্ছে তা এতক্ষণ বলো নি কেন? চল, চল, আমরা বাইরে যাই। কুস্তীর আখ্‌ড়াতে যাবে?

রুদ্রপ্রসাদ কোন জবাব দিল না। সে যেন পটে আঁকা ছবি!

পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, একটি সবুজ রং-এর উলঙ্গ মানুষ বিছানার ওপর শায়িত। একজন প্রৌঢ় ডাক্তার ব্যস্তভাবে পর্দা সরিয়ে ভেতরে গেল। এক ঝলকে ওই ঘরের সবটুকু দেখা গেল—বিছানার পাশে নার্স দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখ্‌ছে!

রুদ্র বল্‌লে—সবুজ কালির মত রং হয়ে যায়, ইলেক্‌ট্রিক চার্জে?

—না, ওর গায়ে কালি ঢেলে দিয়েছিল ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা। সবুজ কালিটা পোড়ার ওষুধ কি না!

—লোকটা বাঁচ্‌বে না?

সে-কথার জবাব এড়িয়ে অভিজিৎ বল্‌লে—ও হো, জরুরী কাজ রয়েছে একটা—লেবার ফেডারেশানের মাতব্বর অভিজিৎ সিং, কাজেই কুটুম্বকে নিয়ে শখের ভ্রমণ ত তার দ্বারা সম্ভবপর নয়!

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রুদ্রপ্রসাদের দৃষ্টি পড়ল কারখানার চিম্‌নীগুলোর মিলিত অগ্নিশিখার দিকে। পথের দুপাশের আলোর সারি ঢেউ-এর লহর তুলে শেষে মিশেছে ওই চিম্‌নীর মহাকেন্দ্রে। আকাশে চাঁদ যে উঠতে পারে ঠিক এই মুহূর্ত্তে সেকথা কেউ বুঝি মনে রাখে না এই মানিকপুরে!

রুদ্রপ্রসাদ আজই এখানে এসেছে—এই একরত্তি মানিকপুর যেন পাটনার চেয়েও ঢের বেশি বড়, এমন কি এই মুহূর্তে কলকাতার চেয়েও বড় মনে হয় যেন। রুদ্রপ্রসাদের মন শ্রদ্ধায়, ভয়ে ভরে উঠেছে—দুনিয়ার আর সব জায়গার চেয়ে পৃথক একটা নতুন বিচিত্র বিস্ময় নিয়ে মানিকপুর তাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে তাতে আর কোনো ভুল নেই।

দুই

বড় বড় বিলেতী গাছের সজ্জায় প্রথম শ্রেণীর সাহেবদের আবাসিক অঞ্চল যেমন মনোরম তেমনি শান্ত জনবিরলতায় নিঝুম—এত শান্ত যে অনেক সময় মৃত্যুর সাম্রাজ্য বলেও ভুল হ'তে পারে। হঠাৎ এখানে এসে পড়লে গাছে গাছে পাখির কলকাকলী ছাড়া আর কিছু শোনা যাবে না। এ পথে চল্‌বার সময় পথিক মুখ বুজে মাথা নীচু করে হাঁটে। অনধিকার প্রবেশেরই মত যেন একটা অপরাধজনক কিছু ক'রে ফেলেছে সে! মাঝে মাঝে কোনো বাংলোর বাগানে পেরাম্বুলেটরে চড়ে ফুটফুটে কোনো শ্বেতশিশুকে দেখা যায়, ঘন বেড়া-ঝোপের মধ্য দিয়ে তাও ভালো করে দেখ্‌তে পাবে না তুমি। কারখানা থেকে মাইল দেড়েক দূরে এই প্রথমশ্রেণীর সাহেব-সুবোদের বাংলো, এখান থেকে চিম্‌নীর হুতাশনকে দেখতে পাবে না। এক-একটি বাংলোর সঙ্গে প্রায় বিঘেখানেক জমিতে বাগান, খেলার মাঠ, চাকর-মালীদের ঘর, মোটর গ্যারাজ! অভিশাপ-দীর্ঘশ্বাসের সীমানা পেরিয়ে এ যেন লক্ষ্মীশ্রীর খাশমহল!

বছর বিশেকের একটি ছোক্‌রা এই পথে চলেছে—বর্তমানে পথের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সে-ই একমাত্র মানুষ। একটি বাংলোর সাম্‌নে থম্‌কে দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার বেশ ভালো করে দেখে নিয়ে সরাসরি গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। অমনি কোথা থেকে একটা কুকুর গর্জন করতে করতে ছুটে এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। এতবড় কুকুর! ছেলেটি বিস্মিতভাবে কুকুরটির অপূর্ব স্বাস্থ্য দেখ্‌ছিল। লক্‌-লক্‌ করছে কুকুরটার জিভ্‌। আর দাঁতগুলিও বেশ মজবুত। হাঁ করে কুকুরটি হাঁপাচ্ছে আর যুবকটির আপাদমস্তক লক্ষ্য করছে। আস্তে আস্তে সে হেসে বল্‌লে—হয়েছে, এখন পথ ছাড়ো, আমার কাজ আছে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কুকুরটি গর্-র্-র্ করে উঠ্‌ল, জন্তুটির আচরণে বিন্দুমাত্র বিনয় নেই।

বাংলোর প্রশস্ত বারান্দায় খানকয়েক সিঙ্গাপুরী বেতের চেয়ার পড়ে রয়েছে। মাঠে বা বাগানে কাউকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ছেলেটি বেশ বুঝতে পারে যে, যদি একটুও নড়াচড়া করে, তাহলে দৈত্যের মত লেলিহজিহ্ব কুকুরটি উচিত ব্যবস্থাই গ্রহণ করবে। বিরক্ত হয়ে সে জোর গলায় বল্‌লে—তাহলে পথ ছাড়তে চাও না! বেশ, থাকো দাঁড়িয়ে, এই আমিও রইলাম!

এ কথার জবাবে কুকুরটি 'ঘেউ-ঘেউ' করে মাটি আঁচড়াতে লাগ্‌ল। যুবকটি বিশেষ বিচলিত হ'ল না, সে পকেট থেকে একখানি খাম বার করে কুকুরের চোখের সাম্‌নে তুলে ধরল—তারপর সজোরে দূরে ঘাসের ওপর ছুঁড়ে দিল। কুকুরটি ঝড়ের বেগে সেই দিকে ছুটল।

তখন সে হাসিমুখে সম্মুখের চওড়া কাঁকর-ছড়ানো পথ দিয়ে জুতোর মস্-মস্ শব্দ করতে করতে অনুদ্বিগ্নভাবে বাংলোর বারান্দার দিকে অগ্রসর হ'ল।

ঘরের জানালা থেকে মেয়েলী গলায় ডাক এল—জিমি-জিমি! কুকুরটি কান খাড়া ক'রে ছুটে চলে গেল বাংলোর মধ্যে। সেই মুহূর্তে স্যাণ্ডো-গেঞ্জী গায়ে, পায়জামা পরা প্রৌঢ় একজন বেরিয়ে এলেন—মাথাজোড়া টাক, চোখে চশমা।

ছেলেটি হাত তুলে নমস্কার করে বারান্দায় উঠে বলে—উঃ, আচ্ছা অবুঝ প্রহরী রেখে দিয়েছেন, আর একটু হ'লেই হয়েছিলো আর কি!

প্রৌঢ় ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বললেন—কার হুকুমে বাংলোয় ঢুকেছ?

ছেলেটি বিস্মিত বিপন্ন কণ্ঠে জবাব দিল—হুকুম? কেন!

ততক্ষণে প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বজ্রকঠিন মুষ্টিতে ছেলেটির ডান হাতখানা চেপে ধরেছেন, তোমার সাহস ত খুব দেখছি! জান এটা কার বাংলো?

—হ্যাঁ, বাইরেই ত লেখা আছে, মল্লিক সাহেবের—অনিরুদ্ধ মল্লিকের বাংলো! কেন, ভুল করেছি নাকি?

ছোক্‌রার কণ্ঠে একটুও জড়তা ফুট্‌লো না।

ভদ্রলোক তার হাতে সজোরে চাপ দিয়ে বলেন—যদি হাতখানা গুঁড়ো করে দিই! যদি রদ্দা মেরে পিঠ দুমড়ে দিই তোমার,—পারবে? পারবে সাম্‌লাতে!

ছেলেটির চোখে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল, প্রবলবেগে একটা ঝাঁকুনী মেরে সে উত্তেজিত হয়ে বল্‌লে—ছাড়ুন, হাত ছেড়ে দিন বল্‌ছি! আমি মল্লিক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি!

প্রৌঢ়ের ওষ্ঠপ্রান্তে শান্ত হাসি, তিনি বল্‌লেন—বাগে পেলে কেউ কি ছেড়ে দেয়? পারো ছাড়িয়ে নাও। তুমি আমার বাংলোর দরজা খোলা পেয়ে ভেতরে ঢুকবে, আমার কুকুর তাড়া করে গেলে তাকে ঠকাবার কায়দাটাও জেনে রেখেছ। এখন যদি তোমাকে চোর সাব্যস্ত করি!

ছেলেটি হেসে উঠ্‌ল—আপনার বুদ্ধির দৌড় টের পেয়ে যাবো।

বয়স অল্প হ'লেও ছেলেটির স্বাস্থ্য ভালো, সাধারণ বাঙালীর ঘরে এরকম বলিষ্ঠ চেহারা সত্যিই দুর্লভ। সে বল্‌লে—আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, নইলে—

—নইলে—কী শুনি—

—নইলে—না, থাক—

—থাকবে কেন, বলেই ফ্যালো—

—না, বল্‌ব না! ছেলেটি স্থির দৃষ্টিতে প্রৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

তার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোক বল্‌লেন—এস, ব'স! সত্যি, তোমার সাহস দেখে খুশি হলাম।

ছেলেটি এবার যেন একটু লজ্জিত হ'ল। তার মনের মধ্যে যে প্রতিরোধের তেজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল, তা যেন নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল! সে ঘাড় হেঁট করে বল্‌লে—আমি কিন্তু সাহস দেখাতে চাই নি স্যার!

—বেশ, বেশ, তবে কি চাইছো বলে ফ্যাল দেখি!

—আমাদের ছাত্রমহল থেকে সরস্বতী পূজো করছি—

—চাঁদা চাই—এই ত! আচ্ছা ব'স।

ভদ্রলোক ভেতরে চলে গেলেন।

চেয়ারে বসে পড়ে ছেলেটি বারান্দায় টাঙানো একখানি ছবিতে মনোনিবেশ করল। ছবিটি সম্ভবতঃ গৃহস্বামীর যৌবন কালের—প্রশংসনীয় স্বাস্থ্য, দেহের প্রত্যেকটি পেশী পুষ্ট এবং সুগঠিত। স্যাণ্ডোর অনুকরণে হারকিউলিসের 'পোজ্'-এ তোলানো ছবি।

পিছন থেকে মেয়েলি গলা শুনে যুবকটি ফিরে তাকালো।

ছিপ্ছিপে শ্যামবর্ণ একটি মেয়ে তাকে বল্লে—আপনি ভেতরে আসুন!

—আমাকে বল ছেন?

সাম্নের দিকে ঘাড় ঝুঁকিয়ে মেয়েটি জানায়—হ্যাঁ!

সম্মুখের ঘরখানিই ড্রয়িং রুম, কিন্তু সে তুলনায় মোটেই সজ্জিত নয়, খানকয়েক সাধারণ কাঠের চেয়ার এবং একটি বড় ডিম্বাকৃতি টেবিল পড়ে রয়েছে। একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে মল্লিক সাহেব বল্লেন—"বস,—"

চেয়ারের সাম্নে টেব্লের উপর একটা থালাতে পেস্তা, বাদাম, কিস্মিস্, খেজুর, আখরোট—আর একটা কাঠের বারকোষে কলা, কমলালেবু, আপেল এবং আরও কয়েক রকমের আস্ত ফল সাজানো। মল্লিক সাহেব এক মুঠো মেওয়া নিজে তুলে নিয়ে বল্লেন—নাও, তোমাকে অনেক হয়রাণ করেছি। দুটে মেওয়া চালাও!

—আজ্ঞে আমাকে এখুনি ফিরতে হবে, অনেক কাজ পড়ে আছে—

—আহা, এটাও ত কাজ হে! না খেলে চাঁদা পাবে না।

অপ্রতিভ অসহায়ভাবে ছেলেটি চেয়ারে বসেই দেখ্লে তার দিকে তাকিয়ে সেই মেয়েটি মিট্-মিট্ করে হাস্ছে।

—তোমার নামটা যেন কী হে? এ হচ্ছে আমার মেয়ে মন্দাকিনী, এর সঙ্গে আলাপ ক'রে নাও।

ছেলেটি বল্লে—তোমার নাম মন্দা?

—না, আমার নাম মন্দাকিনী। তোমার? মন্দাকিনীর শাড়ী পরার বয়স হয়ে গেছে অনেকদিন, তার ফ্রকের আবরণে দেহাবয়ব ঢাকা পড়ে না। হয় ত ষোলোই হবে তার বয়স—না হ'লেও কাছাকাছি। চোখে মুখে কিশোরী কচি পাতার মত ভাবটুকু এখনও প্রচুর পরিমাণে বজায় আছে।

হঠাৎ কোনো অপরিচিত, এই বয়সী মেয়ের মুখে 'তুমি' সম্বোধনটা দেবজ্যোতির কানে 'খট্' করে লাগে, সে বল্‌ল—"দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়।"

মল্লিক সাহেব একমুঠো মেওয়া ধ্বংস করতে করতে বল্‌লেন—কত চাঁদা দিতে হবে? দেবজ্যোতির জবাব দিতে একটু দেরি হ'ল—ওর মনটা মন্দাকিনীর দিকে একটু বেশি ঝুঁকে ছিল—আপনার যা ইচ্ছে দেবেন।

—আট আনার একখানা রসিদ কাটো তাহলে—

দেবজ্যোতি একবার মল্লিক সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—আজ্ঞে রসিদটা পরে পাঠিয়ে দেবো, সঙ্গে ত খাতাপত্র কিছু আনিনি।

—ও, আট আনা চাঁদার বুঝি রসিদ দেবে না!

—না, না, না। এখানে টাকার অঙ্কটা কোনো কথাই নয়—যেমন সাধ্য দেবেন—পূজোর ব্যাপারে ত দরদস্তুর চলে না। তবে আমার ভুল হয়ে গেছে, তাড়াতাড়িতে রসিদ বইখানা ফেলে এসেছি। মানে, আর কোথাও ত চাঁদা আদায় করবার ভার আমার ওপর ছিল না—ছোটরাই সব জায়গায় যাচ্ছে, ওদেরই পূজো। আমি একটু দেখাশুনো করছি। তা আপনার এখানে আমাকেই পাঠালে—

—না, ঠিক তা নয়। ছোট ভাইবোনদের পূজো কি না।

মল্লিক সাহেব হেসে উঠ্‌লেন—তাঁর প্রাণখোলা হাসির তরঙ্গে প্রশস্ত বুকের লোমশ পাটাখানা নৌকোর মতো নেচে উঠ্‌ছিল।

হাসি থামিয়ে তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—মন্দা, যাও পঞ্চাশ টাকা—

মন্দাকিনী ভেতরে চলে গেলে মল্লিক বল্‌লেন—পরখ করে দেখ্‌ছিলাম। বেশ, বেশ! খুশি হয়েছি তোমার ব্যবহারে।

মল্লিকসাহেবকে খুশি করা যেমন সহজ একদিক দিয়ে, তেমনি আবার দুঃসাধ্যও। তিনি খুশি হ'লে তোমাকে দৌলতখানার মালিক করে দিতে পারেন, আর বক্র হ'লে সে রোষের কোপে মহা সর্বনাশও হয়ে যায়। এবং এই খেয়ালী লোকটি হেঁয়ালীর কিম্বদন্তীতে রহস্যময়। কেউ জোর করে বলতে পারে না যে মল্লিক সাহেবের কখন কোন্ মর্জিতে কি ঘট্‌বে!

দেবজ্যোতি এই অদ্ভুত চরিত্রের মানুষটি সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শুনেছে —কারণ মানিকপুরের মাটিতে মল্লিক সাহেবের সম্বন্ধে কথা না শুনে উপায় নেই। মল্লিক সাহেবের সম্বন্ধে তার কৌতূহল অপরিসীম। সে প্রৌঢ়ের মুখের দিকে অসঙ্কোচ দৃষ্টি মেলে দিয়ে দেখ্‌ছিল।

মল্লিক সাহেব বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে বল্লেন—এস আব্দুল।

একটি গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় ব্যক্তি ঘরে ঢুকল, তার দাড়িতে মেহেদী রং, মাথাজোড়া টাক। দেবজ্যোতিকে সুদকষা কড়া নজরের হিসেবী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল বৃদ্ধ, ওষ্ঠে তার কৌতুকের হাসি যেন লেগেই আছে!

দেবজ্যোতির দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে একনজর তাকিয়ে মল্লিক বল্‌লেন—আব্দুল, এ কাঠামোটা ভালো পাওয়া গেছে—খাট্‌লে মন্দ দাঁড়াবে না, কি বলো?

আব্দুল হঠাৎ দেবজ্যোতির সাম্‌নে এসে তার হাতখানা ধরে চাপ দিলে, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে দাড়ি নেড়ে বল্‌লে—তাগ্‌ড়াই ওয়েলারের বাড়ির ফার্স্ট নম্বর ঘোড়া বানিয়ে দেয়া যায়। ক্যা নাম তুম্‌হারে, বেটা!

শেষের প্রশ্নটা তাকে করা হয়েছে বুঝেও দেবজ্যোতি উত্তর দিল না। এই দুজন অপরিচিত ব্যক্তির আলোচনার অদ্ভুত ধরণ দেখে সে বিরূপ হয়ে উঠেছে। মানুষকে যারা কাঠামো আর ওয়েলার ঘোড়া দেখার চোখ দিয়ে বিচার করে, তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা ছাড়া আর কি হ'তে পারে দেবজ্যোতির মত ছেলের? তার চোখের সাম্‌নে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' আর 'বিনয়ে'র মানসিক গঠন আদর্শরূপে জাজ্বল্যমান। দেবজ্যোতি স্বাস্থ্যবান, শিল্পী মনের আধার।

মল্লিক সাহেব বল্‌লেন—আব্দুল তোমার নাম জান্‌তে চায় দেবু!

এবার অপ্রসন্ন মুখে দেবজ্যোতি সাড়া দিল।

মন্দাকিনী ফিরে এসে মল্লিক সাহেবকে চেক বই আর কলম দিল,—খুচরো যা আছে একশ টাকার নোট বাবা!

পরক্ষণে দেবজ্যোতির হাতে একখানা খাম দিয়ে মন্দাকিনী বল্‌লে—জিমির মুখ থেকে এটা পেলাম, আপনারই বোধহয়!

—ও হ্যাঁ! বলে ঘাড় নীচু করে হাত পেতে নিল দেবজ্যোতি।

তারপর অনিরুদ্ধকে বল্‌ল—চেক দেবেন না, তাহলে খুব ফ্যাসাদে পড়ব। আমাদের—

মল্লিক একবার তার দিকে চেয়ে একটু ভাবলেন, আব্দুলের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—দেখি পঞ্চাশটা টাকা দাও তো মিয়াজান।

আব্দ‌ুল সেলাম বাজিয়ে বল্‌ল—জী হুজুর, দিচ্ছি!

মন্দাকিনী মৃদু হেসে বল্‌লে—খামে কিন্তু বাবার নাম লেখা রয়েছে।

মল্লিক বল্‌লেন—আমার চিঠি, তা তুই ওকে দিচ্ছিস কেন রে?

দেবজ্যোতি বল্‌ল—আপনাকে অন্য আর একখানা চিঠি পাঠিয়ে দেবো—এটা থাক!

মল্লিক ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌লেন—তার মানে?

—এখানা আপনারই নিমন্ত্রণপত্র, কুকুরের কবল থেকে নিজে বাঁচবার জন্যে এটা ছুঁড়ে দিয়েছিলাম কিনা!

—ও, তা কি হয়েছে?

—আর কিছু নয়, কুকুরের এঁটো-করা চিঠি ত আর আপনাকে দেওয়া চলে না। অমর্যাদা করা হয়।

—That's the trouble with you : এই ফাঁকা মর্যাদার ঝক্‌মারীতে মরেছো তোমরা। What of that, তুমি ওই চিঠিই আমাকে দিয়ে যাবে।

আব্দুল বল্‌লে—হাঁ! হাঁ! লেড়কা ত খান্‌দানী লবজ্‌ ঝাড়ছে বাবু। হুজুর সাহাব, আপনি ঠিক বলেছেন। জমিন বেশ্‌ উম্‌দা বলেই মালুম হচ্ছে।

দেবজ্যোতির কান গরম হয়ে ওঠে সঙ্কোচে, লজ্জায়, অস্বস্তিতে।

মল্লিক সাহেব বল্‌লেন—না, না! এইসব সামান্য জিনিস নিয়েই যদি সময় নষ্ট করবে, আজকের তরুণ যুবক—তাহলে কাজ করবে কখন? কি করে?

—আপনার উদারতা আপনাকেই মানায়—কিন্তু যতই বলুন না কেন, আমি কি করে কুকুরের এঁটো-করা চিঠি দিয়ে আপনাকে নিমন্ত্রণ করব? না, সে আমি পারব না—মাপ করবেন।

—সিলি! আই সে—Hang your complex. আমি এই চিঠিতেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবো, নইলে থাকলো তোমার পবিত্র পত্রের নিমন্ত্রণ। I wont accept that holy folly!

দেবজ্যোতির হাত থেকে তিনি চিঠির খামখানা প্রায় কেড়ে নিলেন—Try to be a man! খোলা চোখে পৃথিবীকে দেখ্‌তে শেখো দেবজ্যোতি! কত বড় বড় কাজ পড়ে রয়েছে তোমাদের মুখ তাকিয়ে! এ সব মেয়েলী সেন্টিমেণ্ট না কাটাতে পারলে কিছুতেই বড় হতে পারবে না হে!

এর পর আর কোনো আপত্তিই চলে না। পূজার দিন মণ্ডপে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়ে দেবজ্যোতি বিদায় নিল। মন্দাকিনীকেও বল্‌লে সে—মন্দা, মন্দাকিনী তুমিও যাবে! আমার বোনেদের সঙ্গে অঞ্জলি দেবে কেমন? তোমাদের এ পাড়ায় ত পূজো হয় না, তাই না!

আব্দুল শেখের দিকে সে তাকাল না। এই লোকটির নাম সে বহুবার শুনেছে। তবে সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিন্দার প্রসঙ্গে।

মন্দাকিনী এগিয়ে এসে বল্‌লে—চলুন, আপনাকে পার করে দিয়ে আসি। জিমি হয়ত আবার তাড়া করবে। ধুতি দেখ্‌লেই ওর কিরকম মাথা গরম হয়ে যায়!

—ও, তোমাদের কুকুর বুঝি সাহেব ছাড়া মানুষ ছাখে নি!

—না, তা নয়—সাহেবী পোষাক ছাড়া কে আর এখানে পরে! কিন্তু আপনি তা বলে ধুতি ছাড়বেন না।

—কারুর কথাতে আমি কিছু ধরিনে, ছাড়া ত দূরের কথা।

মন্দাকিনী তড়িৎস্পৃষ্টের মত বল্‌লে—তাহলে থাক। আর বল্‌ব না।

এই অল্পক্ষণের মধ্যেই দেবজ্যোতি নতুন আবহাওয়াতে বেশ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে। মল্লিক সাহেবের মত মন্দাকিনীর মধ্যেও জড়তার বালাই নেই, এতে সে খুশি।

—কেন, কি থাকবে? কি বল্‌বে না?

বিস্মিত দেবজ্যোতি জিজ্ঞাসা করলে।

মন্দাকিনী বল্‌লে—আপনি কেমন যেন তাল ঠুকে ঠুকে কথা বলেন। নইলে—

—নইলে কি ?

—বল্‌তাম যে মাঝে মাঝে আসবেন আমাদের বাড়ি। এখানে কি জানেন —আমাকে সবাই হয় ভয় করে, নয়ত পাত্তা দেয় না—

—তা আমি তার কি করতে পারি ?

—আপনাকে আমার বেশ ভালো লেগে গেছে। বাবারও তাই—আপনি এলে সবাই বেশ জমিয়ে গল্প-সল্প করা যায়।

—মন্দ হয় না, গল্প হোক না-হোক খাওয়ার খুব জুৎ আছে। আচ্ছা দেখা যাবে।

—দেখা যাবে মানে, আপনি কি দয়া করে আসবেন ? এতে আবার ছাখা-দেখির কি আছে !

—কেবল আমিই তাল ঠুকিনে তাহলে—এখানে ত থাকিনে, আমি বর্ধমানে পড়াশুনো করি কিনা, তাই বল্‌লাম দেখা যাবে।

ওরা দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠল। বাগান পেরিয়ে গেটের সাম্‌নে এসে মন্দাকিনী হাত তুলে নমস্কার করলে এবং বল্‌লে—আপনাদের পূজো দেখ্‌তে যাবো। খাওয়াবেন ত ?

তিন

অনিরুদ্ধ মল্লিক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আব্দুল শেখের দিকে তাকিয়ে বলেন—কিছু খবর আছে ?

—খবর ত হুজুর ভালো নয়।

—তুমি বুড়ো হয়েছো আব্দুল, ভয় ঢুকেছে।

—না হুজুর, তামাম্ কারখানার মজুর এককাট্ঠা হয়ে পড়ে। ওরা তলে তলে মিটিং করল পরপর চারখানা—আগের মত ছোট ছোট মিটিং নয়। সব সেক্শন থেকে এক-একজন করে নিয়েছে।

—তোমার লোক নেই তাতে ? কোম্পানীর টাকা খায় না তারা ?

—হুজুর বেইমানী হ'ল দুনিয়ার হাল্চাল—শালারা আমার নূন খেয়ে আমাকেই চোখ রাঙায়।

বল্তে বল্তে আব্দুল উত্তেজিত ভাবে দাড়িতে ঘনঘন হাত চালাতে লাগল। অনিরুদ্ধ মল্লিকের হাতেই এই কারখানা একটু-একটু করে বেড়ে উঠেছে। প্রথমে যখন এই মানিকপুরের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিগ্‌দিশাহীন রুক্ষ ভূমি ছাড়িয়ে আকাশে দৃষ্টি চলে যেত আজ থেকে চৌদ্দ বছর আগে—তখন অনিরুদ্ধ মনে মনে যে স্বপ্ন দেখতেন, আজ সেই স্বপ্নের অনেকখানিই সফল হয়ে উঠেছে। অব্যাহতভাবে এখন আর দৃষ্টি ছুটে যেতে পারে না। এদিকে তাকালে ইমারৎ, ওদিকে তাকালে গাছের ছায়াঢাকা রাস্তা—আকাশ দেখতে হ'লে একটু উঁচুতে চোখ তুলতে হয়। অনিরুদ্ধর হাতে-গড়া এই কারখানা-শহর সব-কিছু।

এখানকার শুকনো ডাঙায় তেমন চাষ কোন দিনই ছিল না। গ্রীষ্মের দিনে তৃষ্ণার্ত ধরিত্রীর আর্তনাদ বহ্নিময় হয়ে ছড়িয়ে পড়ত আকাশে-বাতাসে! পথচলা দুঃসাধ্য ছিল। এখন সেই অগ্নিকে বুঝি কারখানার কারা-প্রাচীরে

বন্দী করেছে অনিরুদ্ধ মল্লিক। পথ-ঘাট তৈরী হয়েছে, সে পথে ছায়া দেয় কৃষ্ণচূড়া আর রেইনট্রী, আর শিষু গাছেরা।

পাশের ছোট ছোট দু তিনখানা গ্রামের বসতি গ্রাস করেছে কোম্পানীর আয়তন। এখনও রাধেশ্যামপাড়া গ্রামখানি কোম্পানীর করতলগত হয় নি। কোম্পানী সেটি পাবার জন্য বদ্ধপরিকর।

অনিরুদ্ধ মল্লিক সেই চেষ্টাতেই কয়েকবার রাধেশ্যামের সেবাইতদের কাছে লোক পাঠিয়েছেন। আপাতত তাঁর মনটা ঐ দিকেই ঝুঁকে রয়েছে। এর মধ্যে আজ আব্দুল-বাহিত নূতন দুঃসংবাদে তিনি একটু বিরক্ত হলেন।

আব্দুলকে বল্‌লেন—এ সব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে যদি আমাকে আজও মাথা ঘামাতে হয় মিয়া সাহেব, তাহলে কাজ করি কখন?

—হুজুর, বান্দার বেয়াদপী মাফ করবেন। এটা কিন্তু ছোট কাজ নয়।

—ও শয়তানদের মাটির কল্‌সীতে লাঠি মারবার লোক নেই তোমার হাতে?

—যারা ছিল তাদের ত আপনিই বিগ্‌ড়ে দিয়েছেন হুজুর!

আব্দুলের এ-কথার পিছনে একটু ইতিহাস আছে। সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে কাহিনীটা এই:

এ অঞ্চলের হিন্দুস্থানী গোয়ালারা এতদিন অনিরুদ্ধ মল্লিকের প্রশ্রয় পেয়ে বেশ দাপটের সঙ্গে বসবাস করত। তাদের হাতের লাঠিকে ভয় করত না এমন শ্রমিক খুব কমই দেখা গিয়েছে। যারা তেমন তেমন নির্ভীক বিরোধ দেখাবার জন্য মাথা তুলতে চেষ্টা করেছে, তাদের নির্মূল করেছে গোয়ালারা, নয় ত বা নিজেদের দলে সাকরেদী দিয়ে টেনে নিয়েছে। এই ভাবেই গোয়ালাদের জোরে অনিরুদ্ধ মল্লিক শাসিয়ে রেখে চলেছিলেন কারখানার 'ভূতেদের'। সেই দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে মল্লিক সাহেব দেখা-সাক্ষাৎ করেন নি কখনও—আব্দুল শেখ একাধারে মল্লিক সাহেবের টমটমের কোচ্‌ম্যান-সহিস এবং বেয়ারা-বাবুর্চি হয়ে প্রথমে এসেছিল। এখন আর সে গাড়ি-ঘোড়া নেই, হাল ফ্যাশানের মোটরগাড়ী এসেছে। তবু আব্দুল

থেকেই গেছে। আব্দুলকে বেয়ারার কাজও করতে হয় না। এখন তার কাজের কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। মোটামুটি দেখা যায় যে, আব্দুল শেখ কখনও বক্সীবাঁধে, কখনও রাধেশ্যামপাড়াতে, কখনও আরও দূরের কোনো গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ বলে আব্দুল আড়কাঠির কাজ করে; কারও বিশ্বাস, সে কোম্পানীর পোষা গুণ্ডাদের পাণ্ডা। আড়ালে যে যাই বলুক, সাম্‌নাসাম্‌নি আব্দুল শেখকে সকলেই সমীহ করে। তার অনুগ্রহে অনেক বেকার চাকরি পেয়েছে কারখানাতে, আর রোষদৃষ্টিতে সর্বনাশও হয়েছে কত লোকের! অনিরুদ্ধ মল্লিককে যারা চোখের দেখা দেখে ধন্য হতে পারে নি, তারা আব্দুলকেই জাগ্রত দেবতা শনির মতো সম্মান দিয়ে চলে। সম্প্রতি বক্সীবাঁধের গোয়ালারা আব্দুলকে আর তেমন খাতির করছে না। তাদের সর্দার রঘুবীর আহির একদিন মল্লিক সাহেবের সঙ্গে সরাসরি দেখা করে একজোড়া পাঁঠা ভেট দিয়ে জানালে—হুজুর আমাদের মা-বাপ, আপনার কাছে এক আর্জি আছে।

জিম্ কুকুরটা ছাগল দেখে প্রথমে বিরূপভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে চিৎকার জুড়েছিল, পরে কি জানি ব্যা-ব্যা ডাক শুনে হয়তো ঘাবড়ে নিরস্ত হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। মল্লিক সাহেব পাঁঠাজোড়ার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিপাত করে রঘুবীরের দিকে উদাসীন ভাবে তাকিয়ে বলেন—কি, বলে ফ্যালো!

—হুজুর, আমরা আপনার গোলাম। আপনি আমাদের মা-বাপ হুজুর! কিন্তু আব্দুলের চোখরাঙানী ত আর সহ্য হয় না।

—কি হয়েছে রঘুবীর, আব্দুল কি তোমাদের সঙ্গে কিছু খারাপ ব্যবহার করেছে? অন্যায়-অত্যাচার কিছু সে করেছে? বলো, আমি দেখ্‌ছি—

—আজ্ঞে না হুজুর, ও সেরকম লোকই নয়। তবে কি জানেন, ও হচ্ছে বেজাত বিদেশী—ওর তাঁবে কেউ থাকতে চায় না। আসলে ও ত সেই ঘোড়ার লাগাম—

রঘুবীরের কথা শেষ হবার আগেই মল্লিক সাহেব গর্জে উঠেছিলেন—চোপ্‌রাও! আব্দুলকে মান্‌তে হবে। তোমাদের আমি বিশ্বাস করি না—আজ তোমরা আব্দুলকে হটিয়ে দিয়ে এর পর কোন্‌দিন আমাকেই গাড্ডায়

ফেলবে—বুঝেছি। আব্দুল ছিল বলে আমি আজও নির্ভাবনায় চারিদিক রেখে চালাতে পারছি। ও আমার ডান হাত, বুঝলে ?

রঘুবীর আভূমি নত হয়ে সেলাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—বাবু, গোরুর দুধ কখনো বেইমানী করে না—আমরা সেই গোরুর দুধ খেয়ে মানুষ ! যদি বলি হ্যাঁ, আমরা আপনার পায়ের তলায় আছি—ত থাকবই। কিন্তু ওই হুজুর কথা কেউ মান্‌তে নারাজ। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন, দেখবেন তামাম তল্লাট আপনার নোকর।

—তোমাকে না মান্‌লে কি হবে কি জানি! তোমরা সবাই একজোটে আমার মাথার ওপর লাঠি উঁচিয়ে দাঁড়াবে ? বেশ ত তাই দাঁড়াও—

রঘুবীর জিভ কেটে দুই কানে হাত দিয়ে বলেছিল—রাম, রাম ! আপনি আমাদের মা-বাপ, আপনার খেয়ে পরে আমরা বেঁচে আছি। ওকথা কানে শুনলেও পাপ।

—ত্যাখো রঘুবীর, পিছনে থেকে কে তোমাদের উস্কানী দিচ্ছে তা আমার জান্‌তে বাকী নেই। তোমরা যা-ই বলো, আব্দুলকে আমি ছাড়তে পারব না। তবে তোমাদেরও জোর করে ধরে রাখবো না। বাড়তে চাও, বেড়ে যাও—

—হুজুর একবার ভাল করে ভেবে দেখ্‌বেন।

—রঘুবীরপ্রসাদ ! তুমি কি মনে করো যে তোমাদের মতলব কিছু জান্‌তাম না ? তবে শুনে নাও, কাল রাত সাড়ে এগারোটার পর তোমাদের মজলিস বসেছিল। তাতে কে কে ছিল—কি কথা হয়েছে, সব আমার কানে এসেছে। তবে এটাও জেনে যাও, তোমাদের এই ফেডারেশন আর চোখরাঙানীতে কোম্পানী ঘায়েল হবে না। যদি তোমরা আব্দুলকে ঠিক-ঠিক মেনে চল্‌তে, তাহলে ওই মজলিসের বৈঠকটা রঘুবীর আহিরের বাথানে হত না। যাও বেইমান কোথাকার—

রঘুবীর একটিও কথা বল্‌তে পারে নি। মাথা হেঁট করে চলে গিয়েছিল। তারপর থেকেই বক্সীবাঁধের গোয়ালারা শ্রমিক-আন্দোলনে সরাসরি ভাবেই অংশ গ্রহণ করেছে। আব্দুল শেখের মাথায় তারা লাঠি মারে নি এই জন্যে যে,

তাতে হয়ত গোটা গ্রামখানা জ্বালিয়ে দেবে প্রতিপক্ষ! নইলে আব্দুলের মাথার ওপর ওদের লোভ বড় কম নয়!—

মল্লিক সাহেবকে এই হঠকারিতার জন্য আব্দুলের কাছে মাঝে মাঝে যে মৃদু অনুযোগ শুনতে হয়, তা তিরস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। বক্সী-বাঁধের গোয়ালারা স্বপক্ষে থাকাতে অনেক লাভ ছিল—দুর্দ্ধর্ষ প্রতিপক্ষকে অনায়াসে ঠাণ্ডা করা যেত, আবার গোয়ালাদের মতো শক্তিশালী একটা দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকা যেত।

আজও আব্দুলের কথাতে সেই ইঙ্গিত।

মল্লিক সাহেব তার জবাবে বল্‌লেন—আব্দুল, সেদিন জবাব না দিলেও একদিন দিতেই হত। তোয়াজ করে করে ওদের বাড়তে দিলে বেড়েই যেত—তাতে ওদেরই সুবিধে বাড়ত, আমাদের কোনো লাভই হত না। তার চেয়ে লড়ে যাক। পরখ করে জেনে যাক আমাদের তাগৎ, আবার লেজ মুখে করে ফিরে আসবে—কুত্তার জাত! ওদের মানুষ বলে মনে করো নাকি?

আব্দুল মৃদু হেসে অন্যদিকে তাকাল—আজকের দুনিয়াতে কে রাজা হুজুর? ফিকিরবাজ—না মরদ্‌সাঁচ?

—কিন্তু তাই বলে যদি বেইমান এসে চোখ রাঙিয়ে বলে, খবরদার আমরা বেইমান, আমরা দুষমন, আমাদের পায়ের তলায় তোমাকে থাকতে হবে—তুমি সেই অপমান হজম করতে পারবে আব্দুল?

—নাঃ, আপনি মোরগমুসল্লাম আর সরাব খাবেন না হুজুর। ওতে দেমাক বহুৎ গরম করে দেয়।

—বিবিজানের মতে মিঠে হেকিমী ছেড়ে, যা বলি শোনো—ভরতপুর থেকে কিছু তাগ্‌ড়াই জোয়ান বাছাই করে আনো।

—জী হুজুর!

—আর এদিকে কিছু জখম—

—না, হুজুর খুন-জখমের জমানা বদ্‌লাচ্ছে। নেহাত বেকায়দায় না পড়লে আর বেকার খুন-খারাবীর মধ্যে যাওয়া চলবে না। সেবারের মেজাজ পাল্টে

যাচ্ছে। একটু হুঁশিয়ার থাকতে হবে। আমি বলি কি ডোমনপ্রসাদকে দু-কামরার একটা কোয়ার্টার দিয়ে দিন, হপ্তা ভি কিছু বাড়িয়ে দিয়ে ওকে এধারে আনতে দিন। রঘুবীরের দম স্রেফ পটকে গিয়েছে এবারের জ্বরে। এখন ত ডোমন সর্দারের হাতে আধখানা বক্সীবাঁধ। হুজুর, পলিসিতে চলুন—পলিসি হচ্ছে পাক্কা মাল। ডোমনপ্রসাদকে কায়দা করা যাবে—এখনও পাকা সর্দারীর পাটোয়ারী শেখেনি ও বুর্বাক।

দেয়ালে টাঙানো বড় ঘড়িতে দশটা বেজে গেল। তড়িৎস্পৃষ্টের মত অনিরুদ্ধ মল্লিক চমকে উঠলেন, সাড়ে দশটায় কলকাতার গাড়ি। এখনও স্নানাহার সবই বাকী। তিনি আব্দুলকে বিদায় দিয়ে বললেন—স্টেশনে একটু খবর দিয়ো আমি এই সাড়ে দশটার গাড়িতে কলকাতা যাচ্ছি। ট্রেন ফেল করলে কাজের ক্ষতি হবে, বুঝলে!

—জী হুজুর! বলে আব্দুল সর্দার কুর্নীশ করে বিদায় নিল।

খাবার টেবিলে বসে মন্দাকিনী বলল—আজ যে কলকাতা যাওয়া হবে তা ত কিচ্ছু বলো নি বাপী!

মল্লিক সাহেব মুখ তুলে মেয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন—হঠাৎ মনে পড়ল কিনা, তাই বলা হয়নি। তোমার কি জরুরী কোনো কাজ আছে মানিকপুরে, মা জননী?

—কবে ফেরা হবে শুনি!

—কাল-পরশু কিম্বা দিন দশ পরেও হতে পারে—কাজ সারা হলে তোমার মাকে নিয়েই চ'লে আসবো।

—বা রে, অতদিন দেরী করলে চলবে না। আমি যে কথা দিলাম!

অবাক হয়ে অনিরুদ্ধ মেয়ের দিকে তাকালেন, তাঁর হাতের চাম্চেটা মাঝপথেই স্থির হয়ে থমকে রইল—কি কথা? কাকে দিলি—এঁ্যা!

—ওই যে দেবজ্যোতি গো!

অনিরুদ্ধ কিছুতেই মনে করতে পারেন না দেবজ্যোতিকে—ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—দেবজ্যোতি? কে?

—বারে, এর মধ্যে ভুলে গেলে? এই একটু আগে তার প্রশংসায় ত তুমি আর মিঞা সাহেব পঞ্চমুখ!

—ওঃ, সেই চাঁদাসাধা ছোকরার কথা! তাই বল্। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবজ্যোতিই ত বটে! চোখের সাম্‌নে চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। বেশ ছেলে!

পিতার এ কথায় মন্দাকিনী খুশী হ'ল, একটু যেন লজ্জাও পেল, বল্‌ল—আহা আর অমন হয়ে প্রশংসা করতে হবে না।

—কিন্তু এর মধ্যে তাকে কি কথা দিলে বাপী?

মন্দাকিনী পিতার একমাত্র মেয়ে, আব্দারের সুরে টেনে টেনে বল্‌ল—কথা ত তুমিও দিয়েছ—বলো নি ওদের পূজো দেখতে যাবে!

—বল্‌লেই যেতে হবে? নাও, এখন চট্‌পট খেয়ে নাও, স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকবে।

—না আমি খাবো না ত। তুমি কেন কথা দেবার আগে ভাবো না?

—কিন্তু তোরই বা এত মাথাব্যথা কিসের শুনি!

—না, না, সে আমি পারবো না। তাহলে তুমি একাই যাও কলকাতায়।

—I say মন্দাকিনী, তোমার যেন একটু কেমন কেমন ভাব দেখ্‌ছি! তা ছেলেটা ভালোই। তবে বেশিদূর এগিয়ো না মামী!

মন্দাকিনী এ-কথায় একটুও লজ্জা পেল না, বল্‌ল—তুমি ত বলেছ বাপী, তোমার কাছে কোনো কিছু যেন না লুকোই!

—ঠিক, ঠিক। তা লুকোবার মতো কি হ'ল আবার?

—কিছুই না। আমার বড্ড ভালো লেগেছে দেবজ্যোতিকে। উনি যদি আমাদের বাড়ি আসেন রোজ ত বেশ হয়।

—আই সী! ইউ লাইক হিম?

—হ্যাঁ! তাহলে এক কাজ করো না, বুধবার বিকেলের মধ্যে যদি ফেরো ত যাই। এবার কলিকাতাতে গিয়ে শাড়ী কিনতে হবে কিন্তু।

—আচ্ছা দেখা যাক। বুধবারেই ফিরতে হবে?

—বারে, বুধবারই সরস্বতী পূজো যে!

কন্যা এবং পিতার সম্পর্কটি মধুর। মল্লিক সাহেব মেয়েকে মানুষ করার ষোলআনা ভার নিজের হাতে নিয়েছেন—কিন্তু তাঁর স্ত্রীর বিশ্বাস, বাপের আদরে আদরে মন্দাকিনীর মানুষ হওয়ার শেষ আশাটুকু নির্মূল হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে তিনি কিছু বলেন না। শুধু এই ব্যাপারই নয়—মল্লিক সাহেবের কোনোপ্রকার আচার-আচরণ সম্পর্কেই তাঁর কথা বলা অভ্যাস নয়। তিনি অন্তঃপুরে আপনার পূজার্চনা নিয়েই বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেন। বর্তমানে কি একটা স্নানযোগ উপলক্ষ্যে তিনি কলকাতায় আছেন। মন্দাকিনী পিতার তদবির-তদারক করবার জন্য মানিকপুরে রয়ে গেছে—তার পড়াশুনোর ক্ষতির অজুহাতও মায়ের সঙ্গে না যাওয়ার একটা কারণ।

মল্লিক সাহেব বল্‌লেন—সাম্‌নে তোমার পরীক্ষা, সেটা ভুলে যেয়ো না।

—পরীক্ষার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক থাকতে পারে বাবা ?

—না থাকলেই ভালো।

—কিন্তু কলকাতায় পা দিয়ে বুধবারের কথা তোমার মনে থাকলে হয় !

—তবে না হয় তুই থেকেই যা।

—আমি বুঝি তাই বলেছি ?

—না এখনও বলিস নি—তবে বলা ত যায় না।

—অবিশ্যি একা-একা থাকতে আমার ভারী মজা লাগে। আচ্ছা বাবা, তুমি রাগ করবে না ?

—সময় বড় কম। কি করবি ? তাহলে তুই যাচ্ছিস্ নে ?

—চলো তোমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি তাহলে। আর যদি বুধবার ফেরা যায় তাহলে ঘুরেই আসি। ওখানে গেলে অনেক সাজেশন-টাজেশন যোগাড় করা যায়।

দশটা বেজে সাঁইত্রিশ মিনিট। অনিরুদ্ধ মল্লিক তাঁর মেয়েকে নিয়ে বড় ফোর্ড গাড়িতে চড়লেন সাড়ে দশটার ট্রেন ধরবার জন্য—মানিকপুরের রেল-স্টেশনে পৌছতে তাঁদের আরও মিনিট আষ্টেক সময় লাগবে।

স্টেশন-স্টাফকে কারখানার কর্তাদের মুখচেয়ে চল্‌তেই হয়। উপরী ত কম মেলে না! যিনি তাতে এতটুকু এদিক-ওদিক করেন, তাঁর নামে এমন রিপোর্ট যায় যে বিনা নোটিশে তাঁকে বদ্‌লী করা হয় কোনো পাণ্ডববর্জিত স্টেশনে।

শেষ পর্যন্ত মন্দাকিনী একা এতবড় বাড়িতে থাকতে যেন ভরসা পেল না! —যদিও মালী, চাকর, আয়া ইত্যাদিতে বাড়িটা খুব ফাঁকা থাকে না, এবং আব্দুলও আছে, তবু মন্দাকিনীর মনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। সে বার-বার পিতাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল, চলো,—যাব তোমার সঙ্গে। কিন্তু বুধবার ফিরতেই হবে, মনে থাকে যেন!

চার

রুদ্রপ্রসাদকে যতই খাতির করছে অভিজিৎ সিং, রুদ্রপ্রসাদ ততই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ছে। সে যে ভগ্নিপতির কাছে নিছক আদর-আপ্যায়ন লাভের আশায় এবার আসে নি, একথা এখনও পর্যন্ত বল্‌তে পারে নি। সম্প্রতি সে বেকার। অভিজিতের কারখানাতে যেমন তেমন একটা চাকরী পেলেও রুদ্র এখানে ঢুকে পড়বে, এমনই সংকল্প নিয়ে এসেছে। অভিজিৎ সিং ইচ্ছে করলে দশ-বিশজনের চাকরী জুটিয়ে দিতে পারে সে বিশ্বাস শুধু রুদ্রপ্রসাদেরই নয়, তাদের মন্দার-বউশী অঞ্চলের দশ-বিশখানা গাঁয়ের লোক সবাই জানে যে, অভিজিৎ সিং মানিকপুর কারখানার নোক্‌রীর মালিক। এ হেন অভিজিৎ সিং-এর আপন শ্যালক রুদ্রপ্রসাদকে চাকরীর ভাবনা করতে হবে তা কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল ?

এখানে এসে অবধি প্রতি মুহূর্তেই রুদ্রপ্রসাদ ভাব্‌ছিল—এইবারে আসল কথাটা পেড়ে ফেলা উচিত। কিন্তু সে সঙ্কোচ কাটিয়ে কথাটা বল্‌বার আগেই নানারকমের প্রসঙ্গ এসে চাপা দিয়ে দেয় তার সংকল্পকে। অভিজিৎ সিং গল্প জুড়ে দেয়—'এবার ফসল কেমন হ'ল ? বাকী খাজনার দায়ে কোনো জোত্‌দারের জমিজমা জলের দামে নীলাম হচ্ছে কি ? তাহলে সেটা দাঁও মাফিক ধরে ফ্যালো, টাকার জন্যে আটকাবে না।' কথায় কথায় সে বল্‌লে,—চলো আজ রুস্‌দের ভারতপুরে জোর্‌ জলসা আছে! পাট্‌না থেকে খুব ভারী এক ওস্তাদ এসেছে।

মানিকপুর থেকে ভরতপুরের বসতি মাইলখানেক দূর—দু'খানা মাঠ পেরিয়ে। এদিকেও কারখানার বস্‌তির ধরনের অনেক বাড়ি তৈরী হয়েছে। রাণীগঞ্জ টালীর নীচু ছাদ আর ছোট ছোট ঘর—হুবহু অনুকরণ ওই মানিকপুরের কুলী ব্যারাকের। রুদ্রপ্রসাদ প্রশ্ন করলে—কোম্পানীর কোয়ার্টার কতদূর তক্‌ আছে ?

—আরে না, কোম্পানীর এলাকা এটা নয়। এসব ভাড়া বাড়ি। তল্লাটের বেবাক আদমী হচ্ছে ডাকাত—শালারা এই এক-একখানা ঘরের ভাড়া নেবে বিশ-ত্রিশ রুপেয়া! তাই পড়তে পায় না, সব ঘরে ভাড়াটিয়া আছে—কোনো কোনো ঘরে দু-জন তিনজনও থাকে জরু নিয়ে, বাল্‌বাচ্চা নিয়ে। হারামী কোম্পানীও এমন, কিছুতেই কোয়ার্টার বানাচ্ছে না। বলে সিমেণ্ট নাই, ত লোহা নাই, ত মজুর মিল্‌ছে না—। রহে যাও ভাই ইস্‌কা সওয়াল হোগা—ফেডারেশন যা বন্‌ছে, এখন আর চালাকী চল্‌বে না।

এদিকটা ঘোর মিশ্‌মিশে অন্ধকার। মেঠো পথ, কখনও বা আলের ওপর দিয়ে হাঁট্‌তে হচ্ছে। কেবলমাত্র আকাশের দিকে তাকালে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে সহস্র সহস্র মানুষের অতৃপ্ত আত্মার বহ্নিমান কামনা যেন অদৃশ্য ভগবানকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—কারখানার ফারনেসের আলোর আভা!

মিনিট দশেক হাঁটবার পর একটা জায়গায় কয়েকজন লোককে আব্‌ছা আঁধারে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আঁধারে সর্বাঙ্গ ঢাকা একটি রহস্যময় বাড়ির একটি জানালায় হারিকেন জ্বল্‌ছে। আলোর চেয়ে বেশি ভুষোর কালিমাই সে হারিকেনটিতে উদ্গীর্ণ করছে। সে আলোতে মানুষের মুখ চেনা যায় না—ছায়া ধরা পড়ে।

লোকগুলি জানালার আশপাশে ঘোরাঘুরি করছে। পথের পাশেই পেঁয়াজের বড়া, ছোলাসেদ্দ, চিংড়ীর ঘুগ্‌নী এবং অনুরূপ পণ্য সাজিয়ে বসে আছে একটি লোক, খুব মোটা একখানা কম্বল জড়িয়ে।

রুদ্রপ্রসাদ সন্দিগ্ধভাবে লক্ষ্য করছিল, অভিজিৎ ঘাড় হেঁট করে দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেল,—পাছে তাকে দেখে কোনো আমোদপ্রয়াসী ব্যক্তি লজ্জা পায় এই আশঙ্কায় অভিজিৎ নিজেই সরে যেতে চায়।

আরও খানিকটা এগিয়ে এসে তারা দেখ্‌তে পায় অন্ধকারের মধ্যে গুটি-চারেক ছায়া-মূর্তি ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছে। তাদের মধ্যে থেকে দু'জন সাম্‌নে এগিয়ে এল। রুদ্রপ্রসাদ খুব বিস্মিত হয়ে গেল—স্ত্রীলোক দেখে। নিজের অজ্ঞাতেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আওরাৎ!

মেয়ে দুটির মধ্যে একজন তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—নেহি সাহাব, রেণ্ডী! আ যাও মেরি ছুন্‌-ছুন্‌!

রুদ্রপ্রসাদের কান দিয়ে যেন আগুন ছুট্‌তে লাগল! সে তাড়াতাড়ি অভিজিৎ সিং-এর নাগাল পাবার জন্য দ্রুত চল্‌ল। কিছুদূর এগিয়ে সে যখন পিছন ফিরে তাকাল—অন্ধকারে কাউকেই তখন দেখা যাচ্ছে না, শুধু একটা বীভৎস হাসির রেশ তার কানে বাজতে লাগ্‌ল। গানের দুটি কলি শুনতে পেল—কর্কশ কণ্ঠের আর্তনাদের মত—

"নানা মেরি ঘরমে জল্‌দি
আজ আনা আ-আ
আপ্‌না হাঁথ্‌সে চালানা
রাত্‌কা কারখানা।"

সাম্‌নেই খুব জম্‌কালো রৌশনদার একখানা বাড়ি। ঘ্যান্‌ঘেনে সুরে লাউডস্পীকার বাজ্‌ছে। অনেক লোকজন দাঁড়িয়ে গান শুন্‌ছে।

অভিজিৎ সিং বল্‌লে—এটা হচ্ছে সন্দর্শন সিনেমা—

—মাঠের মাঝে সিনেমা! তা কে আসবে এখানে তসবির দেখ্‌তে?

—গরজ বড় বালাই, শহরের অন্দরে ত সিন্‌মা-টকী কিছুই নাই। যার সখ হবে তাকেই এই সন্দর্শনে আসতে হবে! আগে মানিকপুরের মধ্যেই এটা ছিল, কোম্পানী উঠিয়ে দিয়েছে বলে এখানে এসে বসেছে। ভারী বদ্‌ জায়গা! এই ত মাস দেড়েক আগে এই হাউস থেকে দশটা খুনী ফেরার ডাকুকে ধরল পুলিশে!

—খুনী ডাকু? এখানে কি ডাকাতের আড্ডা আছে?

—না, শালারা বম্বাই সে এখানে এসেছিল—সেখানে খুব বড় বড় ডাকাতী করেছিল। ওদের মাথা পিছু গবর্ণমেণ্টের তিনহাজার টাকা করে নজর ধরা ছিল। বম্বাই সে শালারা পাঞ্জাব গেল—তারপর এখানে এসে গেল। মতলব ছিল সেই রাতে রাধেশ্যামপাড়ার ঠাকুর-বাড়িতে চরাও হয়ে ঠাকুরের হীরাজহরৎ জেবর-দৌলত লুঠে নেবে। হাঁ, সেবার সাহস দেখালে বটে এক বাঙালী নিস্‌পেক্টর। হেড্‌কোয়ার্টারে ফোন করলে, দুশ ফৌজ তৈয়ার হয়ে

গেল। ওদিকে প্লেন ড্রেসে ত্রিশজন লোক বসে গেল ডাকুদের সাম্‌নে আর পিছনের সীটে। তারপর সিনমার খেল ত শুরু হোক্। খেল যখন জম-জমাট, সাহুকার দুষমনগুলো ত মশগুল হয়ে তামাশা দেখ্‌ছে—এমন সময়, দুম্-দুম্! "হ্যাণ্ডস্ আপ!" হেঁকে দিল নিস্‌পেক্টর চাটার্‌জী। ফটাফট সাহুকারেরা রিভল্‌বার বার করে ফেল্‌লে। কিন্তু বেকার—শালারা হাঁ হয়ে দেখ্‌ল আগে-পিছে-পাশে—বুকের ওপর আর ঘাড় ঘুরোলেই পিঠের ওপর—রিভল্‌বার ঠেকানো রয়েছে। ব্যাস্—দিয়ে দাও রিভল্‌বার! সুট্ সুট্ ধরা পড়ো চাঁদ! না হলে জান নিক্‌লে যাবে। তব্‌ভি এক বেটা মেরে দিল ফটা-ফট্ তিনটে গুলী—পুলিশের একজন জখম হ'ল, কিন্তু ও শালাভি সাফ হ'য়ে গেল।...সবাই ত বলে, সাবাস ভাই চাটার্‌জী! সাহুকারদের সর্দার ত শাসিয়ে গিয়েছে চাটার্‌জীকে, আচ্ছা ঘুরে আস্‌তে দাও শালা কুত্তীকে বাচ্ছা! তবে, সব কটার হোল লাইফ মেয়াদ হয়ে গিয়েছে—কিন্তু যেরকম চৌখস্, পালিয়ে যেতে কতক্ষণ!

রুদ্রপ্রসাদ শুন্‌তে শুন্‌তে 'থ' হয়ে যায়। এ কোন্ রাজ্যে সে এসে পড়ল! গল্পে-গল্পে ওরা অনেকদূর চলে এসেছে। অভিজিৎ সিং একটা মন্দিরের চত্বরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে পড়ল—এখানে জুতো খুল্‌তে হবে।

অভিজিৎ সিং আঁধারের দূরত্ব কাটাবার জন্য গলা ফাটিয়ে হাঁক দিলে—ক্যা পণ্ডিত জী ঘর্‌মে হো?

পরক্ষণে খুব শান্ত, অন্তরঙ্গ কণ্ঠে কারা যেন সাড়া দিল—আরে আরে কেয়াবাৎ সিংজী মহারাজ যে? আইয়ে আইয়ে অন্দর।

—আজ ঘরের মধ্যেই আসর চল্‌বে? অভিজিৎ বাইরে থেকেই প্রশ্ন করল।

—আসুন, আসুন, এখনও পণ্ডিতজীর মেজাজ তৈরী হয় নি।

রুদ্রপ্রসাদকে নিয়ে অভিজিৎ সিং যে ঘরে প্রবেশ করল, সে ঘরে সোজা হয়ে দাঁড়ানো চলে না। ঘাড় হেঁট করে ঢুকেই মাদুরের ওপর বস্‌তে হবে। আরও সাত-আটজন লোক বসে আছে। দেয়ালের দিকে একখানা খাটিয়াতে একজন সটান শুয়ে রয়েছে। ঘরখানার মধ্যে ঢুকেই রুদ্রপ্রসাদের নাকে

লতা-পাতা পোড়ানোর চিমসে গন্ধ এবং ধোঁয়া লাগল চোখে-নাকে। একেবারে অচেনা না হলেও, হামেশা এইরকম কড়া গাঁজার গন্ধ সইতে অভ্যস্ত নয় রুদ্র।

অভিজিৎ সাড়ম্বরে শ্যালকের পরিচয় দিল। তারপর বল্‌ল—পণ্ডিতজীর কি ব্যাপার!

—ধেয়ান করছেন। এবারে আপনি এসে গেলেন। পর্‌সাদ চড়িয়ে তারপর সঙ্গৎ হবে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পণ্ডিতজী উঠে বসে গাঁজার কল্‌কে গরম করে ফেল্‌লেন—চোখ দুটি প্রায় জবাফুলের মত লাল হয়েই ছিল। সম্ভবতঃ সন্ধ্যা থেকেই তাঁর শুরু হয়েছিল এই 'হাতে হোম' পর্ব।

মানিকপুরের পেশাদার গানের মাস্টারমশাই অনেকগুলি। তবে তাঁরা সবাই 'মডার্ণ সং' শেখান। রাগপ্রধান গান শিখিয়ে বেড়ান যে ভদ্রলোক তাঁর গানের তারিফ করে অনেকে কিন্তু পসার নেই তেমন। অধিকাংশ বাঙালী পরিবারে কীর্তন আর আধুনিক সঙ্গীতের দিকেই ঝোঁক—সর্বোপরি রবীন্দ্র-সঙ্গীত। কাজেই এই মাস্টারমশাইএর ডাক পড়ে মজলিসে, আসরে-বাসরে নয়। একমাত্র গান শেখানোই যদি এঁর পেশা হত, তাহলে নিশ্চয় এতদিন ইনি মানিকপুরে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারতেন না। কারখানার দ্বিতীয় স্তরের শ্রমিক—তাই তাঁর সঙ্গীত-চর্চা এবং তাঁর প্রাণরক্ষা দু-তরফই কোনো রকমে বহাল বজায় রয়েছে। রাগপ্রধান সঙ্গীত সম্পর্কে এঁর উৎসাহ অদম্য। পাটনা থেকে পণ্ডিতজী এসে অবধি প্রত্যহ সন্ধ্যায় মাস্টারমশাই নিয়মিত হাজিরা দেন ভরতপুরের এই আস্তানাতে।

যন্ত্রপাতি নামানো হ'ল—সেগুলি পণ্ডিতজীর খাটিয়ার ওপরেই একপাশে জমা ছিল।

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—কেয়া বাৎ, আজ কি বাবা ভোলানাথ ঘুমিয়ে পড়ল? বেটা সঙ্গত শুন্‌বে না?

একজন সাগিরদ বল্‌লে—ত বলুন, মন্দিরের উত্তর দিকের বারান্দায় সতরঞ্চি বিছিয়ে দিই, সেখানেই—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভালো। আজ ত সিংজী এলেন, আর আমাদের কুটুমজীও এসেছেন। চলিয়ে মাস্টার সাব—

মাস্টারমশাই হাতজোড় করে বল্‌লেন—আমি কি আপনার তাল সাম্‌লাতে পারব? তবে—

—হাঃ, হাঃ, আপনি মশাই বড় নরম নরম বিনয় করেন। ঠাটে বাৎ ঠাটে চাল, ঠাট মে বাজানা—আঁঃ।

শিবমন্দিরের চত্বরে আসর জমে উঠ্‌ল। তবে এ আসরের বৈশিষ্ট্য গান নয়, বাদ্য! পণ্ডিতজীর ওস্তাদী তবলায়। আর তাঁর তবলা শোনার জন্যই মাস্টারমশাইএর গানকে আনুষঙ্গিক হিসেবে রাখা হয়েছে। পণ্ডিতজীর তবলা চলছে রেলগাড়ির চেয়েও দ্রুত—দুন্‌-চৌদুন অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। মাস্টারমশাই আটে এক, কখনও চারে এক বজায় রেখে গেয়ে চলেছেন। এ আসরে যেন তবলাকে অনুসরণ করে গান চলেছে কুণ্ঠিত চরণে!

রুদ্রপ্রসাদের ভারি অদ্ভুত লাগে এই গানের আসর। এখান থেকে তার দেশ গ্রাম বউশী কতদূর! সেখানে এখন কি হচ্ছে কে জানে!

খান দুই গানের পর পণ্ডিতজী হাঁক দিলেন—ব্যোম শঙ্কর!

মাস্টারমশাই কপালের ঘাম মুছে বল্‌লেন—একটু জল পেলে হত।

পণ্ডিতজীর ভ্রূ-কুঞ্চিত হ'ল—ক্যা, আজ বনায়া নেহি, এঃ পাঁড়ে!

পাঁড়ে বিনীতভাবে জানালে—হুকুম করলেই নিয়ে আস্‌তে পারি।

পণ্ডিতজী হো হো করে হেসে বল্‌লেন—আরে, শঙ্করজীকে পর্‌সাদ, বেটাকে কির্‌পামে হামারা হুকুম? আঁঃ—

সিদ্ধির সরবৎ পরিবেশন করা হ'ল। সবাই "জয় শঙ্কর" বলে পরম তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করলে দরাজ হাতে।

অন্ধকারের মধ্যে একটা সাইকলের ঘণ্টা বেজে উঠ্‌তেই পণ্ডিতজী বল্‌লেন—আ যা বেটা! কৌন হো—ইয়াকুব?

—হাঁ পণ্ডিতজী, গোর্‌ লাগে বাব!

মন্দিরের গায়ে সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রেখে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের যুবক চত্বরে উঠে এসে বসল। মাস্টারমশাই বল্‌লেন—এবার তুমি

ধরো ইয়াকুব। আমি ঘেমে গিয়েছি। এই শীত, তা সে কোথায় পালিয়েছে!

ছোক্‌রা হাতজোড় করে বল্‌লে—মাস্টারজী আপনি থাকতে—

—রাখ্‌ বাৎ! ধর্‌। হোরি খেলে নন্দ্‌কে লালা—পণ্ডিতজী হেঁকে উঠ্‌লেন। ইয়াকুবের গলায় হালকা চালের ঠুংরী বেশ জমে। তারপর তবলায় চাঁটি মেরে ঘাড় নাড়লেন—হাঁঃ।

গান শুরু হ'ল আবার—ইয়াকুবের গলা খুব ভরাট নয় তবে মিষ্টি, একতারার মত মিহি তার গলার কাজ।

গানের মজ্‌লিস ভাঙেনি তখনও—অভিজিৎ সিং রুদ্রপ্রসাদের দোহাই পেড়ে বিদায় নিল যখন, সাড়ে দশটার সিটি তখন বেজে গিয়েছে। পণ্ডিতজীকে সে বলে এল,—রবিবার আমার ওখানে পায়ের ধুলো দিতে হবে কিন্তু!

—দেখি যদি ভোলানাথ যেতে দেয়—আমার কাছে বলে কি হবে? ওই যে মন্দিরে বসে গান শুনছে বেটা শঙ্করনাথ, ওর কাছে আর্জি করে যান, বেটার কি মতলব—!

পরক্ষণে পণ্ডিতজী সুর ধরলেন উদাত্ত কণ্ঠে—শঙ্কর মহাদেব দেব সেবক সুর জাকে—

ইয়াকুব ধর্‌তাইএর ফাঁক খুঁজছে মুখ বুজে। পণ্ডিতজীর চেহারাতে আনন্দ যেন উথ্‌লে পড়ছে! নেশার মেজাজে তিনি যেন অন্য রাজ্যে বিচরণ করছেন! সত্যিই কোনো অলৌকিক রূপলোকের রং-দার ছবি তিনি দেখেছেন হয়তো! আসরের কথা ভুলেই গেছেন—এমনও হওয়াটা বিচিত্র নয়। শিশুর মতই তন্ময় হয়ে তিনি গাইছিলেন।

হঠাৎ চোখ মেলে চেয়ে দেখ্‌লেন আসরে শ্রোতার দল বসে রয়েছে। যেন হুঁস ফিরে এল তাঁর, বল্‌লেন—হাঁঃ। তারপর তব্‌লায় চাঁটি পড়ল। পরমুহূর্তে বাঁয়া-তব্‌লার ওপর কে যেন একদল ঘোড়সওয়ার ছুটিয়ে দিল!

মাঠের মধ্য দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে অনেকক্ষণ পর্যন্ত উদাত্ত সুরের রেশ রুদ্রপ্রসাদের মনে ঝঙ্কার দিচ্ছিল। বিচিত্র এই নতুন রাজ্যের নতুন অভিজ্ঞতা তার মনকে নবায়িত করে তুলেছে। চাকরী নেই, হাতে পয়সা নেই,—দারিদ্র্যের উদ্বেগ, কিছুই যেন তার মনকে ছুঁতে পারছে না! এখনও পর্যন্ত অভিজিৎ সিংকে সে নিজের কথাটা বলে উঠ্‌তে পারে নি—কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে কথাটা বল্‌তে মন চাইছে না।

দুজনে চুপ-চাপ পথ চল্‌ছে।

সন্দর্শন টকীর লাউড্‌ স্পীকার থেমে গেছে। মদের দোকানে লোকের ভিড় নেই। শহরের পথেও মানুষ হাঁটছে খুব কম।

অভিজিৎ বল্‌লে—এগারোটা বেজে গিয়েছে। নাইট-শিফ্‌টের লোকেরাও চলে গিয়েছে।

রাতের আব্‌ছা আলোতে পথের দুপাশে সারি সারি শান্ত বাড়িগুলি ঘুমিয়ে পড়েছে। হাসপাতালের উঁচু বাড়িখানা ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু হুতাশনের নিঃশ্বাস আকাশের বুকে আগুন ছুঁড়ে দিচ্ছে। কারখানার বহ্নিকামনার বিরাম নাই কেন?

রুদ্রপ্রসাদের চোখ জ্বালা করছে এখনও। মনে হচ্ছে সে অনেকখানি গাঁজার ধোঁয়া টেনেছে—আসলে সে এ-সবের ধার-কাছ দিয়েও যায় নি, সিদ্ধিও সে ছোঁয় নি, অথচ এমনটা কেন হচ্ছে, সে বুঝতে পারে না।

ধোবিখানার সামনে অনেকগুলো একহারা গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাছপালার নীচে সামিয়ানা খাটিয়ে কারা যেন ঢোলক বাজিয়ে গান করছে! একটা হারিকেন জ্বল্‌ছে।

অভিজিৎ সিং একবার সেদিকে তাকিয়ে আপন মনেই বল্‌লে—আজ আর রাতে ঘুমোতে দেবে না শালারা।

রুদ্রপ্রসাদ কিছুই বুঝতে পারে না। ভারি আশ্চর্য লাগে তার। শীতের কন্‌কনে ঠাণ্ডাতে বসে এতোগুলো মানুষ চেঁচাচ্ছে কেমন করে! ওদের হাব-ভাব দেখে অনুমান করা যায় যে, মাথার ওপরের ওই সামিয়ানাটুকু টাঙানোরও কোনো দরকার ছিল না।

অন্তরাল থেকে একদল মেয়ে গান গাইছে—তারা ঘরের ভেতরে রয়েছে। তাদের গানের একটা সুর আছে, একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইবার প্রয়াসও আছে। কিন্তু এই সামিয়ানার নীচে বসে যারা ঢোলক পিটছে, তাদের একজন গায়ক এবং বাকী সকলে ধারারক্ষক। গানের চেয়ে তাদের কোলাহলটাই মুখ্য।

রুদ্রপ্রসাদ বল্‌লে—কত রাত পর্যন্ত পালা চল্‌বে?

অভিজিৎ সিং হেসে উত্তর দিল—একটা খুন-জখম না হলে সারারাতও চল্‌তে পারে।

বাড়িতে পা দিতেই রুদ্রপ্রসাদের দিদি অভিযোগ করলেন—গ্যাখো, সবে ছেলেটা এলো, আর রোজই তোমার রাত বারোটা পর্যন্ত টহলদারী চৌকীদারী শুরু হয়ে গেল! আমি সাতসকালে চৌকার পাট চুকিয়ে বসে থাকি—বেশ যা হোক একদিনও তিনজনে বসে দুটো গল্প করা হয় না। একা-একা ভালো লাগে না ছাই।

অভিজিৎ কোনো জবাব দিল না। মেয়েদের সঙ্গে বেশী বাক্যালাপকে সে বাজে সময় নষ্ট করা বলেই জানে।

রুদ্রপ্রসাদ উৎসাহিত ভাবে দিদিকে বোঝাতে বস্‌ল, কি কি দেখেছে সে। মৃদু ধমক দিয়ে তার দিদি বল্‌লেন—তিন বেলা ওই হাসপাতাল আর পণ্ডিতজী আর পাঁড়ের গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে কান আমার কালা হতে চলেছে, তুইও আবার সেই সব কেচ্ছা শুরু করলি? তার চেয়ে বউশী, মন্দার ভাগলপুরের কথা বল্‌ াপু শুনি। রেল থেকে নেমে সেই যে ভগ্‌নিপতির খপ্পরে পড়েছিস—যাক গ। এখন খেয়ে নিয়ে আরাম কর ভাই!

ছোট দুখানি ঘর আর দুটো বারান্দা। সাধারণ শ্রমিকের চেয়ে ভিজিতের আবাস-ব্যবস্থা অবশ্যই উন্নততর। তার এই বিশেষ সৌভাগ্যের ন্যে অনেক মন্দ লোক ঈর্ষ্যাপরতাবশতঃ রটিয়ে বেড়ায়, ফেডারেশনের দৌলতে ংজী ডবল কোয়ার্টার বাগিয়েছে, তন্‌খাও কিছু বাড়িয়ে ফেলে আখের ছিয়েছে! একথা যারা বলে, তারা কোম্পানীর দালাল বই কি!

অভিজিৎ সিং-এর পরিবারটি বড় নয়। রান্নাঘরের সাম্‌নে ওদের খেতে দেওয়া হয়েছে। রুটি, ছোলার ডাল আর দু-তিন রকমের আচার। আজ হাট বসে নি, আনাজপত্র হাটের দিন ছাড়া পাওয়া যায় না। অবশ্য হাট-বাজার নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না অভিজিৎ সিং, তার সময় কোথায়? রুদ্রপ্রসাদের দিদি আপন মনে কয়েকবার বল্‌লেন—আজ একটু কষ্ট করে খেতে হবে ভাই, কাল আবার তুই দেখেশুনে বাজারহাট করবি—আমার আর কে আছে! যে ক'দিন থাকিস্‌ বহিন-বহনুকে খাইয়ে যাবি আর কি!

রুদ্রপ্রসাদের মন এসবে নেই। সে কেবল ভাব্‌ছে কি করে আসল কথাটা বলে ফেলা যায়! সে এখানে ত আদর খেতে আসে নি, চাকরীর উমেদারী করতে এসেছে। এই পরম সত্যটুকু জানাতে যতই দেরী হচ্ছে মনে মনে অস্বস্তিটা ততই চেপে বসছে। এই স্নেহের ডালরুটি যেন পাষাণের মত কঠিন হয়ে কণ্ঠনালীর মধ্যপথে থম্‌কে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে! অথচ পাশে বসে অভিজিৎ সিং দমে দু-বাটি ডাল ফাঁক করে ফেলে, দুধ-রুটির পালাতে হাজির হয়েছে।

একটা সোরগোল শোনা গেল—মার শালাকে, মার শালাকে!—রাত্রির শান্ত আকাশটা চম্‌কে উঠ্‌ল।

রুদ্রপ্রসাদ আহার ছেড়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল! সিংজী ঘাড় না তুলেই ধম্‌কে বল্‌লে—ক্যা হুয়া?

—ওই যে বাইরে হল্লা হচ্ছে! দেখে আসা যাক্‌।

—আরে ব'স। ওত হরদমই লেগে আছে। দুপুররাতে আর ওসব ছাখে না।

রাস্তার ওপর গোলমালটা আরও বাড়ছে। কে যেন আর্তস্বরে চিৎকার করছে—"আরে বাবা, মর্‌ গিয়া! একদম্‌ জান ফাট্‌ গিয়া! আঃ হা—হাঃ, উঃ! শালালোক কুত্তীকে বাচ্ছা, গাধীকে বাচ্ছা!"

—"মার শালেকো—খতম্‌ কর্‌ দে—।"

অনেকগুলো লোক এলোমেলোভাবে হল্লা করছে, তবে আর্তনাদ একজনই করছে।

রুদ্রপ্রসাদ উঠোনে নেমে পড়ল। একটা লোককে নিশ্চয় কারা সবাই মিলে জোট পাকিয়ে ধরে মারছে! তার দিদি বল্‌লেন—তুই যাস নে ভাই!

ওরা দারু খেয়েছে, একটু মারামারি এখন ত হবেই। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। ব'স খেয়ে নে।

অভিজিৎ সিং ভ্রূকুঞ্চিত করে বল্‌লে—এখানে তুমি নতুন এসেছ। কোনো কিছুতে নাক গলাতে যেয়ো না রুদ্‌দর! মানিকপুরের মাটিতে শয়তান আছে, সব সময় এই কথাটা মনে রাখবে ভাই!

—কিন্তু সিংজী, আপনি শুনতে পাচ্ছেন ত, লোকটাকে মেরে চৌপাট করে দিল যে!—কান খাড়া করে রুদ্র বল্‌লে—ওই, ওই আর এক ঘা মারল। ওরা মাতাল বলে ওদের বাধা দিতে হবে না? শেষে খুনোখুনী হয়ে যাবে যে!

—এখন কি ওদের বুদ্ধি আছে? কিছু বলতে গেলে তোমাকেই লাঠি বসিয়ে দেবে। মাতালের বুদ্ধি ত! হয়ত গিয়ে দেখ্‌বে বাঁশের বাড়ির চোটটা রাস্তার ওপরেই পড়ছে, যে লোকটা অত চিল্লাচ্ছে সে স্রেফ আওয়াজ শুনে ভয়েই অমনটা করছে!

রুদ্রপ্রসাদের মন মানে না। সে এক ঝট্‌কায় পথের উপর গিয়ে হাজির হ'ল। ধোবি মহল্লায় সামিয়ানার নীচের আসর ফাঁকা। রাস্তার ওপর জটলা জমাট। সত্যিই একটি লোককে চারিধার থেকে ঘিরে বাঁশপেটা করছে সবাই মিলে। ওদিকে একদল মেয়ে অনতিদূরে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করছে, গালিগালাজ দিচ্ছে। রুদ্রপ্রসাদ হট্টগোলের মাঝে গিয়ে পড়াতে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হ'ল না,—কেউ যেন তাকে দেখ্‌তেই পেল না! যে সব বাঁশে দড়ি টাঙিয়ে ধোপারা কাপড় শুকোয়, সেই বাঁশগুলিই এক-একজনে এক-একটি হস্তগত করে প্রচণ্ড আস্ফালন করছে আর ক্রমাগত পিটিয়ে যাচ্ছে ওই লোকটিকে। আব্‌ছা আলোতে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না চোটগুলো কোথায় গিয়ে পড়ছে! লোকটির চীৎকার এখন নিস্তেজ গোঙানীতে দাঁড়িয়েছে। রুদ্রপ্রসাদ একজনের হাত থেকে বাঁশ কেড়ে নিয়ে রুখে বল্‌লে—সব সামাল হো যাও। মাত্‌লামীর মজা টের পাবে, হাঁ! সব কটাকে হাজত দেবো।

একজন জিগির দিল—আ বে ভাগ শালালোগ, জমাদার সাব আ গিয়া রে!

পরক্ষণে বাঁশগুলো মাটিতে ফেলে রেখে লোকগুলি তাড়াতাড়ি দৌড়ে পালাতে গিয়ে বেসামাল হয়ে সেখানেই গড়িয়ে পড়ল।

ততক্ষণে অভিজিৎ সিং বেরিয়ে এসেছে। এপাশ ওপাশের কোয়ার্টারেরও দু-চার জন লোক দরজা খুলে বাইরে এসে গেছে। যে লোকটিকে এতক্ষণ ওরা সবাই মারপিট করছিল তার মাথা ফেটেছে, নাক দিয়েও রক্ত ঝরছে, অজ্ঞান হয়ে নর্দমার ওপর পড়ে রয়েছে সে।

রুদ্রপ্রসাদ বল্‌লে—এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

কে যেন বল্‌লে—বাঁচবে বলে মনে হয়? হাল ত খুব আচ্ছা লাগ্‌ছে না।

অভিজিৎ সিং একজনকে ডেকে বল্‌লে—ইস্‌মাইল্‌, তুমি হাসপাতালে একটা খবর দাও, গাড়ি পাঠাক ওরা।

আহত লোকটিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে ওরা যখন বাড়ি ঢুকল তখন কত রাত কে জানে? এখন ত আর কারখানার কোনো ভোঁ বাজ্‌বে না। ভোঁ বাজতে শুরু হবে আবার সেই ভোর পাঁচটায়।

বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত রুদ্রপ্রসাদ ঘুমোতে পারল না। তার চোখের সাম্‌নে সেই মারামারির ছবিটা ভেসে বেড়াতে লাগ্‌ল।

আবার ঘুম ভেঙে গেল, তখনও ভালো করে ভোরের আলোই জাগে নি। বাইরে অদূরে কিসের শব্দ হচ্ছে। রুদ্রপ্রসাদ বিছানার ওপর জেগে বসে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—আবার কি মারামারি হচ্ছে? না, কোনো কিছু আছড়ানোর আওয়াজ এটা?

ও, এবারে সে বুঝতে পারে। ধোপারা কাপড় কাচ্‌তে লেগে গিয়েছে। তাহলে বেশ বেলা হয়েছে! দরজা খুলে বাইরে এসে দেখল রুদ্রপ্রসাদ, কুয়াশার ঘন জালে পৃথিবীটা কে যেন ঢেকে রেখেছে! কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশার পর্দার ওপার থেকে সিমেন্টের পাড়ের ওপর ধোপাদের কাপড় আছড়ানোর আওয়াজ ভেসে আস্‌ছে।

কে বল্‌বে যে ওরা গত রাত্রে নেশায় বেহুঁস হয়ে পড়ে ছিল!

একটি মেয়েলী কান্নার সুর তার কানে এসে লাগছে—কাপড় আছড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে। হয়তো, কাল রাতে যে লোকটিকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে,

তার বৌ-এর কান্না শুনতে পাচ্ছে রুদ্রপ্রসাদ! মনটা ভারী হয়ে উঠল। বউশীর বাড়িতে মোতিয়া বৌ ঘুম ভেঙে উঠে একা ঘরে কাঁদছে কি?

ভোর পাঁচটার ভোঁ যখন বাজল তখন আবার রুদ্রপ্রসাদের মনে পড়ে গেল—এইবেলা ভগ্নিপতির কাছে চাকরীর কথাটা পেড়ে ফেলা দরকার। লজ্জা করে লাভ নেই। যখন বল্‌তেই হবে তখন মিছে দেরি করে কি হবে?

ঘরে ফিরে যেতেই অভিজিৎ সিং বল্‌ল—আরে তুমি খামোখা এত ভোরে উঠে শীতে কষ্ট পাবে কেন? তোমার ত আর গোলামীর দড়ি গলায় নিয়ে ছ'টাতে হাজিরা বাজাতে হবে না! আরামে আর এক ঘুম চালিয়ে দাও!

রুদ্রপ্রসাদ মরীয়া হয়ে বল্‌লে—আমাকে এখানে একটা চাকরী জোগাড় করে দিন। সরকারী দপ্তরের কাজে বরখাস্ত হয়েছি—আসলে নোকরীর জন্যেই এখানে এসেছি।

—নেই! সত্যি চাকরী নেই? আচ্ছা দেখি—

বুটের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে অভিজিৎ সিং বল্‌লে—কিন্তু এখানকার কাজ করতে গেলে কলিজার জোর চাই, খাটতে হবে ভাই। এরা রক্ত শুষে নিয়ে পয়সা দেয়, পারবে তা!

রুদ্রপ্রসাদের ওষ্ঠপ্রান্তে উজ্জ্বল হাসি ফুটে ওঠে—খুব, খুব। পারব বইকি!

পাঁচ

মানিকপুরে একটি ছেলেদের এম. ই. স্কুল পুরনো এবং মেয়েদের জন্যও একটি প্রাইমারী স্কুল এই হালফিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাইস্কুলের জন্য কোম্পানীর কর্তাদের কাছে বার বার দরবার করা হয়েছে, কিন্তু তাঁরা আমল দেন না, বলেন—'এই ত সামনেই একটু দূরে রাধেশ্যামপাড়াতেই হাইস্কুল রয়েছে, সেখানে মাত্র আড়াই শ ছাত্র। আবার মানিকপুরে ইস্কুল হলে সেখানে কেউ পড়তে যাবে না। কারুর তেমন পড়ার গরজ হলে ওই রাধেশ্যামপাড়াতে গিয়ে পড়ুক না।'

আরও যে কথাটা তাঁরা উচ্চারণ করেন না অথচ হাবে ভাবে প্রকাশ করেন তা হচ্ছে এই:—ওই মাইনর পর্যন্ত বিদ্যে পেটে পড়লেই কারখানার কুলীদের ছেলেরা বর্তে যাবে। হাইস্কুলের চৌকাঠ পেরুলে হাতুড়ি ধরবার মেজাজ বিগড়ে যাক্ আর কি!—কারখানার যন্ত্রপাতি এবং কাজের যে পরিমাণ দ্রুত গতিতে প্রসার হচ্ছে তেমনি হাতিয়ার ধরার লোকের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোম্পানীকে সেইদিকেই ত নজর রাখতে হবে। লেখাপড়া শিখলেই ছেলেরা যখন কেরাণীগিরি করবে, এমন কি উপোস করবে তবু কারখানার কাজে লেগে বেশি পয়সা রোজগার করতে আসবে না—তখন কোম্পানীর কর্তব্য ত উচ্চতর শিক্ষাকে মানিকপুরের চৌহদ্দীতে না ঢুকতে দেওয়া। তাতে কোনো ভুল আছে কি?

কিন্তু সকলের মুখের ওপর এই কথাটা স্পষ্ট করে কেউ বলতে পারে না।

এম. ই. স্কুলের সর স্বতী পুজো। কারখানার বড় বড় অফিসারদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন হেড্‌মাস্টার নিজে গিয়ে। বড় সাহেব রবিন্‌সন্ বাড়ি ছিলেন না, তাঁর মেমসাহেব স্মিতহাস্যে কিরণবাবুকে অভ্যর্থনা করেছেন এবং কথাও দিয়েছিলেন যে এ নিমন্ত্রণে তাঁরা নিশ্চয় যোগদান করবেন।

অবশ্য রবিন্‌সন্ সাহেব আসতে পারেন নি, মেমসাহেব তাঁর কথামত এসেছেন। অন্যান্য বড় অফিসারদের মধ্যে বিশেষ কেউ আসেন নি। তবে মল্লিকসাহেব তাঁর মেয়েকে নিয়ে ঠিক সময়ে হাজির হয়েছেন। বিকেল পাঁচটায়

সভা। ছোট ছোট ছেলেরা, এবং তাদের অভিভাবকমণ্ডলী মাটিতে সতরঞ্চির ওপর বসেছে। মেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রী তিনজন বেঞ্চের উপর আসীন। খান দশ-বারো সাজানো চেয়ারের মধ্যে মাত্র তিনখানি অধিকার করে বসে আছেন মিসেস রবিন্‌সন্, অনিরুদ্ধ মল্লিক এবং মন্দাকিনী।

সভাপতি বরণ হ'ল, মল্লিকসাহেব সভাপতি। গলায় তাঁর হল্‌দে গাঁদার মালা দিয়ে ছেলেরা গান গাইল। তারপরই স্কুলের তরফ থেকে কিরণবাবু ধন্যবাদ দিতে শুরু করলেন। পরিশেষে আবার সেই হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নিয়ে কিছু উচিত কথাও বলে ফেল্‌লেন তিনি। অন্য অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির মত কিরণবাবুও বুঝেছেন যে অনিরুদ্ধ মল্লিকই কার্যতঃ গ্রেট বেঙ্গল স্টীল ম্যানুফাক্‌চারার্স এ্যাণ্ড এক্সপোর্টার্স কোম্পানীর সর্বময় কর্তা।

অনিরুদ্ধ মল্লিক উঠে দাঁড়িয়ে অবশ্য ইংরাজিতে বল্‌লেন,—যদিও একমাত্র মিসেস রবিন্‌সন ছাড়া কেউ ইংরাজি বক্তৃতা হজম করতে অভ্যস্ত নন্।—'এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের শিক্ষাব্রত আমাকে চমৎকৃত করেছে। তাঁর মনে দেশের ছেলেদের জন্য যে বেদনা সদাজাগ্রত, তার স্পর্শে আমি আজ অভিভূত। তিনি বলেছেন প্রতি বৎসর এই স্কুল থেকে একশ'র ওপর ছেলে পাশ করে, তারপর শিক্ষার পথ খুঁজে পায় না। তাদের অশিক্ষার জন্য কোম্পানীকে দায়ী করেছেন তিনি। অবশ্য তাঁর এই অভিযোগের মধ্যে যুক্তির চেয়ে আবদারই বেশি। আমার বিশ্বাস যে মাত্র একশ' ছেলের ওপর ভরসা করে হাইস্কুল চালানো সম্ভব নয়। আর পুরো একশই বা বলি কি করে? এই যে একশ' ছেলে মাইনর পাশ করল, তাদের মধ্যে অনেকেরই বাপ মা ছেলেকে আর পড়াতে নারাজ হয়ে যাবেন; কারণ তাঁরা জানেন যে, অল্প বয়সে কারখানায় ঢুকিয়ে দিলে এখন থেকে ছেলে কাজ শিখবে ভবিষ্যতে যাতে তারা বেশি পয়সা ঘরে আন্‌তে পারে। সেই দিকেই নজর দেওয়াই তাঁদের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ। অতএব একশ ছেলে মাইনর পাশ করলেও—তাদের মধ্যে হয়তো বিশ-ত্রিশটি ছেলে হাইস্কুলের চৌকাঠ মাড়াতে পারে। তবুও আমি এ বিষয়ে বিবেচনা করবার জন্য আমাদের উপরওয়ালাদের কাছে দরবার করব। সত্যি যদি বছরে পঞ্চাশ জন ছেলেও হাইস্কুলের সুবিধা গ্রহণ করে মানুষ হতে

পারে, তবে সে সুযোগ কোম্পানীর দেওয়া উচিত—তাতে কোম্পানীর আর্থিক লোকসান হলেও সে লোকসান কোম্পানী না হয় স্বীকার করে নেবে। কিন্তু আমার একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলবার আছে।'···মল্লিকসাহেব রুমালে মুখ মুছে একবার চতুর্দিকে নজর দিয়ে দেখলেন, তারপর গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন :

—'আপনাদের কাছে আজ নতুন করে বলে দিতে হবে না যে, কোম্পানী তার কর্মচারীদের সুখ-সুবিধের দিকে সব সময়েই লক্ষ্য রেখে চলে। নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও আপনাদের সহায়তা করতে কোম্পানী কখনই কুণ্ঠিত হয় নি। তেমনি আপনারা যে সেই উদারতাকে যথাযোগ্য সম্মান এবং শ্রদ্ধা করবেন এই আশাও কোম্পানী পোষণ করে। এতকাল সেইভাবেই চলছিল।

আমি জানি যে আপনারা আমার কথার অপেক্ষা না রেখেই কোম্পানীর কাছে কৃতজ্ঞ। তবু বলছি কেন জানেন,—দু-একটি অবুঝ এবং দু-চারটি দুর্বৃত্ত আপনাদের কারও কারও মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছে। তারা আর কিছুই চায় না। আপনারা যে আরামে আমাদের আশ্রয়ে রয়েছেন—এটাই তাদের চক্ষুঃশূল হয়ে উঠেছে। সে সম্বন্ধে আপনারা সময় থাকতে সচেতন না হলে বিপদের আশঙ্কা আছে। বিপদ আপনাদেরই, কারণ কোম্পানীর অমিত শক্তির কাছে তাদের জারিজুরি হাতীর সঙ্গে পিঁপড়ের লড়াই-এর মতই অসম্ভব। অতএব, আমি আপনাদের সজাগ করে দেওয়া কর্তব্য মনে করেই একথা বলে গেলাম।

যাক গে, আমি আপনাদের কথা দিয়ে যাচ্ছি যাতে এই স্কুলই হাইস্কুলে পরিণত হয় তার চেষ্টা করব।'

পরিশেষে মিসেস্ রবিন্‌সন আনন্দ প্রকাশ করে বিদায় নিলেন। এবং হেড্‌মাস্টারমশাই বাংলা ভাষায় মল্লিকসাহেবের বক্তৃতার মর্মার্থ ছাত্রদের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে আর এক দফা ধন্যবাদ দিলেন।

স্কুল থেকে বেরিয়েই মন্দাকিনী বল্‌ল—এবারে আমরা কোথায় যাচ্ছি বাপী?

মল্লিকসাহেব মেয়ের দিকে না তাকিয়েই বললেন—আগে ইণ্ডিয়ান স্টাফ ক্লাবটা সেরে নেওয়া যাক।

—না, না, আগে দেবজ্যোতিবাবুদের ওখেনে চলো। স্টাফ ক্লাবে একবার ঢুকলেই দেরি করে ফেল্‌বে, তারপর বল্‌বে এত রাতে থাক গে—

—চলো! তোমার হুকুমের ওপর আর কথাত চল্‌বে না মা!

ছাত্র-সংসদের পূজোয় খুব ধুম। দেবজ্যোতির তিন বোন মুকুল, মল্লিকা আর দেবিকা সবাই মহাউৎসাহে সব কিছু করেছে। কুলী লাইনের ছেলে-মেয়েরা একত্রিত হয়ে কাগজের ফুল, মালা তৈরী করেছে। মেয়েরা উত্নুন তৈরী থেকে শুরু করে লুচি, আলুর দম, হালুয়া রান্না করেছে। দেবজ্যোতির হাতে-গড়া ঠাকুর। গান-বাজনার আয়োজন—সেখানেও চার ভাই-বোনের নিখুঁত ব্যবস্থা—সমবেত গান, আবৃত্তি, বাচ্ছা ছেলে এবং মেয়ের রাখাল নৃত্য। সবটা মিলিয়ে প্রোগ্রাম নিখুঁত। কুলীমহল্লার সমবেত মহোৎসব।

মল্লিকসাহেব গাড়ি থেকে নামতেই শাঁখ বাজল কুলীমহল্লার পূজামণ্ডপে। একটা ফর্সা গেঞ্জী গায়ে দেবজ্যোতি এগিয়ে এল,—চুলগুলো এলোমেলো মুখে-চোখে শ্রান্তি সুপরিস্ফুট, কিন্তু উজ্জ্বল হাসিতে সারা মুখখানা যেন ধুয়ে গেল এক নিমেষে! সে বল্‌লে—আসুন, আসুন। এস ভাই মন্দাকিনী। তারপর ছেলেমেয়েদের সে ডাকল—কই এদিকে এগিয়ে এসো ভাইবোনদল—তোমাদের আসরের সবচেয়ে গণ্যমান্য অতিথি, এঁদের তোমরা বরণ করো।

বাঁসন্তী রং-এ ছোপানো ফ্রক, শার্ট, শাড়ী—ছোট-বড় সবাই ঘিরে ধরল দেবজ্যোতিকে এবং ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল অনিরুদ্ধ মল্লিক আর তাঁর মেয়েকে। কুলী মহল্লার ইতিহাসে এ এক অভাবনীয় কাণ্ড! মল্লিকসাহেবকে কেউ কখনও এ তল্লাটে দেখে নি। মিনিট কয়েকের মধ্যেই আশপাশে বড়দের ভিড় জমে গেল। যারা দেবজ্যোতির ঠাকুর তৈরীকে ছেলেমানুষী বলে করুণা করেছিল এবং চাঁদাপত্রও বিশেষ দেয় নি, মল্লিক-সাহেবকে সশরীরে আজ হাজির দেখে তারা মনে মনে ঈর্ষ্যা-জর্জর হয়ে উঠল।

ছোটদের নাচগান আবৃত্তি প্রত্যেকটিই উপভোগ্য হয়েছিল। অনিরুদ্ধও হাসি হাসি মুখে বসে দেখ্ছেন। এক সময়ে মন্দাকিনী দেবজ্যোতিকে কাছে ডেকে বল্লে—আমি কিন্তু একটা গান গাইব।

দেবজ্যোতি খুশি হয়ে বল্লে—বেশ, খুব ভালো কথা। আচ্ছা আমি ভাই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তারপর সে দেবিকাকে ইশারায় ডাকল। দেবিকাকে সে বল্লে—এ হচ্ছে মন্দাকিনী, বুঝলে! মন্দাকিনী মল্লিক—গান গাইবে।

দেবজ্যোতিই একমাত্র কর্তাব্যক্তি। আর সবাই ছোট ছোট। সকলেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে আদেশের অপেক্ষায়। কাজেই মল্লিকসাহেব মুখ বুজে বসে থাকতে বাধ্য হন, তিনি একেবারেই একলা। ওদিকে মন্দাকিনী তার নবার্জিত সখীদের সঙ্গে গল্পে জমে গেছে। একটি দশ বছরের মেয়ে গান গাইছে সরস্বতীর স্তোত্রে স্থর দিয়ে, বেশ স্থর—আর তার সঙ্গে তবলা বাজাচ্ছে আরও ছোট একটি ছেলে। বালিশের ওপর তাকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবেই তার হাত কোনোরকমে পৌছেছে বাঁয়া-তব্লাতে। ছেলেটির মাথা নড়ছে তব্লার তালে তালে। কচিগলার গানের সঙ্গে মৃদু সঙ্গত খুব মিষ্টি লাগছে মল্লিকসাহেবের। গান শেষ হতেই তিনি মঞ্চের ওপর উঠে গেলেন। দু'খানা চৌকী জোড়া দিয়ে মঞ্চটি তৈরী। মল্লিকসাহেব ছেলেমেয়ে দুটিকে আদর করে বল্লেন—বাঃ, বেশ, বেশ! তোমার বাবার নাম কি খুকী? খোকা তোমার বাবা আসেন নি?

তারা দু'জনেই পিতার নাম বল্লে। মল্লিকসাহেব প্রশ্ন করেই ক্ষান্ত, কাজেই কি নাম তারা বল্ল, সেটা তাঁর কানে গেল না। তিনি বললেন—তোমাদের এখানকার পূজো দেখে মনে হচ্ছে সত্যি তোমাদের কাছে মা সরস্বতী নিজে এসেছেন পূজো নিতে! কই, দেবজ্যোতি—কই হে? এবারে যেতে হচ্ছে যে বাবা!

মল্লিকা এবং মুকুল দু'জনেই এগিয়ে এসে বললে—এখুনি যাবেন না, আর একটু বস্থন, দাদা এই এল বলে—

—দেবজ্যোতি বুঝি তোমাদের দাদা! বেশ, বেশ।

—হ্যাঁ! আপনি বস্থন, এবারে গান হবে।

মঞ্চের ওপর মন্দাকিনীকে হারমোনিয়ামের সাম্‌নে দেখে মল্লিকসাহেব বিস্মিত হলেন,—খুবই বিস্মিত হলেন তিনি।

গান শেষ হতেই একজন প্রৌঢ় চাদর গায়ে দিয়ে জোড় হাতে মল্লিক সাহেবের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—মালক্ষ্মীর কি চমৎকার কণ্ঠ! যেন বীণার বাদ্য! বড় ভালো লাগ্‌ল।

মল্লিক ঘাড় উঁচু করে প্রশ্ন করেন—আপনি?

—আজ্ঞে হুজুর, আমি দেবজ্যোতির পিতা—

—ও, আচ্ছা! নমস্কার।

—দয়া করে এসেছেন, এতে আমরা যে কী কৃতার্থ হয়েছি তা ভাষায়—

—থাক, থাক! দেবজ্যোতি কোথায় গেল? আচ্ছা তাহলে তাকে বলে দেবেন—

দেবজ্যোতির পিতা বিনয়ে নুয়ে পড়লেন—আজ্ঞে সে কি কথা!

দেবিকা মন্দাকিনীর সঙ্গে এসে পড়ে ব্যস্তভাবে বল্‌লে—এবারে আপনাদের একটু প্রসাদ পেতে হবে, চলুন।

মন্দাকিনী বল্‌লে—কিন্তু তোমার দাদা কোথায় গেলেন ভাই!

—দাদা! দাদা ত এইমাত্র বাজার থেকে ছুটে এসে মিষ্টি দিয়ে গেল, বল্‌লে রাধেশ্যামপাড়াতে আগুন লেগেছে। সেখানেই গেল। সাইকেলের পিছনে দুটো বাল্‌তি বেঁধে নিয়ে ছুটেছে।

মল্লিকসাহেব বল্‌লেন—রাধেশ্যামপাড়াতে আগুন! এখন আমার কিছু খাবার উপায় নেই মা, যেতে হবে!

—সে কি হয়? প্রসাদ একটু মুখে দিতেই হয় যে! দেবিকা বল্‌লে।

মল্লিকসাহেব একটু হাসলেন—আমাদের ত সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেছে, তোমরা তাঁর প্রসন্নতায় মানুষ হও! প্রসাদ-ট্রসাদ নয়, চট করে এক পেয়ালা চা দাও।

মন্দাকিনীর উচ্ছলতাকে যেন ধাক্কা মেরে থম্‌কে দিয়ে গেছে কে! কোথায় রাধেশ্যামপাড়াতে আগুন লেগেছে, সেখানে দেবজ্যোতির যাবার কি দরকার ছিল? তার মনের কথা কেড়ে নিয়ে দেবজ্যোতির বাবা বলে বসলেন—

কোথায় আগুন লেগেছে, তাতে তোর কি দরকার? এদিকে বাড়িতে এত কাজ পড়ে—আর এঁরা সব এলেন, বলো ত একবার ছেলের আক্কেলের কথাটা!

মল্লিকসাহেব গম্ভীরভাবে বল্‌লেন—আপনার ছেলেটির মধ্যে সদগুণ রয়েছে। আপনি ভাগ্যবান।

—আপনি মহৎ, আপনি ত বল্‌বেনই হুজুর—কিন্তু আমাদের এতবড় সৌভাগ্য—ইয়ে, আর বেহুঁস বেআক্কেলটা ছুটল সেই রাধেশ্যামপাড়াতে! বল্‌ব কি মশাই, খবরের কাগজের ওপর দু'বাল্‌তি হালুয়া ঢেলে ফেলে দিয়ে দুটো বাল্‌তিই নিয়ে গেল! ওর যে মগজে কি আছে, তা মা সরস্বতীই জানেন।

দেবজ্যোতির পিতা একটি অসহায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যগ্রভাবে মল্লিকসাহেবের মুখের দিকে তাকালেন।

বিদায় নমস্কারান্তে মল্লিকসাহেব বল্‌লেন—হ্যাঁ ভালো কথা, আপনার নামটা যেন কী?—ও সীতানাথ মুখুয্যে—! কোন্ ডিপার্টমেণ্ট?

—আজ্ঞে হুজুর, ড্রিল সেক্‌শন।

—আচ্ছা মনে থাকবে।

মন্দাকিনীর খুব ভাব হয়ে গেছে দেবিকার সঙ্গে। সে দেবিকাকে বল্‌লে—দাদার সঙ্গে তোমরা সবাই একদিন এসো না ভাই আমাদের বাড়ী। এই শনিবার বিকেলেই কেন এস না!

দেবিকা বল্‌লে—দাদা, কালই বর্ধমানে যাবে। কলেজ থেকে শনিবার রাতে ফিরবে। রবিবার যাবো।

—আচ্ছা তাই যেয়ো।

ইণ্ডিয়ান স্টাফ ক্লাবে সকলের প্রবেশাধিকার নেই। কেবলমাত্র ভারতীয় অফিসারদের জন্য এই ক্লাবের দরজা খোলা থাকে, এখানে সাধারণ শ্রমিকেরা অপাংক্তেয়। ঠিক তেমনি অপাংক্তেয় হচ্ছে ভারতীয় স্টাফ ইউরোপীয়ান ইন্‌ষ্টিট্যুটে! অবশ্য ইণ্ডিয়ান স্টাফেদের উৎসবে সাহেবসুবোদের সাদরে নিমন্ত্রণ করা হয়, যদিও তাঁরা বড় কেউ আসেন না।

নূতন বড় সাহেব রবিন্‌সন্ সবে বিলেত থেকে এসেছেন। তিনি ভারতীয় জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহলী। বোধকরি সেইজন্য এবারের সরস্বতী পূজোতে তিনি ইণ্ডিয়ান স্টাফ ক্লাবে এসেছেন, এবং অন্যান্য সাহেবেরা পিছু পিছু হাজির হয়েছেন।

মল্লিকসাহেব স্টাফ ক্লাবের ভেতরে ঢুকে দেখ্‌লেন, একেবারে চাঁদের হাট! সাম্‌নের সারিতে: চিফ ইঞ্জিনিয়ার লেস্‌লী, কারখানার বড় কর্তা রবিন্‌সন্, কেলী—শপ্ ম্যানেজার, ষ্টিফেন্‌স্—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, হাওয়ার্ড—এ্যাসিণ্ট্যাণ্ট ওয়ার্কশপ্ ম্যানেজার, এঁরা প্রত্যেকেই সস্ত্রীক উপস্থিত। দ্বিতীয় সারিতে ভারতীয় অফিসারবর্গের মধ্যে পাওয়ার হাউস ইঞ্জিনিয়ার চৌধুরী, দত্ত, দে এবং আরও অনেকে। মল্লিকসাহেবের আসন ইউরোপীয়দের সঙ্গে—তিনি হচ্ছেন কোম্পানীর প্রসার-অধিকর্তা Development Adviser এবং ডিরেক্টারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুস্থানীয় বলেও সবাই তাঁকে বিশেষ মান্য করে চলে।

ইণ্ডিয়ান স্টাফ ক্লাবের স্টেজটি নেহাৎ ছোট নয়। হলঘরখানাও বেশ বড়। স্টেজের উপর ঠিক মাঝখানে সরস্বতীর মৃন্ময় মূর্তি আর একপাশে একজন বৃদ্ধ ওস্তাদ তানপুরায় সুর বাঁধছেন। সারেঙ্গী সুর দিয়ে যাচ্ছে। অনেকগুলি যন্ত্র ওপাশে রয়েছে—দুটি এস্রাজ, সেতার গোটা তিনেক, স্বরোদ এবং বেহালা গোটা চারেক, এসবই সরস্বতীর পদপ্রান্তে রাখা হয়েছে।

মল্লিকসাহেব দু'-একবার রবিন্‌সনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে মন্দাকিনীকে বল্‌লেন—আজ তোমার ওখানে গানগাওয়াটা আমার ভালো লাগ্‌ল না বাপী।

মন্দাকিনী প্রশ্ন করলে—কেন বাবা, আমি কি খুব খারাপ গেয়েছি?

—না, তা নয়। গান ভালোই হয়েছে—তবে গাওয়াটা উচিত হয় নি।

অবুঝ মেয়েটি অকপটে প্রশ্ন করল—কেন, বাপী?

—যেখানে সেখানে এভাবে মেলামেশা করা ঠিক নয়। এটা তোমার বোঝা উচিত মন্দা!

মন্দাকিনী বিভ্রান্তভাবে বলে—আমি যদি বুঝতে না পারি তুমি ত বুঝিয়ে দেবে ড্যাডি! আই লাইক দেম ইম্মেন্‌সলি। ওরা কেমন লাভ্‌লী—প্রত্যেকটি

ছেলেমেয়ে কেমন আনন্দ করছে—সবাই খুব ভালোবাসে আমাকে তা জানো!

—ওরা হচ্ছে লেবার। তোমাকে ওদের সঙ্গে কথা বল্‌তে গেলে উঁচু থেকে বল্‌তে হবে। সে আর্টটুকু শিখতে না পারলে, মেশামিশি ঠিক হবে না।

—তার সঙ্গে গানের কি সম্পর্ক? সত্যি বাপী তোমাকেও ওরা ভালোবাসে!

—হতে পারে—তবু ওরা অনেক ছোট!

—তাহলে কি দেবজ্যোতি ছোট? কিন্তু বাবা, তোমাদের ওই দত্তর ছেলে রঞ্জন, চৌধুরীর ভাগ্‌নে হারিৎ, বিলেত-ফেরৎ মলয়—ওরা দেবজ্যোতির চেয়ে কিসে বড়? আমি ত বুঝতে পারিনে বাবা! দেখেছ দেবিকা, মল্লিকা, ওর দিদি সবাই কেমন ভালো, কি সুন্দর ওদের কথা! ওরা কেমন চমৎকার হাস্‌তে পারে! আচ্ছা বাবা—

মল্লিকসাহেব স্টেজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে উত্তর দেন—উঁ!

—আচ্ছা, আমি যে ওদের আস্‌তে বলেছি বাংলোতে, তাতে তুমি রাগ করেছ?

—না ঠিক রাগ নয়। তবে ওদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশাটা লোকের নজরে কেমন ঠেক্‌বে। ধরো, তুমি যদি এই স্টেজে আজ গান গাইতে, তাহলে কত লোকে এ্যাপ্রিসিয়েট করত, আর—

—এখানে গাইতে গেলে গলা কেঁপে যাবে বাপী। ওরে বাবা, সে আমি পারবোই না।

মন্দাকিনী ঘাড় নেড়ে প্রস্তাবটা সরিয়ে ফেল্‌ল।

ওদিকে তানপুরা বাঁধা হয়ে গেল। শুরু হ'ল তব্‌লার ওপর হাতুড়ি ঠোকা আর চাঁটি মেরে তবলাকে সুরে বাঁধার পর্ব। মিনিট কয়েক ধরে পেটাপিটি ঠোকাঠুকির পর যখন তবলা-বাঁয়া বাঁধা হয়ে গেল তখন স্টেজের উপর মিনিট খানেক সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বৃদ্ধ ওস্তাদজী তানপুরাটা সাকরেদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে প্রমাণ হস্তে এক টিপ নস্য নাকে ঠাস্‌তে লাগলেন। রাগ-প্রধান গানেরই উপযুক্ত সেই নস্যি-ঠাসার পর্ব।

বোধ করি সেই প্রদীপ জ্বালার আগের সল্‌তে পাকানোটুকুকে রবিন্‌সাহেব একটু ভুল বুঝলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে খাশ অক্সফোর্ডের খাঁটি ইংরেজিতে যে বক্তৃতা দিলেন তার বাংলা মর্ম হচ্ছেঃ আমি এদেশে নতুন এসেছি। কিন্তু এখানকার আকাশ-বাতাসের সঙ্গে মানুষেরাও আমার কাছে কেমন আপন হয়ে উঠেছে এই ক'দিনেই! ভারতের ঐতিহ্য অপার। এই যে এতক্ষণ ধরে ভারতীয় ওস্তাদেরা বাজনা বাজিয়ে শোনালেন তা অনবদ্য। এর আগে আমি ভারতীয় মিউজিক শোন্‌বার সৌভাগ্য লাভ করিনি। কেন যে করিনি তাই ভেবে আফশোষ হচ্ছে। ভারতীয় সঙ্গীতের কী সুর, কী তাল, কী ছন্দ সবই আমার কাছে নতুন—নতুন হলেও পরিতৃপ্তিকর। আমি খুব আনন্দ লাভ করেছি ইণ্ডিয়ান মিউজিক্ শুনে। আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি।

বক্তৃতা শেষ করে রবিন্‌সন্ সমর্থনের আশায় মল্লিকসাহেবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এ্যাম আই রাইট, মল্লিক!

মল্লিকসাহেব একটু হাসলেন, বললেন—ইউ হ্যাভ ইয়েট টু লার্ণ Rob.

রবিন্‌সন্ হো হো করে হেসে বললেন—দ্যাট্‌স নাইস্। নো ফিয়ার মাই ল্যাড, আই উইল গ্রো ওয়াইজার বাই টাইম।

মল্লিকসাহেব বললেন ব্যাপারটা খুলে যে, মিউজিক এখনও আরম্ভ হয় নি সবেমাত্র যন্ত্রপাতি সুরে বাঁধা হ'ল এতক্ষণ ধরে। রবিন্‌সন্ সাহেব বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন; তারপর বললেন—যাই বলো মল্লিক, আরম্ভের আগে যে আরম্ভ সেটাও বড় কম মিষ্টি নয়। আমি এতেই খুশি হয়ে গেছি। বাকীটা অন্যদিন শোনা যাবে—আজ আমায় মাপ করো তোমরা। I am upset.

রবিন্‌সনের সঙ্গে সঙ্গে সাহেব-সুবোরা সকলেই উঠে চলে গেল, তাতে কেউ আশ্চর্যান্বিত হ'ল না, ক্ষুণ্ণও হ'ল না। কনিষ্ঠদরের ভারতীয় ষ্টাফ। বরং সবাই স্বচ্ছন্দে গা মেলে দিয়ে বাঁচল! রবিন্‌সনের সঙ্গীতবোধ নিয়ে হাসাহাসির পর্বটা আপাততঃ তোলা রইল—কারণ ওদিকে ওস্তাদজী হিন্দোলে আলাপ শুরু করেছেন। বেনারস থেকে দু'শ টাকা খরচ করে ওস্তাদ রামজী মহারাজকে

আনানো হয়েছে। সাহেবের ইংরেজী বক্তৃতা তিনি আদৌ বোঝেন নি। তবে সাহেবেরা চলে যাওয়াতে তিনি একবার প্রশ্ন করেছিলেন—ওরা কি করতে এসেছিল?

যখন রবিন্‌সন্ সাহেব ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিট্যুটে মিউজিক সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন ইউরোপীয়ান ইন্‌ষ্টিট্যুটের চক্‌চকে মেঝেতে পা-পিছলে পড়ে যাওয়ার মত পালিশটুকু আরও ঘষে মেজে চক্‌চকে করতে ব্যস্ত চাকরেরা, আর ঠিক সেই সময়ে রাধেশ্যামপাড়ায় পর পর পঞ্চাশখানা বাড়ীতে একসঙ্গে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে।

কোথা থেকে কি করে আগুন লাগ্‌ল কেউ তা জানে না। একই সঙ্গে গাঁয়ের একটা বস্তির সমস্ত চালাবাড়ি এভাবে আক্রান্ত হওয়াতে গাঁয়ের লোকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। যে যার পুঁজিপাটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যই বেশি ব্যস্ত। মাঘের কন্‌কনে শীত, তার ওপরে উত্তুরে হাওয়া বইছে। লক্ লক্ করে শিখার তেজ বেড়ে উঠ্‌ল। রাধেশ্যামের পুকুর থেকে জল এল। নিভোবার চেষ্টায় অনেকে লেগে পড়ল—কিন্তু পুকুরটি ডাঙাপাড়ার খুব কাছে নয়।—গোঁসাইবাড়ীর বাগানের মধ্যে। বাল্‌তিতে করে সেখান থেকে জল আন্‌তে আন্‌তে আগুনে আরও জোর ধরল। নিরুপায় মানুষগুলো অগ্নিদেবের মহিমায় জড় হয়ে যাচ্ছে যেন! কোন্ দিকে কোন্ চালার মাথায় জল ঢালবে? এরকম আগুন কেউ কখনও দেখে নি।—প্রথম চোটেই একেবারে ঘেরাও করে বস্তিকে কি করে বেড়ার মতো চারিদিক থেকে গিলে বসল!

নাঃ, কোনো উপায় নেই!

দেবজ্যোতি এবং আরও দশ-বারোটি যুবক যখন এসে পৌছলো আগুনের জায়গায়, তখনই অবস্থা দেখে ওরা বল্‌লে—এ আগুন নেভ বার নয়। যে যার ছেলে বউ নিয়ে দূরে সরে যাও। মালপত্র পড়ে থাক, মানুষের প্রাণ আগে বাঁচাতে হবে!

মুখে একথা বল্‌লেও ওরা সকলেই জল বইতে লাগ্‌ল। রক্ষা করার শেষ চেষ্টাটুকু ত ছাড়া যায় না।

ঘণ্টা দেড়েক ধরে একশ লোক জল আন্‌ল, ঢালল—কিন্তু তাতে কিছুই হ'ল না। গোটা বসতিকে গ্রাস করে বসেছে যে আগুন, তাকে নিরস্ত করবার মতো শক্তি এদের নেই।

অবশেষে আশা ছেড়ে দিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। শীত কোথায় পালিয়েছে! চারিদিকের হাওয়াতে উষ্ণতা যেন ক্লিষ্ট মানুষের মনে ক্ষণিক আরাম দেবার জন্য ব্যগ্র!

রাধেশ্যামের উঁচু ডাঙ্গাতে ষাট-বাষট্টি ঘর বসতির এতোগুলো মানুষের আর দাঁড়াবার মত একটুও জায়গা নেই। একখানি ঘরও রক্ষা পেলো না আগুনের কবল থেকে। রাধেশ্যামের সেবাইত প্রাণগোবিন্দ, প্রাণস্বরূপ, প্রাণবল্লভ, প্রাণকৃষ্ণ প্রত্যেকেই হায়-হায় করতে করতে এসে দাঁড়ালেন প্রজাদের পাশে। তাঁরা বল্‌লেন,—আপাততঃ রাতের মত চলো সব ঠাকুর-বাড়িতে। তারপর দেখা যাবে।

সে কি কোলাহল, কলরব! শিশুর কান্না, মায়ের আক্ষেপ, গৃহস্থের হতাশ্বাস, সব মিলে রাধেশ্যামের ডাঙ্গাটায় ছড়ানো অভিশাপ শীতের রাতকে ভয়ঙ্কর করে তুললো। এখানকার বাতাসে বিভীষিকা ছড়িয়ে দিয়েছে কে!

মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এতগুলি প্রাণী নিরাশ্রয় অসহায় হয়ে পড়ল, কি করে কোন্ অপরাধে, কেউ তা বলে দিতে পারবে না। সর্বনাশ যখন চরম মূর্তিতে দেখা দেয়, মানুষ তখন বিহ্বল হয়ে পড়ে। এরাও তাই হয়েছে।

দেবজ্যোতি পাথরের মত দাঁড়িয়ে দেখছিল। তার হাতের কাজ শেষ হয়ে গেছে। কিছু আর করবার নেই। মাথার চুলের নীচে কে যেন বরফ ছিটিয়ে দিয়েছে—কন্ কন্ করছে ঠাণ্ডা, ঘাম না বরফ! তার সারা দেহে অনবরত ঘাম ঝরছে।

সে দেখতে পেয়েছে—এই আগুনের আসল কারণটা তার চোখে আঙুল দিয়ে কে দেখিয়ে দিল! পথের ওপর কতকগুলো টিন পড়ে থাকতে দেখে সে ভেবেছিল, কোনো গৃহস্থের জিনিসপত্র পড়ে রয়েছে বুঝি বা! কিন্তু কাছে গিয়ে আগুনের উজ্জ্বল আভাতে বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারল ওগুলো

পেট্রোলের গ্যালন টিন। একটা টিন হাতে তুলে নিয়ে নাকের কাছে তুলে ধরল—হাঁ, এখনও তাজা গন্ধ রয়েছে।

এর চেয়ে স্পষ্টতর করে কেউ বল্‌তে পারবে না যে, কি করে আগুন লাগ্‌ল। টিন্ টিন্ পেট্রোল এল কোথা থেকে?

ওদিকে হাঁক-ডাক পড়ে গিয়েছে—মালপত্র আপাততঃ কয়েকজনে পাহারা দেবে এখানেই সারারাত। কাল সকালে ওসবের ব্যবস্থা দেখা যাবে। বাকী সবলে ছেলেমেয়ে নিয়ে চলল রাধেশ্যামের আশ্রয়ে। ঠাকুর রাধেশ্যাম নিশ্চয় একটা উপায় করে দেবেন। তিনি দয়াময়। তাঁর কাছে আকুল প্রাণে প্রার্থনা করলে তিনি কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন! আহা তিনি যে প্রেমেরই দেবতা!—এইসব বল্‌তে বল্‌তে বড় গোঁসাই প্রাণগোবিন্দর চোখ ছল্ ছলিয়ে উঠল।

প্রাণস্বরূপ গদগদ কণ্ঠে বল্‌লেন—এইরকম যে একটা অঘটন হবে সে ত ঠাকুর স্বপ্ন দিয়ে জানিয়ে সাবধান করেছেন অনেক আগেই—আমাদের মনের আচ্ছন্নতা এমনই যে, আমরা ঠিক-ঠিক বুঝতেই পারি নাই। কই রে গুরুপদ, কোথায় গেলি রে!

গুরুপদ রাধেশ্যাম-ডাঙার মাতব্বর ব্যক্তি। তারই কথায় এই ডাঙার লোকেরা সবকিছু করে। এতক্ষণ বিপদের মধ্যে গুরুপদর কথা কারও মনেই ছিল না। এখন আর গুরুপদকে কেউ খুঁজে বার করতে পারে না। কোথায় গেল গুরুপদ?

প্রাণস্বরূপ উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বল্‌লেন—মিথ্যে তাকে খুঁজে মরছ হে! সে পালিয়েছে। আরে সেও তো মানুষ—লজ্জায় মুখ দেখাবার উপায় তার নাই!

ঘর পুড়েছে, সর্বস্ব ঘুচে গিয়েছে কিন্তু এদের মনের কৌতূহল কেমন করে অটুট রইল, একথা কেউ বলে দিতে পারবে না। সকলেই গুরুপদর সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে, সত্যি, লোকটা গেল কোথায়? এই সমূহ বিপদে যখন বাইরের লোকেরা ছুটে এসেছে, বুক দিয়ে পড়ে সাহায্য করছে—ঠিক সেই সময়ে তাদের মাতব্বর, যে নাকি পাড়ার মোড়ল, যার ওপর এতগুলি প্রাণী

ভরসা করে থাকে, যার কথা সবাই মাথা পেতে মেনে চলে, সেই আপনতম লোকটি কোথায় যেতে পারে ?

প্রাণগোবিন্দ বল্‌লেন—যদি বল্‌লে কেন, তবে বলি শোনো ! রাধাগোবিন্দজী যে স্বপ্ন দিয়ে জানিয়েছিলেন, সেকথা একমাত্র গুরুপদই জান্‌তো।

রব উঠ্‌ল—কি স্বপ্ন—কি আদেশ ?

প্রাণগোবিন্দ একটু করুণার হাসি হেসে সকলের মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা বোধকরি পরম কারুণিক ঈশ্বরের দিকে নিবদ্ধ করলেন, বললেন্—অ, তোমরা বুঝি সে কথা কিছুই শোনো নাই ! যাক, যদি বললে কেন, তবে বলি শোনো। আদেশ হ'ল,—'আমার ডাঙাতে বজ্রপাত হবে, ছারখার হবে !' তিনি বল্‌লেন—'ওরে আমার অনেক দুঃখ। পাপে-পাপে পৃথিবী যে ছেয়ে গেল, বুকে আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে, তা আমি একবার নিশ্বাস ফেল্‌ব, তার জায়গা খুঁজে পাচ্ছিনে। তুই আমার ডাঙাটা ফর্সা করে দে !'—তা আমি আর কি করি ? কাকে বলি—কাকে বলি মনে করতে না করতে ঠাকুরের ইচ্ছেতেই গুরুপদ হাজির হয়ে গেল আমার সাম্‌নে। তারপর বুঝলে কি না—তাকে ত বল্‌লাম সব ব্যাপার-স্যাপার। সে যে কি বুঝলে জানিনে বাপু, ঠাকুরের স্বপ্নাদেশের কথা শুনেটুনে তবু কাঠ-গোঁয়ারের মত ঘাড় কাৎ করে সাফ জবাব দিয়ে দিলে—'ডাঙা ছেড়ে আমরা যাবো কুথা, আমাদের চাষবাস গরুলাঙল !' বললে কিনা, 'ছাড়বো না গোঁসাই—ঠাকুরের নিশ্বাস যখন পড়বার তখন পড়বেই।'—এখন দ্যাখো, সেই ছাড়তে হ'ল তো !

মুখ শুকিয়ে গেল সকলের। গুরুপদ ত কোনোদিন তাদের কাছে এ কথা ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করে নি। প্রাণগোবিন্দ তাদের স্তব্ধ অভিভূত ভাব দেখে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—তা সে যাক। এখন তোমরা চলো গো সব, সেই ঠাকুরের চরণে নিবেদন জানাবে—যা করবেন তিনি, তার ওপরে ত কোনো হাত নাই।

দেবজ্যোতি এই গুঞ্জন-চক্রের থেকে খুব দূরে ছিল না। সবই তার কানে এসে পৌছচ্ছে কিন্তু ছায়াচিত্রের দর্শকের মতই তার অবস্থা নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে যেন তার করবার কিছু নেই! সে চুপ করে

দাঁড়িয়েই আছে—মাঝে মাঝে ওই শূন্য পেট্রোলের টিনগুলোর দিকে দৃষ্টি গি.য় ফিরে আস্‌ছে।

তার পিছনে কে এসে দাঁড়ালো, পরক্ষণেই কর্কশ কণ্ঠে বললে—কে? কে তুমি? এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখচ হে?

আশ্চর্য, পুড়ন্ত বস্‌তির আগুনে অপূর্ব এক আলোর পরিবেশ রচিত হয়েছে! দেবজ্যোতি ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ল, বাঁশের পাকা লাঠি হাতে একটি লোক। চোখ দুটো তার ঘোর লাল, বুকখানা হাপরের মত উঠ্‌ছে আর পড়ছে যেন! লোকটি খুব হাঁপাচ্ছে। দেবজ্যোতি শান্তভাবেই বল্‌লে—তুমি কে?

—আমি গুরুপদ সদ্দার। তুমি? কে তুমি আগে বলো—

—আমি কেউ নই।

—এখানে কি দেখ্‌চ দাঁড়িয়ে? আগে বলো, নইলে খুন চেপে যাবে আমার মাথায়।

একটু হেসে দেবজ্যোতি বল্‌লে—দেখ্‌চি। ওই যে—ব'লে সে টিনগুলোর দিকে একবার নজর দিল।

গুরুপদ বল্‌লে—ওসব আমাকে আর দেখাতে হবে না। দেখার আগে পেরথম গন্ধ পেয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছি, কিন্তু তা করতে করতে শালারা ধরিয়ে দিয়ে ছুট্‌তে লেগে গেল। আমার বুদ্ধি—তখন সব সজাগ করে দিই ত ঘরগুলোন্ বাঁচে। তা লয় শালাদের পিছেপিছে লাঠি নিয়ে তাড়া করে গেলাম—সেই হ'ল কাল। হায়—হায়—হায়—হায়!

গুরুপদ মাটির ওপর বসে পড়ল।

দেবজ্যোতি তার পাশে এসে বস্‌ল। দু'জনের কেউ কোনো কথা বল্‌ছে না। চুপ করে বসে আছে। আগুনের আভায় তাদের মুখের চেহারা একরকমই দেখাচ্ছে।

বিছানায় শুয়ে মন্দাকিনী অন্ধকারে চোখ মেলে জেগে রইল। ঘুম নেই চোখে। দিনের আলোর চেয়ে এই নিঝুম রাতে জেগে থাকার চেতনাটা অনেক বেশি নিবিড় মনে হচ্ছে। আপন মনে মন্দাকিনী ভাবছে আজকের কথা।

এমন একটা দিন এর আগে কখনও আসে নি। জীবনের রঙ গাঢ় হয়ে উঠেছে হঠাৎ। টুকরো টুক্‌রো ছবিতে মন্দাকিনীর অন্দরমহল জম-জমাট। বিশেষ করে ছাত্রমহলের প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনা ওকে মশগুল করে রেখেছে। তার মধ্যে কয়েকটা ঝলকে-দেখা দেবজ্যোতি—এই মানুষটার ওপর খুব চটে গিয়েছিল মন্দাকিনী। বলা নেই কওয়া নেই, উধাও হয়ে কোথায় চলে গেল আগুন নেভাতে! অথচ একবার ভেবেও দেখল না যে, মন্দাকিনী কী কাণ্ড করে তবে ওই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিল! কলকাতা শহরের ম্যাজিক-সিনেমা দেখার প্রলোভন ছেড়ে, পিতাকে তাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ চুকিয়ে, মায়ের হাতে-পায়ে ধরে আজ সকালের ট্রেণে রওনা হতে পেরেছিল মন্দাকিনী। এমন একখানা পছন্দসই শাড়ী পরে গেল—অথচ দেবজ্যোতি অবাক হ'ল না! তা নয় না-ই হ'ল, কিন্তু এভাবে প্রায় অবজ্ঞা করে চলে যেতে পারল কি করে?

দুর্জয় অভিমান। অথচ সেটা নিজের মনেই পুষে রাখা ছাড়া উপায় ছিল না।

অবশ্য দেবিকা ঠিক কথাই বলেছে,—দাদার ওই রকম স্বভাব, পরের বিপদের কথা একবার কানে যেতে যা দেরী, অমনি ছুটলো! মনটা ভারী নরম! মন্দাকিনী তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে দেবিকার কথা। প্রথমে পারে নি, কিন্তু একটু একটু করে বুঝছে। আর যখন বুঝলো যে দেবজ্যোতি ওকে অবজ্ঞা করে নি, তখন থেকেই ওর মনে খুশীর জোয়ার এলো। সত্যি এমন একটি মানুষের ওপর রাগ পুষে রাখা কত বড় অন্যায়!

গভীর রাতে এই মন খুলে খুশী মতো ভাবনার মুক্তিতে মন্দাকিনী নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে কতো না দুর্ভাবনায় পড়ল! হয়তো এখনো আগুন নেভেনি! সেখানে এখন দেবজ্যোতি কি করছে? আগুনের আঁচ লেগে পা-হাত হয়তো পুড়েছে! যেরকম মানুষ, তাতে নিজের জীবনের কথা দেবজ্যোতি ভাববেই না, জানা কথা। যতো রাজ্যের অমঙ্গল চিন্তা মন্দাকিনীর কোমল মনকে উত্যক্ত করে তুলল। দেবজ্যোতির মায়ামাখানো মুখখানা কিছুতেই চোখের আড়াল করতে পারে না মন্দাকিনী।

ভাবতে ভাবতে ওর কান্না পেয়ে গেল। গায়ের লেপখানা ছুঁড়ে ফেলে দিল মন্দাকিনী—বড্ড গরম লাগছে! তারপর বিছানার উপর সোজা হয়ে উঠে বসল।

এখন যদি একটি বার সেই অসাবধান মানুষটিকে স্বচক্ষে দেখে আসা যেত তাহলে মন্দাকিনী নিশ্চিন্ত হতে পারতো। কোথায় রয়েছে, কি অবস্থায়—অন্ততঃ সে খবরটুকু পেলেও যে বাঁচা যায়। কিন্তু তা হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সকাল হলে পরে তখন—তার আগে এমনি ভাবে সারাটা রাতই ছট্‌ফট্ করে কাটাতে হবে।

আরামের শয্যা আর সহ্য হচ্ছে না। কন্‌কনে শীতে যখন আর একটা লোক না খেয়ে না দেয়ে কোন্ পোড়া মাঠের মধ্যে দুর্ভোগ সইছে তখন মন্দাকিনী নিশ্চিন্ত এই নরম বিছানায় ঘুমের কোলে গা ঢেলে দিয়ে থাকবে কি করে?

অন্ধকার ঘর, কাচের শার্সী দিয়ে বাইরের আকাশে তারাদল মিট্‌মিট্ করছে—কুয়াশার হাল্কা পর্দা পেরিয়ে ওই নক্ষত্রলোকে কী কোনো খবর লেখা আছে! বয়ঃসন্ধির বিচিত্র অনুভূতি-তাড়িত একটি মানবী হৃদয়ের প্রতি কোন্ সংবেদনা সেখানে জমা আছে তা কে জানে! মন্দাকিনী জানালায় গিয়ে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল। রাধেশ্যামপাড়া ত বেশী দূর নয়! আগুন যদি এখনও জ্বল্‌ত তাহলে আকাশে তার রক্তরাঙা আভা নিশ্চয় দেখা যেত! জানালাটা খুলে দিতেই এক ঝলক কন্‌কনে হাওয়া ঢুকে পড়ল—মন্দাকিনীর দাঁতে দাঁতে কাঁপন লাগল, গায়ে ত তেমন কিছুই নেই! কিন্তু ওর মন আকাশটা আগুনের আভায় রাঙা হয়ে রয়েছে কি না তাই দেখবার জন্যে ব্যস্ত। আর কিছু খেয়াল নেই। তা ছাড়া আরামের চেয়ে যেন এই কষ্ট পাওয়াতেই ওর এখন অনেক বেশি আনন্দ!

এমন নিশুতি রাত—একা-একা কখনও মন্দাকিনী জেগে ছাখে নি। এই জাগরণের মধ্যে নিজেকে কতো কাছাকাছি পাওয়া যায়! খুব ভালো লাগছে—মনে হচ্ছে, ওকে ঘিরে আর কিছু নেই। গোটা পৃথিবী জুড়ে ও নিজে আছে নিজের মনকে নিয়ে! এই মনটা যে এমন আপনার, তা কি কখনও ভেবেছে

মন্দাকিনী! অনায়াসে নিজেকে দেখতে বুঝতে পারছে মন্দাকিনী—অথচ আর কেউ সেটা টেরও পেল না। একেবারেই নিজস্ব এই বোঝাপড়া! এ আবিষ্কারটুকুর তুলনা নেই।

আপনাকে নিয়ে এই যে একক জগৎ সৃষ্টি করার গোপন, দুর্নিবার অভিলাষ বুঝি এমনি করেই তরুণ মনে বাসা বাঁধে!

মন্দাকিনী জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেবজ্যোতির সঙ্গে মনে মনে কথা কয়ঃ

ঃ তোমার ওপর শুধু শুধু রাগ করেছিলাম, খুব অন্যায় হয়েছে আমার—এবারের মতো ক্ষমা করো—আর এমন ভুল হবে না।

বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছে মন্দাকিনী,—দেবজ্যোতি হাসিমুখে ওর দিকে চেয়ে বল্‌ছে—

ঃ তোমার জন্যে আমারই কি কম কষ্ট! কত কাণ্ড করে এলে অথচ একটুও দেখতে পারলাম না। সেদিক থেকে আমারও খুব অন্যায় হয়েছে।

মন্দাকিনী ঘাড় নেড়ে বল্‌লঃ না মোটেই নয়, তোমার এতটুকু ভুল হয় নি। তোমাকে ত এমনি করেই বড় বড় কাজে ছুটে যেতে হবে। ঠিক করেছ। আমি এর জন্যেই শ্রদ্ধা করি—সত্যি বল্‌ছি।

এই স্বগত আলাপচারীতে ওর দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা নামেঃ গৌরবের উচ্ছ্বাসে ওর মন উথ্‌লে উঠেছে। খুব আনন্দ হয়েছে ওর, এমন কূলছাপানো আনন্দের বন্যা কখনও ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় নি। এই প্রথম। অপূর্ব মধুর এর স্বাদ।

মন্দাকিনী চাঁদের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে কতক্ষণ কেঁদেছিল কেউ তা জানে না। কতক্ষণ এমনি একমনে কল্পিত দেবজ্যোতির সঙ্গে গল্প করেছিল, কি কথা কয়েছিল, তার একটি বর্ণও পরে মনে পড়ে নি। তবে এই জাগর-রাত্রির পর থেকে মন্দাকিনী মনের মধ্যে একটা নিজস্ব রাজ্য গড়ে তুল্‌তে শুরু করল। সে রাজ্যের খবর আর কাউকে দিতে চায় নি।

ছয়

রাধেশ্যামপাড়ার অগ্নিকাণ্ড নিয়ে তদন্তপত্র বিশেষ কিছু হ'ল না। আগুন লাগার আসল কারণ যাই হোক, ওখানকার প্রজারা আর পোড়ামাটির ওপর দ্বিতীয়বার ঘর বাঁধবার জন্য যায় নি। ঠাকুরের সেবাইতদের দয়ার অন্ত নেই—তাঁরা প্রত্যেক গৃহস্থকে অন্যত্র জমি দিলেন। আর ঘর তৈরীর জন্য ঢালাও হুকুম দিলেন—'যার যা দরকার দশবিশখানা করে বাঁশ কেটে নিয়ে যাও ঝাড় থেকে।' এর ওপর আবার এক কুড়ি করে টাকা! কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল কোনো দিন! এ উদারতার তুলনা হয় না—তাঁরা আরও বলেছিলেন—প্রজা হচ্ছে পুত্রবৎ, তাদের দায়-অদায় আমাদেরই দায়। তফাৎ কিছু নাই। তবে হাঁ, আমাদের দেহে প্রাণ থাক্‌তে ওই পোড়া জমিতে কাউকে ঘর তুল্‌তে দেবো না। ও জমিতে দেবতার শাপ লেগেছে।

এই নিয়ে গুরুপদর সঙ্গে গোঁসাইদের তুমুল বিবাদ হয়ে গেল। সে বল্‌লে —যদি আমি বাপের ব্যাটা হই তবে ওই জমিতেই ঘর তুলে থাকব।

প্রাণস্বরূপ, প্রাণবল্লভ, প্রাণগোবিন্দ সকলে হাঁ-হাঁ-করে হেঁকে উঠ্‌লেন সমস্বরে—ক্ষেপেছ! ওখানে কি মরতে যাবে হে! আমাদের প্রাণ থাকতে—সে খবরদার! অঘটন ঘটতে দিব না।

—তা মরি ত ওখানেই মরব! ঠাকুর, মরণকে ঠেকাতে পারে কেউ?

—এ্যাই ছাখো, তোমার বুদ্ধির দোষে এতগুলো মানুষের সর্ব্বনাশ হতে বসেছিল। আর বসেছিল বল্‌ছি কেন, হ'লটা কম কিসে! আবার তোমার ওই বদ্‌বুদ্ধি!

প্রাণগোবিন্দ অপ্রসন্ন মুখে বল্‌লেন।

—ছাখো ঠাকুর, আমার কাছে বেশি ফট্‌ফট্‌ করতে এসো না। বল্‌ব তবে? শুন্‌বা—

—আহা, তুমি আজকাল সবসময়েই মেশাতে বেএক্তার হয়ে থাকছো—মানীর মান রেখে কথা বল্‌তেও ভুলে যাচ্ছ যে হে! তোমার আর দোষ কি, ঠাকুর যার ওপর বিরাগ হন তার আর গতি কি—!

রাধেশ্যামের মন্দিরের দিকে মুখ করে গুরুপদ চীৎকার করে উঠ্‌ল—ঠাকুর! তুমি সাক্ষী আছো। ওই ওখেনে বসে সব ত দেখেছ। যদি সত্যি তুমি মানুষের ভগবান হও তবে এসে বলে দাও—ভরতপুরের গোয়ালারা এসেছিল কিনা, মোটরের তেল দিয়ে ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল কিনা। গোঁসাইদের ভুট্‌ভুটি ফাঁস করে দাও ঠাকুর! সব শালাদের চালাকী ন্যাংটো করে দেখিয়ে দাও দোহাই!

প্রাণস্বরূপ বিরক্ত হয়ে চাকরদের ইশারা করলেন—ওরে একে সরিয়ে নিয়ে যা। লোকটার মাথা খারাপ হয়েছে—অপদেবতার নষ্ট নজর লাগলে তার আর মতিগতির ঠিক থাকে না।

গুরুপদর ওপর তার আপন লোকেদেরও কোন আস্থা আর নেই। সত্যি কথাই ত! সেবাইত ঠাকুরদের (যারা নাকি এরকম দয়ালু তাদের) বিপক্ষে মিছেমিছি দাঁড়িয়ে কি লাভ আছে! গুরুপদ যে বল্‌তে চায় ভরতপুরের গোয়ালারা এসে তাদের ঘরে আগুন দিয়ে গিয়েছে—সে কথার কোনো মানে হয়? গোয়ালাদের সঙ্গে ত তাদের কোনো বিবাদ হয় নি। শুধ্‌ শুধু আগুন জ্বালিয়ে গাঁ পুড়িয়ে গোয়ালাদের কি লাভ?…আসলে, ওই যে ঠাকুরের আদেশটা একেবারে অমান্য করেছে গুরুপদ এবং তারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ এই সমূহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেল, সেই জন্যই নিজের মন থেকে একটা কিছু খাড়া করতে চায় গুরুপদ। লোকটার সত্যিই মতিচ্ছন্ন হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ রইল না। রাধেশ্যামের কোপদৃষ্টিতে গুরুপদ মরবে, এও সবাই বেশ বুঝতে পারে!

খুব অল্প দিনের মধ্যেই এ ব্যাপারটা সকলে ভুলে গেল। গল্পকাহিনী হয়ে এতবড় দুঃখের ইতিহাসটা গাল্‌-গল্পের বিষয়বস্তুতে পর্যবসিত হ'ল।

হয়ত এত তাড়াতাড়ি সবাই ভুলে যেত না, কিন্তু যে ডাঙ্গার দিকে তাকিয়ে কোনো কৃষকের পাঁজর কাঁপিয়ে বেদনা-করুণ একটি সত্যকার দীর্ঘনিশ্বাস পড়বে, সেই পোড়া জমিটাই হারিয়ে গেল! বিধাতার নির্দেশেই যেন দুনিয়ার বুক থেকে অভিশাপের চিহ্নটুকুও অপসারিত হ'ল। গ্রেট বেঙ্গল স্টীল

ম্যাহ্নফ্যাকচারার্স কোম্পানীর সঙ্গে রাধেশ্যামের সেবাইতদের চুক্তিনামা হ'ল, কোম্পানীকে তাঁরা দীর্ঘকালের জন্য ওই ডাঙাট জমা দিলেন। সেখানে সারিসারি বাংলো গড়ে উঠ্‌ল কয়েক মাসের মধ্যে। গোঁসাইরা প্রকাশ্যেই বল্‌লেন—মরুক গে যাক, আগুন-খেগো কোম্পানীর সর্ব্বনাশ হ'লে আমাদের কিছু এসে যাবে না।

রাধেশ্যামডাঙার পুরনো বাসিন্দারা অনেকেই কোম্পানীর ইমারৎ তৈরীর কাজে দিন মজুরীও করল বই কি! নগদ পয়সার দরকার কার না আছে!

আরও কয়েক মাসের মধ্যে দেখা গেল, সেবাইতদের প্রত্যেকের এক-একখানি মোটর গাড়ি হয়েছে, তাঁরা সেই গাড়িতে চড়ে সাহেবী পোষাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোম্পানীর ঠিকেদারী পেয়েছেন তাঁরা।

এই অগ্নিকাণ্ডটা ঘটেছিল গত বিশ্বযুদ্ধেরও আগে, উনিশ শ' আটত্রিশ সালে।

আর সকলেই ভুলে গেলেও একটি মানুষ ভুলতে পারে নি—এখন ত সে পুরোদস্তুর পাগল! পথে পথে আজও সে সুর করে গান গেয়ে বেড়ায়—

যেমন ঠাকুর নাড়ু গোপাল
আহা, তেমনি তাহার সেবাইত্‌
প্রজার চালায় আগুন লাগায়
বলিহারী ভাই হিতাহিত—
আর, তাদের হাতের সেবা গিলে
গোপাল ঠাকুর পেট বাজায়, হায়-হায়।
এবার কুমপাণীতে চাক্‌রী পেলো লাড়ু গোপাল
হায় রে, দেশের ছিকেয় উঠ্‌ল লাঙল হাল—হায়! হায়!
কুম্পানী যে ফেল্‌ল মস্ত খ্যাপ্‌লা জাল
ধরা পড়ল সেই জালেতে ভাঁড়ু নাড়ু
প্রাণগোবিন্দ সব গোপাল।
আহা, বলিহারি ভাই কলিকাল
কুম্পানীতে চাকরী করছে দেব গোপাল!

রাধেশ্যামপাড়ার আশপাশেই সে ঘুরে বেড়ায় আর এই গানটি যখন যেমন খুশি তেমন সুরে গেয়ে ফেরে। কেউ তাকে কিছু বলে না। দুপুরে এবং রাত্রে সে ঠাকুর বাড়িতে গিয়ে নিয়মিতভাবে পূজা এবং জলপানের সময় এই গানটি গায়। সেবাইতদের বারণ আছে—গুরুপদর গায়ে যেন কেউ হাত না দেয়—ও পাগল, পাগলের কথায় কি এসে যায়!

পাড়ার ছেলেরা পাগলের পিছনে তাড়া করে যায়—ইট পাটকেল ছোঁড়ে, বলে—গুরুপদ পাগ্‌লা!

সে হাসে। ছোটদের ওপর তার এতটুকু রাগ নেই। তাদের সে কাছে ডাকে, কিন্তু কেউ আসে না কাছে—দূর থেকে মুখ ভেংচে পালায়। গুরুপদও হাসে আর বলে—যাঃ শালার ব্যাটারা গোলামী কর গিয়ে!

সাত

আকাশ ভেঙে বর্ষা নেমেছে সকাল থেকে। বর্ষণ-ভারাক্রান্ত মেঘ যতখানি পেরেছে ঢেলে দিয়েছে কালিমা। বাংলোর বারান্দায় বসে বসে মন্দাকিনী অনেক গান গাইল, আবৃত্তি করল, কৃষ্ণচূড়া গাছের রক্তিম ফুলের গুচ্ছগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল কখনও বা। সময় যেন ওই আকাশের বারিধারার মতই অশেষ—কিছুতেই ফুরোতে চায় না! জিমি কুকুরটাও বিরক্ত হয়ে পড়েছে—মাঠে ছুটোছুটি করতে না পেরে। মল্লিকসাহেব কারখানায় বেরিয়ে গেছেন সকালে। আব্দুলের আজ দেখা নেই। এক এক সময় মন্দাকিনীর মনটা অকারণেই নেচে উঠ্‌ছে—আবার কখনও রাজ্যের অসন্তোষ ভিড় করে মনটাকে বিরূপ করে তুল্‌ছে বন্দিনীদশার বিরুদ্ধে। মন্দাকিনী যেন নিজেকেই ঠিকমত বুঝতে পারছে না! পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছে, মন্দাকিনী ম্যাট্রিক পাশ করেছে। কাল রাত্রে কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। ইচ্ছে ছিল আজই সকালে একবার মল্লিকাদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার। বৃষ্টির মধ্যে কারও বাড়ি গেলে তারা যদি কিছু মনে করে এই সংকোচেই মন্দাকিনী তখন বেরুলো না।

সারাটা দিন বৃষ্টির বিরাম নেই—ঝর্‌ছে ত ঝর্‌ছেই।

মল্লিকসাহেব বেলা তিনটেয় বাড়ি ফিরলেন। মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ চল্‌ল—এরপর মন্দাকিনী কি পড়বে তাই নিয়ে।

বিকেলে বৃষ্টি ধরল—কিন্তু আকাশের মুখটা থম্‌থমে হয়েই রইল। তা থাক, মন্দাকিনী মনে মনে বেরুবার জন্য তৈরী হচ্ছে। তার মা বাধা দিলেন—আবার কখন বৃষ্টি আসবে, শেষে ঠাণ্ডা লেগে যদি কিছু হয়, আজ আর না-ই বেরলি মন্টু!

—না মা ভারি বিশ্রী লাগ্‌ছে। একেবারে দিনরাত ঘরে আটক থাকলে শেষে বাত ধরে যাবে। আমি এই যাবো আর আসবো, তুমি কিছু ভেবো না মা।

—আগে ত বাড়িতে বসে থাকলে তোর বাত হ'ত না! যা হয় করো বাপু।

—থাকগে বেরুবো না, যখন রাগ করছ!

—যা, নইলে মুখ ত ওই আকাশের মত আঁধার হয়ে থাকবে! বলি কি, এখন বড় হচ্ছিস—একটু ঠাণ্ডা হ'তে শেখ্ মা। আমি আর ক'দিন!

মন্দাকিনী হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠ্‌ল—ঠাণ্ডা! এই ত সারাদিন পোষা পাখীর মত বাড়িতে ব'সে আছি মা। এর চেয়ে আর কি চাও! আর পালাবার ভয় দেখাচ্ছ—তুমি যেখানে যাবে আমিও সঙ্গ নেবো।

মেয়ের এ কথায় অপ্রসন্ন মুখে মা বল্‌লেন—যত সব অলুক্ষুণে কথা!

মন্দাকিনীর পিস্‌তুতো ভাই রণজিৎ বল্‌লে—ওঃ, দিদি তুমি কিরকম ঠাণ্ডা—সত্যি নাচ, গান, আবৃত্তি সবগুলো করে গেলে! একটা স্টেজের গোটা প্রোগ্রাম একাই তুমি চালিয়ে দিলে। আগে জান্‌লে আমাদের ইস্কুলের প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনের দিন নিয়ে যেতাম কলকাতায়। আচ্ছা দিদি, তুমি বক্তৃতা দিতে পারো?

মন্দাকিনী ধম্‌কে উঠ্‌ল—দ্যাখ্ রঞ্জু, তুই বড় জ্যাঠা হচ্ছিস! মা, তোমাদের আদুরে দুলালকে শাসন করে দাও বল্‌ছি। বড্ড দিক্ করছে।

রণজিৎ দিদির আরও কাছে এসে বল্‌লে—চলো দিদিমণি আমিও যাই তোমার সঙ্গে।

—আমি কোথায় যাবো বল্ তো?

—তোমার আবার যাবার জায়গা কোথায়! ওই তোমার জ্যোতিদাদাদের বাড়ি যাবে। তারপর একবার যাবে অলকা ভাদুড়ীদের বাড়ি—অলকার কাছে পাশের খবরটা দিয়ে দিলেই মানিকপুর মহল্লায় চাউর হয়ে যাবে যে!

মন্দাকিনী কপট রোষে চোখ পাকিয়ে বল্‌ল—দাঁড়া অলকাকে বলে দেবো!

—কী বল্‌বে শুনি!

—বল্‌বো যে, রঞ্জু এই বল্‌ছিলো।

—তাতে আমার ভারি বয়েই গেল। অলকাকে আমার খুব ভালো লাগে—যেমন স্পষ্ট কথা শোনাতে পারে আবার হজমও করতে পারে খুব কড়া কথা।

—ও মা, তুই অবাক করলি যে, অলকার খবর তোর কাছ থেকে নিতে হবে নাকি? এইটুকু ছেলের পেটে পেটে এত!

মা ওপাশের ঘর থেকে হেঁকে বল্লেন—ভাই-বোনে ঝগড়াই করবি ত বেরুবি কখন?

—এই যাই মা।

বলে মন্দাকিনী ফ্রক ছেড়ে শাড়ী পরতে গেল। বাড়িতে এখনও ফ্রকই পরে ও—তবে বাইরে বেরুতে হ'লেই শাড়ী চাই!

বাংলোর বারান্দায় বসে যে বর্ষা মন্দাকিনী এতক্ষণ দেখেছিল আর পথে চল্তে চল্তে যে বর্ষার পরিচয় পেল, দুটো যেন সম্পূর্ণ আলাদা জগতের! মানিকপুরের মাঠে মাঠে জল থৈ-থৈ করছে। পথের পাশে যে কাঁচা নালী তাতে ঘোলা জল বয়ে যাচ্ছে বেশ গর্বিত গর্জনে। এক-এক জায়গায় বাধা পেয়ে এপাশ-ওপাশে উপছে উঠছে, উঠে যেন জঞ্জালের নোংরামী স্বমহিমায় প্রকটিত করছে!

বাবু-বাংলোর এলাকা পেরিয়ে আর জুতো-পায়ে হাঁটা চল্ল না। রণজিৎ বল্লে—বাড়ি ফিরে চলো দিদি, আর এগিয়ে কাজ নেই।

মন্দা বল্লে—বেশ মজা লাগ্ছে, চল্ না দেখেই আসি ওদিকটা।

—জুতো খুল্তে হবে যে!

—তাতে কি!

—তার চেয়ে গাড়ি নিয়ে—

—থাম, সব সময় গাড়ি আর গাড়ি। তোদের কলকাত্তাই অভ্যেস একটু ছাড় দেখি। আচ্ছা রঞ্জু, মানুষের মত হেঁটে চলে বেড়াতে তোর ভালো লাগে না?

এই মৃদু তিরস্কারের কোনো জবাব দিল না রণজিৎ।

আজ শনিবার, দেবজ্যোতি কলেজ থেকে ফিরবে নিশ্চয়—কাল সকালে তাকে চায়ের নেমন্তন্ন করে আসবে মন্দাকিনী। আরও কয়েকজন বন্ধুকে চায়ে বল্তে হবে। তবে তাদের বল্বে কাল বিকেলে—মেয়েরা ভারি হুড়োহুড়ি

আর হাসাহাসি করে। দেবজ্যোতির সঙ্গে তাদের আলাপ করিয়ে দেবার খুব ইচ্ছে—কিন্তু, থাক গে, পরে আর একদিন দেখা যাবে। তাছাড়া আসানসোলেও কয়েকজন সহপাঠিনী রয়েছে—সবাইকেই এক সঙ্গে বল্‌বে ও। মানিকপুর থেকে আসানসোলের স্কুলে পড়তে যেতো দশজন, তাদের মধ্যে এবার মোট চারজন পাশ করেছে। সেই একটা সমস্যা—যারা পাশ করতে পারে নি তাদের নেমন্তন্ন করা ঠিক হবে কি না—সে সম্বন্ধে দেবজ্যোতির কাছে পরামর্শ নিতে হবে! এইসব ভাবতে ভাবতে মন্দাকিনী পথ চল্‌ছিল। আশপাশের দিকে ওর কোনো নজরই ছিল না। হঠাৎ একসময়ে শাড়ীর প্রান্তটা ভিজে ঠাণ্ডা মনে হ'তে ও তাকিয়ে দেখল চারিদিকে জল। শাড়ীটা ভিজে শট্‌-শট্‌ করছে—যেদিকেই দৃষ্টি পড়ে, শুধু জল আর জল! এই অখণ্ড জলরাশির গহ্বরে কুলী-মার্কা কোয়ার্টারগুলো কোনো রকমে গলা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পথের চেয়েও নীচু ওই বাড়িগুলো। পথের এপার থেকে অনায়াসেই ওপারে জল চলে যাচ্ছে—অবিচ্ছিন্ন অসীম যেন এই জলরাশি!

মন্দাকিনী থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। এত জল! কত বৃষ্টি হয়েছে? মানিকপুরের বৃষ্টির সমস্ত জলই কি এখানে এসে সঞ্চিত হচ্ছে?

রণজিৎ তার দিদির হাত ধরে টানলে—দিদি, দিদি! বন্যা হয়েছে—

—তাই ত রে রঞ্জু, আমি ভাবছি—

তার কথা শেষ করতে না দিয়ে রণজিৎ বল্‌লে—তোমাকে আর ভাবতে হবে না দিদি—চলো, ফিরে চলো। তোমাদের মানিকপুর যে এমন ডুবো তা কে জান্‌তো!

—বন্যা হলে আর দেখতে হ'ত না। বৃষ্টির জল বেরুবার পথ না পেয়েই এই হাল। তোদের কলকাতাতেও ত এরকম হয় রে। মনে পড়ছে না ঠন্‌ঠনে কালীতলা আর মেছোবাজারের কথা? এতদূর এসে ফিরে যাবো? ওদের অবস্থাটা একবার দেখে যাবো না?

—আচ্ছা তোমার কি মাথা খারাপ হ'ল? দেখ্‌চ না, ওখানে এক কোমর জল দাঁড়িয়ে গেছে। ওরা কি এখনো এখানে আছে নাকি? সব বাড়িই ত ডুবে গ্যাছে!

—তুই বরং একটু শুক্‌নো জায়গায় গিয়ে দাঁড়া। আমি চট্‌ করে মল্লিকাদের খবর নিয়ে আসি।

—নাঃ, তোমায় নিয়ে আর পারা যাবে না।

—মিছে রাগ করছিস আমার ওপর রঞ্জু। আমাকে একবার যেতেই হবে যে—।

রণজিৎ পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে আর একপাও এগোবে না। মন্দাকিনী ঘাড় ঘুরিয়ে সস্নেহ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল এবং শাড়ী সাম্‌লাবার আশা ছেড়ে দিয়ে স্বচ্ছন্দেই জল ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগল সাম্‌নের দিকে।

পথ থেকে সীতানাথ মুখুয্যের কোয়ার্টার বেশ খানিকটা নীচু—আর সব কোয়ার্টারের সঙ্গে তার কোনোই তফাৎ নেই। মন্দাকিনী দরজার সাম্‌নে এসে দেখল ভেতর থেকে বন্ধ। বিশ্রী একটা গন্ধে গা বমি-বমি করতে লাগল ওর। নাকে কাপড় চাপা দিয়ে মন্দাকিনী শেকল নাড়তে শুরু করল। আশপাশের সমস্ত বাড়িরই দরজা বন্ধ। পথে লোক চল্‌ছে না।

কিছুক্ষণ পরে ভেতর থেকে সাড়া এল—কে? কে?

—আমি, মন্দাকিনী।

দেবজ্যোতির মা, বোধহয় ঘরের মধ্যে থেকেই বল্‌লেন—ওঁমা আমার কি হবে গো! তুমি কেন মা এই আঁস্তাকুড়ে জঞ্জালের মধ্যে!

—শীগ্‌গির দরজা খুলুন।

—দরজা! আচ্ছা মা দাঁড়াও দেখি।

ভেতর থেকে মল্লিকা বল্‌লে—মন্দাকিনী, তুমি ফিরে যাও, এর মধ্যে এসো না।

মন্দাকিনী জোর গলাতে জবাব দিল—আমি ত বাইরে থেকে ফিরব বলে এতটা জল ভেঙে আসি নি!

—আরে দরজা খুল্‌লেই ভেতরে তোমার সঙ্গে বেনো জল ঢুকে পড়বে ঘরে।

—খোলো! বড্ড শীত করছে। আমি বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছি!

মল্লিকা উঠোনে নেমে এল—এপার থেকেই জলের মধ্যে আলোড়নের শব্দ শুনে মন্দাকিনী বুঝতে পারে। দরজাটা খোলার আগে মল্লিকা সতর্ক করে দিল—তুমি বাঁ দিকের পাল্লাটা খুব শক্ত করে ধরো। আমি দরজা খুল্‌লে ডান দিকের পাল্লাটা একটু ফাঁক করে ঢুকে পড়ো। দেখো, বেশি ফাঁক করো না লক্ষ্মী দিদি!

—আচ্ছা।

মন্দাকিনী বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখ্‌ল সর্বত্র জল থৈ-থৈ করছে। ঘরের মেঝেতেও জল। ওরা সকলে চৌকির ওপর উঠে বসে আছে। তিন বোন আর দেবজ্যোতির মা।

সীতানাথ বাড়ি আসেন নি। এরকম বাদলা নামলে এ সব কোয়ার্টারের লোকেরা বাড়ি ফেরে না—কারখানাতেই কাটিয়ে দেয়। মেয়েরা যেমন তেমন করে প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকে এরই মধ্যে।

মন্দাকিনীর চোখের জল বিস্ময়ের তাড়নায় নিথর হয়ে গেছে। ওর মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুচ্ছে না।

মল্লিকা বল্‌লে—কেমন মজা লাগ্‌ছে মন্দা দিদি?

দেবিকা বল্‌লে—এসো আমরা সবাই বাঘবন্দী খেলি।

মুকুল মুখ বুঁজে চটের আসনে নক্সা তুল্‌ছিল। সে বিশেষ কোনো কথা বল্‌ছে না।

খানিকক্ষণ ঘরের ওপরে নীচে চারিদিকে তাকিয়ে এক সময়ে মন্দাকিনী বল্‌লে—চলো তোমরা সব আমাদের বাড়ি চলো মুকুলদি!

মুকুল বল্‌লে—কেন ভাই, বেশ ত আছি।

—তোমাদের খাওয়া দাওয়া কি করে হবে রাত্রে? রান্নাঘরও যে ভেসে গেছে!

—ওই সকালে যা হয়েছে। আকাশের চেহারা দেখেই মা বুঝেছিলেন যে আজ আর রক্ষে নেই। হ'লও তাই।

মল্লিকা বল্‌লে।

মন্দাকিনী ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—ওসব কিছু শুনতে চাইনে। তোমরা সবাই আমাদের বাড়ি আজ চলো, এখুনি, আমার সঙ্গেই।

মুকুল হাসল, অত্যন্ত ম্লান, কঠিন সে হাসি—একদিন দুমুঠো দিলে কি ভাই চিরদিনের দুঃখ ঘোচে ভাই!

মন্দাকিনী কোনো সদুত্তর খুঁজে পায় না। দেবিকা বল্‌লে ওর পক্ষ নিয়ে—আহা দিদির যেন কেমন-কেমন কথা! ভগবানের দেওয়া দুঃখ কি আর কেউ হাত দিয়ে ঘোচাতে পারে নাকি? তাই ব'লে কি মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে না, আদর করবে না?

মুকুলের যেন কি হয়েছে, ও বল্‌লে—ওসব বড়লোকেদের শোভা পায়। তুই কোন্ এক্তারে মন্দার হয়ে কথা বলিস বাঁদ্‌রী?

দেবজ্যোতির মা বড় মেয়েকে তিরস্কার করলেন—ছাখ্ মুকু, তোর আজকাল বড্ড মুখ হয়েছে। যেমন বয়েস বাড়ছে তেমনি ঝাল বাড়ছে। না মা মন্দাকিনী, তুমি মুকুলের কথা গায়ে মেখো না। আহা বেচারী এই সাগর পেরমাণ জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে এলো—এর চেয়ে আন্তরিক টান আর কাকে বলে!

মুকুল মুখ খুল্‌লে সহজে চুপ করবার মেয়ে নয়, ও বল্‌লে—কিন্তু যার জন্যে এত আন্তরিক টান, সেই জ্যোতিদাদার ত দেখা পেলে না ভাই! মিছেমিছি ময়লা জলকাদা ঘাঁটাই সার হ'ল।

কে যেন মন্দাকিনীর পিঠে চাবুক কষিয়ে দিল! অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে মন্দাকিনী মল্লিকাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মল্লিকা, দেবিকা দু'জনেই এক লাফে চৌকি থেকে নেমে পড়ে ছুটে এলো মন্দাকিনীর পথ রোধ করবার জন্য। কিন্তু মন্দাকিনী যেমন দুর্বার ইচ্ছাশক্তির বলে লজ্জা-মর্যাদা ভুলে এখানে এসেছিল, তার চেয়েও প্রবলতর ধাক্কা দিয়ে কে যেন প্রচণ্ডতর শক্তিতে এখান থেকে তাকে টেনে নিয়ে চল্‌ল! মল্লিকা, দেবিকার কোনো কথাই ওর কানে গেল না।

মন্দাকিনী কিছুতেই বুঝতে পারে না মুকুল কেন কেবলই ঠোকর মেরে কথা বলে, কী করেছে ও মুকুলের! পথের ওপর রণজিৎকে দেখে মন্দাকিনীর হুঁস হ'ল। এখন মনে পড়ল—রাগের মাথায় পাশের খবরটাও দেওয়া হয় নি, এমন কি দেবজ্যোতিকে নিমন্ত্রণটাও ক'রে আসা হয় নি।

মন্দাকিনী বিরক্ত হয় নিজের ওপর। মনে মনে প্রশ্ন করল—কি এমন অপমানসূচক কথা মুকুল বলেছে যাতে এইভাবে অশোভন ব্যবহার করে ওদের বাড়ি থেকে চলে আসতে হবে? সত্যি, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে ত মুকুলের কথাগুলো রসিকতা ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। তা ছাড়া, ওরকম অবস্থায় থাকলে মাথা ঠিক রাখা সত্যিই শক্ত।

পথের মধ্যে রণজিৎ অনেক কথা বল্‌ল, কিন্তু মন্দাকিনীর তরফ থেকে কিছুমাত্র সাড়া মিল্‌ল না।

বাড়ি ফিরে মন্দাকিনীর মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। দেবিকাদের কোয়ার্টার থেকে এভাবে চলে আসাটা খুবই ছেলেমানুষী হয়েছে—এ নিয়ে ওরা হয়ত নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করবে।

যদি আর একবার গিয়ে ওই জলমগ্ন বাড়িখানা থেকে ওদের কোনোরকমে টেনে নিয়ে আস্‌তে পারত! আবার ওর নাকে সেই দুর্গন্ধটা এসে গা ঘুলিয়ে দিল। আচ্ছা, দেবজ্যোতি ত আজ রাত্রে ওই বাড়িতে এসে উঠ্‌বে! কি খাবে? রাত্রে ওরা ঘুমোবেই বা কি করে?—কেন, ওদের নিয়ে চলে আসা যায় না? মুকুলের কথা গায়ে মাখবার কী দরকার ছিল?

মায়ের কাছে মন্দাকিনী একচোট বকুনী খেল—রণজিৎ সবিস্তারে বিকেলের অভিযানের আনুপূর্বিক বর্ণনা করেছে, অবশ্য তারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, মন্দাকিনীর কাপড়-চোপড়েই যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া, মেয়েটার মুখের চেহারাও কেমন হয়ে গেছে যেন!

মল্লিকসাহেব কোথায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন গাড়ী নিয়ে। অনেক রাতে বাড়ি ফিরে শুন্‌লেন মন্দাকিনীর জ্বর হয়েছে—রীতিমত কেঁপে জ্বর এসেছে। প্রথমটা তিনি তেমন বিচলিত হন নি, কিন্তু যখন শোনা গেল—জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে অনেক আজে বাজে কথা বক্‌ছে মন্দা, থেকে থেকে উঠে বস্‌ছে—তখন বুঝলেন এ জ্বরের চেহারাটা একটু বাঁকা। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর এই একটিমাত্রই সন্তান—!

মানিকপুরের ডাক্তারদের ওপর মল্লিকসাহেবের আদৌ আস্থা নেই। যে কজন ডাক্তার, সবাই ত হাসপাতালের মাইনে করা। তাঁদের কাজের

মধ্যে বেশির ভাগই 'ফিট সার্টিফিকেট' দেওয়া অর্থাৎ কারও অসুখ পুরোপুরি সারবার আগেই তাকে কারখানায় কাজে যোগ দেবার যোগ্য বলে চিরকুট লিখে দেওয়া, অথবা 'আনফিট' ব'লে ছুটি পাইয়ে দেওয়া এই হচ্ছে কাজ।

চিকিৎসা-বিদ্যা এককালে তাঁরা যেটুকু শিখে ডাক্তারী পাশ করেছিলেন, চর্চ্চার পালিশের অভাবে সেটুকু ঘুচে গেছে। কারণ, হাসপাতালের রোগীদের যে-অসুখই করুক না কেন, তাদের জন্য মোটামুটি কয়েক রকমের মিক্‌শ্চার, পাউডার আর ট্যাব্‌লেট পাইকারী পরিমাণে হাসপাতালেই তৈরী করা থাকে এবং সেখান থেকে বিনামূল্যে সরবরাহ করার ঢালাও ব্যবস্থা আছে। যেহেতু কোম্পানীর শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসার রীতি প্রচলিত, সেহেতু এই বন্দোবস্ত। যদি তেমন কিছু মারাত্মক অসুখ-বিসুখ কারও হয় তবে এখানকার ডাক্তারেরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন 'আসানসোল কিম্বা বর্দ্ধমানে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাও।' কলকাতার নাম করেন না—অত খরচ করে কেউ সেখানে যাবে না বলে।

হাসপাতালের বড় ডাক্তার রামপদ হালদারের কাছে সেই রাতেই গাড়ী পাঠিয়ে দিলেন মল্লিকসাহেব। এ ছাড়া আর এখনকার মত করবার কিছু নেই।

রামপদবাবু ব্যাজার মুখে এলেন,—এই বাদ্‌লার হাওয়ায় বাতের ব্যাথাটা খুবই চাগিয়ে ছিল, তা, বলি কি, তুমি ডেকে পাঠিয়েছ ভায়া যেতেই হবে। কি ব্যাপার বলো তো।

—নিজে চোখে দেখে আপনিই ত বল্‌বেন।

মল্লিকসাহেব গম্ভীর ভাবে জবাব দেন।

—হ্যাঁ, তা ত বল্‌বই। তবে কার অসুখ, কি ব্যারাম, সেগুলো ত আগে জেনে নেওয়া দরকার!

—চলুন ও ঘরে। অসুখটা আমার মেয়ের। কি অসুখ, সেটাও কি আমায় বলে দিতে হবে? আচ্ছা রামবাবু, আপনার কতদিনের সার্ভিস হ'ল?

—কেন, কেন?

—বয়েস ত হয়েছে আপনার, এবারে রিটায়ার—

—না, না, বয়েস আর এমন কি হয়েছে। আর বাতের কথা যদি বলো ভায়া, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে মাছ ধরে ওটা তোমাদের চোখের সামনেই হয়েছে। যাক গে, এখন মা-মণিকে দেখা যাক, চলো।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে রাম ডাক্তার রোগীর ঘরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন।

রোগী দেখে রামপদবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন--আজকাল খুব ম্যালিরিয়া হচ্ছে। তবে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার সময় এটা! এমন কি টাইফয়েডেও দাঁড়াতে পারে। যাই হোক, এই প্রেশক্রিপসন দিয়ে লোক পাঠাতে হবে আসানসোল—এ সব ওষুধ ত আমাদের এখানে পাওয়া যাবে না!

বলে তিনি একবার ওপরের দিকে তাকালেন। বয়স যে রামপদ ডাক্তারের অনেক হয়েছে তা বলে দিতে হবে না কাউকে—তাঁকে দিয়ে এমন কি হাসপাতালের কাজ চলাও দায়, তবু রিটায়ার করার ইচ্ছে তাঁর নেই। কোম্পানীর পুরনো হাসপাতাল তৈরীর আমলে তিনি এসে ঢুকেছেন। তারপর ত পৃথিবীতে অনেক কিছু বদ্‌লালো! এই হাসপাতালেরও কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, কিন্তু রামপদবাবুর সাইকেল এবং নিকেল উঠে যাওয়া স্টেথোস্কোপটা একই ভাবে রয়ে গেছে। হাসপাতালের চিকিৎসা-ব্যবস্থারও বিশেষ পরিবর্তন হওয়াটা তিনি সুনজরে দেখেননি। কিন্তু সাহেবসুবোদের জ্বালায় খুব এঁটে উঠ্‌তে পারছেন না আজকাল। ছোকরা দু-একজন ডাক্তার বহাল হয়েছে—তারা হরদম নতুন নতুন ওষুধ বাৎলায়। রামপদ ভ্রূ কুঁচ্‌কে হাসেন—বিলিতি ওষুধওয়ালাদের দালাল, বলে এদের কৃপার চোখে দেখাই রামপদর অভ্যাস।

রামপদ ডাক্তার বল্‌লেন—তুমি কিচ্ছু ভেবো না ভায়া, আমি রোজ দুবেলা এসে মামণিকে দেখে যাবো।

—তার মানে, কতদিন দেখ্‌তে হবে আপনার মনে হয়?

—না, না, ঠিক সেকথা ত বলা যাচ্ছে না। ম্যালেরিয়া হ'লে ত কালই ছেড়ে যাবে। আমার মনে হয় কি জানো, ম্যালেরিয়াই এটা। এই ত শুরু হ'ল কিনা—এখন হরদম কুইনিনের সমুদ্দুর করে রাখ্‌তে হবে, কুলীমহল্লায় ধুম পড়বে ম্যালেরিয়ার।

কুলীমহল্লার সঙ্গে পয়লা নম্বরের সাহেব-বাংলোর নাম শুনে অনিরুদ্ধ বিরক্ত হলেন। চিন্তিত মুখে মল্লিকসাহেব বল্‌লেন—হ্যাঁ, এমন বিশ্রীভাবে জল জমেছে যে দেখ্‌লে কষ্ট হয়।

—অবিশ্যি তোমার দয়ার শরীর ব'লেই যা কষ্ট। কিন্তু যারা ওর মধ্যে বাস করছে, তাদের ওইরকমই অভ্যেস। কষ্ট-টষ্ট কিছুই তারা টেরও পায় না।

বলে রামপদ ডাক্তার বিজ্ঞভাবে একটু হাসলেন।

জ্বরের মধ্যে মন্দাকিনী বার বার দেবিকা আর মুকুলের কথা বল্‌ছে। ও কেবলই বল্‌ছে—ওদের নিয়ে এসো এখানে।

মেয়ের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে মন্দাকিনীর মা বোঝাবার চেষ্টা করেন—রাত্তির পোহালে ওদের আনিয়ে নেবো, তুই এখন একটু শান্ত হয়ে ঘুমো তো মা।

মন্দাকিনী কিছুতেই শান্ত হয় না, বলে—না, না, তুমি জানো না মা—ওরা সবাই একখানা চৌকির ওপর হাঁড়িকুড়ি বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। ঘর-দোর সব ভেসে গেছে যে—

অসহায়ভাবে মেয়ের মুখের পানে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মা—কি বলে মেয়েকে সান্ত্বনা দেবেন ভেবে পান না।

দু-একবার তিনি বল্‌লেন যে, লোক পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। তাতে ফল আরও বিপরীত হ'ল। মন্দাকিনী চম্‌কে উঠ্‌ছে সামান্য এতটুকু শব্দে—ওরা কি এসে গেছে হ্যাঁ মা! ওরা এলো বুঝি? আমি যাই—বলে উঠে বস্‌ছে।

এতক্ষণ জ্বরের কারণটা মল্লিকসাহেবকে তাঁর স্ত্রী জানান নি, পাছে মেয়ে বকুনী খায়। কিন্তু এখন বুঝতে পারলেন যে মল্লিকাদের একবার এখানে আনাতেই হবে এবং তা করতে গেলে স্বামীর সজাগ দৃষ্টি এড়ানো সম্ভবপর নয়—সেই সময়ে কোনো না কোনো কথাতে বৃষ্টির জলে মন্দাকিনীর সাঁতার-পাথারের কথাটা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে একটা অনর্থ বেধে যাবে। আর মন্দাকিনী নিজেই হয়ত বলে বসবে। তার চেয়ে আগে থেকে জানিয়ে রাখাই ভালো।

মল্লিকসাহেব ভোরের দিকে উঠে যখন মেয়েকে দেখতে এলেন তখন মন্দাকিনীর মা সেদিনের বিকেলের কথাটা তুললেন এইভাবে :

—ছাখো ও বার বারই জ্যোতিদের বাড়ির কথা বল্‌ছে।

—কি বল্‌ছে? জ্যোতি কে? ও দেবজ্যোতি—

—এই ওদের বাড়ির মেয়েদের এখানে আনানোর কথাটা কেবলই বল্‌ছে। ভুল ত মোটেই বক্‌ছে না, বার বার ওই এক কথা—ওদের খুব কষ্ট, ওদের ঘর-দোর ভেসে গ্যাছে, ওরা নাকি রাতে খেতে পাবে না—

চিন্তিত মুখে মল্লিকসাহেব বল্‌লেন—সেই বাড়ির মেয়েরা বুঝি এসে ওর কাছে দরবার করে গিয়েছে! এইজন্যেই আমি গোড়া থেকে ওইসব ইয়েদের সঙ্গে মেলামেশাটা পছন্দ করি নি! These dirty wretches!

—না গো, তা নয়।

—তুমি থামো দেখি, আমি বুঝতে পেরেছি সব। এতদিন ধরে মানুষ নাচিয়ে এলাম এখন তোমার কাছ থেকে জ্ঞান ধার করতে হবে! নিশ্চয় ওরা এমন প্যাথেটিক ভাবে ওদের দুঃখ-কষ্টের কথা বলেছে যে মন্দাকিনীর মনে সেটা খুব গভীর ভাবে লেগেছে। মেয়েটা বেজায় নরম কি না!

একটু চুপ করে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মল্লিকসাহেব বল্‌লেন—ওর বাবা যেমন পাষণ্ড, ও বেটী তেমনি ঠিক তার উল্টো হচ্ছে।

মন্দাকিনী হঠাৎ চম্‌কে উঠে বল্‌লে—না তোমাদের কোনো কথা শুন্‌ব না, এখুনি আমার সঙ্গে চলো।

মল্লিকসাহেবের মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল—দেখ্‌লে, আমি ঠিক বলেছি।

তাঁর স্ত্রী বল্‌লেন—আজ বিকেলে মন্দা ওদের বাড়ি গিয়েছিল।

চম্‌কে উঠ্‌লেন মল্লিকসাহেব—হাউ এ্যাব্‌সার্ড! সে যে,—সে যে সাক্ষাৎ নরক! মানিকপুরের তাবৎ নোংরা ময়লায় মাখামাখি বস্তী! কেন—কেন —কেন গিয়েছিল?

গর্জন করে উঠ্‌লেন মল্লিকসাহেব।

মন্দাকিনীর আয়ত দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল পিতার মুখের ওপর—বাবা! তুমি এসেছ?

মল্লিকসাহেব ব্যাকুলভাবে বল্লেন—তুই, তুই আমাকে এমনি করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবি! হ্যাঁ রে—

—কেন বাবা! বাবা তুমি আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবে না?

— দিচ্ছি রে পাগ্‌লী!

তারপর মল্লিকসাহেব মেয়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে অপটু হস্তে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মন্দা বল্‌লে—ওদের এখানে আনিয়ে নাও বাবা!

—কিন্তু সেকথা তুই আমাকে আগে বলিস্ নি কেন?

—আমি কি আগে জানতাম—আচ্ছা বাবা, জ্যোতিদাদা এসেছেন?

মল্লিকসাহেব চুপ করে রইলেন, তাঁর হাতও থেমে গেল। একদিন এই দেবজ্যোতি তাঁরই প্রশ্রয় পেয়েছিল, এই দেবজ্যোতির দেহসৌষ্ঠব এবং স্বভাব, মাধুর্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন—কিন্তু আজ যেন সেই নাম শুনেই তাঁর মনের মধ্যে দুর্বোধ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। মন্দাকিনীর তরুণ মনের সমস্তটাই দেবজ্যোতি দখল করে বসেছে। তবে কি তিনি দেবজ্যোতিকে ঈর্ষ্যা করেন? মন্দাকিনীর উৎসুক মনের উৎসধারায় দেবজ্যোতি ছাড়া আর কিছু নেই একথা তার পিতাই সবচেয়ে বেশি জানলে।

মল্লিকসাহেবকে চুপ করে থাকতে দেখে মন্দা বল্‌লে—তুমি রাগ করেছ বাবা!

—হুঁ!

—আমি জানি। কিন্তু রাগ করো না বাবা, সত্যি বল্‌ছি তুমি রাগ করলে আমার অসুখ আর সারবে না।

—না রে পাগ্‌লী রাগ করি নি। তুই ঘুমো ত একটু।

—আমার ঘুম হচ্ছে না বাবা, কেবলই ওদের কথা মনে হচ্ছে—ওরা যে জলে ভাস্‌ছে বাবা!

—অমন জলে ভাসা ত মানিকপুরে আরও দশ হাজার মানুষ ভাসছে মা! আর সারা দেশে কত মানুষ ভেসে যাচ্ছে সেই কথাটা একবার ভেবে দেখেছিস্?

—অত বড় বড় কথা আমার মাথায় আসে না। তুমি ওদের এখানে আন্‌বে কিনা বলো। বলো—

আর্তস্বরে মন্দাকিনী চীৎকার করে উঠ্‌ল।

মল্লিকসাহেব চম্‌কে মেয়ের মুখের পানে তাকিয়ে বল্‌লেন—আমি এখুনি ব্যবস্থা করছি। তুমি শান্ত হয়ে একটু ঘুমোও ত মা!

দোর্দণ্ডপ্রতাপ অনিরুদ্ধ মল্লিকের কম্বুকণ্ঠ কোথায় গেল! তাঁর পেশীপুষ্ট দেহ থেকে কে যেন যাদুযন্ত্রে অমিত শক্তির শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত নিংড়ে নিয়েছে!

মন্দাকিনী অবসন্ন হয়ে চোখ বুজ্‌ল।

মল্লিকসাহেবের মুখে চোখে অবসন্ন হতাশার ছাপ ফুটে উঠেছে।

গৃহিণী বল্‌লেন—ওগো, তুমি ওর ওপর রাগ করো না।

—নাঃ, রাগ করে লাভ নেই।

বল্‌তে বল্‌তে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আট

রাত্রে সীতানাথ মুখুয্যে বাড়ি ফিরে এলেন। তাঁকে দেখে সকলেই খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। একটু বিপন্নও বোধ করলে বই কি! দু' খানা চৌকির একখানা জুড়ে সংসারের তাবৎ 'ট্যাম্‌রাটুমরী' আর দ্বিতীয়খানিতে মা এবং মেয়েরা রাজত্ব করছিল। এখন কি হবে? সীতানাথবাবুর জন্যে খাবার-ব্যবস্থাই বা কি করা যাবে?

গৃহিণী বল্‌লেন—হ্যাঁ গো, চাট্টি চিঁড়ে ভিজিয়ে দিই! দই ত ঘরে নেই, গুড় আর একটু তেঁতুল দিয়ে খাবে?

সীতানাথ চৌকির উপর চেপে বসে বল্‌লেন—মুখুয্যে-বংশের কখনো কেউ উপোস করে মরবে না—এই আশীর্বাদ করেছিলেন আমার প্রপিতামহের গুরুদেব, বুঝলে! তিনি ত সাক্ষাৎ অবতার ছিলেন কিনা। তা দ্যাখো, আমরা, রাজা-উজীর না হয়েও নেহাৎ খারাপ নেই। আমার জন্যে ভেবো না, তোমাদের অবস্থা আন্দাজ করে নিয়ে আহারটা সেরেই এলাম—আমাকে নিয়ে আবার ফ্যাসাদে পড়বে কেন!

গৃহিণী বল্‌লেন—এমন বাদ্‌লায় আবার কষ্ট করে এলে কেন? রাত্রে তোমার খুব কষ্ট হবে শুতে।

মুকুল ফোঁস করে উঠ্‌ল—তা বলে বাড়ির মানুষ বাড়ি আস্‌বে না?

সীতানাথ বল্‌লেন—বল্ তো মা!

তারপর একটু হেসে নিয়ে শুরু করলেন—আরে আমি কি আসতাম? আজ যা কাণ্ড হয়েছে, তাতে আর কারখানাতে থাকতে সাহস হ'ল না।

—আবার কি হ'ল? এ্যাকসিডেণ্ট নাকি?

দেবিকা শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

সীতানাথ পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে টান্‌তে টান্‌তে বল্‌লেন—নারে বেটী, এ্যাকসিডেণ্টকেই কি আমরা ভয় করি? লড়াই লেগে

গিয়েছে। বড়সাহেবের সঙ্গে মল্লিকসাহেবের—আবার ফেডারেশনের সঙ্গে কোম্পানীর। গিধেবাড় জগাখিচুড়ী।

বিড়িতে পরম নিশ্চিন্ত মনে টান দিয়ে সীতানাথ চোখ বুজে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর আবার আগের কথার জের টেনে বল্‌লেন—আজ হ'ল কি, ফেডারেশানের পাণ্ডা ওই ইস্‌মাইল, অভিজিৎ সিং, নিরঞ্জন ঘোষাল আর এম. কে. সারথী, এই চার পাণ্ডা সটান রবিন্ সাহেবের খাশকামরার সাম্‌নে গিয়ে হাম্‌লা শুরু করে দিল—আজই এক্ষুণি রবিন্ সাহেবকে তারা কুলী-কোয়ার্টারের নাজেহাল অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়ে তবে ছাড়বে।—চলো সাহেব—বলে জুলুম লাগিয়ে দিল!

মুকুল বল্‌লে—আনতে পেরেছিল?

—পাগল নাকি, ওখানে মল্লিকসাহেব কি বসে আছে ঘাস কাট্‌তে? রবিন্‌সন তো রাজি হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল আর কি?

—তারপর?

মল্লিকা জিজ্ঞাসা করল।

—আরে বাবা মল্লিকসাহেবের দশ দিকে হাজার চর। কখন খবর হয়ে গিয়েছে। মল্লিকে আর রবিন্‌সনে দু'জনে খুব ফোনাফুনী হ'ল। মল্লিক শাসিয়ে দিয়েছে রবিন্‌কে, বলেছে—তুমি বিলেত থেকে নতুন এয়েছ, এখানকার হাল্‌চাল বোঝো না—তা ছাড়া চীফ ইঞ্জিনিয়ার ত কারখানার, কুলী-ব্যারাকে যাবার তার কি দরকার? সেও খাশ ইংরেজ বাচ্ছা, সে বলে, আমি যাই, না যাই, তার ওপর তোমার খবরদারীর কি এক্তার? I am not your subordinate. মানে, আমি কি তোমার তাঁবেদার?

—ঠিক কথাই ত। একবার বড়সাহেব যদি এই জলে ভাসা পায়খানার সাম্‌নে আসে ত খুব মজা হয়!

বলে মুকুল খুব জোরে হেসে উঠ্‌ল।

দেবিকা বল্‌লে—এসেছিল না কি বড়সাহেব, হ্যাঁ বাবা?

—আরে তাই কি আসে? ওদের সব ব্যাপারই আলাদা—সাহেবের আসা ত দূরে গেল। কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে ইসমাইল, ঘোষাল, সারথী, সিং

সঙ্কলের ফাইন হয়ে গিয়েছে। বড়সাহেবের সই করা নোটিশ বেরিয়ে সব ডিপার্টমেণ্টে ঘুরল—ভবিষ্যতে এইভাবে যদি কেউ ডিউটির সময় কাজ নষ্ট করে, তাদের চাকরী 'নট্' হয়ে যাবে।

বলে সীতানাথ খুশি মনে বিড়ি টান্‌তে লাগ্‌লেন।

মল্লিকা আশ্চর্য হয়ে গেল—বলো কি ? পরের উপকার করতে গিয়ে কিনা নিজের সর্বনাশ !

—ছুনিয়াতে কবে আর কে পবের ভালো করতে গিয়ে নিজের ভালোটা বজায় রাখ্‌তে পেরেছে, বল্‌ মা ! তবে একটা কথা, তোদের এক কড়ার মুরোদ যখন নেই তখন হুট্ করে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে যাবার কি দরকার ছিল ? মল্লিকসাহেবকে নাথিং করে উড়িয়ে না দিলেই চাকরি নিয়ে টানাটানি হ'ত না।

মুকুল বল্‌লে—তোমাদের মল্লিকসাহেবকে শিন্নী দেওয়া এক বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে বাবা !

—তবে হ্যাঁ একে বলি সাহস ! বড় সাহেবের নাকের ওপর ঘোষাল ফর্‌ফর্ করে ইংরিজিতে চোস্ত শুনিয়ে দিয়ে এলো, ফাইনই করো আর যাই করো, ফাইট করব শেষ পর্যন্ত।—ওদিকে যে তলে তলে ওরা কতদূর গড়িয়েছিল আমরা কেউ তা টের পাই নি। আজকালের মধ্যে হয় তো ষ্ট্রাইকই হয়ে যেতে পারে। কারখানার হাওয়া খুব গরম। সারথী নাকি সাক্‌চী ছুটেছে স্বামী সাহেবকে আনবার জন্যে। ওদিকে সই-সাবুদ চল্‌ছে—চল্লিশ দফার দাবী দিয়ে কোম্পানীর কাছে, নোটিশ করে ষ্ট্রাইক হবে।

—সেটা কিরকম ব্যাপার হবে ? হ্যাঁ গো, এই ডামাডোলের বাজারে আবার কি হাঙ্গাম হজ্জুত বাধবে নাকি ? ষ্ট্রাইক আবার কী ?

বিষণ্ণ মুখে প্রশ্ন করেন দেবজ্যোতির মা।

সীতানাথ বল্‌লেন চিন্তিত ভাবে—আজকালকার সব ছেলেছোক্‌রাদের রক্ত ত নয়, আগুন ! আমাদের কালে ছিল বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্য, তা এদের হয়েছে তার বিপরীত। যদি ওদের মতে মত দাও ত ভালো কথা, নইলে তোমার কথা বলার এক্তার নেই। এখন যদি ষ্ট্রাইক হয় ত কাল বাদে পরশু

হাঁড়ি চড়বে কি করে, সেটা আগে ভেবে ছাখ! স্ট্রাইক মানে হ'ল ধর্মঘট, সব মজুর হাতিয়ার থামিয়ে দেবে, কাজ বন্ধ!

মুকুল বল্‌লে—তা বলে দু ফোঁটা বর্ষার জল হলেই ঘরদোর থৈ-থৈ করবে তার মধ্যে জন্তু-জানোয়ারের মত থাকতে হবে? কেন, আমরা কি মানুষ নই? আবার লোক দেখিয়ে দয়াবতী এলেন, আদিখ্যেতা করতে—

মুকুল মন্দাকিনীর কণ্ঠস্বরের অনুকরণে বল্‌তে লাগ্‌ল—চলো আজ আমাদের বাড়ি, থাকবে তোমরা! কেন, কেন, ওদের দয়ার ওপরে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে নাকি?

মা বললেন—না, থেকে গরীবের উপায় কী মা!

সীতানাথ ধম্‌কে উঠলেন—উপায় আছে বই কি, সেটা আমরা দেখ্‌তে পাইনে।

—আরে গ্যালো যা, তুইও যে ঘোষালের বুলিগুলো আওড়াচ্ছিস! আমি বাবা ওসবের মধ্যে নাই। আরে সেইজন্মেই ত সই দিতে হবে বলেই আথার-পাথারে সাঁতার দিয়ে এখানে পালিয়ে আসা। বাবা, তিন কাল গিয়ে এককাল বাকী, এখন শেষে সই দিয়ে উপোস করে মরি!

মুকুল বল্‌লে—কাজটা তুমি ভালো করো নি বাবা। ন' হাজার মানুষের যা হবে আমাদেরও না হয় সেই দশা হ'ত।

—তুই ক্ষেপেচিস! জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ—এ কী হয়? বলি, এক কথায় ত টাউনের বাইরে বার করে দিতে পারে। তখন কি হবে শুনি! ক'জন সই করবে, সে আর আমার জান্‌তে বাকী নেই। যাক গে, এখন ওসব তক্কোফক্কো ভালো লাগ্‌ছে না, একটু গা গড়াই!

কথায় কথায় মন্দাকিনীর প্রসঙ্গ উঠল। মন্দাকিনী যে আজকের এই প্রলয়ঙ্কর দিনে এ বাড়িতে এসেছিল, সে কথাটা সীতানাথ প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন নি। অবশেষে মুকুলের বিসদৃশ ব্যবহারের কথাটা কানে যেতে সীতানাথ উঠে বসে পাগলের মত মুকুলকে কিলচড় মারতে শুরু করে দিলেন।

ওইটুকু জায়গার মধ্যে সেই প্রহারের অংশ সকলের গায়েই পড়ছিল—দেবিকা, মল্লিকা দু'জনে মিলে সীতানাথকে বাধা দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'ল।

সীতানাথ অকথ্য ভাষায় মুকুলকে গালাগালি দিতে লাগ্‌লেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সারা ঘরখানা কান্নার উচ্চ রোলে বিলাপে ভরে উঠ্‌ল। সকলেই কাঁদছে। সীতানাথ নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য, মুকুল পিতার নির্মম প্রহারের খুবই স্বাভাবিক কারণে। দেবিকা, মল্লিকা এবং দেবজ্যোতির মা কারুরই এক্ষেত্রে না কেঁদে চুপ করে বসে থাকা অসম্ভব বলে তারাও কাঁদছে। এই বিষণ্ণ অন্ধকার রাত্রে জলে-ডোবা টালির ঘরে নিরুপায় ভাবে বসে থাক্‌তে গেলে কান্না আপনিই আসে, বোধহয় সেইজন্যও ওরা কাঁদছিল।

এরই মধ্যে রাত দশটার সময় ভাগ্যের মত অনিবার্য ভাবেই দেবজ্যোতি এসে পড়ল। দেবজ্যোতিকে কাছে পেয়ে ওরা সকলে এই চরম দুরবস্থার মধ্যেও যেন পরম আশ্বাস খুঁজে পায়! সে রাত্রে ওরা কেউ ঘুমোলো না—বসে বসেই তরল অন্ধকারের মধ্যে রাত্রির প্লাবন শুন্‌ল কয়টি প্রাণী। শুধু সেই ক'টি প্রাণীই নয়—মানিকপুরের কুলী-মহল্লায় যে সব প্রাণীর বাস, তাদের প্রত্যেকের ভাগ্যেই এই ভাসমান দুর্যোগ সেই রাত্রির বুকে চড়ে হায়েনার মত নিষ্ঠুর হানা দিয়েছিল।

সীতানাথ মুখুয্যে অবশ্য তারই মধ্যে অনায়াসেই বসে নাক ডাকিয়ে ঘুমোলেন।

নয়

পরদিন সকালে যথাসময়ে কারখানার অমোঘ বাঁশী বেজে ওঠে। আকাশে মেঘের ঘটা নেই। সূর্যের প্রসন্ন হাসিতে উঁচু চিম্‌নীর কুণ্ডলী পাকানো ধূমপুঞ্জ স্নান করছে অবিরল। তবুও সেই কালো ধোঁয়া—সেই ছাই-ছাই রং এর ধোঁয়া, সেই শুভ্র গ্যাসের পুঞ্জ, সেই তাম্রাভ রহস্যে ঢাকা ধোঁয়ার জোয়ারে কি এতটুকু হাসির রেশ লেগে থাকছে না! রাস্তা দিয়ে ভারী ভারী জুতোর শব্দ রোজ যে নিয়মে যায়, আজও তেমনি এগিয়ে যাচ্ছে ফ্যাক্টরীর সদর গেটের দিকে। বিগত রাত্রির দুঃস্বপ্ন হয়ত অনাগত আগামী রাতের প্রতীক্ষায় বসে রইল—আপাততঃ ওসব কথা ভাবনার অবকাশ নেই। যে সময়ের ওপর নিজের অধিকার নেই, যে সময় তুমি বিক্রী করে দিয়েছ সে সময়টা মালিকের—তোমার নয়, অতএব হাজিরার সময় হুঁশিয়ার থাকো, হাজির হও, নইলে টাইম-অফিস থেকে রিপোর্ট চলে যাবে—বড়সাহেবের সই নিয়ে একেবারে এ্যাকাউণ্টস্ অফিসে, সপ্তাহের মাইনে যখন পাবে তখন দেখবে চিত্রগুপ্তের নিক্তিতে কোথাও বেহিসাব নেই, দেরীর হিসেব মেপে নিয়ে পাই পয়সাটুকুও মাইনে থেকে কাটা গিয়েছে তোমার!

গেটের সাম্‌নে সারিতে দাঁড়াও। তোমার টিকিট! টিকিট কই? পকেটে রেখেছো! টিকিটখানা পকেটে রাখবার জন্য নয়—স্পষ্ট ছাপার অক্ষরে বাংলায়, হিন্দীতে লেখা রয়েছে—সর্বদা গলায় ঝুলাইয়া রাখিবে। কারখানায় চাকরী করো তাতে লজ্জা নেই—আর ওই গোল রূপোর চাকতীর চেয়েও শাদা কাগজের শক্ত টিকিটখানা গলাতে ঝুলিয়ে রাখার মধ্যেই যত অপমান! দিনে দু'বার এই টিকিটের ওপর যন্ত্রের সাহায্যে ছিদ্র করে শ্রমিকের কাজে যোগদানের সময় লেখা হয়ে যায় যেখানে, সেই জায়গাটার নাম টাইম-অফিস। এখানে মানুষের হাতে করবার কিছু নেই। যন্ত্রেরা মানুষের

বিধাতা—তাদের ভুল হয় না, কারণ যন্ত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোথাও মনের প্রশ্রয় নেই।

মানিকপুরের মাঠে মাঠে জল জমে রইল, কিন্তু পনেরো মিনিটের মধ্যে পথের হাজার হাজার মানুষ কারখানার গহ্বরে অদৃশ্য হয়ে গেল! পথ রইল একা, নিতান্তই একাকী পড়ে রইল পথগুলো।

কারখানার প্রভাতী আবাহন-সঙ্গীতের কর্কশধ্বনি শেষ হবার পর আধ ঘণ্টাও পার হয় নি—হঠাৎ পথের বুকে ঘন-ঘন ঘণ্টাধ্বনি বাজতে শুরু করল। "এ্যালার্ম সিগ্‌ন্যাল" বাজিয়ে হাসপাতালের গাড়ী দৌড়চ্ছে। মৃত্যুর সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ বেধে গেছে। কোন্ হতভাগ্য শ্রমিকের অন্যমনস্কতাকে শাস্তি দিয়েছে যন্ত্রবিধাতা। মানুষের অধিকারী মন, আর সেই মনের ওপর জবরদস্তি করে দখল চালায় মনের মানুষ। তার ফলে যদি তুমি যন্ত্রকে অবহেলা করো, তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেবে না সময়ের মালিক যন্ত্র। তার চোখমুখ নেই কিন্তু তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিখুঁত সূক্ষ্ম হিসেবের ওপর নড়াচড়া করে। তার এতটুকু এদিক ওদিক হ'লে সর্বনাশ অবধারিত।

একটা সুইচের রিলিজ টিপ্‌তে আধ মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছিল, তার ফলে গলন্ত তরল লোহা ঢালাই-ঘরের মুখে বাধা পেয়ে ছিট্‌কে এসে তিন জনকে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। এখনও ওরা মরে নি, তাই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পথের দু-পাশের বাড়ি থেকে কৌতূহলী ছেলের দল ছুটে বেরিয়ে এল ঘণ্টার শব্দ পেয়ে। মেয়েদের বুক কেঁপে যায়—অজ্ঞাত কোনো আশঙ্কায় মুখের ওপর লেশমাত্র রক্তের আভা অবশিষ্ট রইল না। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

তারপর আবার হাতের কাজ হাতে তুলে নিতে হয়। কার কপাল পুড়ল? দুশ্চিন্তার ঘোর কাটিয়ে প্রত্যেক গৃহিণীই ভাবতে চেষ্টা করে যে, এ দুর্ভাগ্য তার নিজের নয়। কিন্তু তাদের মধ্যেই কাউকে-না-কাউকে এই আশঙ্কা চরম আঘাত দিয়ে সত্য হয়ে ওঠে। তবু সবাই ভাবে—কার কপাল পুড়ল, আহা!

ময়রার দোকানে বসে দু'জন কাবুলী প্রাতরাশ চুকিয়ে নিচ্ছিল, তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—কোন্ শালা বেহেস্‌তের টিকিট কাট্‌ল?

ছাখো হয়ত পাঁচশ' টাকা ডুবিয়ে দিয়ে স্রেফ স্বর্গে ট্রান্স্‌ফার নিয়ে নিল। ওই জন্যে এই হতভাগা লেবার-মজুরদের টাকা উধার দিতে নেই। আরে বাবা, যদি মরতেই হয় ত আজ বাদে কাল পে-ডে মাইনে নিয়ে, দেনায় কিছু উসুল দিয়ে তারপর মর গিয়ে—খাতক মরে গেলে উত্তমর্ণ কাবুলীও নিরুপায় হয়ে দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে বাধ্য হয়।

নাইট ডিউটি করে ক্লান্ত হয়ে যারা ঘুমোবার চেষ্টা করছিল, তারা ভ্রূকুঞ্চিত করে উঠে বস্‌ল। হয় ত বা কেউ একটু পরে একটা বিড়ি ধরিয়ে কয়েক টান দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল—অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'এ্যালার্ম সিগ্‌ন্যালের' শব্দের দিকেই কানের টান থেকে যায়। চোখের ঘুম কেড়ে নিল কে?

কারখানা থেকে দুপুর বেলায় অভিজিৎ সিং একাই সেদিন কোয়ার্টারে ফিরল। রুদ্রপ্রসাদকে দেখ্‌তে না পেয়ে তার স্ত্রী প্রশ্ন করল—রুদ্দর এলো না যে!

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে অভিজিৎ সিং বুটের ফিতে খুল্‌তে লাগ্‌ল। রুদ্রপ্রসাদের দিদি পুনরায় প্রশ্ন করে—কি হ'ল, অমন চুপচাপ কেন?

অভিজিৎ বল্‌লে—আগে নেয়ে খেয়ে নাও—তারপর চলো তোমাকে হাসপাতালে পৌছে দিয়ে আমি ডিউটি যাবো!

রুদ্রপ্রসাদের দিদি ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ল। রোদন-ভারাক্রান্ত কণ্ঠের বিলাপের বাণী কি কোনো বিশেষ অর্থ বহন করে? নিশ্চল অভিজিৎ সিং-এর দিকে তাকালে মনে হবে যেন পাথরে খোদাই করা মূর্তি! অভিব্যক্তিহীন!

কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে যায়—কিন্তু খুব বেশিক্ষণ নয়, অভিজিৎ চম্‌কে উঠে দাঁড়াল। তারপর তাড়াতাড়ি মাথায় একটু তেল চাপ্‌ড়ে, গাম্‌ছা কাঁধে ফেলে, দুটো বাল্‌তি হাতে নিয়ে স্নান করতে বেরিয়ে গেল। রাস্তার কলে স্নান সেরে দু' বাল্‌তি জল আন্‌তে হবে। এক ঘণ্টা টিফিনের কুড়ি মিনিট ত কারখানায় যাতায়াতেই চলে যায়—বাকী চল্লিশ মিনিটের মধ্যে স্নানাহার বিশ্রাম আনন্দ শোক সব কিছু সেরে নিতে হবে তোমাকে।

স্নান সেরে ফিরে এসে অভিজিৎ দেখ্‌ল, স্ত্রী তখনও কাঁদছে। তার চোখেমুখে বিরক্তি ফুটে উঠ্‌ল, স্ত্রীকে কোনো কিছু না বলে সে রান্নাঘরে ঢুকে ভাত বাড়তে বসল। এবারে চোখের জল মুছে অভিজিতের স্ত্রী উঠে এল—সরো, আমি দিচ্ছি!

অভিজিৎ এতটুকু নড়ল না, মুখে শুধু বল্‌লে—তুমি স্নানটা সেরে নাও, আমার সঙ্গে খেয়েদেয়ে হাসপাতালে যেতে হবে, আলাদা পারমিশন নিয়ে রেখেছি।

—রুদ্দরের কি হয়েছে হ্যাঁ গো—

—হবে আবার কি, জখম—এ্যাক্‌সিডেণ্ট। ঘণ্টি ত শুনেইছ—ব্যস, আর কী!

রুদ্রের দিদির চোখ আবার ছলছলিয়ে আসে, কেন বেচারী এই পোড়া মানিকপুরে এসেছিল! খেতীউতি করলেই ত পারতো, কি লেখাপড়াও ত কম শেখে নি—সরকারী দপ্তরে আর একটা চাকরী জুটিয়ে নিতে পারতো অনায়াসে।

অভিজিৎ সিং ভালোভাবেই জানে যে রুদ্রপ্রসাদের বাঁচবার আশা নেই কিন্তু সেকথা এখনই স্ত্রীর কাছে বলার কোনো মানে হয় না; এ্যাক্‌সিডেণ্টের নাম শুনেই বেচারী যা কান্নাকাটি করছে! তার চেয়ে তাড়াতাড়ি ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চোখের শেষ দেখাটা দেখিয়ে দিতে পারলে হয়!

অভিজিৎ প্রাত্যহিক আহারের অনুপাতে বিশেষ কম কিছু খেল না—আর তার স্ত্রী ভাতের থালার সাম্‌নে বসে আরও খানিকটা কাঁদল। রুদ্রপ্রসাদের জন্য যে ভাত-তরকারী এখনও হেঁসেলে পড়ে রয়েছে—এই কথাটা তার দিদি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেল্‌তে পারে না। আহা, সেই শীতকালের প্রথম দিকে রুদ্র এসে পড়ল, তারপর থেকে কি আনন্দের মধ্যে দিয়েই ওদের দিনগুলো কাটছিল! এতদিনে নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল ওদের সঙ্গে রুদ্রপ্রসাদ—আজ সহসা কি করে ঘুচে গেল সেই নিয়মটুকু! সাম্‌নের দেয়ালটা ঝাপ্‌সা হয়ে গেল অভিজিতের স্ত্রীর কাছে।…কত আশা! রুদ্রপ্রসাদ ছুটির দরখাস্ত করেছে, ছুটি পেলে দিদিকে সঙ্গে নিয়ে দেশে যাবে। সেখানে নবজাত পুত্রকে দেখ্‌তে পাবে রুদ্রপ্রসাদ।……

হাসপাতালে গিয়ে ভাইকে দেখে রুদ্রের দিদি চিন্‌তে পারল না। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে একটা অর্দ্ধদগ্ধ শব যেন! পাশাপাশি তিনটি শয্যায় তিনটি মানুষকে যেন চিতার ওপর থেকে তুলে আনা হয়েছে! চোখমুখ কিছুই বোঝবার কোনো উপায় নেই।

যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে এক সময়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ল রুদ্রপ্রসাদ। মৃত্যুর আগেও সে অস্ফুট স্বরে বলে গেল—আমার ছুটি মঞ্জুর হ'ল না!

না-মঞ্জুর ছুটির পরোয়ানা নিয়ে এক সময়ে রুদ্রপ্রসাদ তার দিদিকে ফেলে রেখে চলে গেল। পিছনে ফেলে রেখে গেল তার মুলুক, জরু আর নবজাত সন্তানের হাত্‌ছানি।

অভিজিৎ সিং-এর সেদিন আর টিফিনের পর কারখানার কাজে যাওয়া হয় নি। রুদ্রপ্রসাদকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। শ্মশান এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে—দামোদরের তীরে নির্জন প্রান্তরে।

আরও দু'জনের মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ওরা বসে রয়েছে। ওরা মরুক, তারপর এক সঙ্গে শবযাত্রা হবে। ব্যস্ততা কিছু নেই। তবে লোকজন যোগাড় করা দরকার। অবশ্য কারখানার ছুটির পর অনেক সঙ্গী পাওয়া যাবে, সে ভরসা আছে।

বাকী দু' জনে মরল তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

দশ

আব্দুল সর্দার দেখা করল সীতানাথ মুখুয্যের সঙ্গে। প্রাথমিক অভিবাদন পর্ব চুকলে পরে, সীতানাথ প্রশ্ন করেন—মা জননী কেমন আছেন, আব্দুলবাবু ?

মেহেদী রং-এর দাড়ির ওপর রোদের জেল্লা খুলেছে খুব চমৎকার—আব্দুল ডান হাতের মুঠোতে এক গোছা দাড়ি ধরে সেই দিকে তাকিয়েই জবাব দিল—দিদিমণি আজ ত ভালোই আছে। লেকিন্ আপনাদের জন্যে তার এতবড় অসুখটা হয়ে গেল—সেজন্যে সাহেব খুব গোসা হয়েছেন আপনাদের ওপর। তবে ও লেড়কী ত সাহেবের জানের চেয়েও পেয়ারের কিনা, তাই খুব বেঁচে গিয়েছেন! নসীব একে বলে।

সীতানাথের মুখটা ফ্যাকাসে দেখায়, তিনি একটু থতিয়ে বল্‌লেন—আহা অমন দয়ার শরীর হয় না, বুঝলেন বাবু একে বলে গিয়ে বংশ! আমাদের মল্লিকসাহেবেরই ত মেয়ে! সেদিন ওই প্রলয় ওই বন্যের মধ্যে—

সীতানাথের কথা শেষ হবার আগেই আব্দুল বাধা দিলে—সে যাক! আপনার ভাগ্য বল্‌তে হবে! সামনের হপ্তায় ত আপনার ডব্‌ল ইউনিট বাংলো মঞ্জুর হয়ে যাচ্ছে। তবে মনে রাখ্‌বেন, মল্লিকসাহেবের মর্জির ওপর মানিকপুরের—

সীতানাথ কথাটা শুনে প্রথমে চম্‌কে উঠ্‌লেন, তারপর খুশীটুকু হজম করে বল্‌লেন—আজ্ঞে সে আপনি বল্‌বেন কি, কারখানার পয়লা চিম্‌নী যেদিন বস্‌ল সেদিন থেকেই ত দেখ্‌চি। আমাদের চোখের সামনেই ত গিয়ে মল্লিকসাহেবের হাতে গড়া এই ইয়ে—সে কি ভুলতে পারি!

আব্দুল শেখ হাতঘড়িতে সময় দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল—আচ্ছা মুখুর্জিমশাই তাহলে এখন চলি! দেখুন কাণ্ডটা, এই ঘড়িখানা জোর করে দিয়ে দিল সেনবাবু। আমিও নেবো না, উনিও নাছোড়; ওঁর সেদিন ঝপ্‌-ঝপ্‌ ইন্‌ক্রিমেণ্ট হয়ে গেল কিনা!

—সে কি কথা! একটু বসুন—এই একটু জলযোগ করতে হবে যে!

সীতানাথ খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এক কথায় কুলীমহল্লা থেকে বাংলো! এতখানি সৌভাগ্য কোনদিন কল্পনাই করতে পারেন নি যে! ডবল ইউনিট কোয়ার্টার তাঁর ন্যায়তঃ অনেকদিন আগেই পাওয়া উচিত ছিল, সেকথা যাক—এখানে যা পাওয়া যায় সেটুকুই যেন করুণার প্রতীক হয়ে গ্রহিতার ভাগ্যে এসে জোটে।

আব্দুল শেখকে কিছু একটা উপহার দিতে হবে, সেটাও সীতানাথ বুঝলেন।

আব্দুল হেসে জবাব দিল—সে পরে খাওয়া যাবে। এখন যাই, আরও কাজ রয়েছে। হঁ্যা, ভালো কথা, দেবজ্যোতি ছোকরার কি খবর?

সীতানাথ বল্লেন—ভালোই আছে।

—দেখুন মুখুর্জিবাবু, আপনাকে একটা হক্ কথা বলি! শুধু শুধু লিখাপড়ি শিখিয়ে ছোঁড়াটাকে বাবু বানাচ্ছেন কেন? তার চেয়ে সাহেবকে ধরলে একটা প্রেন্টিসিপ (Apprenticeship) হয়ে যাবে। তারপর চাই কি, বিলেতও ঘুরিয়ে আন্‌তে পারে ত কোম্পানী—তেমন্ তেমন্ বরাত থাক্‌লে!

আব্দুলের কথায় যেন আকাশের চাঁদ সীতানাথের হাতের মুঠোয় লাফিয়ে এসে পড়ল! তিনি যে কি বল্‌বেন, কি করবেন, কিছুই ভেবে উঠতে পারেন না। স্তব্ধ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আব্দুলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সীতানাথ ঢোক গিল্‌লেন। মুখুয্যের এই তদ্গত মূঢ়ভাব দেখে আব্দুল বলল—অবিশ্যি সবই তগ্‌দিরের খেল্! আচ্ছা নোমোস্কার!

সীতানাথ মুখুয্যে যেন আজ দিনের আলোতেও সাম্‌নের সবকিছু ঝাপ্‌সা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন! বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা সাম্‌লাতে না-সাম্‌লাতে দ্বিতীয় বিস্ময়ের আঘাত তাঁকে অভিভূত বাহ্যজ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। আব্দুল শেখ যে কখন চলে গিয়েছে সীতানাথ টেরও পান নি। তাঁর মনের মধ্যে চারি ধার থেকে ঝড়ের ধাক্কা লাগ্‌ছে! এতখানি সম্ভাবনা, এই আশ্চর্য আশাতীত সুদিনের অস্পষ্ট ধারণা যেন সীতানাথ মুখুয্যের গণ্ডীবদ্ধ সংকীর্ণ মনের বাঁধনকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে উদ্যত হয়েছে। কি হবে ডবল ইউনিট কোয়ার্টার পেলে, —একটা আশমানের চাঁদ দেখা পুরোপুরি শেষ না হতেই আর একটা বিস্ময়ের

ধাক্কা—দেবজ্যোতি যদি এ্যাপ্রেন্টিশ হয়ে যায়, তারপর একদিন বিলেত পর্যন্ত দৌড় দিতে পারে! নাঃ বিলেত-টিলেত গিয়ে কাজ নেই—তাহলে আর ফিরে এসে মা-বাপকে সে চিন্‌তেই পারবে না! অবশ্য বিলেত না গিয়েও ত অনেকে এই কোম্পানীর দৌলতে শয়ে শয়ে টাকা রোজগার করছে!…সহসা সীতানাথের মনে একটা আশঙ্কা ধোঁয়াটে চেহারায় গুমিয়ে উঠ্‌ল। মল্লিক-সাহেবের এই উদারতার বাঁধ-ভাঙ্গা প্লাবনের পশ্চাতে কোনো একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। তার খানিকটা আন্দাজ করা সীতানাথের পক্ষে কঠিন নয়। তিনি মনে মনে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। দেবজ্যোতির ওপর তাঁর অনেক আশা, প্রবল ভরসা। মল্লিকসাহেব প্রসন্ন থাকতে থাকতে সুবিধে-সুযোগগুলো হাতিয়ে নিতে হবে। আর যেন মূহূর্ত বিলম্ব করা চলে না!

পথের পাশে শিরীষগাছের ছায়ায় সীতানাথকে একলা ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুকুল ডাক দিল—বাবা! ও বাবা! ওখেনে অমন ভাবে দাঁড়িয়ে কি করছ?

সীতানাথের কানে মুকুলের ডাক পৌছলো না, অগত্যা মুকুল রাস্তায় উঠে এসে পিতার হাত ধরে নাড়া দিল—ও বাবা! তোমার কি হয়েছে বলো দেখি!

এক এক সময়ে প্রৌঢ় পিতার অসহায় অবস্থার কথা ভেবে মুকুলের মনে খুব আত্মধিক্কার জাগে। ওর মনে হয়, বুঝি বা বিবাহযোগ্যা কন্যাকে পাত্রস্থ করবার কোনো পথ দেখ্‌তে না পেয়েই সীতানাথ যন্ত্রণা ভোগ করছেন।

—ভেবে ভেবে কি শেষে তুমি পাগল হয়ে যাবে? ও বাবা—বাবা গো!

মেয়েকে দেখে সীতানাথ একটু হেসে বল্‌লেন—বুঝলি মুকু-মা, তোদের সেই সাধু ঠিকই বলেছিল, জ্যোতি আমাদের শাপভ্রষ্ট দেবতা!

কথাটা নতুন নয়, মুকুলও অবিশ্বাস করে না—কিন্তু আজ হঠাৎ তার পিতার মুখে দাদার প্রশংসা শুনে মুকুল একটু আশ্চর্য হয়ে গেল।

মুকুল বল্‌লে—চলো, ভেতরে চলো—চা হয়ে গিয়েছে।

চায়েব কথা শুনে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সীতানাথ তেড়ে উঠ্‌লেন—চা, চা হয়ে গিয়েছে? সেই কখন থেকে বল্‌ছি। এখন ভদ্দরলোক চলে গেল, চা হয়ে আর

কি হবে? গেলো তোমরা নিজেরাই ও চা গেলো গিয়ে যাও। আচ্ছা, তোদের আক্কেলকে বলিহারী যাই!

মুকুল বিস্মিত হ'ল—ভদ্দরলোক আবার এর মধ্যে কে এল? তুমি ত সেই মোচলমান কোচুয়ানটার সঙ্গে কথা বল্‌ছিলে!

—কোচ্‌ম্যান! তুই কাকে কি বল্‌ছিস শূয়ার কী বাচ্ছা?

সীতানাথ চীৎকার করে ওঠেন—জানিস ওর কতো পাওয়ার গর্দভ!

মুকুল চাপা গলায় জোর দিয়ে বল্‌লে—যা বল্‌বে বাড়ির মধ্যে এসে বলো। মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর কেলেঙ্কারী করো না।

সীতানাথ গজ-গজ করতে করতে ঘরে এসে ঢুক্‌লেন—তোদের আজকাল বড্ড বাড় হয়েছে। জানিস্ আব্দুল আমাদের ডবল ইউনিট কোয়ার্টার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ওর মত বুদ্ধিমান মানুষ এই মানিকপুরে দুটো নেই—ওর কথায় মল্লিকসাহেব ওঠে-বসে, ইচ্ছে করলে ও তোদের পথের বেগার করে দিতে পারে। এমন একটা জাঁদ্‌রেল লোক কিনা ভদ্দরলোক নয়! তবে হতভাগী বল্ কে ভদ্দরলোক—বল্ আমাকে! ফের যদি এরকম ছোটলোকের মত কথায় কথায় তক্কো করবি ত তোকে গলা ধাক্কা দিয়ে দূর করে দোব বাড়ি থেকে।

মুকুল শান্ত ভাবেই জবাব দিল—ইতরভদ্দর জ্ঞান থাকলে কেউ পথের ওপর দাঁড়িয়ে নিজের মেয়েকে ওইরকম করে গালাগাল দেয় না। অনেক পাপ করে তোমার মেয়ে হয়ে জন্মেছি—দূর করে দেবার দরকার কী, গলায় পা দিয়ে মেরে ফেললেই ত পারো?

—তাই দিই, আয়! আপদের শান্তি হোক।

বলে সীতানাথ উত্তেজিত হয়ে ছুটে গিয়ে মুকুলের চুলের মুঠি ধরলেন। এইরকম একটা সংঘর্ষের আশঙ্কাই করছিল আর সকলে—কাজেই তাঁকে বাধা দেবার জন্য সকলেই এগিয়ে এল, নিমেষ মধ্যে।

মুকুলের কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় না। সে বললে—তুমি কি মনে করো যে আমি কিছুই জানি নে? সব শুনেছি। আব্দুলকে খাতির দেখানোর জন্যে অত লাফালাফি কেন, তাও জানি। তবে আমাকে মেরে

ফেলবার আগে একটা কথা জেনে নাও—দাদা, তোমাদের ওই মল্লিকসাহেবের পা চাটতে যাবে না, যাবে না।

মুকুলের এক-একটি কথার সঙ্গে সঙ্গে সীতানাথের লোহা পেটানো হাতখানার মুঠো দৃঢ়তর হয়ে ওঠে, প্রবলভাবে তিনি মেয়েকে ঝাঁকানী দিয়ে শায়েস্তা করতে চেষ্টা করেন। মল্লিকা, দেবিকা দু' জনেই পিতাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করে। দেবজ্যোতির মায়ের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, তিনি মেয়েকে কেবল পরামর্শ দিতে থাকেন—ওরে, ওরে, তুই আমার মাথা খাস চুপ কর, বাপের সঙ্গে সমানে মুখোমুখি করিস নে রে! আর যদি একটা কথা বল্‌বি ত আমার মরা মুখ দেখ্‌বি—

মুকুল কি এক নিষ্ঠুর শক্তিতে শক্তিমতী হয়ে উঠেছে, কঠিন শ্লেষের সুরে বলে—আহা তোমার এই অভিশাপ যেন আশীর্বাদ হয়ে ওঠে মা! তুমি কত কষ্ট পাচ্ছ! মরে শান্তি পাবে—তেমন সুদিন কি হবে?

সীতানাথ গর্জন করে উঠ্‌লেন—দাদা কারখানার চাকরী করবে না, দাদা তোমার বাপের জমিদারী চালাবে! কে বলেছে তোকে যে জ্যোতি কারখানায় কাজ করবে না?

মুকুল বল্‌লে—দেখে নিয়ো। এ ত আর আমাদের ধরে ঠ্যাঙানো নয়। দেবজ্যোতি মুখুয্যের গায়ে জোর আছে, মনে সাহস আছে, মাথায় মগজ আছে। কারখানায় কাজ করবার মানুষ হ'লে সে আর বর্ধমানে পড়তে যেত না।

মুকুলের মা ধমক দিয়ে বল্‌লেন—থাম, থাম, আর অত বড়াই করতে হবে না—তবু যদি না মামার অন্নে মানুষ হত!

সীতানাথ হাত-পা নেড়ে স্ত্রীকে বল্‌লেন—কালই তোমার ভাইকে পত্তর দিয়ে দাও, এই চিঠিকে টেলিগ্রাম মনে করে যেন জ্যোতিকে এখানে পাঠিয়ে দেয়। যদি তারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়, তাহলে যেন আর একদিনও দেরী না করে। এই আমার শেষ কথা। কোনো ওজোর-আপত্তি চলবে না। পরীক্ষা-ফরীক্ষায় কাজ নেই—আমার ছেলে আমি ফেরৎ চাই। আমিও দিচ্ছি চিঠি। খেটে-খেটে আমার চোখে ছানি পড়ে গেল, হাড়ে দুব্বো গজিয়ে

গেল, বাবুর লেখাপড়ার শখ মিটল না! ওসব হবে না, চাকরী ওকে করতেই হবে। কোম্পানী ওকে বিলেত পাঠাবে। পারবে ওর মামারা বিলেত পাঠাতে? টাকার জোর আছে? পড়ানোর নামে ত বাজার-সরকারী করাচ্ছে। ওসব ফুঁকো নবাবী আর আমি বুঝি নে? খুব হয়েছে—হুঁঃ।

মুকুল মুক্তি পেয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। আপন মনেই বলতে লাগ্‌ল—শুধু শুধু চা-টাকে জুড়িয়ে জল করলে। এখন এই ঠাণ্ডা চা কি গরম করলে সে রকম স্বাদ হয়!

সীতানাথ বসে বসে বিড়ির ধোঁয়ায় ক্লান্তি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। দেবিকা বা মল্লিকা কেউই মুকুলের মত শক্ত নয়, ওদের মনের গঠন ষোল আনা পরাশ্রয়ী ভীরু—ওরা মুকুলের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যায়। দেবজ্যোতির মা উঠোনে নাম্‌লেন বাসন মাজতে। বাড়ির আবহাওয়া শান্ত।

চায়ের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে মুকুল বল্‌লে—হ্যাঁ বাবা, কোম্পানী সত্যিই দাদাকে বিলেতে পাঠাবে? না, ওটা তোমাদের মল্লিকসাহেবের ভাঁওতা?

সীতানাথ জোর দিয়ে বলেন—না পাঠাবার কি দেখ্‌লি তুই! সাধুসন্তর কথা ত মিথ্যে হতে পারে না।

এমনভাবেই সীতানাথ কথাগুলো বলেন যে, দেবজ্যোতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এর চেয়ে সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি আর কিছু হতে পারে না।

মুকুল আস্তে আস্তে বলে—ওই ছুঁড়িটাকে কিন্তু আমার মোটেই ভালো লাগে না। কোন্ দিন না একটা কিছু করে বসে!

সীতানাথ চম্‌কে উঠ্‌লেন, তারপর গম্ভীর হয়ে জবাব দিলেন—পেটের মেয়ের কাছে এসব কথাও শুন্‌তে হবে নাকি?

মুকুলের প্রতিভতা কিছুতেই যেন ক্ষুণ্ন হবার নয়, ও বল্‌লে—আচ্ছা বাবা, দেবিকা যখন হ'ল তখন ত হঠাৎ হয়ে পড়ল, তোমার মনে আছে? তুমি আর আমি দু'জনে কোনোরকমে খালাস করলাম—দাদা গিয়েছিল দাই ডাক্‌তে, কিন্তু দেখা পায় নি। কোন্ এক ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে নাকি দাই চলে গিয়েছে! উঃ সে কী দিনই ছিল! তখন কোথায় হাসপাতাল, কোথায় কি! বয়েস কি আমার কম হ'ল? পেটের মেয়ে বলে কি মানুষ

নই ? না হয় বিয়েই হ'ল না, তা বলে বয়স ত বসে নেই ! আমি কিছু অন্যায় বল্‌ছি নে। তুমি জানো না বাবা, বড়লোকের আদুরে মেয়েরা সব পারে।

মল্লিকা ঝাঁঝিয়ে উঠ্‌ল—দিদি তুমি থামো তো !

মুকুল বল্‌লে—কেন থাম্‌বো ? থেমে থাকার দিন আর নেই ! আমি অনেক দিন থেকে বলি বলি করছিলাম—আজ বলেই ফেল্‌লাম, মন্দাকিনী আমাদের দাদাকে মন্দ করে দেবে, সে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।

সীতানাথ এসব একেবারেই যে ভাবেন নি এমন নয়, তবে এদিকে দৃষ্টি দিলে পাছে সুখের গোড়ায় বালি পড়ে, এই ভয়েই তিনি নিজের সঙ্গে একটু লুকোচুরি করছিলেন।

কিন্তু মুকুলের মন গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরের মতই প্রখর এবং নির্মেঘ, ওর কাছে ধোঁয়াটে হেঁয়ালীর কোনো ঠাঁই নেই। পিতাকে নীরব দেখে ও বল্‌ল—তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ বাবা ! মানিকপুরের চাকায় একবার পড়লে দাদার পরকালটি ঝর্‌ঝরে হয়ে যাবে। ভাগলপুরের ওঁরা—

সীতানাথ মেয়ের কথা শেষ করতে দিলেন না—তাই বলি, মুকুলের ভাবনাটা কোথায় ! ভাগলপুরের ওঁদের কথাটাই তোর সবচেয়ে বেশি করে ভাবা দরকার। তার জন্যে কি আর আমারই চিন্তা নেই ! ওরে, দেবজ্যোতি আমার তেমন ছেলে নয়। তুই দ্যাখ্‌ না—ডবল ইউনিট কোয়ার্টার পেয়ে গেলে, ব্যাস ওদিকে জ্যোতিকে কোম্পানী কিছু-কিছু এ্যালাউন্স দিলেই জ্যোতির বিয়ে দেবো ঝপাং করে। একবার পাকা হয়ে চাকরীতে বসলে পরে তখন মল্লিক-সাহেব আর কিছু করতে পারবে না। বিয়েটা হ'লে আর কে কি করবে শুনি !

মুকুল বল্‌লে—হ্যাঃ, ওরা তাই দিচ্ছে—কুলীখালাসীর হাতে মেয়ে দেবে ভাগলপুরের চাটুয্যেরা—! ওই ওদের মত বনেদী জমিদার ! সেকথা তুমি স্বপ্নেও ভেবো না বাবা !—দাদা ডাক্তার না হলে—

মুকুল জানে যে, ভাগলপুরের চাটুয্যেরা ওকে কুলবধূরূপে বরণ করে নিয়ে যাবেন নির্ঘাত—কিন্তু তার বদলে তাঁরা দেবজ্যোতিকে জামাই করতে চান, আর জামাই পাশকরা ডাক্তার হবে এও চান।

—গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল ! ডাক্তারী পড়বে—পাশ করেই বা কি

রাজ্যপাট কিনবে শুনি! বলি ওই তো দেখছ চোখের ওপর সব ডাক্তারদের পসার। ও হবে না।

সীতানাথ মেয়ের কথা উড়িয়ে দিলেন।

দেবজ্যোতির মা বল্লেন—তোমরা তর্কটা একটু থামাও তো! কোথায় কি তার ঠিক নেই—শুধু-শুধু ঝগড়া, খ্যাচাখেঁচি করছ।

সীতানাথকে বল্লেন—দু বাল্তি জল এনে দাও কল থেকে।

সীতানাথ বাল্তি হাতে করে বেরিয়ে যেতেই মুকুলের মা উঠে এসে ফিস-ফিস করে মেয়েকে বল্লেন—জ্যোতিকে কারখানায় ঢোকাবার মতলব বাতিল করাতেই হবে খেয়াল রেখো মা! নইলে তোমাদের সমূলে সর্বনাশ। ছোঁড়াটা যদি দাঁড়াতে পারে তখন আর তোমাদের ভাবনা কি! ভাগলপুরের জমিজমা সবই ত হাতে এসে পড়বে। এই কারখানার চাকরীতে ঘেন্না ধরে গেছে মা গো!

মুকুল বল্লে—এর ওপর এখন কিছু বল্তে গেলেই ত আবার ধরে মারতে শুরু করবে, মা! ঘাড়-মাথা ঝন্-ঝন্ করছে এখনও।

মল্লিকা বল্লে—আজ আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই! দাদা এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মা বিষণ্ণভাবে বলেন—কি জানি, শেষে বাপে-ব্যাটায় একটা কিছু না বেধে যায়! আমার সেই ভয় মা! সুখের মুখও দেখ্তে পেলাম না—শান্তিটুকু না ঘুচে যায় এর ওপর।

দেবিকা ইশারায় জানালে—চুপ করো, বাবা আসছেন।

মুকুল দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল সীতানাথের হাত থেকে বাল্তি দুটো নেবার জন্য।

এগার

যদিও অনিরুদ্ধ মল্লিকের আন্তরিক ইচ্ছা অন্যরকম ছিল তবু পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে তিনি স্থির করলেন, একদিন রবিন্‌সনকে সঙ্গে নিয়ে কে-টাইপ কোয়ার্টার পরিদর্শনে যাবেন। রবিন্‌সনের বয়স বেশি নয়, তার উপর মনটা যেন কোমল বলে সন্দেহ হয়! পাছে বেফাঁস কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসে এইজন্যই রবিন্‌সনকে তিনি একলা ছাড়তে ভরসা পান না।

কারখানার মধ্যে যেরকম মেঘলা ঘোলাটে আবহাওয়া দেখা দিয়েছে, তাতে করে আশঙ্কা হচ্ছে শ্রমিকেরা খানিকটা সুবিধা আদায় না করে নিরস্ত হবে না। অধিকাংশ শ্রমিকই আর্থিক দৈন্যের জন্য মনে মনে অসন্তুষ্ট, কিন্তু মুখ ফুটে বল্‌বার সাহস এদের এতদিন ছিল না, সেই সাহসের জোগানদার দু-চার জন জুটে গিয়েছে। যে করেই হোক এরা বুঝতে পেরেছে যে, কোম্পানীর দেওয়া মাইনে ছাড়া তাদের সংসার অচল হওয়া যেমনি স্বাভাবিক, তেমনি শ্রমিকেরা হাত গুটোলে কারখানা বন্ধ থাকাও অনিবার্য। বাইরে থেকে আমদানী করা নতুন লোক দিয়ে কারখানা চালানো খুবই কঠিন। তা ছাড়া, কাজ-জানা হাজার হাজার লোকই বা কোম্পানী হঠাৎ আমদানী করতে পারবে কোথা থেকে? কারখানা বন্ধ থাকলে দেশ-বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায়-সংস্রব বজায় রাখ্‌তে পারবে না কোম্পানী—তাতে বিস্তর ক্ষতি। আপোষে মীমাংসা সম্ভবপর হ'লে কোম্পানী শ্রমিকদের কিছুটা সুবিধা-সুযোগ দেবে—দয়া করে নয়, বাধ্য হয়ে। বৃহত্তর ক্ষতি বাঁচাবার জন্য কিছুটা লাভের অংশ শ্রমিকদের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করবে না কোম্পানী।···একথাটা শ্রমিক ফেডারেশনের পাণ্ডারা বার বার সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। তাদের ওপর আস্থা অনেকের হয়েছে, অনেকে আর পাঁচজনকে অনুসরণ করছে এই ভেবে যে সকলের যে দুর্দশা হবে, আমারও সেই দশা হবে। দুর্দশা যদি একজনের ভাগ্যে এসে হানা দেয় তাহলে সেটা দুঃসহ, কিন্তু দশজনে মিলে যদি চরম

দুরবস্থায় পড়া যায় তাহলে যেন একটা সান্ত্বনার হাল্কা বাতাস মানুষের মনকে সঞ্জীবিত করে রাখে।

ফেডারেশনের তহবিলে মাসিক চাঁদা জম্‌ছে, তাছাড়া গোপনে স্ট্রাইক ফাণ্ডের জন্যও আলাদা চাঁদা তোলা হচ্ছে। গভীর রাত্রে ফেডারেশনের কর্মীদের তৎপরতা দেখা যায়।

অনিরুদ্ধ মল্লিক সব খবরই রাখেন। কিন্তু তাঁর পুরাতন অস্ত্র-প্রয়োগে কোনো স্থায়ী সুফলের আশা নেই দেখে তিনি খুব চিন্তিত। বক্সীবাঁধের গোয়ালাদের তরুণ সর্দার ডোমনপ্রসাদকে আব্দুল শেখ মোটা টাকা দাদন খাইয়েছে। সেদিক দিয়ে আশঙ্কার কারণ নেই। রঘুবীরপ্রসাদের সে-দিন আর নেই—এখন ডোমন সর্দার বড় পালোয়ান, বড় খেলোয়াড়, অতএব দাপট ডোমনেরই এক্তারে।

কিন্তু শ্রমিকেরা লাঠির চেয়ে শক্ত হাতিয়ার ধরেছে—দলাদলি ঘুচিয়ে একটা নিশ্ছিদ্র বজ্রশক্তি তৈরী করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এই ন-হাজার মানুষ যদি মাথা তুলে একদিকে দাঁড়ায়, তাহলে বক্সীবাঁধ, ভরতপুর রাধেশ্যামপাড়ার ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের সাধ্য নেই সেই প্রবল প্রতিপক্ষের পায়ের কাছে দাঁড়াবার।…অনিরুদ্ধ মল্লিক সেই বিপুল প্রতিরোধের আশঙ্কায় সর্বদা মনে মনে আতঙ্কগ্রস্ত। উপায় একটা কিছু বার করতেই হবে তাঁকে।

গভীর রাত্রে বাংলোর বারান্দায় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে খালি গায়ে, খালি পায়ে অনিরুদ্ধ মল্লিকের অস্থির পদধ্বনি শোনবার জন্য কেউ জেগে নেই। মাঝে মাঝে পোষা কুকুরটার গভীর নিদ্রার নিশ্চিন্ত নিশ্বাস অনিরুদ্ধ মল্লিকের মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার করে। আহা, কি আরামেই ও ঘুমোচ্ছে! ক্ষণেকের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন মল্লিকসাহেব—আবার চিন্তাসমুদ্রের প্রবল টানে তাঁকে অস্থির বেগে চল্‌তে হয়।

আব্দুল আজ সন্ধ্যায় খবর দিয়েছে, ফেডারেশনের ভিত্‌খানা ওরা রাতারাতি পাকা করে ফেলেছে। কোম্পানীর ডিরেক্টারেরা গোপনে পরামর্শ পাঠিয়েছেন, সামান্য কিছু মাইনে বাড়িয়ে দিলে যদি আপাততঃ ধর্মঘট বন্ধ হয় তবে সেটাই যেন মল্লিকসাহেব করেন। কিন্তু…।

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল অনিরুদ্ধের প্রশস্ত বুক আন্দোলিত করে। কোম্পানীর কর্তারা কেন যে বোঝেন না, একবার আমল পেয়ে গেলে শ্রমিকরা কিছুতেই আর থাম্‌তে চাইবে না—তাদের অধিকারের সীমা দিন-দিনই বাড়বে, আর মালিকদের কর্তৃত্ব ঘুচ্‌বে। এইভাবে অনিরুদ্ধ মল্লিক পরাজয় বরণ করতে প্রস্তুত নন। একদিন এই শ্মশানসদৃশ মানিকপুরে অনিরুদ্ধ মল্লিক এসেছিলেন কেন? রাজত্ব করবার নেশা তাঁকে টেনে এনেছিল—সম্পূর্ণ একাধিপত্য ছাড়া অনিরুদ্ধর পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়, তাই স্বেচ্ছায় মানিকপুরে নির্বাসন গ্রহণ করেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই অনিরুদ্ধ ক্ষমতাপ্রিয়—শুধু কামনাকে বড় করে দেখে অক্ষম স্বপ্নবিলাসী। অনিরুদ্ধ সেই জাতের মানুষ নন্, নিজেকে শক্তিশালী করেছেন কৃচ্ছ্রসাধনার অগ্নিপরীক্ষায়। তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন মানিকপুরের কারখানা—জার্মানী থেকে এনেছেন যন্ত্রপাতি, সাহেবসুবো ধরে এনেছেন স্কটল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড থেকে। দলে দলে মেহনতী কাজের লোক আনিয়েছেন পাঞ্জাব, গুজরাট, রাজপুতানা থেকে। সবসময়েই যে অনিরুদ্ধ মল্লিক খুব নিখুঁত কাজ করতে পেরেছেন তা নয়, তবে নিজের ভুলটুকু ধরতে পারেন, তাঁর মনের সেটুকু প্রসারতা আছে। আরও একটা শক্তি আছে এই ব্যক্তিটির—এক নজরে সাম্‌নের দিক অনেকখানি তিনি দেখ্‌তে পান।

এই দূরদর্শিতাই অনিরুদ্ধকে অস্থির করে তুলেছে। তিনি ভাব্‌ছেন, কেমন করে শ্রমিক-সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করা যায়! অনিরুদ্ধ খয়রাত করতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু জুলুমের প্রশ্রয় দিতে রাজী নন্। আজ পর্যন্ত তাঁর কাছে চোখ রাঙিয়ে কেউ কিছু আদায় করতে পারে নি। কিন্তু অনিরুদ্ধ মল্লিকের আনুগত্য স্বীকার করলে তিনি আশ্রিতের আপদে-বিপদে মাথার উপর সহায় হয়ে দাঁড়ান। এবং তাঁর সহায়তার মধ্যে এতটুকু ফাঁক থাকে না। এই গুণটুকু দিয়ে অনিরুদ্ধ অনেক মানুষকে কিনে রেখে দিয়েছেন।...আজ যারা ধর্মঘটের আয়োজন করছে, যাদের চক্রান্ত একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবার জন্য বদ্ধপরিকর, তাদের মধ্যে খুঁজলে কি একজনও এমন পাওয়া যাবে না যে অনিরুদ্ধর সহায়তা গ্রহণ করে নি?

এক সময়ে অনিরুদ্ধ মল্লিক বাঁ-হাতের করতলে ডানহাতের মুঠো ঠুকে সরবে বলে উঠলেন—আচ্ছা, তবে খেলা শুরু হোক। এসো তোমরা বচ্চায়ে-সাকোর দল! ডিরেক্টররা যাই বলুন, গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। Let them fight it out! ওরা বুঝুক, বুঝে নিক, ওদের জিগির আর ভাত দুটো একসঙ্গে জুটবে না। আপাততঃ রাত্রের মিঠে ঘুমটুকু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্।

শুক্নো গলাটা হুইস্কি দিয়ে একটু ভিজিয়ে নিলেন মল্লিকসাহেব।

বিছানায় শোবার সময়ে পরদিনের কাজের মোটামুটি একটা ছক তৈরী করা তাঁর অনেক দিনের পুরনো অভ্যাস। আজ বালিশের নীচে থেকে ছোট্ট একটি নোট বই বার করে তাতে লিখে রাখলেন অনিরুদ্ধঃ কয়েকটা দাগী আসামী সাব্যস্ত। শায়েস্তা। কোয়ার্টার মেরামতের নোটিশ। ট্রাঙ্ক কল্—কলকাতা। What about দেবজ্যোতি?···

অনিরুদ্ধ মল্লিকের এই সংক্ষিপ্ত পেন্সিলের খোঁচাগুলির কার্যে রূপান্তরিত চেহারা বড় সামান্য নয়! সাধারণ নিয়মে আজকের বীজ-বপনের ফলে আগামী কাল বিরাট মহীরুহ গজিয়ে উঠে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না—কিন্তু মল্লিকসাহেবের ক্ষেত্রে সে নিয়মখাটে না, এমন বহুতর প্রমাণ আছে। তাঁর মুঠোয় বুঝি আলাদীনের আশ্চর্য চিরাগ লুকানো রয়েছে!

বারো

নতুন কোয়ার্টারে বদ্‌লী হয়ে এসে সীতানাথের মেজাজের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। তবে মেয়েদের হাবভাব একেবারে পাল্টে গিয়েছে। ওরা সবাই কেমন আস্তে আস্তে কথা বলে! ওদের চেহারায় পারিপাট্য, ঘরেদোরে ছিম-ছাম গোছ-গাছ দেখে সীতানাথের এক-এক সময়ে বড় অস্বস্তি লাগে। তাঁর মনে হয় যেন, এ বাড়িতে তিনি বেমানান—তাঁর সঙ্গে এই অঞ্চলের কোনোই মিল নেই মনের! কিরকম একটা ফাঁকা অসহায় অবস্থায় পড়েছেন সীতানাথ। পুরাতন প্রতিবেশীদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না। তারা কোনোদিনই সীতানাথকে সুনজরে দেখত না, ইদানীং তাঁর পদোন্নতিতে তারা আরও দূরবর্তী হয়ে গেছে। অথচ বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে সকলেরই বেশ সৌহার্দ্য—এ-মহল্লা ও-মহল্লার মনোভাব সেখানে বেড়া তুলে দেয় নি। এজন্য সীতানাথ অসন্তুষ্ট। তাঁকে কারখানার মধ্যেও অনেকে এড়িয়ে চলে। অথচ তাঁর একটা পোজিশন যে হয়েছে একথা ত মিথ্যে নয়!

এখন সীতানাথ নির্ভয়ে মল্লিকসাহেবের বাংলোতে যান। প্রথম প্রথম একটু সঙ্কোচ হ'ত, সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জন রাস্তা দিয়ে অনেক ঘুরে ফিরে উল্টো রাস্তা দিয়ে তিনি যেতেন সন্তর্পণে। আজকাল সরাসরিই যান। আর কানাকানির ভয় নেই—জানাজানি হয়ে গেছে।

সেদিন একটা মতলব নিয়ে সীতানাথ যাত্রা করেছিলেন। মল্লিক সাহেবের কাছ থেকে কিছু নগদ সাহায্য আদায় করতে হবে। সীতানাথকে দেখে আব্দুল শেখ বল্‌লে—কী সমাচার মুখুর্জি মশাই!

—এই যে মিঞা সাহেব! আপনার সকল কুশল?

মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন সীতানাথ, কোয়ার্টার বদ্‌লীর দরুণ আব্দুলের প্রাপ্য দেওয়া হয় নি।

—হাঁ, আপনাদের আশীর্বাদে। তারপর আপনার লেড়কা এখন কোথায়?

—সে এই বর্ধমানে—মানে ওখানে মামার বাড়িতে সব অসুখ বিসুখ কিনা —তাই মানে আসতে পারছে না। হ্যাঁ, ভালো কথা—সাহেব আছেন নাকি।

—যান না, ওই সামনের ঘরেই—

বলে আব্দুল শেখ দাড়িতে হাত বুলোতে লাগ্‌ল।

হঠাৎ ঘরে ঢুকে সীতানাথ একটু বিপদে পড়লেন! মল্লিক সাহেব কার সঙ্গে যেন কথা বল্‌ছেন। তাই দেখে সীতানাথ ব্যস্তভাবে বেরিয়ে আসতে উদ্যত হলেন, কিন্তু মল্লিক সাহেব মুখে কোন কথা না বলে তাঁকে বস্‌তে ইঙ্গিত করলেন।

যে লোকটির সঙ্গে কথা হচ্ছে, তাকে সীতানাথ কোথাও দেখেছেন মনে হচ্ছে। লোকটি কোন্ সেক্‌সনের?—এই ভাবতে ভাবতে তিনি কথোপকথনে কান দিয়ে ফেল্‌লেন।

লোকটি বল্‌ছে—হুজুর আপনার ভরসা পেয়েই ত জেনানা, লেড়কা, লেড়কী সব এনেছি। তখন হুজুর মেহেরবাণী করে বলেছিলেন,—তোর কোনো ভাবনা নেই, টেম্পোরারী কোয়াটার হলে কি হয়—আমি বল্‌ছি তুই জেনানা নিয়ে আয়। কোম্পানী কিছু বলবে না।·· কিন্তু হুজুর আজ এই আট ঘণ্টা ওই ফারনেসে কৈলা ঠেলে-ঠেলে ঝল্‌সে বাড়িতে পা দিয়েছি কি তখনি মন্নুকে মায়ী কান্না লাগিয়ে দিল, বাচ্ছারা চিল্লাতে লাগল—কী, কোম্পানীর পেয়াদা হাম্‌লা শুরু করে দিয়েছে। কাল সবেরে কোয়াটার খালি করিয়ে না দিলে ডাণ্ডা মেরে ভাগাইয়া দিবে। হুজুর মা-বাপ—! এখন কোথায় দাঁড়াবো!

মল্লিক সাহেব একটু হাসলেন:—ও কোয়াটারটা তোমাকেই দেওয়া হয়েছিল ত?

—হুজুর, আমি আপনার গোলাম হয়ে মিথ্যে বল্‌ব কেন! কসম্ সে—

—তুমি নিজে ওখানে থাকো?

—জী হুজুর, আর কোথায় যাবো!

—কিন্তু লোকে বলে যে তুমি বাড়িতে থাকবার সময় পাও না। আর কথাটা ত মিথ্যে নয়। আব্দুল শেখও এর মধ্যে একদিন তোমার কোয়াটারে গিয়েছিল, তুমি জানো?

—হুজুর, এবারের মত গোস্তাকী মাফ করুন। আমি আব্দুল সাহেবের কাছেও মাফ চাইছি। চারদিকের এত ঝামেলা পড়ে গিয়েছিল যে আব্দুল সাহেবকে সেলাম দিতে পারি নি সময় মত।

অত্যন্ত শান্ত মিষ্ট কণ্ঠ স্বরে অনিরুদ্ধ মল্লিক বল্‌লেন—একটু হিসেব করে চল্‌লে তোমার বিপদ হবে না। কিন্তু—

—হুজুর, আর কখনও বেচাল হবে না। রোজ আগে যেমন হাজিরা দিতাম আব্দুল সাহেবের কাছে, এবার সেইরকম দিতে থাকব হুজুর। বাল্‌বাচ্ছা নিয়ে আপনার পায়ে পড়ে আছি, দোহাই আপনি একটু মেহেরবাণী রাখবেন।

অনিরুদ্ধ তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন—লোকটি আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করে বিদায় নিল।

—আপনার কি খবর ?

—আজ্ঞে—

—কাজ কিছু আছে ? না সমাচারদর্পণ।

—আজ্ঞে আপনি কি খুব ব্যস্ত ?

—আহা, কাজের কথা যদি থাকে বলুন।

—মানে, বড় মেয়েটি আমার বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে কি না।

—সম্বন্ধ স্থির করে বিয়ে দিলেই ত হয়। পাত্র পেয়েছেন ?

—আজ্ঞে পাত্রের সন্ধান করেছি, কিন্তু সামর্থ্যে কুলোচ্ছে না।

—কিরকম ছেলে ? কত চাহিদা ? আপনার ঘাটতি কত—এসব বলুন।

—ছেলেরা উচ্চ ঘর, বংশ যার নাম—

—বংশ টংশ থাক। স্বাস্থ্য কেমন,

—আজ্ঞে, সাধারণ।

—মানে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে, না, পারে না ? ধরা যাক পারে না। আয় করে কিছু ?

—আজ্ঞে পৈত্রিক জোতজমা।

—বুঝেছি, আলস্য ডিস্‌পেপ্‌সিয়া আর বদ্‌মেজাজ—। অন্য ছেলে খুঁজুন। স্বাবলম্বী, স্বাস্থ্যবান, গরীব হলেও ক্ষতি নেই। মানে আপনার ছেলেটির মত—না-হলেও কাছাকাছি। ওরকম ছেলে ত পাওয়া শক্ত।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সীতানাথ বল্‌লেন—আপনি ভরসা দিলে—

বাধা দিয়ে অনিরুদ্ধ বল্‌লেন—আমি ভরসা দেবার কেউ নই। আপনি মেয়ের বাপ। মেয়ে বড় হলে সৎপাত্রে দেওয়াই বিধি।

—আজ্ঞে, যে পাত্র দেখে রেখেছি সেও মন্দ নয়।

—ভালোমন্দের আপনি কি বোঝেন? যেমন বল্‌লাম সেরকম ছেলের হাতে যদি মেয়ে দিতে না চান আমার কাছে এ নিয়ে আর কথা বল্‌বেন না।

—না, না, সে কি কথা হুজুর! আপনার ভরসা ছাড়া কি আর দাঁড়াবার জো আছে!

—আর কোনো কথা আছে?

—আজ্ঞে!

—আচ্ছা তাহলে এখনকার মত নমস্কার।

—আজ্ঞে তাহলে পাত্র খোঁজ করব?

—হ্যাঁ, করতে পারেন। আচ্ছা, দেবজ্যোতি যেন অনেকদিন মানিকপুরে নেই!

—আজ্ঞে, এই আজ-কালের ভেতরেই এসে পড়বে।

—পড়াশুনো ভালো চল্‌ছে তার?

সীতানাথ থতমত খেয়ে বললেন—তেমন আর ভালো বলি কি করে হুজুর? মাতুলালয়ের ব্যাপার বোঝেনই ত!

অনিরুদ্ধ একটু চুপ করে থেকে বল্‌লেন—এনি হাও। যদি ও ডাক্তারীর কোর্স শেষ করতে না পারে, মানে, আপনার সামর্থ্যে ত কুলোবার কথা নয়, তাই বল্‌ছি—যদি অন্য কোর্স নিতে হয় তাহলে এখানে একটা চান্স নিতে পারত।

—আজ্ঞে সেইরকম হলেই যেন ভালো হয়।

—কি করে বুঝলেন ভালো হবে?

—আজ্ঞে হুজুর যখন বল্‌লেন।

—আপনি আমাকে বড্ড বোকা ভাবেন।

সীতানাথ জিভ কেটে কানে হাত ছুঁইয়ে বল্‌লেন—মাইরী, এই মাকালীর কিরে করে বল্‌ছি। হুজুর আমি যদি বেজম্মার বেটা হই ত অমন ভুল করি।

—আঃ, বড্ড তোষামোদ করেন।

—আপনি আমাকে কোতোল করলেও ওই সত্যি কথাই বল্‌ব হুজুর। আজ পর্যন্ত সীতানাথ মুখার্জির মুখে কেউ আজেবাজে কথা শুনেছে বল্‌তে পারবে না।

—আমি বল্‌ছি বলেই যে ভালো হবে এমন নয়—তারও একটা পছন্দ-অপছন্দ রয়েছে। যা খুশি তাই গড়ে তোলবার মত নরম কাদার তাল ত নয় সে ছেলে! তার অসাধারণ পার্শোনালিটী।

—আলবৎ হবে হুজুর, এই বলে গেলাম। ও ত আমারই পয়দা—! দেখে নেবেন আপনি। আজ তবে আসি হুজুর!

সীতানাথ বারান্দায় বেরিয়েই দেখলেন মন্দাকিনী থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে। তাঁকে বেরুতে দেখে এগিয়ে এল মন্দা—কেমন আছেন জ্যাঠামশাই!

—আপনি ভালো আছেন ত জননী!

—ওই দেখুন আপনি এরই মধ্যে আমাকে বুড়ী করে দিলেন ত!

—কেন, কেন?

—আপনি-আপনি করে মেয়ের সঙ্গে কথা বলে নাকি কেউ?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ মা।

—ওরা সবাই ভালো আছে জ্যাঠামশাই?

—হ্যাঁ!

—দেবিকাকে বল্‌বেন কাল বিকেলে যাবো।

—সে ত খুব আনন্দের কথা, নিশ্চয় যাবে বই কি মা।

—আচ্ছা, জ্যোতিদাদা কেমন মানুষ! সেই আমার অসুখের সময় একবার দেখে গেলেন তারপর আর কোনো খবরই নেই।

—আসবে বই কি, মানিকপুরে এলেই।

—আহা, আমি বুঝি জানি না। এর মধ্যে উনি দু-তিন বার এসে গেছেন। সব খবর রাখি জ্যাঠামশাই—আমার কাছে ফাঁকি দিতে পারবেন না আপনি।

সীতানাথের বাকশক্তি রহিত হয়ে গেল। এই একরত্তি মেয়ের কাছে শেষে তিনি এইভাবে ভূয়া প্রতিপন্ন হবেন!

তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে মন্দাকিনী বল্‌লে—চলুন দেউড়ি পার করে দিয়ে আসি, কুকুরটা আবার খোলা রয়েছে।

—তোমাদের কুকুটি খুব হুঁশিয়ার, বুঝলে মা! যেরকম দিনকাল পড়েছে তাতে কুকুরকে খুলে রাখাই দরকার।

মল্লিকসাহেবের কাছে জবাব পেয়ে সীতানাথ মোটেই প্রীত নন্। তবে ভাগ্যকে অস্বীকার করার মতো দুঃসাহস অনেকের থাকে না, সীতানাথের কাছে অনিরুদ্ধও ঠিক সেই অমোঘ ভাগ্যের মতোই অনিবার্য। মুকুলের জন্যে অন্য পাত্র দেখতে হবে, ওই ভাগলপুরের আধাজমিদার পরিবারের ছেলেকে অনিরুদ্ধ নাকচ করেছেন—অতএব! আরও একটা সিদ্ধান্ত সেই সঙ্গেই স্থির হয়ে গেল– দেবজ্যোতিকে আর ডাক্তারী পড়ানোর কোনোই দরকার নেই, অবশ্য আগেও ছিল না। তবু, সামান্য যুক্তি একটা ছিল—ভাগলপুরের ওঁরা মুকুলকে বধূ হিসেবে বরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন, তার বদলে দেবজ্যোতিকে জামাইরূপে পাওয়াটা সর্ত ছিল। আর জামাই হলে ত শুধু হবে না—তাঁরা চান ইঞ্জিনিয়ার কিম্বা ডাক্তার জামাই। তা চাইতেই পারেন, কারণ প্রচুর খরচ করবেন মেয়ের বিয়েতে।···এখন দেখা যাচ্ছে মল্লিকসাহেবের প্রসন্নতার নগদ মূল্যটা অনেক বেশী লোভনীয়। অতএব সীতানাথ ভাগলপুর পর্বে পূর্ণচ্ছেদ টানতে পারেন স্বচ্ছন্দে।

এই হিসেবটুকু মনে মনে কষছিলেন সীতানাথ মল্লিকসাহেবের বাংলোর বারান্দা থেকে নামার আগেই। তাঁর পাশে মন্দাকিনী রয়েছে, তার সঙ্গে কথাও কইছেন কিন্তু তাতে সীতানাথের চিন্তায় বিঘ্ন ঘটেনি।

হঠাৎ যখন মন্দাকিনী বল্‌ল—কাজটা আপনাদের ঠিক হবে না জ্যাঠামশাই!

সীতানাথ অন্যমনস্কভাবেই বল্‌লেন—কি কাজ!

—এই জ্যোতিদাদাকে কারখানাতে ঢোকানো। বেশ ত ডাক্তারী পড়ছেন উনি। আর ক' বছর পরে আমাদের মানিকপুরে একজন ভালো ডাক্তার হবে। কত ভালো হয় সেটা। আর, কারখানাতে ইঞ্জিনিয়ারদের গুঁতোগুঁতি—ও আমার ভালো লাগে না।

সীতানাথ একটু থেমে বল্‌লেন—সংসারে সবকিছুই ত আর মনের মতো হয় না মা!

মন্দাকিনী জিমি কুকুরটাকে আদর করতে করতে সীতানাথের সঙ্গে মোরাম ছড়ানো পথে চল্‌ছিল। গম্ভীর হয়ে থেমে গেল—সব কিছু কেউ আশাও করে না, তবে দু-একটা ক্ষেত্রে আশা ছাড়তে চায় না। আপনি হয়তো জানেন না যে, জ্যোতিদা ডাক্তার হ'তে পারলেই সবচেয়ে খুশী হবেন।

মন্দাকিনীর ধারণা তার বাবা যেরকম ভালোবাসেন মন্দাকিনীকে, সীতানাথ তাঁর ছেলেকে অন্ততঃ ততখানিই স্নেহ করেন। সীতানাথের কাছে ছেলের মতামতের কিছু মূল্য আছে এই বিশ্বাসেই কথাগুলো বল্‌ল মন্দাকিনী।

সীতানাথ থমকে দাঁড়ালেন—নিজের ইচ্ছেটাই বড়? আর কারুর কথার দাম থাকবে না। তুমি কি তাই বল্‌ছ মা জননী! বিশেষ করে তোমার বাবা, তিনি যেখানে চাচ্ছেন ওকে এখানে আন্‌তে, সেখানে ত আর কোনো কথাই উঠ্‌তে পারে না।

মন্দাকিনী নিজের মত প্রকাশে কোনো দিনই বাধা পায় নি। কাজেই সীতানাথের কথার জবাবে সোজাসুজি বল্‌ল—বাবা ভুল করছেন বলে আপনিও করবেন? আমার বাবা চিরকাল কলকব্জার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এসেছেন, তিনি ত চান দুনিয়ার সবাই তাঁর মতো হোক। কিন্তু মানুষ ত আর ছাঁচে ঢালাই করা লোহা নয়!

সীতানাথ চম্‌কে উঠ্‌লেন; মেয়েটা বলে কি! কতই বা বয়স হবে মন্দার। নেহাৎ মল্লিক সাহেবের মেয়ে—নইলে নির্ঘাত একটা চড় কষিয়ে দিতেন সীতানাথ। অতি কষ্টে নিজের মেজাজটা সামলে নিয়ে তিনি বল্‌লেন—তুমি

মা ছেলেমানুষ। এসব কথা বোঝবার বয়স হয়নি। বড়দের কথায় না থাকাই তোমার ভালো। তাছাড়া দেবু আমাদের ছেলে, তাকে আমি যা বল্‌ব সে তাই করবে।

মন্দাকিনী অত সহজে ছাড়বার মেয়ে নয়। ও বল্‌ল—তাঁকে যতদূর জানি তাতে আমার বিশ্বাস কারখানার কাজ তাঁর মেজাজের সঙ্গে মোটেই খাপ খাবে না।

সীতানাথের আশঙ্কা হলো, মন্দাকিনী এই কথাগুলো মল্লিক সাহেবের কাছেও বল্‌বে। অদূরে মেয়ের কথা শুনে যদি মল্লিক মত বদলায় তাহলে সমূহ সর্বনাশ। তাই তিনি বল্‌লেন—আরে না না! আগে ত সে কারখানাতে ঢোকার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আমি আর ওর মামাই জোর করে ডাক্তারীতে ভর্তি করে দিই। সত্যি বল্‌তে কি এখনো পড়াশুনাতে মন বসাতে পারে নি। তা ছাড়া সেখানে ওর মামাবাড়ির লোকেরা তেমন নয়—দিনরাত ফায়ফরমাস খাটায়। দেখেছ ত ছেলেটা কেমন ভালোমানুষ, মুখের ওপর 'না' বলা ওর কুষ্টিতে লেখে নি। তার ফলে পড়াশুনা ত গোল্লায় গিয়েছে। এর ওপর আছে ছাত্রআন্দোলন—সবদিক দিয়ে বিবেচনা ক'রে তাই এ ব্যবস্থাটা হলো, ভালোই হলো! দেবু ত খুব খুশী হয়েছে। এসে পড়ল বলে আজকালের মধ্যে।

সীতানাথ নিজের বানানো কথাগুলো বলে যেন মনেমনে খুশী হ'লেন। মেয়েটা নিশ্চয় এবার স্বর পাল্টাবে।

কিন্তু মন্দাকিনী সংশয়ের সুরে বল্‌ল—আমি কিন্তু অন্যরকম শুনেছি।

কথায় কথায় বাংলোর দরজা পর্যন্ত ওঁরা এসে পড়েছেন। সীতানাথ ক্ষুব্ধ স্বরে বল্‌লেন—তুমি মা জননী কি শুনেছ তা জানি না। লোকে ত কারুর ভালোটা দেখতে পারে না। ওসব বিশ্বাস ক'র না। আমি ঠিকই বল্‌ছি। পিতামাতা হয়ে ত কেউ সন্তানের খারাপটা চায় না—কি বলো, চায়?

মন্দাকিনী বিষণ্ণ স্বরে বল্‌ল—তা চায় না। তবে আপনি একটু দেখবেন, জ্যোতিদাদার ক্ষতি হলে আমাদের মন খারাপ হবে, তাই বল্‌ছি।

আবেগে মন্দাকিনীর কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে এলো।

সীতানাথ আশ্বাস দিলেন—সে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। আচ্ছা মা আসি আজ। আর ছ্যাখো, এ নিয়ে তোমার বাবাকে কোনো কথা বলা ঠিক হবে না, বুঝেছ!

মন্দাকিনী গেট বন্ধ করে চলে যেতেই সীতানাথ পথ চল্‌তে লাগলেন। রাগে তাঁর মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করছে। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন, দেবজ্যোতির পক্ষ নিয়ে মন্দাকিনীর কাছে কেউ ওকালতী করেছে। আর যতদূর অনুমান হয় মুকুলই এর মূলে রয়েছে। মুকুল ছাড়া এরকম দুঃসাহসের কাজ অন্য কেউ করতেই পারে না। নিজের বিয়েটাই ওর কাছে বড় হল? আর গোটা সংসারটা ভেসে যাক! ছি-ছি-ছি!

আরও একটা খোঁচা সীতানাথের মনে খচ্‌-খচ্‌ করছে—মন্দাকিনীর কথাবার্তার ধরন। এরকম বেপরোয়া মেয়ে তিনি আর ছ্যাখেন নি। অনায়াসে তাঁর মুখের ওপর তর্ক ক'রে গেল মেয়েটা অথচ সীতানাথ কিছু বিহিত করতে পারলেন না। গায়ের জ্বালা কি সাধে হয়! এইরকম একটা নির্লজ্জ মেয়ের কাছে মুকুল এসে ঘরের সব কথা ফাঁস করে দিয়ে গেছে!

সমস্ত উষ্মাটা সীতানাথের কেন্দ্রিত হ'লো মুকুলের উপর।

তিনিও অল্পে ছেড়ে দেবার পাত্র নন্‌,—মুকুলের মত দজ্জাল মেয়েকে শায়েস্তা কি ভাবে করতে হয় সীতানাথ তা ভালো ক'রেই জানেন। বলে, কারখানার ত্যাঁদোড় কুলিখালাসীরাই তাঁর কাছে জব্দ থাকে, এ ত ঘরের মেয়ে!

দূরে সিনেমা হাউসের লাউড্‌ স্পীকারে গান চল্‌ছে। গানের বাণী এবং সুরের ভঙ্গী দুইই লঘু চালের—বন্‌কী চিড়িয়া বন্‌মে বন্‌বন্‌। পাশের কুলী মহল্লায় এক-এক ঘরে এক-একটি গানবাজনার আসর—কোথাও তব্‌লা, হারমোনিয়মের সঙ্গে গজল চল্‌ছে, কোথাও বা ঢোলক-মাদল বাজ্‌ছে। ওরই মধ্যে থেকে কচিছেলের কান্নার মিহি সুরও কানে এসে পৌঁছচ্ছে। ধোবিমহল্লায় জমাট আসর বসেছে—মাদল, মাতন, গানের-অনুকরণে বেসুরো কোলাহল। মারামারি খুনোখুনি মাঝে মাঝেই হয়, তবু এ আসরের মজলিস্‌ জম্‌জমে হয়ে আছে।...সীতানাথ পথ দিয়ে যেতে যেতে সবই দেখ্‌চেন শুনছেন কিন্তু

তাঁর মনকে কিছুই স্পর্শ করতে পারছে না, তিনি ক্রমশঃ অধীর হয়ে পড়ছেন, পথের দূরত্বটা কম্‌ছে না যেন।

বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়েই হাঁকলেন সীতানাথ—দোর খোল্‌—।

ভাবছিলেন সীতানাথ, যদি মুকুল দরজা খুল্‌তে আসে ত চুলের মুঠিটা এমন ভাবে ধরবেন যে—। চোখের সাম্‌নে মুকুলের অসহায় মুখচ্ছবি ফুটে উঠ্‌ল। না, সীতানাথ আর বরদাস্ত করবেন না—কিছুতেই নয়। এইসব মেয়েলি চক্রান্তই পরিবারের যত সর্বনাশ ডেকে আনে। আইবুড়ো মেয়েরা যে এত স্বার্থপর হয় তা কে জান্‌ত? বসে বসে বাপের অন্নধ্বংস করছে আর মনে মনে প্যাঁচ পাকাচ্ছে কি ক'রে বাপ-ভাইকে ডোবাবে—। সীতানাথ দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করেন—একবার দরজাটা খুলুক—।

খিল খুলে সাম্‌নে দাঁড়াল দেবজ্যোতি। সীতানাথের উদ্যত ডানহাতখানা চিত্রার্পিতের মত মধ্যপথে নিশ্চল।

দেবজ্যোতি হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে পিতার বিস্ময় লক্ষ্য করল। সীতানাথকে সে ভরাট গলায় মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লে—আপনার শরীর কি তেমন ভালো নয়, বাবা?

সীতানাথ দমকা ঝড়ে নিমেষে নিভে গিয়েছেন। কোনো কথা তাঁর মুখে জোগাচ্ছে না। মন্থর গতিতে বাড়িতে প্রবেশ করলেন, এ যেন অপরের অধিকৃত এলাকায় তিনি পা দিয়েছেন। এখানে তাঁর অখণ্ড প্রতাপ-প্রতিপত্তিকে খর্ব রেখে নির্জীব জীবনযাত্রা করতে হবে—এমনই একটা অলিখিত নির্দেশ এই বাড়ির সর্বত্র মাখিয়ে দিয়েছে কে।

ইদানিং দেবজ্যোতিকে দেখ্‌লেই সীতানাথের এইরকম অস্বস্তিকর আশঙ্কা জাগে। দূরে দূরে যতক্ষণ দেবজ্যোতি থাকে ততক্ষণ সীতানাথ প্রবল শাসক, কঠোর পিতা—কিন্তু সাম্‌না সাম্‌নি তিনি শক্তির অভাব বোধ করেন।

জুতো খুল্‌তে খুল্‌তে প্রশ্ন করলেন—তারপর, হুট্‌ ক'রে এলি যে,—ওখানকার সব খবরাখবর ভালো?

শেষের প্রশ্নের জবাব দিল দেবজ্যোতি—না ছোট মামীমার শরীরটা ভালো নয়।

—তোর ছোট মামীর কথা আলাদা। বড়লোকের বেটী, আবার বড়লোকের বৌ—তার শরীর ত ভালো না থাকাই সম্ভব। তা এসেছিস ভালো হয়েছে। ভাবছিলাম চলে আসবার জন্যে পত্তর দেবো। বল্‌তে বল্‌তে ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে মুকুলকে খুঁজ্‌লেন!

দেবজ্যোতির মা এঘরে ঢুকে পুত্রকে বল্‌লে—হ্যাঁ রে, বলা নেই কওয়া নেই, এই এসেই আবার রাতের গাড়িতেই যেতে হবে? কাল সকালে দু-মুঠো ভাতেভাত মুখে দিয়ে গেলেই ত বেশ হ'ত!

সীতানাথ বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করেন—রাতের গাড়িতে আবার কে কোথায় যাচ্ছে?

দেবজ্যোতি বল্লে—ছোট মামীমাকে নিয়ে খুব মুস্কিল হয়েছে,—এখন তিনি আঁতুড়ে গেলে ছেলেমেয়েগুলোকে কে দেখাশুনো করবে—তাই মুকুলকে ক'দিনের জন্যে ওখানে—।

—বুঝেছি। একজন গিয়ে লেখাপড়ার নামে বাজার সরকারী করছেন—ডাক্তারী পড়ছে না হাতী। আবার এর ওপর বিনিমাইনের বাঁদী চাই—যাও, নিয়ে যাও ধিঙ্গী বোনকে। ওসব বেলেল্লাপনা হবে না, এই বলে দিলাম।

এক নিশ্বাসে ঝড়ের বেগে কথাগুলো বল্‌লেন সীতানাথ—ফলাফল পরীক্ষা করবার জন্য কারুর দিকে তিনি তাকালেন না, বিড়ি ধরিয়ে মোড়ার ওপর চেপে বসলেন, ঘাড় গুঁজে। প্রতিপক্ষের কোনো জবাব না পেয়ে তিনি বিড়-বিড় করতে লাগ্‌লেন—ঝি চাকরের দরকার তা গ্যাঁটের কড়ি খসিয়ে মাইনে দিয়ে লোকজন রাখলেই পারে। যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন এ সংসার আমার সংসার—এতে যে নাক গলাতে আস্‌বে—

দেবজ্যোতি উত্তেজিত হ'লেও তার কণ্ঠস্বর বিন্দুমাত্র উচ্চতর হয় না, সে বল্‌তে লাগ্‌ল—আপনি শুধু-শুধু ওঁদের নামে অপবাদ দিচ্ছেন বাবা।

—থাক-থাক তোমাকে ওকালতী করতে হবে না। আমার চেয়ে তুমি বেশি বোঝো? ডেঁপো ছোকরা কোথাকার—

—মুকুলকে নিয়ে যাবার কথা ওঁরা ত বলেন নি। ও বাড়িতে থাকি, চোখের ওপর ভাইবোনের কষ্ট দেখে, আমি নিজে থেকেই মুকুলকে নিতে এলাম—তাতে 'দাসী-বাঁদী' ওঠে কি করে, আমি ত বুঝি না।

সীতানাথ উঠে দাঁড়িয়ে মেঝেতে পা ঠুকে বল্‌লেন—বেশি ওস্তাদী করতে আসিস নে। কারুর যাওয়া হবে না। তোমাকেও আর ওই মতলববাজদের খপ্পরে যেতে দেবো না। কারখানায় চাকরী করি বলে কি বাপ নই আমি? যে যা খুশি ক'রে বেড়াবে?

দেবজ্যোতির মা সসঙ্কোচে বল্‌লেন—সময়ে অসময়ে ওরা আমাদের অনেক ত করেছে। না-হয় মুকুল দিন কয়েকের জন্যে গেলই—। ওদের এই বিপদের সময় খোকা নিজে যখন নিতে এসেছে, এবার না হয় যাক। এর পর আর না গেলেই হ'ল।

সীতানাথ গর্জন করে উঠ্‌লেন—না-না! স্ত্রী বুদ্ধির পরামর্শে চল্‌লে কোম্পানীর কারখানার রোজগার করে খেতে হ'ত না এই শর্মাকে। চোখের ওপর দেখ্‌চ ছেলেটাকে ক'দিনে পর করে ফেলেছে—এখন ত নিজের বাপমায়ের কথা ভাবে না, আপন হয়েছে ওর মামা-মামী। এর পর ওখানে বেশিদিন থাক্‌লে বুড়ো বয়েসে খেতে দেবে না। ওসব বুঝে নিয়েছি।

দেবজ্যোতি ওই ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে যে ভাবে পায়চারী কর্‌ছ তাতে মনে হচ্ছে খাঁচার মধ্যে কোনো সিংহকে যেন চাবুক মেরে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে কেউ।

সীতানাথ চুপ করবার পর আর কেউ কথা বল্‌ল না। দরজার সম্মুখে মুকুল, মল্লিকা, দেবিকা এসে দাঁড়িয়েছে।

সহসা দেবজ্যোতি বল্‌লে—আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন পড়া আমি ছাড়ব না। কারখানার চাকরী—মানিকপুরের এই ঘানিতে আমি গরু হয়ে থাকতে পারব না। সব খবরই আমি পেয়েছি—ওসব হবে না জেনে রাখুন।

—বিদ্বান হয়ে বাপ্‌কে গরু বল্‌তে শিখেছিস ওরে হারামজাদা! কারখানার গরু আমি!

ব'লেই সীতানাথ দেবজ্যোতির গালে চড় বসিয়ে দিলেন।

মুকুল ছুটে এসে সীতানাথ আর দেবজ্যোতির মাঝখানে দাঁড়াল। দেবজ্যোতি একটু হাসল, বল্‌লে—ছিঃ মুকুল, তোর এটুকু আস্থা নেই আমার ওপর।

মুকুল সরে দাঁড়াল। তারপর বল্‌লে—চলো দাদা এখান থেকে।

—হ্যাঁরে রান্না হয়েছে?

বিস্মিত মুকুল যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। দাদার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—তুমি এখন খাবে?

—নইলে এ গাড়ি ধরা যাবে না রে। আর খেয়ে না নিলে পথে কষ্ট হবে তোর, হাতে ত তেমন পয়সা নেই। তা ছাড়া পথেঘাটে আজেবাজে সব খাবার! আমরা সবাই একসঙ্গে খাবো—চল্। ব'লে দেবজ্যোতি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সীতানাথের চোখের সাম্‌নে পৃথিবীটা যেন প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে। তিনি আবার মোড়ার উপর বসে পড়ে ভাবতে লাগ্‌লেন—কোনো একটা উপায় খুঁজে বার করতেই হবে যা দিয়ে দেবজ্যোতির এই উত্তুঙ্গ অবজ্ঞাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারেন তিনি। উঃ, এত দম্ভ!

সীতানাথের স্ত্রী চাপা গলায় বল্‌লেন—ছি-ছি-ছি। যুগ্যি ছেলের গায়ে হাত তুল্‌তে গেলে কি আক্কেলে। এখন ওকে সাম্‌লাবে কি ক'রে।

সীতানাথ ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন—যাও, কানের কাছে ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করতে হবে না। আদর দিয়ে দিয়েই মাথাটি তোমরা খেয়ে রেখেছ। ও ছেলে উচ্ছন্নে গিয়ে বসে আছে। নইলে, বাপ্‌কে গরু বলে!

—এখনও, বাবাবাছা ক'রে বুঝিয়ে বল্‌লে দেবুর রাগ পড়তে পারে, কিন্তু তোমাদের বংশের ওই রাগটুকু এমনি যে, একবার জেঁকে বস্‌লে আর ত রক্ষে নেই। ওগো, মাথাটা ঠাণ্ডা করো। ব'লে সীতানাথের স্ত্রী আঁচলে চোখ মুছতে লাগ্‌লেন অসহায় ভাবে।

—আঃ, মেয়েমানুষের জাত কেবল কাঁদতেই পারো, একটু শক্ত হয়ে ছেলের অন্যায়টুকু তাকে বুঝিয়ে দেবার মুরোদ ত নেই! ক্যানো গিয়ে বলো না পিতাস্বর্গ পিতাধর্ম—!

—থামো, থামো আর শাস্তর আউড়ে বিদ্যে ফলাতে এসো না। ওতো আর তোমার মুখ্যু মাগ নয় যে লাথি হজম ক'রে পায়ের তলায় পড়ে থাকবে। যে ছেলের চোখমুখ হয়েছে, যে লেখাপড়া শিখেছে তাকে তুমি কি বলে চড় মারলে। আমার যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে!

সীতানাথ আর কোনো কিছু ভেবে না পেয়ে ছুটে রাস্তার ওপর বেরিয়ে গিয়ে চীৎকার শুরু করলেন—আমাকে গরু বল্‌লি—গরু বলে আমায় মাথায় জুতো মারলি—। এত তোর বিদ্যের দম্ভ! আজ গরু বল্‌ছিস, কাল আরও যে কী বলবি তাই ভেবে তাজ্জব মেরে যাচ্ছি। ওরে আমার বিদ্বান্‌ ছেলে রে! আমি গরু, মানিকপুরের সবাই গরু!

সীতানাথের স্ত্রী কেবলই বল্‌ছেন—আঃ; কি করছ। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? ভেতরে এস।

—তুই থাম্‌ মাগী! দেখ্‌চিস ত চোখের ওপর ভাইবোন সবকটা একজোট হয়ে আমাদের অপগেরাহ্যি করছে। এ চোখের জল বৃথা যাবে না—আমার বাপ-পিতেমো ত্রিসন্ধ্যা করতেন, নিষ্ঠাবান নৈকষ্যি কুলীনের ব্যাটা আমি—এই বলে দিলাম। সর্বনাশ হবে।

সীতানাথ ভাবলেন, তাঁর পিতৃপিতামহের পুণ্যশক্তি সীতানাথকে প্রভূত সহায়তা করবে কিন্তু দেবজ্যোতির পিতাকে কেউ নিষ্ঠাবান অপবাদ দিতে পারবে না অতএব দেবজ্যোতিকে সাহায্য করতে কোনো দৈবশক্তিই আসবে না।

তবুও দেখা গেল, মিনিট দশেকের মধ্যেই দেবজ্যোতি একটি বাক্যব্যয় না ক'রে বেরিয়ে গেল—মুকুলকে সঙ্গে নিয়ে। সীতানাথ প্রণাম নিলেন না, দেবজ্যোতির মা মুখে যা বলা যায় না করুণ দৃষ্টিতে তা ব্যক্ত করলেন। মল্লিকা আর দেবিকা দাদা দিদিকে প্রণাম করে বল্‌লে—কালই চিঠি দিয়ো পৌঁছে!

সীতানাথের আস্ফালন নিস্ফল আক্রোশে দংশন ক'রে ক'রে নিজেকে ক্লান্ত করে ফেলেছিল। কিন্তু দেবজ্যোতি আর মুকুল চলে যাবার পর আবার সীতানাথ চেঁচামেচি শুরু করলেন। তাঁকে আশপাশের প্রতিবেশীরা এই অল্প দিনেই চিনে নিয়েছে—কেউ খোঁজ করতে এল না একবারও।

গভীর স্তব্ধ রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ল তখনও দেবজ্যোতির মা কাঁদছিলেন—তাঁর সে অশ্রুতে কোনো অভিযোগের বিষ নেই, ভীরু স্নিগ্ধ মাতৃস্নেহ তরল শান্তিবারির মত অবিরল ঝরছে। সে অশ্রু কল্যাণ কামনা করছে—স্বামীর, পুত্রের, কন্যার, সকলের মঙ্গলবিধায়িনী সেই নিশীথ রাত্রির চোখের জল। হয় ত এই অশ্রুর স্নিগ্ধ স্পর্শেই সীতানাথও ঘুমিয়ে পড়েছেন। দেবজ্যোতি আর মুকুলের পথও হয়ত নিরাপদ হবে—পিতার অভিশাপ থেকে রক্ষা করবে এই মাতৃঅশ্রুধারা!

তের

ধর্মঘট একে বলা চলে না। অথচ একেবারে যে ধর্মঘট নয় তাই বা বলি কি ক'রে। শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করবে মতলব ছিল আগামী পরশু, কিন্তু কোম্পানীর বিরাট লোহার দরজায় মোটা শিকল পরিয়ে বড় বড় কয়েকটা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে কে! কারখানা বন্ধ হ'য়ে গেছে।

আপনাআপনিই কি বন্ধ হ'ল? গেটের বাইরে লোক গিজ্ গিজ্ করছে! প্রবল উত্তেজনায় জনসমুদ্র উত্তাল—। কি হবে উপায়? বাংলা, হিন্দী, পুস্তু এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিচিত্র ভাষায় পরস্পর আলোচনা আর মুখ চাওয়াচাওয়ি চল্‌লো। এমন একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কার জন্য কেউ তৈরী ছিল না। দরজা বন্ধ। কাজ বন্ধ। কারখানায় তাদের ঢুকতে দেওয়া হবে না!

কেউ কেউ হতাশ। কি হবে উপায়? কোম্পানীর কারখানা যে ষোলআনা মালিকদের সম্পত্তি সেটা এতদিন জানা থাক্‌লেও এরকম রূঢ় সত্যের আকারে প্রকট হয়ে ওঠে নি। কোথায় যেন একটা অধিকারের মোহ জড়ানো ছিল শ্রমিকের মনে। তাদের মনের মধ্যে গোপনে যে মমতা ছিল এই লৌহ-দানবের প্রতি, তা যে এমনি ভাবে ধাক্কা দিয়ে কেউ কোনো দিন ঠুন্‌কো কাচের পাত্রের মত ভেঙে চুরমার ক'রে দিতে পারে সেকথা কেউ ভাবে নি। আশ্চর্য এদের অযান্ত্রিক সত্তা। যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিদিন এত ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে তবু এদের মনেই বোধকরি মানবসত্তার মৌলিক উপাদান সবচেয়ে বেশি। এরা সহজে ভালো বাস্‌তে পারে, এরা পারে বিশ্বাস করতে, এরাই রুষ্ট হয়ে খুনজখম করতেও অদ্বিতীয় নিজের বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখবার সংকল্পে। এদের মনের পাগলামীকে শিকল পরাবার মতো শিক্ষা কেউ দেয় নি। যান্ত্রিকতার চরম প্রতিবাদ এদের স্বভাবে। তবু এরাই যন্ত্রের আপন জন। এরা যান্ত্রিক!

দু-দিন আগে যারা ধর্মঘট করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল আজ তাদের মুখের ওপর কারখানার দুয়ার রুদ্ধ হয়ে যাওয়াতে তারা যতখানি বিস্মিত হয়েছে

তারচেয়ে অনেক বেশি আঘাত পেয়েছে। প্রভাতের প্রথম আলোতে এরা অনুভব করল, কারখানার বয়লার, ফার্নেস, চিম্‌নী, বেল্‌চা, একটুক্‌রা নাট-স্ক্রু-পিন পর্যন্তও শ্রমিকের আত্মীয় নয়। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমরা দিনমজুর। কারখানায় যারা দৈনিক হাজিরা দেয়—যাদের গলার সঙ্গে কাগজের চাক্‌তী লট্‌কানো থাকে, যাদের প্রতিটি মুহূর্তের জীবনীশক্তি বিক্রয় ক'রে নিজের রুটির সওয়াল করতে হয়, যাদের মাথার ঘাম কপাল থেকে মাটিতে পড়বার আগেই আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপে শুকিয়ে যায় তারা মনে প্রাণে জানে যে তারা দিনমজুর। তবুও মানুষের বিচিত্র মনোগঠনের প্রভাবে তারা একটু আশা রাখে যে এই লোহার কারখানাতে, এই আগুনের উত্তাপের মধ্যেও কোথায় যেন আত্মীয়তার সুর আত্মগোপন ক'রে আছে। কিন্তু কী ভুল, কি ভুলই তাদের হয়েছে! একটি লহমায় শ্রমিকের মনের সামান্য সেই আত্মীয়তার বিশ্বাস ঘুচে গেল।

কারখানার সেই কানের পর্দাফাটানো কর্কশ বাঁশী আজ বারেকের জন্য বাজ্‌ল না। তবু শয়ে, শয়ে, হাজারে হাজারে শ্রমিক এসে হাজির হয় কারখানার ফটকের সাম্‌নে।

জনসমুদ্র মন্থন করে একটিমাত্র প্রশ্ন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে—ফেডারেশন কি করতে চায়? ফেডারেশনের নেতা কোথায়—তার নির্দেশ চাই।

এমন সময়ে 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনিত হল—তারপর 'ইন্‌কিলাব-জিন্দাবাদ—ইন্‌কিলাব-জিন্দাবাদ'।

কার কণ্ঠস্বর? কণ্ঠস্বর যারই হোক তাতে কিছু আসে যায় না, পথপ্রদর্শনের ইঙ্গিত এসেছে এই সমবেত মানুষের মধ্যে থেকে। অতএব তার জবাবে এক কণ্ঠে সমগ্র জনতা সাড়া দিল—বন্দেমাতরম্‌, ইন্‌কিলাব-জিন্দাবাদ! সারথী, ইস্‌মাইল, নিরঞ্জন ঘোষালকে দেখা যাচ্ছে। কয়েকজনে মিলে তাদের ঘাড়ের ওপর দায়িত্ব তুলে ধরেছে। তারা বল্‌ছে—কোম্পানী দরজায় তালা বন্ধ করেছে। দুষমনেরা ভয়ের চোটে দরজা বন্ধ করে বসে আছে। কিন্তু আমরাও দেখে নেবো! ভাইসব আমরা যেন আমাদের পায়ে কুড়ুল না মারি, সেটা খেয়াল রেখো। যদি কোনো বেইমান, ওই কুকুরের ডাকে

সাড়া দেয় তাকে আমরা পিঁপড়ের মত পায়ের নখের চাপে টিপে মেরে ফেল্‌ব, এই জেহাদ। আর আমাদের এই জেহাদ যে, আমাদের জান্‌ কবুল করে এই কুত্তা কোম্পানীর টুঁটি টিপে হক-মাফিক পাওনা আদায় করব। আমাদের এই ফেডারেশন এখন সারা ভারতের মধ্যে খুব বড় একটা শ্রমিক সমবায়। অতএব আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে যে, দুনিয়ার কাছে আমাদের এই একতার নিশান উঁচু করে তুলে রাখতে হবে।

আমরা জানি, খুব শীগ্‌গিরই ওই লোহার দরজা খুলে কোম্পানী আমাদের পায়ে ধরে সাধাসাধি করে ডেকে আন্‌তে দিশে খুঁজে পাবে না। আমরা জানি যে আজকের এই হুম্‌কী, আজকের এই চোখ রাঙিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া সব কিছুই একদিন পথের ধুলোতে লুটোপুটি খাবে। আমরা যদি শক্ত থাকি, আমরা যদি সারা ভারতের মজুর ভাইদের প্রাণের ভাই হই, তাহলে বুক ফুলিয়ে ওই রাঙা চোখের রঙ্‌বাজীকে ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে পারব। আমাদের হাতে ফারনেসের আগুন জ্বলে। আমরা চিম্‌নীর ওপর দিয়ে যে ধোঁয়া উড়িয়ে দিই, তা দুনিয়ার বিধাতার নজরে পড়ে। আমরা না থাকলে ফারনেস নিভবে, ধোঁয়া আর উঠ্‌বে না—তখন কোম্পানীর বিধাতাদের চোখ আঁধার! কলিজার আগুন ঠাণ্ডা! তাই বল্‌ছি—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

প্রত্যুত্তরে ঢেউ উঠ্‌ল কণ্ঠে কণ্ঠে। আশার আলো জ্বল্‌ল চোখে-চোখে। হাসির রেখা ফুট্‌ল কঠিন হাড়-জড়ানো কালো-কালো গালের চাম্‌ড়াতে! হাপরের হাওয়া পেয়ে যেন চুপসে-যাওয়া মজুরের বুকগুলো গন্‌গনিয়ে উঠ্‌ল।

শ্রমিকনেতা এলেন, সেলুন গাড়িতে চড়ে। মানিকপুর স্টেশন থেকে জাঁকালো শোভাযাত্রা শুরু হ'ল, মহাসমারোহে তাঁকে অভ্যর্থনা করে ফেডারেশনের আপিসে আনা হ'ল। জনতার মধ্যে গুঞ্জন, খুব ভারী লীডার, কড়া কড়া ভাষণ দিতে পারেন এই স্বামীসাহেব! স্বামীর গতিবিধির সীমানার কোনো হদিস খুঁজে পাওয়া যায় না। একদিকে শ্রমিক মহলে তাঁর যেমন প্রতিপত্তি তেমনি সরকারের দপ্তরেও তাঁর দোর্দণ্ড দাপট।

ময়দানে বক্তৃতা হবে। এখনকার গোটা মানিকপুর বসতির প্রায় সবটাই মাঠ ছিল কিন্তু এখন ময়দান বল্‌তে বোঝায় বক্সীবাঁধের কাছে হাটতলার পাশের পোড়ো জমিটা। বেলা চারটেতে সভা হবে।

এত বড় সভা এখানে এর আগে কখনও হয় নি। বেলা দুটো থেকে লোক জমতে লাগ্‌ল। রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরে লুয়ের লেলিহান শাসনকে অনায়াসে উপেক্ষা করে শ্রমিকেরা এসে জম্‌ছে। তাদের সর্বসত্বায় প্রবল উত্তেজনা। নূতনত্বের আস্বাদ যেমন আকর্ষণ করছে, তেমনি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তাতে তারা অস্থির। সত্যিই কি তাদের কিছু সুরাহা হবে? কোম্পানী মানেই অসীম ক্ষমতাশালী একটা শক্তি। আর শ্রমিক মানে যে কী, তা তারা নিজের মধ্যেই ভালো করে জানে! ধর্মঘট ত কোম্পানীর এতদিনের চাকরীতে কেউ দেখে নি। আর তালাবন্ধ—সে ত আরও অভাবনীয় কাণ্ড! প্রত্যেকের মনে একটা আশঙ্কা উঁকি দিয়েছে—তবু বাইরে তার প্রকাশ নেই; কারণ, সেই প্রকাশের মধ্যে যে ক্লীব হীনতার পরিচয় রয়েছে! অতএব ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ! আর সবাই যদি শুকিয়ে মরতে ভয় না পায় তবে কি পৃথকভাবে একজনের ভয় পাওয়া উচিত? ছি! এই ছি-ছি গ্লানি প্রত্যেকটি মানুষকেই নিজের কাছে কুণ্ঠিত লজ্জিত করে, তাই তারা পরস্পরের একতার প্রতি আন্তরিক আকুতি নিবেদন নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

হাটতলার ময়দানের পথে চল্‌তে চল্‌তে অভিজিৎ-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ছটুলালের। ছটু নমস্কার করল—জয় রাম জী কী!

অভিজিৎ একটু লক্ষ্য করে দেখ্‌ল ছটুকে, তারপর হেসে বল্‌লে—জয় রাম জী কী! তারপর ছটুয়া তোমার বাড়ির খবর ভালো?

ছটুর মুখখানা হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে ওঠে,—আর ভালো! জরুটা ত মরবার দাখিল হয়েছে।

অভিজিৎ চিন্তান্বিত ভাবে বল্‌লে—তা এক কাজ করো, হাসপাতালে দিয়ে দাও।

—অস্‌পতালে দিলে ত ভয়েই মরে যাবে ও! আর সেখানে দিয়েই বা কি ফায়দা হবে—ডাকৃটর সাহেব ত তিনরকম সুই-এর ফিরিস্তি দিয়ে বসেছেন।

আর তার খাবারের ফর্দই কি কম? দুধ, মাখন, কলা, এইসব যত পারা যায়-না-যায়। সে ছেড়ে দিন, কিন্তু কাজের কথা ত শুনে লিই আপনার কাছে।

—কি শুন্‌তে চাস্ বল্!

—আর কী, আখেরের হাল্‌চাল্!

—আরে ভাই সে ত ভগবানের হাতে। তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই।

—কি জানেন মেম্বরসাহেব, আমরা বুর্‌বাক্ বুদ্ধু, কিছু বুঝি না, তাই এই ছট্‌ফটানী। আরও মুস্কিল আছে, পয়সা কামাতে না পারলে বৌটার আর বাচ্ছা দুটোর নাজেহাল—।

—আরে বাবা, আজ ত পহেলা রোজ, এখনই কিছু হবে না! এ লড়াই চল্‌ল এখন। দু-দিনে যদি কম্পনী নরম হয়ে যায় ত গ্যালো, নইলে—।

—নইলে কী?

—দু-চার মাসও চল্‌তে পারে লড়াই!

—কিন্তু মেম্বরসাহেব! দু-দিন চল্‌বার উপায় নেই, কি খেয়ে দু-মাস লড়াই করবে সব?

—আরে বাবা, এ ত আচ্ছা জেরা! যদি না-ই চালাতে পারবে তবে ইউনিয়ন কিসের?

—ইউনিয়ন টাকা দেবে?

—দেবে। তা বলে কি আর যত খুশি দিতে পারবে? তবে হ্যাঁ, আমার-তোমার বিপদের সময়ে দেখ্‌বে বলেই না ফেডারেশন! আরে এই যে স্বামী-সাহেবকে দেখ্‌ছিস, এ হচ্ছে একেবারে আস্‌লী লীডার! দেখ্‌বি কেমন লেক্‌চার ঝাড়ে—!

ছোটুলাল উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌ল—আচ্ছা সিংজী! আমার জরুর বেমার ডাক্তারের খরচ চল্‌ছে না, তা ফেডারেশনের কাছে চাইলে কিছু পাবো না?

—পাবি! বেশ গুছিয়ে সব কথা লিখিয়ে একখানা দরখাস্ত ফেডারেশনে দিয়ে আস্‌বি। তারপর কৌশিস ভি করতে হবে।

—বহুৎ আচ্ছা!—বলে ছটুলাল স্বামীসাহেবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে—হাঁ, সুরৎ দেখেই মালুম হয়ে গিয়েছে যে দেওতার কৃপা ওঁর মধ্যে বহুৎ খুব আছে।

- অভিজিৎ সিংকে ময়দানের দিকে আসতে দেখে আরও অনেকে তার এপাশ ওপাশে জুটে গেল। আলাপ চলতে লাগল স্বামীসাহেবের প্রসঙ্গে। সেই সঙ্গে নানারকমের প্রশ্ন শুরু হ'ল,—আচ্ছা এই তালাবন্ধ অবস্থায় কারখানা কতদিন রাখতে পারে কোম্পানী? কারখানার ভেতর কি বাইরের লোক চালান করে আনিয়েছে নাকি? যদি আনিয়ে থাকে আর তাদের দিয়ে কাজ চালায় তবে কি উপায় হবে শ্রমিকদের?

অভিজিৎ সিং বিজ্ঞভাবে হেসে উত্তর দিল—ভাইসব, ঘাবড়াবার কিছু নেই। স্বামীসাহেবের ভাষণ শুনলেই আমাদের অবস্থা জানতে পারবে! তিনি যখন এসে পড়েছেন তখন আর কিছু ভাঁবনা নেই।

হাটতলার ময়দান জম-জমাট।

চারটে বাজতে যেন আর সবুর সইছে না! কোলাহল, গুঞ্জন, ছোটখাট উত্তেজনাকর খুচরো বক্তৃতা, আপোষে সমবেত জনতার মধ্যে চলছে। এরই মধ্যে কেউ-কেউ ছুটির দিনের নিয়ম পালন করেছে, একটু তাতরস পান করে। এইরকম একটি প্রৌঢ় বেশ কম্পিত কণ্ঠে শুরু করে দিল—মেরে প্যারে বহেনো ঔর বেরাদর, আজ এই ময়দানে আমরা যে সামিল হয়েছি তার জন্যে ফেডারেশন তরফ থেকে কত মজুরী মিলবে? ও শালা দুষমন কম্পনীর মুখে আমরা ঝাড়ু মারতে ত তৈয়ার আছি, আগর বড়া উম্‌দা এই ফেডারেশন বাহাদুর আমাদের মত এই গরীব দুনিয়ার ভালাই-এর জন্য ডবল-ডবল মজুরী মঞ্জুর করে ত আমরা ফেডারেশন বাহাদুরের জুতার সুখতল্লী হয়ে পড়ে থাকব। হাঁ বিশোয়াস না হলে ফেডারেশন বাহাদুর আপনা দালাল পেঠিয়ে চুপ-চুপসে খবর নিয়ে দেখুন।...

পিছন থেকে একজন জোয়ান ধমক দিল—চুপ, চুপ-যা শালা মাতোয়ালা! দারু পিয়ে হো?

প্রৌঢ়টি এবারে রক্তবর্ণ। চোখ দুটি ঘুরিয়ে মিনতিভরা কণ্ঠে বললে—ক্যা করুঁ, এতোয়ারমে এহি ত ধরম্!

তার একথায় একটা হাসির জোয়ার বয়ে গেল। জোয়ানটি গম্ভীর ভাবে বল্‌লে—মেরে হাড্ডি গুঁড়ো করে দেবো, উল্লু, বেয়াদপ বেসরম বেহুদা বেহেড্‌! ফূর্তির আর দিন মিল্‌ল না হারামীকে বেটা!

প্রৌঢ়টি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে দেখে বসে পড়ল—ক্যা তাজ্জব, ফেডারেশন বাহাদুরের কুদরতে লাখো লাখো ভিখমাঙ্গা সামিল হয়েছে। আরে বাস্‌রে! তামাশা ত জোর হবে!

জোয়ানটি বজ্রকঠিন হস্তে প্রৌঢ়ের গলা টিপে ধরে বললে—জানে মেরে দেবো, শালা চুপ করে বসে থাক্‌!

প্রৌঢ় স্তিমিত কণ্ঠে জবাব দিল—আঃ, ছাড়ো বাবা, গলা ছাড়ো। আচ্ছা বাবা, এই মারলাম আমার মুখে লাথি—চুপ! ব্যাস্—চুপ ত চুপ! তুমি বুঝি ফেডারেশন বাহাদুরের দালাল! বেশ, বেশ।—চুপ করছি বাবা! মৌজটুকু বিগড়ে দিস না বাপ আমার—দশ আনা পয়সা খরচা বেফয়দা হয়ে যাবে!

চারটে বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় সারথীকে দেখা গেল সভা-মঞ্চের ওপর! সারথী বল্‌লে—ভাইসব, শান্ত হয়ে বসুন। আর একটু পরেই আপনাদের সভার কাজ শুরু হবে।

ঠিক বেলা চারটেতে সভা আরম্ভ হ'ল। স্বামীসাহেব উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাত জোড় করে নমস্কার করে বল্‌লেন—ভাইসব, আজকের এই সভাতে নিরঞ্জন ঘোষালকে আমি সভাপতির আসন নিবেদন করছি। আপনারা সবাই 'হাঁ' বলুন।

নিরঞ্জন সকাল বেলাতে যেসব কথা বলেছিল এখনও সেইসব কথাই আবার বল্‌লে বক্তৃতায়। এর সঙ্গে আর বাড়তি যা বল্‌লে সে, তা হচ্ছে ফেডারেশনের ধর্মঘট করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে। সে বললে—আমরা আশা করেছিলাম যে কোম্পানীর কর্তারা আপোষে আমাদের সামান্য ক'টি দাবী মেনে নেবেন। আমরা চেয়েছিলাম যে, কোনো শ্রমিক যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তাকে ছুটি মঞ্জুর করা হোক, ছুটির মাইনে তাকে দেওয়া হোক। আমরা চেয়েছি যে, আমাদের মাথা গোঁজার মত জায়গা কোম্পানী দেবে। আমরা সারাজীবন

কোম্পানীর কলে চাকরী ক'রে বুড়ো বয়েসে যখন অকেজো হয়ে বেঁচে থাকব সেই সময়ে আমরা কি খেয়ে বাঁচব, সে কথাটাও কোম্পানীকে ভেবে দেখার জন্ম বলেছি আমরা। সেই সময়ের জন্যে যদি প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের ব্যবস্থা থাকে—তাহলে আমাদের গরু-ছাগলের মত পরের দয়ার দিকে তাকিয়ে থাকার দরকার হবে না বুড়োকালে, এই চেয়েছি। আর চেয়েছি ইন্‌ক্রিমেণ্ট—মাইনে বাড়ানোর কথা বলেছি আমরা। আমরা যা চাই তা হচ্ছে এই—মানুষের মতো আমরা বাঁচতে চাই। সেটা কি এমন কিছু অন্যায় ?

আমাদের এইসব ছোটখাটো দাবিদাওয়া জানাবার জোরালো ভাষা জানা ছিল না। যাঁরা সেরকম লেখাপড়া জানেন তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইতে গিয়েছিলাম আমরা। সেইসব মানুষ—যাঁরা আমাদের দাবিদাওয়া জানাবার ভাষাটুকু গুছিয়ে বলতে সাহায্য করেছেন—তাঁদের কোম্পানী জহ্লাদের মত ছাঁটাই করে দিয়েছে। সাতজন কর্মচারীকে বিনা কারণে কোম্পানী বরখাস্ত করেছে—কেন করেছে ? না, আমাদের সুখ-সুবিধা এতটুকু দিতে চায় না কোম্পানী। আমরা যে মানুষ, সেটুকু ওঁরা স্বীকার করতে নারাজ !

আজ স্বামী সাহেব আমাদের মাথার ওপর দাঁড়িয়েছেন এসে। ইনি আমাদের মজদুর দুনিয়ার ভালো করবার জন্য যে ব্রত নিয়েছেন, তার জন্য ভগবান তাঁর ভালো করবেন।

সব শেষে বক্তৃতা দিতে উঠলেন নিমন্ত্রিত নেতা স্বামীসাহেব। তাঁর গলার জোর আছে। তাঁর ভাষার বাঁধুনীও মজবুত। চল্লিশ মিনিট ধরে তিনি অনর্গল বক্তৃতা করে গেলেন।—আজই এই সভার পর তিনি ডিরেক্টরদের সঙ্গে মিটমাটের কথাবার্তা শুরু করবেন। যাতে মজদুরমহলের পুরো জিদ্ বজায় থাকে, তার জন্য তিনি লড়াই করবেন। ন'হাজার মজুরের ভাগ্যের দায়িত্ব বহনের যে গুরুভার তাঁর ওপর বিধাতা চাপিয়ে দিয়েছেন, সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবার জন্য যথেষ্ট শক্তি যাতে বিধাতা তাঁকে জুগিয়ে যান সেজন্য সমবেত জনতা প্রার্থনা করুক। বিধাতার এই বিরাট বিশ্বকারখানার তুলনায় কোম্পানীর কারখানাটুকু খেলনার চেয়েও ফ্যালনা—এ কথাটা কোম্পানীর

মালিক আর তার পেটোয়া তাঁবেদাররা যদি বুঝতে পারত, তাহলে কোনো ভাবনাই ছিল না ইত্যাদি।

বিকেল গড়িয়ে গিয়ে সন্ধ্যা নাম্‌ল। তবু সেদিন কারখানাতে ছুটির বাঁশী বাজল না। আজ আর ভারি-ভারি কালো জুতোর শব্দে পথের বুক কেঁপে উঠল না। তবে বসতি আর নিঝুম শান্ত নেই কোথাও। ঘরে ঘরে কলগুঞ্জন উঠছে। যে যার মহল্লায় জমায়েৎ। কোনোদিন, কোন ছুটির দিনেও কারখানার সব মজুর পুরোপুরি ছুটি পায় না। আজ যেন বস্তিগুলো ভর্তি হয়ে উপছে পড়বার উপক্রম হয়েছে! এই পূর্ণতার স্বাদ, এই প্রতিবেশীত্বের পরিপূর্ণ রূপ সকলকেই খুশি করেছে।

আলোচনা চলছে, গুজব রট্‌ছে নানারকম। আজ কিন্তু রামনাম কীর্তনের কোলাহল নেই, ওস্তাদী মজলিসের আসরে কেউ রেওয়াজে বসে নি—শুধু ফেডারেশন, স্বামীসাহেব আর মল্লিকসাহেবদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা চারিদিকে। রাত-দুপুরে শোনা গেল, ঠিকাদারের লরী বোঝাই দিয়ে পাঁচশ' লোক এসেছে কারখানা চালু করবার জন্য। আরও দু হাজার লোক আনাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এ সংবাদে অনেকের মুখ শুকিয়ে গেল।

কুলি-মহল্লা থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ' লোক ছুট্‌ল শ্রমিক ফেডারেশনের আপিসে—আজই এই রাত্রেই কারখানার সবগুলো গেটএর সাম্‌নে শয়ে শয়ে লোক মোতায়েন রাখতে হবে, যাতে বাইরের কোনো লোক কারখানাতে ঢুকতে না পারে। এমন কি, ভেতর থেকেও কাউকে বাইরে আসতে দেওয়া হবে না। যারা কারখানার মধ্যে রয়েছে, তারা না খেতে পেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে ওর মধ্যেই মরে যাক্, এই এদের ইচ্ছা।

ফেডারেশনের আপিসে ইস্‌মাইল, ঘোষাল, সারথী, অভিজিৎ এবং আরও অনেক লোক বসে ছিল। হঠাৎ এতগুলি লোককে এভাবে চেঁচামেচি করতে দেখে ইস্‌মাইল ধমক দিয়ে উঠল—তোমরা কি চাও? কোয়াতে কান নিয়ে গ্যালা এইকথা শুনেই তোমরা ক্ষেপে যাবে? কানে হাত দিয়ে আগে ভাখো! আরে বাবা, আমরা কি এখানে বসে ঘুমোচ্ছি? আগর গুজবগুলজারে

মাথা খারাপ করো ত ভাইসব বিলকুল বরবাদ হয়ে যাবে। আর যদি কাজ হাসিল করবার মতলব থাকে তবে চুপচাপ আপনার ঠাটে বসে থাকো। যখন যাকে যে কাজ বলবে ফেডারেশন, তখন সে সেই কাজ করবে। নিজে থেকে যদি সবাই আপনার মতলবে কিছু করতে যায়, তবে ন-হাজার মানুষের ন'শ নিরানব্বই মতলব হয়ে যাবে। আরে ভাই—

ওদিকে আরও লোক আস্‌তে শুরু করেছে। জনস্রোত। ফেডারেশন অপিসের সাম্‌নের পথটা সরগরম হয়ে উঠল।

সারথী এগিয়ে এল—ভাইসব, যে যার ঘরে ফিরে যাও। কোনো ভাবনা নেই। আমাদের লোক সব জায়গায় ছড়ানো রয়েছে। তোমরা ফিরে যাও, ভাইসব। এখানে হাল্লা করলে কাজের বড় অসুবিধে হবে। ঘরে গিয়ে আরাম করো তোমরা।

জনতার মধ্যে থেকে তুবড়ির ফুলকীর মত অগণিত প্রশ্ন ছিট্‌কে আসতে লাগল—কোম্পানী নাকি মিটিয়ে নিতে চাইছে? ক'হাজার লোক আনিয়েছে ঠিকাদার দালালদের দিয়ে? আমাদের জরু আর বালবাচ্ছাদের খাইখোরাকী চলবে কি করে? কোম্পানী কোয়াটার থেকে তাড়িয়ে দেবে লেবারদের, এ কথা কি সত্যি? ফৌজ আসছে সদর থেকে? গুলী চালাবে?—তখন স্বামীসাহেব পালিয়ে যাবেন না ত? আরও কত প্রশ্ন।

নেতাদের তীব্র তিরস্কারের তলে সব প্রশ্নই চাপা পড়ে গেল। সেদিনের মত জনতা নিরস্ত হয়ে অন্ধকারে এলোমেলো পদধ্বনি করে ঘরে ফিরে গেল—পথের উচ্চকিত কুকুরেরা বিরক্ত হয়ে ঘেউ ঘেউ ডাকে রাত্রির গভীরতায় অশান্ত আন্দোলন তুলে ছুটোছুটি শুরু করল, তাদের মাতামাতি কিছুতেই থাম্‌তে চায় না। অশান্ত বিক্ষুব্ধ রাত্রি জাগরণ-আলোড়নে শ্রমিক মনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠল। মানিকপুরের আকাশে আজ ধোঁয়া নেই, চাঁদের আলোর প্লাবনে পথঘাট পরিপ্লুত।

চোদ্দ

দেবিকাদের নতুন কোয়ার্টারের খান তিনেক বাড়ি পেরিয়ে আরতিরা থাকে। সকাল থেকে একঘেয়ে চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগছিল না, তাই মল্লিকা, দেবিকাকে সঙ্গে নিয়ে আরতিদের কোয়ার্টারে বেড়াতে গেল। আরতি বল্‌লে—হাঁ রে, তোরা যাবি না দেশে? আমরা ত মামাবাড়ি যাচ্ছি—

দেবিকা চট্‌পট জবাব দিল—বাবার ত ছুটি নেই, কারখানায় ভারি কাজের চাপ কি না?

—তোর বাবা বুঝি চুপি চুপি কারখানায় যাচ্ছেন?

মল্লিকা প্রতিবাদ করে—চুপিচুপি কেন যাবেন? ফেডারেশান থেকে ত বন্দোবস্ত করেছে জল, আলো, হাসপাতাল আরও সব কিসের ওপর ইয়ে থাকবে না, মানে ধর্মঘট নেই—

আরতি হাস্‌ল—যা-ই বলিস, সবাই যখন যাচ্ছে না কারখানাতে, তখন তোর বাবাও না গেলেই বেশ হত, আমাদের মত তোরাও দেশে যেতে পারিস।

—হ্যাঁ ভাই, তোরা কতদিন থাকবি মামাবাড়িতে? দেবিকা উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করে।

—বাবা ত বলেছেন অনেকদিন থাকব। আমাদের আবার ভাই হবে কি না।

আরতি বেশ জোর গলায় বল্‌লে।

মল্লিকা মুখ টিপে একটু হাসে—হ্যাঁরে তোর যে ভাই হবে, সে বুঝি খুব ফর্সা?

আরতির মা রান্নাঘর থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বল্‌লেন—বলি ও মলি, এসব কী শুন্‌ছিরে?

—কী কাকীমা?

—এধারে শোন্ না বলি।

মল্লিকা রান্নাঘরের দরজার সাম্‌নে এসে দোর আগলে দাঁড়ালো—ওটা কী চড়িয়েছেন কাকীমা? চিম্‌সে গন্ধ ছাড়ছে বড্ড!

—কই আবার চিম্‌সে গন্ধ! তোদের আবার আজকাল লম্বা নাক হয়েছে মা। এই পরশুর হাটে মস্ত এক মাছ এনেছিল, সেটাই ঝালমশলা দিয়ে,—কী আর বল্‌ব লজ্জার কথা—মুখখানি এমন হয়েছে আঁসটে গন্ধ ছাড়া ভাত রোচে না। তা হ্যাঁ, যা বলছিলাম—তোর দিদি নাকি ইয়ে বাধিয়ে বসেছিল তাই সাম্‌লাবার জন্যে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওকে!

মল্লিকা বল্‌লে—কি বল্‌ছেন কাকীমা, আমি বুঝতে পারছি নে!

—থাম ছুঁড়ি। আর ন্যাকামী করতে হবে না। ওলো বেশি বয়সে ঘরে বাঁচন রাখলে ওরকম হয়েই থাকে। তা তোদের আর ভাবনা কি, মল্লিক সাহেবের নেক-নজর পড়েছে যখন—বলে বিশেষ অর্থপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে মল্লিকার আপাদমস্তক দেখ্‌তে লাগলেন আরতির মা।

মল্লিকা পারতপক্ষে কাকীমার ধারে কাছে ঘেঁষতে চায় না। অথচ এ বাড়িতে আনাগোনা করতে ওর খুব ভালো লাগে। এ বাড়ির বড় ছেলে ললিত ওর ছোটবেলার বন্ধু—ইদানীং ললিতকে মল্লিকা নাম ধরে ডাকতে সঙ্কোচ বোধ করে, তাই অনেক ভেবে চিন্তে ললিতদা বলে। কাকীমা ছাড়া এবাড়ির আর সবই মল্লিকার পছন্দ—কাকাবাবু, আরতি, শোভনা সবাইকে।

কাকীমার কথার কোনো জবাব দিতে ইচ্ছে হয় না। যদিও আসল ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট বুঝল না, তবু এর মধ্যে এমন কিছু একটা ইঙ্গিত রয়েছে সেটুকু ধরতে মল্লিকার মোটেই অসুবিধে হয় না। হয়ত আর একটু খোঁচাখুঁচি করলে কাকীমা আরও সরলভাবেই রহস্য উদ্ঘাটন করতেন, সেই আশঙ্কাতে মল্লিকা কৌতূহল সম্বরণ করল।

কিন্তু গোবিন্দবাবুর গৃহিণী এখানেই থামলেন না—তা হলে, যা রটে তার কিছু কিছু বটে! আমার কাছে লুকোতে চাস নে মলি, আমি ত ঘরের লোক। এরকম ত মানিকপুরে হামেশা হচ্ছে। এই যে মালাকারের পিসতুতো বোনের কেচ্ছা—সবাই জেনে ফেল্‌ল তাই সে ঢি-ঢি, ছি-ছি, নইলে—! হ্যাঁ রে ক-মাস হয়েছিল?

মল্লিকার কাছে ইঙ্গিত দিনের আলোর মত সুপ্রকট হয়ে উঠ্‌ল, ওর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরতে লাগ্‌ল! বললো—আপনি ভারি অসভ্য! ছি এসব কি বল্‌ছেন? এসব আপনি কি বল্‌ছেন?

কাকীমা হেসে উঠ্‌লেন। মল্লিকার কানে সে হাসি অত্যন্ত বিশ্রী লাগ্‌ল—কাকীমার মুখখানা কেমন নোংরা দেখাচ্ছে ওর চোখে! ও বল্‌লে—এসব ভাবলেও পাপ হয় কাকীমা! আপনি গুরুজন, বল্‌তে লজ্জা করছে না আপনার?

—সেই যে বলে, দেখন্তির লাজ—হ্যাঁরে! আমার মুখে হাতচাপা দিয়ে কি হবে মা! মানিকপুরে একথা আর রাষ্ট্র হতে ত বাকী নেই—সীতেনাথ মুখুয্যে নাকি মেয়ের দৌলতে কপাল ফিরিয়ে ফেলেছে! আজ কোম্পানীর গাড়িতে চড়ে কারখানায় ঢুকছে, জামাই আদরে ভেতরে বসে চপ-কাট্‌লেট উড়োচ্ছে। সবাই বল্‌ছে, একদিন ত স্ট্রাইক মিটে যাবে, তখন সীতানাথকে সব সায়েস্তা করবে! এই রকম ত সব শুনছি মা! বলি, আমি কি আর মনগড়া কিছু বলেছি? তা তোমাদের কানে যদি পৌঁছে দিয়ে এমন কিছু অপরাধ করে থাকি ত মাপ চাইছি।

মল্লিকা মহাফ্যাসাদে পড়ল। বিব্রত হয়ে বললে—রাগ করছেন আমার ওপর। কিন্তু এসব ছোটলোকের মতো নোংরা কথা শুনতেও ঘেন্না করে।

—রাগ-ঝাল কি আর আমাদের সাজে মা? ভালো ভেবেই বলা। এসব রটনা ত ভালো নয়। তুমিও ত আর কচি খুকীটি নও, আমার অমন বয়সে ললিত পেটে।—না হয় আরতির সঙ্গে মেলামেশাই করো, তোমার বয়সটাও ত কম নয় মা। সবই বোঝো!

রান্নাঘরের খোলা জান্‌লা দিয়ে দক্ষিণের সরু উঁচু পথটা ছবির মত দেখায়, মল্লিকার দৃষ্টি সেদিকে পড়ল—ললিতদা আস্‌ছে। আপাততঃ কাকীমাকে অপ্রসন্ন করতে আর ইচ্ছে নেই, একটু আন্‌মনা হয়ে ও বল্‌লে—আপনারা চলে যাচ্ছেন শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে, কোথায়ই বা যাবো, আর—ভালো লাগে না অন্য কোয়ার্টারে যেতে!

গোবিন্দবাবুর স্ত্রীর মনটাও কেমন যেন বেদনাতুর হয়ে ওঠে! এই বুড়ো বয়সে ভাই-এর সংসারে এতগুলি মানুষ গিয়ে ভর করলে সেটা খুব প্রীতিপ্রদ

হবে না, সেই কথাটাই ক'দিন থেকে পীড়া দিচ্ছে তাঁকে। অথচ চোখের সামনে স্বামীর আর্থিক দুর্দশা দ্রুতগতিতে বেড়েই চলেছে, দেখতে পাচ্ছেন। তাই নিজেই এই ব্যবস্থা করেছেন। সংসার অচল হয়ে উঠেছে। আসবাব বলতে তেমন কিছুই ছিল না, তাও ত একে-একে বিক্রী-বন্ধক দিয়ে কোনো রকমে এতদিন চলেছে। এখন সে আশাও আর নেই।

মল্লিকার কথার জবাবে বললেন—কি করি মা, আমারই কি যেতে মন সরছে? ছেলে-মেয়েদেরই কি সেখানে গিয়ে মন বস্‌বে? কী আছে সেখানে? অজ পাড়াগাঁ—

পিছন থেকে ললিত বলে উঠল—সত্যি মা, কী আছে? ক্ষেতে ফসল, পুকুরে মাছ, ঘরে চাল, গোয়ালে গরু, কুয়ার পাশে কতকগুলো শিমের মাচা, পালংএর জঙ্গল—এইসব ফালতু জিনিস ছাড়া আর কিচ্ছুটি নেই। চিম্‌নীর ধোঁয়া নেই, ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি কোয়ার্টার নেই, কালিঝুলিমাখা মানুষ নেই, এ্যাক্‌সিডেন্টের ঘণ্টা বাজিয়ে এ্যাম্‌বুলেন্সের গাড়ি দৌড়ানো নেই—সেখানে আমাদের মন হাঁপিয়ে উঠবে বই কি!

—তোর ওই এক কথা। মামাবাড়ির সব ভালো। তাহলে বলি জানিস মলি, ওখানে গেলে ললিতের পাত্তাই থাকে না। মামাবাড়িতে বসে কত যে গল্প আর কবিতা লিখেছে!

মল্লিকার কাছে কাকীমা কোনো নতুন খবর সরবরাহ করতে পারেন না। ললিতের লেখা কবিতা, গল্প সবই খাতা থেকে মল্লিকা একাধিক বার পড়েছে। তবু বিস্ময় প্রকাশ করতে হ'ল—সত্যি! ললিতদা আমায় দেখাও না—

কাকীমা বল্‌লেন—ওসব কাউকে দেখাতে ললিতের লজ্জা। কিন্তু বেশ লেখে ললিত।

—থামো মা, আর বলে না। বড্ড খিদে পেয়েছে, তোমার রান্না কতদূর হ'ল?

—এই এবারে ভাত চড়িয়ে দিই! তুই চান্ করতে-করতেই হয়ে যাবে। হ্যাঁরে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ এত বেলা অবধি? সেই যে সকালে বেরিয়ে

গেলি আস্‌ছি বলে! এতক্ষণে বুঝি পেটে জ্বালা ধরেছে, তাই বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়ল?

—জানো মা, আজ আমার ভাগে সকালে বারো আনা লাভ হয়েছে!

ললিতের মা ছেলের দিকে চোখ কুঁচকে কী ইশারা করলেন। মল্লিকা সেটা লক্ষ্য করল কিন্তু ললিত টেরও পেল না, সে বলেই গেল উৎসাহিতভাবে— আমাদের দোকানে আজ সাত টাকা বিক্রী -

মল্লিকা বললে—তোমাদের কিসের দোকান ললিতদা?

বিরস বদনে ললিতের মা বললেন—যা খোকা চান করগে, পিত্তি পড়ে পড়ে একটা অসুখ-বিসুখ করলে শেষে ভুগতে ত এই মাকেই হবে! গল্প করবার ঢের সময় পাবি।—বলে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

ললিত নড়ল না, সগর্বে বললে—এমন যদি চলে আমাদের বিজনেস, তাহলে আর তোমাকে শিবলুনে যেতে হবে না। একবেলাতে বারো আনা মানে দিনে দেড় টাকা আয় বড় কম নয়। ওতেই বেশ চলে যাবে আমাদের।

ওদিক থেকে গোবিন্দবাবুর স্ত্রী অসহিষ্ণুভাবে বলেন—তোমার অত ভাবতে হবে না, উনি ত এখনও বেঁচে আছেন বাছা!

—তুমি মিছিমিছি রাগ করো মা। এই স্ট্রাইকের ক'টা দিন আমরা ঠিক দোকান চালিয়ে যাবো। দেখতে দেখতে তেইশ দিন হয়ে গেল। আরও যদি এমনি চলে,—

মল্লিকা কৌতূহলী হয়ে উঠল—কিসের দোকান? কোথায় দোকান করেছ ললিত দা?

—আমরা আনাজের দোকান করেছি ভাই। ঠ্যালাগাড়ি করে বাড়ি বাড়ি আলু-বেগুন বিক্রী করে বেড়াচ্ছি। মায়ের জন্যে ত আমাদের মহল্লায় আসতে পারি না, নইলে আরও বিক্রী বাড়তো। তা মা মনে করেন, কী না জানি অপমান হচ্ছে!

—খুব বাহাদুরী হয়েছে—ভদ্দর লোকের ছেলে হয়ে—

—পরিশ্রমের মূল্য বোঝো? বইতে লিখছে মান-মর্যাদা এতে খাটো হয় না! হয় কি না হয় আচ্ছা এবারে জ্যোতিদা এলে জিজ্ঞেস করো।—বলতে বলতেই ললিত প্রশ্ন করল—হ্যাঁ মা, বাবা কোথায়?—

—তাঁর কি আর নাইবার-খাবার সময় আছে? ফেডারেশনের চোঙা মুখে দিয়ে গলা ফাটিয়ে টো-টো করে বেড়াচ্ছেন—সবই আমার কপাল—

দেবিকার কণ্ঠস্বর শোনা যায়—দিদি বাড়ি যাবে না?

—চ, যাই—বলে মল্লিকা আঁচলটা অনাবশ্যকভাবে পিঠ থেকে সরিয়ে সাম্‌নের দিকে অপসারিত করে, আবার গোছ-গাছ কর্‌তে লাগ্‌ল।

ললিত বল্‌লে—তোমরা আমাকে বয়কট করলে কেন দেবী?

—বয়কট কোথায়? তুমি এখন চান করবে খাবে—মল্লিকা জবাব দেয়।

—আরে বস বস, এই ত আজকের দিনটা যা জ্বালাতন করব—কাল হয়ত —বলেই রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে গলাটা একটু নামিয়ে বল্‌লে—আমি যাচ্ছিনে মামাবাড়িতে। সবে বিজ্‌নেস্‌টা জম্‌ছে, এখন গেলে সব মাটি! আবার ধার বাকী পড়ছে। সেগুলো আদায় উসুল করবে কে? চলে যাওয়া বল্লেই কি যেতে পারি!

আরতি বল্‌লে—ইস্‌, মাকে বলে দিচ্ছি দাঁড়াও—

—বলেছি ত একটা বড় প্রজাপতি ক্লিপ কিনে দেবো তোকে—ললিত ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল।

—চাই না, তার চেয়ে তুমিও চলো না দাদা!

আরতির কথা শেষ হবার আগেই বাইরে থেকে ভেসে এল লাউড্‌ স্পীকারের ঘোষণা—আজ দুপুরে আড়াইটায় বক্‌সীবাঁধের ময়দানে ধর্মঘটের গুরুতর পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রমিকনেতা স্বামীসাহেব ভাষণ দেবেন। ভাইসব, আপনারা নিজেদের অধিকার কায়েম করবার জেহাদে জমায়েৎ হোন!— তারপর হিন্দীতে এই কথাগুলিই পুনরাবৃত্তি হ'ল!

গোবিন্দবাবুর স্ত্রী প্রশ্ন করলেন—দুলালদের ঘড়িটা একবার দেখে আয় ত! এখনও উনি ফিরলেন না—আবার ত দেখচি আড়াইটেয় নেমন্তন্ন হ'ল।

ললিত বল্‌ল—সাড়ে এগারোটা হবে আর কি!

ললিতের কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই মনে পড়ে গেল—ঠিক এই সময় কারখানার বাঁশিটা গর্জন করত—প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে।

মল্লিকার কেমন যেন লজ্জা করছে, ওর বাবার সঙ্গে এই ধর্মঘটের কোনো যোগ নেই বলে! এ যেন বৃহৎ একটি উৎসবের আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হওয়ারই বেদনা! সহসা মল্লিকা ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—চলি কাকীমা, বড্ড বেলা হয়ে গেল।

—এসো মা! ওবেলা একবার আসিস, কালই ত চলে যাচ্ছি—আবার কতদিনের মত। আমার যে পথে বেরুবার মত অবস্থা নেই, নইলে দিদিকে প্রণাম করতে যেতাম।

—মাকে বল্‌ব যদি আস্‌তে পারেন!

—তাহ'লে ত ভালোই হয়। নিয়ে আসিস সঙ্গে করে-নাহয় খোকাকে পাঠিয়ে দেবো সন্ধ্যের দিকে—নিয়ে আস্‌বে।

সেদিন দুপুরের মিটিং-এ এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। কোথা থেকে যে সীতানাথ মুখুয্যেকে একদল লোক ধরে আনল কেউ জানে না। তবে একেবারে জবাফুলের মালা পরিয়ে তাঁকে সভাপতির আসনে বসিয়ে দিল।

সীতানাথকে দেখে সবাই অবাক! গোবিন্দবাবু থিয়েটারী ভঙ্গীতে ঘোষণা করল—গোলামীর ফাঁসি থেকে আজ যিনি মুক্ত হ'য়ে এসেছেন তাঁর মুখ থেকে আমরা আশার বাণী শুনতে চাই। সীতানাথ মুখার্জি যে আজ হাজার হাজার ভাই-এর দুঃখ-দুর্দশা নিজের মনে সম্‌ঝেছেন, আমাদের লড়াইতে এসে হাত মিলিয়েছেন, এতে যে আমাদের কতখানি জোর বাড়ল তা সবাই বেশ ভালো করেই বুঝছি। সীতানাথ মুখার্জি কী জিন্দাবাদ!

সীতানাথ থর-থর করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে ভাঙাগলায় বল্‌লেন—আজকের সবচেয়ে নতুন খবর আপনাদের জানা নেই, কোম্পানী বল্‌ছে যে, এই ধর্মঘট বেআইনী। এ ধর্মঘট বন্ধ করবার জন্যে কোম্পানী সরকারী আইন ফলাবে। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে, কারখানার দরজা কোম্পানীই বন্ধ

করে দিয়েছিল, ধর্মঘট হবার আগেই কারখানা বন্ধ করেছেন ওঁরা। অথচ মতলববাজ কোম্পানীর গোলামরা সব বল্‌তে চাইছে যে, মজুররা ধর্মঘট করেছে। যেদিন ধর্মঘট হবার কথা, তার আগে ষ্ট্রাইক করা ত বে আইনী—! আসলে এটা লক্‌আউট !

সীতানাথের কথা শেষ হলো না, তার আগেই মিলিত জনতার মধ্যে থেকে প্রতিবাদ উঠ্‌ল—না, আমরাইত ষ্ট্রাইক করেছি! আমরা লড়াই করছি। আমাদের দাবি পুরো আদায় করবার জন্যে লড়াই চালাচ্ছি, চালাবো—

সীতানাথ বল্‌লেন—হ্যাঁ, এই ত চাই। স'বাস ভাইসব, লড়াই করতে এসে পিছু হঠলে চল্‌বে না। ধর্মঘট যখন শুরু করেছি আমরা তখন এর শেষ দেখতে চাই।

সীতানাথ মুখুয্যে সম্বন্ধে এপাশ-ওপাশ থেকে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠ্‌ল—দালালটাকে এখানে কেন আনা হয়েছে? ও শালা সরমায়াদার কি মতলবে আমাদের মধ্যে এল? কেউবা বল্‌লে—এতদিনে ব্যাটার হুঁশ হ'ল, যাক! সব মিয়াঁকেই পথে আস্‌তে হবে বাবা।

তাঁর ভাষণের পর অনেকে এসে সীতানাথকে ঘিরে ধরল। কারখানার ভিতরের হালচাল সবাই জানতে উৎসুক। কিন্তু নানাজনের কোলাহলে সব এলোমেলো হয়ে গেল। সীতানাথ শুধু বল্‌লেন—আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি ভাই! তাই চলে এসেছি আমার ভাইদের কাছে, তোমাদের পায়ে ধরে এই ভুলের জন্যে ক্ষমা চাইতে আমার একটুও লজ্জা নেই।

স্বামীসাহেবের বক্তৃতা শুরু হ'ল, তিনি বল্‌লেন যে, কোম্পানীর ডিরেক্টররা ফেডারেশনের নামে মামলা রুজু করছে, বেআইনী ধর্মঘটের দায়ে। এই ধর্মঘটের পাণ্ডাদের নামে খুব গুরুতর অভিযোগ দাঁড় করিয়েছে কর্তারা। এই নিয়ে তিনি নিজে রোজ দু-বেলা ডিরেক্টরদের সঙ্গে সঙ্গে তর্ক-ঝগড়া করছেন। আজ সকালেও তাঁর সঙ্গে হাতাহাতি হবার উপক্রম, ডিরেক্টররা বল্‌ছেন—আমরা সব কিছু দিয়ে দিতে তৈরী আছি, কিন্তু তার আগে শ্রমিকরা বিনাসর্তে কারখানায় এসে হাতিয়ার ধরুক। তাদের সঙ্গে আমাদের বাপ-বেটা সম্পর্ক, এটাই আমরা দেখতে চাই। তারা চোখ রাঙিয়ে, ভয় দেখিয়ে

আমাদের দমিয়ে দাবিয়ে রাখ্‌বে, এটা আমরা বরদাস্ত করব না। এই হ'ল কোম্পানীর শেষ কথা।—

একথায় স্বামীসাহেব রেগে চলে এসেছেন, কর্তাদের মুখের সাম্‌নে নথীপত্র ছুড়ে ফেলে দিয়ে। বক্তৃতার এই অংশে এসে স্বামী একটু থাম্‌লেন—করতালির প্রতীক্ষায়। প্রচুর হাততালি পড়ল। এরপর অনেক ক'জন বক্তৃতা দিল সন্ধ্যা পর্যন্ত।

সভা থেকে ফিরেই সীতানাথ বিছানা দখল করলেন। উঃ, যা ধকল গেল! ওই অতো লোকের সাম্‌নে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ত চাট্টিখানি কথা নয়! কি যে বলেছেন কে জানে? তবে যেটুকু দরকার সেটুকু ঠিকই বলেছেন—ধর্মঘট করেছে শ্রমিকরা, এইটুকুই ত বলবার কথা,—লকআউট নয়, জলজ্যান্ত স্ট্রাইক, হ্যাঁ তাই ত আব্দুল শেখ লোক মারফতে পরামর্শ পাঠিয়েছিল! এখনও হাত-পায়ের কাঁপুনী থামে নি। সীতানাথ নিজের কৃতিত্বে খুব খুশী। এবার আর ভাবনা নেই। আখেরের সিঁড়ি তাঁর সোনা দিয়ে বাঁধানো হয়ে গেল, এই আজকের কৃতিত্বের বলে।

রাত তখনও আটটা বাজে নি। ললিতকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেখে সীতানাথ চুপ করে গেলেন, কোনো একটা বিষয়ে খুব উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছিলেন তিনি। তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে গদগদ হয়ে ললিত বল্‌লে—জ্যাঠামশাই, আপনি আজকে যে দৃষ্টান্ত মাণিকপুরে দেখালেন, এ সত্যিই কেউ ভাবতে পারে না।—

যে লোকের সঙ্গে সীতানাথ কথা কইছিলেন, সেও ললিতকে দেখে বিদায় নিল।

—হ্যা-হ্যা, কী যে বলো বাবাজী, কি যে বলো!—সীতানাথের কণ্ঠস্বর কেমন ভারি হয়ে আসে আবেগে—তোমার বাবা গোবিন্দ ঘোষাল, সারথী—এদের তুলনায় আমি আর কি করেছি বলো? ওরাই হচ্ছে খাঁটী ওয়ার্কার—

—আজ্ঞে, তাঁরা ত যা স্বাভাবিক তাই করেছেন। কিন্তু আপনার এই ত্যাগ অতুলনীয়। কোম্পানী আপনাকে যে পোজিশন দিচ্ছিল দিন-দিন,

তাতে আর কারুর পক্ষে সেই লোভ ছেড়ে এভাবে মাঠে নেমে আসা সম্ভব হ'ত না। আপনি বলেই পারলেন।

—আরে তুমিই বলো বাবাজী, ফেডারেশনই কি আমায় কম দিচ্ছে কিছু! আমায় বুড়ো মানুষ বলে ত দিলে প্রেসিডেণ্ট করে—খামোকা! কিছু জানিনে বুঝিনে, ওরা সবাই ধরে বসল আমাকেই প্রেসিডেণ্ট হতে হবে। টাকাটাই কি সব? আমি ত বলি ললিত, উপোষ করে এভাবে মরতে পারাও একটা বিরাট কাজ! ওসব যাক, তোমাদের খবরাখবর সব ভালো তো? ওরে ও মলু, ছাখ কে এসেছে! বলে সীতানাথ গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন।

ললিত দাঁড়িয়েই রইল, তার তরুণ মনের আবেগ এখনও প্রশমিত হয় নি,—আপনি এদিকে চলে আসাতে লেবার-মহলে ঝিমোনো ভাবটা কেটে গিয়ে নতুন উৎসাহ দেখা দিয়েছে! আচ্ছা জ্যাঠামশাই, আপনি ত ওধারের হাল-চাল জানেন, কতদিন আর এইভাবে চলবে বলে মনে করেন?

—ও বাবা মল্লিকসাহেবের প্যাঁচ বোঝা ভারি শক্ত। দেখলে ত ধর্মঘট-খানাই বেআইনী প্রমাণ করতে চাইছে!

মল্লিকা এসে বল্‌লে—বাবা, মা একবার ডাকছেন!

—এই যাই মা—বলে সীতানাথ মোড়া ছেড়ে উঠ্‌লেন।

সীতানাথ চলে যাওয়ার পর ললিতকে একা পেয়ে মল্লিকা চাপা গলায় বল্‌লে—তুই যাস নে ললিত! যাস্ নে রে!

ললিত সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওকে দেখে নিয়ে বল্‌লে—না গেলে কি দিবি?

যখন আশপাশে কেউ থাকে না তখন ওরা পরস্পরকে 'তুই' বলে।

—ইস্ কী আবার দেবো? ভারি দুষ্টু হয়ে উঠেছিস—যা! থাকবি ত তাহলে?

—আচ্ছা, তাহলে যাই—বলে ললিত কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অপাঙ্গে মল্লিকাকে দেখতে লাগল।

—এই দোকান-টোকান করলে কিন্তু ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। ওসব আবার কি ঢঙ!

—আমার কিন্তু ওতে কোনো লজ্জা নেই। পরের কাছে হাত পাতার চেয়ে এটা ভালো নয় ?

—কি জানি আমার ভারি বিচ্ছিরি লাগে—তাই বল্‌ছিলাম।

—আমার কবিতার খাতাটা রেখে দিবি ? যদি যেতেই হয়, তবে খাতাটা থাকবে তোর কাছে। ফিরে এসে কিন্তু আবার নেবো—বলে ললিত শার্টের তলা থেকে একখানি এক্সারসাইজ বুক বার করে এগিয়ে দিল। মল্লিকা এদিক ওদিক দেখে নিয়ে চট্‌ করে খাতাখানা আঁচলের মধ্যে ঢেকে ফেলে বেরিয়ে গেল, ললিতকে বস্‌তে ইশারা করে !

পাশের ঘরে ঢুকেই শুন্‌ল—না, না, ওবাড়ি যাওয়া-টাওয়া চল্‌বে না, ওরা হচ্ছে স্ট্রাইকের পাণ্ডা ! কী দরকার এত মাখামাখিতে ! বলে দাও শরীর খারাপ, ল্যাঠা চুকে গ্যালো। তুমি না পারো আমিই বলে দিচ্ছি।

মল্লিকা পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল—মায়ের সঙ্গে ললিতদের বাড়ি আর যাওয়া হবে না ! কয়েক মুহূর্তের জন্য পৃথিবীর সব-কিছুই ওর চোখের সাম্‌নে থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ দেবিকার কণ্ঠস্বরে হুঁশ হ'ল। তাড়াতাড়ি এক্সারসাইজ বুকটা দাদার বই-খাতার গাদাতে চালান করে দিল মল্লিকা।

দেবিকা বল্‌লে—যাবি ছোটদি মন্দাদের বাড়ি ? বাবা বল্‌ছিলেন—

—যা, কেবল বড়লোকদের খোশামুদী আমার ভালো লাগে না।

—এতে খোশামুদীর কি আছে ? তুইও দিদির মত কথা বল্‌ছিস কেন রে ?

মুকুল সত্যিই এই ধরণের কথা বলে। মল্লিকার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আপন মনেই দেবিকা বল্‌লে—ও বুঝেছি। আরতির বাড়ি যাওয়া হ'ল না, তাই—

পরক্ষণে সে মল্লিকার হাত ধরে চৌকির ওপর টেনে বসিয়ে বল্‌লে—জানিস ছোট্‌দি, খুব একটা ভালো খবর ! বাবা বল্‌ছিলেন দিদিকে এখানে নিয়ে আস্‌বেন—

—ও তাই নাকি ? কবে দিদি আসবে ? দাঁড়া, বাবাকে জিজ্ঞেস করে আসি।—কথাটা শেষ করতে করতেই মল্লিকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে ললিতকে সীতানাথ বিদায় করে দিয়েছেন। মল্লিকা যে প্রশ্নটা করবার জন্য এঘরে এসেছিল সেটা কোথায় হারিয়ে গেল—কিছুতেই মনে করতে পারল না। এই ঘরখানা যেন মৃত্যুর চেয়েও জড় অচেতন, সীতানাথ মুখুয্যের অস্তিত্বও মল্লিকার চোখে এই ঘরের জড়তার চেয়ে কিছুমাত্র সজীব নয়। ওর নিজের নিবিড় উত্তাল হৃৎস্পন্দনটুকু ছাড়া আর কিছুই টের পাচ্ছে না মল্লিকা।

ললিত এমন করে সহসা কেন চলে গেল? এই প্রশ্নটা বার বার মল্লিকার মনে ঘুরে ঘুরে গুম্‌রে মরছে—কিন্তু কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবে!

সীতানাথ নীরস কণ্ঠে বল্‌লেন—কি অমন হাঁ করে সং-এর মত এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

মল্লিকা নিজেকে লুকিয়ে ফেল্‌তে পারলে যেন বেঁচে যায় এমনই সঙ্কোচ-সম্বৃত ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল।

সীতানাথ মুখ বাঁকিয়ে তাচ্ছিল্যময় কয়েকটি কথা বল্‌লেন—যত্তো সব ইয়ে! খাবে দাবে আর সোঁদরগাধার মত ঢং করে বেড়াবে! কাজের বেলায় আল্‌কাটাকাপ।—

মল্লিকা ভাবছিল—আবার কতদিন দেখা হবে না ললিতের সঙ্গে। অথচ দিন আসবে, রাত কাট্‌বে! কাটবে কি? কিন্তু কেমন করে কাট্‌বে!

সীতানাথ বেরুলেন দেবিকাকে নিয়ে। মন্দাকিনীদের কোয়ার্টারে যাচ্ছেন তিনি। নিছক বেড়াতে যাওয়াই যে তাঁর উদ্দেশ্য, সেটা বোঝাবার জন্যই দেবিকাকে সঙ্গে নিয়েছেন। একই সঙ্গে দু-নৌকোতে পা দিয়ে তাল সাম্‌লাবার চেষ্টা করছেন তিনি—অথচ নিজের কাছেও সেটা গোপন রাখতে চান যেন! বেরুবার সময় মল্লিকাকে বল্‌লেন—দরজাটা বন্ধ কর, চারদিকে চুরি-চামারী হচ্ছে!

পনর

বাদামতলার মেস্‌বাড়িতে তাসের আড্ডা জম্‌জমাট। ঢালাও উঠোনে চট্‌ বিছিয়ে হাঁকাহাঁকি চল্‌ছে ঃ

অবিনাশ চাটুয্যে বিড়ির ছাই ঝেড়ে বল্‌ল—মজুমদার, তোমার বিবি সামাল্‌—এ্যাই চল্‌ল আমার রঙের সাহেব!

—থাম-থাম দালাল, তোর কালো সাহেবের বাবা টেক্কা আছি না আমি! লাগ্‌সই মারের মুখে মজুমদারের 'জুটি' হরিহর হুঙ্কার দিয়ে চটাস্‌ করে টেক্কা মারল। হয়ত এরকম বেকায়দায় মার খেয়েই অবিনাশ চাটুয্যের মেজাজ খারাপ হয়েছিল, কিন্তু প্রতিক্রিয়ার প্রকাশটা একটু অস্বাভাবিকই দাঁড়াল। সে ঝট্‌ করে উঠে দাঁড়িয়েই সপ্তমে গলা চড়িয়ে ফেল্‌ল—দালাল বলিস তুই কাকে শালা? শালা বেইমান কোথাকার! আমি দালাল, না তুই দালাল? তোর গুষ্টি দালাল।

হরিহর আচম্‌কা এই কাণ্ড দেখে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে যায়! আম্‌তা আম্‌তা করে বল্‌ল—আহা, বেশ আমিই নয় দালাল, হয়েছে ত? এখন ব'স, ছক্কার সেটটা খেয়ে যাও দাদা। চটাচটির কি আছে—খ্যালা ইজ্‌ খ্যালা—।

—নাঃ, আমি ওরকম ছোটলোকের সঙ্গে খেলি না। আজ পর্যন্ত এই শর্ম্মার মুখের সাম্‌নে চড়া গলায় কেউ কথা বল্‌তে পারে নি—মায় ফোর্‌ম্যান পর্যন্ত বুঝে সম্‌ঝে চলে, আর তুই দেড় দিনের যুগী—ছোঃ!

অবিনাশ চাটুয্যে বেঁকে বসল। হরিহর টেক্কার মারখানা ছেড়ে দিতে চাইল তবুও আর খেলতে রাজী হ'ল না। এমন সময়ে দত্তগুপ্ত এসে হাজির—খুব ত জমিয়েছ, ওদিকে মিটিং যে বাজী ভোর—চলো চলো—মিটিংএ সামিল হতে হবে।

মজুমদার বল্‌লে—ধ্যাত্তেরি মিটিং! সেই পুরনো বুলি ঝাড়বে ত! কাজের নামে ঘণ্টা, কেবল ফুল্‌লকি বাজী!

দত্তগুপ্ত একটু হাসল—তা যা বলেছো। কিন্তু আজ যে সেই ফড়েটার লেক্‌চার দেওয়ার কথা—

—কার কথা বল্‌ছিস্‌?

প্রশ্ন করে অবিনাশ।

—ক্যানো তোমার প্রাণের ইয়ার সীতেনাথ মুখুয্যে গো!

দত্তগুপ্তের কণ্ঠের শ্লেষ চোখেমুখেও উপ্‌ছে মাখামাখি হয়েছে।

অবিনাশ বল্‌ল—লেক্‌চার না ঢুঁঢুঁ দেবে। সীতানাথকে মল্লিকসাহেব চর পাঠিয়ে সামাল দিয়েছে।

—ঘোঁড়ার ডিম জানিস তুই। সেদিনে সেই যে পথ থেকে সীতানাথকে ধরে নিয়ে গিয়ে সভাপতি করে হাততালি দেওয়া হ'ল, তার ফল কি হয়েছে জানো? ওকে আর কারখানামুখো হ'তে বারণ করেছে কোম্পানীর টিকটিকি।

ব'লে দত্তগুপ্ত হাসল বিজয়ীর ভঙ্গীতে।

—ব্যাস, এখন শালাকে ফেডারেশনের তরফ থেকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে গ্যালো। ফর্সা!—দালালী করে খায়, সে হ'ল লীডার!

মজুমদার আর হরিহর পরস্পরের মুখের দিকে আশাহত দৃষ্টিতে তাকাল—এমন পাকা খেলাটা বরবাদ হয়ে যাবে! অবিনাশ ত হারবার ভয়ে আর বস্‌বেই না। শেষ অবলম্বন দত্তগুপ্ত ছিল, সেও সভায় চল্‌ল। আর ত কেউ নেই এখন মেসবাড়িতে। যে যার নিজের দেশঘরে চলে গেছে। এখানে বসে বসে খাবার মতো পয়সা কারুরই নেই—তবু এরা অবশিষ্ট চার-পাঁচজন মেস-বাড়ি আগ্‌লে পড়ে আছে, তার কারণ, দেশে-ঘরে গেলে দুঃখ-দুর্দশা আরও চরমে পৌঁছবে। অতএব এখানে থাকাটাই শ্রেয় মনে করে এরা। ঠাকুর-চাকর কেউ নেই—নিজেরাই কোনরকমে ডাল-ভাত আর পোস্ত-চচ্চড়ির ওপর প্রাণ রক্ষার ভার ছেড়ে দিয়েছে।

আরও একটি গোপন আশা এদের মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে যায়—ইশারা-ইঙ্গিতও এসেছে রাধেশ্যামপাড়ার প্রাণগোবিন্দ-ঠাকুরের কাছ

থেকে। ঠাকুর বল্‌ছে—কোনো ভাবনা নেই, রাতারাতি সাতপুকুরের শ্মশান পার দিয়ে সাম্‌লে-সুম্‌লে কারখানার ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়াটা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার হবে না। আরও কথা আছে, কোম্পানীর এই দুঃসময়ে সহায়তা করবে যারা, তাদের উন্নতি অবধারিত। মনের নিশান ত অনুকূল বাতাসে পত্‌-পত্‌ করে সায় দিয়েছে, কিন্তু ওদিকে একবার যদি ফেডারেশনের কেউ টের পেয়ে যায়, তাহলে অপমান আর বেইজ্জতির সীমা থাকবে না! এখনো এরা কোম্পানীর ঠিকেদার মিস্টার ঠাকুরকে আজ নয় কাল বলে ঠেকিয়ে রেখেছে!

অবিনাশ এর মধ্যে দু'একদিন চুপিচুপি ডিউটি করেও এসেছে, বোনের বাড়ি যাবার নাম করে। কারখানার মধ্যে কাজ করতে করতে মজুমদারকে দেখে সে ঘাবড়েই গিয়েছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই দরাজ গলায় হো-হো করে হেসে মজুমদারের গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—আখের গুছোতে হবে ভাই, বেশ করেছিস!

তারপর থেকেই হরিহর, দত্তগুপ্ত প্রমুখ ওদের সন্দেহ করছে—সেজন্যই মুস্কিল হয়ে পড়েছে—রোজ রোজ বোনের বাড়ি যাওয়া যায় না ত! বিশেষ করে যে বোনের কথা এতদিন কেউ শোনে নি, তার বাড়ি হামেশা গেলে এরা চাউর করে দেবে। অগত্যা তাস খেলাতেই এরা মন দিয়েছে।

কিন্তু আজ অসময়ে তাসের আসরে বজ্রপাত হওয়াতে কেউ কেউ মুষড়ে পড়ল—শেষে কি মিটিং-এ যেতে হবে?

সেখানে গিয়ে যে কোনো মোক্ষই লাভ হবে না এটুকু এরা বেশ বুঝে ফেলেছে। তবু গেল।

এই চার সপ্তাহের মধ্যেই কোম্পানীর ইস্পাত-মনোবৃত্তি শাণিত হয়ে আরও ধারালো আকার নিয়েছে।

হাটতলার মাঠের সভায় অনেক লোক। তবে আগের তুলনায় ক্রমশ জনতার ভিড় যেন কমে যাচ্ছে! বহু শ্রমিক মানিকপুর ছেড়ে দেশে ঘরে চলে গেছে। না গিয়েই বা করবে কি—এখানে থাকাও ত ব্যয়সাপেক্ষ। ফেডারেশনের তরফ থেকে ঢালাও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যারা দেশে যেতে চায় তারা নিশ্চিন্ত মনে চলে যাক। কোম্পানীর সঙ্গে মিটমাট হবার আভাস

পেলেই যার-যার ঠিকানায় খবর দেওয়া হবে। ফেডারেশন স্পষ্টই জানিয়েছে যে, এত লোকের খাওয়া-পরার খরচের বোঝা বইবার মতো আর্থিক সচ্ছলতা ফেডারেশনের নেই—অতএব শ্রমিকেরা নিজেদের ফেডারেশনকে বাঁচাবার জন্য অন্ততঃ 'জরু-বাল-বাচ্চাদের' মুলুকে মোকামে পাঠিয়ে দিক। সংগ্রাম চালাতে গেলে যেসব জরুরী খরচ আছে, সেগুলো ভাল ভাবে সাম্‌লাতেই প্রচুর টাকা লাগে,—এখন সেদিকটা জোরদার রাখাই বেশী দরকার। তবে হ্যাঁ, তেমন তেমন বিপদ-আপদের জন্য যে কোনো শ্রমিককে সাহায্য অবশ্যই ফেডারেশন করবে।

এখনও যারা মানিকপুরে রয়েছে, তাদের দিন কাট্‌ছে খুব দুর্গতির মধ্য দিয়ে। প্রথম দু-সপ্তাহ মুদিখানা থেকে ধারবাকী পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু মুদিখানার মালিকেরা আর ধারে মালপত্র দিতে পারছে না। তারা বলছে,—আমাদের পুঁজিপত্র ত বেশী নয়, যতদিন পেরেছি আমরা গাঁটের কড়ি খরচা করে, নগদ কিনে এনে ধারে জিনিসপত্তর দিয়েছি। এখন আমাদের হাতে নগদ টাকা নেই যে তা দিয়ে নূতন করে মাল আনিয়ে ধারে সরবরাহ করতে পারি। তাদের কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আজকের সভাতে মূল ব্যাপার নিয়ে যা বক্তৃতা হ'ল, তাতে নতুন কিছুই নেই। সারথী উঠে দাঁড়িয়ে আধঘণ্টা ধরে জোর গলায় বক্তৃতা দিল: স্বামী-সাহেব কলকাতায় কোম্পানীর কর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। তিনি নিশ্চয় একটা ফয়স্‌লা করে ফিরবেন। অতএব মজদুর ভাইসব, সংগ্রামের জেহাদজিন্দী রাখতে পারলেই বিলকুল কামাল হয়ে যাবে। এদিকে যে দালালদের দুশমনী বাড়ছে, সে খবর ফেডারেশন জরুর জানে, ওতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। যে সব কুত্তা লুকিয়ে-চুকিয়ে কোম্পানীর পা চাট্‌তে গিয়েছে, তাদের নসীবে নিমকহারামের যা সাজা তাই নাচছে—ওইসব নেড়ী কুত্তাকে কি করে খুঁচিয়ে মারতে হয় তা ফেডারেশনের ভালভাবেই জানা আছে। মজদুর ভাইরা, আর কিছুদিন নিজের 'কোট' বজায় রাখতে পারলেই দিন ফিরে যাবে। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ্‌, স্বামীসাহেব জিন্দাবাদ্‌, মজদুর দুনিয়া জিন্দাবাদ্‌, দালালকুত্তা মুর্দাবাদ!

তারপর ঘোষাল উঠল বক্তৃতা দিতে: হামারে প্যারে মজদুর ভ্যাইয়োঁ, আজ এইমাত্র খবর প্যাওয়া গেল যে, কাফের কোম্পানী আমাদের নামে মাম্‌লা রুজু করেছে। আমরা নাকি স্ট্রাইক করেছি! হাত জোড় করে নাকি কোম্পানীর সাহেবেরা কাজে জয়েন করবার জন্যে বারবার সেলাম জানিয়েছিল —আমরা নাকি সেই ডাকে সাড়া দিইনি! আমরা নাকি জবাব দিয়েছি যে দাবিদাওয়া পূরো হাসিল না হ'লে কাজ করবো না, তাতে কোম্পানী জাহান্নামে যায় যাক। এই সব হচ্ছে মজদুরদের নামে মিথ্যে চার্জ। আজ কোম্পানী যে মামলা খাড়া করেছে তার সঙ্গে বলবো কি, আমাদের প্রাণের মজদুর ভাইদের থেকেও বিভীষণ হয়ে ওদিকে গিয়ে চুক্‌লী খেয়েছে।

জনতার মধ্যে গুঞ্জন উঠল—একথা ঠিকই, তাতে মামলার কি আছে? আমাদের হিস্যা পূরো হতেই হবে।

—তাতে মাম্‌লাই হোক আর দাঙ্গাই হোক, আমরা লড়ে যাবো।

ঘোষালের কণ্ঠস্বর আর শোনা গেল না। জনতার কোলাহলে মাঠখানা ভরে গেল। বরষার বাদলা পোকার মতো টুকরো কথায় কথায় বাতাস যেন ছেয়ে পড়ল কয়েক মিনিটের মধ্যে! ওদিকে মঞ্চের ওপর থেকে কে বা কারা ঘোষালকে টেনে নামিয়ে নিল সেদিকে বিশেষ কারুর নজর নেই।—নতুন একটা উত্তেজনায় জনমন চঞ্চল।—মাম্‌লা হুয়া, মাম্‌লা লেগে গেছে, লড়াই আরও জমে উঠল বুঝি।

হৈ চৈ হট্টগোলের মধ্যে বিশৃঙ্খলভাবে মানুষগুলো ছড়িয়ে পড়ল। আশাতীতভাবে সেদিনের সভা ওইখানেই শেষ হ'ল। আবার আগামী কাল সভা হবে। আশা করা যাচ্ছে—স্বামীসাহেব কলকাতা থেকে নতুন কিছু সংবাদ নিয়ে ফিরবেন ইতিমধ্যে।

যারা অপেক্ষাকৃত নিরুদ্যম হয়ে পড়েছে, তাদের মনে একটা সংশয় জুটল। কোম্পানী আবার মাম্‌লা রুজু করে বস্‌ল, তাহলে মিটমাটের ভরসা পিছিয়ে গেল! মাম্‌লার যুক্তিটাও কেমন অদ্ভুত—শ্রমিকরাই ধর্মঘট করেছে। আর মালিকরা তাদের সাধাসাধি করেও কাজে যোগ দেওয়াতে পারে নি। আসলে কি তা-ই হয়েছিল? না, কোম্পানী কারখানার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল,

কাজে ঢুকতে দেবে না, বলে।...এই ক' সপ্তাহের নিয়ত স্নায়বিক সংগ্রামে সাধারণ মানুষের স্মৃতিশক্তি যেন বিস্রস্ত হয়ে পড়েছে! তবুও এতবড় একটা ঘটনা ভুলে যাবার মতো নয়। তবে একটা সূক্ষ্ম অপমানবোধের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই শ্রমিকরা বুঝতে চেয়েছিল লকআউট না হয়ে ধর্মঘট হওয়াটাই সমীচীন। তা ছাড়া লকআউট আর ধর্মঘটে পার্থক্য আর এমন কি? আসল ব্যাপার ত লড়াই, সেই লড়াই-এর উন্মাদনাই এদের মনের জোরকে জিইয়ে রেখেছে।

সভা থেকে ফিরতি পথে অবিনাশকে খুঁজে পাওয়া গেল না। দত্তগুপ্ত, হরিহর, মজুমদার, আর এ. সি. দাস—চারজনে একসঙ্গে মেসে ফিরছিল। হরিহর হঠাৎ প্রশ্ন করল—শেষে গোসা করে অবিনাশটা কোথাও চলে-টলে গেল না ত?

দত্তগুপ্ত জবাব দিল—গোসাটোসা কিছু নয়, শালা দালালীর মতলবে আছে। যেই দেখেচে সীতানাথ মুকুয্যে মিটিং-এ আসে নি, অমনি দৌড়েছে তার কোয়ার্টারে। পয়লা নম্বরের সর্‌মায়াদার!

এ. সি. দাস বিড়ি বিতরণ করতে করতে বল্‌ল—ও ছেলে সোজা নয়। মায়ের পেট থেকে একটাকে খুন করে তবে মাটিতে পা দিয়েছে!

হরিহর প্রশ্ন করল—তার মানে?

—মানে আবার কি, যমজের একটা মরা আর একটি জ্যান্ত হ'ল! তা ব্যাটা কি ভাইকে মেরেই থাম্‌ল? মাও তো আঁতুড়েই ঘায়েল হয়েছে!

দত্তগুপ্ত একটু সুরুচির পক্ষপাতী, সে বাধা দিল—ছিঃ, ওরকম করে কারুর কথা বলা ঠিক নয়, বেচারী মা-বাপ মরা ছেলে! আর তোমার ত ছেলেবেলার বন্ধু না আশু দা!

দত্তগুপ্তর মারটা হজম করে আশু দাস বল্‌ল—নাঃ, ভেবেছিলাম বলব না কিন্তু অবিনাশের চালচলন দিনদিনই বেতরিবৎ হচ্ছে কি না! শালার আসল মতলব তোমরা জানো না, ও রাস্কেল ওই মুকুয্যের ছোট মেয়েটাকে গাঁথবার তালে আছে।

হরিহর হেসে উঠ্‌ল—ও বাবা, পেটে পেটে এত? কিন্তু শালার কপালে প্যাদানী মাপা আছে, এই বলে দিলাম।

এ. সি. দাস ওরফে আশু দাস ঘাড় নাড়ল—না ভাই, ও হচ্ছে জাত খ্যাড়োয়াল! ছোটবেলা থেকে এই কাজে এলেম পাকিয়েছে কি না! পটাপট প্রেম জমাতে পারে।

দত্তগুপ্ত এতক্ষণ চুপ করে ছিল, সে এবার সায় দিল—কথাটা অবিশ্যি উড়িয়ে দেবার মতো নয়। মনে আছে, সেবার হতভাগা মেসে এসেই সেই সাঁওতালী ছুঁড়িটাকে কামাল করল—এ্যাঁ!

—থাম, কুলীকামীনদের পটানো আর ভদ্দর লোকের মেয়েকে ইয়ে করা, এক নয়। তবে ও শালা আবার মডার্ণ গান জানে কি না! চেহারাটাও অনাদরে অযত্নে, মায়াটানার মতো তৈরী।

হরিহর চিন্তিতভাবে সব-কিছু বিশ্লেষণের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

এ. সি. দাস সহসা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌ল—বাপটা বেইমান বটে কিন্তু ছেলেটা আর মেয়েগুলো কিন্তু অন্য রকমের। মানিকপুরের জলহাওয়াতে এমন ছেলেমেয়ে যে কি করে হ'ল তাই ভাবি। ওদের মা নিশ্চয় খুব ইয়ে—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে যে অবিনাশ জুৎ করতে পারবে না।

হরিহর খুব সায় দিল না—তিন-তিনটে এক লপ্তে রয়েছে কি না, তার মধ্যে একটাকেও কায়দা করতে না পারলে রাস্কেল মিথ্যে ধন্না দিত না।

পরম দার্শনিকের মতো বিড়ির টুক্‌রো ফেলে দিয়ে এ. সি. দাস বল্‌ল—ও শালা মরুকগে, যে কাঠ খাবে সে আংরা উগ্‌রে মরবে। আমাদের এত মাথা ব্যথার কি গরজ? তার চেয়ে বাবা দু-হাত তাস খেলা যাক।

রাত্রে আর খাওয়াদাওয়ার চিন্তা নেই—এ বেলা সবাই মিলে ছোলার ছাতু ভিজিয়ে ঐ কাজটা স্বল্পমূল্যে হাসিল করে, তাতে শুধু পয়সাই নয় খাটুনীও বাচে।

ঘোষালকে সেদিনের সভার পর আর কেউ দেখতে পায়নি। সে যে কোথায় নিরুদ্দেশ হ'ল কেউ জান্‌ল না, দিন তিনেক পরে খবর পাওয়া গেল তার প্রাণহীন দেহটা দামোদরের চরে পড়ে রয়েছে।

মানিকপুরের আন্দোলনের স্রোতে কিছুদিন ধরে ভাঁটা পড়ে এসেছিল। ঘোষালের মৃত্যুতে যেন সেই নিভু-নিভু মিট্‌মিটে ভাবটা কেটে গিয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড বেগের সঞ্চার হ'ল। একদিনের মধ্যেই শহরের হাওয়ায় অশান্ত বিক্ষোভ রুদ্ররোষে গর্জে উঠ্‌ল। শহীদের রক্তে শত শত বিদ্রোহী দীক্ষিত হোক, বলে পথে পথে শ্লোগান ছড়িয়ে বেড়াতে লাগল একদল লোক।

সেদিন বিকেলের আগেই সভা ডাকা হ'ল। বেলা দুটোয় সভা। 'মজতুর ভাইদের সামিল' হবার জন্য ঢেঁড়া পিটিয়ে গেল, ফেডারেশনের 'হুকুমদার' রসিকলাল। কালা রসিকলাল পানবিড়ির দোকানে জড়ের মতো বসে থাকতে পারেনি। সেও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে—যেন মহোৎসবের আস্বাদ গ্রহণের আনন্দ পায় সে এতে! শুধু দর্শক হয়েই বাকী জীবনটা বইয়ে দেওয়া রসিকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। ঢ্যাঁড়া পিটোনোর সময় রসিক তার ছোট ঢোলকটায় হাতের সবটুকু শক্তি দিয়ে কঠোর আঘাত কষিয়ে উচ্চ কণ্ঠে হাঁক দেয়, বোধকরি সে শব্দ ওর বধির কানেও পৌঁছয়।

সবাই বলাবলি করছে, ঘোষালের শবদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা করা হবে, একদল মজতুর নাকি এরই মধ্যে দামোদরের ধারে রওনা হয়ে গেছে, মৃতদেহটা উদ্ধার করে আনবার জন্য।

অপেক্ষাকৃত ভীরু, শান্ত প্রকৃতির মানুষগুলো নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল —মড়া নিয়ে হৈ চৈ করার কি দরকার ছিল? এ ত অপঘাত মৃত্যু, মুর্দার ওপর প্রেতের দৃষ্টি রয়েছে। সেই প্রেতকে এইভাবে শহরের মধ্যে ঢোকানোটা খুব শুভ কাজ হবে না। একেই ত একটা দুর্গ্রহের পাকে শহরের লোকের দুর্গতির শেষ নেই—এর ওপর আর একটা প্রেত!—অবশ্য এসব কথা কেউই সদরে প্রকাশ করল না, পাছে তাতে জনমতের বিরোধ সমঝায় কেউ।

দামোদরে এখন জল বল্‌তে বিশেষ কিছু নেই। ফাল্গুনের শেষ—ধূ-ধূ বালির প্রান্তর। কুমারী মেয়ের সাদা সরু সিঁথির মতই শীর্ণ জলরেখা। সেই সরু জল রেখার দিকে তাকালে তৃষ্ণা বাড়ে, শান্তির সাক্ষাৎ মেলে না।

শ'দেড়েক লোক পলাশ জঙ্গলের পাথুরে মাটির ওপর নিরাশ অবসন্নতায় এলিয়ে বসে রয়েছে। একজনের হাতে একগোছা জবার মালা। শ্রমিকনেতা ঘোষালজীর জন্য বয়ে এনেছে বেচারী। আরও দুচার জন ফুল-মালা এনেছে।

কিন্তু শবদেহটা কোথায় গেল ?

তবে কি এখানে নয় ? অথচ পাশের গ্রাম ময়নাপাড়াতে এরা খোঁজ করে জেনেছে জঙ্গলের মধ্যেই মৃতদেহ দেখা গিয়েছিল। যে লোকটি প্রথম সংবাদ নিয়ে গিয়েছিল তাকে সবাই জেরা করতে লাগল ঃ

—হ্যাঁ হে নটবর, তুমি অমন বোকা হয়ে কি ভাব্‌ছ ?—এখন মুর্দাটা গেল কুথা সেইটা বল ?

—এই ত সেই ঠাঁই বটে। আজ সকালে আমার মেয়েমানুষটা কাঠ নিতে এল, দ্যাখে মড়া। হোই তো মৌল গাছ—এসো, দ্যাখো ক্যানে এটাই, রক্ত বটে কি না ?

—হ্যাঁ রক্তই ত বটে !

পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল না, চোখেই দেখা যাচ্ছে শুক্‌নো রক্তের গাঢ়, কাল্‌চে-লাল রঙ্‌-এ খানিকটা জায়গার মাটি ঢাকা পড়ে গেছে। সে মাটির চেহারা আলাদা !

নটবর বল্‌তে লাগল—মেয়েমানুষটা ঘরবাগু ছুট্‌ছিলো—ডর-তরাসে ঠক্‌ঠক্‌ করে কেঁপে গিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। তখুন তো ভোর বেলা একটা মুতো হবে।

নটবরের কাছে সোজা হিসেব,—সকাল হ'লেই একটা বাজা দিয়ে দিন শুরু হয়, আর সূর্য যখন পাটে নামেন তখন সন্ধ্যায় বাজে বারোটা। নটবর এর আগেও এই কাহিনীই অনেক বার বলেছে। ভদ্দরপারা বাবু শুনে নটবর দেখতে এসেই চিনতে পারে ঘোষালবাবুকে। আর এই ঘোষাল-বাবুকে না চেনে কে ? তিনি ত টাঁড়ের বোঙার আশীর্বাদ পাওয়া মানুষ !

কিন্তু এর মধ্যে লাশটা কোথায় উবে গেল ?

নদীর চরের চারদিকে লোক ছড়িয়ে পড়ল। বনের মধ্যেও তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি চল্‌ল।—কোথাও কি পুঁতে ফেল্‌ল কেউ? জন্তু-জানোয়ারে ছিঁড়ে খেলেও ত তার ভুক্তাবশিষ্ট কিছু চিহ্ন পড়ে থাকবে!

ঘণ্টা তিনেক ধরে ওরা চরের জঙ্গল আর বালিবন তচ্‌নচ্‌ করে হাঁপিয়ে পড়েছিল। আস্তে আস্তে অনেকেরই কেমন যেন সন্দেহ হ'ল—এর পিছনে গভীর কোনো রহস্য রয়েছে। ঘোষালের মৃতদেহটা নিশ্চয় সরিয়ে ফেলেছে—মানে লুকিয়ে ফেলেছে কোন দলের লোক। ঘোষালের মৃত্যুটাই যখন রহস্যময় তখন গুম্‌ হওয়া আর বিচিত্র কি?

ফিরতি পথে ওরা দেখল সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। শ্রান্ত দেহমন, ব্যর্থ জীবনের রিক্ততায় অবসন্ন। ওদের চোখের দৃষ্টি থেকে সমস্ত আলো কে যেন নিংড়ে কেড়ে নিয়েছে! অনেক আশা নিয়ে ওরা ছুটে এসেছিল ধূ ধূ নদীর বালুবেলাতে—নেতার শবদেহের মধ্যেই যেন ওদের জীয়নমন্ত্র লুকোনো ছিল! সেটা খুঁজে পেল না। সেই হারানো মৃতদেহের নিরুদ্দেশ যাত্রার পিছু পিছু এই দেড়শ' মানুষের জীবনসত্তা কোথায় উধাও হয়ে চলে গেছে!—

ঢলে-পড়া সূর্যের দিকে মুখ করে যেন দেড়শটি শবদেহ হেঁটে চলেছে!

শহরে ফিরে ওরা শুনলো: সারথী, ইসমাইল প্রমুখ সাতজনকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, বেলা বারোটা নাগাদ। নিরঞ্জন ঘোষালকে হত্যার ষড়যন্ত্রে এরা লিপ্ত ছিল বলে পুলিশ সন্দেহ করছে। আর নিরঞ্জন ঘোষালের মৃতদেহটা সদরে চালান দেওয়া হয়েছে, ময়না তদন্তের জন্য। কখন কি ভাবে যে লাশ সরানো হয়েছে, সে রহস্য কারুর জানা নেই।

নিরঞ্জন ঘোষালের রহস্যময় মৃত্যু আর ফেডারেশনের অগ্রণীদের গ্রেপ্তারে মানিকপুরের হঠাৎ জ্বলে-ওঠা আন্দোলন-উত্তেজনা দপ্‌ করেই নিভে গেল।

এখন এগিয়ে এল সাম্‌নে অভিজিৎ সিং, সীতানাথ মুখুয্যে, লখীন্দর দত্ত, আব্‌দুল শেখ। হ্যাঁ আবদুল শেখও প্রকাশ্যে শ্রমিকদের দলে সামিল হয়েছে।

আশ্চর্য এই যে, আবদুল শেখকে দেখেও আজ কোনো কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'ল না। ত্রাসের ছায়াপ্রভাবে সব যেন মায়াগ্রস্ত!

মজদুরদের সভায় সীতানাথ মুখুয্যে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে নিরঞ্জন ঘোষালের আকস্মিক মৃত্যু উপলক্ষে শোক-প্রস্তাব আনলেন।

তারপর অভিজিৎ সিং বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়িয়ে জানালো : কলকাতা থেকে স্বামীসাহেব 'তার' করে জানিয়েছেন, খুব জরুরী কাজে আজই আমেদাবাদে রওনা হয়েছেন তিনি। এদিকে মালিক মহলের সঙ্গে তাঁর যা চূড়ান্ত কথাবার্ত্তা হয়েছে, তাও জানিয়েছেন স্বামীসাহেব।

স্বামীসাহেব জানিয়েছেন যে, মানিকপুরের শ্রমিক আন্দোলনে একতার পরিচয় বিস্ময়কর। এখানকার মজদুর ভাইয়েরা স্বামীসাহেবকে মুগ্ধ করেছে, অভিভূত করেছে। তবু এখন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তাতে সবদিক বেশ ভেবে চলার দরকার। এই একতার ভরসা থাকা সত্ত্বেও মস্ত বড় যে একটা গলদ গোড়াতে রয়ে গেছে : বেআইনী ধর্মঘট। যে তারিখে ধর্মঘট করার কথা ছিল, সেই তারিখের দু-দিন আগেই ধর্মঘট করা ভুল হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ বল্‌ছে যে এটা ধর্মঘট নয়, কোম্পানীর তরফ থেকে দরজা বন্ধ করার দরুণে শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়েছে। স্বামীসাহেব প্রথমে সেই রকম শুনেই নেতৃত্ব করতে এসেছিলেন—কিন্তু এখন প্রমাণ-প্রয়োগ যা মিল্‌ছে তাতে তাঁর ধারণা হয়েছে যে, কোম্পানী তালাবন্ধ করে নি। এ ক্ষেত্রে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে মালিকেরা মামলা রুজু করলে সমূহ সংকটের আশঙ্কা রয়েছে। স্বামীসাহেব ঠাণ্ডামাথায় বিবেচনা করে বুঝেছেন, কোম্পানীর সঙ্গে মিটমাট করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

শ্রমিকরা তাঁর উপর আস্থা রাখে, সেহেতু তিনি শ্রমিকদের সম্মতি এবং সমর্থন পাবেন জেনেই ডিরেক্টরদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কয়েকটি দাবি এসেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দাবিটি হচ্ছে ধর্মঘটের জন্য যতদিন কারখানা বন্ধ ছিল ততদিনের বেতন কোম্পানী দেবে না। এ ছাড়া আরও কয়েকটি শর্ত রয়েছে। স্বামীসাহেব ফেডারেশনের বিপদের কথা চিন্তা করেই সবগুলি শর্ত মেনে নিয়েছেন। আর এইসঙ্গে তিনি একটা দাবি মঞ্জুর করিয়েছেন, আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব করেছে, তাদের উপর কোনরকম অত্যাচার কোম্পানী করতে

পারবে না। এতে করে শ্রমিকদের মঙ্গলই করেছেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

অভিজিৎ সিং স্বামীসাহেবের টেলিগ্রামের সার মর্ম শুনিয়ে একবার মিলিত জনতার দিকে চোখ বুলিয়ে দিল। তারপর আবার বল্‌তে শুরু করল সে: স্বামীসাহেবের কথা শুনে আমাদের বন্ধুরা কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে কাজটা তিনি ঠিক করেন নি। আমার নিজেরও প্রথমে সেইরকমই মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ একথাটা লুকিয়ে রেখে লাভ নেই যে, ফেডারেশনের মাথাওয়ালা নেতাদের মধ্যে একতায় চিড়্ ধরতে শুরু করেছিল। আমার মনে হয় যে, সেই ভাঙনের দৌলতে চোরাগোপ্তা খুন-জখমও আরম্ভ হয়েছে। ভাই সব, একথা ভুল্‌লে ত চল্‌বে না যে, ন হাজার মজদুরের, আর তাদের বাপ-মা-জরু-বাচ্ছার সব ভালাই-এর ভারি বোঝা আমাদের ঘাড়ে রয়েছে। এখানে হুঁশিয়ার হয়ে চল্‌তে হবে। একটু চালে ভুলচুক হ'লে কত লোকের জানমান বিল্‌কুল বরবাদ হয়ে যাবে। তাই বল্‌ছি যে, স্বামীসাহেব হয়ত আমাদের ষোলআনা পুরো আদায় আন্‌তে পারেন নি, বল্ কি তিনি চেষ্টা করেছেন, এ কৌশিস্-এর কি দাম কিছু নয়? আলবৎ এটাই বড় কথা।...

আরে ভাই, আমাদের মান বাঁচাতে হবে, জান বাঁচাতে হবে! সেকথা আমরা ভুলতে ত পারি না। আগর আজ যদি মাম্‌লা জুড়ে দেয় কোম্পানী, ও শালার আর কি, টাকা আছে লড়াই করবে। কিন্তু আমরা আজ নাঙ্গা, ভিখ্‌মাঙ্গার দল—এই লম্বা লড়াইতে মদত্ দিয়ে ঘটিবাটি খতম, মাথার চুল ত বিকিয়ে গেছে ধারদেনাতে—এখন মেনে নিলে পরে মান-জান দুটোই বাঁচে! একথাটা ঘোষালদের বোঝাতে গিয়েই ত আমি শালা বেওকুফ্, বুর্‌বাক বনেছিলাম। লেকিন আজ স্বামীসাহেবের মতো উম্‌দা লীডার ভি সেই পরামর্শ দিচ্ছে। তখন এটাই ভালো—কেমন কি না!

জনতার মধ্যে কোনো উত্তেজনা নেই, মৃদু গুঞ্জনও হচ্ছে না।

সবাই যেন হতচকিত হয়ে পড়েছে! বাদানুবাদের মত শক্ত মন যেন মরে গেছে! এরা সব যন্ত্র! অভিজিৎ সিং এই আন্দোলনের সময়ে কোথায় পিছিয়ে পড়েছিল, কিন্তু আজ সহসা সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে নতুন বাণী শোনাচ্ছে

যেন! ঝাড়া দেড় ঘণ্টা ধরে সে বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ চালালো। এবং পরিশেষে জানালো যে, কোম্পানীর কর্তারা দু-এক দিনের মধ্যেই জানাবেন কারখানা কোন্ তারিখে খোলা হবে।

আবার কারখানার কর্কশ বাঁশির ডাক সবাই শুনতে পাবে! কারখানা খুলবে?

জড়ের মধ্যে প্রাণসঞ্চারের আভাস দেখা দিল। অলস কর্মহীন দিনযাপন আর যেন ভালো লাগে না! খুলুক কারখানা। কাজ করে মানুষ বাঁচুক!

মানিকপুরের ছোট্ট ডাকঘরে ভিড় জমে উঠল, ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়িতে পোস্টমাস্টার, পিওন সবাই উদ্ব্যস্ত। একঘণ্টার মধ্যে খাম, পোস্টকার্ড, টিকিট, সব সাফ হয়ে গেল। আর কিছু নেই। যা ছিল সব শেষ। খবর পাঠাচ্ছে সবাই। অনুপস্থিত শ্রমিকদের ফিরে আসার আহ্বান!

অবিনাশ চাটুয্যে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে—স্যাব আমার টেলিগ্রাফের কি হবে? টিকিট দিন!

—নেই, কিছু নেই, কতবার বল্‌বো?

—তাহলে কি উপায়! গাঁয়ে গিয়েছে গোবিন্দ—তাকে যে খবর দিতে হবে।

—এসব আগে থেকে ভেবে রাখেন না কেন? আমার—

—ভাবব কি করে? দিব্যি দেখলাম নেতাগুলো জেলে ঢুক্‌ল, তাতে হাওয়া আরো তাত্‌বে ভেবে নিশ্চিন্দি ছিলাম—

—আপনাদের মশাই থেকে থেকে রকম-রকম নাচ্! আমবা সরকারী চাকরী করি। আপনাদের তালে তাল দেওয়া কোম্পানীর কাজ। সেখানকার হুদোয় যতো কসরৎ দেখাতে চান হ্যাখান। এখানে কেন? যান-যান ওসব লেবার-ফেবারের কথা সরকারী জায়গায় জুড়বেন না। শেষে চাক্‌রীটা আমার চলে যাক আর কি!

—কিন্তু স্যার, বেশি দাম দিলে যদি কোনো উপায় হয় তাই নয় করে দিন।

—বলেছি ত এখন গিয়ে ঘুমোন—কাল আসবেন। ঝাঁপ বন্ধ আজ।

—মাইরি, ইয়ার্কি নয় বড্ড দরকার।

অবিনাশের মুখের সামনে মাস্টারমশাই জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে শেষ জবাবটা কায়েম করলেন। তারপর গালাগালি দিতে দিতে অবিনাশ চলে গেল।

স্ট্রাইকটা চল্‌ছিল, বেশ ছিল সে, মোটামুটি উপরি আয়টা জমে উঠেছিল—এখন আবার সেই পোঁটা চুন্নীর পো হয়ে, রোজের মাইনেটুকু! একটাকা চৌদ্দ আনা রোজের রোজগারে দিল্ খুশ রাখ্‌তে হবে! ক্রিং ক্রিং ক্রিং—ভিড়ের পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে অবিনাশ সীতানাথ মুখুয্যের কোয়ার্টারের সাম্‌নে এসে ব্রেক কষ্‌ল। মরুক গোবিন্দর দল, যেমন শখ করে কোম্পানীর সঙ্গে লড়াই লাগাতে গিয়েছিল তেমনি তার ফল ভুগবে। অবিনাশের কোনো দোষ নেই—পোস্ট-অফিসের কারসাজির জন্যে সে ত আর দায়ী হতে পারে না!